উনিশ শতকে
বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র
[১৮৪৭-১৯০৫]

সপ্তম খণ্ড

উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র

[১৮৪৭-১৯০৫]

সপ্তম খণ্ড

মুনতাসীর মামুন

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

উৎসর্গ

প্রয়াত শ্রী বিনয় ঘোষ
দু'দশক আগে প্রথম সাক্ষাতেই
যিনি এ গ্রন্থমালা শুরু করার
উৎসাহ দিয়েছিলেন

সূচিপত্র

ভূমিকা

উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছিল বাংলা একাডেমী। বর্তমান খণ্ডটি সপ্তম খণ্ড। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৯১ সনে (১৯৮৫)। ঐ খণ্ডে সামগ্রিকভাবে উনিশ শতকে প্রকাশিত বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাকি এবং বতমান খণ্ডে সংকলিত হয়েছে ঐ সময়ে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত যেসব সংবাদ-সাময়িকপত্র পাওয়া গেছে তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ রচনা ও সংবাদ। তাই প্রথম খণ্ডটিকে বাকি খণ্ডগুলির ভূমিকা হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় খণ্ডটি বিভক্ত দু'টি পর্বে। প্রথম পর্বে সংকলন করা হয়েছে সংবাদপত্রসমূহ থেকে। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ সংবাদ-সাময়িকপত্র আর এখন পাওয়া যায় না। সুতরাং, যা-ই খুঁজে পেয়েছি তা থেকেই সংকলন করেছি। দ্বিতীয় খণ্ডে সাময়িকপত্র ছাড়া, 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' ও 'বঙ্গবন্ধু' থেকে সংবাদ/রচনা সংকলিত হয়েছে। 'রিপোর্ট অন দ নেটিভ পেপার্স' থেকেও সংকলন করা হয়েছে।

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডে সংকলন কবা হয়েছে মাত্র একটি সংবাদপত্র থেকে এবং তা' হলো 'ঢাকা প্রকাশ'। এ পত্রিকাটিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার কারণ আছে। উনিশ শতকে পূববঙ্গ থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ সংবাদ-সাময়িকপত্র আজ আর পাওয়া যায় না। বিদেশে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কয়েকটি পত্রিকার অল্প কিছু সংখ্যা আছে। 'ঢাকা প্রকাশ'-ই একমাত্র পত্রিকা যার অধিকাংশ সংখ্যা অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছে। এ ছাড়া 'ঢাকা প্রকাশ'-এর মতো আর কোন পাত্রিকা এতো দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিতও হয় নি। প্রায় একশো বছর টিকেছিল পাত্রিকাটি। শেষের দিকে 'ঢাকা প্রকাশ' অবশ্য প্রকাশিত হতো নিলামের ইস্তেহার হিসেবে। পত্রিকাটির পাতায পাতায় ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের আর্থ- সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়ের বিভিন্ন উপাদান। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে আমি মাত্র চল্লিশ বছরের 'ঢাকা প্রকাশ' থেকে অল্প কিছু সংবাদ/রচনা সংকলন করেছি। তবে পাঠকদের সুবিধার জন্য চতুর্থ খণ্ডে 'ঢাকা প্রকাশ'-এ প্রকাশিত রচনার একটি সূচি সংযোজিত হয়েছে।

পঞ্চম খণ্ডে সাপ্তাহিক 'হিন্দু রঞ্জিকা' [১৮৮৭, ১৮৮৮ ও ১৮৯৯-১৯০০] থেকে সংকলন করা হয়েছে। 'হিন্দু রঞ্জিকা'র আর অন্য কোন বছরের ফাইল খুঁজে পাওযা যায় নি।

ষষ্ঠ খণ্ডটি একটু ব্যতিক্রম। এ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ঢাকা নিউজ' (১৮৫৭-৫৮) থেকে। 'ঢাকা নিউজ' শুধু ঢাকার প্রথম সংবাদপত্রই নয়, পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিকও বটে। 'ঢাকা নিউজ'-এর সঙ্গে ঢাকার মুদ্রণ ইতিহাসও জড়িত। এ খণ্ডে প্রবাসী ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা পাই।

'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র'-এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল একটি কারণে। বর্তমান বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে তখনও

বিস্তারিত গবেষণা হয় নি। সামগ্রিকভাবে, বাংলা-সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে কিন্তু তাতে কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রই গুরুত্ব পেয়েছে। প্রধানত সে অভাব পূরণের জন্যই এ গ্রন্থের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। গ্রন্থের সময়সীমা ১৮৪৭ থেকে ১৯০৫। ১৮৪৭ থেকে শুরু করার কারণ, ঐ সময়ই বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' প্রকাশিত হয়েছিল। আর ১৯০৫ সালতো বঙ্গভঙ্গের কারণে বাংলার ইতিহাসে অধিকার করে আছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। যদিও এ গ্রন্থে ১৯০০ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে আলোচনা করেছি তবুও গ্রন্থের শিরোনামে উনিশ শতকই ব্যবহার করা হলো। বর্তমান গ্রন্থে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ বলতে বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা বোঝানো হয়েছে।

বর্তমান খণ্ড যেহেতু সাময়িকপত্রভিত্তিক সেহেতু এর রচনাসমূহকে সংবাদপত্রের সংবাদ/রচনার মতো বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করা যায় নি বরং এগুলিকে সাজানো হয়েছে ভিন্নভাবে। এ পর্বে, প্রথমে সাময়িকপত্রের নাম, তারপর প্রাপ্ত সংখ্যাসমূহের সূচি ও সংকলন। এ ক্ষেত্রে প্রথমে সংখ্যা ও তারিখ, তারপর সূচিপত্র। সূচিপত্রে যে বিষয়টি উদ্ধৃত বা সংকলন করেছি তার শিরোনাম দেওয়া হয়েছে বোল্ড টাইপে।

বর্তমান খণ্ডটি স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য অনেকক্ষেত্রে পরবর্তী খণ্ডসমূহে উল্লিখিত বক্তব্য, টীকার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

২

বর্তমান খণ্ডের ভিত্তি উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং এ শতকের শুরুতে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত কিছু সাময়িকপত্র। সংবাদপত্রের মতোই উনিশ শতকে প্রকাশিত পূর্ববঙ্গের সাময়িকপত্র দুষ্প্রাপ্য। দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩টি সাময়িকপত্র থেকে সংকলন করা হয়েছিল। ১৩টি সাময়িকপত্রের পুরো সিরিজ নয়, কিছু সংখ্যা মাত্র। বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হয়েছে ১০টি সাময়িকপত্র। সেগুলি হলো

সেবক	১৩০৩ [১৮৯৬]
অঞ্জলি	১৩০৫ [১৮৯৮]
কল্যাণী	১৩০৮-১৩০৯ [১৯০২-৩]
আরতি	১৩০৭-০৯ [১৯০১-১৯০৩]
আশা	১৩০৯ [১৯০২]
ভারত সুহৃদ	১৩০৯ [১৯০৩]
ধূমকেতু	১৩১০ [১৯০৩-৪]
নববিকাশ	১৩১১-১২ [১৯০৪-১৯০৫]
জীবন সহচর	১৩১২ [১৯০৫]
বৌদ্ধ পত্রিকা	১৩১২ [১৯০৫]

৯টি মাসিক পত্রিকার ৮০টি সংখ্যার সূচিপত্র ও উল্লেখযোগ্য অংশ এ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। একদিক থেকে এ খণ্ডটি উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, সংকলিত অধিকাংশ

সাময়িকপত্র আগে গবেষকরা দেখেননি বা ব্যবহার করতে পারেন নি ; অনেক জায়গায় উল্লেখ হয়ত দেখেছিলেন।

উল্লিখিত সাময়িকপত্রসমূহ রক্ষিত আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পী মুর্তজা বশীর আমাকে এ সংগ্রহের সন্ধান দিয়েছিলেন সাহিত্যবিশারদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে প্রচুর সাময়িকপত্র ছিল যার অধিকাংশ অযত্নে নষ্ট হয়ে গেছে। এ সংগ্রহের একটি অংশ এখন রক্ষিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই সংগ্রহ আমার সময়কালে প্রকাশিত সাময়িকপত্র বেছে নিয়ে সংকলন করেছি। এর সাহায্যে আমরা তৎকালীন পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনা চরিত্র ইত্যাদির একটি রূপরেখা তৈরি করতে পারি।

এ পটভূমিকায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হয় হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না তার জন্ম চট্টগ্রামের পটিয়ার সূচক্রদণ্ডী গ্রামে ১৮৭১ সালে। এন্ট্রান্স পাস করেন ১৮৯৩ সালে এবং চট্টগ্রাম কলেজে এফ এ পড়ার সময় সান্নিপাত রোগে আক্রান্ত হলে কলেজ ত্যাগ করেন। ১৮৯৫ সালে কর্মজীবন শুরু করেন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষক হিসেবে। পরে, কবি নবীনচন্দ্র সেন তাকে তার অফিসে কেরানীর চাকরি দেন। নবীনচন্দ্র ছিলেন তখন চট্টগ্রামের কমিশনারের পার্সোনাল এ্যাসিসট্যান্ট। আবদুল করিম সে সময় থেকেই পুঁথি সংগ্রহ করছিলেন। পুঁথি সংগ্রহের কারণে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'জ্যোতি' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ১৮৯৭ সালে। এ বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে নবীনচন্দ্রের বিরোধীরা ঘোট পাকায়। পরিণামে আবদুল করিম চাকরিচ্যুত হন ও নবীনচন্দ্রকে কুমিল্লায় বদলী করা হয়। এরপর কিছুদিন বেকার থাকার পর আবার শিক্ষকতায় যোগ দেন। ১৯০৬ সালে চট্টগ্রামের স্কুল ইনসপেক্টরের অফিসে কেরানীর চাকরি লাভ করেন এবং ১৯৩৪ সালে অবসর গ্রহণের পূর্বপর্যন্ত একই পদে ছিলেন।

আবদুল করিমের অন্যতম শখ ছিল বিভিন্ন স্থান ঘুরে পুঁথি সংগ্রহ বাংলা সাহিত্যের একটি সময়ের ইতিহাস জানা যেত না যদি না তার বিশাল পুঁথি সংগ্রহ থাকত। নিরন্তর তিনি পুঁথি খুঁজে বেড়িয়েছেন, এ কারণে চাকুরিও হারিয়ে ছিলেন কিন্তু দমে যান নি। তার সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা প্রায় দুই হাজার যা তিনি দান করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বরেন্দ্র যাদুঘরে। সংগৃহীত অনেক পুঁথি তিনি সম্পাদনা করে টীকাভাষ্য তৈরি করে প্রকাশ করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন "গ্রন্থের সম্পাদনা করিতে যেরূপ কৌশল, যেরূপ সহৃদয়তা ও যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সমস্ত বাঙ্গালায় কেন, সমস্ত ভারতেও বোধহয় সচরাচর মিলে না। এক কথায় মনে হয় যেন কোন জার্মান এডিটর গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছেন। ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছিলেন, "তিনি ব্যক্তি নহেন তিনি একটি প্রতিষ্ঠান।"

পুঁথি সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সাময়িকপত্র সংগ্রহও ছিল তার নেশা। মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী জানিয়েছেন 'আবদুল করিম সাহেবের সাহিত্যিক জীবনের দুটি গতি লক্ষ্য করা যায়। একটি হলো প্রাচীন পুঁথিপত্র সংগ্রহ ও তার তথ্য তালাশ করা, অপরটি হলো সাময়িকপত্রাদি ...। এই সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহটিও যে সমভাবেই তার কীর্তির অপর পরিচয় এ সন্ধান আমাদের জানা নেই। অথচ এর মূল্যও কোন অংশে কম ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে প্রায় বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়, বিশেষ

করে আধুনিক কালের মুসলিম সাময়িক সাহিত্যের তথা মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান তথ্যের সন্ধান এই সংগ্রহটির মধ্যে ছিল।"

অধ্যাপক আবদুল করিম জানিয়েছেন ঐ সংগ্রহ থেকে "চার হাজারের বেশী" সাময়িকপত্র ১৯৭৮ সালে অধ্যাপক আহমদ শরীফ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন।

আবদুল করিম বেশ কিছু পুথি সম্পাদনা করেছিলেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' (১৩২১), শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষ বিজয়', আলাওলের 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি। এছাড়া ড এনামুল হকের সঙ্গে রচিত আরাকান রাজ সভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' ও 'ইসলামাবাদ' উল্লেখযোগ্য। ১৩০৯ সালে 'চট্টল ধর্মমণ্ডলী' তাঁকে 'সাহিত্যবিশারদ' উপাধি প্রদান করে। ১৯২০ সালে নদীয়া সাহিত্য সভা উপাধি দেয় 'সাহিত্য সাগর'। তবে সাহিত্যবিশারদটিই সবসময় তার নামের শেষে ব্যবহার করা হয়েছে। তার মৃত্যু সূচক্রদণ্ডীতেই ১৯৫৩ সালে।[১]

৩

১৮৭০ ৯০ এ সময়টুকু ছিল পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর জাগরণের কাল [দ প্রথম খণ্ড]। এ সময়টুকুতে, অধিকাংশ সংবাদ সাময়িকপত্রের উদ্যোক্তা ছিলেন হিন্দু পেশাজীবী বা ভদ্রলোকরা। কারণ হিন্দু মধ্যশ্রেণীর বিকাশ শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই এবং বাংলায় ছিলেন তারা আধিপত্য বিস্তারকারী সম্প্রদায়। শিক্ষাদীক্ষা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গে তারা এগিয়ে ছিলেন, মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সমাজে ছিলেন পশ্চাৎপদ। তাই আমরা দেখি এ সময় মুসলমানদের পত্র পত্রিকার সংখ্যা কম।

বুদ্ধিজীবী কাকে বলবো এবং ঔপনিবেশিক কাঠামোয় তাদের চিন্তার জগত কি রকম হয় তা প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। যদি ধরে নিই, সংবাদ-সাময়িকপত্রের সম্পাদক, লেখক এবং সভা সমিতির শিক্ষিত উদ্যোক্তারা ছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অগ্রণী অংশ তাহলে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত বিশ্লেষণ করলে একই সঙ্গে পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর চরিত্র, জাগরণের রূপ স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এখানে অবশ্য একটি কথা উল্লেখ্য। কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে 'নবজাগরণ' এর সৃষ্টি হয়েছিল তার পুরোটা ছিল এক বিশেষ সম্প্রদায়, হিন্দু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। কিন্তু বাংলাদেশের উভয় সম্প্রদায়েরই ভূমিকা ছিল এই জাগরণে। এটা ঠিক, সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন হিন্দু মধ্যশ্রেণী কিন্তু মুসলমানরা পিছিয়ে থাকলেও তাদের যেটুকু সম্বল ছিল সেটুকু নিয়েই এগিয়ে এসেছিলেন। এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। ১৮৭০ ৯০ এর মধ্যেই হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সংবাদ সাময়িকপত্রের বিকাশ হয়েছিল। শুধু তাই নয় পূর্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমান লেখকদের অধিকাংশ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল এ সময়।

---

১ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জীবন ও কর্মের জন্য দেখুন—আজহারউদ্দিন খান *মাঘ নিশীথের কোকিল* কলকাতা ১৯৮৬। মুহম্মদ এনামুল হক ও কবীর চৌধুরী সম্পাদিত, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারক গ্রন্থ* ঢাকা ১৯৬৯।
আবদুল করিম, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ জীবন ও কর্ম* ঢাকা ১৯৯৪

বিশেষ করে এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে গিয়ে আনিসুজ্জামান লিখেছেন-"১৮৭০ খৃষ্টাব্দকে মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সীমারেখা বলে মনে করা অসমীচীন নয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দকে এই যুগান্তরেব কাল বলে মনে করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। সরকারী শিক্ষানীতির পরিবর্তনের ফলে এই সময় থেকে বাংলার মুসলমানদেব মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে। এই শিক্ষা আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টিতে মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করে।"[২] সুতরাং বলা যেতে পারে, পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর জাগরণ ঠিক একতরফাভাবে একটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র কবে গড়ে ওঠেনি। শুধু তাই নয়, কলকাতাকেন্দ্রীক নবজাগরণ ঠিক কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু পূববঙ্গে, সবকিছু ঢাকা-কে কেন্দ্র করেই বিরাজ করেনি। ঢাকা হয়ত অগ্রণী ছিল কিন্তু এ জাগরণেব রেশ ঢাকার বাইরে মফস্বলেও পৌঁছেছিল। বতমান সংকলনের সাময়িকপত্রগুলি এব প্রমাণ। তবে, এটাও ঠিক, এ জাগবণ একটি শ্রেণীর ভগ্নাংশেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সংকলিত সাময়িকপত্রগুলির সময়কাল ১৮৯০-১৯০৫। সুতবাং উপযুক্ত মন্তব্য এ সময়কাল সম্পর্কেও কমবেশি প্রযোজ্য। এ সময়টা ছিল বাংলাব মধ্যশ্রেণীর আত্মানুসন্ধানের সময়। ইংবেজ শাসনের বিরুদ্ধে অনেক আগে থেকেই সংবাদ-সাময়িকপত্র, বিশেষ করে সংবাদপত্রে লেখালেখি হচ্ছিল। এই অসন্তোষ এই সময একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা পেয়েছিল যার অন্য নাম স্বদেশি আন্দোলন। দেশাত্মবোধেব এই ধারা শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতে রাজনীতিতে সব পর্যায়ে শুরু হযেছিল আবো আগেই। কংগ্রেসেব প্রভাব ধীরে ধীবে বাডছিল কিন্তু এ প্রশ্নও উঠছিল যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ২৯ বছর পরও কংগ্রেস কিছু করতে পারে নি। এ প্রশ্ন-ই যে মধ্যশ্রেণীর একাংশ-কে সশস্ত্রপন্থায় উদ্বুদ্ধ করেছিল তা বললে বোধ হয় অসমীচীন হবে না। এ সময়টুকুব কথা মনে রেখেই বোধহয় লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ — ". বাঙ্গালির চিত্ত ঘরেব মুখ লইয়াছে--নানাদিক হইতে তাহার প্রমাণ পাওযা যাইতেছে। কেবল যে স্বদেশের শাস্ত্র আমাদেব শ্রদ্ধা আকষণ কাবতেছে এবং স্বদেশী ভাষা স্বদেশী সাহিত্যের দ্বাবা অলংকৃত হইয়া উঠিতেছে তাহা নহে, স্বদেশের শিল্প দ্রব্য আমাদের কাছে আদর পাইতেছে, স্বদেশের ইতিহাস আমাদের গবেষণাবৃত্তিকে জাগ্রত করিতেছে, রাজদ্বারে ভিক্ষাযাত্রার জন্য যে পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যহই একটু একটু করিয়া আমাদিগকে গৃহদ্বারে পৌঁছাইযা দিবারই সহায়তা করিতেছে।[৩]

এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং জন প্রতিক্রিয়া সংগঠনে ভূমিকা পালন করে যার তীব্র পরিণতি দেখি বঙ্গভঙ্গের সময়। সে সময়টি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ছাপ ফেলেছে লেখক এবং সম্পাদকের ওপর। সংকলিত সাময়িকপত্রগুলির সূচিপত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবো নিজের শেকড় অন্বেষণের দিকে ঝোঁক বাড়ছে। ভাষা-শিক্ষাকে আত্মোন্নতির মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এবং সব কিছু মিলে সৃষ্টি করেছে স্বদেশী ভাবের। উদাহরণস্বরূপ কিছু সাময়িকপত্রের সূচিপত্র থেকে কিছু বিষয়ের শিরোনাম উদ্ধৃত করছি—ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার.

২ আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ ৪৪৭।

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, 'আত্মশক্তি'. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ৩খণ্ড, কলকাতা, ১৯৫৭।

দক্ষিণ বঙ্গ [আরতি] ; মহাকবি কালিদাস, প্রাচীন স্ত্রী কবি তারিনী দেবী, ঢাকা দক্ষিণ, ভাষানুসন্ধান (বাঙ্গালার গ্রাম্য গীতি) [আশা] ; ধর্ম্মের পটভূমিতে হিন্দু ও মুসলমানের একত্ব, আলাওলের পদাবলী, বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা ভাষা, মাননীয় সুরেন্দ্র নাথ, রাজা রামমোহন রায় [ভারত সুহৃদ] , বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্গমহিলা, আমাদিগের মাতৃভাষা [ধূমকেতু] ; প্রাচীন হিন্দু বাণিজ্য এবং প্রভাব, প্রাচীন ভারতের উপনিবেশ, মুসলমান কবির বাঙ্গালা গীত [নববিকাশ] প্রভৃতি। 'অঞ্জলি'তে ইতিহাস শিক্ষা বিশেষ করে বাংলার ইতিহাস শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এ ছাড়া সাধারণভাবে শিক্ষা, কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনের ওপর জোর দেয়া হয়েছিল। 'অঞ্জলি'-তে লেখা হয়েছিল—

১ "মানবজীবনপট ও শিক্ষার আলোক পাইয়া ক্রমশ বিস্তারিত ও চিত্রিত হয়।"
২ "শিক্ষা জীবন স্রোতের গতির নিয়ামক"
৩ "লেখাপড়া শিক্ষার এক প্রকরণ বা বিধাতার একটী তুলি
৪ "জীবনপট অনন্ত অতএব শিক্ষার ও সমাপ্তি নাই"
৫ "জগৎ শিক্ষার উপাদান শিক্ষার উপাদান সমুদয়ই বিজ্ঞানময় হওয়া প্রয়োজন। সুশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর যাহা কিছুর সহিত সম্পর্ক হইবে তত্তাবৎ সমুদয়ই বিজ্ঞানের অন্তর্গত এবং শৃঙ্খলাময় ও সুসজ্জিত হওয়া প্রয়োজনীয়।" [অঞ্জলি, ১/১ ১৮৯৮]

'আরতি'-তে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ গ্রাম্যগীতি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। আঞ্চলিক ইতিহাস প্রভৃতির ওপর প্রকাশিত হয়েছিল প্রবন্ধ।

প্রতিটি সাময়িকপত্রই কোন না কোনভাবে বাঙ্গালি জাতির জীবনে বাঙ্গালা ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিল। কয়েকটি উদাহরণ—

১ "যেমন স্কুলগুলিতে ইংরেজার পাঠদান এবং হাইস্কুলগুলির নিম্নস্থ শ্রেণীগুলিতে বাঙ্গলাতে শিক্ষাদান প্রবর্ত্তিত হইলে এদেশে বাঙ্গলা শিক্ষায় নবযুগ উন্নতযুগ আরম্ভ হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি হইবে।' [অঞ্জলি ২/৫ ১৩০৫]

২ "আমাদের মাতৃভাষা একরূপ না করিয়া [illegible] ভাষা করিবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করেন তাহারা জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতীয় উন্নতি সর্বতোভাবে ভাষার উন্নতি সাপেক্ষ উন্নতি প্রাপ্ত জাতি মাত্রেরই ভাষাও উন্নত ভাষার উন্নতি ব্যতীত জাতীয় উন্নতি অকাশ কুসুম।" [কল্যাণী]

৩ "বঙ্গভাষা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিলে বঙ্গভাষা বলীয়ান হইলে আদিম ভাষাও সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হইবে ইহা বলা অসঙ্গত হয় না, এবং এই ভাষার সেবা করিলে আমাদের জাতীয় ভাষাকেই সেবা করা হইবে। আমাদের জাতীয় জীবনের একটী অঙ্গ পুষ্টি ও পূর্ণতা লাভ করিবে, আমাদের জাতীয়তা ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।" [কল্যাণী। ১/৭-৮, ১৩০৯]

সাম্প্রদায়িক সংপ্রীতি ব্যতীত যে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয় এ কথা সম্পাদকরা অনুধাবন করেছিলেন, 'কল্যাণী' সম্পাদকের স্বাদেশিকতা অস্পষ্ট থাকেনি। তাঁর পত্রিকায় 'সীতারামোৎসব' ও আঞ্চলিক কিছু সংবাদ এর উদাহরণ। হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী স্বাদেশিকতার ভক্ত

হলেও সম্পাদক সবসময় হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায়ের পক্ষে ছিলেন এবং নিজ পত্রিকায় তার গুরুত্বও দিতেন।

'ভারত সুহৃদ' ও গুরুত্ব আরোপ করেছিল সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উন্নতির ওপর। পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল—"উভয়েতে যতোই জাতিগত স্বতন্ত্র সঙ্কীন বৈলাক্ষণ্য থাকুক, আজকাল হিন্দু-মুসলমান উভয়েই উদারতাব উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, পরস্পরের সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া উভযের সংযোগ গঠিত বাঙ্গালী জাতির গৌরব-বন্ধনে একান্ত অভিলাষী। এই ক্ষণ বাঙ্গালীর গৌরব, বাঙ্গালীর উৎকর্ষ, বাঙ্গালীর জয় বলিলে, উৎকর্ষ ও জয় সূচিত হয় এবং বাঙ্গালী বলিলে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের একত্র সমাবেশে নির্দেশিত হয়। আজকাল বাঙ্গালী বলিলে কেবল মাত্র হিন্দু বা মুসলমানের নির্দ্দেশ হয না, পরন্তু উভয়েব মনোহর সংযোগ স্থাপিত হয়। বাঙ্গালী সমাজ দুই সমাজের সমষ্টি, হিন্দু ও মুসলমান।" [ভাবত সুহৃদ, ১/৩, ১৩০৯].

স্বদেশী আন্দোলনেব ওপব মন্তব্য করেছিল 'নববিকাশ'—

"বিংশতি শতাব্দীতে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাও মহাপুরুযগণ কর্তৃক রক্ষিত হইবে, ছাত্রগণ উপলক্ষ মাত্র। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই দেখিবেন—সামাজিক কুনীতি, অধর্ম্ম ও অত্যাচার নিরাকৃত করিবার জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুযগণ চেষ্টিত হইবেন। এই স্বদেশী আন্দোলনে ঈশ্বরের হস্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ; ইহার বিনাশ নাই। ভ্রাতৃগণ! আপনাবা শত্রুপক্ষেব ভ্রূভঙ্গীতে ও উপহাসে ভীত বা নিরুৎসাহিত হইবেন না।" (২/৬-৭, ১৩১২)

কংগ্রেসেব আবেদন-নিবেদনের বাজনীতি নিযে মধ্যশ্রেণীর একাংশের মনে প্রশ্ন জেগেছিল। প্রশ্নটি ছিল ২০ বছর কংগ্রেস আবেদন-নিবেদন করেছে কিন্তু তাতে কি কোন ফল হয়েছে? সুতরাং বিকল্প পন্থা প্রয়োজন। এই বিকল্প পন্থা ছিল আবেগজাত যার অন্য নাম স্বদেশী আন্দোলন এবং পরিণতি বিপ্লববাদে যাবে অনেকে বলেছেন সন্ত্রাসী আন্দোলন। যে সমযকার সাময়িকপত্র নিয়ে আলোচনা করছি তখন প্রশ্নটি মাত্র উত্থাপিত হযেছে এবং অনেকে চাইছিলেন, একটি সমন্বয় বা মধ্যপন্থা যা প্রকাশ পেয়েছে 'নববিকাশ'-এ—

"যে কোন পক্ষ যখন দেশ হিতকর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন তৎপ্রতিপক্ষগণ যেন সেই পক্ষে জননীব সুখ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আপন ভ্রাতার নিঃস্বার্থ চেষ্টা ভাবিয়া মত বৈষম্য ভুলিয়া, অন্তয়ের সহিত সে কার্য্যে সংসাধনে ব্রতী হয়।" [২/৪, ১৩১২]

এ দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মহম্মদ হারুন এক দীর্ঘ কবিতায় নিজ মনোভাব ব্যক্ত করে সবশেষে লিখেছিলেন --

"এদের হৃদয় নহে গো সরল
পুরিয়াছে দ্বেষ হিংসা যে কেবল
অমৃতের স্থান উঠেছে গবল
হারায়েছে এরা একতা ধন।

নিঃস্বার্থ মানব বিরল এখানে
কেন মা তাকাও কাতর নয়নে

রাখ নিজ দুঃখ আপন পরাণে
ধৈর্য্য বাঁধনে বাঁধ মা মন।"
[নববিকাশ, ২/৮, ১৩১২]

৪

আগেই উল্লেখ করেছি উনিশ শতকের সাময়িকপত্রের ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য পাওয়া দুরূহ। কোন সাময়িকপত্রটি ঠিক কখন প্রকাশিত হলো, প্রচারসংখ্যা কত ছিল, সম্পাদক কে ছিলেন, কবে এর প্রকাশনা রহিত হলো — এ সব সম্পর্কে সবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না। বর্তমান সংকলনে সংকলিত সাময়িকপত্রগুলি সম্পর্কে যতটুকু তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে সেগুলির পরিচিতি দেয়া হলো।

সেবক

১৮৯০ সাল থেকে শুরু হয়েছিল পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম সম্মেলন। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল একটি পত্রিকা প্রকাশ করার।[১] এ পরিপ্রেক্ষিতে শশিভূষণ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল (আশ্বিন ১২৯৮) 'সেবক'। দু'বছর চলার পর পত্রিকাটি কিছুদিন বন্ধ ছিল। তৃতীয় বর্ষে শ্রীনাথ চন্দের সম্পাদনায় আবার প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটি।[২]

অনেকটা 'নিউজ লেটারের' মতো ছিল 'সেবক'। প্রতি সংখ্যায় থাকত ধর্মবিষয়ক কিছু উপদেশ ও ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কিত সংবাদ। পঞ্চম বর্ষের একটি সংখ্যা থেকে অনুমান করা যায়, প্রতিবছর সম্মেলনে 'সেবক'-এর জন্য একজন সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক নির্বাচন করা হতো। আরেকটি সূত্র অনুসারে দু'জন সম্পাদকের নাম পাওয়া যায়। নবকুমার সমাদ্দার এবং শশীচন্দ্র ঘোষাল।[৩] শেষোক্তজন ছিলেন ষষ্ঠ বর্ষের সম্পাদক। সে ক্ষেত্রে ধরে নিতে পারি নবকুমার ছিলেন পঞ্চম বর্ষের। এ সময় পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চাব্বিশ, মূল্য এক আনা দু'পাই। প্রচার সংখ্যা ছিল তিনশো পঞ্চাশ কপি।[৪]

'সেবক' কতদিন চলেছিল জানা যায় নি। তবে বেশিদিন যে চলেনি তা অনুমান করে নেয়া যায় নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপন থেকে —

"সেবকের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। গ্রাহকদিগের অগ্রিম মূল্যের উপরেই সেবকের জীবন নিভর করিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিয়মিত সময়ে অনেকের নিকট হইতেই মূল্য পাওয়া যায় না। গ্রাহকবর্গের নিকট বিনীত নিবেদন যে, অতি শীঘ্র ষষ্ঠখণ্ডের অগ্রিম মূল্য

---

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৩৪২।
২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা. ১৯৭৪, পৃ. ৬২।
৩ *Bengal Library Catalogue*, Calcutta, Jan-June, 1898.
৪. ঐ।

প্রদান কারিয়া বাধিত করিবেন। একান্তপক্ষে পৌষ মাসের মধ্যে মূল্য না পাইলে সেবক মাঘ মাসে ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হইবে।

শ্রী কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় —
ম্যানেজার—'সেবক'।"
[৫/১১, ১৩০৪]

সাহিত্য বিশারদ সংগ্রহে 'সেবক'–এর সাতটি খণ্ড পাওয়া গেছে (১৩০৩–৪)। সাধারণত সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে বর্ষ শুরু হতো বৈশাখ–এ। কিন্তু 'সেবক'–এ বর্ষশুরু হতো বোধহয় মাঘ থেকে। কারণ ৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা শুরু হয়ে ফাল্গুন থেকে এবং অগ্রহায়ণ (১৩০৪) পর্যন্ত চলছে একই খণ্ড। এখানে 'সেবক' থেকে দু'টি নিবন্ধ সংকলন করা হলো।

অঞ্জলি

"শিক্ষা বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন" 'অঞ্জলি' প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে ১৮৯৮ (১৩০৫) সালে। সম্পাদক ছিলেন রাজেশ্বর গুপ্ত, প্রকাশক যোগেন্দ্রমোহন গুপ্ত। 'অঞ্জলি' হারানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সনাতন যন্ত্রে মুদ্রিত হতো। পঁচিশ পৃষ্ঠার (ডাবলডিমাই ১/১৬) পত্রিকার দাম ছিল দু' আনা; বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১৲ এক টাকা। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন নেয়ার বন্দোবস্তও ছিল—

বিজ্ঞাপন

"১. বিজ্ঞাপনেব নিয়ম প্রতি পংক্তি দুই আনা হিসাবে। অধিক হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত মতে লওয়া হইবে।

২. প্রবন্ধাদি ও প্রেরিতপত্র সম্পাদকের নামে, মূল্য ও টাকা পাঠাইবেন।

৩. ৵৴ আনা টিকেট পাঠাইলে নমুনা স্বরূপ একখণ্ড অঞ্জলি প্রেরিত হইবে ।

৪. ডাক টিকেটে মূল্য পাঠাইলে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ডাক টিকেট পাঠাইবেন না।"

তবে, 'অঞ্জলি'তে বিজ্ঞাপন প্রায ছিল–ই না।

সরকারি রিপোর্টে 'অঞ্জলি'র মুদ্রণ সংখ্যা একশো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, 'অঞ্জলি'তে 'মূল্য প্রাপ্তি'র একটি তালিকা পাওয়া গেছে। সেখানে ক্রমিক নম্বরকে যদি গ্রাহক সংখ্যা হিসেবে ধরি তা'হলে দেখা যায় পত্রিকার মুদ্রণ সংখ্যা ৬০০–এর ওপর।[১] এমনও হতে পারে প্রথম কয়েকসংখ্যার মুদ্রণ সংখ্যা ছিল একশো পরে তা বৃদ্ধি পায়। গ্রাহকদের এই

১. *Bengal Library Catalogue*, January-June, 1898.

তালিকা দেখে বোঝা যায় পত্রিকাটিব প্রচাব শুধু চট্টগ্রামেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এব পাঠক ছিল, এমনকি হুগলিতেও।[২]

পত্রিকাব নাম 'অঞ্জলি' কেন বাখা হযেছিল? সম্পাদক প্রথম সংখ্যায় জানিযেছেন, "'অঞ্জলি'তে - দীনভাব, দেবভাব, শ্রদ্ধা, ভক্তি শুদ্ধি ও প্রসন্নতা একত্র মিলিত বলিযা, পূজ্য, পূজা ও পূজক একগুচ্ছে গ্রথিত কবিযা আমি এই পত্রিকাব নাম "অঞ্জলি" বাখিযাছিলাম।"

'অঞ্জলি' ছিল "শিক্ষা বিষযক মাসিক পত্রিকা, বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষিত কবা ইহাব প্রাণ।" শুধু তাই নয, "মানুষ শিক্ষা প্রভাবে মানুষ হয। সেই শিক্ষা বিষযে মানব মণ্ডলীব কথঞ্চিৎ সেবা কবা আমাদেব কার্য্য।"

'বালক-বালিকা'দেব সুশিক্ষিত কবা উদ্দেশ্য হলেও, মনে হয এব পাঠক ছিল প্রধানত নিম্ন ও উচ্চবিদ্যালযেব শিক্ষকবৃন্দ। 'অঞ্জলি'ব প্রথম সংখ্যায একটি ছাডা আব কোন সংখ্যায কোন কবিতা প্রকাশিত হয নি। পত্রিকাটি পূর্ণ ছিল শিক্ষা, শিক্ষা প্রদান সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীতে। সম্পাদকেব উদ্দেশ্য ছিল – এসব প্রবন্ধ পাঠ কবে যদি শিক্ষকবা নিজেদেব এটি বিচ্যুতি সম্পর্কে জেনে সঠিক পাঠদান কবেন এবং ছাত্রদেব প্রভাবিত কবতে পাবেন তা হলে সমাজ উপকৃত হবে। 'অঞ্জলি' তে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ এব প্রমাণ।

তৎকালীন সমাজেব পবিপ্রেক্ষিতে সম্পাদকেব দৃষ্টি ছিল আশ্চর্য বকমেব স্বচ্ছ। এই মাসিকপত্রে ধর্ম সম্পর্কিত বিষযে আলোচনা কম। ববং সহজ ভাষায, সম্পাদক আধুনিক (তৎকালীন) জগতেব সঙ্গে পাঠকদেব পবিচিত কবিযে দিতে চেযেছেন। প্রথম সংখ্যায 'শিক্ষা' শিবোনামেব প্রবন্ধে উল্লেখ কবা হযেছে –

১ মুদ্রা–প্রাপ্ত

৬ ১। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সবকাব এ সংখ্যা। ৭১০ শ্রীযুক্ত হেড পণ্ডিত ভোলাব সাবেক। ৫০৩। শ্রীযুক্ত হেড পণ্ডিত বাজানগব সাকিং ২৬১। শ্রীযুক্ত হেড পণ্ডিত কনকসাব সাকিন। ৫৭০। শ্রীযুক্ত হেড পণ্ডিত ফাইটাপাড়া সাকিন। ৫৮ শ্রীযুক্ত হেড পণ্ডিত লেবদা সাকিন ১৬০। শ্রীযুক্ত হেড পণ্ডিত, বাযকাওন সর্কেল। ৫৮৬। শ্রীযুক্ত হেড পণ্ডিত বোসনীয়া সাকিন ১২ বাবু কাশীমোহন চক্রবর্ত্তী বালীকচ্ছ। ১৭৫। বাবু নবীনচন্দ্র ওযাদ্দাব, ভাইটাখাইন। ১১৬। বাবু গগনচন্দ্র অন্নদাপুবোহিত, ভাইটাখাইন। ১১১ মৌলবী আবদুল হোসেন, পটীযা। ১১৫। বাবু শবৎচন্দ্র বায চৌধুবী, ইসপপুব। ৬০। বাবু যাদবচন্দ্র চন্দ, ইসপপুব ৮৬১। বাবু অন্নদাচবণ বাঙ্গিলাল গাজীপুব। ৪৯। বাবু যতীন্দ্রমোহন বল সীতাকুণ্ড। ৫১৩। বাবু নবীনচন্দ্র চন্দ চবাসাদ্ধ। ১৬৪ বাবু নন্দকুমাব চক্রবর্ত্তী, শিবগঞ্জ। ৬০৫। বাবু কাশীমোহন কানুনগো, পটুযাখালী। ১১৮। বাবু অম্বিকাচবণ বাক্ষত, কক্সবাজাব। ৭০২ বাবু কৃষ্ণসুন্দব ভট্টাচার্য্য, ববকাণ্ডা ১৫১। বাবু দ্বিজবাশঙ্কব দাস, জোযাবা। ৬১৪ বাবু প্রসন্নকুমাব চক্রবর্ত্তী, ঝালকাঠী। ৫৩৭। বাবু শাবদাপ্রসন্ন দাস এম, এ হুগলী। ৪৮৬। বাবু শ্রীনাথ গুহ, নোযাখালী ১২১। শ্রীযুক্ত সম্পাদক জ্ঞানপ্রদাযিনী সভা কক্সবাজাব। বাবু বেণীমাধব সেন উকিল, চট্টগ্রাম। বাবু বমেশচন্দ্র দাস মোক্তাব, চট্টগ্রাম। বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র বায বি, এল চট্টগ্রাম। ডা দুর্গাদাস দত্ত, চট্টগ্রাম। বায অভযাচবণ মিত্র বাহাদুব, চট্টগ্রাম। বাবু কমলাকান্ত সেন বি, এল, চট্টগ্রাম। বাবু ববদাচবণ ধব, চট্টগ্রাম। বাবু কুঞ্জবিহাবী চট্টোপাধ্যায় বি, এ, চট্টগ্রাম। বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বায, চট্টগ্রাম। বাবু মহিমচন্দ্র গুহ বি, এল, চট্টগ্রাম। বাবু নবীনচন্দ্র দাস এম,এ, বি এল, চট্টগ্রাম। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র পাল, চট্টগ্রাম। বাবু মহিমচন্দ্র বসু, চট্টগ্রাম।

"জগৎ শিক্ষার উপাদান। শিক্ষার উপাদান সমুদয়ই বিজ্ঞানময় হওয়া প্রয়োজন। আমরা যে ঘরে থাকি তাহাও শৃঙ্খলাময় সজ্জিত বিজ্ঞান হওয়া চাই। খাওয়া পরা, শয়ন উপবেশন প্রভৃতির কিছুই আকস্মিক বা অবিজ্ঞানময় হইলে তাহাতেই শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। অতএব সুশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর যাহা কিছুর সহিত সম্পর্ক হইবে তত্তাবৎ সমুদয়ই বিজ্ঞানের অন্তগত এবং শৃঙ্খলাময় ও সুসজ্জিত হওয়া প্রয়োজন। না হইলে সুশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে।"

'ইতিহাস শিক্ষা' বিষয়ে সম্পাদক যে মন্তব্য করেছেন তা খুবই আধুনিক। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ ধারণার প্রবর্তন হয়েছে এক-দু' দশক আগে মাত্র। তিনি লিখেছেন—

"ইতিহাস বলিতে অনেকে রাজ বংশাবলী ও তাহাদের যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ বুঝিয়া থাকেন। বাস্তবিক শিক্ষণীয় ইতিহাস কেবল তাহা নহে। ইতিহাস বংশ বিশেষের বিবরণ নহে, জাতি বিশেষের বৃত্তান্ত। তাহাদের উৎপত্তি ও বিকাশ, তাহাদের শাসন নীতি, সমাজ নীতি ও ধর্ম্ম নীতি, তাহাদের সাহিত্য শিক্ষা ও বাণিজ্য, এই সকল আলোচনীয় বিষয়..."

"... ইতিহাস শিক্ষা দিতে যেমন ঘটনাবলীর উল্লেখ করিতে হইবে তেমন তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধও দেখাইতে হইবে।"

ঐ সময় আমরা জানি, ভদ্রলোক হতে হলে শুধু সম্পদ নয় শিক্ষারও যোগ থাকতে হতো। শিক্ষা হয়ে উঠেছিল সমাজে মর্যাদার চিহ্ন বা স্ট্যাটাস সিম্বল। অনেক অভিভাবকই সামর্থ থাকলে সন্তানকে শিক্ষা প্রদানে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু, এই শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রেও এক ধরনের টেনশন ছিল। পেশাদারী গ্রুপ নিজেদের একমাত্র শিক্ষার ধারক বাহক মনে করত এবং এ ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য বজায়ে সচেষ্ট ছিল। ধারণাটা ছিল এরকম-কৃষকের ছেলে কৃষক হবে, সে কেন শিক্ষিত হয়ে পেশাজীবী গ্রুপে যোগ দেবে? এবং সমাজের এ ধরনের ঝোঁকের সমালোচনা করে আধিপত্যকারী গ্রুপ প্রায় সমগ্র সমস্ত দোষ শিক্ষার ওপর চাপিয়ে দিত। সম্পাদক লিখছেন, পাশ্চাত্যে শিক্ষা একধরনের সামাজিক "সাম্যবাদ" এনেছে। এ দেশেও তা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

"...বর্ত্তমান রাজ প্রকৃতির সাম্যবাদের মোহন রস সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। এখন যাহারা কৃষি কার্য্যের, ব্যবসায়ের বা শিল্পের প্রাণ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবেন, তাঁহারা অবশ্যই শিক্ষিত, স্বার্থত্যাগী হইবেন। তুমি যদি সমাজের অগ্রণী হও, তুমি যদি তোমার সন্তানবর্গকে সিবিল সার্ভেন্ট বা ব্যারিস্টার করিতে চাও, সিবিল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার করিতে চাও, তবে তুমি আকাশ পাতাল ফাটাইয়া বজ্রনাদে কৃষিকার্য্য কর; ব্যবসা বাণিজ্য কর, শিল্পকার্য্য কর প্রভৃতি বলিলেও সে কথার অর্থ তাহারা বুঝিবে— "হে সমাজের নীচ স্থানে অবস্থিত মানবগণ, তোমরা চিরকালই সমাজের নীচ স্থানে থাকিয়া আমাদের পদধূলি লইয়া স্বর্গসুখ ভোগ কর।" এরূপ অপমান কে সহ্য করিবে? সাম্যবাদের এই খরস্রোতে তোমার এই কৌশলময়ী বাক্‌চাতুরী ভাসিয়া যাইতেছে, সকলেই তাহা বুঝিতেছে, অনভিজ্ঞতা কেবল তোমারই।"

ভদ্রলোকদের উদ্দেশে বলেছেন, এসব শিক্ষার দোষ নয় — "তোমার মত উন্নত শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের অভিমানের কুফল।" এবং যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারলে

"তোমার অলীক অভিযোগ করিবার ঘনঘটা শারদ মেঘ নির্ঘোষে পর্য্যবসিত হইবে।" [বর্ত্তমান শিক্ষার অপবাদ, ২/৮]।

শিক্ষা-কে 'অঞ্জলি' নিছক শিক্ষিত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে নি। শিক্ষা-কে কার্যক্ষেত্রে সফল হওয়ার মাধ্যম হিসেবেও গণ্য করেছে। 'ছাত্র সমিতি' শিরোনামে এক প্রবন্ধে ছাত্র সমিতির উদ্দেশ্যগুলিকে পরিবর্তন করতে বলা হয়েছে। ঐ প্রবন্ধ থেকে জানা যাচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র সমিতি ছিল, যাদের কাজ ছিল আবৃত্তি, বক্তৃতা বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা। 'অঞ্জলি' পরামর্শ দিয়েছে "কেবল বাচনিক শিক্ষা কাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে শক্তিদান করিতে পারেনা ... এই জন্য আমাদের ছাত্র সমিতিগুলিকে কার্য্যক্ষেত্রের প্রবেশদ্বার করা আবশ্যক। ভবিষ্যজীবনে ছাত্রগণ কিরূপ নীতির অনুসরণ করিবে. কিরূপ আমোদপ্রমোদ করিবে, কিরূপে পরিজন ও স্বদেশ বিদেশের হিতসাধন করিবে, ছাত্র সমিতির এই সকল লক্ষ্য থাকিবে।" [ছাত্রসমিতি, ১/১২]

'অঞ্জলি' কতদিন টিকেছিল জানা যায় নি। তবে, পত্রিকার যে কটি সংখ্যা পাওয়া গেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গে এই ধরনের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পত্রিকা বিরল। প্রথম (বৈশাখ ১৩০৫) ও দ্বিতীয় বর্ষ (১৩০৬) মিলিয়ে 'অঞ্জলি'র মোট দশটি সংখ্যা পাওয়া গেছে। এখানে তা থেকে বাছাই করা কিছু রচনা সংকিলত হলো।

কল্যাণী

ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে 'কল্যাণী'র উল্লেখ করেন নি। উনিশ শতকের বাংলাদেশের 'সংবাদ-সাময়িকপত্র' প্রথম খণ্ডে আমি উল্লেখ করেছিলাম, 'কল্যাণী' প্রকাশিত হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি নড়াইল থেকে। উৎস ছিল একটি আঞ্চলিক ইতিহাস। এখন দেখছি সে তথ্য ভুল।

সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহে 'কল্যাণী' আছে চতুর্থ বর্ষের ৩টি ও পঞ্চম বর্ষের ২টি সংখ্যা। চতুর্থ বর্ষের তাবিখ ১৩০৮। সে পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করছি 'কল্যাণী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৫ বা ১৮৯৮ সালের দিকে, যশোরের মাগুরা থেকে। আবার ৫ম বর্ষ শুরু হচ্ছে ১৩১২ সাল থেকে। খুব সম্ভব তা মুদ্রণ বিভ্রাট। এখানে ৪র্থ বর্ষ ১৩০৮ ও ৫ম বর্ষ-কে ১৩০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বলে ধরে নেয়া হচ্ছে।

'কল্যাণী'র নিয়মাবলী ছিল এরকম—

"সর্ব্বত্র কল্যাণীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২ দুই টাকা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কল্যাণী পাঠান হয় না। প্রতি সংখ্যার মূল্য।. চারি আনা মাত্র। অপারগ পক্ষে কমেও দেওয়া যায়।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। টাইটেল পেজ প্রতি পৃষ্ঠা প্রতিবারে ৩ তিন টাকা।

অন্যান্য পৃষ্ঠা প্রতিবারে ২ টাকা। অন্য কোনরূপ বন্দবস্ত করিতে হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিয়া স্থির করিতে হইবে।

কল্যাণী প্রতি মাসে বাহির হইবে। শ্রী বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ, মাগুরা—যশোহর।"

বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ হলেও আসলে ছিলেন সম্পাদক। বিশ্বেশ্বর ও সমমনারা মাগুরায় গড়ে তুলেছিলেন "সামাজিক পরিষদ" এবং সিদ্ধান্ত হয়েছিল— "কল্যাণী এই পরিষদের মুখপাত্রী হইয়া ইহার কার্য্যাবলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতে থাকিবে।" (৪র্থ বর্ষ ৮–৯–১০ম সংখ্যা) ঐ সভার কার্য্যবিবরণীতে বিশ্বেশ্বব-এর পেশা হিসেবে 'সম্পাদক' উল্লেখ করা হয়েছে।

মফস্বলের অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে 'কল্যাণী' প্রকাশিত হতো। প্রকাশিত হতো অনিয়মিতভাবে। ছাপা হতো অন্য প্রেসে। সম্পাদক উল্লেখ করেছেন— "ছাপাখানার নানা প্রকার অসুবিধা থাকায়, আমাদের বহুচেষ্টা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যতা প্রযুক্ত "কল্যাণী" যথাসময়ে বাহির করিতে পারি নাই. এই জন্য গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। দৈব দুর্ব্বিপাক না ঘটিলে কল্যাণী আগামী আষাঢ় মাস হইতে যথা নিয়মে প্রকাশিত হইবে এমন আশা করি। কারণ মাগুরায় 'প্রেস' আসায় নিজের তত্ত্বাবধানে মুদ্রাঙ্কনাদি সুচারু রূপে সম্পন্ন করিবার সুবিধা হইয়াছে।"

সমসাময়িক অন্যান্য সাময়িকপত্রের মতোই ছিল 'কল্যাণী'। অর্থাৎ প্রবন্ধ, গল্প, কবিতার সংকলন। তবে, সামান্য পার্থক্যও ছিল। তাহলো 'কল্যাণী' স্থানীয় সংবাদ-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করত এবং প্রতি সংখ্যায় স্থানীয় কিছু সংবাদ থাকত। ঐ সব সংবাদ এবং প্রবন্ধে 'কল্যাণী' সম্পাদকের স্বাদেশিকতা অস্পষ্ট থাকে নি। হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী স্বাদেশিকতার ভক্ত হলেও সম্পাদক সবসময় হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায়ের পক্ষে ছিলেন এবং সংবাদসমূহেও তার গুরুত্ব দিতেন।

আরতি

'আরতি' প্রকাশিত হয়েছিল ময়মনসিংহ থেকে ১৩০৭ [১৯০১] সনের শ্রাবণে। 'আরতি'র জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে বেশ কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচলিত আছে। এর উৎস, কেদারনাথ মজুমদার সম্পর্কিত গৌরনাথ চন্দ্রের একটি প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে গৌরনাথ চন্দ্র 'আরতি' ও 'সৌরভ' সম্পাদনার কৃতিত্ব কেদারনাথ-কেই অর্পণ করেছেন। এই বৃত্তান্ত আবার বিস্তারিত উদ্বৃত হয়েছে 'ময়মনসিংহের সাহিত্য সংস্কৃতি' ও যতীন সরকারের 'কেদারনাথ-মজুমদার'-এ। প্রথমে সেই উদ্ধৃতিটি দেয়া যাক—

"... ১৩০৭ সালের ১লা আষাঢ় তাঁর কয়েকজন বন্ধুর উদ্যোগে 'আরতি' প্রকাশিত হলো। এ-সময় সিলেট জেলার প্রবীণ সাহিত্যসেবী রায় বাহাদুর রমণী মোহন দাস ময়মনসিংহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়ে আসেন। রমণী বাবুর সহযোগীতায় কেদারনাথ ১৩০৮ সনে ময়মনসিংহ শহরে একটি সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা করেন। কেদারনাথ এ-সভার সম্পাদক মনোনীত হন। এ-সভার তত্ত্বাবধানে ও বেদজ্ঞপণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সম্পাদনায় 'আরতি' প্রকাশিত হয়। ... রমণীবাবু অন্যত্র বদলি হয়ে গেলে 'আরতি'র

পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন 'সুহৃদ সমিতি' নামক প্রতিষ্ঠান ও সম্পাদক মনোনীত হন কেদারনাথ মজুমদার। ...'আরতি' সম্পাদন সময়েই কেদারনাথ সহসা পীড়িত হয়ে পড়েন ও চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলিকাতায় যেতে হয়। তখনই 'আরতি'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।"

'আরতি' প্রকাশের প্রায় দু'বছর পর 'ময়মনসিংহ সাহিত্য সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরা এর আগে আরতি ব্যক্তি উদ্যোগেই প্রকাশিত হয়েছিল। আর উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কখনই 'আরতি'র সম্পাদক ছিলেন না। এবং চতুর্থ বষ পর্যন্ত কেদারনাথের নাম সম্পাদক হিসেবে কোথাও নেই। ব্রজেন্দ্রনাথও উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা ঠিক নয়।

'আরতি'র একজন উদ্যোক্তা হয়ত ছিলেন কেদারনাথ কিন্তু তা প্রকাশিত হয়েছিল সারদাচরণ ঘোষ, এম. এ. বি. এল-এর সম্পাদনায়। পত্রিকার শিরোনামে লেখা থাকত— 'আরতি : মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী'। বার্ষিক মূল্য ছিল দেড় টাকা।

প্রথম বষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যা [মাঘ, ১৩০৮] পযন্ত সারদাচরণই পত্রিকার দায়-দায়িত্ব বহন করেছিলেন। এরপর 'ময়মনসিংহ সাহিত্য' সভা 'আরতি'র উন্নতি বিধানের ভার গ্রহণ করে। কিন্তু এর অর্থ আর্থিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ কিনা তা জানা যায় নি। তবে, সারদাচরণও এ সভার একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। তাতে মনে হয়, পত্রিকার দায়িত্ব বহন করা এককভাবে হয়ত সারদাচরণের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। তাই এ সভা গঠন করে দায়দায়িত্ব খানিকটা লাঘব হয়ত তিনি করতে চেয়েছিলেন।

১লা মাঘ 'সাহিত্য সভা' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বিষয়ে একটি সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল 'আরতি'-তে যা থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়। সংবাদ-বিজ্ঞপ্তিটি ছিল এরকম—

ময়মনসিংহ সাহিত্য সভা

"মাতৃভাষার সেবা ব্রত শিরে লইয়া এখানে 'ময়মনসিংহ সাহিত্য সভা' নামে একটা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিগত ১লা মাঘ তারিখে 'আরতি' কার্য্যালয়ে এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়।

উপস্থিত সভ্যগণের সম্মতি ক্রমে 'আরতি' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ এম. এ. বি. এল গবর্ণমেন্ট উকীল মহাশয় সভাপতির আসনগ্রহণ করেন।

সভাপতি নির্ব্বাচনের পর সভার উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয়। নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্য লইয়া এই সভা গঠিত হইয়াছে।

(ক) আরতির উন্নতি বিধান ও নিয়মিত প্রচার।..." [বিস্তারিত দেখুন : ২/৮, মাঘ ১৩০৮ সংখ্যা]।

চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞাপন পর্যন্ত সম্পাদক হিসেবে সারদাচরণের নাম পাই। 'আরতি'র পঞ্চম ও অষ্টম বর্ষের সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে উমেশচন্দ্র রায় ও যতীন্দ্রনাথ মজুমদার। খুব সম্ভব এর পর কেদারনাথ এর সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেছিলেন। 'আরতি' কতদিন টিকে ছিল জানা যায় নি। তবে, 'আরতি' বিলুপ্ত হলে কেদারনাথ 'সৌরভ' প্রকাশ

শুরু করেন। এ থেকে অনুমান করে নিতে পারি, 'আরতি' কমপক্ষে দশবছর টিকেছিল। মফস্বল একটি শহর থেকে দশবছর নিয়মিত একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করা এবং টিকিয়ে রাখা বর্তমানেও খুব দুরূহ। কিন্তু 'আরতি'র বেলায় তা সম্ভব হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এ পত্রিকায় বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন যশস্বী লেখকরা লিখেছিলেন।

'আরতি'-তে গল্পকবিতা প্রকাশিত হতো, কিন্তু এর একটা বড় অংশ জুড়ে থাকত বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ। অন্যান্য অনেক সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ থাকত, তবে তার মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম। 'আরতি'র প্রবন্ধের বিষয় ছিল বিবিধ—ইতিহাস, সমাজ, দর্শন, কৃষি, প্রাচীন সাহিত্য। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হতো। 'আরতি'র সূচিপত্র দেখলে বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে।

সমসাময়িক খ্যাতিমান লেখকরা 'আরতি'-তে নিয়মিত নিয়মিত লিখেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—গোবিন্দ চন্দ্র দাস, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, মানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কেদারনাথ মজুমদার, পাঁচকড়ি দে, রামপ্রাণ গুপ্ত, মনোমোহন সেন প্রমুখ। দক্ষিণারঞ্জনের অনেক কবিতা এখানে প্রকাশিত হয়েছে যা অনেকের অজানা। রামপ্রাণগুপ্তের 'মোহাম্মদ' এখানেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু তাই নয় যে 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' আজ বিখ্যাত তাও এই 'আরতি'-তেই ছাপা শুরু হয়েছিল। সাহিত্য-সমালোচনাও 'আরতি' গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থের দীর্ঘ আলোচনা এর প্রমাণ।

'আরতি'-তে প্রকাশিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর 'দক্ষিণবঙ্গ' প্রবন্ধ আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৬০/৭০-এর দিকে দক্ষিণবঙ্গ কেমন ছিল তার একটি চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। ঐ সময়ের বাংলাদেশ সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য যা পাওয়া যায় তাঁর প্রবন্ধে তা' হলো—

নদনদী— ভৈরব, কপোতাক্ষ, ইছামতী নদী মরে যাচ্ছিলো এবং "কপোতাক্ষ নদের দক্ষিণ প্রদেশ, ক্রমশঃ লোক বসবাস শূন্য হইতেছে।"

জঙ্গল— দুর্ভিক্ষ, মৃতপ্রায় নদী প্রভৃতির কারণে ২৪ পরগণা ও খুলনার দক্ষিণাংশ বিরাণ হয়ে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ছে। এসব অঞ্চলে আগে বিপুল পরিমাণ শৃগাল ছিল। এখন তা হ্রাস পেয়েছে। কাকও কমেছে। লেখক অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন শৃগাল ও কাকভোজী 'বন্যজাতি'র কারণে শৃগাল ও কাকের সংখ্যা কমছে।

মানুষজন — ভদ্রলোকদের অবস্থা পড়তির দিকে কিন্তু যারা পরিশ্রমী তাদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে, যেমন, বারুই, তাঁতি, নবশাখ প্রভৃতি। পূজা-পার্বনের সংখ্যা কমে গেছে, ধর্ম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তা' ছাড়া "একটু ত্রুটি হইলে হিন্দুরা যেমন ভোজদাতার নিন্দা করে, মুসলমানেরা সে রূপ করে না।" "মুসলমানদের ধর্ম্মবিশ্বাস প্রায় অটুট রহিয়াছে।" এরপর হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্যও বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক।

রামপ্রাণগুপ্তের 'মোহাম্মদ' এখনও সুখপাঠ্য। সে সময়ের কথা মনে রাখলে আশ্চর্য হতে হয় এ ভেবে যে, ভিন্নধর্মী একজনের পক্ষে এ ধরনের সহানুভূতিশীল দৃষ্টির রচনা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল। শুধু তাই নয়, রামপ্রাণ গুপ্ত এ রচনায় বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্যের সমাহার

ঘটিয়েছেন। বাংলাভাষায় মোহাম্মদ (দঃ)-এর যে জীবনী রচিত হয়েছে তার মধ্যে এটি অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র দীর্ঘ সমালোচনা ছাপা হয়েছে দু' সংখ্যায়। এটি পাঠ করলে এ শতকের গোড়ার দিকে শ্লীল-অশ্লীল বিষয়ে ভদ্রলোকদের মানদণ্ডটি বোঝা যাবে। বিনোদিনী বিহারীকে একটি চুম্বন প্রদান করেছিল। সমালোচক সে বিবরণটি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছিলেন—"ধর্ম্মপরিণীতা পত্নী স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা হইলে অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া এরূপ প্রেম যাওা করা স্ত্রী স্বাধীনতার লীলাভূমি ইউরোপে ক্বচিৎ কুত্র সম্ভবপর হইলেও, তাহা এদেশে আশা করা যায় না। তাহাতে উপনায়ক নায়িকার মধ্যে—যেখানে প্রেমের স্বত্ব সাব্যস্ত হয় নাই, সে স্থলে প্রেমলীলার এরূপ অপূর্ব্ব অভিনয় (।) লজ্জাহীনতার ঘৃণিত চিত্র আজ পর্য্যন্ত কোন উপন্যাস লেখক কল্পনা করিতে পারেন নাই। বলি ইহাই কি এই উপন্যাসের নূতনত্ব?"

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহে 'আরতি'র ১ম বর্ষের মাত্র একটি এবং ২য় ও ৩য় বর্ষের সবকটি সংখ্যা আছে। এখানে সে-সব সংখ্যা থেকে সূচিপত্র উদ্ধৃত ও উল্লেখযোগ্য রচনা সংকলিত হলো।

•

আশা

নোয়াখালির 'আশা নিকেতন' থেকে মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সম্পাদনায় ১৩০৯ সালের বৈশাখে প্রকাশিত হয়েছিল 'আশা' (১৯০৩)। 'আশা' মুদ্রিত হতো এলাহাবাদ থেকে কারণ 'মুদ্রাযন্ত্রেব কর্ম্মচারীগণের অভাব'। সম্পাদক একবাব ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছিলেন "নিজের মুদ্রাযন্ত্র না করা পর্য্যন্ত আমার এসব দুঃখ সহ্য করিতে হইবে।" দ্বিতীয় সংখ্যায় দেখা যায় 'বামেন্দ্র-যন্ত্র' নামে একটি মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নোয়াখালীতে এবং 'আশা' সেখান থেকেই "শ্রী তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।" তবে, প্রচ্ছদ ছাপা হতো এলাহাবাদে।

'আশা'র আকার ডিমাই (১/১৬), দুই ফর্মা বা ৩২ পৃষ্ঠা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল ভারতে ১।।০ ও অন্যান্য অঞ্চলে ২ রূপি। প্রতি সংখ্যা ১০।

'বঙ্গভাষা'র সাধনা করার জন্যই সম্পাদক প্রকাশ করেছিলেন 'আশা'। প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতায়ই বলা হয়েছে—

> অয়ি বঙ্গভাষা !
> তোমারি সাধনা করিতে গো আজ
> হৃদয়ে জেগেছে 'আশা।'

সম্পাদক লিখেছিলেন—"মাতৃভাষার সেবাকল্পে 'আশা'র পশ্চাতে সম্পাদকরূপে নিজেকে দণ্ডায়মান করিতে সাহসী হইয়াছি।" এই ভাষা প্রীতি সম্পাদক বা পত্রিকার সব সময়ই ছিল। ৭ম-৮ম সংখ্যায় বাংলা ভাষার প্রতি আধুনিকদের অবজ্ঞা লক্ষ্য করে ক্ষোভের সঙ্গে সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন—"বাঙ্গ'লা ভাষা যে জাতির, সেই জাতিই যদি ইহার প্রতি বিরূপ ও বীতরাগ হয়, তাহা হইলে আর বাঙ্গলা গ্রন্থ পড়িবে কে, বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিই বা করিবেই কে?"

'আশা'র তিন সংখ্যা দেখে লিখেছিল 'ধূমকেতু'—

"...আশার আশা, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না রা ইহা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নানা প্রবন্ধের এক অপক্ক খিচড়ী বিশেষ। এরূপ হইলে আর আশার দর্শনে, আশার সাফল্য কোথায়? সকল সাহিত্য পত্রেরই একটা নির্দিষ্ট mission বা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। হাটের নাগরা, যে আসিল, সেই তালেবেতালে একগদ বাজাইয়া গেল, এরূপ হইলে, আর ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য পত্রের সার্থকতা কি?..."

আসলে 'ধূমকেতু' ও এর থেকে আলাদা কিছু ছিল না, সেই সময় সব সাময়িকপত্রে যা প্রকাশিত হতো গল্প–কবিতা–প্রবন্ধ, 'আশা'তেও তা প্রকাশিত হতো।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সংগ্রহে 'আশা'র পাঁচটি সংখ্যা পাওয়া গেছে (১/১ বৈশাখ ১৩০৯—১/৯ পৌষ ১৩০৯)।

ভারত সুহৃদ

'ভারত সুহৃদ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৯ সালের (১৯০২) আষাঢ় মাসে। বরিশাল থেকে প্রকাশিত মাসিকপত্রটির সম্পাদক ছিলেন এ.কে. ফজলুল হক ও নিবারণচন্দ্র দাস। এ. কে. ফজলুল হকের পরিচয় দেওয়া নিস্প্রয়োজন। নিবারণচন্দ্র দাসের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় নি। এখানে উল্লেখ্য যে ফজলুল হক ১৯০১ সালে প্রকাশ করেছিলেন 'বালক'। খুব সম্ভব 'বালক'–এর বিলুপ্তির পর সম্পাদক হিসেবে 'ভারত সুহৃদ' তাঁর দ্বিতীয় প্রয়াস।

পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'নিবেদন'–এ জানিয়েছিলেন সম্পাদকদ্বয়—

"ভারত–সুহৃদ" বৈশাখ মাসে প্রকাশ করিবারই সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। কার্য্যের সুবিধার জন্য বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ গণনা করিলেই ভাল হয়। যদি সম্ভব হয়, তবে এ বিষয় পশ্চাতে বন্দোবস্ত করিয়া চৈত্র মাসেই বর্ষ শেষ করিবার ইচ্ছা রহিল।

সম্প্রতি ডবল ক্রাউন আকারে আড়াই ফর্ম্মা বিষয় সন্নিবেশিত হইল। যদি সুবিধা হয়, তবে ক্রমে ফর্ম্মা বৃদ্ধি করিয়া দিবার ইচ্ছা আছে।

মফস্বল হইতে এরূপ পত্র প্রচার করার পথে এত বিঘ্ন বাধা আছে যে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝতে পাবে না। এ সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমরা "সুহৃদ" পরিচালনা করিতে পারিব কিনা তাহা জগদিশ্বরই জানেন, তবে চেষ্টার ক্রটী হইবে না। এস্থানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে স্থানীয় কয়েকজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক সময়োচিত উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

অনিয়মিত প্রকাশ বাঙ্গালা মাসিক পত্রের প্রসিদ্ধ দুর্ণাম। দুই একখানা ব্যতীত আর কোন মাসিকই নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হয় না। "ভারত–সুহৃদ" যাহাতে প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখে রীতিমত প্রকাশিত হইতে পারে তজ্জন্য আমরা বিশেষরূপে চেষ্টিত রহিলাম—আশা করি সফলকাম হইব।"

বলাই বাহুল্য উপর্যুক্ত সঙ্কল্প রাখা সব সময় সম্ভব হয় নি।

তবে সম্পাদকদ্বয় যে পত্রিকাটি সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ ও বিতরণ করতে চেয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যায় তারা জানিয়েছিলেন—

"বিশেষ দ্রষ্টব্য : শাখা কার্য্যালয়। কার্য্যের সুবিধার জন্য রাজবাড়ি, গোয়ালন্দ ঠিকানায় "ভারত সুহৃদের" শাখা কার্য্যালয় স্থাপিত হইল ; তথায় শ্রীযুক্ত খোন্দকার আমিনউদ্দিন আহাম্মদ কার্য্যাধক্ষ নিযুক্ত হইলেন।"

'ভারত সুহৃদ' মুদ্রিত হতো বরিশালের বিকল্প মেসিন প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে। প্রতিসংখ্যার মূল্য ছিল তিন আনা, বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা দেড় টাকা। 'মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার' দেখে মনে হয় বরিশাল পটুয়াখালি এলাকায়-ই গ্রাহক সংখ্যা ছিল বেশি।

সমসাময়িক অন্যান্য মাসিকপত্র থেকে 'ভারত সুহৃদ'-এর চরিত্র আলাদা ছিল না। তবে এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তা'হলো সাহিত্য সমালোচনা, যার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র সমালোচনা। 'মানসী'র সমালোচকের নাম নেই ; 'সোনার তরী' সমালোচনা করেছিলেন বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল্যায়ণ করা হয়েছিল এ বলে যে—

"ত্রুটি এক আধটা থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাহার অনন্য সাধারণ প্রতিভা প্রভাবে, বঙ্গদেশে এক অভিনব অভূতপূর্ব, অচিন্ত্যপূর্ণ নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে তিনি ইচ্ছা করিয়াও যদি দুয়েকটা ভ্রমাত্মক কথা লেখেন তাহা সর্ব্বথা অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য মনে করি।"

'ভারত-সুহৃদ'-এর প্রকাশ কবে বন্ধ হয়েছিল তা জানা যায় নি। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগ্রহে ১৩০৯ সনের সাতটি সংখ্যা পাওয়া গেছে।

ধূমকেতু

সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে। নীরদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৩১০ সনের জ্যৈষ্ঠ (১৯০৪) মাসে প্রকাশিত হযেছিল 'মাসিকপত্র ও সমালোচনার সমালোচন' 'ধূমকেতু'। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা, অগ্রিম বার্ষিক আট আনা, মুদ্রিত হতো ঢাকার গিরিশ যন্ত্রে।

"ধূমকেতু হঠাৎ কেন এই বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সমুদ্রিত হইল ?" কারণ, "যে গদ্য কিংবা পদ্য প্রকৃত অবসাদ শূন্য চির-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে ও আত্মা এবং মনকে সমভাবে উন্নত করে, তাহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। নিত্য নূতন পদ্যগদ্যের আবর্জনার পূতিগন্ধে অস্থির হওয়া ও দীনহীনা বঙ্গভাষার প্রতি এত জুলুম দেখিয়া, হঠাৎ বঙ্গ সাহিত্যাকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাব হইল। আশা করি সাহিত্য-সেবিগণ ইহাকে বিদ্বেষের চক্ষে না দেখিয়া--বঙ্গভাষার ক্ষতস্থানে প্রলেপদ্যান উদ্যত বলিয়াই, সমহৃদয়তার স্বাভাবিক আকর্ষণে হাস্যমুখে সংবর্দ্ধনা করিবেন।"

কোন কোন ক্ষেত্রে কোন পত্রিকা বা গ্রন্থের প্রতি কটাক্ষপাত করা ছাড়া 'বঙ্গভাষা প্রতি.. জুলুম' রোধ করতে পারেনি 'ধূমকেতু'।

বান্ধব মাসিক পত্রটির সমালোচনা করে লিখেছিল—"ধূমকেতুর কবিতাগুলি সুন্দর হইতেছে।...প্রবন্ধ নিশ্চয়ও একটুকু স্বাধীন চিন্তার পরিচায়ক। কিন্তু চিন্তা, কোন কোন প্রবন্ধ, স্তূপীভূত-প্রস্তর-প্রতিহত পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর ন্যায় গম্ভীর শব্দে মুখরিত হইয়া গড় গড় গর্জ্জনে মনুষ্যের মনে ভাবান্তর জন্মাইয়াছে, অনবরুদ্ধ প্রবাহিনীর মত, আনন্দের ঢেউ খেলাইয়া, বহিয়া যায় নাই।"

'ধূমকেতু' ১৯০৫-এর পর প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় নি। সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহে আটটি সংখ্যা পাওয়া গেছে (১৩১০)।

নববিকাশ

'সাহা সমিতি'র উদ্যোগে, হরকুমার সাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে। 'ধূমকেতু' লিখেছিল "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আর্থিক অস্বচ্ছলতায় নববিকাশ কখনও মারা যাইবে না। বিশেষত: সাহা সম্প্রদায়ের যে সকল ধনী সন্তান রহিয়াছেন, তাঁহাদের যদি দীনা বঙ্গ ভাষার কল্যাণ কামনায় এবং স্বদেশ ও সমাজের উন্নতিকল্পে এ দিকে একটুকু কৃপা কটাক্ষপাত করেন তবে নববিকাশের দীর্ঘ জীবন অবশ্যম্ভাবী।"

বৈশাখ ১৩১১ (১৯০৪) সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'নব-বিকাশ'। সে সময় স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। হয়ত এ আন্দোলনের চেতনাও কাজ করেছিল পত্রিকা প্রকাশের পিছে ; নামকরণে তা অনেকটা পরিস্ফুট। প্রকাশের এক বছর পর এক বিজ্ঞাপনে দেখা যায় পত্রিকার ম্যানেজার জানাচ্ছেন—"আমরা এখন হইতে নববিকাশ দেশীয় কাগজে মুদ্রিত করিতে মন:স্থ করিয়াছি। তবে এবার সময়মত দেশীয় কাগজ একান্তই না পাওয়াতে বাধ্য হইয়া শেষ ভাগে বিলাতী কাগজ দেওয়া হইয়াছে।"

'নব-বিকাশ'-এর বার্ষিক মূল্য ছিল দুইটাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্যের উল্লেখ নেই। তবে অনুমান করে নিচ্ছি তা তিন আনার মতো ছিল। 'নব-বিকাশ' কতদিন প্রকাশিত হয়েছিল তা জানা যায় নি।

'নব-বিকাশ'-এর সূচিপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে নিজের শেকড়-খোঁজা অর্থাৎ স্বদেশ চিন্তার প্রতিই ঝোঁক ছিল বেশি। কেন, তার কারণ আগেই উল্লেখ করেছি। কয়েকটি উদাহরণ দিই—'প্রাচীন ভারতের উপনিবেশ' ইত্যাদি। অন্যদিকে,—নিজেদের স্বাবলম্বী ও সার্বভৌম করার চিন্তাও সমান্তরালে প্রভাব ফেলেছিল। এসব বিষয়েও 'নববিকাশ' নিয়মিত প্রবন্ধ ছেপেছে। যেমন—'অর্থের প্রয়োজন ও ব্যবহার', 'আমাদের অভাব ও তন্মোচন উপায়' 'স্বদেশী' প্রভৃতি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে 'নব-বিকাশ'-এর প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। মনে হয়, সম্পাদক সময়ের দাবী মেটানোর জন্য এগুলি লিখিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন যেহেতু চলছে সেহেতু ইতিহাস বোধ জাগানো দরকার এবং তা অংকুরে প্রোথিত করতে পারলেই ভালো হয়। 'শিশু-পাঠ্য ইতিহাস'-এ তাই বলা হলো—"ইতিহাস পাঠের সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রয়োজন—দেশ বা জাতিবিশেষের একটি চিত্র মনোমধ্যে স্থাপন। যে ইতিহাস লেখক-পাঠকগণের অন্ত:করণে তাহার বর্ণনায় বিষয়ের সত্যমূলক ও জীবন্ত চিত্র দৃঢ় সন্নিবিষ্ট করিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে 'ইতিহাস লেখক' আখ্যা পাইবার যোগ্য পাত্র।" এরপর উল্লেখ করা

হয়েছে কি ভাবে শিশুদের জন্য ইতিহাস লিখতে হবে। 'বর্ত্তমান কালের সাধারণ স্ত্রী শিক্ষা' প্রবন্ধে বলা হয়েছে—"সাধারণত: যে স্ত্রী শিক্ষা হইতেছে, তাহা পাখী পুষিয়া পড়া শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা কোন অংশে বেশি নহে।" রাজনীতিক্ষেত্রে দুই মতের দ্বন্দ্ব হলে 'নববিকাশ' আবেদন করছে এ বলে যে, যে কোন পক্ষ যখন দেশ হিতকর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন তৎপ্রতিপক্ষগণ যেন সেই কার্য্য "জননীর সুখ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আপন ভ্রাতার নি:স্বার্থ চেষ্টা" ভাবিয়া। মত বৈষম্য ভুলিয়া, অন্তরের সহিত সে কার্য্য সংসাধনে ব্রতী হন।" স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য কবা হয়েছে—"এই স্বদেশী আন্দোলনে ঈশ্বরের হস্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ; ইহার বিনাশ নাই। ভ্রাতৃগণ ! আপনারা শত্রুপক্ষের ভ্রূভঙ্গীতে ও উপহাসে ভীত বা নিরুৎসাহ হইবেন না।"

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহে 'নববিকাশ'-এর প্রথম দুই বছরের ১৬টি সংখ্যা পাওয়া গেছে।

জীবন সহচর

'জীবন সহচর'-এর খোজ এর আগে পাওয়া যায় নি। ব্রজেন্দ্রনাথের তালিকাতেও এর উল্লেখ নেই। সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহে এর দু'টি সংখ্যা পাওয়া গেল। ক্রাউন আকারে 'মাসিকপত্র ও সমালোচন' 'জীবন-সহচর' প্রকাশিত হয়ে ছিল শ্রাবণ ১৩১২ বা জুলাই ১৯০৫ সালে। সেই সময় স্বদেশী বা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ার চলছে। সে কারণেই বাঙালিদের 'জাগ্রত' কবার জন্য কিছু অনুল্লেখ্য ছড়া বা প্রহসন ছাড়া উল্লেখ করার মতো কিছু নেই এ পত্রিকাতে।

যশোহরের চৌবেড়িয়া থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মাখন লাল দত্ত, সহকারী সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রতিসংখ্যা মূল্য ছিল এক আনা, বার্ষিক এগার আনা। পত্রিকার বিজ্ঞাপন ও সংশ্লিষ্ট তথ্যে জানা যায় 'জীবন-সহচর' আগেও প্রকাশিত হয়েছিল [তারিখ জানা যায় নি] তবে ১৯০৫ থেকে "নূতন করিয়া নূতনভাবে নূতন আকারে সকলেরই জীবন-সহচর করিয়া দিবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।"

বৌদ্ধ পত্রিকা

'বৌদ্ধ-পত্রিকা' সম্পর্কে প্রায় কোন তথ্য-ই জানা যায় নি। এর আগে কোথাও এর উল্লেখও দেখিনি। চট্টগ্রাম থেকে ১৯০৫ সালে 'বৌদ্ধ পত্রিকা' বেরিয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের সহায়তার জন্য।

এ অনুমানের কারণ এই যে, একই উদ্দেশ্যে ১৮৮৪ সালে (বৈশাখ, ১২৯১) চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'বৌদ্ধ বন্ধু'। সম্পাদক ছিলেন কালীকিঙ্কর মুৎসুদ্দী। উদ্দেশ্য ছিল — "ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজের উন্নতি সাধন।" সম্পাদক ছিলেন কালী কিঙ্কর মুৎসুদ্দী। এক বছর চলার পর পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ; আবার প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৭ সালে। এ সময় কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী কিছুদিন সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং একবছর চালিয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন ১৯০৬ সালে নবপর্যায়ে আবার তা প্রকাশিত হয়েছিল। এ জায়গাটুকুতেই ব্রজেন্দ্রনাথ ভুল করেছিলেন। 'বৌদ্ধ-বন্ধু'র সূত্র ধরেই হয়ত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তবে নাম বদলে হয়েছিল 'বৌদ্ধ পত্রিকা'।

'বৌদ্ধ–পত্রিকা' প্রকাশিত হতো চট্টগ্রামের অনাথবাজার বৌদ্ধ বিহার ভবন থেকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল তিন আনা, বার্ষিক দেড় টাকা।

দিনাজপুর পত্রিকা

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'দিনাজপুর পত্রিকা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৫ (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২) সালে এবং তা ছিল প্রধানত কৃষিতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকা, সম্পাদক ছিলেন ব্রজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

সাহিত্য বিশারদ সংগ্রহে এক কপি 'দিনাজপুর পত্রিকা' পাওয়া গেছে এবং তা ১৩১০ সনের। কিন্তু বর্ষ হিসেব দেখলে বোঝা যায় এটি ব্রজেন্দ্রনাথ উল্লিখিত পত্রিকারই ১৮ বর্ষের সংখ্যা। তবে তখন তা আর কৃষিতত্ত্ব বিষয়ক ছিল না এবং সম্পাদক ছিলেন যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। দিনাজপুর সেন যন্ত্রে মুদ্রিত পত্রিকার প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দুই আনা। নিচে পত্রিকার নিয়মাবলী উল্লেখ করা হলো—

"১। দিনাজপুর পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ১।৶৹ আনা, তদ্বতীত ১ টাকা, প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৵০ আনা।

২। দিনাজপুর পত্রিকার মূল্য কি মাশুল প্রাপ্ত হইলে পত্রিকায় প্রাপ্ত স্বীকার করা ভিন্ন কোন গ্রাহককে তাহার রসিদ দেওয়া যাইবে না।

৩। মনিঅর্ডাব বা ৵৹ কি ৫ পয়সা মূল্যের ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য উপায়ে এই পত্রিকার মূল্য লওয়া যাইবেনা। প্রেরিত মনিঅর্ডারের সংলগ্ন কুপনের টাকা পাঠাইবার উদ্দেশ্য স্পষ্টক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে২, তাঁহাব ঠিকানা স্পষ্টরূপে লিখিয়া না জানাইলে পত্রিকা পাইতে গোলযোগ হইবে।

৫। তিন মাস মধ্যে বাৎসরিক সমস্ত মূল্য উপরিউক্ত কোন উপায়ে প্রেরণ করিলেও অগ্রিম বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

৬। দিনাজপুর পত্রিকা সম্বন্ধীয় সমস্ত পত্র ও প্রবন্ধ এবং পুস্তক নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। ব্যারিং পত্র গ্রহন করা যাইবে না।

৭। কোন গ্রাহক সহসা পত্রিকা লওয়া বন্ধ করিলে, পূর্ব্বগৃহীত সমস্ত পত্রিকার মূল্য শোধ করিয়া দিতে হইবে।

৮। ঘটনাচক্রের অনিবার্য্যতা বশতঃ কাগজ বন্ধ হইলে, গৃহীত মূল্যের অবশিষ্টাংশ ফেরত দেওয়া যাইবে, কিন্তু কোন গ্রাহক কোন এক সময়ের জন্য মূল্য প্রদান করিয়া, সেই সময় পূর্ণ না হইতে, কাগজ লওয়া বন্ধ করিলে তাঁহাকে অবশিষ্ট মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে না।

দিনাজপুর পত্রিকা কার্য্যালয়। শ্রী সীতানাথ ভট্টাচার্য্য

দিনাজপুর, সেন–যন্ত্রালয়। কার্য্যাধ্যক্ষ।"

৫

বর্তমান সংকলনের ভিত্তি, আগেই উল্লেখ করেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগ্রহ। উল্লিখিত সাময়িকপত্রের বিচ্ছিন্ন কিছু সংখ্যা হয়ত বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু একসঙ্গে পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কাজ করার সময় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ ইসহাক আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। প্রুফ দেখে দিয়েছেন ও শব্দসূচি তৈরি করেছেন মোঃ আজম বেগ, হাছানুর রহমান ও মন্নুজান বেগম। আমি তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

কোন গ্রন্থই নিখুঁত নয়, বর্তমান গ্রন্থতো নয়-ই। এ গ্রন্থমালা প্রস্তুত ও প্রকাশে আমার সময় লেগেছে প্রায় কুড়ি বছর। ফলে, অনেক ক্ষেত্রে খেই হারিয়ে ফেলেছি। গত দু'দশক বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত গত শতকের পত্রপত্রিকার খোঁজ করে বেরিয়েছি। উনিশ শতকের বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই এখন দুষ্প্রাপ্য। কোন পাঠক/গবেষক যদি উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত কোন সংবাদ-সাময়িকপত্রের খোঁজ দিতে পারেন তা'হলে উপকৃত হবো।

প্রথম খণ্ডে, উনিশ শতকের বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের যে তালিকা ও সংখ্যা দেওয়া হয়েছে বলা বাহুল্য তা সম্পূর্ণ নয়। আরো অনেক পত্র-পত্রিকা হয়ত তখন বেরিয়েছিল যা এখন হারিয়ে গেছে বা আমার চোখে পড়েনি। ভবিষ্যতে কোন গবেষক হয়ত সুষ্ঠুভাবে এ কাজ সম্পন্ন করবেন। সে আশায়ই রইলাম।

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয, ১৯৯৭।

মুনতাসীর মামুন

সংকলন
সেবক

৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩০৩

প্রার্থনা, সাধন প্রসঙ্গ, ব্রাহ্মসমাজে শাস্ত্রবাদ,

ভারতের জন্য ব্রাহ্মসমাজ কি করিয়াছেন?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৬। অভ্রান্তশাস্ত্র ও গুরু।— কোন বিশেষ পুস্তক কিম্বা ব্যক্তিতে ধর্ম্ম আবদ্ধ, ব্রাহ্মসমাজ এমত বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বরের জল, বায়ু, আলো যেমন সকলের জন্য, ধর্ম্ম ও তেমনি সাধু, অসাধু, জ্ঞানী, মূর্খ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলের জন্য। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্ম-লাভ বিষয়ে সবল ও দুর্ব্বল অধিকারী স্বীকার করেন না। "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার। যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার। ভ্রম-কুসংস্কার পাপ-অন্ধকার, বিনাশিতে স্বর্গের ধর্ম্ম মর্ত্তে আইল ; তোরা কে যাবি আয় বিনা মূলে ভব-সিন্ধুপার, তোরা আয়রে ত্বরায়, এবার নাই কোন ভয়, পারের কর্ত্তা মুক্তি দাতা স্বয়ং ঈশ্বর"— ইহাই ব্রাহ্মসমাজের মত। ব্রাহ্মধর্ম্মে মধ্যবর্ত্তী নাই। ঈশ্বরের সহিত সকলেই সাক্ষাৎ যোগের অধিকারী। কোন ব্যক্তিবিশেষকে গুরু না মানিলে ধর্ম্মলাভ হয় না, ব্রাহ্মসমাজ ইহা স্বীকার করেন না। ইংরেজিতে একটী সুন্দর কথা আছে— "A man however great, is a man after all" মানুষ যতই মহৎ হউক না কেন চিরদিনই ভ্রান্ত। অবশ্য মানুষ একে অন্যের ধর্ম্মলাভের সহায়, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীকার কবেন। বেদ, বাইবেল,- কোরাণ, জেন্দেবেস্তা, ত্রিপিটক, গ্রন্থসাহেব ইত্যাদি ধর্ম্ম পুস্তকে অনেক সত্য আছে যাহা আমরা মানি এবং সত্য আছে বলিয়াই উক্ত সকল গ্রন্থ ব্রাহ্মের নিকট আদরণীয়।

৭। সত্যধর্ম্ম অন্তরে।—ঈশ্বর মানুষের সহজ-জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধি দ্বারা সকলের নিকট সত্য প্রকাশ করেন এবং প্রত্যেকের আত্মাতে স্বয়ং প্রকাশিত হন। God in nature, অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থে ঈশ্বর দর্শন ; ইহাও ব্রাহ্মসমাজের মত। অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ, অবতারবাদ ইত্যাদি দূষণীয় মত বিদূরিত করিবার জন্য জগতে ব্রাহ্মসমাজ যে যত্ন করিতেছেন তজ্জন্য কেবল ভরতবর্ষ নহে, সমস্ত পৃথিবী ইহার নিকট বিশেষ ঋণী।

৮। অলৌকিক ঘটনা (Miracles)।— ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের মধ্যে কোন প্রকার অলৌকিক ঘটনাতে বিশ্বাস করেন না। এই বিষয়েও ব্রাহ্মসমাজের প্রচার দ্বারা ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যান্যস্থানে ক্রমশঃ মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

৯। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব ("Fatherhood of God and Brotherhood of man")। —জগতের সকল ধর্ম্মই এই কথা স্বীকার করেন। হিন্দু ধর্ম্মও এই কথা অস্বীকার করেন তাহা নহে ; কিন্তু কার্য্যতঃ হিন্দুসমাজ ইহার ঘোর বিরোধী। হিন্দুসমাজের দূষণীয় জাতিভেদ প্রথাই আমার কথার স্পষ্ট প্রমাণ। এই বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা এদেশের বিশেষ

মঙ্গল সাধন করিয়াছে। সমাজ-সংস্কার বিষয়ের আলোচনাকালে এই বিষয়টী সবিস্তার বিবৃত হইবে।

১০। চরিত্র সংশোধন।—এদেশের শিক্ষিতগণের চরিত্র গঠন বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ-বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। হিন্দু সমাজের যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের সহিত কোন না কোন প্রকারে সংসৃষ্ট, তাঁহারা প্রায় সকলেই চরিত্রবান্ বলিয়া পরিচিত। বাঙ্গলার সুবিখ্যাত লেখক ব্রাহ্মসমাজের সভা ও সেবক মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের নীতি গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া বঙ্গদেশের কত লোক যে উপকৃত হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমি তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া জীবনে অনেক উপকার লাভ করিয়াছি। সুবিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকার Smiles বলিয়াছেন "Character is a power" চরিত্রবল মহাবল। যাহার চরিত্র নাই সে মনুষ্যপদ বাচ্য নহে। গোঁড়া হিন্দুগণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক আচরণ ও মতের বিরোধী। কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ ব্রাহ্মগণের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এদেশের অন্য লোকাপেক্ষা চরিত্র রক্ষার প্রতি যে ব্রাহ্মগণের অধিক দৃষ্টি আছে, অনেকে তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজ-বিরোধী একজন শিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা আর কিছু না হউক, এদেশের অনেক যুবার চরিত্র রক্ষিত ও সংশোধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ ব্যভিচার ও সুরাপানের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।" তিনি আরও বলেন যে, "সন্তানদিগকে ২০। ২২ বৎসর বয়স পর্যন্ত ব্রাহ্মগণের সহিত যোগ রাখিতে দেওয়া শুভজনক।" কলিকাতার একজন দেশীয় উচ্চ কর্ম্মচারী কোন ব্রাহ্ম প্রচারককে বলিয়াছিলেন—"আপনি আমার সন্তান কয়টীকে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত করুন ; তাহা হইলে উহারা ভাল লোক থাকিবে, কুকার্য্য দ্বারা শরীর ও বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করিবে না"। এই সকল কথা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ব্রাহ্ম-শিক্ষকের ছাত্র সকল সাধারণতঃ চরিত্রবান ইহাও অনেকে স্বীকার করেন। ব্রাহ্মসমাজের লোক যে পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, বিচারক সেই পক্ষের মোকদ্দমা সত্য বলিয়া ডিক্রি দিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও কোনও কোনও ব্যক্তির চরিত্র স্খলিত হইয়াছে, তাহা আমাদের অবিদিত নাই। তজ্জন্য নিতান্ত লজ্জিত ও ব্যথিত আছি। তবে শিথিল চরিত্র ব্যক্তি অধিক কাল ব্রাহ্মসমাজে স্থান পাইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ ! সাবধান ! তোমাদের ধন-বল কিম্বা জন-বল নাই। বিদ্যা-বল যে অধিক আছে তাহাও নহে। তোমাদের একমাত্র বল চরিত্র-বল। চরিত্র আছে বলিয়াই তোমরা জনসমাজে আদৃত। যদি এই আদরের বস্তু হইতে তোমরা বঞ্চিত হও, নিশ্চয় জানিও তোমাদের বিড়ম্বনার একশেষ হইবে। দেশীয় যুবকদিগের চরিত্র রক্ষা বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের নিকট ভারতবাসী দায়ী। ব্রাহ্মগণ লোকের চরিত্র রক্ষার জন্য কতদূর যত্ন করেন, তৎসম্বন্ধে একটী কথা বলিতেছি। বঙ্গদেশের কোনও নগরের ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েক বৎসর গত হইল তাঁহার বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তথাকার "ব্রাহ্মগণ সুরাপান ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে প্রচার করাতে, সেই নগরের বেশ্যাগণের অবস্থা মন্দ ও সুরার কাট্‌তি কম হইয়াছে।" এই কথা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে যে অতিশয় গৌরবের বলা বাহুল্য। আর একটী হৃদয়-বিদারক ঘটনা এখানে প্রকাশ করিতেছি। এই ঘটনা

দ্বারা হিন্দুসমাজের নীতির অবস্থা এবং কোনও কোনও হিন্দু ব্রাহ্মসমাজের কি প্রকার ভয়ানক বিরোধী তাহা দৃষ্ট হইবে। ঘটনাটী এই,—দিনাজপুর নগরের একটী বি, এ, উপাধিধারী যুবক তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিতে যোগ প্রদান করিত। যুবকটী চরিত্রবান বলিয়া পরিচিত। যুবকের অভিভাবক ইচ্ছা করেন না যে, সে ব্রাহ্মদিগের সহিত কোনও প্রকার সংস্রব রক্ষা করে। যুবককে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়াও যখন ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংস্রব ত্যাগ করাইতে অক্ষম হইলেন, তখন যুবকের অভিভাবক (পিতা কিনা ঠিক মনে হইতেছে না) একটী অতি পৈশাচিক উপায় অবলম্বন করিলেন। সেই কথা মনে হইলে দেশের নৈতিক অবস্থা ভাবিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। যাহাতে ব্যভিচার ও সুরাবিষ দ্বারা যুবকের চরিত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার অভিভাবক বিধিপূর্ব্বক সেই চেষ্টা আরম্ভ করিলেন ! ! ! যুবক প্রলোভনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অসমর্থ হইল এবং তাহার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক আসিল। হায় ! হায় ! কি বিষম ব্যাপার ? কি পৈশাচিক ঘটনা ! কোন অভিভাবকও এইরূপ জঘন্য চরিত্র হইতে পারে ? ব্যভিচারী হও, সুরাপায়ী হও তাহাও ভাল, তথাপি ব্রাহ্মসমাজে যাইও না ! ! ! হায় ! দেশের কি দুর্দ্দশা উপস্থিত। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী[১] মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগের অতি অল্পকাল পূর্ব্বে এখানে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতাতে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ধর্ম্মভাব উদ্দীপন এবং চরিত্র গঠন বিষয়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজের নিকট অশেষ ঋণী।

১১। কপটতা— ব্রাহ্মসমাজ কপট ব্যবহারের ভয়ানক শত্রু। ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান শিক্ষিতগণের কপট ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষা ব্যবহার করেন বলিয়া, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের নিন্দাকারী। ধর্ম্মবিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতেই হইবে ব্রাহ্মসমাজের ইহা একটি মূল সূত্র। এই কথা বহুদিন হইতে ব্রাহ্মসমাজ ভারতে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। "কপটতা মহাপাপ" ইহা হিন্দু শাস্ত্রে বহুলভাবে দৃষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন এই কথার প্রতি অনেক হিন্দু, বিশেষতঃ নব্য শিক্ষিত হিন্দুগণের একবারেই দৃষ্টি নাই। সত্য লঙ্ঘন ও গোপনই ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক পিতা সন্তানদিগকে কপটব্যবহার শিক্ষাপ্রদান করেন। ব্রাহ্মসমাজ বলেন,—'কর্ত্তব্য বুঝিবে যাঁহা, নির্ভয়ে করিবে তাহা, যায় যাক্ থাকে থাক্ ধন প্রাণ মানরে, পিতাকে ধরিয়া রবে অচল সমানরে"। সরলতাই ধর্ম্মের প্রধান পত্তনভূমি। ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের কার্য্য ও জীবনদ্বারা এই বিষয়েও অনেক পরিমাণে দৃষ্টান্তস্থানীয়।

১২। ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা এদেশে শিক্ষিত সমাজে খৃষ্ট ধর্ম্মের গতিরোধ।— ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক পূজনীয় ডাক্তার কেরী[২], মার্শমেন[৩] এবং ওয়ার্ড[৪] ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের যত্নে হিন্দুসমাজস্থ কতক লোক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইহার পর সুবিখ্যাত ডাক্তার ডফ্[৫] (Dr. Duff) প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হন। এবং রেভারেন্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন (Rev. Dr. K. M. Banerjee.) বন্দ্যোপাধ্যায়ের[৬] ন্যায় হিন্দুসন্তান তাঁহার নিকট খৃষ্টধর্ম্ম বিরুদ্ধে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়। এইসময় যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় না হইত তাহা হইলেও এ দেশীয় অনেক শিক্ষিত

লোক যে খৃষ্টীয় সমাজভুক্ত হইত তাহার সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হওয়াতে অনেক শিক্ষিত হিন্দু ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিবেকের আদেশ পালনে তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। ৩০/৩৫ বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত বাগ্মী বাবু কেশবচন্দ্র সেনের[৭] সহিত রেভারেন্ড লালবিহারী দে[৮] ও পাদ্রী (Rev. Dyson) রেভারেন্ড ডাইসন্ সাহেবের খৃষ্ট ও ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে যে তুমুল ধর্ম্মসংগ্রাম হইয়াছিল তাহা আমাদের বিলক্ষণ মনে পড়িতেছে। কলিকাতা এবং কৃষ্ণনগর এই ধর্ম্মসংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র হইয়াছিল। এই সংগ্রামে খৃষ্টীয়গণ পরাজিত হওয়াতে সেই সময়ের হিন্দুসমাজপতি ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই ঢাকা নগরীতেও ইহার কিছুকাল পরে খৃষ্টানদিগের সহিত ব্রাহ্মসমাজের বিলক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল। সুবিখ্যাত বক্তা বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ[৯] এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি অত্রত্য পাদ্রী (Rev. Allen) রেভারেন্ড এলেন ও নর্ম্মাল বিদ্যালয়েব প্রধান শিক্ষক এরাটুন সাহেবের সহিত খৃষ্ট ও ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা এদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের গতি অনেক পরিমাণে রুদ্ধ হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার জন্য ব্রাহ্মসমাজ এদেশবাসিগনের কৃতজ্ঞতা ভাজন।

১৩। দেশে ও বিদেশে বক্তৃতা দ্বাবা ধর্ম্ম প্রচার ও একতা সংস্থাপন।— খৃষ্টীয় প্রচারকগণ এই বিষয়ে সর্ব্ব প্রথম পথ প্রদশক। ব্রাহ্মগণ তাঁহাদেরই অনুকরণে বক্তৃতা দ্বারা দেশ-বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজ-সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচাবকগণ দ্বারাই সর্ব্ব প্রথম ভারতের নানাস্থানের নানা জাতীয় শিক্ষিত লোকেব মধ্যে একতা সংস্থাপনের সূত্রপাত হয়। বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেশ ব্রাহ্মসমাজের সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিতেছেন। প্রচারক নিযুক্ত করিয়া বক্তৃতা দ্বারা দেশ-বিদেশে ধর্ম্ম প্রচাব কবা হিন্দুরীতি নহে। এখন যে পুনরুত্থানকারী নব্য হিন্দুগণ নানাস্থানে ধর্ম্ম প্রচাব করিতেছেন ইহাও ব্রাহ্মসমাজের নিকট শিক্ষা। ব্রাহ্মসমাজ এদেশে বক্তা প্রস্তুত করিয়াছেন বলিলে বোধ হয অসঙ্গত হইবে না। আধুনিক বঙ্গদেশের প্রথম বক্তা বাবু রামগোপাল ঘোষ[১০]। তিনি ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কাব কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। তৎপব বাহ্মসমাজ হইতেই ক্রমে ভারতেব সর্ব্বপ্রধান বক্তা বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার[১১], বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শিবনাথ শাস্ত্রী[১২], নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়[১৩] বক্তা প্রস্তুত হইয়াছেন। ব্যারিষ্টার বাবু আনন্দমোহন বসু[১৪]ও এক জন বিখ্যাত বক্তা। বঙ্গের প্রসিদ্ধ বাগ্মী বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াই প্রথমতঃ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বঙ্গের অপর প্রসিদ্ধ বক্তা পরিব্রাজক কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনও এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সহিত কতকটা সংসৃষ্ট ছিলেন এরূপ শুনিয়াছি। ইহা কতদুব সত্য ঠিক জানিতে পারি নাই। বিলাত ও আমেরিকাতে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়া যিনি যশস্বী হইয়াছেন, সেই বিবেকানন্দ স্বামী[১৫]ও ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন এরূপ শুনিয়াছি।

১৪। ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা। — যে ধর্ম্মের মধ্যে যতটুকু সত্য তাহা গ্রহণ করা ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তব্য মনে করেন। কিন্তু উদারতার নামে কোনও ধর্ম্ম শাস্ত্রের কিম্বা সাধু ব্যক্তির বিন্দুমাত্রও অসত্য গ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মগণ পরমহংস, ব্রহ্মচারী, ফকীর প্রভৃতির

অনেক আচরণের বিরোধী ; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। দক্ষিণেশ্বরের স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস[১৬] মহাশয় বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার পরিচয়ের পূর্ব্বে অতি অল্প লোকের নিকটই পরিচিত ছিলেন। যাই [যেই]কেশব বাবু ও তাঁহার মধ্যে পরিচয় হইল, অমনি শত শত লোক দেশের চতুর্দ্দিক হইতে পরমহংসের নিকট উপদেশ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইতে লাগিল। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে ব্রাহ্মসমাজ ভাল জিনিশের অতিশয় পক্ষপাতী, তাহা যে সম্প্রদায়ের লোকের নিকটই পাওয়া যাউক না কেন। বারদীর স্বর্গীয় ব্রহ্মচারী[১৭] মহাশয়ও এইভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীদ্বারা সর্ব্ব প্রথম শিক্ষিতসমাজে পরিচিত হন। মুক্তিফৌজের অধিনায়ক সুবিখ্যাত জেনেরাল বুথ যখন কলিকাতা আগমন করেন, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত দয়ানন্দ[১৮] যখন বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকেও যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ চিরকাল জগতের প্রকৃত সাধু ভক্তদিগকে যথোচিত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ বুদ্ধের "স্বার্থত্যাগ ও বিশ্বব্যপী মৈত্রী" ; লুথারের "ধর্ম্ম-চিন্তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা" ; সক্রেটিশের "আপনাকে আপনি জান" ; উপনিষদকার ঋষিদিগের "আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন" ; মহম্মদের "একমাত্র ঈশ্বরের পূজা—দেব পূজার প্রতিবাদ" ; চৈতন্যের 'জীব দয়া, নামে ভক্তি" ; ঈশাব 'পৃথিবীতে স্বর্গবাজ্য" ; ইত্যাদি মহাভাবেব অত্যন্ত আদব করেন ; কিন্তু এই সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও সংস্কারকদিগের মধ্যে যে সমুদয় কুসংস্কার ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী মত আছে, ব্রাহ্মসমাজ কখনও তাহা গ্রহণ কবেন না। কোন মনুষ্যই ব্রাহ্মের আদর্শ নহে ; কারণ মানুষ মাত্রেই অপূর্ণতা বিদ্যমান। সত্যই ব্রাহ্মের লক্ষ্য — ঈশ্বরই তাহার একমাত্র আদর্শ।

১৫। ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন এদেশে বর্ত্তমান সময়ে নানা প্রকার ধর্ম্মান্দোলনের মূল। — উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দয়ানন্দ সরস্বতী "আর্য-সমাজ", মান্দ্রাজ প্রদেশে দেওয়ান রঘুনাথ রাওর "সংস্কৃত-হিন্দুসমাজ", পাঞ্জাবে পণ্ডিত শিব নারায়ণ অগ্নিহোত্রীর "দেবসমাজ", বঙ্গদেশে "হরিসভা", "হরিসেনাদল", পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণের "যোগ-সমাজ", কর্ণেল অলকটের 'থিওসফিষ্ট' (Theosophist) দল, Revivalist, Reactionist (পুনরুত্থানকারী দল) প্রভৃতি নানা নামে যে সকল ধর্ম্মসমাজ ও ধর্ম্মান্দোলনকারীদিগের অভ্যুদয় হইয়াছে, বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মান্দোলন ও সমাজসংস্কারই ইহার মূলীভূত কারণ। কোন ব্রাহ্ম-বিরোধী বি. এ. উপাধিধারী ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজই এদেশে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলনের ফল। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মগণের আন্দোলনে ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়াছে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

ব্রাহ্মসমাজ এদেশে সমাজসংস্কার, বিদ্যালয় সংস্থাপন, শিক্ষাবিস্তার এবং অন্যবিধ যে সকল হিতকর কার্য্য করিয়াছেন এখন তাহাই প্রদর্শন করিব। ব্রাহ্মসমাজ সমাজ সংস্কার-কার্য্যকেও ধর্ম্ম বিষয়ের অন্তর্গত মনে করেন।

সমাজ সংস্কার, দেশ হিতকর কার্য্য ইত্যাদি। —১। বাল্য বিবাহ নিবারণ।— বহুকাল হইতে এই কুপ্রথা এদেশে প্রচলিত। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বঙ্গের সুবিখ্যাত গ্রন্থকার বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত[১৯] সর্ব্বপ্রথম তাঁহার গ্রন্থের বাল্যবিবাহের নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন করেন। তৎপর ব্রাহ্মসমাজের অধীন "ভারত সংস্কারকসভা" দ্বারা এবং ঢাকাস্থ "বাল্যবিবাহ নিবারণীসভা" হইতে প্রকাশিত "মহাপাপ বাল্যবিবাহ" পত্রিকাদ্বারা এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়[২০]। এই সকল আন্দোলনের ফলে বাল্যবিবাহ যে অতি দূষণীয় কার্য্য, তাহা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং বালক বালিকাদিগের বিবাহের বয়সও পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রচারক বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে যে সকল সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন তাহাতেও বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। এই সংস্কারের জন্য ভারতবাসী সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী। বোম্বাই নগরে মিঃ মেলেবেরি (Mr. Malabari) কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মগণ বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন[২১]। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্কুল ইন্‌স্পেক্টার মিঃ গ্যারেট (Mr. Garrett) যখন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের মধ্যে বাল্যবিবাহ নিবারণ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসমিতির (Syndicate) নিকট একটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন তখন বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী হিন্দুগণের মধ্যে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণ গ্যারেট সাহেবের প্রস্তাবের অতিশয় পোষকতা করিয়াছিলেন। কত বযসে বালক বালিকাদের বিবাহ দেওয়া উচিত, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজই তৎসম্বন্ধে সুবিজ্ঞ দেশীয় ও বিদেশীয় চিকিৎসকগণের মত সংগ্রহ করেন।

২। বহুবিবাহ নিবারণ।—এই কুপ্রথার বিরুদ্ধেও ব্রাহ্মসমাজ সময়ে সময়ে আন্দোলন করিয়াছেন। ব্রাহ্মগণদ্বারা পরিচালিত প্রসিদ্ধ "সঞ্জীবনী"[২২] পত্রিকাতে ৩/৪ বৎসর গত হইল, এই বিষয়ে বিলক্ষণ আন্দোলন চলিয়াছিল. প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়[২৩] যখন বহুবিবাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, ব্রাহ্মসমাজ প্রাণপণে তাঁহার কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। বিক্রমপুরবাসী বিখ্যাত কৌলিন্য-সংস্কারক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়[২৪] যখন এই কুপ্রথার প্রতিবাদী হন, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কোনও কোনও কুলীনকুমারী ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্যে বহুপত্নীক কুলীনের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, ইহা আমরা জানি। এদেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রশমন বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ কিছু যে করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না।

পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম।*

(বঙ্গবন্ধু হইতে উদ্ধৃত)

প্রাণের ভাইভগিনিগণ, মহানগরী কলিকাতায় যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়, বিস্তার এবং পরিণতি হইয়াছে, তাহাতে মহাত্মা রামমোহন[২৫], মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ[২৬], ভক্ত কেশবচন্দ্র, ক্রমান্বয়ে এই তিনটী মহাত্মা রঙ্গভূমিতে দণ্ডায়মান হওয়াতে মানবীয় মহত্ত্বের প্রতি লোকের দৃষ্টি নিপতিত হইবার যথেষ্ঠ কারণ আছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ কেমন আশ্চর্য্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মকে উৎসারিত, প্রবাহিত এবং বিস্তৃত করিলেন, তাহার সাক্ষ্যদান করিবার জন্যই আমি পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের পবিত্র সন্নিধানে এবং আপনাদের সকলের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলাম। এই সাক্ষ্যদানে আমাকে মধ্যে মধ্যে নিজের সম্বন্ধেও কোন কোন কথা বলিতে হইবে, তাহা যেন কেহ আত্মাভিমানসম্ভূত বলিয়া মনে না করেন।

ব্রহ্মোপাসনাই ব্রাহ্মধর্ম্ম মানব অন্তর হইতেই উৎসারিত হইয়াছে। আবার এমন সকল লোকও আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল ব্রহ্ম ও মানবের মিলনভূমি হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম উৎসারিত এবং ক্রমে প্রবাহিত ও বিস্তৃত হইয়াছে। অনেকে উপাসনা শব্দের তাৎপর্য্যও পরিগ্রহ করেন না। উপাসনা বলিতে একাসনে উপবেশন বুঝায়। যেমন ব্রহ্ম মানবের, তদ্রূপ মানব ব্রহ্মেব নিকটবর্ত্তী হইলে যখন উভয়ের মিলন হয়, তখনই ব্রহ্মোপাসনা সংসিদ্ধ হইয়া থাকে। এরূপ ব্রহ্মোপসনাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎস। এই উৎস হইতেই কিরূপে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগর—এই ঢাকায় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে অগ্রহায়ণ দিবসে শুভক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম উৎসারিত হইয়া. ক্রমে পূর্ব্ববঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারই সাক্ষ্যদান যথাসাধ্যরূপে করিতেছি।

কি আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, আবকারিতে সামান্য কার্য্যে নিয়োজিত, ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে আমাদের পিতৃস্থানীয় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্র[২৭] মহাশয়কে এবং তাঁহার কয়েকটী বন্ধুকে একত্র করিয়া পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ গোপনে তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত করিলেন ! চতুর্দ্দিকে কত নিন্দাচর্চ্চা, কত বাধাবিঘ্ন মধ্যে যে তাঁহাদিগকে সমবেত হইয়া এই প্রকারে গোপনে ব্রহ্মোপাসনাতে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না ! আমার মনে হয়, মাতৃগর্ভে যেমন গোপনে শিশু সন্তানের সঞ্চার হয়, তদ্রূপ পূর্ব্ববঙ্গের গর্ভে গোপনে স্বর্গের শিশু, ব্রাহ্মধর্ম্মের সঞ্চার হইয়াছিল। শিশুসন্তান যেরূপ কিছুকাল মাতৃগর্ভে গোপনে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তদ্রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মও পূর্ব্ববঙ্গের গর্ভে এই ঢাকা নগরে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

প্রথমতঃ যখন ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হয়, তখন সংস্কৃত কতকগুলি শ্লোক পাঠ করিয়াই তাহা সম্পন্ন হইত। এইরূপে কিছুদিন ব্রহ্মোপাসনা হইতে থাকে। এবং যিনি সপ্তাহে সপ্তাহে

* ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম উৎসব উপলক্ষে ১৩০৩ সনের ২৩শে অগ্রহায়ণ দিবসে পূর্ব্ব বাঙ্গলা উপাসনালয়ে শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়কর্ত্তৃক বিবৃত।

ব্রহ্মোপসনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেন এবং যাঁহারা তাহাতে যোগদান করিতেন, তিনি কিম্বা তাঁহারা প্রত্যহ উপাসনা করিবার জন্য পূর্ণ ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইতেন না। এইরূপে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা হইতে থাকে। ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় ডেপুটী কালেক্টররূপে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জে গমন করেন। তথায় তখন আমি পাঠ্যাবস্থায় ছিলাম। তাঁহার শুভাগমনের সংবাদ পাইয়াই আমরা অনেকে তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। আমার মনে আছে, তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া মনে হইল যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবেইত তাঁহার এরূপ মুখের জ্যোতিঃ হইয়াছে। তাহাতে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় যে কেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইবার উপক্রম হইল, তাহা এখন বলিতে পারি না। কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, পিতাপুত্রের মিলনের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে আমার ব্রহ্মোপাসনাতে মধুর মিলন হইবে। এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য নগরেও প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ঢাকার পর কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং ফরিদপুরে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সকল স্থানেও বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত লোকদিগকে ব্যবহার করিয়াই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের কি দয়া! ভাই ভগিনীগণ, তিনি এইরূপে কেমন তোমার আমার — আমাদের সকলের উদ্ধারের জন্য আয়োজন করিলেন। একদিকে যেমন ঢাকা কলেজে, এবং অনান্য স্থানে বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইয়া বিদ্যালোকে ভ্রমকুসংস্কার দূর করিতেছিল, অপরদিকে তদ্রূপ ব্রহ্মোপাসনালয় সকল সংস্থাপিত হইয়া কেমন ব্রহ্মজ্ঞানালোকে অন্তরের মোহান্ধকার যাহাতে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার পথ খুলিয়া গেল। বন্ধুগণ, ভাবিয়া দেখ— পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যেরূপ ভ্রমান্ধকার দূর হইয়াছিল, বাহ্য জগৎও যে মিথ্যা নয়, অসার নয়, ইহার মধ্যেও যে, গভীর সত্যসমূহ প্রচ্ছন্নভাবে রমিয়াছে, তাহা যেমন বিদ্যালোকে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তদ্রূপ যদি ব্রহ্মজ্ঞানালোকে ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হইবার উপায় না হইত, আমরা কেমন জড়বাদী ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া পড়িতাম। ধন্য ঈশ্বরের করুণা!

এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মালোক যেমন পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে বিকীর্ণ হইবার উপক্রম হইল, অপরদিকে তেমনি ঢাকা নগরের ব্রাহ্মসমাজে কালেজ এবং নর্ম্মাল স্কুলের যুবক ছাত্রগণ যোগদান করিতে আরম্ভ করিলেন। একটী শাখা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইল। তাহাতে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন[২৮], কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার[২৯] এবং গোবিন্দপ্রসাদ রায়[৩০] উপদেশ প্রদান করিতেন। শ্রীযুক্ত দীনবাবু দার্শনিক, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ধর্ম্ম, এবং গোবিন্দপ্রসাদ রায় মহাশয় সামাজিক ও পারিবারিক নীতি বিষয়ে উপদেশ করিতেন। তাহাতে আমাদের তিনটী চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবার উপায় হইল। আমরা স্পষ্ট এই দেখিতে সক্ষম হইলাম যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে দর্শন, ধর্ম্ম এবং সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

এইরূপে তৎকালীন ছাত্রগণমধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে খুব আন্দোলন উপস্থিত হইল। এমন সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের পরমবন্ধু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় দেখিতে পাইলেন যে, যুবকগণ জ্ঞানেতে

ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে সক্ষম না হইলে তাহারা কখনও জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহাতে তাঁহার এই ইচ্ছা হইল যে, ঢাকা নগরে একটী ব্রাহ্ম-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। তিনি তখন কুমিল্লা ছিলেন। তথা হইতে তিনি মাননীয় শ্রীযুক্ত দীনবাবুকে ঢাকাতে একটী ব্রাহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিতে লিখেন এবং নিজে তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হন। ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে তিনি এরূপ ভাব প্রকাশ করেন যে, তাহাতে অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইবে। ঈশ্বর কতকগুলি কথা মুখস্থ করাইলে চলিবে না। ঈশ্বরপরায়ণ শিক্ষকদ্বারা শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইলে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষাও হইতে পারে। অতএব এরূপ শিক্ষকের কর্ত্তৃত্বাধীনেই বিদ্যালয়টীকে স্থাপন করিতে হইবে, তাহা হইলে সিদ্ধ মনোরথ হওয়ার সম্ভাবনা। এই মনে করিয়া শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় শ্রীযুক্ত দীনবাবু মহাশয়কে একটী ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্ম শিক্ষকের জন্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিতে অনুরোধ করেন। তাহাতেই ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রদ্ধেয় অঘোরনাথ গুপ্ত[৩১] মহাশয় এখানে শিক্ষক হইয়া আসেন। সেই সময়ে আমি এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছিলাম। আমার জীবনে যে আমি কি করিব, তাহা স্থির করিতে অক্ষম হইয়া এবং নিজের নানারূপ অনুপযুক্ততা ভাবিয়া আমি সেই সময়ে বড়ই বিপাকে পড়িয়া ছিলাম। বাড়ী হইতে ঢাকায় আসিয়াই এই জানিতে পাইলাম যে, কলিকাতা হইতে সংস্কৃতজ্ঞ—সংস্কৃত কালেজের ছাত্র—এক জন সামান্য বেতনে এখানে ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতার পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। এই নগরে এই কথা লইয়া বেশ আন্দোলন হইতেছিল। কারণ তখন এঅঞ্চলের লোকের ধারণা এই ছিল যে. যে যত অধিক বেতন পায়, সেই তত উন্নত এবং গণ্যমান্য। ইহার বিপরীত ব্যাপার দেখিয়া সকলে ইহার কারণ বুঝিতে পারিল না। আমিও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অঘোর বাবু কেন এমন অল্প বেতনে এখানে আসিলেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে না হইতেই তিনি দণ্ডায়মান হইয়া সাদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমি তখন মাত্র কাজে হইতে বাহির হইয়াছি, এইরূপে কোথাও কখনও ইতিপূর্ব্বে আদৃত হই নাই। ইহাতে তাঁহার সঙ্গে খুব সরলভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে সুযোগ পাইলাম এবং আমি যাইয়াই তাঁহার এখানে এত অল্প বেতনে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। অমনি তিনি সহাস্য মুখে এই উত্তর করিলেন যে, "আমার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে" ; এই কথা আমার অন্তর ভেদ করিল। আমার মনে হইতে লাগিল, ধনোপার্জ্জন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যও মানুষের থাকিতে পারে? ইহাতে আমার মনের মধ্যে যে কি এক আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাহা এখন বুঝাইবার যো নাই।

এই অঘোর বাবু তখন ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এরূপ ব্যাকুল অন্তরে ব্রহ্মোপাসনা কার্য্য সম্পন্ন এবং প্রার্থনাদি করিবার সময় ঈশ্বরকে এরূপ লক্ষ্য করিতেন যে, তাহাতে ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে মহা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি জীবনেও ব্রাহ্মধর্ম্ম পরায়ণতার এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন

করিতে লাগিলেন যে তাহাতে অনেকের এবং বিশেষতঃ আমার গুরুতর উপকার সিদ্ধ হইল। এইরূপে ঢাকাতে ব্রাহ্মধর্ম্মালোক নূতনভাবে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তখন যুবকগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত ব্রহ্মোপাসনাতে যোগদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে এমন একদল যুবক দণ্ডায়মান হইল যে, তাহারা কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে পরিণত করিবে, তজ্জন্য ব্যাকুল হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। আমি সকল অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছিলাম।

এমন সময়ে ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন আসিয়া এখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বিশ্বাস, উদারতা, প্রেম এবং অন্যান্য বিষয়ে এমন কয়েকটী বক্তৃতা করেন যে, তাহাতে আমাদের আশা উৎসাহ খুব বর্দ্ধিত হয়। কেশববাবুর বক্তৃতাতে আর একটী গুরুতর ব্যাপার এই হইয়াছিল যে, আমাদের পূজনীয় প্রিন্সিপেল ব্রেনেন্ড[৩২] সাহেব সেই সকল বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মোহিত হন। কেশব বাবু এবং লালবিহারী দের মধ্যে যখন আন্দোলন হয়, তখন ব্রেনেন্ড সাহেব মহোদয় লালবিহারী দের বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে ক্লাশে কটাক্ষ করিতেন, তাহাতে আমরা—ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষপাতী ছাত্রগণ মনে বড় কষ্টানুভব করিতাম। তিনি এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন।

এইরূপে ঢাকাস্থ সাধারণ ছাত্রসমাজের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আরও বিশদরূপে মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। সেই সময়ে আমি ঢাকা পোগোজ স্কুলের শিক্ষক ছিলাম। পোগোজস্কুলের[৩৩] ছাত্রগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের এরূপ পক্ষপাতী হইয়াছিল যে, লোকে পোগোজস্কুলকে ব্রাহ্মস্কুল বলিয়া বিদ্রূপ করিত এবং হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা[৩৪] আমাকে পোগোজস্কুলের শিক্ষকতার কার্য্য হইতে অবসৃত করিবার জন্য পোগোজ সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিল। তখন ঢাকার ছাত্রসমাজের এরূপ অবস্থা ছিল যে, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতাদি শ্রবণাপেক্ষা উপাসনাতে যোগদান করিবার জন্য সমধিক আগ্রহের সহিত দলে দলে উপস্থিত হইত।

এইরূপে ঢাকা নগরে ব্রাহ্মধর্ম্ম অত্যন্ত দ্রুতবেগে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেই সময়ে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে পার্কার, নিউমেন এবং মিস কব প্রভৃতির কতকগুলি ইংরেজী গ্রন্থ শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন মহাশয়ের সাহায্যে পাঠ করিতে পাইয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত না হইলে যে জীবনে পরিণত হইতে পারে না, তাহা আমরা তখন সুন্দরমত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে সঙ্গত-সভা সংস্থাপিত হওয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে পবিণত হওয়ার পথ খুলিয়া গেল। আমাদের মধ্যে প্রথমতঃ প্রার্থনা, তাহার পর নিয়মিত উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল এবং চরিত্র গঠনের জন্য আমাদের মধ্যে বিশেষ যত্নও হইতে লাগিল। সঙ্গত সভার একটী অল্প বয়স্ক সভ্যকে "আমাকে পাপ হইতে উদ্ধার কর" প্রার্থনা করিতে শুনিয়া একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বালক, তুমি আবার পাপ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য প্রার্থনা কর?" তাহাতে সেই বালকটী বলিল যে, "আমার ও পাপ আছে। খেলার সময়,

শ্রেণীতে পড়া দেওয়ার সময় কত অপরাধ করিয়া থাকি।" এরূপ স্বাভাবিক প্রার্থনাদি দ্বারাই চরিত্র গঠনের সাহায্য হয়।

এইরূপে ঢাকা নগরে একটী উন্নতশীল ব্রাহ্মদল দণ্ডায়মান হইতে চলিল। এই দেখিয়া অধিক বয়স্ক ব্রাহ্মগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিক বয়স্ক ব্রাহ্মগণের এই আনন্দ অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। তাঁহারা সামাজিক বিষয়ে এরূপ রক্ষণশীল ছিলেন যে, কয়েকটী আরমানি ভদ্রলোক সাপ্তাহিক উপাসনাতে উপস্থিত হইতে চাওয়াতে, তাঁহারা বিশেষ আলোচনার পর এরূপ স্থির করিলেন যে, তাঁহারা বাহিরে বসিয়া উপাসনা দেখিবেন। এমতাবস্থাতে একটী মুসলমান যুবক যখন আমাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন, তখন একদিকে নগরে অধিক বয়স্ক ব্রাহ্মদের মধ্যে এবং অপর দিকে আমাদের গ্রামদেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই আন্দোলনে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রায়শ্চিত্ত করেন। সে সকল যুবক দণ্ডায়মান রহিলেন, তাঁহারা এই পরিক্ষায় পড়িয়া বিশেষভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে শিক্ষা কবিলেন এবং স্ব স্ব চরিত্রের প্রতিও তাঁহাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে যুবক ব্রাহ্মগণ উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলরূপে ঢাকা নগরে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহাতে ঢাকাতে বিশেষভাবে এবং পূর্ব্ববঙ্গে সাধারণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তৃত হইবার পথ খুলিয়া গেল।

ব্রাহ্ম পরিবার না হইলে ব্রাহ্মসমাজ কখনও গঠিত হইতে পারেনা। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, শ্রদ্ধেয় ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় যেমন কয়েকটী বন্ধুসহ সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনিই তদ্রূপ তাঁহার সন্তানদিগকে লইয়া পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনারও সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ব্যবহার করিয়া পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন পূর্ব্ববঙ্গে মহাব্যাপারের সূত্রপাত করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়, বিস্তার এবং ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকভাবে আমা অপেক্ষা আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়[৩৫] মহাশয়ই উৎকৃষ্টতররূপে বর্ণন করিতে সক্ষম। এবং তিনি তাহা আপনাদিগকে প্রদর্শন করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি এখন আর অধিক কথা না বলিয়া, কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম কি গুরুতর উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ প্রেরিত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদিগকে অনন্ত উন্নতির স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিতে হইলে, আমাদিগকে একদিকে সত্য, জ্ঞান, ন্যায়, প্রেম, পুণ্য ও শান্তির অনন্ত আধার ইচ্ছাময় একমাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্ম–সনাতনকে লক্ষ্য ও আদর্শ করিতে হইবে। তিনি আমাদেব প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরাত্মারূপে বিরাজমান থাকিয়া সুমতি সুবুদ্ধি প্রদান, নানা সদ্ভাব ও সদিচ্ছা উদ্দীপন এবং সৎপথে পরিচালন করিতেছেন। এই অন্তরাত্মার আলোকে আলোকিত, ইঁহার প্রভাবে প্রভাবিত এবং ইহার পরিচালনে পরিচালিত হইয়াই আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে সমুন্নত হইতে, রত থাকিতে হইবে। কেবল নিয়মিতমতে তাঁহার উপাসনা, কিম্বা তাঁহার নিকট প্রার্থনাদি করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। ঘাটে পথে, যেখানে সেখানে, যখন তখন তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের

স্রোতে ভাসিতে হইবে ; তাহা না হইলে কাহারও সাধ্য নাই ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

ইহা হইলেই যে আমাদের জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য বিধিমত সংসিদ্ধ হইতে পারে, তাহা নহে। আমাদিগকে জীবনের সমুদায় ব্যাপারে, কারবারে এবং সমুদয় নরনারীর অন্তরে বাহিরে, পূর্ণব্রহ্ম ভগবানকে প্রকাশিত হইয়া লীলা বিহার করিতে সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ভক্তি এবং প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি করিতে হইবে। ...

৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩০৩

প্রার্থনা, সাধন প্রসঙ্গ, মৃত্যু, কেশবচন্দ্র সেন, ব্রাহ্মরমণীর পবিত্র বসন্তোৎসব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন, তিন ব্রাহ্মসমাজে মৈত্রীস্থাপন, সংবাদ।

৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩০৩

প্রার্থনা, সাধন প্রসঙ্গ, ব্রাহ্ম কৃপা, ব্রাহ্মযোগ, কেশবচন্দ্র সেন, পূর্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সম্মিলনীর ৭ম বার্ষিক কার্য্য, সংবাদ, ব্রহ্ম ও জগৎ।

৫ম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩০৪

প্রার্থনা, সাধন প্রসঙ্গ, পাপ, সংবাদ, রামমোহন রায় ও সেমিনারি–বাঁকিপুর

৫ম খণ্ড, নবম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩০৪

প্রার্থনা, সাধন প্রসঙ্গ, পুনরাবর্তন, বিবেকের সার্ব্বভৌমিকত্ব, সম্পাদকীয় মন্তব্য, সংবাদ, বিবিধ।

৫ম খণ্ড, দশম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩০৪

প্রার্থনা, সাধন প্রসঙ্গ, অহঙ্কার ভয়ানক শত্রু, কেন আমরা সম্মানিত হইতে পারি না। প্রাণস্বরূপ, পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্ম সম্মিলনী, ব্রাহ্মসমাজে দরিদ্রতা, সংবাদ।

৫ম খণ্ড, একাদশ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩০৪

প্রার্থনা, সাধন প্রসঙ্গ, কয়েকটা কথা, অষ্টম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, মানবজীবন মঙ্গলময়ের বিধাতৃত্ব।

সংকলন

অঞ্জলি

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩০৫, এপ্রিল ১৮৯৮

উৎসর্গ

(১)

প্রকৃতি প্রাঙ্গণে যাঁর
চন্দ্র সূর্য্য তারকায়
খেলিছে অনন্ত জ্যোতিঃ,
অনন্ত চিন্ময় জ্ঞান ;
তাঁহার রাতুল পায়
করি এ "অঞ্জলি" দান।

(২)

আনন্দ সুষমাময়
অনন্ত মহান ভাব,
যাঁহার প্রসাদে করে
মোহিত মানব প্রাণ ;
তাঁহার রাতুল পায়
আমার "অঞ্জলি" দান।

(৩)

যে নর-প্রকৃতিময়
পুণ্যের আলোকে তাঁর
ফুটিছে কুসুমরাশি ;
সে নর-প্রকৃতি-করে
এই নব সংবৎসরে
সামান্য "অঞ্জলি" মোর
দিনু আজ উপহার।

নাম-করণ।

অঞ্জলি—পুষ্পপত্র চন্দন প্রভৃতি বিবিধ ভিন্ন ভিন্ন উপকরণপূর্ণ বলিয়া এবং উহার প্রত্যেকটীই সতেজ, টাটকা ও পবিত্র বলিয়া ;

অঞ্জলি—দেব দেবীর চরণে, বিশেষতঃ সারস্বত উৎসবে বিদ্যাদেবীর চরণকমলে অর্পিত হয় বলিয়া ;

অঞ্জলি—পুষ্পাঞ্জলি, জলাঞ্জলি, কনকাঞ্জলি, প্রেমাঞ্জলি, শোকাঞ্জলি প্রভৃতি সুন্দর, স্বাদু, তরল, উজ্জ্বল ও ভাবপূর্ণ শব্দসমূহের অঙ্গ বলিয়া ;

অঞ্জলিতে— দীনভাব, দেবভাব, শ্রদ্ধা, ভক্তি, শুদ্ধি ও প্রসন্নতা একত্র মিলিত বলিয়া, পূজ্য, পূজা ও পূজক এক গুচ্ছে গ্রথিত বলিয়া, আমি এই পত্রিকার নাম "অঞ্জলি" রাখিলাম।

উদ্দেশ্য

এই খানি শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্রিকা, বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষিত করা ইহার প্রাণ।

এই শিক্ষাদান কার্য্যে পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকদিগের বিশেষতঃ শিক্ষক ও ছাত্রদিগের সাহায্য করা ইহার উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যব্রত সাধনে ভগবান আমাদের সহায় হউন এবং আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও সিদ্ধি দান করুন।

আমি একাকী এই ব্রত উদ্‌যাপন করিব বলিয়া গ্রহণ করি নাই, এবং করিতে পারিব বলিয়াও মনে করি না। সকলের সমবেত চেষ্টা না হইলে একটী সামান্য পিনও প্রস্তুত হয় না, দুর্ব্বিসহ মানবচরিত্রের সহস্র মুখে প্রধাবিত স্রোতের কথা তবে আব কি ! কতকগুলি প্রবাদ লিখিয়া পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করা উদ্দেশ্য হইলে তাহা হয়ত দুচার জন মিলিয়া করিতে পারিতাম,—সে উদ্দেশ্য নয়। ভাষার পারিপাট্য সম্পাদন করিয়া পাঠকমণ্ডলীর তৃপ্তিসাধনও আমাদের ব্রত নয়। মানুষ শিক্ষা প্রভাবে মানুষ হয়। সেই শিক্ষা বিষয়ে মানব মণ্ডলীর কথঞ্চিৎ সেবা করা আমাদের কার্য্য। প্রার্থনা করি, অভিভাবক, শিক্ষক, পরিদর্শক ও ছাত্রমণ্ডলী সকলেই অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও সহায়তা করিবেন। আগামী বারে বিস্তারিতরূপে এই বিষয়ে নিবেদন করিতে বাসনা রহিল।

শিক্ষা

এক একটী মানব জীবন এক একখানি সাদা আবৃত পট। এক একটী কুসুমকোরক বটা বহুদলসমষ্টি,—জল বায়ু আলোক পাইয়া যেমন কোরক বিকশিত হয়, কুসুমদল রঞ্জিত হয়, দেখিয়া মানবের চক্ষু জুড়ায় ও প্রাণ হরণ করে, সেইরূপ মানবজীবনপটও শিক্ষার অলোক পাইয়া ক্রমশঃ বিসারিত ও চিত্রিত হয়। উহার কোন স্থান সুরঞ্জিত হয়, কোন স্থান নীলিমাময় হয়, কোন স্থান বা একেবারে সাদাই থাকিয়া যায়। এক একখানি পট কেমন মনোহর ! তাকাইয়া দেখিলে প্রাণ জুড়ায় ! এমন যে সাদা কাগজখানি তাহা কালে শিক্ষা প্রভাবে বিধাতার তুলিতে চিত্রিত হইযা এক একটী মানব জীবনরূপে প্রতিভাত হয়—অস্থি মাংসের ঢিবি দেবতা হয়।

শিক্ষা জীবনস্রোতের গতির নিয়ামক। একটী প্রবহমাণ স্রোতের সম্মুখে শিক্ষা খাদ কাটিয়া যায়, কাজেই উহার গতিরেখা বা নিয়তিরেখা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। জীবনস্রোত সেই খাদে খাদে চলিয়া যায়, কোন রূপেই অন্যথাচরণ করিতে পারে না।

লেখাপড়া শিক্ষার এক প্রকরণ বা বিধাতার একটী তুলি। ঐ তুলিতে জীবনপট চিত্রিত হয়। অতএব লেখাপড়া, লেখাপড়ার জন্য নয়, কিন্তু জীবনপট চিত্রিত করিবার জন্যই

আবশ্যক! দুঃখের বিষয় উহা অনেকেই বুঝে না। বিধাতার তুলিতে বা বিধির কলম, অব্যর্থ। উহাতে যাহা চিত্রিত হইবে তাহাই জীবনপটের দৃশ্য রচনা করিবে। লেখাপড়া জীবনপটের একটী প্রকাণ্ড অঙ্কের দৃশ্যপট রচনা করে। উহা মানসিক শক্তি বিকাশের একটী অমোঘ উপায়।

জীবনপট অনন্ত, অতএব শিক্ষারও সমাপ্তি নাই। জন্ম ও মরণ শিক্ষার দুদিকের দুটী রেখা। এই দুই সীমারেখার মধ্যেই আমি আমার কার্য্যক্ষেত্র স্থির করিয়াছি। যাহা অনেকের পক্ষে অন্ধকারময়, আমি সেই অন্ধকার তিমির গর্ভে প্রবেশ করিব না মনুষ্য জীবনের আদি ও অন্ত উভয়ইত তিমিরে ঢাকা, সে তিমিরে আলো ঢালা আমার কাজ নয়, তজ্জন্য এ উদ্যম নয়।

যাহা জীবনপটে রঙ্‌ ঢালে, যাহা জীবন স্রোতের প্রদর্শক তাহা যে কত গুরুতর ব্যাপার সকলেরই তাহা একবার ধারণা করা উচিত।

এক একখানি পট এক একরূপ, এক একটী স্রোত এক একদিকে প্রধাবিত। সুতরাং সকলের জন্য এক বিধি ও এক পথ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। তথাপি এক বিধি ও এক পথ এক এক শ্রেণীর জন্য অতিদেশ করা যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক একটী বিষয় শিক্ষাদানার্থ বিবিধ উপায় আবশ্যক হয়। শিক্ষাদাতাকে সে সকল উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। এক উপায়ে শিক্ষাদান সর্ব্বত্র ফলপ্রদ হয় না। পাত্র ভেদে উপায় প্রভেদ করিতে হয়। এইজন্য আমরা একই বিষয় বিভিন্নরূপে প্রদর্শন করিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেহ তাহা পুনরুক্তি বা বহূক্তি মনে করিবেন না।

মানব–জীবন বিজ্ঞান, প্রত্যেক জীবন স্বতন্ত্র এক এক খানি বিজ্ঞান। যাহা বিজ্ঞান গঠন করে তাহাও বিজ্ঞান, শিক্ষা ও বিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞানে জ্ঞান না থাকিলে সুশিক্ষা দান করা যায় না।

জগৎ শিক্ষার উপাদান। শিক্ষার উপাদান সমুদয়ই বিজ্ঞানময় হওয়া প্রয়োজন। আমরা যে ঘরে থাকি তাহাও শৃঙ্খলাময় সজ্জিত বিজ্ঞান হওয়া চাই। খাওয়া পড়া, শয়ন উপবেশন প্রভৃতির কিছুই আকস্মিক বা অভিজ্ঞানময় হইলে তাহাতেই শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। অতএব সুশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর যাহা কিছুর সহিত সম্পর্ক হইবে তত্তাবৎ সমুদয়ই বিজ্ঞানের অন্তর্গত এবং শৃঙ্খলাময় ও সুসজ্জিত হওয়া প্রয়োজনীয়। না হইলে সুশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে।

বর্ণশুদ্ধি

ছাত্রদের প্রতিও এইরূপ অনুজ্ঞা থাকা কর্ত্তব্য যে কোন শব্দ লিখিতে সন্দেহ হইলেই তাহারা শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া বা অভিধান দেখিয়া লইতে পারিবে। শিক্ষক মহাশয়ও এই অজ্ঞতার জন্য কোন প্রকার দণ্ড প্রয়োগ না করিয়া তাহা বলিয়া দিবেন বা দেখিতে দিবেন কিন্তু যদি কোন ছাত্র কোন শব্দ অশুদ্ধ বিন্যাস করে তবে তজ্জন্য তাহাকে বিশেষ শাসন করিবেন।

শাসনের অর্থ দোষ সংশোধনার্থ উপায় প্রয়োগ করা। যে শাসনে সংশোধন হয় না তাহা শাসন নামের উপযুক্ত নয় ; তদ্দ্বারা উপকার না হইয়া শাস্তা ও শাসিত উভয়েরই অমঙ্গল হইয়া থাকে। এই জন্য বর্ণাশুদ্ধির জন্য অর্থ দণ্ড বা শারীরিক দণ্ড সীমা বহির্ভূত দণ্ড। বর্ণাশুদ্ধির জন্য অশুদ্ধ শব্দকে শুদ্ধ করিয়া ৩০ বার লিখাইয়া লইলে উৎকৃষ্ট দণ্ড হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত ছাত্রের তাহাতে ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে আশা করা যায়। অল্প বয়স্কদিগকে ১০ বার লিখাইয়া লইলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। বয়স অনুসারে বার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া আবশ্যক। আবার কোন শব্দ যদি বার বার অশুদ্ধ হয় তবে ৩জ্জন্য ও বার সংখ্যা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। আবশ্যক হইলে কোন শব্দ শতবার লেখাইয়া লওয়াও অন্যায় নয়।

শিক্ষক প্রত্যেক শ্রেণীব পাঠ্য বই দেখিয়া দুরূহ শব্দগুলি এক খান খাতা বইতে পৃথক পৃথক লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। এবং উহার সহিত ছেলেরা সচরাচর সে সকল শব্দ ভুল করে সে গুলিও লিখিয়া রাখিবেন। শ্রুতিলিপি লেখাইবার সময়ে সেই খাতা বই দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে শব্দ বলিবেন। অন্ততঃ সপ্তাহ কাল উহা হইতে একই বারটী শব্দ প্রতিদিন লেখাইবেন। এইরূপে সেগুলি সকলের অভ্যস্ত হইলে আবার পববর্ত্তী অন্য বারটী শব্দ লইবেন। এই নিয়মে শ্রুতিলিপি দ্বারা সচরাচর ব্যবহৃত ও পাঠ্য বহির কঠিন কঠিন শব্দ গুলির অভ্যাস হইবে। অনেক শিক্ষক শ্রুতিলিপির বিষয়ে কোন নিয়মই অবলম্বন করেন না। বই দেখিয়া যথেচ্ছ শব্দ বলিয়া যান, আজ এখান হইতে কাল ওখান হইতে লেখাইয়া থাকেন। ইহাতে ছাত্রদের বণশুদ্ধির বিষয়ে বিশেষ কোন সাহায্য হয় না। বস্তুতঃ কোন ক্রম অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান না করিলে কোন শিক্ষাই কায্যকরী হয় না।

কোন ছাত্র বোডে. কি নোট বইতে, কি বিদায়েব পত্রে কি সাপ্তাহিক কি অন্যরূপ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরে কোন শব্দ অশুদ্ধ লিপি করিলে শিক্ষক মহাশয় তজ্জন্য ছাত্রকে পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ দণ্ড বিধান কবিবেন। এই রূপ দণ্ডদানে নিশ্চিতই বিদ্যালয় হইতে অশুদ্ধ লিখনের স্রোত বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহাতে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, কোন একটী শব্দও যেন শিক্ষক মহাশয়ের অনাবধানতা বশতঃ বাদ না যায়, এবং শিক্ষক মহাশয় দণ্ড প্রয়োগে শিথিলযত্ন না হন।

ছাত্রদের বিদায়ের বা অন্য কোনরূপ আবেদন পত্রগুলির সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম অবলম্বনীয়। ছাত্র বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থাকিলে ঐ রূপ দণ্ডদান একটুকু অসুবিধাজনক হয়। আজ একজন ছাত্র অসুস্থ হইল, বিদায়প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র অন্য ছাত্রের দ্বারা শিক্ষক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিল। শিক্ষক মহাশয় দেখিলেন তাহাতে একটী শব্দ অশুদ্ধ বিন্যস্ত হইয়াছে। "এখন তিনি কি করিবেন?" এই প্রশ্ন হইতে পারে। এরূপ স্থলে যে ছাত্র আবেদন পত্র আনিয়া দিবে তাহাকে দিয়া সেই অশুদ্ধ শব্দ ১০ বার কি ৩০ বার লেখাইয়া লওয়ার বিধান করা অযুক্ত নয়। আপাত দৃষ্টিতে উহা "পরের জন্য পরের দণ্ড" এই ন্যায়সূত্রের অন্তর্গত বলিয়া প্রতীত ও উপেক্ষিত হয়। কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় উহা সাক্ষাৎ দণ্ড অপেক্ষাও সমধিক ফলোপধারী। দণ্ডভয়ে প্রত্যেক ছাত্রই পত্র গ্রহণ করিবার সময়ে বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইবে পত্র শুদ্ধরূপে লিখিত কি না এবং

অশুদ্ধ দেখিলে তখনই লেখক দিয়া বা নিজেই শুদ্ধ করিয়া লইবে। আবার এক জনে দণ্ড পাইলে অন্যেরা সতর্ক হইবে। লেখক ও পত্রবাহক প্রত্যেকেই বিশেষ করিয়া শুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। ছাত্রদের অশুদ্ধ পত্র শিক্ষক একেবারেই গ্রহণ করিবেন না। প্রত্যুত অশুদ্ধি থাঁকিলে এক একটী শব্দ দশ কি ত্রিশ বার লিখিয়া দিতে হইবে এরূপ আদেশ থাকিলে বর্ণাশুদ্ধি একেবারে অন্তর্হিত হইবে।

ইতিহাস শিক্ষা

ইতিহাসের অধ্যাপনা অতি কঠিন ব্যাপার। বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাস শিক্ষার যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত পুস্তক নাই, শিক্ষকগণও এবিষয়ে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং বঙ্গবিদ্যালয়সমূহে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া উচিত কি না সন্দেহ স্থল। অতীত ঘটনাবলীর সহায়ে কোন জাতির বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া ইতিহাসের কার্য্য। দেখ, ইংলন্ড একটি ক্ষুদ্র দেশ, ইয়রোপের এক প্রান্তে সাগর গর্ভে অবস্থিত, সেই দেশের অধিবাসীরা অর্দ্ধ পৃথিবীর অধিপতি, তাহাদের অতুল ধন, অসীম ক্ষমতা, গভীর জ্ঞান! কি প্রকারে তাহারা এই সকল প্রাপ্ত হইল তাহা জানিতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কুতূহল জন্মে। ইতিহাস এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে। কোন জাতির ইতিহাসের মূল ঘটনাগুলি অসংশ্লিষ্ট নহে—পরস্পর কার্য্য কারণরূপে সম্বন্ধ; সুতরাং ইতিহাস শিক্ষা দিতে যেমন ঘটনাবলীর উল্লেখ করিতে হইবে তেমন তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধও দেখাইতে হইবে।

দেশের প্রকৃতি দ্বারা অধিবাসীদের চরিত্র অনেক পরিমাণে গঠিত হয়; আবার অধিবাসীদের চরিত্রের উপর তাহাদের দেশের ইতিহাস নির্ভর করে। অতএব কোন দেশের ইতিহাস অধ্যাপনা আরম্ভ করিতে সেই দেশের ও তাহার ইতিহাস-সম্বন্ধ অপরাপর দেশের স্থূল স্থূল প্রাকৃতিক অবস্থা এবং অধিবাসীদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি বলিয়া লওয়া আবশ্যক। বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাসই বঙ্গবিদ্যালয়সমূহে অধীত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থাসম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষ অতি বিস্তীর্ণ দেশ, ইহাতে পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় প্রাকৃতিক অবস্থা দৃষ্ট হয়, কোন প্রদেশ অতি উষ্ণ, কোন প্রদেশ অতি শীত, কোন প্রদেশ বা নাতিশীত বা নাতিউষ্ণ; কোন দেশ পর্ব্বতাকীর্ণ, কোন প্রদেশ সমতল, কোন প্রদেশের ভূমি অনুর্ব্বর, বালুকা ও প্রস্তরময়, আর কোন প্রদেশের ভূমি শস্যপ্রসূ কোমল মৃত্তিকা। ভারতবর্ষের কতিপয় প্রদেশ সমুদ্র হইতে বহুদূরবর্ত্তী, আবার ইহার বহুদূরব্যাপী সমুদ্র উপকূলও আছে। এই মহাদেশের অধিবাসীদিগের প্রকৃতি যে দেশের প্রকৃতির অনুরূপ—অতি বিভিন্ন প্রকার হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? অতএব আমরা ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকৃতির নানা জাতির বাস দেখিতে পাই। কতকগুলি লোক বলশালী ও সমরকুশল, কতকগুলি দুর্ব্বল ও শান্তিপ্রিয়; কতকগুলি লোক শ্রমশীল ও কষ্টসহিষ্ণু, কতকগুলি শ্রমবিমুখ ও আরামপ্রিয়। তাহাদের যেমন প্রকৃতি বিভিন্ন, তেমনি ভাষাও বিভিন্ন। তাহাদের মধ্যে হিন্দী, উর্দু, বাঙ্গলা, উড়িয়া, মারাট্টা, গুজরাটী, তামিল, তেলগু, কর্ণাটী প্রভৃতি

নানা ভাষা প্রচলিত। এই সুবিস্তীর্ণ সমগ্র দেশের এবং তদধিবাসী নানা জাতির এক ইতিহাস হইতে পারে না। বর্ত্তমান শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের পৃথক পৃথক ইতিহাস। কখন কখন পাটলীপুত্রে বা দিল্লীতে সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়া বিভিন্ন রাজ্যসমূহের ইতিহাস একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের স্বাতন্ত্র্য কোন কালে একবারে বিধ্বস্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার এই একটি প্রধান স্মরণীয় বিষয়।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই দেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং কতকগুলি লোক কায়িক শ্রম হইতে অবসৃত হইয়া নানা শাস্ত্রালোচনায় ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিরত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পার্শ্ববর্ত্তী আফগানিস্থান ও তাতার অনুর্ব্বর পর্ব্বতাকীর্ণ মরুদেশ ; তাহাদের অধিবাসীরা নিরতিশয় কর্কশপ্রকৃতি, প্রভূত বলশালী ও সমরকুশল জাতি, তাহারা যে ভারতবর্ষের ধন–রত্নে প্রলুব্ধ হইয়া অধিবাসীদিগকে বারংবার আক্রমণ করিবে তাহা একান্ত সম্ভবপর।

আবার ভারতবর্ষের ধন–রত্ন এবং ইহার সুদীর্ঘ সাগরতীর সুদূরস্থিত নানা ইয়ুরোপীয় জাতিকে প্রথমে বাণিজ্যের জন্য আকৃষ্ট করিয়া ছিল ; পরে অধিবাসীদের আত্মকলহে সুযোগ পাইয়া তাহারা নিজ নিজ অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। এবং ইংরেজ ক্রমে সমস্ত দেশ জয় করিয়া এরূপ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে যে ভারত–ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান কোন কালেও সেরূপ হয় নাই।

ইতিহাসের পুস্তক পঠন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই উল্লিখিত কথাগুলি শিক্ষক ছাত্রদিগকে গল্পচ্ছলে ম্যাপের সাহায্যে নানা উদাহরণ দ্বারা বিস্তার করিয়া বলিবেন। শিক্ষক আশা করিবেন না যে, বালকেরা সকল কথা মনে রাখিয়া তদ্বিষয়ে পরীক্ষা দিতে সক্ষম হইবে। তাহারা যদি এই কথাগুলি পরিষ্কার রূপে বুঝিয়া থাকে তাহা হইলেই তাহাদের ভবিষ্যতে ইতিহাস শিক্ষার অনেক সহায়তা হইবে।

সকল দেশের ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বিশেষ ঘটনা এবং শাসন বা ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তনে নবযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ হইতে বিভিন্ন। কোন দেশের ইতিহাসের বিস্তার পাঠ না আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সমগ্র ঐতিহাসিক কালকে প্রধান প্রধান যুগে বিভক্ত করিয়া ছাত্রদিগকে দেখাইতে হইবে। যেমন ইয়ুরোপের ভূগোল শিক্ষা করিতে প্রথমে ফ্র্যান্স জরমেনী প্রভৃতি দেশগুলির নাম ও অবস্থিতি অবগত হইয়া পরে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিবরণ শিক্ষা করিতে হয় সেইরূপ প্রথমে ইতিহাসেরও প্রধান প্রধান যুগের সহিত সাধারণভাবে পরিচিত হইয়া তদন্তে তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষা করিলে সুবিধা হয়।

ভারত ইতিহাসে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ শাসনকাল এই তিন প্রধান যুগ আছে। এই প্রত্যেক যুগকে নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(ক) হিন্দুশাসনকাল —

১। বৈদিককাল ২,০০০ খৃঃ পূঃ হইতে ১৪০০ খৃঃ পূঃ।

২। পৌরাণিক কাল, ১৪০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৫০০ খৃঃ পূঃ।

৩। বৌদ্ধ কাল ৫০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৫০০ খৃঃ অব্দ।

৪। বিপ্লব কাল ৫০০ খৃঃ পূঃ হইতে ১৪০০ খৃঃ অব্দ।

(খ) মুসলমান শাসন কাল —

াক্রমণকাল ৭১২ খৃঃ অঃ হইতে ১১৯৪ খৃঃ অঃ।

পাঠানরাজ্যকাল ১১৯৪ খৃঃ অঃ হইতে ১৫২৬ খৃঃ অঃ।

৩। মোগল অভ্যুদয় কাল ১৫২৬ খৃঃ অঃ হইতে ১৬৫৮ খৃঃ অঃ।

৪। মোগল পতন কাল ১৬৫৮ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৬০খৃঃ অঃ।

(গ) ইংরেজ শাসন কাল —

১। রাজ্যসংস্থাপন কাল ১৭৪৪ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৬৫ খৃঃ অঃ।

২। রাজ্যবিস্তার কাল ১৭৬৫ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৮৫ খৃঃ অঃ।

৩। শাসননীতির সংস্কার কাল ১৭৮৫ খৃঃ অঃ হইতে ১৮৫৭ খৃঃ অঃ।

৪। মহারাণীর শাসনকাল ১৮৫৭ খৃঃ অঃ হইতে বর্ত্তমান সময়।

এই কাল সমূহের প্রধান লক্ষণগুলি নিম্নলিখিতরূপে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতে পারে—বৈদিক কালে আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে আগমন হয়, ঐতিহাসিক ঘটনা অতিবিরল, আর্য্যদিগের ধর্ম্ম ও সমাজনীতি ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়। পৌরাণিক কালে আর্য্যদিগের সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তার, রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা এই কালের অন্তর্গত। উক্ত দুই যুগের কালনির্ণয় অতি দুরূহ ব্যাপার, পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই বিষয়ে নানা বিতণ্ডা চলিতেছে। বৌদ্ধকালে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব, বিস্তার ও বৌদ্ধ সাম্রাজ্য বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব, বিস্তার ও বৌদ্ধ সাম্রাজ্য সংস্থাপন ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়। তাহার পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়, এই কালকে তমসাচ্ছন্ন কাল বলা যাইতে পারে। ভারতের মুসলমান ইতিহাসে আক্রমণ কালে আরব ও আফগান জাতি রাজ্যস্থাপন না করিয়া লুণ্ঠন জন্য বারংবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। দ্বিতীয় কালে পাঠানেরা দিল্লীতে ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে রাজ্য সংস্থাপন করে ; কিন্তু উত্তর ও পশ্চিমে রাজ্য সংস্থাপন করে ; কিন্তু উত্তর ও পশ্চিমে কাশ্মীর ও রাজপুতনা, পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর প্রভৃতি কয়েকটী হিন্দু রাজ্য ও বামনী প্রভৃতি কয়েকটী মুসলমান রাজ্য স্বাধীন ছিল। এইকালে ইহাদের সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস। মোগল অভ্যুদয়কালে স্বাধীন রাজ্যসমূহ দিল্লীর সিংহাসনাধীনে আনয়ন প্রধান আলোচ্য বিষয়।

পতনকালে ঐ সকল রাজ্যের পুনঃ স্বাধীনতা লাভ ও মারহাট্টা জাতির অভ্যুদয়, নাদিরসাহ[৩৬] ও আহমদ আবদালী[৩৭] বিদেশীর রাজগণের ভারত আক্রমণ প্রধান ঘটনা। ইংরেজ ইতিহাসের প্রথম কাল অধিকার লাভের চেষ্টায় অতিবাহিত হয় ; এই কালে দাক্ষিণাত্য ও বাঙ্গালা ইতিহাসের স্থল ছিল। দ্বিতীয় কালে রাজ্য বিস্তার হয়—দাক্ষিণাত্যে মহীশূর রাজ, নিজাম ও মারহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ ; উত্তরে কাশীরাজ্য অযোধ্যা ও রোহিলা জাতির বশীকরণ প্রধান ঘটনাবলী। তৃতীয় কাল কর্ণওয়ালিসের[৩৮] শাসন হইতে আরম্ভ হয়, বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও শাসন প্রণালীর সংস্কার দ্বারা রাজ্যের দৃঢ়ীকরণ এই কালের প্রধান ঘটনা। ড্যালহৌসী[৩৯] কর্ত্তৃক শাসন নীতির পরিবর্ত্তনে বিদ্রোহ সংঘটন ও তজ্জন্য কোম্পানীর শাসনের অবসান ইংরেজ শাসন কালের তৃতীয় ও চতুর্থ যুগের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ঐতিহাসিক কালের যুগ বালকেরা স্ব স্ব খাতায় লিখিয়া লইবে এবং যুগসমূহের প্রধান আলোচ্য বিষয় উপরোক্তরূপ মৌখিক উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। বালকেরা তৎপর একাদিক্রমে যুগসমূহের বিশেষ বিবরণ পুস্তক হইতে শিক্ষা করিবে, প্রথমে প্রত্যেক দিনের পাঠ্য বিবরণ সম্বন্ধে শিক্ষক মৌখিক উপদেশ দিবেন ; ঐ সকল তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইল কিনা প্রশ্ন দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিবেন, তৎপর ছাত্রেরা পুনরালোচনার ন্যায় বাড়ীতে তাহা পুস্তক হইতে পড়িবে।

যুগবিশেষে ব্যক্তিবিশেষের আবিভাব হয়, তাঁহাদের জীবনী সেই সেই যুগের প্রায় সমগ্র ইতিহাস ; অতএব ঐ সকল লোকের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বালকদিগকে পৃথকরূপে উপদেশ দিতে হইবে। দেশ বা জাতি বিশেষের ইতিহাস অপেক্ষা ব্যক্তি বিশেষের ইতিহাসে বালকদিগের মন অধিকতর আকৃষ্ট হয় এবং জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা নীতিশিক্ষারও উৎকৃষ্ট সহায়, সুতরাং মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত সম্বন্ধে শিক্ষকের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। পৌরাণিক কালের রাম ও কৃষ্ণ, বৌদ্ধকালের শাক্যসিংহ[৪০] ও অশোক[৪১] বিপ্লবকালের বিক্রমাদিত্য[৪১] ও শঙ্করাচার্য্য[৪৩], মুসলমানকালের আকবর[৪৪] ও শিবাজী[৪৫], ইংরেজাধিকারকালে ক্লাইব[৪৬], হেষ্টীংস[৪৭], কর্ণওয়ালিস ও নরেন্দ[৪৮] ইত্যাদি মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত স্ব স্ব কালের ইতিহাস স্বরূপ।

এতদ্ব্যতীত মানসিংহ[৪৯], তোডড়লমল্ল[৫০] প্রভৃতি হিন্দুবীর ও রাজপুরুষদিগের এবং নানক[৫১] চৈতন্যদেব[৫২] ও রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের জীবনী সম্বন্ধে শিক্ষক সাময়িক উপদেশ দিবেন।

ইতিহাস বলিতে অনেকে রাজবংশাবলী ও তাহাদের যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ বুঝিয়া থাকেন। বাস্তবিক শিক্ষণীয় ইতিহাস কেবল তাহা নহে। ইতিহাস বংশবিশেষের বিবরণ নহে, জাতিবিশেষের বৃত্তান্ত। তাহাদের উৎপত্তি ও বিকাশ, তাহাদের শাসন নীতি, সমাজ নীতি ও ধর্ম্মনীতি, তাহাদের সাহিত্য শিক্ষা ও বাণিজ্য, এই সকল আলোচনীয় বিষয়, এই সকল বিষয়ের বিবরণ শিক্ষক যতদূর সংগ্রহ করিতে পারেন প্রত্যেক যুগ সম্বন্ধে বলিবেন। ইতিহাস কি সকল অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপনা সম্বন্ধেই এই একটী ধ্রুব সত্য যে, বালকদের শিক্ষিতব্য বিষয় সুচারুরূপে শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষকের তাহা অপেক্ষা বেশী জানা

আবশ্যক। বালকেরা যাহা পুস্তকে পড়িবে শিক্ষকের যদি তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান না থাকে তবে সহায়তার প্রয়োজন কি?

পাঠশালায় বঙ্গদেশের ইতিহাস অধীত হয়। বঙ্গদেশের ইতিহাস ভারত ইতিহাসের অন্তর্গত, তাহা শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল বাঙ্গালার ইতিহাস শিক্ষাদানেও ঐ সকল উপদেশ পালনীয়। নিম্নলিখিতরূপে বাঙ্গালার ইতিহাসের যুগ ভাগ হইতে পারে।

আর্য্য শাসনকাল—

১। বৌদ্ধরাজগণ পূর্ব্বকাল হইতে ৭০০ খৃঃ অঃ। ২। পাল বংশ ৭০০ খৃঃ অঃ হইতে প্রায় ৯৫০ খৃঃ অঃ কিঞ্চিদধিক। ৩। সেন বংশ ৯৫০ খৃঃ অঃ ১২০৩ খৃঃ অঃ।

মুসলমান শাসনকাল—

১। পাঠান রাজত্ব পরতন্ত্র ১২০৩ হইতে ১৩৩৯ খৃঃ অঃ ২। পাঠান রাজত্ব স্বতন্ত্র ১৩৩৯ হইতে ১৫৭৬ খৃঃ অঃ। ৩। মোগল রাজ ১৫৭৬ হইতে ১৭৬৫ খৃঃ অঃ।

ইংরেজ শাসনকাল —

১। রাজ্যস্থাপন ও রাজ্য বিস্তার কাল ১৭৫৭ হইতে ১৭৮৫ খৃঃ অঃ ২। শাসন নীতির সংস্কার কাল ১৭৮৫ হইতে ১৮৫৭ খৃঃ অঃ ৩। মহারাণীর শাসনকাল ১৮৫৭ হইতে বর্ত্তমান সময়।

মুসলমান যুগের তৃতীয় ও চতুর্থ কালে দিল্লীর ইতিহাস যেমন প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইংরেজ শাসনকালে বঙ্গদেশের ইতিহাস সেইরূপ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস।

কৃষি বিদ্যালয়

কৃষি ভারতের সর্ব্বস্ব। ভারতে শিল্প নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; যাহা কিছু ছিল বর্ত্তমান কলকারখানাজাত শিল্পের প্রতিযোগিতায় প্রায় সে সকলের অস্তিত্ব লোপ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের বাণিজ্য কৃষিজাত দ্রব্যে। সুতরাং কৃষিই ভারতের সর্ব্বস্ব। ভারতের বৈষয়িক উন্নতি সর্ব্বথা কৃষির উপরই নির্ভর করিতেছে। এককথায় ভারত কৃষিমাতৃক দেশ বলিলেই হয়। কৃষিই মাতৃবৎ ভারতকে লালন পালন করিতেছে। কৃষির উন্নতির সহিত ভারতের দারিদ্র্যদুঃখ কেবল প্রশমিত হইবে তাহা নয়, বর্ত্তমান ঘন ঘন দুর্ভিক্ষও নিরাকৃত হইবে। কৃষির উন্নতিতে ভারতের ধনবৃদ্ধি ও তদ্দারা দেশের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উন্নত হইবে। এখন এক বৎসর অজন্মা হইলেই অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; কিন্তু ধনবৃদ্ধি হইলে সেরূপ দুরবস্থার আশঙ্কা থাকিবে না। কৃষিধন ভারতের কৃষির উন্নতি সর্ব্বপ্রকারে ভারতের কল্যাণকর ও উন্নতিপ্রদ। গবর্ণমেন্ট কৃষির উন্নতি সাধনার্থ সম্প্রতি একটী কৃষি বিদ্যালয় খুলিতেছেন। শিক্ষার্থীরা যদি কার্যতঃ শিক্ষালাভ করিয়া দেশের কৃষিবৃদ্ধি করিতে পারেন তবেই দেশের পরম লাভ হইবে। কৃষি বিদ্যালয় সংক্রান্ত নিয়মাবলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বর্ত্তমান বর্ষের জুন মাস হইতে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কৃষি শ্রেণী খোলা হইবে। উহাতে দুটী শ্রেণী থাকিবে একটী উচ্চ ও অপরটী নিম্ন শ্রেণী। উচ্চ শ্রেণীতে শিক্ষালাভ করিয়া যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহারা রাজস্ব সংক্রান্ত ও তজ্জাতীয় সরকারী উচ্চপদগুলিতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন, তাঁহারা জমিদারের ম্যানেজার, সাব–ম্যানেজার বা তহশীলদারের পদেও নিযুক্ত হইতে পারিবেন। নিম্ন শ্রেণীতে কানুনগো প্রভৃতি রাজস্ব সংক্রান্ত অধস্তন পদগুলিতে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। উভয় শ্রেণীতেই জুন মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী বৎসরের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত চৌদ্দ মাস পড়িতে হইবে। আবার নভেম্বর হইতে পরবৎসরের জুন মাস পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে গবর্ণমেনট অথবা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডেসের মহালসমূহে শিক্ষানবীস রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিবপুর ক্ষেত্রে এবং সময়ে সময়ে বর্দ্ধমান ও ডুমরাওনের পরীক্ষা–ক্ষেত্রে লইয়া যাইয়া ছাত্রদিগকে ঐরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের যে সমস্ত ছাত্র তৃতীয় বর্ষের অন্তে এফ, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীতে পড়িতে পারিবেন। স্থান খালি থাকিলে গবর্ণমেন্টের মনোনীত বি কোর্সে বি, এ, অথবা তদ্রূপ শিক্ষিত কোন ছাত্রকেও পাওয়া যাইতে পারিবে। উচ্চশ্রেণীতে কৃষিবিষয়, জান্তব ও কৃষি রসায়ন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগৃহের কার্য্য, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, বারিবিজ্ঞান, বুক–কিপিং ও জমিদারী হিসাব শিক্ষা দেওয়া হইবে। কলেজে গবাদি পশু চিকিৎসা বিষয়ে লেক্‌চার শুনিবারও ব্যবস্থা করা হইবে এবং গালা, নীল, চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিষয়েও বিশেষ লেক্‌চার দেওয়া হইবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষানবীস বিভাগে যাহাদের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে সেই সকল ছাত্র নিম্ন শ্রেণীতে পড়িতে পারিবে। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর মঞ্জুর করিলে ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষকগণ ও উক্ত শ্রেণীতে ভর্তি হইতে পারিবেন। কৃষি, জরীপ, কারখানার কার্য্য, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, জমিদারী হিসাব পাঠ্য হইবে।

চৌদ্দ মাস পরে উভয় শ্রেণীরই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে কলেজের অধ্যক্ষের নিকট হইতে ডিপ্লোমা এবং নিম্ন শ্রেণীর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ পারদর্শিতাসূচক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইবেন। ইহার পর আবার উভয় শ্রেণীরই কার্য্যশিক্ষার পরীক্ষা হইবে। তাহাতে উত্তীর্ণ হইলে কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর পূর্ব্বপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা ও প্রশংসাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিবেন। তখন ঐ সমস্ত ছাত্র কার্য্য পাইবার উপযুক্ত হইতে পারিবেন। উল্লিখিত ডিপ্লোমা–প্রাপ্তগণের মধ্যে উপযুক্ত বোধে প্রতি বৎসর এক জনকে সরকারী ডিপুটীগিরি কার্য্যে ও আর এক জনকে সব–ডিপুটীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। এতদ্ব্যতীত ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কেহ ডিপুটী ম্যাজিষ্টরী বা আফিং বিভাগের প্রতিযোগী পরীক্ষায় মনোনীত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলে তাঁহার প্রার্থনা একটুক বিশেষ বিবেচনা করা হইবে। নিম্নশ্রেণীর পরীক্ষার যাঁহারা প্রশংসা পত্র পাইবেন তাঁহারা কানুনগো হইতে পারিবেন তদ্ভিন্ন কোর্ট অব ওয়ার্ডের কার্য্য ও পারদর্শিতানুযায়ী অন্যান্য কার্য্য পাইতে পারিবেন।

আপাততঃ কোন ছাত্রকেই বেতন দিয়া পড়িতে হইবে না। কেবল আহার, বাসস্থান ও তৈলের খরচ দিতে হইবে। কলেজের হোষ্টেলে তাহাদের থাকার বন্দোবস্ত করা হইবে।

শিবপুর কলেজে এখন সিনিয়ার ছাত্রবৃত্তি ১০টি আছে—মাসিক ২০ টাকার একটী, ১৫ টাকার ৩টী ও ১০ টাকার ৬টী। ঐ কলেজের ছাত্রেরা ৪র্থ বর্ষে কৃষি শ্রেণীতে ঐ বৃত্তি ভোগ করিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত মাসিক ৩০ টাকার আর একটী বৃত্তি থাকিবে। ৪র্থ বর্ষের যেসকল ছাত্র কৃষি শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবেন তাহাদের দশ জনকে মাসিক দুই টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। এই শ্রেণীতে ১০ টাকা করিয়া আরও চারিটী বৃত্তি দেওয়া হইবে।

কৃষি শ্রেণী খুলিতে আপাততঃ ৭ হাজার টাকার যন্ত্র ক্রয় করিতে হইবে। লেকচারারদের বেতন, চাকরদের বেতন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদী ব্যয় বৎসরে ১০ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। ১৮৯৭–৯৮ সনের শিক্ষার জন্য যে বাজেট হইয়াছে তাহা হইতেই এই ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার শিবপুর কলেজের অধ্যক্ষের উপর থাকিবে। কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর লেক্চারার মনোনীত কবিবেন। এক্ষণে ডিপুটী কালেক্টরদের মধ্য হইতেই লেক্চারার নিযুক্ত করা হইবে। উক্ত লেক্চারার আপন গ্রেডের বেতন ভিন্ন একশত টাকা ভাতা পাইবেন। ছোট লাট সাহেব বাঙ্গলার কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর মিঃ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যাযকে উক্ত লেক্চাবার পদে নিযুক্ত করিলেন।

অভিভাবকের দায়িত্ব

বালকবালিকাদের শিক্ষাকার্য্যে অভিভাবকের দায়িত্ব গুরুতর। যেমন "রাজাব দোষে রাজ্য নষ্ট" সেই রূপ অভিভাবকের দোষে সন্তান নষ্ট হয়। জ্ঞানবৃদ্ধদের মধ্যে অনেকে মনে করেন শিশুরা আপনার পায় আপনারাই কুঠারাঘাত করে। আবার কেহ কেহ ভাবেন শিক্ষকের হাতেই ছেলের শিরশ্ছেদ হইল। আমি শিশু ও শিক্ষক কাহাকেই দায়িত্ববিহীন বলি না, কিন্তু শিশুর কল্যাণ অকল্যাণ পনর আনা অভিভাবকের উপরেই নির্ভর করে। অনেক অভিভাবক শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া আপন কর্ত্তব্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে পাঠাইবার পুর্ব্বেই যে শিশুর শিক্ষার সোপানমালা রচিত হয়, তাহা প্রায় কোন অভিভাবকই অনুভব করিতে পারেন না। পাঁচ বৎসর কাল শিশু বাড়ীতে থাকিয়া যে সকল কুশিক্ষা লাভ করে বিশ বৎসরেও সে সকল সংশোধন করা দুঃসাধ্য হয়। বিশেষতঃ কতকগুলি বিষয়ে প্রথম বয়সে কু-অভ্যাস জন্মিলে শেষে পরিণত বয়সে এমন কি সমস্ত জীবনেও সে সকলের সংশোধন হয় না।

দেখিয়া শুনিয়া শিশুর অনেক শিক্ষা লাভ হয়। ঘর বাড়ী সুসজ্জিত, দ্রব্যগুলি সুশৃঙ্খলা ক্রমে স্থাপিত, কর্ত্তব্যকার্য্যের যথানির্দ্দিষ্ট সময় থাকিলে ছেলেরা বিনা শিক্ষায়ও অনেক শিক্ষা করিয়া থাকে। আমি বড় লোকের ঘর বাড়ী ও আসবাব আদির কথা বলি না। অতি গরীবের ঘর বাড়ীও তাহার সামান্য কয়েক খানি দ্রব্যের কথা বলিতেছি। সুসজ্জা ও সুশৃঙ্খলা যেমন রাজ প্রসাদে হইতে পারে গরীবের কুটীরেও সেরূপ হইতে পারে। লক্ষ্মী কোন গৃহই উপেক্ষা

করেন না। গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রী যদি আপনার ঘর বাড়ী, দ্রব্য সামগ্রী লক্ষ্মীর আবাসস্থান করিয়া রাখেন শিশুরা তাহা দেখিয়া সহজেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলা শিক্ষা করিতে পারে। শিশুকাল হইতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে তাক না জন্মিলে শেষে বহু সাধনা দ্বারায়ও উহা উপার্জ্জন করা যায় না। পিতামাতা যদি গৃহসামগ্রীগুলি বিশৃঙ্খলভাবে রাখেন, কোন কিছুরই স্থান কাল নির্দ্দিষ্ট না রাখেন তাহা হইলে সহজেই শিশুদের প্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খল ও অনিয়মিত হইয়া পড়ে।

শিক্ষার বীজ বাধ্যতা। শিশু বাধ্য হইলেই সুশিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকদিগকে অতি যত্নে শিশুর হৃদয়ে বাধ্যতা-বীজ বপন ও প্রতিপালন করিতে হয়। অবাধ্য শিশুর শিক্ষার দ্বার অর্গলাবদ্ধ ; অবাধ্য শিশুকে বৃহস্পতি তুল্য আচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিলেও সুফল লাভের আশা নাই।

শাস্ত্রে "জীবতো বাক্য পালনং" বলিয়া সৎপুত্রের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রে "পিতা মাতার অবাধ্য হইও না" বলিয়া উপদেশ আছে। খৃষ্টীয়ধর্ম্মশাস্ত্রে জ্ঞানতরুর ফল আহার করিয়াও কেবলমাত্র অবাধ্যতার জন্যই আদি পিতামাতার পতন হইল। পিতামাতার বাধ্যতা, গুরুর বাধ্যতা, শাস্ত্রের বাধ্যতা, রাজার বাধ্যতা, স্বামীর বাধ্যতা প্রভৃতি আজন্ম আমরণ অনেক রকমের বাধ্যতা ধর্ম্মশাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।

বাধ্যতা শিক্ষার ভিত্তি ও অতি উপাদেয় ভাব। কিন্তু নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে উহাতেও গরল উৎপন্ন হয়। এইজন্য অতি সতর্কভাবে শিশুদিগকে বাধ্য রাখিতে হয়। সহস্রলোচনে সন্তানের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, সহস্রকর্ণে তন্ন তন্ন করিয়া সমুদয় শুনিতে হয় এবং সহস্রবুদ্ধি হইয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। শিশু যাহাতে অবাধ্য না হইতে পারে তজ্জন্য শিশুর ইচ্ছা ও রুচির দিকে অভিভাবকের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কোন বিষয়ে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য ও ভালমন্দ বিবেচনার সময়ে শিশুর ইচ্ছারুচির দিকেও কটাক্ষ রাখা অভিভাবকের গুরুতর কর্ত্তব্য ; নচেৎ শিশু সহজেই অবাধ্য হইয়া উঠে। গোবাঘ যেমন নরশোণিতের স্বাদ পাইলে কেবলই মানুষ খাইতে চায় শিশুও সেইরূপ একবার অবাধ্য হইতে পারিলে সহজে বাধ্য হইতে চায় না। অতএব কোন রূপেই শিশুকে অবাধ্যতার রসাস্বাদন করিতে দেওয়া বিধেয় নয়। পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবক অতি চতুর ও চৌকষ না হইলে শিশুরা সহজেই অবাধ্য হইয়া উঠে।

এইজন্য শিশু যাহা বলিবে তাহাই যে অনুমোদন করিতে হইবে তাহা নয়। সুচতুর অভিভাবক শিশুর জীবনতরির কর্ণটী নিজহাতে ধরিয়া বসিবেন, ক্ষেপণী মাত্র শিশুর হাতে প্রদান করিবেন। শিশু যথেচ্ছাক্রমে দাঁড় টানিলেও জীবনতরণী অবিভাবকের লক্ষ্জিত দিকেই প্রধাবিত হইবে।

শিশু অবাধ্য না হইলেই যে বাধ্য হইল তাহা নয়। নানাপ্রকার কার্য্য করিতে আদেশ প্রদান করিয়া শিশুকে বাধ্যতা শিক্ষা দিতে হয়। গরীবের ঘরে শিশুকে সর্ব্বদা নানাপ্রকার সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় এবং তদুপলক্ষে কার্য্যগত্যা তাহাকে অভিভাবকের বাধ্য থাকিতে হয়। এইরূপে বাধ্যতা দ্বারা গরীবের ঘরের শিশুরা প্রায়ই সুশিক্ষিত হইয়া থাকে।

গরীবের শিশুরা যদিও বিদ্যা শিক্ষা করিতে তেমন সময় পায় না তথাপি বাধ্যতার গুণে অল্প সময়েই অনেক শিক্ষা করিতে পারে। শিশুরা অনেকক্ষণ লেখাপড়ায় নিযুক্ত থাকিতে পারে না, তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে গৃহকার্য্যে নিয়োগ করিলে উহাদের যেমন কার্য্যকুশলতা, উৎসাহ উদ্যম জন্মে সেইরূপ বাধ্যতাও শিক্ষা হয়। অবশ্যই শিশুর রুচি অনুসরণ করিয়া এরূপ গৃহকার্য্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। অভিভাবক যদি বিন্দু বিসর্গেও বুঝিতে পারেন বালক অমুক কাজ করিবে না তবে তিনি কখনও তাহাকে সেই কাজ করিতে আ.দেশ করিবেন না ; করিলে হিতে বিপরীত হইবে, শিশূর বাধ্যতার কুসুমে কীট প্রবেশ করিবে, আজ না হইলেও কাল সে ফুলটীকে কাটিয়া ফেলিবে।

শিশুরা সহজেই অভিভাবকের প্রকৃতি বুঝিতে পারে। সাধ্যাতীত বিষয়ে আদেশ প্রচার করিলে শিশু বুঝিতে পারে অবিভাবক উহা কথার কথা বলিতেছে এবং সহজেই অবাধ্য হইবাব সূত্র লাভ করে। শিশু অভিভাবকেব এই দুর্ব্বল প্রকৃতির ছিদ্রপথে বিচরণ করিতে করিতে শেষে দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়ে। অতএব অভিভাবক সাধ্যাতীত বিষয়ে বা শিশুদ্বারায় প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা করাইতে চান না এরূপ বিষয়ে কোন আদেশ কবিবেন না।

অনেক সময়ে শিশুব ইচ্ছার অনুসরণ করিযা কৃত–আদেশ পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। যেমন অভিভাবক–শিশুকে বলিলেন "দোযাতটী আনত।" শিশু বলিল না আমি "পয়সাটী আনিব।" অভিভাবক তখন বালককে কেবল দোয়াত আনিতে বাধ্য না করিয়া, এইরূপ বলিলেই সমীচীন হয় "তুমি পয়সাটীও আন, দোয়াতটীও আন।" সম্ভবতঃ শিশু আনন্দিত মনে পযসা ও দোয়াত উভয়ই আনিয়া উপস্থিত করিবে।

আবার নিরন্তর শিশুর ইচ্ছা–রুচির অনুসরণ করিতে যাইয়া অনেক অভিভাবক শিশুকে নিতান্ত দুললিত ও শিক্ষার সীমা বহির্ভূত করিয়া রাখেন। এরূপ আবদেরে ছেলেকে লইয়া শিক্ষকের গলদঘর্ম্ম হইতে হয়, অথচ প্রায়ই কোন ফলোদয় হয় না। আমাদের দেশে পিতামহ ও পিতামহী প্রভৃতি বৃদ্ধেরা এইরূপে অনেক শিশুর পরকাল নষ্ট করিয়া "আলালের ঘরের দুলাল" করিয়া তোলেন। শিশুর আবদার রক্ষা করার মত শিশুশিক্ষার প্রতিকূল আর কিছুই নাই।

অনেক অভিভাবক শুষ্ককাষ্ঠের মত নীরস। এরূপ অভিভাবকের নিকট শিশুরা কোন রূপেই তিষ্ঠিতে পারে না। শিশু চরিত্র ফুলের মত সুন্দর, কোমল ও আনন্দময়। শিশু যদি অভিভাবকের নিকট ঘেসিতে না পারে প্রত্যুত অভিভাবককে যমের মত ভয় করে, তবে সে অভিভাবকের অন্তরালে থাকিয়া নানা প্রকার কুসঙ্গীর সঙ্গে মিলিত ও নানাপ্রকার কুকার্য্যে রত হয়। এরূপ অভিভাবকের গৃহ শিশুর পক্ষে অগ্নিক্ষেত্র, সে সেগৃহ হইতে দূর থাকিতে ভালবাসে। অভিভাবকের চরিত্রে এরূপ মধু থাকিবে যে তজ্জন্য ঘর বাড়ী সমুদয়ই শিশুর নিকট মধুবর্ষন করিবে, সে আর অন্যত্র যাইতে চাহিবে না। অভিভাবক আবশ্যকমতে শিশুকে দৃঢ়তর আদেশও করিবেন কিন্তু সেরূপ আদেশ বিশেষ ক্ষমতার সহিত করিবেন, শিশু যেন কোন রূপে তাহার অন্যথাচরণ করিতে না পারে। এরূপ আদেশ কুসঙ্গী পরিবর্জ্জন, কুভ্যাস ত্যাগ, প্রভৃতির জন্যই করিবেন। অভিভাবক মনে রাখিবেন এরূপ আদেশ

ব্রহ্মাস্ত্রনিক্ষেপ, ইহা দেশ কালপাত্র বিবেচনায় করিতে হয় এবং কোন রূপেই যেন ব্যর্থ হইতে না পারে।

শিশুকাল হইতে যথাকালে যথাকর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে হয়, অযথা ও অনিয়মিত আহার পান দ্বারা অনিয়মের প্রশ্রয় দান করা হয়। অনিয়মিত সময়ে শয়ন, স্নান ইত্যাদির দ্বারাও নিয়মিততার ব্যাঘাত ঘটে। সন্ধ্যার পরে শিশুদিগকে ছোট ছোট নীতি কথা, শ্লোক আওড়ান ও সাধুদের চরিত্র উপকথার মত বলিলে শিশুদের চরিত্রের বিকাশ হয়। পূর্ব্বপুরুষদের কৃতিত্ব প্রভৃতি বর্ণন করিলেও ছেলের হৃদয়ে মহত্ত্বের বীজ উপ্ত হয়। এই সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে অভিভাবকদের হস্তে নির্ভর করিতেছে।

কুঅভ্যাস ও কুসঙ্গী দূর করা কঠিন ব্যাপার। অভিভাবক সর্ব্বদা সহস্র চক্ষে পূর্ব্বোক্ত দুই শত্রু হইতে শিশুকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। কুঅভ্যাসের মধ্যে এইগুলি ধরা যাইতে পারে। তামাক, চুরুট প্রভৃতি নেশাপান, বৃথা ভ্রমণ, বিনা কাজে অন্যের নিকটে যাওয়া, পরনিন্দা, বৃথা গল্প, অধিক কথা বলা, অনধিকার চর্চ্চা প্রভৃতি। কুঅভ্যাস হইলে তাহা দূর করা অপেক্ষা কুঅভ্যাস না হইতে দেওয়াই প্রকৃষ্ট ও সহজসাধ্য।

অধ্যয়ন, বর্ষ, দণ্ডপ্রদান

ভুলভ্রান্তি॥

আমরা পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যে যে ভুলভ্রান্তি দেখিব বা জানিতে পারিব অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সাহায্যার্থ তত্তাবৎ প্রকাশ করিব। এই কার্য্য আমরা সমালোচকের ন্যায় করিব না, অধ্যাপনার সাহায্যার্থ করিব। একটী কথা আছে "সয়তানের ভুল নাই," মনুষ্যের ভুল-ভ্রান্তি থাকিবেই। বস্তুতঃ একবারে ভুলভ্রান্তির বর্জ্জিত গ্রন্থ অতি বিরল। কাহারও রচিত কোন গ্রন্থের অযশ ঘোষণা করা বা ব্যক্তিবিশেষের সুনাম লোপের চেষ্টা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রতিদিন ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রত্যেক শিক্ষককেই শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে হয়। দণ্ডের সংখ্যা গণিলে বিচারকের দণ্ড হইতে উহা অধিক হইবে। পড়ার ত্রুটী, অমনোযোগ, অবাধ্যতা, অনৈতিক আচরণ প্রভৃতির জন্য শিক্ষককে প্রতিদিন অনেক ছাত্রকে দণ্ড প্রদান করিতে হয়। এই দণ্ডদান সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে যে যে নিয়ম প্রচলিত আছে, আমরা গত শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট হইতে নিম্নে তাহা প্রদান করিলাম—"শারীরিক দণ্ড কেবল ঘোর দুশ্চরিত্রতার জন্যই প্রযুক্তব্য। উহা কেবল প্রধান শিক্ষকই প্রদান করিবেন। শারীরিক দণ্ড উত্তেজিত অবস্থায় প্রদান না করিয়া উপযুক্ত বিবেচনার পর দেওয়া কর্ত্তব্য। পড়ার অমনোযোগ, অনুপস্থিতি, অশিষ্ট ব্যবহার প্রভৃতির জন্য সাধারণতঃ অতিরিক্ত কার্য্যভার (টাস্ক), অতিরিক্ত সময় স্কুলে রাখা, ও অর্থ দণ্ড করা হয়। কদাচিৎ ঘোর নৈতিক দুরাচারের জন্য ছাত্রের নাম কর্ত্তন করা হয়।...

ইতিহাস

মুসলমানদের বাঙ্গলা বিজয়ের কাল ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ নহে ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

২। বাঙ্গলার সেন রাজবংশে লাক্ষ্মণেয় নামে কোন রাজা ছিলেন না। যে সময়ে বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ অধিকার করেন সে সময় লক্ষ্মণ সেন বাঙ্গলার রাজা ছিলেন।

ভূগোল।

প্রায় সমুদয় বাঙ্গলা ভূগোলে বিষুবরেখার সংজ্ঞা এইরূপ লিখিত আছে "যে বৃত্ত উভয় মেরু হইতে সমদূরে থাকিয়া ভূগোলককে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করে তাহার নাম বিষুববৃত্ত।" কিন্তু উহাকে বিষুববৃত্ত নয় বিষুবরেখা বলা হয় [এর পরের পরিচ্ছেদে যা ছাপা হয়েছে তার সঙ্গে শিরোনামের মিল নেই। খুব সম্ভব তা মুদ্রণ বিভ্রাট]

মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য, ১৮৯৯॥

ক। মধ্য ইংরাজী পরীক্ষা—

১। ১৮৯৯ অব্দের পরীক্ষার জন্য সাহিত্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছে—

(অ) ইংরাজী ভাষা (পূর্ণসংখ্যা ১৫০) প্রশ্নের কাগজ ১ খণ্ড।

The Middle Class Reader, by Babu Krishna Chandra Roy, the whole book.

ইংরেজী ব্যাকরণ—

To be confined to (a) parts of speech, (b) simple rules of Syntax, (c) parsing ; composition to consist of translations from Vernacular to English and *vice-versa.*

(আ) বাঙ্গলাভাষা (পূর্ণসংখা ১৫০)

প্রেসিডেন্সি, ছোটনাগপুর এবং বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যশ্রেণী স্কুলের জন্য।

গদ্য–সীতার বনবাস ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকৃত (সমস্ত পুস্তক)।

পদ্য–কবিতাপাঠ, তৃতীয় ভাগ, মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত (৫১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।)

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়সমূহের এবং পাটনা ও ভাগলপুর বিভাগের যে যে মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষার অধ্যাপনা হয় তাহাদের জন্য।

গদ্য—প্রবন্ধ মঞ্জরী, রজনীকান্ত গুপ্ত কৃত (সমস্ত পুস্তক)।

পদ্য—পলাশীর যুদ্ধ, (স্কুল সংস্করণ) নবীনচন্দ্র সেন কৃত (৭৮ পৃষ্ঠা।)

সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রশ্নে, প্রবন্ধ লিখন ও রচনা বিষয়ক প্রশ্ন থাকিবে।

বাঙ্গলা ব্যাকরণ—বাঙ্গলা ভাষা বিশুদ্ধরূপে লিখিবার জন্য যতদূর জানা আবশ্যক (যথা,—সন্ধি, তদ্ধিৎ, কৃৎ, সমাজ, কারক ও শব্দত্ব) ; রচনা।

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের অধিকাংশেই কোনও পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট হইল না। কিন্তু, বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কেরা ১৮৯৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত পাঠ্য পুস্তকের যে এক সম্পূর্ণ তালিকা* : প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বহির্ভূত কোনও পুস্তকের অধ্যাপনা করাইতে পারিবেন না। সাহায্যপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, যে সকল বিদ্যালয় হইতে ছাত্রেরা এই পরীক্ষা দিবে সেই সকল বিদ্যালয়ে ঐ তালিকার বহির্ভূত কোনও পুস্তকের অধ্যাপনা নিষিদ্ধ।

২। ইতিহাস এবং ভূগোল (পূর্ণসংখ্যা ১৫০) প্রশ্নের কাগজ ২ খণ্ড।

ইতিহাস—(পূর্ণসংখ্যা ৫০) ভারতবর্ষের ইতিহাস ; হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ শাসনকাল বাঙ্গলা দেশের ইতিহাসের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক।

ভূগোল—(পূণসংখ্যা ১০০)

১। পৃথিবীর সাধারণ জ্ঞান ও বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষের বিশেষ জ্ঞান।

২। প্রাকৃতিক ভূগোল—পৃথিবীর আকার ও পরিমাণ ; দিবা এবং রাত্রি ; ঋতু পরিবত্তনের কারণ ; বায়ু ও বায়ুর উষ্ণতা ও শৈত্য ; বায়ু প্রবাহের কারণ ; বাষ্প, শিশির, কুজ্ঝটিকা, মেঘ ও বৃষ্টি ; শিলাবৃষ্টি ও তুযার ; উৎস, সরিৎ ও নদী, তাহাদের উৎপত্তি ও কায্য ; ব দ্বীপের সৃষ্টি।

৩। পাটীগণিত (পূর্ণসংখ্যা ১৫০—ইয়ুরোপীয় পাটীগণিত ১০০+ দেশীয় অর্থাৎ শুভঙ্করী ৫০) ; প্রশ্নেব কাগজ ১ খণ্ড।

সঙ্কলন, ব্যবকলন. গুণন ও ভাগাহার (অমিশ্র ও মিশ্র) ; মুদ্রা দ্রব্যাদির ওজন ও পরিমাণ এবং ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধীয় সচরাচর চলিত অত্যাবশ্যক নিয়মাবলী এবং তত্তৎসম্বন্ধীয় দেশীয় ধারাপাত ; লঘুকরণ ; দ্রব্যাদির মূল্য ও প্রাপ্য বেতনের হিসাব ; সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ ; ত্রৈবাশিক ; সাঙ্কেতিক ; কুসীদ ব্যবহার ; ডিস্কৌন্ট ; বর্গপরিমাণ ; আড়গুণন ; ঐকিক নিয়ম ; কাঠাকালী, বিঘাকালী, বৎসর মাহিনা ও মাসমাহিনা সম্বন্ধীয় শুভঙ্করের নিয়ম, মুখে মুখে সহজ প্রণালীতে অমিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণন ও ভাগহার অঙ্কের সমাধান।

জ্যামিতি (পুর্ণসংখ্যা) ; প্রশ্নের কাগজ ১ খণ্ড।

১। ইউক্লিডের জ্যামিতি—প্রথম অধ্যায়, সহজ সহজ অনুশীলনী সমেত ; পরিমিতির সহজ সহজ প্রশ্ন যাহা জ্যামিতির প্রথম অধ্যায়ের সাহায্যে সমাধান করা যাইতে পারে।

৫। বিজ্ঞান (পূর্ণসংখ্যা ১০০) প্রশ্নের কাগজ ১ খণ্ড।

(অ)। সরল পদার্থবিদ্যা—

১। জড় পদার্থের গুণ।

"শিক্ষাবিভাগের আদেশ ও নিয়মাবলী" (২য় সংস্করণ) ১৫৯-১৭৯ দেখ।

২। শক্তি অর্থাৎ বল ; শক্তির লক্ষণ অর্থাৎ বল কাহাকে বলে ; আণবিক আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণ (ভারকেন্দ্র ; বিবিধ সাম্যভাব বা সাম্যাবস্থা ; তুলাদণ্ড)।

৩। কঠিন, দ্রব ও বায়বীয় পদার্থের গুণ—কঠিন পদার্থের গুণ।

দ্রব পদার্থের গুণ বা ধর্ম্ম—চাপ সঞ্চালকতার সমতা বা চাপের সমভাব ; ঐ সকলের নিয়ম। উর্দ্ধ ও নিম্ন চাপ ; তরল বা দ্রব পদার্থের সাম্যবস্থা ; তরল পদার্থের উপরিভাগ বা পৃষ্ঠ দেশের সমোচ্চতা বা সমতলতা ; তরল পদার্থের উদ্ভাসিতা বা উদ্ভাসিনী শক্তি ; আর্কিমিডিসের নিয়ম ; জলে ভাসমানতা ; আপেক্ষিক গুরুত্ব।

বায়বীয় পদার্থের গুণ বা ধর্ম্ম—

বায়বীয় পদার্থের চাপ ; বায়ুমণ্ডলের চাপ ; বায়ুমান যন্ত্র (টরিসেলির পরীক্ষা) বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র ; জল তোলা কল ; সাইফন বা বক্রনালী।

৪। তাপ এবং তাপেব কার্য্য—

তাপের প্রকৃতি।

প্রাকৃতিক কার্য্য—সাধারণতঃ পদার্থের বিস্তৃতি বা প্রসারণ ; উষ্ণতামান বা সাধারণ তাপমান যন্ত্র (পারদপূর্ণ)।

১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩০৫, সেপ্টেম্বর ১৮৯৮

নানা কথা, ব্রহ্মচারী, নিদ্রা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, বাধ্যতা শিক্ষা, বুঝাইয়া দেওয়া, নিমেষ [প্রবন্ধ]

পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা।

একজন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন "আমি শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগ হইতে প্রশ্ন করিলেও বড় বড় বিদ্বানের উত্তর দান করা দুঃসাধ্য হইবে।" ইহার অর্থ এই যে বই সহজই হউক আর কঠিনই হউক প্রশ্নের কাঠিন্য সর্ব্বথা প্রশ্নকর্ত্তার হাতে, তিনি ইচ্ছা করিলে সহজ পুস্তক হইতেও সুকঠিন প্রশ্ন এবং কঠিন পুস্তক হইতেও সহজ প্রশ্ন করিতে পারেন। পরীক্ষায় সফলতা লাভ প্রশ্নের প্রকৃতির উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে। অধ্যেতৃবর্গ যে যে প্রণালী বা ক্রম অবলম্বনে শিক্ষা দিয়া থাকেন প্রশ্ন সে ক্রম বহির্ভূত হইলে বুধোপম পরীক্ষার্থীও আশানুরূপ ফললাভে সমর্থ হন না। পক্ষান্তরে আলোচিত প্রশ্ন পরীক্ষায় আসিলে নিরাশ আঁধারে পতিতেরাও আশাব প্রসন্ন মুখ দেখিতে পায়। প্রশ্ন কিরূপ প্রকৃতির হইতে পারে তাহার অধিকাংশ প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর জানা থাকা আবশ্যক। সরস্বতীর প্রসাদে সম্পূর্ণরূপে অনালোচিতপূর্ব্ব প্রণালীতে প্রশ্ন করিতে যে কেহ না পারেন তাহা নয়, কিন্তু সেরূপ প্রশ্ন হইলেই মহা নবমীর অভিনয় হয়, দলে দলে পরীক্ষিত বংশের মুণ্ডপাত হয়। বহু বৎসরের প্রশ্ন আলোচনা করিলে প্রশ্ন-প্রকৃতির একটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তা যে চিরানুগত প্রথারই অনুসরণ করিবেন তাহা বলা যায় না। অন্য কোন অঙ্কুশ না থাকিলে তিনি তাহার অন্যথাও করিতে পারেন। এইজন্য যাহাতে পরীক্ষার্থীদের অনেকোচ্ছেদন না হইতে

পায়ে তজ্জন্য প্রত্যেক পরীক্ষারই প্রশ্নের প্রকৃতি কিরূপ থাকিবে তাহার যতদূর সম্ভব বিশদ ব্যবস্থা থাকা বিধেয়। ব্যবস্থাগুলি কেবল অধ্যাপকগণের নয় পরীক্ষার্থীদেরও পরিজ্ঞাত থাকিবে। শিক্ষকেরা সারা বৎসর তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অধ্যাপনা করিবেন এবং ছাত্রেরাও অধ্যয়নকালে সে লক্ষ্য বিস্মৃত হইবে না।

প্রশ্নের প্রকৃতি নির্ব্বাচন করিয়া দিলেই যে প্রশ্ন সুসঙ্গত হইবে তাহাও বলা যায় না। একই প্রকৃতির প্রশ্ন কঠিন ও সহজ দুই-ই হইতে পারে। যত কেন বিধি ব্যবস্থা হউক না প্রশ্নের ভালটী প্রশ্নকর্ত্তার হাত ছাড়াইয়া নেওয়া কাহারো সাধ্যায়ত্ত নয়। এইজন্য পরীক্ষার্থীদের বরাতলিপি অনেকাংশে প্রশ্নকর্ত্তাই লিপিবদ্ধ করেন। প্রশ্নকর্ত্তা ছাত্রদের অবস্থানভিজ্ঞ হইলে সর্ব্বথা সঙ্গত প্রশ্ন হইবে আশা করা যায় না। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ছাত্রেরা সদুত্তর করিতে পারে এরূপ ত্রিচতুর্থ প্রশ্ন থাকিলে, প্রশ্ন সঙ্গত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। চতুর্থাংশ কি পঞ্চমাংশ প্রশ্ন উৎকৃষ্ট ছাত্রদের জ্ঞানগরিমা পরিচয়ার্থ নিয়োজিত হইলেই যথেষ্ট হয়।

প্রশ্নের ভাষার জটিলতা ও সন্দিগ্ধতাও কখন কখন পরীক্ষার্থীদিগকে ঘোর অন্ধকারে নিক্ষেপ করে ; তাহারা জানিয়া উত্তর লিখিতে পারে না, প্রশ্নের উত্তর ইহা না উহা ভাবিতেই আকাশ পাতাল পরিভ্রমণ করে। প্রশ্নের ভাষা সরল ও উদ্দেশ্যের প্রতিপাদক হইলে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় না।

কখন কখন পাঠ্যবহির্ভূত প্রশ্নের উত্তর প্রদানের বৃথা চেষ্টায়ও পরীক্ষার্থীদের মন কম বিরক্ত এবং সময় কম অপব্যায় হয় না। যদিও সে সকল প্রশ্ন পরে বাদ পড়ে তথাপি সেগুলি অন্যান প্রশ্নের উত্তর দানের পক্ষে অনেক অসুবিধা উপস্থিত করে।

পরীক্ষার্থীদের ভাগ্যলিপির বাকী অংশ নম্বরদাতারা লিখিয়া থাকেন। নম্বর-কুণ্ঠ পরীক্ষকগণের হস্তে পরীক্ষার্থীদের নম্বর তিলে তিলে বাষ্পবৎ উড়িয়া যায়, স্বয়ং সহস্রলোচনও তাহ দেখিতে পান না। কোন বিষয়ের বহু পরীক্ষক থাকিলে তাঁহাদেব সকলের নম্বর দানের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ অবশ্যই কতকগুলি সাধারণ নিয়ম হইয়া থাকে। সে নিয়মগুলি যতদূর সম্ভব প্রতি বৎসরে একইরূপ হওয়া বিধেয়। নম্বর কিরূপে দেওয়া হইবে তাহার সাধারণ কতকগুলি নিয়ম থাকিলে এবং সে নিয়মগুলি শিক্ষক ও শিক্ষিত সকলের জানা থাকিলে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় এত অধিক পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য্য হইবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আমাদের অন্যান্য সকল পরীক্ষার আদর্শ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নম্বর দানের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইলে অন্যান্য পরীক্ষায়ও ক্রমে তদনুরূপ নিয়ম অবলম্বিত হইবে আশা করা যায়।

এন্ট্রেন্স স্কুলের অনেক শিক্ষকই জানেন না কোন্ কোন্ বিষয়ে ভাষা অশুদ্ধি ও বর্ণ অশুদ্ধির জন্য নম্বর কাটা হয়, এবং কি হারে নম্বর কাটা হয়, অঙ্কের নিয়ম শুদ্ধ হইলে নম্বর দেওয়া হয় কিনা, ক্ষেত্রতত্ত্বের অংশবিশেষ শুদ্ধ হইলে কিরূপ নম্বর দেওয়া হয়। বস্তুতঃ এই সকল বিষয়ে সাধারণত কোন নিয়ম নাই বলিয়াই তাঁহারা তাহা অবগত নন। এই সকল বিষয় অবগত থাকিলে অধ্যাপনা কার্য্য আরো ফলপ্রদরূপে সমাহিত হইতে পারে।

যেমন প্রশ্ন করা সম্বন্ধে তেমনি নম্বর দান বিষয়েও যতদূর হইতে পারে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকিলে এবং সে নিয়মগুলি সাধারণের পরিজ্ঞাত থাকিলে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পরীক্ষায় অনেকোচ্ছেদন হইবে না, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণের সংখ্যা কমিয়া আসিবে। অভিভাবক, শিক্ষক ও পরীক্ষক সমিতি সকলে সমবেত চেষ্টা করিলে এই বিষয় একটা কড়াকড়ি নিয়ম হইতে পারে।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও চাক্‌মা ভাষা।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের বিবিধশ্রেণীর পার্ব্বত্যজাতির বাসস্থান। পরিমাণফল ৫৪১৯' বর্গ মাইল। অধিবাসী সংখ্যা ১০৭২৮৬। পার্ব্বত্য জাতির সাধারণ নাম জুমিয়া। ইহাদের কৃষির নাম জোম। ইহারা লাঙ্গল গরুর সাহায্য ব্যতীত দা দিয়া জোম করিয়া থাকে। দা,কুড়াল, (কুঠার) ও কাস্তা ইহাদের কৃষিকার্য্যের উপকরণ। জোম করে বলিয়া ইহাদিগকে জুমিয়া বলে। জুমিয়ারা উন্নত গিরি গাত্রে ও অধিত্যকায় আপনাদের জোম (কৃষি) ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া লয়। সমভূমিতে জোম কম হইয়া থাকে। বংশ সমাকীর্ণ ঢালু স্থান জোম কৃষির উপযোগী ক্ষেত্র। জোমে তিল, ভুট্টা, কার্পাস, কুমড়া, শশা প্রভৃতি শাক শব্‌জির বীজ ও ধান এক সঙ্গে সমদূরবর্ত্তী গর্ত্তসমূহে রোপিত হয়। জুমিয়ারা সাধারণতঃ নদী সৈকতে পল্লী নির্ম্মাণ করিয়া শীত ঋতু যাপন করে। বর্ষার সময় বৃদ্ধ বা অক্ষমদিগকে গৃহে রাখিয়া সকলে নিজ নিজ স্ত্রী, পুত্র ও গৃহপালিত পশু পক্ষ্যাদিসহ জোম বা কৃষিক্ষেত্রে বর্ষাযাপন করিয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রীপুত্র সকলেই কষ্টসহিষ্ণু ও শ্রমশীল। স্ত্রীগণ স্বামীদের সহিত সমভাবে জোম ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া থাকে। পুরুষগণ কেবলমাত্র স্বাধীন ভাবে জোম কাটিয়া থাকে অর্থাৎ বৃক্ষাদি কর্ত্তন ও দাহন কার্য্য সম্পাদন করে। অপর সকল বিষয়ে স্ত্রীগণ স্বামীদিগের দক্ষিণ হস্ত। পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে কেবল রিয়াং, কুকি ও লুসাই উন্নত গিরি শৃঙ্গে এবং গিরি গাত্রে পল্লী নির্ম্মাণ করে। পাহাড়ীদিগের বাস ঘর মাচানে বা মঞ্চের উপর নির্ম্মিত ; এবং বনজাত বাঁশ ও গাছের দ্বারা উহা প্রস্তুত।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম তিন ভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগ এক একজন সার্কেল চিফ বা সর্দ্দারের অধীন। ইহারা বংশপরম্পরায় রাজা নামে অভিহিত হন। চক্রাধিপদিগের মধ্যে ২জন মগ ও একজন চাক্‌মা।

সাধারণ শাসন ভার সার্কেল চিফ মহাশয়দিগের হস্তে ন্যস্ত। পাহাড়ীগণ সাধারণতঃ জড়োপাসক। ইহাদের মধ্যে মগ ও চাক্‌মা বৌদ্ধ মতাবলম্বী।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে মগ, চাক্‌মা, ত্রিপুরা, রিয়াং মুরুং, বন জুগী, পাঙ্খু, কুকি ও তংচঙ্গীয়া প্রভৃতি জাতীয় লোকের বসতি। ইহাদের মধ্যে মগ ও চাক্‌মা সামাজিক বিষয়ে উন্নত ও অপেক্ষাকৃত সভ্য ও শিক্ষিত।

চাক্‌মা ও তংচঙ্গীয়ারা একপ্রকার সংস্কৃতমূলক অপকৃষ্ট বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। আমরা আজ কেবল এই দুই সম্প্রদায়ের কথিত ভাষার বিষয়ই আলোচনা করিব।

চাক্‌মাগণ আপনাদিগকে আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া অনুমান করে এবং ইহারা ছোটনাগপুরের অন্তর্গত চাম্পারণ বা চম্পকনগর হইতে আসিয়াছে বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা চাম্পারণ হইতে আসিয়াছে বলিয়া আপনদিগকে চাম্মা বা চাক্‌মা বলে।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে, বিজয়গিরি নামক চাক্‌মারাজকুমার সসৈন্যে পরিবৃত হইয়া অভিযান উপলক্ষে আরাকাণ উপস্থিত হন। এবং তথায় দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজার (তদীয় পিতৃদেবের) মৃত্যু হওযায় তাহার কনিষ্ঠ পুত্র উদয়গিরি তদীয় সিংহাসনারূঢ় হন। যুদ্ধ সমাপনান্তে কুমার বিজয়গিরি স্বীয় রাজধানী প্রত্যাগমন করিবার সময় শুনিতে পাইলেন, তাহার কনিষ্ঠ সহোদর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। তচ্ছ্রবণে তিনি আর স্বদেশে না যাইয়া সখ্যভাবে আরাকাণ রাজের সহিত আরাকাণেই অবস্থান করেন। এই সময় তংচঙ্গীয়াগণ অর্থাৎ আরাকানের পাহাড়ী জাতির অপর এক সম্প্রদায় তাঁহাদের সহিত মিলিত হয়। তংচঙ্গীয়াগণ চাক্‌মাদিগের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া চাক্‌মার অনুকরণে কথাবার্ত্তা কহিতে শিখিলেও চাক্‌মাগণ তাহাদিগকে আপন সমাজভুক্ত করিয়া লয় নাই, এমন কি, বিবাহাদি কার্য্যে কোনরূপে ইহাদেব সহিত সম্বন্ধ হয় নাই। চাকমাবা সাধারণতঃ ইহাদিগকে একটুকু ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইহাদিগকে কথিতভাষা চাক্‌মা ও মগ ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয। ইহারা মগীবাঙ্গলা সুরে চাকমা কথা বা কদয্য বাঙ্গলায় কথা কহিয়া থাকে।

পাহাড়ীদিগের মধ্যে মগ ভিন্ন অপর কোন সম্প্রদায়ের লিখিতভাষা নাই। চাকমাদিগের এক প্রকার লেখা আছে, তাহা মগা অক্ষরে বাঙ্গলা কথায় লিখিত হয়। অর্থাৎ অক্ষরগুলি মগা বা বার্ম্মিজ, আব ভাষা তাহাদের কথিত ভাষা—কদয্য বাঙ্গলা। অভিনিবেশপূর্বক দেখিতে গেলে, আমরা দেখিতে পাই লিখিত বাঙ্গলায় যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হয়, কথিত ভাষায় তাহার প্রয়োগ অতি অল্প--যেমন হৃদয় কৃপা, কলুষ, প্রতীতি, প্রত্যয় ইত্যাদি চাক্‌মারা যে ভাষায় কথা কহে, তাহাব অনেক শব্দ লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয, নমুনাস্বরূপ আমবা নিম্নে ইহার কয়েকটী আদশ দিলাম।

সংস্কৃতের অনুরূপ ইহাদের এক ও বহুবচনে ক্রিয়ার পরিবতর্ত্তন হইয়া থাকে ; অনেক শব্দের বিশেষতঃ বহুবচনান্ত শব্দের ক্রিয়ার থাকে। বাঙ্গলা পদ্যের মুই ইহারা উত্তম পুরুষে ব্যবহার করিয়া থাকে। এ সকল ভিন্ন অন্যান্য অনেক শব্দ বিশুদ্ধ ও সংস্কৃতের অনুরূপ।

আমরা পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি উচ্চারণ বৈষম্যে, অবোধ্য ভাষার সৃষ্টি হয়, আমাদের বিশ্বাস উচ্চারণ দোষেই ইহাদের উচ্চারিত ভাষার এত দুর্গতি হইয়াছে, নিম্নোক্ত উদাহরণে ইহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

চাক্‌মা ভাষা বাঙ্গলা ভাষা।
বিউন—বেগুন
মেদে—মে দেহি বা আমাকে দাও।
ছন্দভাষ—সন্দেহ ভাষা।
পিচ্ছা—পিচ্ছিল।

কুলুকপানি—কুলুষ পানি বা কুলুষিত জল।
ছেতখানা—শেতখানা বা পায়খানা।
ছবা শাল—শব শালা।
উনান ছাল—উনন শালা।
গোছান—গোয়াল।
পাত্যায়—প্রত্যয়।
কৃপা-কৃপা
খোজা—খুঁজিয়া দেখা
মাগা-চাওয়া
কুদু—কুত্র বা কোথায়
কুয়ৎ—কুত্রাৎ বা কোথায় হইতে।
লুংখছ—লঙ্ঘিয়াছে
হিদত—হৃদয়েতে
উড়াণী—উত্তরীয় বা উড়ানি
ধুঁধা—ধুয়া।
পীড়া—বেদনা।
পিযুল—পিযুণ।
এই সকল নিত্য ব্যবহৃত শব্দ।

পরীক্ষার্থীর প্রতি

অন্ততঃ পরীক্ষার এক মাস পূবব হইতে ভাল আহারের ব্যবস্থা করিবে, শরীর সুস্থ রাখিবে, সুনিদ্রা যাইবে।

যাহাতে শরীর কি মনের উত্তেজনা হয় এমন কোন বিষয়ে আপনাকে নিযুক্ত করিবে না। উত্তেজনায় ব্রহ্মচর্য্য বিনষ্ট হয়, মনঃসংযম শিথিল হয়।

পাঠ্যবই ব্যতীত অন্য বই পড়িবে না। থিয়েটার প্রভৃতি দর্শন করিবে না, উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিবে না। তর্ক-বিতর্ক পরিহার করিবে সর্ব্ব প্রযত্নে মন প্রযত ও সংযত রাখিবে।

উৎকট বিষয় চিন্তা করিবে না। কঠিন বলিয়া পূর্ব্বে যাহা শিক্ষা কর নাই তাহা শিখিতে শ্রম করিবে না। সংসার চিন্তা ও অন্য বিষয়ক চিন্তা হইতে বিনিবৃত্ত থাকিয়া অধীত বিষয় পরিচিন্তনেই নিযুক্ত থাকিবে।

সর্ব্ব প্রযত্নে চিত্ত প্রসন্ন রাখিবে। লঘু আমোদ, লঘু ভ্রমণ, মধুর আলাপ প্রভৃতি দ্বারা বিশ্রাম সময় অতিবাহিত করিবে। নিয়মিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত করিবে না। প্রতিদিন সরল মনে প্রার্থনা করিবে।

আহার, বিহার, অধ্যয়ন প্রভৃতি সকল বিষয়েই নিয়মিত হইবে। নিমন্ত্রণ খাওয়া বর্জ্জন করিবে, অতি ভোজন বা অসময়ে ভোজন করিবে না। অতি মাত্রায় অধ্যয়ন করিয়া শরীর অসুস্থ করিবে না।

আগামী দিন কি কি বই কত দূর পড়িবে আজই শয়নের পূর্ব্বে তাহা লিখিয়া রাখিবে ; এবং পরদিন নিবিষ্ট চিত্তে তাহা পরিসমাপ্ত করিবে।

পরীক্ষাগৃহে ; —

সিদ্ধিদাতা ভগবানের নাম লইয়া পরীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিবে।

নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়া কাগজ, দোয়াত, কলম প্রভৃতি আছে কিনা দেখিবে এবং তত্তাবৎ যথা স্থানে রাখিয়া দিবে।

পরীক্ষার বিষয় ভাবিয়া আপনাকে ব্যাকুলিত করিবে না। প্রশ্নপত্র পাইবার অন্ততঃ দশ মিনিট পূর্ব্বে শান্তভাবে আপন স্থানে বসিয়া ভগবানকে স্মরণ মনন করিবে ও হৃদয়ের অশান্তি দূর করিতে যত্ন করিবে।

প্রশ্নপত্র পাইলে ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। অতি শান্তভাবে, অতি সাবধানে প্রশ্নপত্র পাঠ করিবে। তাড়াতাড়ি পাঠ করিয়া যাইবে না। প্রশ্নপত্র পড়িতে প্রথম বার যাহা ভুল করিবে দ্বিতীয় কি তৃতীয় বার পাঠেও তাহা সংশোধিত হইবার আশা অল্প। প্রথম বার "অরবিন্দ" কে অবিন্দম পড়িলে পরেও তাহাই পাঠ করিবে। একবারে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না হইলে দ্বিতীয় বার পাঠ করিবে।

কতটা প্রশ্ন এবং প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিতে কত সময় দিতে পার, প্রথমেই নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। যে সকল প্রশ্নোত্তর তুমি নিশ্চিত অবগত আছ সে গুলির উত্তর অগ্রে প্রদান করিবে। পরিজ্ঞাত উত্তরের মধ্যেও যে প্রশ্নের উত্তর লেখা অতি অল্প সময়ে হইতে পারে সেই প্রশ্নের উত্তরই সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিবে। ক্রমে অধিক সময় সাপেক্ষ উত্তর, উত্তর উত্তর প্রদান করিবে।

অনিশ্চিত নম্বর অপেক্ষা নিশ্চিত নম্বর প্রাপ্তির আশা যেখানে, সে প্রশ্নের উত্তরই অগ্রে প্রদান করিবে। সাহিত্যের ব্যাখ্যা করা অপেক্ষা ব্যাকরণঘটিত প্রশ্নোত্তর ও শব্দার্থ প্রভৃতি লেখার নম্বর নিশ্চিত।

সংক্ষেপে সম্পূর্ণ উত্তর দিবে। অনর্থক অধিক কথা লিখিবে না। যে সকল প্রশ্নের উত্তর স্তম্ভাকারে প্রদত্ত হইতে পারে সে সকলের উত্তর রচনার ন্যায় লিখিয়া দিবে না। যেমন শব্দার্থ, পুং স্ত্রী লিঙ্গ, প্রকৃতি প্রত্যয় ; রাজগণের নাম, রাজত্বকাল ও প্রধান প্রধান ঘটনা প্রভৃতি।

যথাসাধ্য সুন্দর করিয়া লিখিবে। কাগজের উপরে ও বামদিকে অন্ততঃ দু আঙ্গুল স্থান রাখিয়া লিখিতে আরম্ভ করিবে। প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রথম পঙ্‌ক্তিটী যাহাতে সোজা হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ভাল মনে করিলে কাগজে প্রথম পঙ্‌ক্তিটীর স্থান ভাজ করিয়া লইবে।

অক্ষর বড়ও করিবে না, অতি ক্ষুদ্রও করিবে না। মধ্যে মধ্যে যাহাতে অধিক কালি না পড়ে তজ্জন্য সতর্ক থাকিবে। কালি পড়িলে আঙ্গুল বা হাত দিয়া পুছিয়া ফেলিবে না, ব্লটিং বা নেকড়া দিয়া শুষিয়া উঠাইবে।

লিখিবার সময় অনেকের হাতে ও আঙ্গুলে কালি লাগে। একখান নেকড়া সঙ্গে রাখিবে, ওরূপ কালি লাগিলে তাহা সময়ে সময়ে মুছিয়া ফেলিবে।

পরীক্ষক যাহাতে সুখী হয়, সর্ব্বথা সে চেষ্টা করিবে। পরীক্ষক বিরক্ত হইলে তোমার স্বার্থ হানি হইবে মনে রাখিবে।

কোন প্রশ্ন দ্ব্যর্থ বুঝিলে তুমি উহার দুই রকম অর্থ করিয়া যে উত্তর ভাল জান তাহাই প্রদান করিবে। জানা থাকিলে উভয় রকম উত্তরই দিবে।

কোন প্রশ্নের অর্থ না বুঝিলে, তুমি যে জন্য উহা বুঝিতেছ না লিখিয়া দিবে। ভুল বুঝিলে, প্রশ্ন শুদ্ধ করিয়া তাহার উত্তর দান করিবে। কোন প্রশ্নে কোন অর্থ প্রতিপন্ন না হইলে তাহাও লিখিয়া দিবে। পাঠ্য বহির্ভূত প্রশ্ন হইলে সে বিষয় তোমার পাঠ্য নয় বলিয়া লিখিয়া দিবে। এবং যতদূব পার উত্তর লিখিবে ; না জানিলে কিছুই লিখিবে না।

প্রশ্ন অধিক হইলে এবং সময়ের অভাব হইবে অনুভূত হইলে অতি সংক্ষেপে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিবে। কখন কখন এক প্রশ্নের উত্তর বিস্তৃতরূপে না দিয়া সেই সময়ে সংক্ষেপে দু তিন প্রশ্নের উত্তর দিলে অধিক নম্বর পাওয়া যায়।

যে সকল প্রশ্নের উত্তর কঠিন বা চিন্তা করিয়া দিতে হইবে সে সকল প্রশ্নের উত্তর সকলের শেষে দিবে। প্রথমেই সেগুলি লইয়া টানাটানি করিয়া মনের শান্তি নষ্ট করিবে না। অধিক নম্বর হইলেই সেগুলি প্রথমে ধরিবে না।

উত্তর মনে হয হয় অথচ হইতেছে না এরূপ উত্তর চিন্তনেও মনকে উচ্ছৃঙ্খল করিবে না, উহা পরের জন্য রাখিয়া দিবে। হয়তো ইহার মধ্যে হঠাৎ উহা মনে পড়িবে। যদি সেই প্রশ্নেব উত্তরই শেষ উত্তর হয় অথবা লিখিতে লিখিতে কোন কথা মনে না পড়ে, তবে বরং কিছু কালের জন্য সে চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিবে।

সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিতেই যত্ন করিবে। কোন প্রশ্নের উত্তর আংশিক লিখিয়া থাকিলেও তাহা উত্তর স্বরূপ প্রদান করিতে সঙ্কোচিত হইবে না।

উত্তরের কোন স্থান কাটিয়া ফেলিতে হইলে তদুপরি একটী রেখা টানিয়া রাখিবে। কালি দিয়া উহার বিলোপ চেষ্টা করিবে না।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাহাতে পরিজ্ঞাত সকল প্রশ্নের উত্তর হইতে পারে প্রথম হইতেই তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। পরে যেন তোমাকে "আহা ! সময় পাইলাম না" বলিয়া মনস্তাপ ও বৃথা আক্ষেপ করিতে না হয়। অধিক প্রশ্ন হইলে যতদূর পার তোমার উত্তর সংক্ষেপে লিখিতে যত্ন করিবে। আবশ্যক হইলে নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্নও ব্যবহার করিবে।

পরীক্ষা গৃহের যে সকল নিয়ম আছে সে সব প্রতিপালন করিবে। কোনরূপে তাহার বিন্দু পরিমাণেও অন্যথা করিতে চেষ্টা বা ইচ্ছা করিলে মনের শান্তি নষ্ট হইবে, ভাল উত্তর দিতে পারিবে না।

সময় থাকিলে প্রশ্নোত্তরগুলি অতি মনোযোগের সহিত পুনরাবৃত্তি করিয়া দেখিবে।

যদি কোন শব্দের বর্ণবিন্যাস বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে প্রতিশব্দ দিয়া বা বিষয়টী অন্যরূপে লিখিবে, তথাপি সন্দিগ্ধ শব্দ লিখিবে না।

সময়ে সময়ে মন চঞ্চল বা ব্যস্ত হইলে ভগবানেব নাম লইয়া সে ভাব দূর করিতে যত্ন করিবে। প্রশ্নোত্তর লেখা হইলে কৃতজ্ঞ হৃদযে ভগবানকে স্মরণ করিবে। কাগজ প্রদানের ৫ মিনিট পূর্ব্বেই সর্ব্বতোভাবে কাগজ প্রদানে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।

পরীক্ষাগৃহ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সে বিযযের চিন্তা পাবিত্যাগ কবিবে। বাহিবে যাইযা কে কি লিখিল, তোমাব উত্তব শুদ্ধ হইল কিনা তজ্জন্য আলোচনা বা ব্যস্ততা প্রকাশ কবিবে না।

ভুল-ভ্রান্তি

অর্থান্তবন্যাস অলঙ্কাব বাঙ্গলাব অলঙ্কাব সংস্কৃত অলঙ্কাবেবই উপনিবেশ। সংস্কৃতে দণ্ডিকৃত কাব্যাদর্শ, মম্মট ভট কৃত কাব্যপ্রকাশ এবং বিশ্বনাথ কবিবাজ কৃত সাহিত্যদর্পণ বিশেষ আদৃত। তন্মধ্যে সাহিত্যদর্পণ আধুনিক হইলেও নকল নয, প্রত্যুত অনেক বিষযে উৎকৃষ্ট ও নূতন। দণ্ডী অর্থান্তব ন্যাসেব লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ কবিযাছেন—

জ্ঞেযঃ সোহর্থান্তব ন্যাসো বস্তু প্রস্তুতং কিঞ্চন। তৎসাধন সমর্থস্য ন্যাসো যোহন্যস্য বস্তুনঃ॥

অর্থ—প্রস্তুত বস্তুব বর্ণন কবিতে তৎসাধন সমর্থ অন্য কোন বস্তুব স্থাপনকে অর্থান্তরন্যাস বলে।

এই লক্ষণ অনুসারে কাব্য প্রকাশ ও সাহিত্যদর্পণোক্ত দৃষ্টান্ত অলঙ্কাব ও অর্থান্তরন্যাসের অন্তর্নিবিষ্ট হয। এই জন্য দণ্ডী দৃষ্টান্তেব স্বতন্ত্র লক্ষণ নির্দ্দেশ কবেন নাই। দণ্ডী দৃষ্টান্ত ও অর্থান্তরন্যাস উভযকেই অর্থান্তবন্যাস নামে নির্দ্দেশ করিযাছেন। দণ্ডীব অর্থান্তর ন্যাসেব বিভাগগুলিও সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু দণ্ডীব টীকাকাব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রত্যেক উদাহবণেই সামান্য বিশেষ ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতে অযথা যত্ন করিয়াছেন। মম্মট ভট যে লক্ষণ নির্দ্দেশ কবিয়াছেন তাহার অর্থ "সামান্য দ্বাবা বিশেষ ও বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থনকে অর্থান্তবন্যাস বলে।" বিশ্বনাথ কবিরাজ ইহার সঙ্গে "কার্য্যদ্বাবা কারণের এবং কারণ দ্বাবা কার্য্যের সমর্থন" যোগ কবিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশেব টীকাকাব মহেশ্বর ন্যাযালঙ্কার সামান্য বিশেষেব কোন ব্যাখ্যা বা অর্থ করেন নাই। বিশ্বনাথ কবিরাজও কেবল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াই পর্য্যাপ্ত মনে করিয়াছেন।

বাঙ্গালাতে অনেকগুলি ব্যাকরণে অলঙ্কার পরিচ্ছেদ নিবদ্ধ হইয়াছে। কেহ বা দণ্ডীর কেহ বা মম্মট ভটের লক্ষণের অনুবাদ কবিয়া দিয়াছেন। কাব্য নির্ণয়কার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি পূর্ব্ব সংস্করণের কাব্যপ্রকাশের এবং নূতন সংস্করণে সাহিত্যদর্পণের লক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি "সামান্য=সাধারণ" লিখিয়াছেন। কিন্তু উহাতে সামান্য শব্দের যে বিশেষ কোন অর্থ প্রকাশ হইয়াছে বোধ হয় না।

আমি মনে করি ভাষা পরিচ্ছেদকার সপ্ত পদার্থের মধ্যে "সামান্য, বিশেষ" বলিয়া যে দুইটি পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত সামান্য বিশেষও তাহাই। কেবল ভাষা পরিচ্ছেদেই যে উহাদের উল্লেখ আছে তাহা নয়, বৈশেষিক দর্শনে ও সপ্তপদার্থের মধ্যে সামান্য বিশেষ গৃহীত হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দাবলির ব্যাখ্যা ভাষা পরিচ্ছেদে লিখিত। ভাষা পরিচ্ছেদের টীকাকার সামান্য অর্থ "অনেক সমবেতত্ব" লিখিয়াছেন। অনেক সমবেতত্বের অর্থ জাতি বলা যাইতে পারে। ইংরেজী লজিকের জিনাস্ (Genus), স্পেসিজ্ (Species) ও ইন্ডিভিজুয়েল (Individual) শব্দে সামান্য বিশেযের সম্বন্ধ আছে। জিনাস্ সামান্য হইলে স্পেসিজ্ সামান্য হইলে ইণ্ডিভিজুয়েল বিশেষ হইয়া থাকে। মম্মট ভট ও বিশ্বনাথ কবিরাজের উল্লিখিত অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের উদাহরণগুলি একে একে পরীক্ষা করিলেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

সামান্য অর্থ জাতি বা অনেকের সমষ্টি, বিশেষ অর্থ সেই জাতিরই এক অংশ। সামান্য বিশেযকে অন্য কথায় সমষ্টি ব্যষ্টিও বলা যাইতে পারে। সামান্য ব্যাপক, বিশেষ ব্যাপ্য। যেমন পশুর মধ্যে গো, পশু সামান্য গো বিশেষ ; সতীর মধ্যে সীতা, সতী সামান্য সীতা বিশেষ ; বেদনার মধ্যে সর্পদংশনবেদনা, বেদসামান্য সর্পদংশনজনিত বেদনা বিশেষ। সামান্য বিশেষ এইরূপ একটী অপরটীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। যেখানে সেরূপ হয না সেখানে কাব্যপ্রকাশ বা সাহিত্যদর্পণের মতে অর্থান্তরন্যাস হয় না, দৃষ্টান্ত হয়।

ব্যাকরণ মঞ্জুষায় কাব্যাদর্শনের লক্ষণ লিখিয়া দৃষ্টান্তকে স্বতন্ত্র অলঙ্কার বলা সঙ্গত হয় নাই।

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩০৫, অক্টোবর ১৮৯৮

নানাকথা, ব্রহ্মচারী, অভ্যাস, ব্যাখ্যা করা, সমাজের দ্বিমূর্ত্তি, প্রশ্ন প্রযোগের ধারা, চাকমা ভাষার উৎপত্তি,

সংবাদপত্র॥

সংবাদপত্র উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবের চূড়া। সভ্য জগতের অগ্রণী ইংরেজ জাতির মধ্যে উহার প্রবল প্রতাপ। রাজা ও পার্লিয়ামেন্টের পরেই ইংরেজী সংবাদপত্রের শক্তি। রাজা, জমিদার, বিশপ ও সাধারণের প্রতিনিধি হাউস অব কমন্সের পরবর্ত্তী শক্তি বলিয়া "পঞ্চম শক্তি" নাম হইয়াছে।

ইতিহাসের তিমির গর্ভের সংবাদপত্রের প্রথম জন্ম হইয়াছে। প্রথমে গিরি–নদীর ন্যায় ক্ষীণতোয় অতি ক্ষুদ্র একটী স্রোতঃ ছিল ; এখন বিপুলকায় ও মহাবেগবান্ হইয়াছে, আরো হইবে। পৃথিবীতে এখন এমন দেশ নাই, যে দেশে লেখাপড়ার চর্চ্চা আছে অথচ কোন সংবাদ কাগজ নাই। সংবাদপত্র দেশের উন্নতি ও বিদ্যাচর্চ্চার পরিচায়ক এবং উহাদেরই পরিপোষক। তার ও রেলের ন্যায় সংবাদপত্রও সভ্য জগতকে আচ্ছাদিত করিতেছে।

লেখাপড়ার চর্চ্চা বৃদ্ধির সহিত লোকের জানিবার ইচ্ছাও বৃদ্ধি হইতেছে। পৃথিবীতে কত কিছু জানিবার আছে, কত ঘটনা নিত্য নূতন ঘটিতেছে সে সকলের তত্ত্ব অবগত হইবার

ইচ্ছা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। লোকে যত জানিতেছে, জানিবার ইচ্ছা ততোধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ইচ্ছাতেই সংবাদপত্রের জন্ম, স্থিতি ও প্রচার। লোকের জ্ঞান-তৃষ্ণা বাড়িতেছে—সংবাদ কাগজের প্রচার বাড়িতেছে।

সংবাদপত্র জাতীয় জীবন গঠনের প্রধান সহায়। বর্ত্তমান সভ্য জগতের উন্নতির সহিত প্রতিযোগিতা রক্ষা করিতে সংবাদপত্রই একমাত্র সাধন। যেমন সাগরের কোন এক স্থানের জল উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিলে সমগ্র সাগর তলে উহা ছড়াইয়া পড়ে সেইরূপ পৃথিবীর কোন এক স্থানের উন্নতিও সংবাদ কাগজের প্রভাবে পৃথিবীময় হইয়া পড়ে। সংবাদ কাগজের প্রভাবে জাতীয় জীবনের যেখানে যে রোগ আছে জানিবার উপায় হয় ; এবং প্রতিকারক ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ রাজনৈতিক পত্রিকাকে লোকে সংবাদ কাগজ বলিয়া থাকে। আমরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতি, ধর্ম্ম, দর্শন, গণিত, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সম্পাদিত পত্রিকাও সংবাদ পত্রের মধ্যে গণনা করিলাম। এই গণনায় দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রগুলি যেমন, পাক্ষিক, মাসিক পত্রগুলিও তেমনি সংবাদপত্র।

সংবাদপত্র এখন দেশের মুখস্বরূপ—উন্নতি-অবনতির, সুখদুঃখের,মঙ্গলামঙ্গলের, ন্যায় অন্যায়ের তূর্য্য নিস্বন। বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিষয়ই এখন পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সংবাদ পত্রিকার প্রচার গণনা করিয়া দেশীয় সভ্যতার ও ভাষার উন্নতির পরিমাণ করা হয়। এই জন্য আমরা পৃথিবীর সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিলাম।

কোন্ সময়ে পৃথিবীতে সংবাদপত্রের প্রথম সৃষ্টি হয় তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করা সহজ নয়। রোমের রাজকীয় সৈন্যদল দেশ শাসনে বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইলে, দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ অবগতির নিমিত্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণ স্বীয় স্বীয় সৈনিকদিগের মধ্যে তাহা প্রচার করিয়া দিতেন। ঐতিহাসিকগণ ইহাকেই সংবাদপত্রের পূর্ব্বসূচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারই অনুকরণে খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্ম্মেণীতে চিঠির আকারে খবরের কাগজ প্রচারিত হইতে থাকে। অতঃপর ১৫৬৬ খৃঃ অঃ ভিনিস গবর্ণমেন্টের অনুজ্ঞায় বর্ত্তমান প্রণালী অনুযায়ী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই সকল পত্রিকা প্রথমতঃ হস্তে লিখিত হইয়া প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হইত এবং যে কেহ "গেজেট" নামক একটী মুদ্রা প্রদান করিলেই উহা পড়িতে পারিত। এই মুদ্রার নামানুসারে সংবাদপত্রগুলিও 'গেজেট" নামে অভিহিত হইত। শীঘ্রই এই সকল পত্রিকার বহুল প্রচারের আবশ্যকতা অনুভূত হইল এবং মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল ; এবং ধীরে ধীরে ইউরোপ খণ্ড পত্রিকায় ছাইয়া পড়িল।

জার্ম্মেণী আধুনিক সংবাদপত্রের জননী বলিয়া সমধিক আদরণীয় হইলেও প্রাচ্য ভূমিই ইহার আদি জন্ম স্থান। প্রথিত-যশ, চীন সাম্রাজ্য অতি প্রাচীন, বল ও ক্ষমতায়, জ্ঞান ও সভ্যতায়, শিল্প ও বিজ্ঞানে অতি গৌরবান্বিত ছিল। চীনই সংবাদপত্রের আদি জন্মভূমি। সহস্রবর্ষদেশীয় চীনের "সিন্‌পান"ই প্রাচীনতম সংবাদপত্র বলিয়া সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু অধুনা জানা গিয়াছে পিকিন শহরের "সিংপাও" পত্র ৭১০ খৃঃ অব্দ হইতে এপর্যন্ত নিয়মিতরূপে সম্পাদিত হইতেছে। সুতরাং এখন এই পত্রের বয়স প্রায় ১৩ শত বৎসর ; আটশত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে সংবাদপত্রের অস্তিত্ব ছিল না।

১৬২২ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে (The Weekly News) ফ্রান্সে ১৬৩১ অব্দে "গেজেট," আমেরিকা ১৬৯০ সনে "Public occurrences" এবং ভারতবর্ষে ১৮১৬ খৃঃ অব্দে "বেঙ্গল গেজেট" নামে প্রথম সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষে ইহার পূর্ব্বেও যে সংবাদপত্র ছিল না এমন নহে। ইতিহাসে মুসলমান রাজত্ব কালেও সংবাদপত্রের কথা পাওয়া যায়, তবে সেগুলি হস্তলিখিত ছিল বলিয়া তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই।

১৮৯১ সনে সমগ্র পৃথিবীর সংবাদপত্রের সংখ্যা ৪১ হাজার ছিল। এখন অবশ্যই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। এই ৪১ হাজারের কেবল ইউরোপেই ২৪ হাজার। ইউরোপের মধ্যে জার্ম্মেণীতে ৫৫ শত, ফ্রান্সে ৪১ শত, বৃটন সাম্রাজ্যে ৪০ শত, অষ্ট্রিয়ায় ৩৫ শত, ইটালীতে ১৪ শত, স্পেনে ৮ শত পঞ্চাশ, বেলজিয়ম ও হলন্ডে ৩ শত প্রকাশিত হইত। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের পত্রসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং উহাদের সংখ্যা ১২৫ শত। আমেরিকার কানাডায় ৭ শত এবং অষ্ট্রেলিয়ায়ও ৭ শত। এশিয়ার মধ্যে জাপানে ২শত, ভারতবর্ষে ৪৯০। সমগ্র আফ্রিকাতে মাত্র ২ শত সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়। সেন্ডুইচ্‌ আট্‌লানিটক মহাসাগরস্থ্ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ সেখানেও ঐ সনে তিন খান সংবাদপত্র বাহির হইত। একমাত্র লন্ডন নগরেই ১৮৯০ সনে ৬৪৬ খান পত্রিকা ছিল।

ভাষার হিসাবে ইংরেজীতে ১৭ হাজার, জার্ম্মেণীতে ৭৫০০, ফরাসীতে ৬৮০০, স্পেন ভাষায় ১৮ শত এবং ইটালীতে ১৫ শত মুদ্রিত হয়। ভারতবর্ষে বড় বড় পত্রগুলি ইংরেজীতেই প্রকাশিত হয় ; তদ্ভিন্ন বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু, মহারাট্রা ও তামিল প্রভৃতি ভাষায়ও পত্রিকা আছে। চীন, জাপানেও ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

পত্রিকাগুলি নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি দৈনিক কতকগুলি সপ্তাহে তিন বার ও কতকগুলি দুই বার প্রকাশিত হয়। অন্যগুলি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক।

ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিরই প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইংরেজী কোন কোন পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ৫ লক্ষেরও অধিক। বিলাতের অনেক পত্রিকার গ্রাহক দুই লক্ষের উপরে। পৃথিবীর মধ্যে লন্ডনের Times পত্রের ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সমগ্র ব্রিটিশ রাজ্যের উপরে ইহার প্রবল প্রতাপ। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের (Herald, Tribune, World, Times, ও Sun পত্রিকা বিশেষ বিখ্যাত। ফরাসী দেশে Figaro ও (Temps) পত্রিকারই অধিক প্রভাব, প্রথম খানির গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ। Le Petit Journal নামক ফরাসী পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ৯ লক্ষ ৫০ হাজার। পৃথিবীতে এত্‌ অধিক গ্রাহক আর কোন পত্রিকার নাই।

জর্ম্মেণীর সংবাদপত্রগুলি প্রায় চতুর্থাংশই সরকারী, লোকে উপহাস করিয়া সে পত্রগুলিকে "Bismarck's reptile press" অর্থাৎ বিস্‌মার্কের সর্প বা সৃপপত্রিকা বলিয়া থাকে। জর্ম্মেণীর Cologne Gazette ই সমধিক ক্ষমতাপন্ন পত্র। ডেনমার্কের সরকারী পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা দশ হাজার। কোপেনহেগেনে দশ খান দৈনিক পত্র আছে। কোপেনহেগেনের লোক সংখ্যা ২ লক্ষ ৪০ হাজার। সুইডেনে Stockholm Dagblad পত্রের

গ্রাহক সংখ্যা ২৩ হাজার। নরওয়ে Den Morgenblad প্রধান। স্পেনে Imparcial পত্রের ৭০ হাজার গ্রাহক।

পোপেরা সংবাদ পত্রের বিরোধী ছিলেন বলিয়া ইটালীতে সংবাদপত্রের তেমন প্রসার হইতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সে সঙ্কীর্ণতা অক্ষুণ্ন ছিল। ইটালীতে এখন ৫০ খান দৈনিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে। মিলান নগরের Secolo পত্রের গ্রাহক সংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার।

রুসিয়াতে পিটার দি গ্রেট সংবাদপত্রের জন্মদাতা। জারের রাজ্যে কার্য্যতঃ রাজ্য শাসন বিষয়ক কোন কথার সমালোচনা কবিবার অধিকাব নাই। রুসিয়ার অর্দ্ধ সরকারী পত্র, Journal de-St Petersburg ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয় বলিয়া ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত। তদ্ভিন্ন Novoe Vremya (নব সময়). Novossti (নব সংবাদ) নামে দুই খানি প্রধান পত্র আছে ; প্রথম খানি প্রাচীন দলেব ও শেষোক্ত খানি নূতন দলের।

তুরস্কে ফরাসীরা পত্রিকার ব্যবসা খোলে। প্রচলিত শাসনকার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলিবার ক্ষমতা নাই। তুরস্কের সংবাদপত্রে এইজন্য কোন প্রবন্ধ থাকে না। কনষ্টান্টিনোপলে প্রতিদিন ইংরেজী, ফরাসী, তুরস্ক ভাষায় ১৪ সিট কাগজ মুদ্রিত হইয়া থাকে। তুরস্কের প্রধান পত্রের নাম Djendei Havadis.

কলিকাতা, এলাহাবাদ, বোম্বে ও মান্দ্রাজ নগরে ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র আছে। কলিকাতার Englishmen ও এলাহাবাদের, Pioneer বিশেষ ক্ষমতাশালী বলিয়া সাধারণে গণিত। বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক নগরেই সংবাদপত্র আছে।

বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষা

১৮৯৭-৯৮ সালেব বাঙ্গালাব সাধারণ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যবিবরণী বিষয়ক রিপোর্ট সম্বন্ধে বাঙ্গালা গবণমেন্টের প্রকাশিত মন্তব্যের কয়েকটী প্রধান প্রধান কথার মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইল—

উক্ত বৎসর সমগ্র প্রদেশের স্কুল সংখ্যা ৮৪ হাজার ৫১৩ ; তন্মধ্যে সরকারী স্কুল ৫৩ হাজার ১০০, অবশিষ্ট বেসরকারী। সরকারী স্কুলগুলির মধ্যে কলেজ ৩৮টি, উচ্চ শ্রেণীর স্কুল ৪০০, মধ্য ইংরাজী স্কুল ৯৪৮, মধ্য বাঙ্গালা স্কুল ১১২৯, উচ্চ প্রাথমিক ৪১১৩, নিম্ন প্রাথমিক ৩৩ হাজার ৪৮২, বিশেষ স্কুল (মাদ্রাসা ও ব্যবসায় শিক্ষার স্কুলগুলির ইহার অর্ন্তভুক্ত) ১২৯ ও বালিকা স্কুল ২৮৬১।

বেসরকারী স্কুলগুলির মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর আরবী ও পারসী শিক্ষার স্কুল ১ হাজার ২০১, সংস্কৃত শিক্ষার স্কুল ১ হাজার ৬৪১ : প্রাথমিক মাতৃভাষা অথবা প্রধানতঃ মাতৃভাষা শিক্ষার স্কুল সংখ্যা—(১) যেখানে ১০টি অধিক ছাত্র ২০৫, (২) যেখানে ছাত্র সংখ্যা দশের ন্যুন—৩ হাজার ৪৫২। প্রাথমিক কোরাণ শিক্ষার স্কুল ; [অস্পষ্ট] হাজার ৩৪৮ ; অন্যান্য স্কুল সে সকলের পাঠ্য শিক্ষা বিভাগীয় পাঠ্যের অনুগত নয়, ১৬৬।

পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় এবৎসরে স্কুল শতকরা ৪,৯১টি কমিয়াছে। এ বৎসরের ছাত্র সংখ্যা কিঞ্চিন্ন্যুন ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার—পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় প্রায় ৫০ হাজার কম। কলেজের সংখ্যা বাড়ে নাই ; উচ্চ শ্রেণীর ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা কিছু কিছু বাড়িয়াছে। অপরাপর বিশেষতঃ নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা কমিয়াছে। ছোট লাট বাহাদুর ইহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণতঃ অন্নকষ্টকেই স্কুল ও ছাত্র সংখ্যা কমিবার কারণ নির্দ্দেশ করায় ছোটলাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে অন্নকষ্ট উহার পক্ষে এক-টি প্রধান কারণ হইতে পারে সত্য, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর কোনও কারণ আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও ছোটনাগপুরের করদ মহলগুলি ছাড়িয়া ধরিলে (ঐ সকল স্থানের স্কুলগুলিও হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই) সমগ্র বাঙ্গলা প্রদেশের লোক সংখ্যা ৭ কোটী ৩০ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬৯৭—ইহার মধ্যে পুরুষ ৩ কোটী ৬৪ লক্ষ ১২ হাজার ৭৪৯, অবশিষ্ট স্ত্রী। শতকরা ১৫ জনের হিসাবে ৫৪ লক্ষ ৬১ হাজার ৯১২ জন বালক এবং ৫৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৬৪২ জন বালিকা স্কুলে পড়িবার উপযুক্ত। এই সংখ্যার মধ্যে ১৫ লক্ষ ২০ হাজার বালক ও ১ লক্ষ ৪ হাজার ৮১৫ জন বালিকা অর্থাৎ শত করা ২৭.৮ জন বালক ও ১.৯ জন বালিকা উক্ত বৎসর স্কুলে পড়িয়াছে।

সরকারী স্কুলেব মধ্যে ১৭১টি স্কুল গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক এবং ১৯৫টি স্কুল ডিষ্ট্রিক্ট অথবা মিউনিসিপাল বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত। গবর্ণমেন্ট অথবা মিউনিসিপাল অথবা জেলা বোর্ডের সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলেব সংখ্যা ৩৭ হাজার ২৭০ ; ঐরূপ সাহায্যকৃত নয় এমন স্কুলের সংখ্যা ১৫ হাজাব ৪৬৪ (দেশীয় রাজ্য সমূহেব দ্বারা পুষ্ট স্কুলগুলিও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত)। মধ্য শ্রেণীর স্কুলগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট গুরু ট্রেণিং শ্রেণী গুলি উঠাইয়া দেওয়াতেই প্রধানতঃ গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা এবারে কম হইয়াছে।

মোট ১ কোটী ৯ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৯৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূব্ব বৎসর ইহা অপেক্ষা ২৬ হাজার ১ শত ৪০ টাকা অধিক ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ২৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৬৮ টাকা এবং ইহা পূর্ব্ব বৎসরের ব্যয় হইতে ২ লক্ষ ৯ হাজার ১৭৬ টাকা কম। ছাত্র বেতন প্রভৃতি পূব্ব বৎসর অপেক্ষা ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ১৭৩ টাকা বাড়িয়াছে ; উক্ত বাবতে এবারে ৭২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৫০ টাকা হইয়াছে।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর বৎসর কাল মধ্যে ৫১ দিন পরিদর্শন কার্য্যে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। ছোটলাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে, ডিরেক্টর বাহাদুরের আপিসের কাজ বেশি বলিয়া অধিকাংশ সময় তাঁহার সদরে থাকারই প্রয়োজন হয়, কিন্তু তিনি নিজে পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে না পারিলেও আবার কাজ তেমন ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই; শুধু রির্টণ ও চিঠিপত্রাদির উপর নির্ভর করিলে বাহিরের কাজ কর্ম্ম, অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের যোগ্যতা এবং ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার অবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না।

শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারিগণ মধ্যে ইন্‌স্পেক্টর ৭ জন—ইঁহারা বৎসরে প্রত্যেকে গড়ে ১৪৬ দিন করিয়া পরিদর্শন কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছেন। ইউরোপীয় স্কুলের ইন্‌স্পেক্টর ২

জনের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী—ইহাঁরা যথাক্রমে ৬৯ ও ৪০ দিন পরিদর্শনে কাটাইয়াছে। সহকারী ইন্‌স্পেক্টর ১০ জন—প্রত্যেকের পরিদর্শন দিনের গড় সংখ্যা ১৫৩ ; ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর ৪৮ এবং সব ইন্‌স্পেক্টর ২১০ জন। ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরেরা প্রত্যেকে গড়ে ১৭৭ এবং সব ইন্‌স্পেক্টরেরা ২১৮ দিন স্কুল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন। পরিদর্শন কার্য্যে আরও অধিক সময় দেওয়া হয়, ছোটলাট বাহাদুর এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে যে শ্রেণীর লোককে সব ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হইতেছে, সেই শ্রেণীর লোক লইয়াই কয়েক জন সহকারী সব ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করা হইবে এবং জেলা বোর্ড ইচ্ছামত ইন্‌স্পেক্টিং পণ্ডিতদিগের স্থলে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন—এ প্রস্তাব এক্ষণে গবর্ণমেন্টের বিবেচনাধীনে আছে।

ডিরেক্টর বাহাদুর ডাক্তার মার্টিন প্রস্তাব করিয়াছেন যে স্কুলের ইন্‌স্পেক্টরগণ প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সকলে একটি সভাস্থলে সমবেত হইয়া এবং তদ্ব্যতীত তাঁহারা নিজেরাও সহকারী ও ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরদিগকে প্রতি দুই বা তিন বৎসর অন্তর এক একটি সভায় সমবেত করিয়া প্রধানতঃ পরিদর্শন ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ছোটলাট বাহাদুর প্রস্তাবটি উপযুক্ত মনে করিয়াছেন কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে চূড়ান্ত কিছু একটা করিবার পূর্ব্বে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার উপযোগী কাগজপত্র সমূহ গবর্ণমেন্টের নিকট উপস্থাপিত করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছেন।

ডিরেক্টর বাহাদুরের অপর প্রস্তাব এই যে প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীতে সেই জেলার ডেপুটী-ইন্‌স্পেক্টর একজন মেম্বর থাকিবেন এবং জেলা বোর্ডগুলিতে কমিসনরেরা একটি শিক্ষাসংক্রান্ত সাব কমিটি সংগঠিত করিয়া ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরকে তাহার একজন সদস্য করিবেন। এরূপ ব্যবস্থায় মিউনিসিপালিটী ও জেলা বোর্ড কর্তৃক সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রদেয় টাকার সুব্যবস্থা হইতে পারে। ফলে এ বিষয়ের পরিচালনার জন্য উহার মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়াভিজ্ঞ একজন পাকা লোক থাকিতে পাইলেই ভাল হয়। এ প্রস্তাবটি সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য মিউনিসিপাল বিভাগের উপর ভার দেওয়া হইবে।

কলেজগুলির জন্য উক্ত বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ৭০ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৭২ টাকা, উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর স্কুলগুলিতে ২৯ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৮৯ টাকা এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৬ টাকা।

সমস্ত গবর্ণমেন্ট হাইস্কুল (রাঙ্গামাটী ভিন্ন) এবং অনেক বেসরকারী স্কুলেও ড্রইং শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছাত্রাবাস এবং উহাতে ছাত্রসংখ্যা উভয়ই পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা এবারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্কুলসমূহে শারীরিক "ড্রিল" শিখাইবার ব্যবস্থায় ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতি ত হইবেই, অধিকন্তু 'আজ্ঞাপালন' ও শৃঙ্খলা অভ্যস্ত হওয়ায় শিষ্টাচার শিক্ষা সম্বন্ধেও উন্নতি হইবে।

যেখানে স্কুলের শিক্ষককে পোষ্ট অফিসের কার্য্য করিতে হয় তথায় স্কুলের অধ্যাপন সম্বন্ধে একটুকু ব্যাঘাত ঘটে। এই অসুবিধা নিবারণের জন্য ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরগণ পোষ্ট আফিসের ইন্‌স্পেক্টরদিগকে এ বিষয় জানাইবেন।

ট্রেণিং স্কুলগুলিতে "টীচারসিপ" পরীক্ষার জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণী খোলায় ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থায় ফল তেমন ভাল হইবে কিনা তদ্বিষয়ে চূড়ান্ত মত প্রকাশের আজও সময় হয় নাই। ৩ বৎসর পরে যদি ভাল ফল হইতেছে না দেখা যায় তাহা হইলে উহা রহিত করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের উপকারিতা যে অনেক, সে বিষয়ে এখন আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।। এই কলেজের ছাত্রগণ উপযুক্ত হইলেই চাকরী পায়। বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা বিবেচনায় ইহা একটী মহৎ অভাব দূরীকরণের কারণ হওয়ায় ছোট লাট বাহাদুব যতদূর পারেন ইহার সাহায্য কবিবেন।

বালিকা স্কুলগুলিতে ৫৮ হাজার ৮০৭ জন বালিকা অধ্যয়ন করিয়াছে এবং উহাতে মোট ব্যয় ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ২৬০ টাকা হইয়াছে। বালিকা পরীক্ষার পাঠ্য সমগ্র প্রদেশে একই রূপ করিবার প্রস্তাব এখনও বিবেচনাধীন আছে। হিন্দু ও মুসলমানের মেয়েদিগকে বৃত্তি দেওয়ার পরিবর্ত্তে পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাবও পরে স্বতন্ত্র ভাবে বিবেচিত হইবে।

সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে উক্ত বৎসর প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ২১ হাজার ২৭০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সংস্কৃত আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা গ্রহণে ৭ সাত শত টাকা ব্যয় হইয়াছে। বৎসরকাল মধ্যে সংস্কৃত টোল ১২২টী কমিয়াছে এবং সেই সঙ্গে ছাত্রও ১ হাজার ৮৫ জন কম হইয়াছে।

(উদ্ধৃত)

তত্ত্বখবর, সংবাদ।

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩০৫, নভেম্বর ১৮৯৮

নানা কথা, ব্রহ্মচাবী, পরিবারে শিক্ষা লাভ, উৎসাহ, লিখিয়া শিখা, কণ্ঠস্থ বিদ্যা, বিদ্যালয় পরিদর্শন, রাস্কিন কলোনি, জাপানে শিক্ষা, তত্ত্বখবর, সংবাদ।

১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩০৫, জানুয়ারি ১৮৯৯

নানা কথা, ব্রহ্মচারী, পরিবর্ত্তনের পরিবর্ত্তন, বিদ্যালয়ে সরঞ্জাম,

অযাত্রা।

অযাত্রা কোন দেশের কেবল কুসংস্কার নয়, নিরবচ্ছিন্নকালের আবর্জ্জনাও নয়। দিনে দিনে বিন্দু বিন্দু জল বাষ্পীভূত হইয়া ঘনঘটার উৎপত্তি করে, আকাশ ছাইয়া ফেলে। বিন্দু বিন্দু লোকের অসুবিধা পুঞ্জীভূত হইয়া এক একটা অযাত্রার নিশান হইয়াছে। অগণ্য নক্ষত্ররাজি ভূতল হইত দেখিতে পাই সমুদয়ই একতলে—আকাশ-চন্দ্রাতপে অসংখ্য কোহিনুর জ্বলিতেছে। কিন্তু উহারা তিনটী একতলে নাই, সুদূর হইতে দেখি বিষয় গুলিও অতীতের অসংখ্যা কালন্তরে এক একটী করিয়া জন্মিয়াছে ; কিন্তু আমরা কালের বহুদূর হইতে দেখিতেছি, কাজেই সে সমুদূয় গুলি কালের অগম্য নীলাম্বরে দেখিতে পাই।

যাত্রার শুভ মুহূর্ত্ত খনা বিজ্ঞানের কণ্ঠে কণ্ঠে দিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"মন চলে যখন, যাত্রা করবে তখন।" যাত্রার এই মাহেন্দ্রক্ষণ সর্ব্ববাদিসম্মত ! কিন্তু সকল লোক সমান নয়, গোবরগণেশই অনেক। কোন কোন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "স্ত্রীলোকের মন নাই।" একথা সত্য না হইলেও অনেকের মন যে সাত সমুদ্র তের নদী খেওয়াইয়াও পাওয়া যায় না, তাহাতে সন্দেহ নাই। সময়ে সময়ে অনেকেই বলেন—"আমার মনটা কেমন কেমন করিতেছে।" ইহার অর্থ, তাঁহার মন কি বলিতেছে তিনি নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন ; কিন্তু ভাষা বুঝিতে পারে না, অনেকে একটায় আর একটা বুঝিয়া হিতে বিপরীত করে। কবিগুরু কালিদাস একশ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে "সাধু" বলিয়াছেন। তিনি বলেন "সতাম্ হি সন্দেহপদেষু বস্তুযু প্রমাণমন্তঃকরণ প্রবৃত্তয়ঃ।" সাধুরা সন্দিগ্ধ বিষয়ে অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি বুঝিয়া কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিবেন। সুতরাং আত্মপ্রত্যয়লব্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞান সকলের নাই—কেবল সাধুদেরই আছে। খনাও সেই অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি অর্থাৎ মনের চলনই যাত্রার শুভক্ষণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অলস ও দীর্ঘসূত্রীদের যাত্রার সুসময় কোন পাঁজিতেই লিখে নাই। ইংরেজী বল, সংস্কৃত বল, মিসর বল, কি গ্রীস বল, সত্যযুগ বল, কি কলিযুগ বল, সর্ব্বভাষায়, সব্বদেশে, সর্ব্বকালে, ইহাদের অনন্ত অযাত্রা ! ইহাদেব ক্ষণ দগ্ধ, দিন দগ্ধ, মাস দগ্ধ, বৎসরও দগ্ধ ! ! এক কথায় ইহাদের হৃদয় দগ্ধ ! ! ইহারা যাত্রা করিয়াও কুস্বপ্ন দেখে যাত্রাকালে হাচি টিকটিকীর শব্দ শুনিতে পায়—আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। যে কাজে যার মন চলে না সে কাজে তার অযাত্রার তরঙ্গ "পঞ্চতরঙ্গে" সারি বাঁধিয়া একটীর পিছনে আর একটী ছুটে। তুমি কত বাঁধা কাটিবে ? দুষ্ট সরস্বতী তাহার কাঁধে চাপা, সে কেবল বিভীষিকা চারিদিকে দেখিতে পায়, চারিদিকে টিকটিকীবংশ টিক টিক টিক্ করিয়া উঠে! খনা বলেন "আজ তোমার মন চলে না, অযাত্রা।" বিজ্ঞান ও তাহাই বলেন।

ইংরেজী বিজ্ঞানে "Will force" বলিয়া একটা কথা আছে। ইহার অর্থ ইচ্ছাশক্তি বা ইচ্ছাবল। বল ভিন্ন গতি হয় না, গতি ভিন্ন যাত্রা নাই। যাত্রা কেবল শরীরের গতি নয়, মনের গতি ও আবশ্যক। অতএব যাত্রার নিদান গতি, গতির নিদান বল, বলেন নিদান ইচ্ছা। ইচ্ছা না থাকিলে অমৃতযোগ, সিদ্ধিযোগ, পাপপ্রতিঘ [ম] যোগ হইয়া উঠে—অমৃত অমৃতে বিষ হয়।

মন না চলিবার অনেক গুলি কারণ আছে। "বাড়ীমুখ বাঙ্গালীর" বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া এক বর্গির হাঙ্গাম। কাশীতে ৩ বার ভূমিকম্প হইলে বাঙ্গালী অতিকষ্টে অতি শোকে একবার অতি সাধের বাড়ী ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে সময় স্থির করিতে পারে। "শাকান্নাভোজন অপ্রাবাস" যে জাতির পরম দুঃখ সে জাতির পঞ্জিকাতে যাত্রার সময় যখন তখন দূরে থাক, কদাচিৎ পাওয়া গেলেই সৌভাগ্য। বাঙ্গালী প্রবাসে যাইতে পরলোক দর্শন করে এবং প্রবাসে হইতে ফিরিয়া ঘরের ছেলে ঘরে আসিলে তাহার পুনর্জ্জন্ম লাভ হয়। দারিদ্র্যের অঙ্কুশাঘাতে মন একবার অস্থির হইয়া উঠে বলিয়াই বাঙ্গালী কখন কখন যাত্রার শুভক্ষণ প্রাপ্ত হয়। আত্মীয় পরিজন ছাড়িয়া বিদেশে যাওয়া বাঙ্গালীর খণ্ডমৃত্যু।

অসময় যাত্রার আর একটা প্রধান অন্তরায়। ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, এই সময়ে কেহই পার্য্যমানে ঘবের বাহির হয় না। আকাশে ঘনঘটা দেখিলে দূর স্থানে যাত্রা অযুক্ত। বর্ষাকালে যখন তখন মূষলধারে বারি বৃষ্টি হয়। সকলে তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া ঘরের বাহির হয়। কিন্তু অসময়ে মেঘগর্জ্জন হইলে ঝটিকাবর্ত্ত প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা বলিয়া প্রাচীন সমুদয় জাতির মধ্যেই "অকালিক দেবগর্জ্জন" বিধাতার অনভিমত সূচনা করিত। অধিকন্তু, লোক যাহার জন্য প্রস্তুত নয় তাহাই তাহার কেমন একটা বাঁধা বাঁধা লাগে। অকালে মেঘগর্জ্জন ও সে বাধা বাঁধার জন্যই অমঙ্গল সূচনা করে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় প্রকৃতির বহু পরিবর্ত্তন হয় মেঘ, বৃষ্টি, জলবৃদ্ধি, বাত্যা প্রভৃতি প্রায় সেই সেই তিথিতেই হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত "পক্ষান্তে মরণং ধ্রুব।" বলিয়া পক্ষান্তে যাত্রা নিষিদ্ধ হইযাছে। প্রসঙ্গতঃ আর একটা কথা বলিতে হইল, ব্যবস্থা আবহমানকাল হইতে দুই প্রকার। সকল জাতিতেই উহার দ্বিরূপ পরিলক্ষিত হয়। এক কর্ত্তব্য নির্দ্দেশক, আর এক ভীতি-প্রদর্শক ভয় দেখাইবাব জন্য যে বিধি কুফলের শেষকথা। "পক্ষান্তে মবণং ধ্রুবং" এখানে ও ব্যবহার দ্বিরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। (১) পক্ষান্তে গমন করিবে না, (২) গমন করিলে ধ্রুব মৃত্যু জানিবে। ১ম কথাটা ব্যবস্থা, ২য় কথা অকরণে তাহার শাসন—সম্ভাবিত বিপদের শাসনের ব্যবস্থার শেষ ফলই লিখিত থাকে—সমগ্র দণ্ডবিধিই ইহাব সাক্ষী।

কেবল মেঘ, বৃষ্টি শীত, বাতই যে অযাত্রা তাহাও নয়, প্রখর সূর্য্যোত্তাপে চলা দুষ্কর এই জন্য মধ্যাহ্নও পথিকের সুসময় নয়। হাটিয়া পথ চলিতে হইলে দিবসের প্রথম ভাগ অতি মনোরম। এইজন্য প্রকৃতি বল আর বিজ্ঞান বল, কি মানবের সহজ জ্ঞানই বল, শাস্ত্রের মুখে বলিলেন "উষা করোতি কল্যাণং পূর্ব্বং নগচ্ছবি।" উষালোক কল্যাণকর যদি পূর্ব্বমুখে যাইতে না হয়। পূর্ব্বমুখে যাইতে বালাতপ একেবারে মুখের উপর ঝক্ মক্ করিয়া পড়ে, ছত্রদ্বারা আববণ করিলে ও পথরোধ হয়। এই জন্য "যদি পূব্ব" ন গচ্ছতি" ব্যবস্থা হইল।

আমরা ব্যবস্থা পাইলাম "উষাযাত্রা অতি শুভকর ; কিন্তু পূব্বমুখে উষাযাত্রা নাই।" ইহা হইলেই আমরা অবান্তর আরো একটী ব্যবস্থা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু অনুমান হইলেও উহা জ্যামিতির অনুমানের ন্যায় অভ্রান্ত। সে অনুমানটী এই:—বেলা উঠিলে অযাত্রা, বা শুভযাত্রা নয়। চারিদণ্ড কি এক প্রহরের সময় তুমি অনাহারে অন্যত্র দূরস্থানে গমন করিবে ইহা সাধুসম্মত নয়।

পুর্ব্বে ঘড়ি ছিল না, ৮ কি ৯ টার সময় অন্যত্র গমন বিহিত নয় বলিতে পারিত না ; দণ্ড ছিল কিন্তু সামান্য লোকে দণ্ডের মান ও জানিত না। সামান্য লোককে সময় বুঝাইতে হইলেও উপায়ান্তব গ্রহণ করিতে হইত। সে উপায় অবশ্যই সামান্য রকমের। যাহারা উষা বুঝেনা, তাহাদিগকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে বা অরুণোদয়ের সময় না বলিয়া বলিতে হয়—

"ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা।
তাহার নাম শ্রীউষা।।"

প্রত্যুষে যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে গমন করে তাহাদের সহিত যাত্রীর সাক্ষাৎ হইলে শুভ ফলে। কারণ উষাযাত্রা ভিন্ন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ অসম্ভব। এইজন্য যাত্রাকালে মেথরের

মুখ দেখিলে শুভ হয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখনকার কালে কলিকাতার যাত্রীর পক্ষে মুটে মজুর দর্শন বা গঙ্গাস্নানে কাহাকে যাইতে দেখিলে শুভযাত্রা বলা যাইতে পারে, কারণ প্রত্যুষে যাত্রা না করিলে সে সকল দর্শন করা যায় না। জালুয়ারা এবং গোয়ালারা প্রভাতে স্ব স্ব কার্য্যে গমন করে এইজন্য তাহাদের দর্শনেও শুভফলে বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু এই সকলই উষা যাত্রার ফল।

বেলা উঠিলে যাহারা কার্য্যক্ষেত্রে গমন করে যাত্রাকালে তাহাদের দর্শন অমঙ্গলকর–ইহার অর্থ, বেলা উত্তীর্ণে যাত্রাকরা কর্ত্তব্য নয়। এই জন্যই অযাত্রার ব্যবস্থায়—

"আগে ধোবা পাছে নাই।
সে পথে না যেয়ো ভাই॥
সে কথাও পায় ঠেলি।
যদি সাম্‌নে না পড়ে তেলি॥"

ইহার অর্থ, ধোবা, নাপিত, তেলি যাত্রাকালে দর্শনে অশুভ হয়। এই সকল ব্যবসায়ীরা, রোদ উঠিলে, স্ব স্ব ব্যবসা কার্য্যে গমন করে। এইজন্য বেলা উত্থানে যাত্রা না করিলে ইহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। ইহার অর্থ বেলা উঠিলে যাত্রা করিবে না। এখনকার মত শাস্ত্র করিলে বলিতে হইত, "কাচারী যাত্রী কেরাণী বাবুর দর্শন অযাত্রা।" কারণ তাঁহাদিগকে ৮, ৯ টার সময় যাইতে হয়, এত বেলায় যাত্রাই অযাত্রা।

কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের অযাত্রার লক্ষণ গণনা করিলে চলে না। রেলগাড়ী বা ষ্টীমার আজ ৮ টার সময় ছাড়িবে, তুমি যদি অযাত্রা বল রেলগাড়ী বা ষ্টীমার চলিয়া যাইবে তুমিই পড়িয়া থাকিবে। পূর্ব্বকালে পাথিকদিগকে অতিথি হইয়া আহারের সংস্থান করিতে হইত, নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে আহার জুটিত না। এখন আহার্য্য বস্তু সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পার, স্থানে স্থানে পান্থশালা বা হোটেলের অপ্রতুল নাই, দু আনার কাছে দশ পয়সা দিলে তৎক্ষণাৎ ডাল ভাত পাইবে। আর এক কথা, এখন আর সে ক্ষুদ্র তরণী নাই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলের জাহাজ বাত্যোত্থিত তরঙ্গ নিকর অবহেলা করিয়া, সাগরবক্ষঃ বিদারণ করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং অমাবস্যা বা পূর্ণমাসীকে ভয় করিবার কারণ নাই। ঝড়বৃষ্টি রেলপথ কি জলপথ কিছুরই প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। রেলের গাড়ীতে চড়, রেলগাড়ী শ্রাবণের ধারা বা বৈশাখের ঝড়ের প্রকোপ ভ্রূভঙ্গিতে উড়াইয়া দিয়া হু হু করিয়া চলিয়া যাইবে। তুমি যাত্রী, সব দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাক একটুক বাতাস বা একবিন্দু জল তোমার গায় লাগিবে না। অতএব তোমার অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় ভয় কি? রেলের ষ্টেশনে ষ্টেশনে দেখিবে অমাবস্যা বা পূর্ণমাসী দিনে ও কত যাত্রী রেলে চড়িতেছে। জাহাজেও সেইরূপ এখন আর দিন ক্ষণের বিধি ব্যবস্থা অনেকে মানে না। অনেকে যাত্রা করিয়া শুভক্ষণের মাহাত্ম্য রক্ষা করে।

একথা সত্য যে বিঘ্নবিপদ দেখিয়াই এক একটা নিষেধবিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এখন সে সকল আশঙ্কিত বিপদের কোন সম্ভাবনা না থাকিলে সে বিধির অসুবিধা করা কুসংস্কার বই কিছু নয়। যাত্রা বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই লক্ষণালক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু সে সকলের তত্ত্ব নির্ণয় করা বহুকাল ও বহুজন সাপেক্ষ।

·দেশ কালভেদে অযাত্রার বিধি স্বতন্ত্র। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে··

"করিআ ব্রহ্মণ গোর চামর।
ইন্‌কে সাথ ন উতরিয়ে পার॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ ও গৌরবর্ণ চামারের সঙ্গে নদী পার হইবে না।

উছট্ খাইলে বা হাঁচি পড়িলে হিন্দুদিগের ন্যায় প্রাচীন রোমাণদেরও অযাত্রা হইত। হাঁচিপড়াটা সর্দ্দির পূর্ব্ব লক্ষণ, সর্দ্দি পূর্ব্বকালে হয়তো প্লেগের ন্যায় সংক্রামক ছিল— একজনের হইলেই সে বাড়ীর শত জনের হইত। এইজন্য বাড়ীর একজনের সর্দ্দি হইলেই উহা ব্যাপ্ত হইবার আশঙ্কা হইত ; এবং গমনোম্মুখ ব্যক্তির অন্যত্র যাওয়া নিষিদ্ধ হইত।

গ্রীকদের মধ্যে ঈগল, শকুনি, কাক প্রভৃতিও গণকাচার্য্য ছিল। উহারা ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বলিতে পারিত। উহাদের শব্দ বিশেষ বা গতিস্থিতি যাত্রার শুভাশুভ বলিতে পারিত। হিন্দুদের মতে শকুনি, কাক, শিবা প্রভৃতি ও ভবিষ্যদ্বক্তা। উহাদের শব্দ ও গতি বিধি ও শুভাশুভ সূচনা করিয়া থাকে।

কত দেশে যে কত কিছু শুভযাত্রা বা অযাত্রার চিহ্ন ছিল ও আছে তত্তাবৎ বিনির্ণয় করা অতি উদ্যমেব কার্য্য। এবং সে সকলের কারণ–সূত্র স্থির করা ততোধিক গবেষণা ও অভিজ্ঞতা সাধ্য।

যাত্রার দিন ক্ষণ চিরকালই আবশ্যক। এখনও দিন ক্ষণ দেখা আবশ্যক। তবে পাঁজি স্বতন্ত্র হইয়াছে। আগে ছিল কালেজের বা নবদ্বীপেব পঞ্জিকা, এখন পঞ্জিকার নাম হইয়াছে "টাইম্ টেবিল" বা সময় পত্র। কোন্ সময়ে কোন্ ট্রেণ ছাড়িবে, কতটার সময় কোথায় পৌছিবে তাহা দেখিয়া যাত্রার সময় স্থির করিতে হয়। তুমি প্রসিদ্ধ গণকাচার্য্য দ্বারা লগ্ন স্থির করিয়া যাত্রা কারিলে কিন্তু ষ্টেশনে যাইয়া দেখিলে ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে তখন অতি শুভ মুহূর্ত্তে যাত্রাও ভঙ্গ হইল। অতএব যে রেলওয়ে টাইম টেবিল দখিয়া লগ্ন স্থির না করিবে তাঁহাকেই এইরূপ যাত্রাভঙ্গ করিতে হইবে।

যাত্রার আর একটা অসুবিধা জলকষ্ট। পথ চলিতে চলিতে পিপাসায় তোমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতে ও বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতে পারে। সে সময় যদি একবিন্দু বারি পান করিতে না পার তোমার গতি কি হইবে ? অনেক বছর জল দুর্ভিক্ষ হয়, পুরনারীবর্গ শূন্য কলসী কক্ষে লইয়া পল্লী পার হইয়া জল আনিতে যায়। তুমি যদি এরূপ শূন্য কলসী কক্ষে লইয়া জল অন্বেষণে নারীগণকে ইতস্ততঃ যাইতে দেখ, বুঝিবে তুমি পিপাসার সময়ে জল পাইবে না, তুমি সে দুর্দ্দিনে দূরদেশে যাত্রা করিবেনা। অতএব শূন্য কলসী দেখিলে তোমার "অযাত্রা" মনে রাখিবে। জল দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া অযাত্রা, শূন্য কলসী তাহার পরিচায়ক। কিন্তু জল দুর্ভিক্ষ হয় নাই, অথচ একটী শূন্য কলসী দেখিলেই, যেমন যাত্রাগানে বৃন্দা বলিয়াছিল—

"শূন্য কলসী লইয়া কক্ষে দক্ষে দাঁড়াব।
দেখায়ে শ্যাম জলজাক্ষে যাত্রা ভাঙ্গিব॥"

যাত্রাভঙ্গ হইবে, ইহা কথার ভাব ছাড়িয়া, অক্ষরানুসরণ বা অল্পদর্শিতা।

যেখানে যাইতে হইবে, যে যে দেশ দিয়া যাইতে হইবে, সে সকল বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। দেশকালাভিজ্ঞতা যাত্রার সময় নির্ব্বাচনে নিতান্তই প্রয়োজন। যে স্থানে যাইবে যাত্রার পূর্ব্বেই মন তথায় চলিয়া যাইবে। তোমার শরীর যেখানে আছে সেখানের টিকটিকীর শব্দ আর তুমি শুনিতে পাইবে না। কেবল তুমি নও, তোমার বন্ধুবর্গের মধ্যেও কেহ তাহার শব্দ লক্ষ্য কবিবেনা ; তখনই বুঝিবে তোমার মন যাত্রা করিয়াছে, তুমি এখন পদনিক্ষেপ করিলেই হয়।

এখন দেশ কাল, যান বাহন সকলই নূতন হইয়াছে, যাত্রার সময ও নূতন রকমের হইয়াছে। পূর্ব্বে পঞ্জিকা না দেখিলে যাত্রার সময় নির্ব্বাচন হইত না ; কারণ তখন বাত্যা বৃষ্টিও অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক–মুক্ত হইবার তেমন উপায় ছিল না। এখন রেল, জাহাজ স্থানে স্থানে হাট বাজার ও আশ্রয় স্থান প্রভৃতি হইয়াছে, এইজন্য প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় লোক অনায়াসেই যাতায়াত করিতে পারে। এখন যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই রেলওয়েব টাইম· টেবিল দেখিতে হয়, টাইম টেবিল এখন নূতন যুগের "নূতন পঞ্জিকা।" সে পঞ্জিকাসম্মত না হইলে তোমার "মাহেন্দ্রক্ষণ" ও "অযাত্রা"।

দরিদ্রাবস্থা।

দরিদ্রাবস্থা দদ্দুরকের ন্যায় কদাকার কিন্তু উহার মস্তকে মণি থাকে।

দরিদ্রাবস্থা সমাজের মেরুদণ্ড, উহার উপরেই মানবসমাজ দণ্ডায়মান।

প্রকৃতি সকলের সাম্যবক্ষা করে। কেহ ধন সম্পত্তিতে হীন হইলে, অন্যদিক দিয়া তাহা পোষাইয়া যায।

গরীবেরা শাবীবিক স্বাস্থ্য, বিদ্যা ও জ্ঞানলাভেব অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

গরীবেরা বিনযী ও নিরীহ প্রকৃতি। সাধরণের দুঃখ কষ্ট অনাযাসেই পরিমাণ করিতে পারে। সহানুভূতি তাহাদের সহজাত গুণ।

দরিদ্রেরা সুখী হইবার অনেক সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হয়। তাহাবা স্বল্পসন্তুষ্ট।

দরিদ্রেরা সহিষ্ণু, অবস্থার কশাঘাতে তাহারা অচল।

গরীবদের আত্ম–কাহিনীই সুখময় রাজ্যে প্রবেশেব দ্বার।

দুঃস্থদের দল ক্ষমতাশালী ও পরিপুষ্ট। অতএব হে দরিদ্র! তুমি ভীত বা আপনার অবস্থায় ম্রিয়মাণ হইও না।

ফ্রান্সের সুগৃহীতনামা বলন্টিন জামিরে ডুবালের পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অতিকষ্টে পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। ডুবালের দশবর্ষ ব্রয়ঃক্রমকালে, তাঁহার পিতা মাতা, কতকগুলি পুত্র কন্যা রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। এই কড়াব ভিখারী ডুবাল স্বীয় অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় মাত্র সহায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে বিবিধ জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা তৎকালীন প্রায় সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক বিদ্যাবান্ হইয়া ছিলেন।

সুইডেনের জগদ্বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ লিনিরস অতি দীন গ্রামপুরোহিতের পুত্র ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ও নগণ্য হইয়াও অলোক সামান্য বুদ্ধি শক্তি, মহোৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্র ও অন্যান্য বিদ্যা বিষয়ে মনুষ্য সমাজে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন।

ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিত সর্‌ আইজাক নিউটনের পিতা তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, কেবল যৎকিঞ্চিৎ ভুমিকর্ষণ দ্বারা জীবিকা সম্পাদন করিতেন। বিদ্যাভ্যাসে স্বাভাবিক অনুরাগ থাকায় নিউটন গণিতে, জ্যোতিষে ও প্রকৃত বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় লোক হইয়া গিয়াছেন।

আমাদের দেশে লক্ষ্মী সরস্বতীর চিরবিবাদ—লক্ষ্মীর গৃহে বিদ্যাদেবীর পদধূলি পড়ে না, বিদ্যাদেবীর গৃহে লক্ষ্মীর বাস আকাশ-কুসুম। ইহা কবির পরিকল্পনা নয়, দেশের ইতিহাস অক্ষরে অক্ষরে ....সাক্ষ্যদান করিয়াছে বলিয়াই লক্ষী সরস্বতীর বিবাদ সমাজে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে কবি কালিদাস একদা কবিতা রচনা করিতে আদ্দিষ্ট হইলে বলিয়া ছিলেন— "অন্ন চিন্তা ... কাতরে কাতরে কবিতা কুতঃ।" এত বড় পণ্ডিত কালিদাসেরও বরে অন্ন সংস্থান ছিল না। ভারতের পণ্ডিতকুল ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষোপজীবী—অতি পুরাতন কাল হইতে।

দুর্ঘিবগাহ ধীশক্তি সম্পন্ন রঘুনাথ শিরোমণি দুঃখিনী বিধবা জননীর অতিকষ্টে প্রতিপালিত হইয়া মৈথিল গৌরবলক্ষ্মী নবদ্বীপে স্থাপন করিয়া ছিলেন। তর্কশাস্ত্রে তদানীন্তন ভারতে অদ্বিতীয় হইয়া ছিলেন।

প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কলঙ্কারবংশপত্র জ্বালাইয়া তদালোকে পাঠ অভ্যাস করিতেন। অর্থাভাবে তৈল কিনিয়া রাত্রিতে পড়িতে পারিতেন না। কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিপ্রতিভাবলে শিরোমণির সমকক্ষ ও একজন প্রধান তার্কিক হইয়াছিলেন। নবদ্বীপের মহিমাময় চিত্রে জগদীশের প্রতিকৃতি চির সমুজ্জ্বল। তাঁহার প্রণীত "শব্দশক্তি প্রকাশিকা" ও "তর্কা-মৃত" তাঁহাকে অমর করিয়াছে।

বঙ্গের শিরোভূষণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অতি গরীবের সন্তান ছিলেন। পিতার মাসিক দশ টাকা মাত্র আয় ছিল। এই অল্প আয়ে সাতটী পুত্র, তিনটী কন্যা ও অন্যান্য পরিজনবর্গের ভরণ পোষণ করিতে হইত। ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বহস্তে পাক, সামান্য দ্রব্য ভক্ষণ, কদর্য স্থানে বাস, অপকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। এইরূপ অবস্থান লৌহক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইলেন।

বঙ্গের অন্যতম তমোহা শিরোরত্ন অক্ষয়কুমার দত্তও সম্পন্ন পিতার সন্তান ছিলেন না। অর্থাভাবে নিয়মিতরূপে শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই, ইহাকে উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা সম্পাদন করেন, পরে একজন আত্মীয়ের সাহায্যে আড়াই বৎসর মাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। স্বয়ং অনুশীলন করিয়া জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কণিকসেক্‌সন, ক্যালকুলাস প্রভৃতি গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান ও ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

অতএব হে দরিদ্র! তুমি আত্ম-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া যার তার কাছে ভিক্ষার্থী হইও না। বরং সামান্য কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তথাপি অন্যের গলগ্রহ হইবে না। তুমি ভিক্ষা করিয়া লঘুতা প্রকাশ করিলে, হস্তস্থিত মণি অতল-সাগর-জলে নিক্ষিপ্ত হইবে।

শিক্ষক-সমিতি।

সভা সমিতি বর্ত্তমান কাল-তরঙ্গের শিরোভূষণ। পূর্ব্বকালে এক এক জন বড়লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া কেহবা ধরণীতে, কেহবা এক এক দেশে, এক এক বিষয়ে একচ্ছত্র রাজত্ব করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের বিধান—দশ জনে মিলিয়া কাজ করা। পূর্ব্বে যে ক্ষেত্রে একজন মাত্র ছিলেন, এখন সে ক্ষেত্রে দশ জন দণ্ডায়মান হইয়াছেন। যেখানে দশ জন সমকক্ষ, সেখানে একজনের সার্ব্বভৌমত্ব বিধিবিহিত নয়—কাল ধর্ম্ম সে অদ্বিতীয়ত্ব চূর্ণ করিয়াছে। পূর্ব্বে দশ জন ছিল না, বলিয়াই একজনের কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিত।

সভাতে ভাবের বিনিময়ে, চিন্তা ও মানসিক শক্তিসমূহের উন্মেষ ও বিকাশে জ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃত হয় ও কার্যশক্তি বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে সভা সমিতির বাল্যাবস্থা ; সভাগুলি এখনও কার্য্যক্ষমতারূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই। এদেশে অন্যান্য সকল বিষয়েই সভার ভাব একরূপ প্রবেশ করিয়াছে বলা যাইতে পারে ; কিন্তু শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত শিক্ষক ও পরিদশকদের মধ্যে সে ভাব অতি বিরল। বলিতে পারি, এখনও শিক্ষা-বিষয়ে আমাদের দিব্য দর্শন লাভ হয় নাই,—আমরা মুক্ত হৃদয়ে ভূত ভবিষ্যৎ দেখিতে পারি না। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সভা করিবার বলবতী ইচ্ছা, জ্বলন্ত উৎসাহ, অদম্য চেষ্টা দেখা-যায় ; কিন্তু তাহাদের সেই অগ্নিময় উচ্ছ্বাস ও প্রকৃতির নিস্পেষণে —হাতুড়ি আঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উত্তপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িয়া কায্যক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্বেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। শিক্ষক ও পরিদর্শকদিগের মধ্যে এখনও সে চেষ্টার অরুণোদয় হয় নাই। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শাসনের উৎকর্যসাধন, ছাত্র বিশেষে অধ্যাপনার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ও শিক্ষা-সঙ্কটগুলিব যথাযথ মীমাংস করিবার জন্য যে. সমিতির দরকাব, তাহা এখনও লোকের বাধগম্য হয় নাই।

ভারতে লর্ড রিপণের[৫৩] আমলে কয়েক জন শিক্ষা-প্রবীণ লোক ভারতীয় শিক্ষার "ভবিষ্য পুরাণ" লিখিতে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন : উহার নাম হইয়াছিল "শিক্ষা কমিশন" বা শিক্ষা-সমিতি। সে কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি অবশ্যই স্থূল স্থূল বিষয় লইয়া হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর সার্ আলফ্রেড্ ক্রফট্ সাহেব দারজিলিঙ্গে বঙ্গদেশের স্কুল ইন্স্পেক্টরদিগকে লইয়া এক সভা কবিয়াছিলেন। পূব্বর্চক্রের স্কুল ইন্স্পেক্টর রায় দীননাথ সেন সাহেব ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার প্রধান প্রধান শিক্ষক, আসিষ্টাণ্টও ডিপুটী ইন্স্পেক্টরদিগকে লইয়া একবার একটী সভা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মাদ্রাজে বড় বড় শিক্ষকদের এক সমিতি আছে, তাহাতে শিক্ষা বিষয়ক বিবিধ আলোচনা হইয়া থাকে। গত অধিবেশনে লাট সাহেব সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ গতবারে প্রদান করিয়াছি। মাদ্রাজের এই সভার কার্য্য আমরা বিশেষরূপে অবগত নই। কিন্তু মোটের

উপর বলা যায় আমাদের দেশে শিক্ষকদের কি পরিদর্শকদের নিয়মিত কোন সভা সমিতি নাই।

আমাদের বর্ত্তমান ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত পেডলার সাহেব এদেশে এরূপ সভা সমিতির বিশেষ স্বভাব অনুভব করিয়া পাটনা ডিভিশনের বিগত বার্ষিক রিপোর্টে লিখিয়াছেন :—

"that in my opinion periodical conferences are desirable.

* * I would even go so far to say the great urgency of having at least annual conferences between the Circle Inspector the Assistant Inspector and all the Deputy Inspectors. At such conferences all the varying subjects which constitute efficient school inspection and efficient administration could be discussed in turn."

তাঁহার মতে—সময়ে সময়ে স্কুল পরিদর্শকদের সভা হইলেই ভাল হয়। অন্ততঃ বৎসরে একবার ইন্‌স্পেক্টর, আসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর ও ডিপুটি ইন্‌স্পেক্টরগণ সমবেত হইয়া কিরূপে বিদ্যালয় দর্শন ও পরিচালন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা তাঁহাদের নিতান্ত আবশ্যক।

এই বিষয় উপলক্ষে ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর ডাক্তার মার্টিন সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন—ইন্‌স্পেক্টরগণ অন্ততঃ প্রতি পাঁচ বৎসরে সকলে একটী সভা করিয়া এবং প্রত্যেক ইন্‌স্পেক্টর দুই কি তিন বৎসর অন্তর একত্র হইয়া পরিদর্শন বিষয়ে আলোচনা করিলে ভাল হয়। বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুরও প্রস্তাবটি উপযুক্ত মনে করিয়াছেন। কিন্তু চূড়ান্ত হুকুম দিবার পূর্ব্বে সভায় কি কি কায্য হইবে এবং কি কি বিষয়ের আলোচনা হইবে তত্তাবৎ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক মনে করেন।

এই সকল পড়িয়া মনে করিতেছি, পরিদর্শকদের সমিতি অগৌণেই হইবে, উহা বার্ষিক কি পঞ্চবার্ষিক যেরূপই হউক। আমরা পরিদর্শকদের সমিতির ন্যায় শিক্ষকদের সমিতি ও অতি প্রয়োজনীয় মনে করি। বিলাতে পরিদর্শকদের ন্যায় শিক্ষকদেরও সমিতি আছে। এবং সে সকল সভার সাহায্যে অধ্যাপনার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরিদশকদের সভায় বিদ্যালয় পরিদর্শন ও পরিচালন কার্য্যের পর্য্যালোচনা ও উৎকর্ষ সাধন হইবে ; কিন্তু অধ্যাপনার উন্নতি অধ্যাপকদের সমিতি না হইলে সম্ভবপর নয়।

পরিদর্শকদের সমিতির এক অন্তরায় ব্যয় বাহুল্য। পরিদর্শকদের ভাতা প্রভৃতির ব্যয়ভার গবর্ণমেণ্টকে বহন করিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষক সমিতির সেরূপ ব্যয় বহনের প্রয়োজন হয় না। দুইজন পরিদর্শক একত্র মিলিতেই ভাতা চাই, কিন্তু এক স্কুলের এমন কি এক নগরের সমুদয় শিক্ষকই বিনা ভাতায় সম্মিলিত হইতে পারেন। এই জন্য প্রতি জেলায় শিক্ষক সমিতির স্থাপনা অতি সহজ। এমন কি প্রতি মাসে উহার এক একবার অধিবেশন হইতেও একটি পয়সা ব্যয় বহন করিতে হইবে না। অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হইবে না বলিয়া গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরীরও তেমন প্রয়োজন নাই। শ্রীযুক্ত ডিরেক্টর সাহেব সভা সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিলেই শিক্ষক সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। প্রতি

জেলার শিক্ষকগণও সমবেত হইয়া সেরূপ সভা করিতে পারেন। কিন্তু এদেশে তেমন কার্য্য-প্রবর্ত্তক শক্তি নাই বলিয়া ডিরেক্টর সাহেবের সে অগ্নি জ্বালিয়া দিতে হইতেছে।

আপাততঃ যে যে নগরে কলেজ আছে সেই সেই নগরে এক একটি শিক্ষক-সমিতিকার্য্য পরীক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কার্য্য আশানুরূপ হইলে পরে প্রতি জেলায় সভার প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে।

মাসের কোন এক শনিবার ২ টার পরে নগরস্থ সমুদয় শিক্ষক কলেজ গৃহে সমবেত হইয়া এই সভার কার্য্য নিব্বাহ করিলে অধ্যাপনার সময়ের ও কোন ক্ষতি হইবে না। প্রত্যুত শিক্ষকগণ এইরূপ সভার সাহায্যে সমধিক কার্যক্ষম ও বহুজ্ঞ হইতে পারিবেন। এরূপ সভাদ্বারা যে দেশে শিক্ষা বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবে ইহাতে তিল মাত্রও সন্দেহ নাই।

প্রতি সভার কায্য অন্যান্য জেলার সভায়ও পরিদশকদের নিকট প্রেরিত হইলে তদ্দ্বারা উহার কার্য্যকারিতা আরো বৰ্দ্ধিত হইবে।

এইরূপ সভায় স্কুল পরিদর্শকগণও অন্যান্য রাজকৰ্ম্মচারীরা সময়ে সময়ে উপস্থিত থাকিলে আলোচিত বিষয়ে নানাতত্ত্ব প্রকাশিত হইতে পারে।

আমরা স্থানে স্থানে এইরূপ শিক্ষক-সমিতির প্রতিষ্ঠা কামনা করিতেছি।

সংবাদ পত্র-পরিচালন।

এদেশে ইংরাজ ও দেশীয় দ্বারা পরিচালিত অনেকগুলি প্রাত্যহিক ইংরাজী পত্র বাহির হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে পাইওনিযাব, 'ইংলিশম্যান', 'ডেলি-নিউস', 'মিরর', 'ষ্টেট্স্ম্যান', 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি প্রধান।[৫৭] আমাদের কায্যের সহিত তুলনায় এই সকল প্রাত্যহিক পত্র বাহির করিতে অনেক অধিক অর্থব্যয় ও পরিশ্রম হইয়া থাকে। এদেশের সংবাদপত্রের এখনও তত আদর হয় নাই বলিয়া অত্রত্য ইংরাজী পত্রসমূহের উর্দ্ধ সংখ্যায় ২, ৩ হাজারের অধিক গ্রাহক নাই। অথচ এক একখানি প্রাত্যহিক ইংরাজী পত্র বাহির করিতে সকলকেই সবিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। ইহাদের সাহিত বিলাতের প্রাত্যহিক পত্রগুলির তুলনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তথায় এক একখানি প্রাত্যহিক পত্রের এক লক্ষ দেড় লক্ষ গ্রাহক। প্রত্যহ এত কাগজ ছাপা হইয়া গ্রাহকবগকে বিলি করা হইয়া থাকে, অথচ কার্যের কোন বিশৃঙ্খলতা লক্ষিত হয় না। বিলাতে কি প্রণালীতে এবং কিরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কায্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহা, শুনিলে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। সম্প্রতি বিলাতের পত্রান্তরে একখানি প্রাত্যহিক পত্রের সবিস্তৃত পরিচালন-কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে; পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে আমরা উহা হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বিলাতে কার্য্যবিবেচনায় সম্পাদক অপেক্ষা সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব সব্বাপেক্ষা অধিক। কারণ, সহ-সম্পাদককেই সমস্ত কায্য কবিতে হয়। সম্পাদক কেবল সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি দেখিয়া দিয়া থাকেন। এরূপ করিবার অভিপ্রায় এই যে, সম্পাদকীয় মতামত সম্বন্ধে কাগজের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় যেন কোন পার্থক্য না ঘটে। কারণ তাহা হইলে

সম্পাদককেই নিন্দনীয় হইতে হয়। ইহা ব্যতীত কাগজে কোন গ্লানি বা নিন্দাপূর্ণ কথা বাহির হইলে সম্পাদকেরাই তাহার নিমিত্ত দায়ী থাকেন। এবং তজ্জন্য বা অন্য কোন কারণে মকদ্দমা মামলা উপস্থিত হইলে, সম্পাদকদিগকে লইয়াই টানাটানি হইয়া থাকে ; সহ-সম্পাদকদিগকে আদালতে বা বাহিরের লোকের নিকট কোন বিষয়ে দায়ী থাকিতে হয় না। সম্পাদক বা তাঁহার অন্য কোন সহকারী প্রেরিতপত্রগুলি খুলিয়া পড়িয়া দেখেন। প্রকাশোপযোগী পত্রগুলি রাখিয়া অবশিষ্টগুলি ফেলিয়া দেওয়া হয়। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রগুলি দেখা ভিন্ন সম্পাদক আর কোন কার্য্য করেন না। কাগজের অবশিষ্টাংশ পুরাইবার ভার সহকারীর হস্তে অর্পিত থাকে। লিডস্-মারকরি, লিভরপুল-কুরিয়ার, গ্লাসগোহেরাল্ড, ডেলিনিউস প্রভৃতি বিলাতের প্রাত্যহিক পত্রগুলিতে ৭২ হইতে ১০৮ "কলম" বা স্তম্ভ আছে। ইহার মধ্যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ৩, ৪ স্তম্ভ গিয়া থাকে ; ২৫ হইতে ৫০ স্তম্ভ বিজ্ঞাপনাদিতে যায় ; বাকী ৪০, ৫০ স্তম্ভ সংবাদ ও স্থানীয় সভাসমিতির কার্যবিবরণাদিতে পূর্ণ থাকে। সহকারী সম্পাদককেই এই ৪০, ৫০ স্তম্ভ প্রত্যহ লিখিয়া দিতে হয়।

আবার এত সংখ্যক কাগজ ছাপা হইবে এবং এত অধিক লিখিতে হইবে বলিয়া সেখানে প্রাতঃকাল হইতেই কার্য্য আরম্ভ হয় না,—সন্ধ্যার পর হইতেই হইয়া থাকে এই সময়ে দুই একজন কবিয়া লেখক (সহকারী সম্পাদকের সহকারী) আফিসে উপস্থিত হইতে থাকেন। তাঁহাদেব নিকট হেড-আফিস হইতে সন্ধ্যাব পর তারযোগে সংবাদ আসিতে আরম্ভ হয়। প্রথমে বাজাব-দর ও জাহাজাদির গতিবিধির সংবাদ আসে। সংবাদগুলি একজন সহকারী দেখিয়া কম্পোজিটারের ঘরে পাঠাইয়া দেন। রয়টার, সেন্ট্রাল নিউস প্রভৃতি কোম্পানীর লোকেরা পৃথিবীর নানা স্থান হইতে তারযোগে যে সকল সংবাদাদি পাঠাইয়া থাকেন. এই সময়ে তাহাও স্থানীয় পোষ্ট-আফিস সমূহ হইতে উপস্থিত হইতে থাকে। এই সকল সংবাদ আফিসে পৌছিবা মাত্রই কম্পোজিটারদিগের হস্তে অর্পিত হয় না। সংবাদগুলি কোথা হইতে আসিতেছে, কোন বিষয় সম্বন্ধে আসিতেছে, কিরূপভাবে চলিয়াছে, ইত্যাদি নানা বিষয় দেখিয়া শুনিয়া আবশ্যক মত পরিবর্ত্তনাদি করিয়া দিতে হয়। রাত্রি ৮টার সময় সহকারী সম্পাদক উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ কত স্তম্ভ লিখিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। বিজ্ঞাপনাদি বাদে যত স্তম্ভ লিখিতে হইবে তাহা জানিয়া লইয়া তিনি ঐ সকল সংবাদের আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন।

সহকারী সম্পাদকের অতিশয় স্মরণশক্তি থাকা চাই, এবং তাঁহার লিখিত বিষয়গুলিতে কতস্থান পূরণ হইবে তাহাও জানা চাই। স্মরণশক্তি না থাকিলে একই কাগজের মধ্যে এক বিষয় দুইবার যাইতে পারে ; আবার কোন বিষয় পূর্ব্বে যেরূপভাবে লেখা হইয়াছে, পরে সেরূপভাবে লেখা নাও হইতে পারে। এই কারণে তাঁহার অদ্ভুত স্মরণশক্তির আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস ও ভূগোল তাঁহার কণ্ঠাগ্রে থাকা আবশ্যক। নতুবা নগরাদির অবস্থান ও অন্যান্য তত্ত্বাদি সম্বন্ধে ভুল বিবরণ প্রকাশ হইতে পারে, এবং তাহা হইলে পরদিবস সম্পাদককে তজ্জন্যে সাধারণ্যে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। এই জন্য সহ-সম্পাদককে

সবিশেষ দেখিয়া শুনিয়া লিখিতে হয়। এই সময়ে তিনি তাঁহার সহকারীদিগকে স্থানীয় সংবাদাদি আবশ্যকানুসারে বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়া দিতে বলিয়া দেন। সহকারীরা স্থানীয় সভাসমিতির অধিবেশনের, কার্য্যবিবরণ ও বক্তৃতা, এবং আদালতের আবশ্যকীয় মকদ্দমাদি সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ পাইতে থাকেন, তাহা অমনি তদনুসারে লিখিতে থাকেন। এই সময়ে আবার হেড-আফিস হইতে কতকগুলি সংবাদ আসে, এবং ঐ সংবাদ সমূহ যে কয়েক পংক্তিতে লিখিত হইবে, সেইসঙ্গে তাহাও বলিয়া পাঠান হয় ; যথা—অমুক বড় লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে ৭৫ লাইন লিখিতে হইবে ;—অমুক স্থানে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, ঐ সম্বন্ধে ১০০ লাইন লিখিতে হইবে ;—অমুক স্থানে রেল-দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে,—তৎসম্বন্ধে ৫০ লাইন লিখিতে হইবে, ইত্যাদি। সহকারী সম্পাদক এই সংবাদগুলি একত্রিত করিয়া, তাহাতে আবশ্যকমত উপদেশ দিয়া তাঁহার সহকারীদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া থাকেন। আবার পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অধিবেশনের সময় উহার সুবিস্তৃত কার্য্যবিবরণাদি আসিয়া থাকে। এই বিবরণ প্রকাশে অনেক সময় গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। কখনও যেরূপ আশা করা যায়, হয়ত তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়া গেল ; আবার কখন বা কম হইয়া পড়িল। এতদুভয়েরই জন্য সহকারী সম্পাদককে প্রস্তুত থাকিতে হয়। বেশী হইলে কাগজে তাহার স্থান সঙ্কুলান করিতে হয় ; আর কম হইলে তাঁহাকে স্বয়ং অন্য বিষয়ে লিখিয়া দিতে হয়।

এই সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়া তিনি হিসাব করিয়া দেন যে, ইহাদ্বারা কাগজের সমুদয় স্থান পূরণ হইবে ; আর কোন বিষয় লিখিবার আবশ্যক নাই। তদনুযায়ী কাজ চলিয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এমন সময়ে অর্থাৎ রাত্রি ১২ টা কি ১ টার সময় হয়ত তারযোগে আবার কোন বিশেষ সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সহকারী সম্পাদককে তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ প্রকাশের স্থান সঙ্কুলান করিতে হয়, এবং যতক্ষণ সম্ভব অপেক্ষা করিয়া, ঐ সম্বন্ধে যত কিছু নূতন সংবাদ আসে, তাহা বিশদরূপে লিখিতে দিতে হয়। এই সময়েই তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়া থাকে। কারণ, নূতন বিষয়টী যত স্থান অধিকার করিবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহা আন্দাজ করিয়া লইয়া, সেই হারে পূর্ব্বলিখিত যে সকল বিষয় তখনও কম্পোজ হইতে যায় নাই, তাহা কমাইতে হয়।

ইহার পর প্রুফ আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে। সহ সম্পাদক তাহা দেখিয়া আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনাদি করিয়া দিতে থাকেন। প্রুফ দেখিতে আরম্ভ করিবার অর্দ্ধঘণ্টা বা এক ঘণ্টার মধ্যে কাগজ ছাপা হইতে আরম্ভ হয় ; কিন্তু মুদ্রাঙ্কনের এত অল্প সময় বাকী থাকিতেও শেষ যে নূতন সংবাদ আসিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আবার তারযোগে সংবাদ পাঠাইয়া আরও নূতন খবরাদি জানিয়া লওয়া হয়।

এতদ্ব্যতীত সহকারী সম্পাদকের সহকারীদিগের নিকট হইতে লিখিত বিষয়গুলি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইলে, তিনি উহা দেখিয়া দিতে থাকেন। সময়ে সময়ে হয়ত কোন লেখা পছন্দ না হইলে তাঁহাকেই তাহা লিখিয়া দিতে হয়। আবার এই কার্য্য করিতে

করিতে তাঁহার নিকট যে ব্যক্তি যখন যে বিষয় সম্বন্ধে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আইসে, তিনি তাহাকেই তদ্বিষয়ে উত্তর দিয়া থাকেন। তাঁহার সহকারীরা তাঁহাকে প্রায়ই নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, কম্পোজিটারেরা ও নানাকথা জিজ্ঞাসা করে,—বিরক্ত না হইয়া তাঁহাকে সকলের কথারই সমানভাবে উত্তর দিতে হয়।

এইরূপে রাত্রি ৮টা হইতে রাত্রি প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া সহ-সম্পাদক বিশ্রামলাভ করিতে আরম্ভ করেন। ৮ ঘণ্টার মধ্যে দেখিতে দেখিতে কাগজের কার্য্য ও শেষ হইয়া যায় ; সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে ৫০, ৬০ স্তম্ভ বিষয় লিখিত, সংশোধিত, অক্ষরে গ্রথিত, ও তাহার প্রুফ সংশোধিত হইয়া যায় ঃ ব্যাপারখানা কি, বুঝিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

সহকারী সম্পাদকের সহকারীরা প্রায়ই নূতন লোক হইয়া থাকেন। সুতরাং তিনি ইহাঁদিগকে গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিয়া লন। ইহাঁরা কিন্তু একটু কাজের লোক হইলেই চম্পট দেন ; এবং তজ্জন্য সহ-সম্পাদকের বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। ইহার উপর আবার তাঁহার আইন কানুন সবিশেষ জানা চাই। নতুবা তাঁহার কোন অপরিপক্ক সহকারী দ্বারা হয়ত কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর—উক্ত সহকারীর কোন পূবব- আক্রোশবশতঃ—কোন গ্লানিপূর্ণ বা নিন্দার কথা বাহির হইয়া যাইতে পারে। এ সমস্তও তাঁহাকে বিশেষভাবে দেখিয়া দিতে হয়। নতুবা অনেক সময় অনর্থক নিগ্রহভোগ ও অর্থক্ষতি সহ্য করিতে হয়। ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বিলাতের কোন মিউনিসিপ্যাল সভার এক অধিবেশনে জনৈক সভ্য অপর কোন অনুপস্থিত সভ্যের নামে বলিয়াছিলেন, "তিনি ঘুষ লইয়াছেন।" কোন কাগজের সংবাদদাতা সভার কায্যবিবরণ পাঠাইবার সময় তাহা যথাযথ লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। সহ-সম্পাদকের সহকারীও তাহা না দেখিয়া ছাপিতে দিয়াছিলেন। সহ-সম্পাদকও ব্যস্ততা প্রযুক্ত উহা দেখিতে পান নাই ; সুতরাং উহা ঐরূপভাবেই বাহির হইয়াছিল। যাঁহার নামে ঐ কথা বাহির হইয়াছিল, পরদিবস তিনি ঐ কাগজের স্বত্বাধিকাবীর নামে তজ্জন্য অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। স্বত্বাধিকারী ৭, ৮ হাজার ব্যয় করিয়া উহা মিটাইয়া ফেলিলেন। সহকারী সম্পাদকের সামান্য ভুলে বিলাতে এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

এইরূপে ৬, ৭ ঘণ্টার মধ্যে এত বড় একখানি কাগজের কার্য্য শেষ হইয়া যায়। আবার এক একখানি সংবাদপত্র পরিচালনার জন্য কত লোক নিযুক্ত আছে তাহা দেখিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। এদেশ অপেক্ষা সুসভ্য দেশসমূহে সংবাদপত্রের আদর আছে। তথায় গ্রাহকের সংখ্যাও অধিক, এবং তাহারা তাহাদের দেয় টাকাও যথাসময়ে চুকাইয়া দিয়া থাকে। এদেশে ইহার কিছুই নাই। এই কারণে এদেশে সংবাদপত্রের এত অবনতি, আর বিলাত প্রভৃতি সুসভ্য দেশে সংবাদপত্রের এত উন্নতি।

(সময়)

১ বর্ষ ১২ সংখ্যা, চৈত্র ১৩০৫, মার্চ ১৮৯৯

নানাকথা, ব্রহ্মচারী, প্রশ্নোত্তর প্রণালী, একাদশ-সমিতি, সময়ের ব্যবহার, সার এন্টনি ম্যাকডলেন ও শিক্ষা,

ছাত্র-সমিতি

প্রতি বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ছাত্রদের এক একটী সভা আছে। কোথায় বা প্রধান শিক্ষক, কোথায় বা অন্য শিক্ষক উহার সভাপতি। কোথায় বা কেবল ছাত্রগণই হার সভাপতি। কোথায় বা কেবল ছাত্রগণই উহার সর্ব্বেসর্ব্বা। এই সভাগুলির প্রধান কর্ত্তব্যকার্য্য লিখিতে ও বলিতে শিক্ষা করা। আলোচনা ও নীতি বিষয়ক উন্নতি সাধন ও উহাদের অন্যতব উদ্দেশ্য। কেবল ক্রীড়া ও ব্যায়াম প্রভৃতির জন্য ও অনেক বিদ্যালয়ে "ক্লাব" আছে, উহাও একরূপ সভা।

প্রতি কার্য্যেরই সংস্কার ও উন্নতি আবশ্যক। বিদ্যালয় সংসৃষ্ট অনেকগুলি সভাই হ্রাস-বৃদ্ধি রহিত, কাজেই জড়ত্বপ্রাপ্ত। বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে কিন্তু উহাদের কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না। সেই রচনা, সেই বক্তৃতা, সেই আলোচনা, কোথায় বা পুরাতন বিষয়গুলি পযন্ত চক্রাবত্তনে দুই তিন বার ঘুবিযা উপস্থিত হইতেছে। এইরূপ সভার স্থিতি জলবিম্ববৎ ক্ষণস্থায়ী, সাগরতবঙ্গবৎ উত্তাল হইলেও অচিরেই সাগরের কুক্ষিগত, বিজলীঝরা সম দীপ্তিশালী হইলেও ক্ষণ প্রভাময়, কুসুমেব মত সুন্দর ও সৌরভময় হইলেও দিনান্তেই ভূপতিত। আকাশে অসংখ্য উল্কা পরিভ্রমণ করে, প্রতি রজনীতে কত উল্কাপাত আমাদের নয়নগোচর হয়। সভার আকাশেও সেরূপ কত ছাত্রসভা সময়ে লীলাসম্বরণ করিতেছে।

অনেকেব মতে, যাহারা এই জন্মিল এই মরিল, তাহাদেব না জন্মানই ভাল ছিল। এই সূত্রে প্রতিদিন অসংখ্যা কীটাণুর জন্ম মৃত্যু নিষ্ফল. অসংখ্য কুসুমেব জীবনলীলা অকারণ, অসংখ্য লহরী লীলা আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু আমবা বলি পদার্থ বা ঘটনা যত ক্ষুদ্র হউক, যত অল্প স্থায়ী হউক প্রত্যেকেই আত্মলক্ষ্য সাধন করিয়া পঞ্চত্ব লাভ করে। ছাত্র সভাগুলি ও নিয়তির ইঙ্গিতে জন্মলাভ ও উদ্দেশ্য সাধন কবিয়া তিবোহিত হয়।

পবিবর্ত্তনের দুইটী প্রকাব আছে ; এক প্রকাব ব্যক্তিগত বা ঘটনাগত, আর একপ্রকার সমাজগত বা সমষ্টিগত। প্রথমটীর নাম বয়োবৃদ্ধি, দ্বিতীয়টীব নাম যুগান্তর। শিশু পরিবর্ত্তিত হইয়া বালক হয়. বালক যুবক বৃদ্ধ হয উহাব নাম বয়োবৃদ্ধি। আব মনুষ্য পূবেব গর্ত্তে বাস করিত, পরে গৃহী হইল, এখন অট্টালিকায বাস করে উহার নাম যুগান্তব। যেমন বাস ভবন তেমনি আহার. যান প্রভৃতি বিষযেও যুগান্তর হইয়াছে। এইরূপ প্রতি ঘটনারই কালান্তরে যুগান্তর ঘটে।

বর্ত্তমান ছাত্র সমিতিগুলির দিকে তাকাইলেও উহাদের যুগান্তব কাল উপস্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। লিখিতে, বলিতে, আলোচনা করিতে, কিম্বা নীতিবিনির্ণয় করিতে কেবল উহারা এখন ব্যস্ত নয় ; আবৃত্তি, অভিনয় ও বিবিধ সাধু আমোদ উহাদের অঙ্গসঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু এখন আবার নবযুগের অরুণোদয়েব উপলব্ধি হইতেছে ; কারণ এ সকলে আর ছাত্র বৃন্দের মন উঠে না। বৃক্ষ পত্র যখন পাকিয়া যায, নীরস হয় তখনই নবপত্রোদ্গমেব আসন্ন কাল। যখনই কোন বিষয় নীরস বলিয়া প্রতীয়মান হয় তখনই উহার পরিবর্ত্তন কাল নিকটবর্ত্তী বুঝিতে হইবে। এবং তখন নতন কিছু প্রবর্ত্তিত না করিলে অচিরেই তাহার

বিনাশ সাধিত হয়। বর্ত্তমান ছাত্র-সমিতি গুলির নীরস- তাই উহাদের নূতন কিছু প্রবর্ত্তনার সূচনা করিতেছে।

প্রতি কার্য্যেরই দুইটী লক্ষ্য থাকে—এক সেই কার্য্য উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদন করা, আর এক ভবিষ্যৎ আর একটী কার্য্যের জন্য বর্ত্তমান কার্য্যটিকে সুদৃঢ় সোপান করা। সুতরাং কেবল বত্তমান কাযা উৎকষ্ট হইলেই কোন কায্যেরই সমাক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। বীজ বৃক্ষের জন্য, বৃক্ষ ফলেব জন্য, ফল আবার বীজোৎপাদনের নিদান। প্রাত কায্যই এইরূপ পরবর্তী আর একটি কায্যেব কারণ হইয়া দাঁড়াইলে উহাকে প্রকৃত কায্য বলা যাইতে পাবে। ছাত্র জীবনের কার্য্য সংসাব জীবনেব কারণ—বিকাশোন্মুখ কারণ হওয়া আবশ্যক। এদেশী ছাত্র জীবনের একটা কলঙ্ক আছে—ছাত্রের মুধ-সর্ব্বস্ব, লেখনা-সর্ব্বস্ব, সংসার জীবনে তাহাদের পূর্ব্বজীবনেব নাম গন্ধও থাকেনা। সকলের সম্বন্ধে এ কথা সত্য না হইলে ও অনেকের সম্বন্ধেই উহার প্রাতবাদ করা যায় না। ছাত্রেরা সভা সমিতিতে যেরূপ কথাবাত্তা বলে, যেরূপ আলোচনা করে, সুদীঘ রচনা করে, পরের জন্য দেশের জন্য ভাবে, কায্যক্ষেত্রে তাহা জল রেখাব ন্যায় অচিন হইয়া পডে। ইহার কারন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই, ছাত্র জীবনের সভা সর্মিতিতে ববিষ্য জীবনের উপাদান সংগৃহীত হয় না। ছাত্র জীবনের প্রধান লক্ষ্য কথা বা ভাবসংগ্রহ, সংসার জীবনের প্রধান লক্ষ্য কায্য। জীবন কাব্যেব প্রত্যেক সগেব অন্তেই পরবর্ত্তী সগেব আভাস থাকা প্রয়োজন। ছাত্র জীবনেব ভাবের সঙ্গে কায্যেব আভাস না থাকিলে ভবিষ্যৎ কায্য-ক্ষেত্রে সে ভাব শুখাইয়া যায়, কায্য প্রণালী অতীতের সাক্ষ্যদানে সমর্থ হয় না।

এই জন্য আমাদের ছাত্র সমিতি গুলির সংস্কার আবশ্যক। সে সংস্কার সংসার জীবনের কায্যের উপাদান হইবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাতে আমরা কায্যক্ষেত্রের শিক্ষালাভ করিতে পারি না। সে শিক্ষা লেখা পড়া কথাবার্ত্তাই পয্যবসিত হয়। আমাদের ছাত্র-সমিতিগুলি সে শিক্ষার উপায় করিলে উহাদের নূতন সংস্কার ও উপাদেয়ত্ব বৃদ্ধি হইতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ বিলাতের একটী বালক সভার উদ্দেশ্য এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই সভার নাম "সহৃদয় বালক সেনা" সভার নিয়ম এই:—

১। প্রত্যেক সভ্য জীবে দয়া করিবেন।

২। কোন সভ্য পাখীর বাসা ভাঙ্গিবেন না, বা পাখী দেখিলে গুলি করিবেন না।

৩। প্রত্যেক সভ্য আপন অপেক্ষা দুব্বলতর মনুষ্য বা পশু পক্ষীকে সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিবেন।

৪। কোন সভ্য "পারি না", "পারিব না" বা "করিব না" এই প্রকার কাপুরুষোচিত কথা ব্যবহার করিবেন না।

৫। অশ্লীল বাক্য কখনও উচ্চারণ করিবেন না।

৬। প্রত্যেক সভ্য পিতা মাতা ও শিক্ষকদিগকে হৃদয় মনের সহিত শ্রদ্ধা করিবেন ও সর্ব্বদা তাঁহাদের বাধ্য থাকিবেন।

বাধ্যতা, ভদ্রতা ও সদাচরণ শিক্ষা দেওয়া এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। ছাত্র জীবনে কিছু কিছু সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। এই জন্য সভার উদ্যোগিগণ বিবিধ উপায়ে, বালক সেনাদিগকে সদনুষ্ঠান করিতে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। দুই বৎসরে ৭৫ হাজার বালক এই সভার অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়া সভ্য হইয়াছে। কখন নানাপ্রকার বিশুদ্ধ আমোদ কখন বা সমবেত ভোজন, কখন বা পুরস্কার দান দ্বারা সভ্যদের নব নব উৎসাহ ও কার্য্য-যত্নে বিলাতে বালকেরা সাধু ও সৎকর্ম্মশীল হইতেছে।

এই আদর্শে আমাদের ছাত্র-সমিতি গুলির সংস্কার করিতে নিম্নলিখিত কয়েটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয় ;—

[১] সমস্ত জীবনের জন্য কয়েকটী ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। তন্মধ্যে দুই একটী "করিব" এবং দুই একটী "করিব না"। যেমন আমার আয় অতি সামান্য হইলেও তাহা মইতে নিয়মিতরূপে কিছু দান করিব। কায়মনবাক্যে দুর্ব্বলের সাহায্য করিব, প্রাণপণে কথা প্রতিপালন করিব ইত্যাদি। "করিব না" যথা—নেশাপান করিব না, মিথ্যাচরণ করিব না, পরের দ্রব্য হরণ করিব না ইত্যাদি।

এই সকল ব্রত দেশের ও সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে।

[২] আলোচনা কার্য্য-প্রতিপাদক হওয়া প্রয়োজন। সাধু ইচ্ছা বা সন্নীতি সমূহ কিরূপে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে তাহার প্রণালী ও উপায় প্রদশন বিষয়ক আলোচনা হইলে কার্য্যক্ষেত্রের পথ পরিস্কৃত হইয়া থাকে।

[৩] কায্য সাধন—যে সকল কার্য্যদ্বারা স্নেহ, দয়া সহানুভূতি প্রভৃতি সাধুগুণ বর্দ্ধিত হইতে পারে সতীর্থ বন্ধু বা প্রতিবেশীদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করা। পরোপকার, সেবা, বাধ্যতা শিক্ষাকরা যাইতে পারে এরূপ এক একটী অনুষ্ঠান আপনাকে নিযুক্ত রাখা।

কেবল বাচনিক শিক্ষা কাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে শক্তিদান করিতে পারে না। এইজন্য কথায় ভবিষ্য জীবনের যেরূপ আভাস দান করেন সেইরূপ হইতে পারেন না ; অনেকে একেবারে বিপরীত মূর্ত্তি ধারণ করিযা ছাত্র জীবনকে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনাময় স্বপ্ন মনে করেন।

ছাত্র জীবনেই কায্যক্ষেত্রের পথ পরিস্কার করিতে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যদ্বারা আপনাকে ভবিষ্যতে বড় বড় কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ছাত্র জীবনেই কার্য্য বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্‌গম হয় এবং তাহা দেখিয়াই লোকে বুঝিতে পারে এ বৃক্ষ না বনস্পতি হইবে।

এই জন্য আমাদের ছাত্র সমিতিগুলিকে কায্যক্ষেত্রের প্রবেশদ্বারা করা আবশ্যক। ভবিষ্য জীবনে ছাত্রগণ কিরূপ নীতির অনুসরণ করিবে, কিরূপ আমোদ প্রমোদ করিবে, কিরূপ পরিজন ও স্বদেশ বিদেশের হিতসাধন করিবে, ছাত্র সমিতিরই এই সকল লক্ষ্য থাকিবে। কিন্তু প্রত্যেক সমিতিরই লক্ষ্যানুযায়ী কায্য করিবার একটী বিভাগ থাকিবে। এখন শিশু হইতে অশীতিপরের কায্য করিবার সময়, এ সময়ে মুখ-সব্বস্ব ও লিপি-সর্ব্বস্ব হইয়া কাহারো থাকা বিহিত নয়। বর্ত্তমান সময়ের যদি কোন নাম করিতে হয় তবে উহার নাম "কার্য্যযুগ" হইবে। এই কার্য্য প্রবণ যুগে ছাত্র সমিতি গুলিও কার্য্যশক্তি সম্পন্ন হইলে নীরস ও জীবন্মৃত হইবে না।

আমিষ ভোজন।

আমিষ ভক্ষণের ঔচিত্যানুচিত্ত বিচার আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। হিন্দু জাতির আমিষ ভোজনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনা করিব বলিয়াই এ প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

মাংসাশী মানব জাতি পৃথিবীর আদিম অধিবাসী, জগতের বাল্য ইতিহাস সে তত্ত্বের প্রচারক। সেই আদিম কালের অসভ্য মানব আমমাংসে উদরপূর্ত্তি করিত। মানুষ পরে শস্য ভোজী হইলেও আমিষের স্বাদ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। জগতের আর্য্য অনার্য্য সকল জাতিতেই এই ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রহিয়াছে।

ভারতীয় আর্য্য জাতি মদ্য মাংস লইয়া পার্শীদের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে মদ্য মাংস লোভী একদল দাঁড়াইল, আর একদল শস্য ভোজনের পক্ষপাতী হইল। এইরূপে দলাদলির সৃষ্টি হইল, নিন্দা ও নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। প্রথমোক্তেরা বিতাড়িত হইয়া "প্রত্নৌকা" বা প্রাচীন বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া ভারতে প্রবেশ করিল। শস্য ভোজনের পক্ষপাতী দল "পারসীক" নামে অভিহিত হইল। যে আর্য্য ইতিহাস ঋষিবংশের পুণ্যকাহিনীতে পরিপূর্ণ তাঁহারা মদ্যপ ও আমিষভোজী এ কথা বিনা সাক্ষীতে অনেকেই গ্রহণ করিত চাহিবেন না। এই জন্য ভারতীয় প্রত্ন তত্ত্বের খনি রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের একটি কথা এখানে উদ্ধৃত করিলাম :-

"The relation of the agriculturists with the shepherds was not always of the most peaceful kind. Their respective habits of life were such as to make them antagonistic to each other. The shepherds had the most frequent opportunities of indulging in animal food and fermented drink, and they did not fail to make the most of these opportunities. The agricelturists were necessarily driven to depend principally on the products of their fields, and they on vegetable diet". (Rajendra Lal Mitra's Indo Aryans article XX. "Primitive Aryan")

অর্থ—কৃষক ও মেষপালক আর্যদিগের মধ্যে বড় সদ্ভাব ছিল না। তাহাদের স্বতন্ত্র আচার ব্যবহার এককে অন্যের শত্রু করিয়া তুলিয়াছিল। মেষপালকেরা মাংসাশী ও উগ্র-সুরাপায়ী ছিল এবং তত্তৎ বিষয়ে তাহাদের প্রচুর সুবিধা ও ছিল। কৃষকেরা অনন্যগতি হইয়া ক্ষেত্রজাত আহার্য্যেই সাধারণত: জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

সামাজিক ইতিহাসের রকটি বিচিত্র নিয়ম এই যে, "প্রত্যেক ব্যবহারই অত্যন্ত হইয়া সমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে।" প্রত্যেক নূতন আচার সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে অতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকে অত্যন্তে বাপান্ত দর্শন করিয়া পরাঙমুখ হইয়াছে, অত্যন্তের ভীষণ পরিণাম দেখিয়া উহার সীমারেখা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতীয় আর্য্যদিগের অনির্ব্বাণ আমিষ ক্ষুধার ও অতিবৃদ্ধি হইয়া মন্দাগ্নি হইল। অনাসক্ত শাক্যসিংহ "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" ঘোষণা করিয়া জীব হিংসার মুখে পাথর চাপা দিলেন। নিরামিষভোজী নববংশ জন্মধারণ করিল।

গয়াতে বিষ্ণুপদ আছে, চট্টগ্রামে বৌদ্ধ-তীর্থেও বিষ্ণুপদ আছে। এই বিষ্ণুপদ বুদ্ধের পদ চিহ্ন কিনা বিতর্ক হয়। দশ অবতারের মধ্যে বুদ্ধও বিষ্ণুর অবতার। সুতরাং বুদ্ধই বিষ্ণু নামে অভিহিত হওয়া বিচিত্র নয়। বৌদ্ধেরা বিষ্ণুপদকে বুদ্ধেরই পদাঙ্ক বলেন, হিন্দুরা বিষ্ণু পদ বলেন। বিষ্ণুপদ হিন্দু বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়েরই পূজিত। বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধদের মতই অহিংসা-পর। এই সকল সামঞ্জস্য দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় বৌদ্ধধর্ম্মই বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে হিন্দু সমাজে প্রচ্ছন্নরূপে স্থান লাভ করিয়াছে।

যাহউক, বৌদ্ধদিগের "অহিংসা পরমোধর্ম্ম:" মন্ত্র আর্য্যাচারের মেরুদণ্ড হইল। আমিষ ভোজন অধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্মের ঢোল আর্য্যগৃহে বাজিয়া উঠিল।

আর্য্য গৃহে মৎস্য মাংস লইয়া আবার দলাদলি আরম্ভ হইল, এবার সুরাপায়ী মাংসাশীরা শাক্ত এবং শস্যভোজীরা বৈষ্ণব নামে পৃথক হইলেন। কিন্তু দেশ ছাড়িয়া কাহাকেও অন্যত্র যাইতে হইল না। পুরাতন আর্য্যেরা যেমন পরস্পরের উপাস্য দেবতাকে গালাগালি করিতেন এবারও সে নিন্দা চর্চ্চার ক্রটি হইল না। মদ্য মাংস লইয়া আর্য্যদিগের বংশ পরম্পরা বিদ্বেষ ও শত্রু-ভাব বর্ত্তমান যুগে ও সংক্রামিত হইয়াছে। অখাদ্য মাংস ভোজনের জন্য বর্ত্তমান সংস্কার দলের প্রতি অন্যান্য হিন্দুদিগের দলাদলির ভাবই তাহার সাক্ষী।

বৈষ্ণবেরা তো নিরামিষভোজী হইলেনই, অন্যান্য হিন্দুদিগের উপরেও নিরামিষ আহারের সাময়িক ব্যবস্থা হইল। শাস্ত্রকারেরা ষষ্ঠী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে, রবিবারে, সংক্রান্তিতে এবং বর্ষবৃদ্ধি দিনে আমিষ ভোজন করিতে নিষেধ করিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা শারীরিক সুস্থতার জন্য, না কেবল নিরামিষের জন্য বিহিত করিলেন বলিতে পারি না।

সকল প্রকার আহার্য্য বস্তুরই বৃদ্ধির সময় পালন করিতে হয়। পশু পক্ষী মৎস্যাদিরও বংশ বৃদ্ধির সময় পালন না করিলে অচিরেই নির্ব্বংশ হইতে পারে। ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব" মৎস্য বংশ পালনের জন্য জাল ছিদ বড় করিবার জন্য এক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে চাহিয়া ছিলেন। তাহা হইলে ক্ষুদ্র মৎস্য গুলি বড় হইয়া আহার্য্য বস্তুর পরিমাণ অধিক হইতে পারিত। সে ব্যবস্থা আইনে পরিণত হয় নাই। জীবজননীদিগকে ভক্ষণ করিলে বংশ লোপের সম্ভাবনা বলিয়া হিন্দুরা মেষী, ছাগী প্রভৃতির মাংস ভোজন করেন না। পক্ষীও মৎস্যের সম্বন্ধে সেরূপ বিচার করিয়া আহার করা সর্ব্বদা সম্ভবপর নয় বলিয়াই সেরূপ বিধি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু পরিত্যক্ত হইলেও, যে যে মাসে পশু-পক্ষী-মৎস্য জননীরা সসত্ত্বা থাকে সে সে মাসে নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ফুল্লরার বারমাসীতে বলিয়াছেন--

"বৈশাখ হইল বিষ, বৈশাখ হইল বিষ।
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ॥"
"নিদারুণ মাঘ মাস, নিদারুণ মাঘ মাস।
সর্ব্বজন নিরামিষ কিম্বা উপবাস॥"

উদ্ধৃত কবিতা দুইটীতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৈশাখ ও মাঘ মাসে নিরামিষ আহার প্রশস্ত। বৎসরের মধ্যে বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ পূণ্যমাস বলিয়া হিন্দুদের মধ্যে গণিত। এই

তিন মাস অনেকেই নিরামিষ আহার করিয়া থাকে। এই তিন মাসে পশু, পক্ষী, মৎস্যাদির ছানা হইয়া থাকে বলিয়াই ওরূপ নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই সময়ে আমিষ ভোজনের ব্যবস্থা হইলে জীবমাতার সঙ্গে সন্তানগুলির বিনাশ ও অবশ্যাম্ভাবী ; কাজেই আহার্য্য জীবের অপ্রতুল হইবে। কোথায় ও দুর্গাপূজার পর হইতে শ্রীপঞ্চমী পর্য্যন্ত ইলীশ মৎস্য ভোজনের ব্যবস্থা নাই। সে সময়ে মৎস্য মাতা অণ্ড প্রসব করে এবং শিশু মৎস্যদিগকে প্রতিপালন করেন। সময়ে সময়ে এইরূপ নিরামিষ ভোজনের নিয়ম প্রাতপালন আহায্য জীবের বংশ বৃদ্ধির জন্যই করা হইয়াছে অনুমিত হয়।

অনারেবল জাস্টিস এম. সি. রাণাডে এম.এল.এল.বি.সি.আই.ই, সংবাদ

২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩০৬, জুন ১৮৯৯

নানা কথা, ব্রহ্মচারী

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : সাহসী কে?
উত্তর : যে সত্যবাদী।
প্র: বলবান কে?
উ: যে প্রেমিক।
প্র. স্বাধীন কে?
উ: যে নিষ্কাম।
প্র: ভীরু কে?
উ: যে স্বার্থপর।
প্র: জয় কাহার?
উ: প্রেমের।
প্র: বিজয়ী কে?
উ: ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, যাহার কামনা।
প্র: মুক্ত কে?
উ: ভগবানকে কর্ত্তারূপে যে দেখিতে পায়।
প্র: ক্ষমাপর কে?
উ: লোকের দোষ দুর্ব্বলতার মধ্যেও যে ঈশ্বরেচ্ছা দেখিতে পায়।
প্র: প্রেমিক কে?
উ: জিঘাংসু শত্রুর জন্য যিনি প্রার্থনা কবেন।
প্র: সূক্ষ্মদর্শী কে?
উ: সর্ব্বকার্য্যে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে যিনি দেখিতে পান।
প্র: স্থূলদর্শী কে?
উ: সকল কার্য্যে যিনি মানুষের কর্ত্তৃত্ব দর্শন করেন।

প্র: কে জীবিত?

উ: যাহার সহিত পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র, লতা পাতা ফুল ফল, বায়ু অগ্নি, পর্ব্বত পাহাড় ধূলি, অণু পরমাণু সকলেই কথা বলে।

প্র: কে মৃত?

উ: যাহার সহিত কেবল মনুষ্যই কথা বলে।

প্র: ভাবুক কে?

উ: যে কিছুই ভাবে না।

প্র: অহঙ্কারী কে?

উ: যে ফল প্রত্যাশী।

প্র: বিনয়ী কে?

উ: যিনি "বিষ্ণুপ্রীতে" সমস্ত কায্য করেন।

প্র: অবিকারী কে?

উ: যিনি অকর্ত্তা।

প্র: কে নিশ্চিন্ত?

উ: যিনি সূক্ষ্মদর্শী

প্র: কে ব্রাহ্মণ?

উ: যিনি অপকারীকে আশীর্ব্বাদ করেন।

প্র: কে চণ্ডাল?

উ: যে উপকারীকে অভিসম্পাত করে।

প্র: দুশ্চিন্তা কি?

উ: পাপের শাসন।

প্র: কে এমন চীৎকার করে যে, সমগ্র জগতের লোক শুনিতে পায়?

উ: মৃত্যু।

প্র: কাহার হাসির তরঙ্গ জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া যায়?

উ: সন্তোষের।

প্র: কাহাকে আঘাত করিলে জগতের সকলের গায় লাগে?

উ: সত্যকে।

প্র: কাহার অপমানে জগতের সকলের অপমান হয়।

উ: প্রেমের।

প্র: কাহাতে জগতের নর নারী সকলে মুগ্ধ?

উ: সরলতাকে।

প্র: বালক সুন্দর কেন?

উ: সরল বলিয়া।

প্র: যুবক সুন্দর কেন?

উ: উৎসাহী বলিয়া।

প্র: প্রৌঢ় সুন্দর কেন?
উ: অক্লান্তকর্ম্মা বলিয়া।
প্র: বৃদ্ধ সুন্দর কেন?
উ: সমস্ত প্রলোভনের মধ্যে স্থির চিত্ত বলিয়া।
প্র: কে উৎকৃষ্ট আচার্য্য?
উ: যিনি কিছুই শিক্ষা দেন না, কেবল শিক্ষা করেন।
প্র: কে উৎকৃষ্ট শিষ্য?
উ: যিনি কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না, নিঃশব্দে সমস্ত শিক্ষা করেন।
প্র: কে উৎকৃষ্ট পাঠক?
উ: যিনি প্রকৃতি গ্রন্থ পাঠ করেন।
প্র: জগতের সকলেই কাহা হইতে ভয় পায়?
উ: মৃত্যু হইতে।
প্র: কোন ধনের সব্বাপেক্ষা পরিমিত ব্যয় আবশ্যক?
উ: সময়ের।
প্র: জগতে একেবারে শব্দ নাই কাহার?
উ: গাম্ভীয্যের।
প্র: শত্রু নাই কাহার?
উ: বোবার।
প্র: কোন বিষের অনিব্বাণ জ্বালা?
উ: পরশ্রীকাতরতার।
প্র: কে উৎকৃষ্ট কর্ত্তা?
উ: যিনি দোষ ত্রুটির জন্য অনুজীবীদি' কে দণ্ডদান না করিয়া সৎপথে লইয়া যান, যিনি দণ্ডদাতা নন, শিক্ষক।
প্র: আকাশ অপেক্ষাও উচ্চে কি উঠে।
উ: উৎসাহ।
প্র: কুসুম অপেক্ষাও সুন্দর কি?
উ: প্রফুল্লতা।
প্র: পাষাণ অপেক্ষা দৃঢ় কি?
উ: প্রতিজ্ঞা।
প্র: কাহার অন্ত নাই?
উ: দীর্ঘসূত্রতার।
প্র: কাহার দিন রাত নাই?
উ: অলসের।
প্র: সব জান্তা কে?
উ: মিথ্যাবাদী যে।
প্র: কাহার রাজত্বের পতন নাই?
উ: ন্যায়ের।

শিক্ষার যুগান্তর

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

আর একটী কথা ভাবিবার। নূতন প্রণালীতে বর্ত্তমান শিক্ষার কোন হানি হইবে কিনা? বর্ত্তমান শিক্ষার অর্থ ভাষা শিক্ষা। এখন যেরূপ ভূগোল ও ইতিহাসের কতগুলি অকেজো নাম মুখস্থ করান হয় তাহার কিছু কমাইলে যে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে বলা যায় না। পাঠনার কার্য্যকারিতা পুস্তকের পৃষ্ঠার উপর তত নয় যত পুস্তকের ভাষা এখন উন্নত হইয়াছে, লর্ড মেকলে যে কথা বাঙ্গালা শুনিয়া বলিয়াছিলেন The dialects commonly spoken among the natives of this part of India contain neither literary nor scientific information and are moreover so poor and rude এখন আর সে বাঙ্গালা নাই।

প্রস্তাবিত প্রণালীর দুইটি উদ্দেশ্য, (১) শিশুর শিক্ষার উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রবর্ত্তন, (২) কার্য্যকরী শিক্ষাদান। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী প্রবর্ত্তনা দ্বারা শিশু শিক্ষার ভূরি উন্নতি হইবে। সকলেই স্বীকার করেন, সে শিক্ষার হাতে হাতে ফল দেখিয়া তদ্বিষয়ে কেহ আপত্তি করিতে পারেন না। কিন্তু ব্যয় বাহুল্য ভয়ে অনেকেই উহার সফলতা বিষয়ে নিরাশ হন। একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক যে যে যে দেশে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী বহুকাল হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই সেই দেশের তুলনায় এ দেশে এই নূতন প্রণালী আপাতত বৃক্ষের তুলনায় অঙ্কুর মাত্র হইবে। ইহাতেই কাঠিন্য থাকে না থাকিলেও তাহা দোষ বই গুণ নয়। নূতন প্রণালী বহু বাধা বিঘ্নের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে বলিয়া উহার মাথা উঠাইতে অনেক সময় কাটিয়া যায়।

অনেকেই নূতন প্রণালীর বিরোধী, অনেকে ফুল না দেখিয়া বৃক্ষের গুণ গ্রহণ করিতে অসমর্থ। এই শেষোক্ত দলের প্রবোধার্থ যত শীঘ্র ফল ফলান যায় ততই মঙ্গল। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী সত্বর ফলবতী করিতে হইলে একটুকু ব্যয় বাহুল্যের আবশ্যক হইবে। বিশেষতঃ কেবল হাটে বাজারে যাহা পাওয়া যায় সে সকল লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে, উহাতে সকলের সামান্য বুদ্ধি জন্মিবে এবং শিক্ষার ব্যাঘাত হইবে। বাঙ্গলাকে সংস্কৃত ইংরেজীকে ল্যাটিন করিলেই উহা মন্ত্র হয়। কথায় ও মন্ত্রে অনেক প্রভেদ, ভাব ভক্তির অনেক বিভিন্নতা। আমাদের দেশের সামান্য জিনিস গুলি বাঙ্গলা কথা, সেগুলিই একটুকু মাজিলে ঘসিলে, ইংরেজের হাত ছোঁয়াইলে মন্ত্র হয়, তখন আমরা সকলেই উহার শোভা দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হই। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষাদান করিবার দ্রব্য গুলি অযত্ন সুলভ হইলে বহুকাল ফল প্রত্যাশায় অতিপাত করিতে হইবে। এইজন্য দ্রব্যগুলি সামান্য হইলেও মাজিয়া ঘসিয়া উহাদের একটুকু শ্রীসম্পাদন করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে যে জিনিস দিয়া শিক্ষা প্রদত্ত হইবে সেগুলির প্রতি শিক্ষাদাতার যত্ন ও আদর চাই যত্ন ও আদরই বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি করিবার প্রধান সঙ্কেত।

শিক্ষাদানের উপকরণ গুলি পরিপাটী করিয়া একটী আধারে রাখিতে হইবে। নচেৎ শিক্ষা দিবার সময় এখান হইতে একটুকু বাঁশ ওখান হইতে একটুকু বেত লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহার ফলোপধায়িতা একবারে নষ্ট হইবে। আমাদের দেশে সকল শিক্ষাই যেমন তেমন করিয়া দেওয়া হয় ; কিণ্ডারগার্টেনে সে প্রণালীর অভিনয় হইলে সে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বিফল হইবে। শিশুদের সৌন্দর্য্যও শৃঙ্খলা জ্ঞান মেঘে ঢাকিবে। এইজন্য সামান্য দ্রব্য গুলি ও সাজাইয়া ও পরিপাটীরূপে রাখিতে কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। একদিকে শিক্ষকের সেই সেই যত্ন ও আদর ; অন্যদিকে আধার পাত্রটীর সৌন্দর্য্য ও গঠন শিশুদিগের অন্তরে সে শিক্ষার মহার্ঘতা ও উপাদেয়তা স্বতঃই উদ্রেক করিবে। একটী কেরোসিনের সামান্য বস্ত্রও বস্তুর আধার করিলে উহাকে সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া চিত্রবঞ্জন করিতে হইবে। দ্রব্যের মুল্য যাহাই হউক উহাদিগকে সুসজ্জিত করিতে এবং উহাদের আধারের জন্য ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে। কমিটি যে অল্প ব্যয় দেখাইয়াছে তাহাতে সুসম্পন্ন হইবে না।

ভারতের সমগ্র শিক্ষা যে সংস্কারের প্রার্থী কিঞ্চিৎ ব্যয় বাহুল্য বলিয়া তাহার প্রতিকূলে হস্তোত্তোলন করা কাহারো কর্ত্তব্য নয়। প্রথমে অতি সামান্যাকারে হইলেও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দ্বারা উহার আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি সম্পাদিত হইবে।

কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী সত্বর ফলপ্রদ করিতে প্রথমতঃ কতকগুলি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেই সেই বিদ্যালয়ের গৃহ, দ্রব্য সামগ্রী সমুদয়ই আদর্শস্থানীয় হইবে। সেই সকলের অনুকরণে অন্যান্য বিদ্যালয়ের অবস্থা ক্রমে উন্নত হইবে। নিকটস্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা মধ্যে মধ্যে সেই সকল বিদ্যালয় দেখিয়া আদর্শ লাভ করিবেন। এই সকল আদর্শ বিদ্যালয় অবশ্যই সরকারী ও বোর্ডের স্কুল হইবে, এবং নুতন সংস্কার প্রবর্ত্তনার জন্য সরকারী ও বোর্ডকে অধিক ব্যয় বহন করিতে হইবে ; অথবা ব্যয় সাম্যরক্ষার্থ কোথায় বা ব্যয় লাঘব করিতে হইবে।

কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী যুগপৎ সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলেও আদর্শ বিদ্যালয় না থাকিলে সত্বর উহার সুফল ফলিবে না। নমুনা প্রদর্শনের উপর নুতন সংস্কারের সাফল্য বহু পরিমাণে নির্ভর করে।

নুতন প্রণালীর দ্বিতীয় ফল—কার্য্যকরী শিক্ষার প্রবর্ত্তন। পাঠশালা সমূহে উহার হাতে খাড় হইবে। অচিরেই বিশেষ বিশেষ গ্রাম্য বিদ্যালয়ে কৃষি ও দেশী শিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন হইবে। সত্য বটে, এখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অপেক্ষা শিল্প ব্যবসায়ীরা ভাল শিক্ষা দান করিতে পারে। কিন্তু প্রণালী মতে শিক্ষার গুণে অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই সে ভাব তিরোহিত হইবে। এখন যেমন বাড়ীতে লেখা পড়া না শিখাইয়া সকলেই স্ব স্ব সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া থাকেন, কালে স্থানে স্থানে শিল্পবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হইলে সুফল দেখিয়া সকলেই শিক্ষার্থী সন্তানবর্গকে তথায় প্রেরণ করিবেন। সকল সভ্য দেশেই ভাল বাল কারিকর শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্র। এখন বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা দান আমারে দেশে আকাশ-কুসুমবৎ অলীক। জাপানে উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়েই বিশেষ ছাত্রদের জন্য কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।

জাপানে যেমন কল-কারখানার বিদ্যালয় আছে আমাদের দেশেও সেরূপ উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় হইয়াছে। কেবল চাকরি করিয়া খাইবার উপযোগী শিক্ষা রহিত করিয়া সেরূপ শিক্ষার কথা বলি না ; কিন্তু তদতিরিক্ত কৃষি শিল্প ও কলকারখানা প্রভৃতির শিক্ষা দান আবশ্যক হইয়াছে। তাহা হইলে দেশের লোক এই কঠিন জীবন সংগ্রামের দিনে পরিশ্রান্ত কলেবরে দু মুঠো অন্য মুখে তুলিয়া দিতে পারিবে। এখন গবর্ণমেন্ট মসিজীবীদিগকে চাকরি দিয়া কূল কিনারা পাইতেছেন না বলিয়াই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য রূপান্তরিত করিয়া ব্যবসাদারগণের সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করিতেছেন। এই প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তিত শিক্ষার উচ্চ অঙ্গ হইবে দেশের কলকারখানার উৎপত্তি। যদি সে উদ্দেশ্য সাধনার্থ গবর্ণমেন্ট সেরূপ উচ্চ বিদালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়েও শিল্প ও কৃষির উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। প্রস্তাবিত প্রণালী অতি অল্পকাল মধ্যেই দেশের আদৃত ও পরিগৃহীত হইবে।

বিলাতে কি ইউরোপের অন্যান্য দেশে ব্যবসাদার কোম্পানিরাই কলকারখানা স্থাপন ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে বিদ্যালয় করিয়া হাতে কলমে সেই সকল নিম্মাণ করিবার শিক্ষা না দিলে দেশের অবস্থা ফিরিবে না। জাপানে যেমন বিবিধ যন্ত্র নিম্মাণ ও উহাদের পরিচালনা শিক্ষা দেওয়া হয় আমাদের দেশেও সেইরূপ শিক্ষা দিবাব সময় হইয়াছে। অন্যথা সব্বপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্য পরহস্তগত হইবে, দেশীয়েরা অন্নাভাবে দুর্ভিক্ষের অশনিপাতে দলে দলে খুন হইবে।

(ক্রমশঃ)

অভিনিবেশ, জন হেন্‌রী পোটাল্লজি, ট্রান্সভাল, চাকমাদিগের পিণ্ডদান

মধ্য ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য ১৯০১ সন

Eastern Group অর্থাৎ ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের জন্য---ইংরেজী গদ্য ও পদ্য—ভোলা নাথ পাল কৃত--Moral Instructor মূল্য আট আনা (১) Tale of a pin (২) Demetrius and Antiphilus (৩) Castles in the Air (৪) James Ferguson (৫) Solon and Croesus (৬) King Porsenea and the Romans (৭) The story of Arion , পরিত্যাগ করিয়া।

বাঙ্গালা গদ্য---রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা হইতে সঙ্কলিত "সংগ্রহ মঞ্জুরী , যষ্ঠপাঠ ; দ্রোপদী ও দশমপাঠ রুক্ষপাশ্ব নকুল ব্যতীত। মূল্য ।।. আনা।

বাঙ্গালা পদ্য---কন্দপ মোহন ঘোষ কৃত নবপদরাজী, মূল্য ছয় আনা, ৯ম কবিতা (স্বর্ণময়ী) ও ১০, কবিতা (বঙ্গে বিজয়া দশমী) বাদে।

Southern Group--অর্থাৎ প্রেসিডেন্সী, বৰ্দ্ধমান ও উড়িষ্যা বিভাগের জন্য Longman কৃত "Ship" Literary Readers–Book IV মূল্য—১শিং ৪ পেন্স ১---৩, ২৯—৩১ এবং ৪০ হইতে ৪৮ পাঠ বাদ দিয়া।

বাঙ্গালা গদ্য—অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত চারুপাঠ ৩য় ভাগ মূল্য দশ আনা। (১) মেঘ ও বৃষ্টি ; (২) তাড়িত, বজ্র ও বিদ্যুৎ ; জোযার ভাটা ; (৪) ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যতীত।

বাঙ্গালা পদ্য—কবিতাবলী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা হইতে সংগৃহীত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। ৯ম, ১১শ, ১৭শ,এবং ১৮শ, সংখ্যক কবিতা বাদ দিয়া।

Northern Group--রাজশাহী, পাটনা, ভাগল পুর ; এবং ছোটনাগপুর বিভাগের জন্য R. M. Dutt কৃত Easy Readings from English Literature মূল্য বার আনা মাত্র। পদ্যাংশে—১১শ, ১৪শ, ১৫শ, ১৭শ, ২৫শ, ২৪শ, ৩০শ, ৩২শ, ৩৩শ, ৩৪শ, ৩৮শ এবং ৪০শ পাঠ, (পদ্যাংশে) ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ এবং ২৩শ পাঠ বাদে।

বাঙ্গালা গদ্য—রাখালদাস চক্রবর্ত্তী কৃত ; নীতিও চরিত্র মূল্য আট আনা। ৩য় ও ১০ম পাঠ ব্যতীত।

বাঙ্গালা পদ্য—দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী কৃত কবিগাথা মূল্য আট আনা। ৯ম, ১০ম, ১২শ, ১৩শ, ১৫শ, ১৬শ, ১৯শ, ২২শ, ২৫শ, ২৬শ এবং ২৭ সংখ্যক কবিতা বাদ দিয়া।

উচ্চ প্রাইমেরীর পাঠ্য সন ১৯০১।

চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ

বিজ্ঞান—সংক্ষিপ্ত পদার্থ-দর্শন।—মহেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য কৃত।

কৃষি—কৃষিচন্দ্রিকা—উমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত কত।

রাজশাহী ও বর্দ্ধমান বিভাগ।

বিজ্ঞান—প্রাথমিক প্রাকৃত-দশন।—কুমুদিনী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত।

কৃষি—কৃষিসোপান।—গিরিশচন্দ্র বসু কৃত।

২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩০৭, আগস্ট ১৮৯৯

নানাকথা, আচায্য. শ্রদ্ধা, তিনজন বড়লোক, তেত্রিশ কোটি দেবতা,

বাঙ্গলাশিক্ষা ও ট্রেণিং স্কুল।

পণ্ডিত হইবার জন্যশিক্ষা করার ইচ্ছা, বহুকাও হইল এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সংস্কৃতি ও আববীর ভূবি চর্চ্চা যখন ছিল, তখন এক একদিন ছিল, তখন লোকে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে সাধ করিত অথবা তখন লোকে কেবল পণ্ডিত হইবার জন্যই এদেশে লেখাপড়া অভ্যাস করিত। সে কাল মবিযা আবরা জন্ম লাভ করিয়াছে। কিংবা মাতৃগর্ভে অবস্থান করিতেছে ; ক্রমশঃই সে ইচ্ছা আবরা নবাবতার শিশুর ন্যায় প্রতীয়মান হইবে আশা করা যায়।

কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ যেরূপ লেখাপড়ার প্রয়োজন তাহাই বহুকালাবধি এদেশের লক্ষ্য স্থানে অবস্থান করিতেছে। কাজ কর্ম্মের মধ্যেও আবার সরকারি কাজ কর্ম্মই শিক্ষাতরীর কর্ণধার, অন্যান্য কাজ কর্ম্ম দাঁড়ী বলিলেও অত্যুক্তি হয়, যে আরোহী সাধ করিয়া দু একবার দাঁড় টানে, সে আরোহী হইতে পারে।

যদিও ওয়াবেণ হেষ্টিংস ১৭৮১ সনে কলিকাতা কলেজ স্থাপন কবিয়া ইংবেজী শিক্ষাব প্রথম দ্বাব উদঘাটন কবেন তথাপি সবকাবী কাজ কৰ্ম্ম পাবস্য ভাষাব একাধিপত্য থাকায় ইংবেজী শিক্ষা মস্তকোত্তলন কবিতে পাবে নাই। ১৮৩৫ সনে লর্ড মেকলেব অকাট্য যুক্তি পবম্পবা ইংবেজী ভাষা দেশীয় প্রাচীন ভাষাব উপবে বিজয় লাভ কবিল, ইংবেজী আফিসেব ভাষা হইবে সিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু এই হইতে ১৮৫৭ সন পযন্ত সংস্কৃত আববী প্রভৃতি ভাবতীয় ভাষাব সঙ্গে ইংবেজিব বাদ বিসংবাদ একেবাবে নিষ্পত্তি হইয়া যায় নাই। ১৮৫৭ সনে স্যাব চার্লস উডেব প্রসিদ্ধ ডিচপাচ অনুসাবে লর্ড ডালহৌসীব শাসনকালে ইংবেজীব ১১শ বৃহস্পতি হইল কলিকাতা মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালযেব সৃষ্টি হইল নানা স্থানে কালেজ ও হাইস্কুল স্থাপিত হইল। পক্ষান্তবে এই প্রসিদ্ধ লিপিই দেশীয় শিক্ষাব ভূযসী উন্নতি সাধন কবেন দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা সবকাবী পবিদর্শকাবীনে স্থাপিত হইল, বঙ্গদেশেব নানা স্থানে বাঙ্গলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে সব চার্লস উডেব নাম ভাবতেব শিক্ষা দপণে চিব মুকুবিত ও দীপ্যমান হইয়া বহিল।

শ্রীবামপুবেব পাদ্রি সাহেববাই বাঙ্গলাকে প্রকৃত ভাষায় পবিণত কবেন। ১৮০০ সনে সুপ্রসিদ্ধ কেবি সাহেব শ্রীবামপুব প্রচাব জন্যই এদেশে লেখাপড়া অভ্যাস কবিত। সে কাল মবিযা আবাব জন্ম লাভ কবিযাছে। কিন্তু বা মাতৃগর্ভে অবস্থান কবিতেছে ক্রমশ ই সে ইচ্ছা আবাব নবাবতাব শিশুবদন যখ প্রতীযমান হইবে আশা কবা যায়।

কাজ কৰ্ম্ম নির্বাহার্থ যেরূপ লেখাপড়াব আশ্রম স্থাপন কবেন। পাদ্রি মার্সম্যান ও ওয়াড সাহেবও তাই ব সাহায্যকাবী হন। তাহাদেব যত্নে বাঙ্গলায় ব্যাকবণ অভিধান সংবাদপত্র ও বাইবেল প্রচাবিত হয় তাহাদেব যত্নেই বাঙ্গলা গদ্য লিখিবাব যথা সম্ভব বিশুদ্ধ প্রণালী ব্যবস্থাপিত হয়। পবিণামে বাঙ্গলা এ পৃথিবীতে একটি ভাষারূপে দণ্ডাযমান হইবে তাহাব সূত্রপাত তাহাবাই কবেন

লর্ড বেণ্টিংকেব সময় ইংবেজী ভাষা দেশীয় ভাষাব উপব ডিক্রি পাইলেও ডিক্রিজাবি কবিযা দখল লইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানে বন্দোবস্ত সাহায্য দানাদীব ব্যবস্থা কবিযা বাঙ্গলা শিক্ষায উৎসাহদান কবেন এবং বেন্টিংকেব সময়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ দেশীয় ভাষাব মুখে একটুকু জল সঞ্চাব হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জেব সময় হইতেই লাভ কবে তিনি নিয়ম কবেন "যাহাবা সবকাবী বিদ্যালয শিক্ষা লাভ কবিয়া বিশেষ পাবদর্শীতা প্রদর্শনে সমর্থ হইবে সবকাবী কার্য্যে তাহাদেবই অগ্রগণ্য দাবি হইবে।" ১৮৩৫ সন হইতে বিদায পাইলে বাঙ্গলা ভাষা শনৈঃ পাদাবিক্ষেপে সে ক্ষেত্রে অবতবণ কবে, এবং বঙ্গদেশেব সকায নিম্ন কাৰ্য কৰ্ম্ম বাঙ্গলাযই চালিত থাকে। এই সময় বাঙ্গলাব একাদশ বৃহস্পতি। এই সময় হইতে কযেক বৎসব উকীল, মোক্তাব, মুনসেফ, ডিপুটী প্রভৃতিব কার্য্যেও বাঙ্গলাভিজ্ঞেব অধিকাব ছিল। একদিকে যেমন বিশ্ব বিদ্যালযে শিক্ষাব উন্নতি হইতে থাকে অন্য দিকে বাঙ্গলাব ও কম উন্নতি হয় নাই। দেশীয় ভাষায ডাক্তাবি শিখিবাব জন্য মেডিকেল স্কুল সর্বত্র স্কুল প্রভৃতিব সৃষ্টি হইয়া বাঙ্গলা শিক্ষাব যথেষ্ট উন্নতি সাধন কবে।

১৮৫৮ সনে কলিকাতায়, ঢাকায় হুগলীতে নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। নর্ম্মাল স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা চর্চ্চার সিংহদ্বার খুলিয়া গেল। গ্রামে গ্রামে সার্কেল স্কুল, সাহায্যকৃত স্কুল স্থাপিত হইল। সে সকল স্কুলে শিক্ষক যোগানই নর্ম্মাল স্কুল গুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হইলেও আফিসের মোহরের গিরি, ও উকীল মোক্তারি প্রভৃতি কার্য্যেও তাহাদের অনধিকার ছিল না। মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই ওকালতি মোক্তারি পরীক্ষাদানের অধিকার জন্মিত, সাভে মেডিকেল, টেক্‌নিকাল স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারিত, নর্ম্মাল স্কুল তো তাহাদেরই একচেটিয়া ছিল।

বাঙ্গলা শিক্ষা সরকারী কাজকর্ম্মে উৎসাহের মধ্যাকাশ অধিকার করিয়া এখন অস্তাচল শিরে গমন করিয়াছে। মোক্তারি পরীক্ষাদানের অধিকার বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়াছে। এখন ইংরেজী না জানিলে মুটে মজুরের কাজও ভাল করিয়া চলে না। সাধারণ কাজের তো কথাই নাই, জমীদারেরা পর্য্যন্ত ইংরেজী কর্ম্মচারী অন্বেষণ করেন।

মেকলে দেশীয়দের ইংরেজী শিক্ষার যে সকল বৈজ্ঞানিক হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন সে সকলের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়াও, বলা যাইতে পারে যে, ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য সৌকর্য্যই যে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কেন্দ্রে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই ইংরেজী অভিজ্ঞ প্রার্থীর সংখ্যা যত বাড়িতে লাগিল ততই বাঙ্গলাভিজ্ঞদের সরকারী কার্য্যের এলাকা সঙ্কীর্ন হইতে লাগিল। ক্রমে সরকারী কার্য্যে এবং সর্ব্বত্রই ইংরেজীতে লিখিবার আজ্ঞা জারি হইল। এখন বাঙ্গলা রাজকার্য্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, জমীদারদের আফিসেও বাঙ্গলা মেকী টাকা।

একে একে মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষোত্তীর্ণের সমস্ত অধিকার বিলোপ হইয়াছে। এখন উহারা কেবল ট্রেণিং স্কুলে পড়িবে, আর ভর্ণাকিউলার মাষ্টারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মধ্য স্কুলে ও প্রাইমারী পাঠশালায় শিক্ষক হইবে। অর্থাৎ মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষা কেবল ভর্ণাকিউলার মাষ্টারসিপ পরীক্ষা কেবল মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষায় ছাত্র তৈয়ার করার জন্য, যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা।

মোক্তারি পরীক্ষার অধিকার বিলোপ হইয়াছে অবধি লোকের বাঙ্গলা পড়িতে আর রুচি নাই। আমাদের দেশে লেখা পড়ার এক মাত্র বা মুখ্য উদ্দেশ্য সরকারী ও অন্যান্য কাজকর্ম্মে উপযুক্ততা লাভ করা। বাঙ্গলা পড়িয়া যখন সে উপযুক্ততা জন্মেনা, তখন লোকে সে দিকে কেন যাইবে? ইংরেজী সর্ব্বপ্রকার চাকরির নিদান বলিয়া সকলেই সে দিকে ছুটিয়াছে। অতি অল্প কালের মধ্যে অনেকগুলি মধ্য বাঙ্গলা স্কুল মধ্য ইংরেজী স্কুলে এবং অনেকগুলি মধ্য ইংরেজী স্কুল এন্ট্রেন্স স্কুলে পরিণত হইয়াছে ; এবং এইরূপ আরো হইবে। মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমেই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া উঠিবে এবং দেখিতে দেখিতে গোষ্পদের জলের ন্যায় আপনিই শুকাইয়া অচিন হইয়া পড়িবে কাজেই ট্রেণিং স্কুলগুলি ও পতনোন্মুখ হইয়া থাকিবে।

দেশের প্রকৃতি ও রুচির সঙ্গে লড়াই করিয়া বাঙ্গলা শিক্ষার উন্নতি সাধন করা বৃথা চেষ্টা। বরং প্রকৃতি ও রুচির অনুকূল বাতাসে শিক্ষাতরি চালাইয়া দিলে দ্রুত বেগে উহা

অগ্রসর হইবে। বৃক্ষের মরা ডাল পচিয়া পচিয়া পড়িবার অগ্রে কাটিয়া ফেলাই উৎকৃষ্ট মালীর কার্য্য। বরং কৃতীমালী বৃক্ষশাখা শুকাইতে আরম্ভ করিলেই ছেদন করিয়া উহার জীবন রক্ষা করে। সেইরূপ মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষা প্রণালী অচিরেই উহক বা চিরেই হউক যখন ধ্রুব বিনষ্ট হইবে, তখন টানাটানি করিয়া উহার জীবন রক্ষার চেষ্টা না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র উহা উঠাইয়া দেওয়াই দেশের রুচি-সঙ্গত ও কল্যাণ কর।

বঙ্গদেশে এখন অন্ততঃ কিছু কাল মধ্য ইংরেজী লইয়াই তৃপ্ত হইবে। শিক্ষার সঙ্গেও একটুকু ইংরেজী স্তান থাকিলে কাজ কর্ম্ম, চলাফিরা, চাকরি প্রভৃতির সুবিধা হয়। বড়লাট লর্ড কার্জ্জন সত্যই বলিয়াছেন "প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেই এখন ইংরেজীব দরকার ; এই নিমিত্ত অতি অল্প মাত্র ইংরেজী জানিলেও উপকার দর্শে।" তাঁহার এই কথা গুলি ইউক্লিডের একটি প্রতিজ্ঞার সামান্য কথনের ন্যায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং সমগ্র ভারতবয উহার প্রমাণ। এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বহুপ্রচার আবশ্যক ; ইহা যেমন বড় লাটেব, তেমনি চিন্তাশীল প্রতিজনের, তেমনি আপামর সাধারণের ধারণা। এই জন্য মধ্য বাঙ্গলা পরীক্ষা উঠাইয়া দিয়া কেবল মধ্যইংরেজী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে সকলেই ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইবে।

যাহারা মধ্যইংরেজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহাদেরও ট্রেণিং স্কুলে প্রবেশধিকার থাকিবে। ট্রেণিং স্কুলের অন্যান্য পাট্য কিঞ্চিৎ কমাইয়া ইংবেজী পাঠ্যভুক্ত করিলে মাষ্টাবসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকগণই মধ্যইংরেজী স্কুলে ইংরেজী পডাইতে সক্ষম হইবেন।

বিগত কয়েক বৎসরের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ইংরেজী মাষ্টারসিপ পরীক্ষার জন্য যে শিক্ষাদান প্রণালীর প্রবত্তন হইয়াছিল তাহা উষর ভূমিতে বীজ বপন হইয়াছে। ওরূপ শিক্ষা বা শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য দেশ প্রস্তুত নয়, অথবা কখনই হইবে না। ছোট লাট সাহেব সত্বরেই ইংরেজী ট্রেণিং ক্লাসগুলির ব্যবস্থান্তর কবিতে বলিযাছেন। এবারের পরীক্ষায় কটক ও ঢাকা হইতে এক এক জন কেবল পাটনা হইতে তিন জন উত্তীণ হইয়াছেন। ট্রেণিং ক্লাস পূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছে, কালকাতা হইতে এবার একজনও উত্তীণ বইতে পারে নাই। সুতরাং ইংরেজী ট্রেণিং ক্লাসগুলির অন্য ব্যবস্থা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই ইংবেজী ক্লাসগুলি নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষিত ইংরেজী শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। এখন পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল, যাহারা এন্ট্রেন্স বা এফ্ এ পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়াছে তাহারা নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে অভিলাষী নয়। নিম্ন শিক্ষকদেব বেতন ২৫, ৩০ টাকার অধিক নয় ; এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারীরাও ৪০, ৫০, টাকার সরকারী শিক্ষকতা কাজের জন্য চাতকের ন্যায় চাহিয়া থাকেন। সুতরাং এন্ট্রেন্স বা ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষোত্তীর্ণেরা শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া কঠোব জীবন সংগ্রাহে ৩০ টাকায় জীবন উৎসগ করিতে সম্মত নন। তাহারা ২০ টাকাব কেরাণী হইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে তাকাইয়া থাকিবেন ; না হয় উকীল মোক্তার হইয়া নিজেরাই ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের লৌহময় কপাট উদ্ঘাটনে প্রাণপণে আঘাত করিবেন, তথাপি নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক হইবেন না। অগত্যা হইলেও সহস্র সুযোগ অন্বেষণ করিয়া জাল-মুক্ত হইবেন। কাজেই এইরূপ ইচ্ছা বিমুখ শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা কার্য্যে যথেষ্ট অসুবিধা জন্মে। পক্ষান্তরে পুনঃ পুনঃ গতায়াতে বহুদর্শী নিম্ন শিক্ষকের

সংখ্যা বিরল হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা আছে তাহারাও ভগ্নোরু হতমান দুর্য্যোধনের ন্যায় ম্রিয়মান ও নির্বীর্য্য।

এই শিক্ষক শ্রেণীয় উৎকর্ষ বিধান আর এক গুরুতর সমস্যা। ট্রেণিং বিদ্যালয় দ্বারা এই শ্রেণীর শিক্ষক প্রস্তুত করিতে হইলে ট্রেণিং স্কুলে ইংরেজী প্রবর্ত্তন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। পূর্ব্বে যেরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে মধ্যইংরেজী পরীক্ষা দিয়া ট্রেনিং স্কুলে ভর্ত্তি হইবে এবং তথায় ইংরেজী অভ্যাস করিবে, সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে মাষ্টারসিপ পরীক্ষোত্তীর্ণেরাই ইংরেজী স্কুলে নিম্ন শিক্ষকের কার্য্যে করিতে পারিবে। যদি মনে হয়, মধ্য ইংরেজী পরীক্ষার পর তিন বৎসর ইংরেজী চর্চ্চা ইংরেজী শিক্ষক প্রস্তুতির পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহা হইলে, ট্রেণিং স্কুলের অধ্যয়ন কাল এক বৎসর অধিক করিয়া চারি বৎসর করিলেই উপযুক্ত শিক্ষক হইবে।

বর্ত্তমান ইংলিস ক্লাসগুলি উঠাইয়া দিলে যে অর্থ সংস্থান হইবে তদ্দ্বারা অনায়াসেই এক বৎসরের ব্যয়াধিক্য সঙ্কুলান হইবে। সুতরাং ট্রেণিল স্কুলের পঠনকাল বর্ত্তমান তিন বৎসরের পরিবর্ত্তে চারি বৎসর করিলেও গবর্ণমেন্টকে অধিক ব্যয় বহন করিতে হইবে না।

ইংরেজী স্কুল গুলির নিম্ন শ্রেণী গুলিতে ইংরেজী ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপনা বাঙ্গলায় হইলে প্রস্তাবিত ট্রেণিং স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষকগণ ইংরেজী স্কুলে সুদক্ষ শিক্ষক হইবেন। বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের যে যে অধিকার আছে, ইহাদের সেই সেই অধিকার না থাকায় অন্য কার্য্যে যাইবার ও তেমন সুযোগ থাকিবে না। কাজেই ইহারা ভূরিদর্শী সুশিক্ষক হইবেন। ইংরেজী স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে ইংরেজী ব্যতীত অন্যান্য বিষয় বাঙ্গলাতে শিক্ষাদানের পক্ষাপক্ষ ভবিষ্যতে আমরা আলোচনা করিব, প্রস্তাব দীর্ঘতর হইবে বলিয়া এখানে তাহার অবতারণা করিলাম না।

আমাদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, আর এক ফল এই হইবে যে, ট্রেণিং স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষকগণ সরকারী ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহে ২৫, ৩০ টাকার কাজগুলি পাইবেন। তাহাতে তাঁহাদের অবস্থা উন্নত হইবে এবং ইংরেজী জানা না থাকার দরূণ নানা বিষয়ে যে অনভিজ্ঞতা আছে তাহাও বিদূরিত হইবে। ট্রেণিং স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষকগণ উন্নত শ্রেণীর উৎকৃষ্ট শিক্ষক হইবেন। প্রত্যুত মাইনর পাশ করিয়া চারি বৎসরের ইংরেজী জ্ঞান এফ এ উত্তীর্ণদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না।

ইহাদের মধ্যে যাহারা কৃতী ক্রমাগত ইংরেজীক অভিজ্ঞতা তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা উন্নত করিয়া তুলিবে। কার্য্য গ্রহণ করিয়া ক্রমাগত ইংরেজী চর্চ্চা করিলে কাহারো কাহারো পক্ষে অপ্রত্যাশিত উন্নতি লাভ করাও অসম্ভব হইবে না।

এইরূপ হইলে বাঙ্গলা চর্চ্চার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। শিক্ষার নিম্নস্তর দেশীয় ভাষায় হইলে বাঙ্গলা গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতির বহু প্রচার দ্বারা একদিকে বঙ্গ ভাষার অপর দিকে সুশিক্ষা ও সুশিক্ষক লাভের পথ উন্মুক্ত হইবে। দেশ মধ্যে বাঙ্গলা চর্চ্চাবৃদ্ধি পাইবে। ইংরেজীধিকৃত দেশে দেশীয় ভাষার ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের পরাউন্নতি হইবে।

ট্রেণিং স্কুলের ছাত্রগণই বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষালাভ করে। ইংরেজী জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজী হইতে একটি প্রবল স্রোতঃ বাঙ্গলার সহিত মিশিয়াছে। কেবল শব্দ নয় ইংরেজী ভাব ও ভূরি পরিমাণে সংযোজিত হইয়াছে। যেমন সংস্কৃত, আজ কালের দিনে তেমনি কিঞ্চিৎ ইংরেজী জানা না থাকিলে বাঙ্গলা ভাষায় কৃতিত্ব জন্মে না। এই জন্যও ট্রেণিল স্কুলগুলিতে ইংরেজী অধ্যাপনার প্রয়োজন। আজ কালের বাঙ্গলা ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিতে ইংরেজী ও সংস্কৃতের অনুপাত সমাননা হইলেও উনিশ বিশ মাত্র।

ট্রেণিং স্কুলের তিন শ্রেণীতেই এখন পরীক্ষা হয়। চারি বৎসর পাঠের নিয়ম হইলে প্রতি শ্রেণীর পরীক্ষার পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় বর্ষের ও চতুর্থ বর্ষের শ্রেণীতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। ২য় বর্ষের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৩য় গ্রেডের এবং ৪র্থ বর্ষের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২য় গ্রেডের সার্টিফিকেট পাইবে। আর যাহারা বি, এ পাশ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় শিক্ষা প্রণালীর বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাহারাই প্রথম গ্রেডের নিদর্শন পত্র পাইবে।'

ট্রেণিং স্কুলগুলিতে ইংরেজা পাঠনা এবং হাই স্কুল গুলির নিম্নস্থ শ্রেণীগুলিতে বাঙ্গলাতে শিক্ষাদান প্রবর্ত্তিত হইলে এদেশে বাঙ্গলা শিক্ষার নবযুগ—উন্নতযুগ আরম্ভ হইবে ; এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষার ভূরি উন্নতি হইবে।

বাঙ্গলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের বিষয় বিবৃত করিবার পূর্ব্বে ব্যাকরণের নিদান অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ একবরা অনুসন্ধান করা ভাল। কারণ, সকল বিষয়ের আদি কারণ, তৎবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভের প্রথম সোপান বা ভিত্তি। নিদানে দিব্য জ্ঞান হইলে তত্ত্ববিনির্ণয়ে তুলভ্রান্তি জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না। নিদানে সুষ্ঠুজ্ঞান জন্মিলেই অনেকে আয়ুর্ব্বেদে কৃতিত্ব লাভ করেন। এই কারণে আমরাও ব্যাকরণের নিদান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। যদিও সে তত্ত্বে অধ্যেতৃবর্গের ফল শ্রুতি না হউক, কিন্তু অধ্যাপকগণের কিয়ৎ পরিমাণে হইলেও ফল-লাভ হইবে।

ব্যাকরণের জন্ম গণনা করিতে আমরা সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গলা ব্যাকরণেরই আলোচনা করিতেছি। কারণ উহার সমুদয় বিষয়রই প্রায় আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি কাল অনেকের মতে ৮ শত বৎসরের পূব্বকািল, সে বিষয়ে বিতণ্ডানা করিয়া আমরা বাঙ্গলাকে ন্যূনকল্পে ৫, ৬ শত বৎসরের প্রাচীন বলিতে পারি। এই বাঙ্গলা ভাষার আদি ব্যাকরণ রচয়িতা পাদ্রি সাহেবগণ। ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে হাল হেড সাহেব সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করেন। তাঁহার অনুসরণ করিয়া লয়ার, কিথ্ প্রভৃতি সাহেবেরাই সে দিকে পদ চারণা করেন। সাহেবদের হাত হইতে রাজা রাম মোহন রায় সম্ভবতঃ প্রথমে সে অধিকার গ্রহণ করেন ; এবং ব্রজ কিশোর গুপ্ত, শ্যামাচরণ সরকার, ভগবতী চরণ কাব্য বিশারদ প্রভৃতি রাজারই পদানুসরণ করিয়াছিলেন।[৬১]

পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব হইতে দুটি সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইতেছে (১) ভাষা উৎপন্ন হইবার বহুকাল পরে ব্যকরণের উৎপত্তি হইয়াছে ; (২) বিদেশীরা বা বিভিন্ন ভাষাঁরাই প্রথমে কোন ভাষার

ব্যকরণ রচনা করিয়াছেন। প্রথম সিদ্ধান্তটি সর্ব্ববাদি-সম্মত, সুতরাং তৎসম্বন্ধে বাক্য-ব্যয় করিয়া পণ্ডশ্রম করিব না। দ্বিতীয় সত্যটি আমরা নূতন প্রতিষ্ঠিত করিতেছি ; সুতরাং উহা বহু প্রমাণের আবশ্যক। এইজন্য তদ্বিষয়ে আমাদের সামান্য অভিজ্ঞতা বিনিয়োগ করিতেছি।

মাতৃভাষা আর মাতৃদেবী অভিন্ন। শিশু জন্মিলেই মাতৃ ক্রোড়ের ন্যায় মাতৃ ভাষার অঙ্কে লালিত পালিত হইতে থাকে। সুতরাং মাতৃ ভাষায় সিদ্ধি লাভ করিতে কাহারো কোন ব্যাকরণ অধয়ন করার প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ আদিম কালে যখন ভাষা শিশুর ন্যায় অপুষ্টদেহ থাকে, তখন সে ভাষাভাষীদের পক্ষে কোন ব্যাকরণেরই আবশ্যক হয় না। বিদেশীরা বা বিভিন্নভাষীরা কার্য্যোপলক্ষে আসিলে, তাহাদেরই সে ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন হয়। তাহারা আর মাতৃ-ভাষার ন্যায় সহজে সে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারেনা, তাহারাই বিজাতীয় ভাষার ব্যাকরণ বা সাধারণ নিয়ম সঙ্কলন করিয়া তৎসাহায্যে সে ভাষা আয়ত্ত করিয়া থাকে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বাঙ্গলা ভাষায় প্রচার করিতেই পাদ্রিসাহেবদের বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা হইল, এবং তজ্জন্যই তাহারা বাঙ্গলা ভাযার নিয়ম সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গলা ব্যাকরণের জন্মদান করিলেন।

কেবল বাঙ্গলা ব্যাকরণের সিদ্ধান্তটি সমুদয় ভাষার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে অনেকেরই উহা ক্ষীণ-দর্শিতা বলিয়া মনে হইবে। একটি উদাহরণের উপর সাধারণ একটি সিদ্ধান্ত উপন্যস্ত করা ঘোর অর্ব্বাচীনতার কার্য্য, আমি সে অসহ্য বোঝা মাথায় লইবনা। এই জন্য তৎস্বরূপ আরো দুএকটি প্রমাণ প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

রোমকেরা গ্রীকশিক্ষা করিবার জন্য গ্রীক ভাষাব প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। লাটিন ভাষায় রচিত সে সকল গ্রীক ব্যাকরণই বর্ত্তমান ইউরোপীয় ভাষা সমূহের ব্যাকরণের জন্মদাতা। এখানে ইহাও উল্লেখ করা সঙ্গত যে, অপ্রযুক্ত প্রাচীন গ্রীক শব্দ গুলির অর্থ প্রকাশার্থ গ্রীক পণ্ডিতগণ তকগুলি সঙ্কেত গ্রীক ব্যাকরণ রচিত হইবরা পূর্ব্বেই নির্ব্বাচিত কবিয়াছিলেন, কিন্তু সে গুলিকে ব্যাকরণ বলা যাইতে পারে না।

প্রথম ইংরেজী ব্যাকরণ নর্ম্মাণেরাই রচনা এবং শিক্ষাদান করেন। ২য় রিচার্ডের রাজত্ব কালে ১৩৮৫ সনে জন কর্ণওয়েল বালকদিগকে প্রথম ইংরেজী ব্যকরণ শিক্ষা দেন। শিব প্রোক্ত মাহেশ সংস্কৃত আদিম ব্যাকরণ বলিয়া কথিত। প্রক্নতত্ত্বালোচনায় শিব অনার্য্য দেবরাজ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে এইরূপ উদাহরণ আরো সংগৃহীত হইতে পারে। এইরূপ প্রমাণ স্বত্বেও দোদুল্যমানচিত্তে আমি প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি।

বর্ত্তমান বাঙ্গলা ব্যাকরণ গুলি সে আদিম ব্যাকরণ গুলির পদানুসরণে রচিত হয় নাই। প্রচলিত বাঙ্গলা ব্যাকরণ গুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গলা ব্যাকরণ গুলির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। সে গুলির অধিকাংশ স্থলই সংস্কৃত ব্যাকরণ বাঙ্গলায় রচিত, অতি অল্পাংশ কেবল যাঙ্গলার নিয়ম নির্ব্বাচনে পর্য্যবসিত। চিন্তাশীল সুধীদের মতে কোন চলিত ভাষাই ব্যাকরণের পরিখার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। উহারা চিরগতিশীল, কেবলই অগ্রসর হইবে। সে অগ্রসরণে অবশ্যই প্রাচীন রীতি নীতি বিষ্ণুর কৌস্তুভ মণির ন্যায়

আপন বক্ষে রাখিবে। এই হেতুবাদে, বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও বাঙ্গলা ভাষার সর্ব্বময় বিধাতা পুরুষ হইতে পারে না।

ব্যাকরণ শিখিয়া বাঙ্গালীরা বাঙ্গলা শিক্ষা করেনা। মাতৃভাষা শিখিতে ব্যাকরণের আবশ্যক হয় না পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে ভাষার শৃঙ্খলা বা বিধিগুলি আয়ত্ত হইলে ভাষার অধিকার লাভের জন্য ব্যাকরণ অভ্যাস করিতে হয়। বলিতে কহিতে ও লিখিতে পড়িতে পারা এক কথা, ভাষায় অধিকার জন্মান আর এক কথা ; অধিকারী শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিতে সমর্থ। ব্যাসকূটের ন্যায় ভাষায় জটিল প্রশ্নগুলির মীমাংসায় কখন কখন ব্যাকরণের সাহায্য লইতে হয়।

প্রথম শিক্ষার্থীরা নিত্য কথা বার্ত্তায় যে সকল শব্দ প্রয়োগ করে সে সকলের মধ্যে এক একটা সাধারণ বিধি বা সূত্র দেখিয়া মুগ্ধ হয়। এবং সেই সূত্র অবলম্বনে আবার নূতন নূতন বাক্য রচনা করিতে পারে বলিয়া নিরতিশয় আমোদিত হয়। এইরূপে তাহাদের ভাষায় এলাকা বাড়িয়া যায় এবং স্বয়ং আপনারাই নূতন ব্যাক্যের অর্থ বোধে সমর্থ হয়। যেরূপ নূতন পত্র রসাকর্ষণ করিতে করিতে যখন পাকিয়া উঠে, তখন আপনিই শুষ্ক হইয়া পড়িয়া যায়, সেইরূপ বহু অধ্যয়ন দ্বারা যখন ভাষায় অধিকার জন্মে তখন আর ব্যাকরণলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না বলিয়া ব্যাকরণের সূত্র গুলি পুরাতন পত্রের ন্যায আপনারাই খসিয়া পড়ে। এই অন্য কবি বা বহুজ্ঞ লোকের ভাষা ব্যাকরণের অঙ্কুশে নিয়মিত করা যায় না বরং তাঁহারাই ভবিষ্যৎ বৈয়াকরণদের বিধাতা পুরুষ হইয়া উঠেন। বাঙ্গালা ভাষার এই উদ্যম সময়েও অনেকে ব্যাকরণের লড়ী হাতে লইয়া উহাকে গো-তাড়নার উৎকট যাতনা প্রদান করিতেছেন পক্ষান্তরে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে কেবল মাটিতে প্রতিমা হয় না, কুমার সুলভ নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা ও আবশ্যক। যাহার কুমারের ন্যায় নির্ম্মাণ ক্ষমতানাই, সে যেন কোন কিছু নূতন নির্ম্মাণ ক্ষমতা নাই, সে যেন কোন কিছু নূতন নির্ম্মাণ করিতে যত্ন না করে ; তাহার পক্ষে চিরাগত সরণির অনুসরণ করাই শ্রেয়।

বাঙ্গলা ব্যাকরণের অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, কেবল বাঙ্গলায় ব্যাখ্যাত ; একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেই জন্য বাঙ্গলা ব্যাকারণের সেই সেই অংশ প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে সর্ব্বথা পরিহার্য্য। সন্ধি, কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস এমন কি স্ত্রত্বি বাঙ্গলা ব্যাকরণ হইতে পরিবর্জ্জন করিলে ক্ষতি নাই। সংস্কৃতাভিজ্ঞদের অতি মমতায়ই এ সকল বাঙ্গলা ব্যাপকরণে স্থান লাভ করিয়াছে। প্রথম রচিত বাঙ্গলা ব্যাকরণে এসকলের উল্লেখ ছিলনা !

বর্ত্তমান সময়ে সেন্ট্রেল টেক্‌ষ্ট বুক কমিটির তাড়নায় প্রাথমিক বাঙ্গলা ব্যাকরণের বহু সংস্কার হইয়াছে, এখনও আরো সংস্কারের প্রায়োজন আছে। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ব্যাকরণ গুলিতে এখনও পূর্ব্ববৎই সকল ব্যাকরণের সূত্র সকল বাঙ্গলায় সঙ্কলিত রহিয়াছে। ব্যাকরণের সূত্র পড়িয়া পড়িয়া অনেক স্কুলে ছেলেদের স্মৃতি শক্তির বিকৃতি উপস্থিত হয়।

আমার মনে হয় ব্যাকরণ ভাষাতত্ত্ব–বিদ্যা না হইয়া ভাষা শিক্ষার সাধন হওয়া প্রয়োজন। এইজন্য শব্দের উৎপত্তি ভাষাতত্ত্ব বা অভিধানের হাতেই ভার রাখা বিধেয়। ব্যাকরণে সে সকল লিখিয়া কোমল মতি বালক–বৃন্দের কালক্ষয় ও যন্ত্রণা উৎপাদন করা অনুচিত।

বাঙ্গলা লেখকদের মনে এক সময়ে একটা ভাব আসিয়াছিল যে, কি ইতিহাস, কি ভুগোল, কি ভূগোল, কি ব্যাকরণ সকল গ্রন্থেই অধিক ও নূতন লেখাটাই যেন গ্রন্থ উৎকৃষ্ট করিবার একটা প্রধান উপায়। এই কারণে বাঙ্গলা পাঠ্য গ্রন্থ গুলিতে অনেক আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে ও গ্রন্থগুলি বহুবায়ত হইয়াছে। এখন সে সকল ঝাড়িয়া ফেলার সময় হইয়াছে। ছাত্র বর্গের বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের শিক্ষা এত বাড়িয়াছে যে, সে সকল অধিকন্তু অংশ আর কোন রূপেই রাখা যাইতে পারে না। বাঙ্গলা ব্যাকরণ হইতে শব্দের উৎপত্তি সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা বাক্য রচনার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহাই মধ্য পরীক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দের পাঠ্য হওয়া বিধেয়। তৎপর যাহারা সংস্কৃত পড়িবে তাহাদিগকে বর্ত্তমান মধ্য পরীক্ষার্থ নির্ব্বাচিত কোন একখানি বাঙ্গলা ব্যাকরণ পড়ান যাইতে পারে।

বাঙ্গলা সংস্কৃতের গায় গায় লাগা হইলে ও বাঙ্গলা সম্পূণ স্বতন্ত্র একটী ভাষা। জোর জুলুম করিয়া সংস্কৃতের রীতির দুর্বহ ভাব উহার ঘাবে চাপাইলে দু একদিনের মধ্যেই গা ঝাড়া দিয়া সে ভার দূরে ফেলাইয়া দিবে। নদী যেমন আপনার গন্তব্য পথ আপনিই নির্দ্দেশ করিয়া আপনিই কাটিয়া লয়, ভাষা ও সেই রূপ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে আপনার পথ আপনিই নিম্মাণ করে।—বাঙ্গলা ভাষাকে সংস্কৃতের পথানুবর্ত্তিনী করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া একদল আপনারাই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বাঙ্গলা ব্যাকবণেকে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে গঠন করা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সে বৃথা চেষ্টারই ফল।

বাঙ্গলা বাক্য রচনা করিতে বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, কারক, বচন এবং তদরিক্ত স্ত্রীত্বজ্ঞান জন্মিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। ৬চ্চ শ্রেণীতে সমাস নিষ্পন্ন শব্দ রচনার বিষয়ে অতি সামান্য সামান্য জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়া মন্দ নয়। কিন্তু এই সকল যুক্ত–শব্দ শিক্ষাদিতে সংস্কৃত সমাস প্রণালীর অনুসরণ কোন রূপেই সঙ্গত নয়। কর্ম্মধারয়, অব্যয়ীভাব, দ্বিগু, দ্বন্দ্ব সমাস বাঙ্গলার গায় গাধার বোঝা, সে সকল বাঙ্গলা ঝড়িয়া ফেলিতেছে। তত্তৎ সমাস নিষ্পন্ন এক একটি সংস্কৃত শব্দের এই অর্থ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। সে শিক্ষার ভার অভিধানের হাতে রাখিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়। তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন পদ কিরূপে রচনা করিতে হয় মোটামোটী উহার একটা ভাব মনে অঙ্কিত করিয়া দিলেই পর্য্যাপ্ত হইল। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গলা রীতি সংস্কৃত বড় বড় সমস্তপদ গ্রহণ করিতে নারাজ। সমাসের রীতি ক্রমশঃই বাঙ্গলার বিফল হইয়া উঠিতেছে।

সমালোচনা, সংবাদ।

২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩০৭, নভেম্বর ১৮৯৯

নানা কথা,

পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত

পণ্ডিত রজনীকান্তের জন্ম ১২৫৬ সনের ২৯শে ভাদ্র, মৃত্যু ১৩০৭ সনের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, এবং জন্মভূমি মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মত্তগ্রাম। শিশুকালে প্রাণান্ত জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া রক্ষা পান : কিন্তু উহাতেই শ্রবণশক্তি চিরদুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। শ্রবণশক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ আত্মীয়েরা তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য শিক্ষা প্রদানের ইচ্ছা করিয়া সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। রজনীকান্ত এন্ট্রেন্স ক্লাস পড়িয়াই বিদ্যালয়ের পড়া সমাপন করেন। সংস্কৃত কালেজে তিনি সংস্কৃত ভাল করিয়া শিক্ষা করিয়া ছিলেন। তাঁহার জীবনের ক্ষুদ্র পঞ্জী এখানেই সমাপ্ত করা যাইতে পারে। ইহার পরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে এবং যদ্বারা তাঁহার জীবন জাতীয়-জীবনের এক অংশ বলিয়া গণিত হইয়াছে তাহা তাঁহার নিজের যত্নের ফল বা স্বীয় প্রকৃতির অন্তঃসলিলা সরস্বতী প্রবাহিনী।

মানব জীবনের একটা গূঢ় রহস্য এই যে, যাঁহারা বিশেষ লোক বলিয়া সমাজে গৃহীত হন, তাঁহারা নিবন্তর আপনাদের অভাব ও বিপদ স্বীয় উন্নতির সাধন করিয়া লন। এবং এই বিষয়ে যিনি যত কৃতকায্যতা প্রদর্শন করিতে পারেন তিনিই তত বডলোক বলিয়া গণিত হন। বামনই ত্রিবিক্রম, অষ্টাবক্র আজন্ম পণ্ডিত। আমবা স্থূল-দৃষ্টিতে দেখিতেছি, বজনী বাবুব রোগজনিত শ্রবণ দৌর্ব্বল্য তাঁহার শিক্ষার পবিপন্থী হইল। কিন্তু বাস্তবিক সেই দুর্ব্বলতাই তাহার ভবিষ্য উন্নতিব নিদান হইয়াছিল। এইরূপ না হইলে তিনি হয়তো অন্য কোন কালেজে পড়িতেন। একজন খ্যাতনাম এম্ এ, কি বি এল হইতেন, বঙ্গের সহস্র সন্তান যেরূপ সেরূপ হইতেন, বঙ্গসমাজ-সাগবে জলবুদবুদের ন্যায় মিশিযা যাইতেন। তাঁহাব সে তাঁহাব সে দুর্ব্বলতারই জীবনেব স্রোত ফিবিযা গেল, অন্য পথে প্রধাবিত হইল। এবং তিনি ভবিষ্য জীবনের উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃত না শিখিলে বাঙ্গলায় কৃতিত্ব লাভ করিতে পরহস্তে ধনের ন্যায় পবমুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তাহাতেও সম্যক্ অধিকাব জন্মে না। রজনী বাবু সংস্কৃত কালেজে পডিযা যত্ন পূর্ব্বক সংস্কৃত শিখিয়া বাঙ্গলার কৃতী লেখক হইবার প্রধান উপায় সংগ্রহ করিলেন।

পরের নিয়তি গণনা অনেকেই করে এবং তাহা সহজসাধ্য। আত্ম নিয়তি যে সে গণনা করিতে পারে না। যাঁহাবা আপনার ভবিষ্য নিয়তি চিনিয়া সেদিকে পদ প্রসার করিতে পারেন তাঁহারা বড়লোক না হইলেও বড়বংশের লোক। রজনী বাবু জীবন পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই সে পথেব গন্তব্য রেখা চিহ্নিত করিয়া লইলেন। এই জন্য আত্মীয়েরা সবডিপুটি কাজের যোগাড় করিলেও তিনি তাহা গ্রহন করিলেন না, স্বীয় পদপীতেই পদচালনা করিলেন। আজীবন কেবল গ্রন্থ লিখিয়াই জীবিকা অর্জ্জনের পথ এদেশে তিনিই প্রথম প্রদর্শন করিয়েছেন। অনেকে গ্রন্থ লেখা অর্থার্জ্জনের উপায় স্বরূপ গ্রহন করিয়াছেন এবং করেন ; কিন্তু গ্রন্থের জন্য গ্রন্থ লেখার পথ অতি অল্প লোকেই অনুসরণ করেন। বিশেষতঃ রজনী বাবুর মত অবস্থাপন্ন লোকের নিকট সে শশ বিষাণ প্রত্যাশা।

রজনী বাবু বাঙ্গলা লেখক সমাজে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। সজীবতা তাঁহার লেখার প্রদান লক্ষণ। তিনি হৃদয়ের এক একটি কুসুম কোরক ভাষার তুলিতে প্রস্ফুটিত করয়িাছেন। তাঁহার রচিত সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস তাঁহাকে বঙ্গে ঐহিক অমরতা দান কয়িাছে। তাঁহার লেখা গবেষণাপূর্ণ ও চিন্তা প্রসূত। তিনি জয়দেব চরিত্র, পাণিনি বিচার, আসাকীর্ত্তি, ভারত–কাহিনী, প্রবন্ধ মালা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, মেক্‌স মুলারের[৫৭ক] ধর্ম্মবিজ্ঞানের বাঙ্গলা অনুবাদ, প্রতিভা প্রভৃতি অনেক গুলি পুস্তক লিখিয়াছেন।

বাঙ্গলা যুক্তাক্ষর

ইংরাজী বানান পৃথিবীর সর্ব্ব ভাষার মধ্যে জটিল ও কুটিল। ইংরাজী ভাষা অন্যান্য বিষয়ে সহজ হইয়াও কেবল এই এক কারণে দুরূহ হইয়াছে। আমেরিকাবাসী ইংরেজগণ ইংরেজী অনেক গুলি শব্দের বর্ণ বিন্যাস অপেক্ষাকৃত সহজ করিয়াছেন। ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টার[৬২] সাহেব ভারতবর্ষীয় শব্দ গুলি ইংরাজীতে লিখিবার এক পদ্ধতি করিয়া ভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ বিন্যাসের জটিলতা পরিহার করিয়াছেন। চিন্তাশীল ইংরেজগণ ইংরেজী বানানের কাঠিন্য পরিহারের উপায় চিন্তনে বিবৃত হইয়াছেন। কিন্তু ইংরেজেরা চিরদিনই পুরাতনের পক্ষপাতী ; কাজেই তাঁহারা বুঝিয়াও বানানের সবলতা সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না ; এবং শীঘ্র যে পবিবর্ত্তন প্রয়াসীদের যত্ন সর্ব্বতোভাবে সফল হইবে তাহা ও আশা করা যায় না। কিন্তু ইংবেজী বানান যে একেবারে অপরিবর্ত্ত্য অবস্থায় রহিয়াছে তাহা নয়। মধ্য যুগের ইংরেজী ও বর্ত্তমান ইংরেজী বানানে অনেক পার্থক্য। মধ্য যুগে Sunne-এর পরিবর্ত্তে এখন Sun, Sune–এর স্থানে Son হইয়াছে। এইরূপে আরো বহু পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইযাছে।

বাঙ্গলা বর্ণ বিন্যাস সহজ হইলেও বাঙ্গলা সংযুক্ত অক্ষর গুলি অতি জটিল। ইংরেজীতে ২৬টি অক্ষর ; সাধারণ নাগবীতে ৫০টি অক্ষরের ব্যবহার দেখা যায়। বাঙ্গলার বর্ণ সংখ্যা ও নাগরী হইতে যোগ বিয়োগ করিয়া ৫০টির ন্যূন হইবেনা। অক্ষরের সংখ্যা যে ভাষার যত অল্প, সে ভাষাই একদিকে তত সহজ। বর্ণ সংখ্যা কম বলিয়া ইংরেজী বা রোমাণ অক্ষরের জগৎ ভরিয়া মান। বর্ণ সংখ্যা অধিক বলিয়া চাইনিজ ভাষা কাঠিন্যে অদ্বিতীয়।

বাঙ্গলা সংযুক্ত বর্ণ বাঙ্গলা ভাষা কঠিন হইবার একটি প্রধান কারণ। বাঙ্গলা উচ্চারণও যে একেবারে জলবৎ তরল তাহা নয়। অকারান্ত শব্দ গুলি কোথায় স্বরান্ত, কোথায় বা হলন্ত পড়িতে হইবে তাহা কঠিন সমস্যা। আমাদের পড়িতে পড়িতে বা বলিতে বলিতে অভ্যাস হইত কিন্তু বাঙ্গলা এখন সে বর্ণটি ঝারিয়া ফেলিয়াছে।

বাঙ্গলা মিশ্র বা সংযুক্ত বর্ণগুলির দৌরাত্ম্যে বাঙ্গলা কম্পোজ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বানানে ও কলায় সাধারণ নিয়মের বিপর্য্যয়ে যে যে সংযুক্ত বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে আপাততঃ সে গুলি ফেলিয়া দিলে বাঙ্গলা শিক্ষার কতকটা কাঠিন্য বিদূরিত ও বাঙ্গলা কম্পোজিটারদের পবিশ্রমের কিঞ্চিৎ লাখব হইতে পারে। আমি মনে করি, ইহাতে ভাষার সৌন্দর্য্য বা গৌরবের বিন্দুমাত্রও অপচয়াশঙ্কা নাই। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীদের সুবিধা হইবে বলিয়া আদরই বাড়িবে।

গু, শু, রু, রূ, দ্ধ, গ্ধ, ন্ধ, ঙ্গ, হৃ প্রভৃতি রূপান্তরিত যুক্তবর্ণগুলি কেবল বর্ণ বৃদ্ধির ভার চাপাইবার জন্যই। নচেৎ গু, শু, রু, ক্র, ব্ ধ, গ্ ধ, ঙ্ গ প্রভৃতি লিখিলেই আপদ্-চুকিয়া যায়। কেহ-কেহ মনে করিতে পারেন ওরূপ বা কয়টা বর্ণ আছে, উহাতে বা আসে যায় কি ? আমি বলি একেই ফলা বানানে বাঙ্গলা ঝালাপালা, উহাতে বোঝার উপরের শাক আটির ভার কমিলেও পরম লাভ। অধিকন্তু, ভাষা সহজ হইতে পারিলে সে সুবিধা কখনই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। ভগ্নাংশের লঘুকরণের ন্যায় ভাষার লঘুকরণের সুযোগও সর্ব্বদাই অন্বেষণ করা সঙ্গত।

চিরাগত সরণি প্রাচীন সকল জাতিরই অতিপ্রিয়। দশ দিন দেখিলে শুনিলেই তাহার সহিত 'আমার' বলিয়া কেমন একটা সম্পর্ক জন্মে। এই মায়ায় লোক বদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়াই কুসংস্কারের এত প্রবল প্রতাপ, চিরাগত বিধি ব্যবস্থার এত সমাদর। পরিবর্ত্তন উঠাইতে উঠাইতেও দশ বৎসর কাটিয়া যায়। আমরা এই সকল সংযুক্ত বর্ণের প্রয়োগ বদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিলেও বহু বৎসরে উহা কার্য্যে পরিণত হইবে।

পরিবর্ত্তনের কথা তুলিলেই অনেকে হয়তো সংস্কৃতে কি আছে তাহার দিকে তাকাইবেন। আমরা পূর্ব্বাপর বলিতেছি, বাঙ্গলা সংস্কৃতের অনেক নুন্ খাইয়াছে এবং আরো খাইবে ; কিন্তু আপনরা স্বাধীন প্রকৃতি সংস্কৃতের মুখ চাহিয়া কখনও পরিহার করে নাই, এবং কখনও করিবেনা। বাঙ্গলা বর্ণমালায় এত বিভিন্নতা প্রবেশ করিয়াছে যে উহা সম্পূর্ণ পৃথক্ বর্ণমালা হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কৃতের দুটি ব বাঙ্গলার একাকার হইয়াছে, সংস্কৃতে য এর দ্বিবিধ উচ্চারণ ছিল বাঙ্গলার তৎপবির্ত্তে য ও য় দুটি বর্ণ হইয়াছে। এইরূপ ড র ড়, ঢ ও ঢ় ও দুটি দুটি বর্ণ হইয়াছে। বানান সম্বন্ধে অসংখ্য পরিবর্ত্তন অবলম্বন করিয়াছে।

অনেক দিনের কথা নহে—উষা নামক বৈদিক পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী করিয়া চলিয়া না লিখিয়া প্রাকৃতের অনুকরণে করিআ চলিআ প্রভৃতি প্রবর্ত্তনে যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা সে পরিবর্ত্তন গ্রহণে সম্মত হইল না দেখিয়া, তিনিই আবরা করিয়া চলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কাল ধর্ম্মের ইঙ্গিত বাঙ্গলা কেবল জোর জবরদস্তি করিয়া কোন পরিবত্তনই সাধিত হইতে পারে না। কাধর্ম্ম যাহা ব্যবস্থা করিবে সর্ব্বপ্রকার মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া তদনুসরণ করাই জীবনের বা জীবিত জাতির লক্ষণ। আমি কালের ইঙ্গিত মতে বাঙ্গলা ভষার সংযুক্তে বর্ণের এই সংস্কার প্রস্তাব করিতোছি, আশা করি সকলেই একবার ভাবিয়া যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

পণি বা ফিনিসিয়ান ; নববষ, আচার্য্য,

বর্ত্তমান শিক্ষার অপবাদ।

অনেক্‌ে মনে করেন এবং বলিয়া থাকেন "কৃষকের ছেলে পাঠশালায় পড়িলে কৃষিকার্য্য করিতে যায় না, অধিকন্তু উহা অপমান জ্ঞান করে।"

একদিন একটী পদস্থ ভদ্রলোক আমাকে বলিয়াছিলেন "আমার এক নাপিতেব ভাই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ দিযাছে। আমার নিকট একটী প্যাদগিরি কার্য্যের ওমেদারীতে

আসিয়াছিল। আমি বলিলাম তোমার প্যাদগিরি কার্য্য হইবে না, তুমি যাইয়া আপন ব্যবসায় অবলম্বন কর, তাহাতেই তোমার যথেষ্ট লাভ হইবে। কিন্তু সে কোনরূপেই নাপিতের কার্য্য করিতে সম্মত হইল না, উহা তাহার পক্ষে হীন কাজ বলিয়া ভাব দেখাইল।" তিনি উহা বর্ত্তমান শিক্ষার কুফল বলিতেও বাকী রাখিলেন না।

এক শ্রেণীর লোকে মনে করেন, শিক্ষার এমন একটা প্রণালী হওয়া বিধেয় যে, কৃষকের ছেলে কেবল লেখা পড়াটি শিখিবে আর তাহার চৌদ্দ হইয়াছে বলিয়া তেমন কঠিন বোধ হয় না। কিন্তু ইংরেজ বা চীনীয়েরা সে কাঠিন্য সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকেন। কমল্‌কুটীর্ না কমলকুটীর, না কমল্লকুটীর পড়িব তাহা বহুলব্ধ জ্ঞান। এইরূপ ধনভাণ্ডার্ বা ধনভাণ্ডার বলিতে হইবে তাহা বর্ণদ্বারা উপলব্ধ হয় না। কিন্তু এই বিষয় বাঙ্গলা অপেক্ষা উড়িয়া সৌভাগ্যশালী। উৎকলবাসীরা অকারান্ত শব্দ গুলির কখন ও হলন্ত পাঠ বা হলন্ত উচ্চারণ করে না। সংস্কৃতেও এ সন্দেহ দোলায় দোলিত হইতে হয় না। হিন্দী সর্ব্ববিষয়েই সংস্কৃতের অনুকারী। সংস্কৃত মূলক সুমদয় ভাষার পঠনই প্রায় এইরূপ দ্বৈধবিহীন। কেবলমাত্র বাঙ্গলায়ই অকারান্তকে হলন্ত করিয়া বলিতে বা পাঠ করিতে হয়।

ইংরেজীর সংমিশ্রণই এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া মনে হয়। ইংরেজী শব্দে অকারন্ত পাঠ নাই, তদনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াই বাঙ্গলায় কোথায় বা হলন্ত উচ্চারণ. কোথায় বা সংস্কৃতানুযায়ী স্বারন্ত উচ্চারণই হইতেছে। আমার মনে হয়, বাঙ্গলা এবিষয়ে সংস্কৃতের অনুকরণ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজীরই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবে। যে সকল শব্দ এখনও অকারান্ত পাঠ বা উচ্চারিত হইয়া থাকে, সে গুলিও ক্রমে হলন্ত উচ্চারিত হইবে। আমরা প্রত্যয়ের কারণ এই :—হলন্ত বলিতে সময় কম লাগে। সময়ের অল্পতা সাধন লক্ষ্য করিয়াই জগতের সর্ব্বপ্রকার সংস্কার ও উন্নতি সাধন হইয়াছে ও হইতেছে। বাঙ্গলা ও যথাসবে আত্ম সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া অকারান্ত শব্দ সকলের হলন্ত উচ্চারণেই তৃপ্তিলাভ করিবে।

বাঙ্গলা পাঠকালে প্রথম পাঠার্থীকে যে কেবল এই একবিধ সমস্যারই সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হয় তাহা নয়, তাহাকে মধ্যে মধ্যে সাধারণ জ্ঞানের হাতে আরও সাঞ্ছিত হইতে হয়। বানান পড়াইবরা সময় একদিন একটি পঞ্চ বৎসরের শিশু তাহার বাবাকে বলিতেছিল "আমি "কি" পড়িব না। আগে ই পরে ক আছে, আমি 'ইক' বলিব।" শিশুকে 'কি' বলাইবার জন্য বাবাকে একটুকু পরিশ্রম করিতে হইল। শিশুটি বুদ্ধিমান ছিল বলিয়া সহজেই সে পিতার কথায় সম্মত হইল। সাধারণ ছেলের মনে এরূপ কোন খট্‌কা লাগিলে তাহার অপনোদন করিতে বহু সময় অপব্যয় করিতে হয়। ভাষার এই ক্রমবিপর্য্যয় নিবন্ধন সকল শিশুকেই যে কিছুক্ষণ থম্‌কিতে হয় তাহার সন্দেহ নাই। বাঙ্গলায় সংযুক্তক এ, ঐ, ও , ঔ লইয়াও এইরূপ বিপণ্ন হইতে হয়। সংস্কৃতে কেবল ই-সংযুক্ত বর্ণেই এরূপ বিভ্রাটে পরিতে হয়, অন্য কোথায়ও ক্রমবিপর্য্যয় নাই। ইংরেজীতে এরূপ ক্রমবিপর্য্যয় দেখা যায় না।

দুইবর্ণ সংযুক্ত হইয়া উহাদের যে রূপান্তর হইয়া থাকে, তাহা ভাষা কাঠিন্যের একটি প্রধান কারণ। ইংরেজীতে এরূপ কাঠিন্য এত অল্প যে নাই বলিলেই হয়। সংস্কৃতও

তদন্তর্গত আর্য্যভাষা সমূহে ওরূপ ভূরি পরিবর্ত্তন রহিয়াছে। এই জন্য ভারতীয় ভাষা সমূহ শিক্ষার পক্ষে জটিল হইয়াছে। এক একটি স্বরবর্ণও এক একটি ব্যঞ্জনবর্ণ সংযুক্ত হইয়া যে সাধারণ ক্রম গঠন করিয়াছে তাহা ছাড়িয়া দিলেও, বিশেষ রূপান্তরগুলির জটিলতা নিতান্তই কষ্টকর এবং শিক্ষার্থীর সময়াপহারক। গ ও উ ; শ ও উ ; র-সঙ্গে, উ, ঊ সংযুক্ত হইয়া সে বর্ণ বাহুল্য করিয়াছে তাহা একরূপ অদানে অব্রাহ্মণে বলিতে হইবে। বাল্যকালে দেখিয়াছি ক ও উ সংযুক্ত হইয়াও বিশেষ রূপ প্রাপ্ত পুরুষ যে কৃষক ছিল সেও সেই কৃষকই থাকিবে। এইরূপে নাপিত ধোপা কামার কুমার সকলেই বংশাচরিত ব্যবসা কবি বাড়ার ভাগ, কেবল লেখা পড়া টুকু শিখিবে।

অনেকে উহার অন্যথা দেখিয়া, কৃষকের সন্তানকে বাবুর মত পোষাক পড়িতে দেখিয়া, ধোপা নাপিত প্রভৃতিকে জুতা পায় দিতে দেখিয়া দেশের দুর্ভাগ্য, ঘোরকলির আগমন প্রভৃতি কল্পনা করেন। আবার যখন কৃষকের পুত্র চাকরি করিতে যায়, ধোপা নাপিত কলমব্যবসায়ী হইতে চেষ্টা করে তখন চাকরি বা কলম ব্যবসায় যাহাদের একচেটিয়া, তাহারা মহা খাপ্পা হইয়া উঠেন। তাহারা বলেন "সারা দিন খাটাইয়া, বি এ, পাশ করিয়া ২০/২৫ টাকার চাকরি করিবে কেন? তুমি নিজের ব্যবসা করিলে, কৃষিকায্য করিলে যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিবে।" কিন্তু সে, সে কথায় কানও দেয় না। যত বুঝাও, যত লাভ দেখাও কিছুতেই সে নিজের ব্যবসা করিতে সম্মত নয়, তাহার মন নিজেব ব্যবসা হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে।

অনেকের ধারণা ইহা বর্ত্তমান শিক্ষাদান প্রণালীর দোষ। বত্তমান সময়ে যেরূপ হাইস্কুল গুলিতে দ্বিবিধ পাঠ্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেরূপ মফস্বলস্থ প্রাইমারী পাঠশালা গুলি দুইভাগে বিভক্ত করিলে শিক্ষাদান গত দোযের পবিহাঁর হইতে পারে। এখন সকল শ্রেণীর লোক এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে বলিয়া এবং বিদ্যালয়ে ব্যবসায়োপ্রোযোগী শিক্ষাদান হয় না বলিয়া সকলেই চাকরির জন্য ব্যস্ত হয়। বর্ত্তমান শিক্ষাব প্রতি আর একটি দোষারোপ করা হইয়াছে যে উহা সকলকেই বিলাসী ও অমিতব্যয়ী করিযা তোলে।

দোষাই হউক বা গুণই হউক আমরা অদ্য সে বিষয়েব প্রস্তাব করিব না। ব্যবসায়ীর ছেলেরা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াই হউক, কি না করিয়াই হউক, কিরূপ স্বভাবোপেত হইতেছে তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। উহা বিদ্যা শিক্ষার সহিত কতদূর সংশ্রুত তাহাই আলোচনা করিব।

আমাদেব ধারণা উহা পাশ্চাত্যভাব, সাম্যবাদ উহার জন্মভূমি। প্রাচ্যভাব রাজা প্রজা, ধনী গরীব, মুর্খ জ্ঞানী, ব্রাহ্মণ চণাল প্রভৃতির ব্যবধানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। এই সকরেল মধ্যে প্রথমে সূক্ষ্মসূত্র থাকিলেও ইদানীং সরিৎসাগব ভূধর ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যভাবের প্রভাবে প্রাচ্যভাব ক্রমশঃ বিদূরীত হইতেছে এবং আরো হইবে। পাশ্চত্য ভাব গুচ্ছের জ্বলন্ত বর্ত্তিকা হস্তে হইয়া ইংরেজ জাতি এই দেশের রাজ্যভার গ্রহন করিয়াছেন। রাজ্যভাব গ্রহন করার অর্থ ইহা নয় যে এদেশ হইতে কিছু অর্থ শোষণ করা। সাধারণ লোকে মনে করে রাজকর গ্রহণ করাই রাজার একমাত্র বা সর্ব্বপ্রদান কর্ত্তব্য। ইহার উপর যদি আর

কিছু রাজ–কর্ত্তব্য থাকে তাহা শান্তিরক্ষা করা। কিন্তু রাজভাব, রাজচরিত্র যে বিজিত বা প্রজা সাধারণের মধ্যে বিলি হইয়া যায় তাহা স্থূল দৃ?িতে অনেকেই মনে করে না। মুসলমান রাজাগণের আমলে রাজভাব রাজপ্রকৃতি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে হিন্দুগণের রক্ত মাংসে প্রবেশ করিয়াছে। ভাষায় যাবনিক শব্দের যেমন অভাব নাই, অনুসন্ধান করিলে আচার ব্যবহারে, কাজ কর্ম্মেও যাবনিক রীতি নীতির তেমনি বাহুল্য পরিলক্ষিত হইবে। ইংরেজ আমাদের রাজা, সুতরাং রাজভাব অবশ্যই প্রকৃতি পুঞ্জের প্রকৃতিতে লক্ষিত ও অলক্ষিতভাবে সংক্রামিত হইবে। ভাল পরিবার, ভাল খাইবার, ভাল থাকিবার ইচ্ছা আমাদের রাজভাব। কাজেই সে ভাব যেমন বড় লোকের তেমনি গরীবের, যেমন জ্ঞানীর তেমনি মুর্খের, যেমন জমিদারেব তেমনি কৃষকের ভিতরে প্রবেশ করিবে। ইহা প্রকৃতিপুঞ্জের কপালে যুগ ধর্ম্মের বিধিলিপি, উহার খণ্ডন করা স্বয়ং বিধাতারও সাধ্যাতীত।

আমাদের বর্ত্তমান রাজভাবেব মূল্য সাম্যবাদ ডালা পালা আর সব। এই সাম্যবাদের প্রভাবে কৃষকের ছেলে মসীজীবী হইতে ইচ্ছা করে। সে দেখিতে পায়, তাহা না হইলে, সে ধনে কি গৌরবে অন্যদের সমতা লাভ করিতে পারে না। তুমি ব্রাহ্মণ, চণ্ডালকে বলিবে দুরে থাক্ ; তুমি ধনী, গরীবকে বলিবে 'তুই আমাদের সমাজে আসিস্ না' ; তুমি উচ্চ রাজপদে আসীন, তুমি ব্যবসয়ী বা কৃষককে বলিবে 'সাবধান তোব বাতাস যেন আমরা গায়ে না লাগে' ; এইরূপে তুমি যদি সময়ের কপাল লিখন অন্যথা করিতে চাও, তবে অবশ্যই কৃষক তাহার কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া, ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায পরিত্যাগ করিয়া, ভৃকত্য তাহার পরিচর্য্যা পরিহার করিযা তোমরা সমকক্ষ হইবরা জন্য প্রাণ পণ রাখিয়া ঘোর সাধনা করিবে। উন্ন রাজপদের, উচ্চশিক্ষার অভিলাষী হইবে। তুমি যদি কৃষি ও কৃষকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পার, তুমি যদি কার্য্যতঃ প্রতিপন্ন করিতে পার যে, তোমাব ও ব্যবসায়ীর মধ্যে একগাছ কেশ মাত্র ব্যবধান, তাহা হইলে, নিশ্চিতই তুমি এখন শিক্ষার প্রতি যে দোষারোপ করিতেছ তাহার ভুলভ্রান্তি উপলব্ধি করিতে পারিবে। এবং শিক্ষার দোষ কতটুকু এবং তোমাদের সামাজিক প্রথাই বা উহার কতদূর পরিপন্থী স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।

একদিকে তুমি কৃষককে এবং ব্যবসায়ীকে নীচ ক্ষুদ্রলোক বলিয়া তাহাকে বসিতে দিবে না, তাহার সহিত আলাপ করিবে না ; অন্যদিকে তুমি বলিবে তুমি-চাষ বাস কর, ব্যবসায় বাণিজ্য কর সুখে থাকিবে। তোমার এ কথার মর্ম্ম সকলেই বুঝিবে। কৃষক ও ব্যবসাযী বুঝিবে, কদষিকার্য্য ও ব্যবসায় নীচ কাজ, আমি সে কাজ করিয়া মাথার গাম পায় ফেলিব, তোমাদের পদলেহন করিব, তোমরা আমাদিগকে নীচ অসভ্য ছোটলোক বই বলিবে না! আমরা কেন এমন হীন কার্য্যে জীবন যাপন কবিব?

বস্তুতঃ সমাজের নেতৃগণ কৃষক বা ব্যবসায়ী হইয়া ক্ষেত্র পতির বা "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"র আরাধনায় নিযুক্ত না হইলে কিছুতেই কৃষকেরা ও ব্যবসায়ীরা সাম্যনীতির সাধনা পরিত্যাগ করিবে না। হয় তুমি কৃষক বা ব্যাসায়ী হইয়া কৃষিজীবী বা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সমতা প্রদর্শণ করিবে ; না হয়, তাহারাই মসীজীবী বা উন্নত রাজপদ লাভ করিয়া সামাজিক মর্য্যাদায় তোমার সমকক্ষ হইবে। বর্ত্তমান রাজপ্রকৃতির সাম্যবাদের মোহন রস সকলকে মুগ্ধ

করিয়াছে। এখণ যাহারা কৃষি কার্য্যের, ব্যবসায়ের বা শিল্পের প্রাণ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবেন তাঁহারা অবশ্যই শিক্ষিত, স্বার্থত্যাগী হইবেন। তুমি য সমাজের অগ্রণী হও, তুমি যদি তোমার সন্তানবর্গকে সিবিল সার্ভেন্ট বা ব্যারিষ্টার করিতে চাও, সিবিল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার করিতে চাও, তবে তুমি আকাশ পাতাল ফাটাইয়া বজ্রনাদে কৃষিকার্য্য কর ; ব্যবসায় বাণিজ্য কর, শিল্পকার্য্য কর প্রভৃতি বলিলেও সে কথার অর্থ তাহারা বুঝিবে—"হে সমাজের নীচ স্থানে অবস্থিত মানবগণ, তোমরা চিরকালই সমাজের নীচ স্থানে থাকিয়া আমাদের পদধুলি লইয়া স্বর্গসুখ ভোগ কর।" এরূপ অপমান কে সহ্য করিবে? সাম্যবাদের এই খরস্রোতে তোমার এই কৌশলময়ী বাক্‌চাতুরী ভাসিয়া যাইতেছে, সকলেই তাহা বুঝিতেছে, অনভিজ্ঞতা কেবল তোমারই!

যদি মেওয়া লইয়া কোন কাবুলি তোমার নিকট আইসে তুমি বরং তাহার সঙ্গে মিষ্ট আলাপ করিবে তাহাকে বসিতে আসন দিবে। কিন্তু তোমার প্রতিবেশী কেহ তরবারীর ভাণ্ড মাথায় লইয়া তোমরা দ্বারে উপস্থিত হইলে তোমার তুচ্ছ কথায় সে তখনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিবে "আমি কিছু টাকা পয়সা করিতে পারিলে, উইল করিয়া যাইব আমার বংশে যেন কেহ এ নীচে ব্যবসায় অবলম্বন না করে।"

এখন তুমি বল দেখি, একি শিক্ষার দোষ, না তোমার দোষ, তোমার সমাজের দোষ? একি কৃষকদের সামান্য লেখা পড়ার শিক্ষার ত্রুটি, না তোমার মত উন্নত শিক্ষিত ভদ্র সন্তানদের অভিমানের কুফল! তুমি হৃদয়ের সহিত কৃষিকার্য্যকে আদর করিতে শিখ, ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্মান কর, দেখিবে নব নব কৃষকবংশে, ব্যবসায়ীর দলে ভারত পরিপূর্ণ হইবে। তোমার অলীক অভিযোগ করিবার ঘনঘটা শারদ মেঘ-নির্ঘোষে পর্য্যবসিত হইবে।

"ডান লাগে না", বাঙ্গলা শিক্ষার নূতন আকার, জিজ্ঞাসাবাদ, সমালোচনা, সংবাদ।

২ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩০৭ ডিসেম্বর ১৮৯৯

বার্ণিক সংগ্রাম, পাপিস (পপি:), গো-হরণ, সরমা, পপি অর্থ গো অর্থ, সরমা অর্থ, বিবাদের কারণ, পক্ষ বিপক্ষ, পরস্পর শত্রুতা, বর্ণিক সংগ্রামের সময়, উপসংহার।

বিজ্ঞাপন

ডাক্তার আর, সি, দাসের সকল প্রকার জ্বর ও প্লীহাদির একমাত্র অবাধ মহৌষধ,

সর্ব্ব-জ্বর-হর মিশ্র

এই মহৌষধের অত্যাশ্চয্য শক্তিতে আজ সকলেই বিমোহিত এই মহৌষধকে সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া অনেকেই স্বীকার কবিয়াছেন। সুদূর ব্রহ্ম দেশেও এই ঔষধের আদর হইতেছে। যে কোন প্রকারের জ্বর হউক না কেন একবার ব্যবহার করুন

জ্বর না সারিলে

মূল্য ফেরৎ দিব॥

মূল্য প্রতি বোতল ৸৹ আনা, মফঃস্বলে ডাক যোগে পাঠান হয়, পাইকেরী দর সুলভ। অন্যান্য দেশী ও বিলাতি পেটেন্ট ঔষধ, ডাক্তারের ব্যবহার্য্য ঔষধ অস্ত্র প্রভৃতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সর্ব্ব-জ্বর-হর মিশ্র ও অন্যান্য পেটেন্ট ঔষধ বিক্রয়ার্থ সর্ব্বত্র এজেন্টের প্রয়োজন, যাহারা ঘরে বসিয়া দশ টাকা উপার্জন করিতে মনস্থ করেন, তাঁহারা অগ্রসর হউন, পত্র লিখিলে সবিশেষ জ্ঞাতব্য। অর্দ্ধ আনার টিকেট সহ আবেদন করিলে ১৩০৫ সালের সুদৃশ্য পঞ্জিকা ও তিনটী গল্প নামক পুস্তক বিনা মূল্যে পাঠাইব।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস ডাক্তার,

ডায়মণ্ড জুবিলী মেডিক্যাল হল, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র গুহ বিরচিত

কাব্য-তরঙ্গিনী মূল্য ।৷৹ আনা।

বিশুদ্ধ ধারাপাত, মূল্য৵১০ আনা।

কুমিল্লা, গ্রন্থকারের নিকট ও কলিকাতা, ২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

[১/১, বৈশাখ ১৩০৫]

সংকলন

কল্যাণী

৪র্থ বর্ষ, ৮ম-৯ম-১০ম সংখ্যা, পৌষ-ফাল্গুন ১৩০৮

পূজা [কবিতা], ভারতে ধর্ম্ম ও সমাজ, করুণা-নিধান [কবিতা], ওঙ্কার [প্রবন্ধ], মাধাইপুর [ভ্রমণ], রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী : মালদহ, সাগর-সঙ্গমে, সাধক-তত্ত্ব,

সন্ধ্যায়

দিবার দুয়ারে পড়িল অর্গল,
সারাটি দিনের শ্রম-কাতর,
আঁখি ক্ষীণ এবে তন্দ্রা বিজড়িত,
দিন মণি পশে অস্ত-শিখর।
পশ্চিম গগনে ঢল ঢল ঢল
সোণার বরণ কিরণ-পাঁতি,
রহি' রহি' রহি' মিলাইয়া গেল,
রহি' রহি' তার নিবিল ভাতি।

দুই-এক খানি ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘে
দিক্ বধূগণ উচ্ছল—কায়া
দি'ছিল পুলকে মেলিয়া সিন্দুর,
পড়িল তাহাতে সাঁঝের ছায়া।

নদী, সরোবর, প্রান্তর, ভূধর,
উপবণ ঘন-পাদপ-ময়,
কি যেন প্রগাঢ় ঝিমের আবেশে
ভাসা-আঁখি সব চাহিয়া রয়।

কি এক বিমিশ্র কোলাহল রবে
পূরিয়া গিয়াছে বিমান-দেশ,
উচ্ছ্বাস বিভ্রমে মিশেছে যেন রে
বিদায় কালের বিষাদ লেশ।
সান্ধ্য পবনের মৃদুল-হিল্লোলে
বে-লয় বে-সুরা মুছিয়া গেছে ;
আকুল গগনে স্থির রব গুলি
সঙ্গীতের পারা ভাসি' রহিছে।

মিটি মিটি করি' দু-একটা তারা
সে গীতি সাগরে ঢালিয়া দেহ,
সুনীল অম্বরে সুমৃদু হাসিল
"নিকষ-পাষাণ-কনক-রেহ"।

তারা-বিভাসিত নীলিমে সুধীরে

রজত-বিশদ প্রেমের ছবি,
গৌরবে গরব-পরশটী-হীন
ভাতিল চন্দ্রমা নীরব কবি।

পাদরী মেয়ের শুভ্র-বাস পরা
জ্যোছনা গুলিন পবিত্র হিয়া,—
নূতন জীবনে তরু লতা গণে
জাগাল চুম্বন অমৃত দিয়া।

তটিনী হৃদয়ে আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা
শত শত চাঁদ ভাসিয়া যায়
তরঙ্গ গুলিন কত না যতনে
একেকটী তার হৃদে দুলায়।

অই দুলালের খেলনা দেখিতে
হৃদয়ে কত কি বিনোদ বাসি,
শৈশবের দিন গুলির মতন
অভিনয় তাই দেখিতে আসি।

চাঁদের হৃদয়ে রবির পরাণে
অলখিত কোন আছে বা ডোর,
নীরবে চন্দ্রমা হাসিলে গগনে
কবি-হিয়া তাই প্রীতি-বিভোর।

অথবা উদার প্রদোষ গগন
উদার মধুর প্রদোষ গান,
মৃদুল আঘাতে কবির হৃদয়ে
তুলি দেয় এই উদার তান।

ঘরের প্রাচীর কারাগ বেষ্টন
বিরস কাহিনী কত কি কহে,
সমস্ত জগৎ রহস্যের মত
আলোর আধারে ডুবিয়া রহে।
আলোর আঁধারে ছট ফট করি
বায়ু যেন দম্—ফুটিয়া রয়,
দীর্ঘ দিবসটী পোঁবার মতন
আঁকু বাকু কবি চাহিয়া রয়।

হাসি নাহি তার, নাহি অশ্রু লেশ,
ধূসর দীনতা—মাখিয়া গায়
কেমন মতন মুখের উপর
চাহি' চাহি' সেগো মরিয়া যায়।

সে সমাধি' পরে সন্ধ্যা দেবী যবে
দাঁড়ান, ভাবের মূরতি খানি,
নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে এ জগৎ
পরশি' শীতল কোমল পাণি।

সাঁঝের বিমল করের পরশে
কবাটটি যেন খুলিয়া যায়,
উনমুক্ত প্রাণে প্রদোষ পবনে
শিরীষ কুসুম বাস বিলায়।

আমারো হৃদয়ে মোহের পরদা
স্নিগ্ধ সেই মৃদু পরশে টুটে,
মরুর উপরে গোটা গোটা যেন
ভাবের কুসুম ফুটিয়া উঠে।

তুমিও তটিনী উদার পরাণে
সাগর অনন্তে বহিয়া যাও,
জানিনা কেমনে হৃদয়ে আমারো
অনন্তের স্পৃহা জাগা'য়ে দাও।

প্রকৃতি সুন্দরী আধ ঘুম ঘুম
কতকি সোয়াস্তি পেয়েছে যেন,
তেমনি তেমনি সে স্নেহের কোলে
তুমিও তাহারি বালিকা হেন।

কত কি উদার কাহিনী তোমার
বিশাল হৃদয়ে রয়েছে লেখা,
আমি একেবারে কি হইয়া যাই
যখনি তোমার পাই গো দেখা।

তাই নিতি নিতি তব তীরে আসি ;
কি মধুর প্রীতি লভে পরাণ,
যখনি তোমার কুল কুল রবে
শুনিগো জীবন-জুড়ান গান।

শিশুপালন

প্রসূত শিশু যদি সুস্থ ও সবল হয় তবে সত্বরই ক্রন্দন করিয়া উঠে। ইহা দ্বারা ফুস্ফুস বায়ু পূর্ণ হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে। নাড়ী বান্ধা, এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কার্য্য সম্পূর্ণ আরম্ভ হইবার পরে শিশুর গাত্র ধৌত করতঃ পরিষ্কার করিয়া, তাহাকে গরম ফ্লানেলের মধ্যে রাখা উচিত। নাড়ী কাটা গাত্র ধৌত কার্য্য সত্বর সম্পন্ন করিবে ; পরে প্রসূতির প্রসব-জনিত ক্লেশ লাঘব হইয়া আসিবা মাত্র সন্তানকে স্তন্য পানের নিমিত্ত প্রসূতির

ক্রোড়ে দিবে। ইহাতে প্রসূতির স্তনে সত্বর দুগ্ধ আইসে, সন্তানেরও কিয়ৎ পরিমাণে সান্ত্বনা হয় এবং স্তনের বোঁট দুগ্ধ ভরে কঠিন হইবার পূর্ব্বেই শিশু তাহা টানিতে অভ্যাস করিতে পারে ; অধিকন্তু ইহাতে প্রসূতির জরায়ু সঙ্কুচিত হয়, রক্তস্রাবের ও দুগ্ধ জ্বরের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। প্রসবেব পর কোন কোন প্রসূতির তিন দিবস স্তনে দুগ্ধ থাকে না ; কিন্তু অনেক প্রসূতিরই স্তনে যে পরিমাণ দুগ্ধ থাকে তাহাই শিশুর পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং শিশুকে অপর আহার দেওয়ার পূর্ব্বে প্রসূতির স্তন্যপান করাইবার চেষ্টা পুনঃ পুনঃ করা উচিত ; ইহাতে স্তনে দুগ্ধ আসিবার সম্ভাবনাই অধিক ; অনেকক্ষণ চেষ্টার পরেও যদি দুগ্ধ নিতান্ত না আইসে তবে ২/৩ দিবসের মধ্যে (যাবৎ উত্তম দুগ্ধ না আইসে) গাভীর দুগ্ধ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প খাইতে দিবে। জ্বাল দেওয়া কিম্বা চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ খাইতে দেওয়া ভাল নহে। দুই ভাগ দুগ্ধ ও এক ভাগ উষ্ণ জল মিশ্রিত কবিয়া খাওয়ানই বিধেয়।

কোন কোন শিশু মৃত প্রায় হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। যদি অল্প মাত্র হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া থাকে তবে যথা সময়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস আনয়ন করিবার চেষ্টা পাইলে এরূপ শিশুব জীবন রক্ষা হওয়ার সম্ভব। কিন্তু সত্বরে বিশেষ চেষ্টা না করিলে এই অবস্থাতেই মৃত্যু হইয়া থাকে। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করাইতে হইলে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তাহাকে কাত করিয়া এমোনিয়া কিম্বা আদা ও মরিচ দন্তে পেষণ করিয়া নাসিকা ও মুখে প্রয়োগ করিবে এবং গল মধ্যে অঙ্গুলি বা পালক দিবে ইহাতে বমি বা হাঁচি হইবার উপক্রম হইলেই শ্বাস ক্রিয়া হইতে থাকে। অপর মুখ মণ্ডল এবং বক্ষস্থল ঘষণ করিয়া উষ্ণ করিবে পরে হঠাৎ জলাভিঘাত করিবে ইহাতেও কখন কখন শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ শিশুর মৃত্যুই প্রসূতির দোষে ঘটিয়া থাকে। সন্তানের স্নান, আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা পিতা মাতার নিতান্ত কত্তব্য। নিম্ন লিখিত নিয়মগুলি যথা সাধ্য পালন করিলে শিশুগণের রোগের সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকে। রুগ্ন ব্যক্তি চিকিৎসকেব হস্তে আবোগ্য লাভ কবিবে ইহা অপেক্ষা রোগ না হইতে দেওয়াই প্রার্থনীয়।

স্নান : স্নান করিলে শরীর পরিষ্কাব ও স্নিগ্ধ হয়। শিশুদিগকে অন্ততঃ একবার স্নান করান উচিত। নিতান্ত শিশু হাঁপাইয়া না উঠে এরূপ ভাবে শরীর জলে ডুবাইয়া ভিজা গামছা কি স্পঞ্জ দ্বারা সমস্ত শরীর ও মস্তক রগড়াইয়া দিবে পরে শুষ্ক বস্ত্র বা ফ্লানেল দ্বারা শীঘ্র মুছিয়া দিবে। স্নানের পর শীতল বায়ু, গাত্রে লাগান কর্ত্তব্য নহে এজন্য ঘরের ভিতর স্নান করান উচিত। শীতকালে ৬ মাস পর্য্যন্ত বয়স্ক শিশু দিগকে শীতল জলে স্নান করাইবে না। ঈষদুষ্ণ জল মিশ্রণে জলের শৈত্য নাশ করিয়া তাহাতে স্নান করাইবে। কিন্তু জল অধিক উষ্ণ করা বিধেয় নহে। সুস্থ শিশুদিগকে উষ্ণ জলে স্নান করান অন্যায়, তবে কোন কোন রোগে উষ্ণ জলে স্নান করাইলে উপকার হয়।

গাত্রবস্ত্র : গাত্র বস্ত্র কোমল, পরিষ্কার এবং ঢিলা হওয়া আবশ্যক। অনেকে শিশুর মস্তক টুপি প্রভৃতির দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত রাখেন অথচ পদদ্বয় সম্পূর্ণ খোলা থাকিলে কিম্বা ভিজা মোজা দ্বারা আবৃত থাকিলেও তাহা লক্ষ্য করেন না। এইটী সম্পূর্ণ ভ্রম। টুপি

না থাকিলেও চলে কিন্তু পদদ্বয় নিয়ত গরম রাখা আবশ্যক। ভিজা মোজা বা কাপড় এক দণ্ডও গাত্রে রাখা উচিত নহে। বস্ত্রাদি এরূপ আঁটিয়া পরিবে না যে তাহাতে পরিপাক কার্য্য, নিশ্বাস, প্রশ্বাস ও রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত জন্মে। শীতকালে গলা এবং বুক আবৃত রাখা আবশ্যক। গাত্রে বস্ত্র বরং না দেওয়া ভাল কিন্তু এক একবার শরীর আবৃত করিয়া গরম করতঃ হঠাৎ শীতল বায়ু শরীরে লাগান নিতান্ত অন্যায়।

নিদ্রা : নিতান্ত শৈশব অবস্থা অতিক্রম করিলেই শিশুগণকে শীতনাশক গরম গাত্র বস্ত্রে আবৃত করিয়া স্বতন্ত্র শয্যায় নিদ্রা যাইতে দেওয়াই বিধেয়। তবে বালক নিতান্ত ক্ষীণ, অকাল জাত হইলে নিদ্রাশীল হয়। এমন কি তিন বৎসরের শিশুকে পর্য্যন্ত দিবসে একবার নিদ্রা যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল অবস্থাতেই আহার নিদ্রা যথা সময়ে হওয়া উচিত। নিদ্রার সময় তাহাদিগকে জাগ্রত অবস্থাতেই শয্যা শায়িত করিবে। দোলাইয়া গান করিয়া, স্তন্য দিয়া অথবা অন্য কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয় ঘুম পাড়ান ভাল নহে। নিদ্রিত শিশুকে আহারাদির জন্য জাগ্রত করান অনুচিত। শয়ন গৃহের সমুদয় জানালাদি বদ্ধ করিয়া রাখা অন্যায়। তবে বাহিরের শীতল বায়ু শরীরের উপর দিয়া বহিয়া না যায় তাহার উপায় করিয়া সমস্ত গৃহ যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ুতে পূর্ণ থাকে, এরূপ করিবে। আশৈশব বিশুদ্ধ বায়ু সেবন-সুখে বঞ্চিত হওয়া অকাল মৃত্যুর অতি প্রধান কারণ। এজন্য নিদ্রিত শিশুর গৃহ যেমন বায়ু ও আলোকপূর্ণ বাখা কর্ত্তব্য, তেমনই দিবসে জাগ্রত অবস্থায় শিশুকে বিশুদ্ধ বায়ুতে খেলা করিতে দেওয়া উচিত। সন্তানগণকে গৃহের বাহিরে পরিস্কার স্থানে নির্দ্দোষ শ্রমজনক ক্রীড়া করিতে শিখান পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাতে বালক বালিকার শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি হয়, নচেৎ তাহারা ক্ষীণ অসন্তুষ্ট ও কালে চির রুগ্ন হইয়া থাকে।

আহার : শিশুদিগের আহার বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হইবে। আহারেব দোষে যত রোগ জন্মে, এত আর কিছুতেই হয় না। জন্মাবধি শিশুকে নিয়মিত সময়ে নিয়মিত আহার দিলে তাহাদের রোগ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকে। প্রথম দুই এক মাস স্তন্যই একমাত্র আহার। দুই তিন ঘণ্টা অন্তব এক একবার পান করিতে দিবে। একটী স্তনের দুগ্ধ বদ্ধ রাখিয়া অপরটী ক্রমাগত দেওয়া ভাল নহে, দুইটীই সমান রূপে পান করিতে দেওয়া উচিত। প্রথম দুই সপ্তাহের পর নিতান্ত অধিক রাতে স্তন্য না দেওয়াই ভাল। যাহারা প্রচুর পরিমাণে অথবা একেবারেই মাতৃ দুগ্ধ না পায়, তাহাদিগকে গাভীর টাট্‌কা দুগ্ধ দেওয়াই বিধেয়। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার বৃদ্ধি করা ও বিলম্বে দেওয়া, আবশ্যক। সুস্থ ও সবল শিশুকে এক বৎসরের মধ্যেই স্তন্য ত্যাগ করান উচিত।

অথঃঅবদূতলীলা, গা জ্বলে-চোখ জ্বলে [পাঠ্য বইয়ের ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে], প্রকৃতিঃসন্ধ্যা, পরলোকগত পণ্ডিত চন্দ্র ন্যায় কাব্যতীর্থ, শোকাচ্ছাস [কবিতা]

সামাজিক পরিষদ।

হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ কর্ত্তৃক সামাজিক পরিষদ গঠিত হইবে।

২। হিন্দুগণের প্রত্যেক শ্রেণীর, ২/৪টী গ্রাম লইয়া এক একটী ক্ষুদ্র সমাজ আছে। এই সমাজের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা এক একটি ক্ষুদ্র পরিষদ গঠিত হইবে এবং এই ক্ষুদ্র ২ পরিষদের নির্ব্বাচিত লোক কর্ত্তৃক সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে। সাধারণ পরিষদ স্বীয় সদস্যগণ মধ্য হইতে কায্য নির্ব্বাহ সমিতি গঠন করিবেন।

৩। হিন্দু সন্তানগণের স্ব স্ব শ্রেণী এবং ভিন্ন ২ শ্রেণীর মধ্যে সৌহার্দ্দ ও সহানুভুতি সংস্থাপন, পুত্র কন্যার বিবাহাদিতে কুপ্রথা তিরোহিত করন, নিঃসহায়া হিন্দু বিধবার এবং পিতৃমাতৃহীন নিঃসহায় হিন্দু সন্তানের প্রতিপালন, সাধারণ হিন্দুর শিক্ষা বিষয়ক, নৈতিক ও সামাজিক এবং ধর্ম্ম, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধীয়, সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন এই পরিশদের উদ্দেশ্য।

৪। সাধাবণ লোককে সনাতন হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী সদাচরণসম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান্ করাইবার নিমিত্ত এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই পরিষদ হইতে শাস্ত্রাভিজ্ঞ প্রচারক স্থানে স্থানে প্রেরিত হইবে।

৫। "কল্যাণী" এই পরিষদের মুখপাত্রী হইয়া ইহার কায্যাবলি ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতে থাকিবে।

৬। পরিষদের কায্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অর্থেব আবশ্যক এই অর্থ সংগ্রহের উপায় সাধাবণ পরিষদ গঠিত হইলে স্থিরীকৃত হইবে।

৭। ক্ষুদ্র ২ যে সমুদয় পরিষদ গঠিত হইতেছে ইহার আবশ্যকীয় ব্যয়, চূড়া, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কায্যে পরিষদেব একটি বৃত্তি স্থাপন করিয়া তাহা হইতে নির্ব্বাহিত হইবে।

৮। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বত্র সমাজ-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের এতদ্বিষয়ে মত গ্রহণ এবং পরিষদ গঠনের চেষ্টা করিবেন।

শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য তর্করত্ন।
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কাব্যতীর্থ অধ্যাপক
বারইখালি সংস্কৃত কলেজ।
শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচায্য উকিল।
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উকিল।
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত মোক্ষদা চরণ ভট্টাচায্য, ডাক্তার।
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কুলীন

বঙ্গের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যে কুলীনগণই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া সম্মানিত। ঘটকচূড়ামণি দেবিবর এই কুলীনদিগকে মেল বন্ধনে আবদ্ধ করেন। কিন্তু এই মেল বন্ধন প্রথায় তৎকালে

কুলীনগণ নানারূপ বিশৃঙ্খলতা হইতে পরিরক্ষিত হইলেও বর্ত্তমানে উক্ত প্রথা যে বিষময় ফল প্রসব করিতেছে তাহা কোন সমাজাভিজ্ঞ ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না।

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা সাধারণতঃ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এতদ্ব্যতীত কুলীন পুরুষ স্বঘর ব্যতীত শ্রোত্রীয় ও বংশজ কন্যাও বিবাহ করিয়া থাকেন ; কিন্তু কুলীন কন্যার বিবাহ স্বঘর ব্যতীত অন্য ঘরে কখনও হয় না, এই সমস্ত কারণে অবিবাহিতা কন্যার সংখ্যা অধিক হওয়ার বহু বিবাহ প্রথা কুলীন সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। আবার বর্ত্তমান কালে কুলীন গণের মধ্যে অনেকেই একাধিক বিবাহে সম্মত নহে সুতরাং কুলীন সমাজে অবিবাহিতা কন্যার সংখ্যা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী কুফলও সমাজ নীরবে সহ্য করিতেছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এই কুপ্রথার ফলে শত শত পরিবার সতত জর্জ্জরিত হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন কবিতেছে অথচ ইহার প্রতিকাবেব উপায় অবলম্বনে অগ্রসর হইতে কেহই সাহসী হইতেছেন না।

মেলান্তরে পুত্র কন্যা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে সাধারণের নিকট কুল মর্য্যাদা অব্যাহত থাকিয়াও এই কুপ্রথার কঠোরতা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে পারে। আশা করি সহৃদয় কুলীন মহাত্মাগণ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া স্ব স্ব প্রিয়তমা দুহিতৃকুলের অশ্রুমোচন করিবেন এবং জন সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সহৃদয়তা ও কন্যাবৎসলতা প্রদর্শনে আপন আপন বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ এবং পারিবাবিক জীবনে শান্তি সংস্থাপন কবিতে যত্নশীল হইবেন।

বঙ্গীয় কুলাচার্য্য মহোদয়গণেব নিকট অনুবোধ এই যে তাঁহারা কুলীনগণেব চিরসহায়, এই শুভ কার্য্যেরও তাঁহারা সাহায্যকাবী ও পৃষ্ঠপোষক হইয়া শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে কুলীনগণের যথার্থ হিতসাধন করুন। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত একার্য্যে সাফল্য লাভ অসম্ভব।

যে সমুদায় কুলীনগণ বিভিন্ন মেলের মধ্যে আদান প্রদানে সম্মত আছেন তাঁহারা যেন স্বীয় ২ পরিচয় সম্বলিত সম্মতিসূচক স্বাক্ষর কল্যাণী সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন।

যে সমুদায় কুলীন মহোদয়গণ বিভিন্ন মেলে আদান প্রদানে সম্মত তাঁহাদের নাম ও পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নাম	বর্ত্তমান বাসস্থান	কোন মেল ও সন্তান	স্বভাব	ভঙ্গ
শ্রীশ্যামাচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	জয়গাছি বাগহাট	খড়দহ কামদেব পণ্ডিত		ভঙ্গ
শ্রীবামচরণ চট্টোপাধ্যায়।	পাঁজিযা যশোহব	ফুলে নারায়ণ চট্টো	স্বভাব	
শ্রীশীতল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	মো খুলন সাং বাজীতপুর	খড়দহ দুর্গাদাস বাটুর্য্যের সন্তান		ভঙ্গ
শ্রীসতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	হাল সাং ছয়ঘরিয়া বনগ্রাম	খড়দহ		ভঙ্গ
শ্রীনিশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়।	মেঘশীমলী	মধুশুদন চাটুয্যে	স্বভাব	
শ্রীভুপতি নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।	বাজিতপুর	খড়দহ	স্বভাব	

শ্রীসতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কুমড়ী	ফুলিয়া কেশব চক্রবর্ত্তী	স্বভাব	
শ্রীহরি গোপাল মুখোপাধ্যায়, পুঃ ইঃ যশোহর।	হালিসহর জেলা ২৪ পঃ	ফুলিয়া রাজবল্লভ ঠাকুরের সন্তান		ভঙ্গ
শ্রীবসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।	বাজিতপুব	খড়দহ	স্বভাব	
শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।	দেয়াপাড়া	ঐ		ভঙ্গ
শ্রীবিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়।	ঐ	ঐ		ভঙ্গ
শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়।	কাশিপুব	ঐ	স্বভাব	

নীল-বিদ্রোহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আশ্বিন মাসে "হিতৈষিণী-সভার" বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে নারায়ণপুরে এক বিরাটসভার অধিবেশন হইল। হিন্দু, মুসলমান, প্রায় দ্বিসহস্র লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

* * নিবাসী বাবু ব্রজকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মুসলমান-কুল-তিলক মীর মোয়াজেব হোসেন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আজ কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই একাসনে উপবিষ্ট, সকলেই এক গভীব চিন্তায় নিমগ্ন! কি এক অভূতপূর্ব্ব সমবেদনা যেন সকলের হৃদয়কেই আলোড়িত করিতেছে। সকলেই যেন এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত! পরে জনৈক বক্তা সেই নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ সভ্য মণ্ডলীর মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া গভীর স্বরে জাতি-মান-ঐশ্বর্য্যাপহাবী নীলকরের অত্যাচার কাহিনী যথাযথ রূপে বর্ণনা করিলেন এবং স্থান পরিত্যাগ ব্যতীত তাহাদের সহিত কোনরূপে নিস্পত্তি অসম্ভব বলিয়া জানাইলেন। তখন সভাস্থ সমস্ত লোক হিন্দু-গুরু ব্রাহ্মণ ও মুসলমান-গুরু মীর সাহেব সমক্ষে এই অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত যে কোন বিপদকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। পরে উভয় জাতিই দুর্ব্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, সর্ব্বপাপহারী, সর্ব্বজীব-পরিত্রাণ-কারী জগদীশ্বরের নাম স্বীয় স্বীয় ভাষায় গগণভেদী নিনাদে উচ্চারণ করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন। পাঠক! হিন্দু-মুসলমানের এই একতায় পরস্পরের মনে যে কি উৎসাহ, আশা ও আনন্দ জন্মিয়াছিল, তাহা তাঁহাদের তৎকালীন প্রফুল্লানন দর্শন করিলেই বুঝিতে পারিতেন! লেখনী দ্বারা তাহা বুঝান সুকঠিন। তাই বলিতেছি, হে হিন্দু-মুসলমানগণ! একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি পরস্পর জাতি-বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া সম্প্রীত ভাবে বশতবাস করিলে এবং পরস্পরের প্রতি যথোচিত সমবেদনা দেখাইলে জীবন কত সুখের হয়, মন কত সরল হয়; হৃদয় কত প্রসাবিত হয়; কত নিঃশঙ্ক চিত্তে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পার। আমি "হরি" বলি, তুমি "আল্লা" বল, তাহাতে ক্ষতি কি? আমি তোমার স্পৃষ্ট অন্ন খাইনা, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তুমি যাহা খাও, আমি তাহা খাই না, তাহাতেই বা কি আসে যায়? এই সামান্য

পার্থক্যের নিমিত্ত, যাহাতে সকলের একই স্বার্থ,যাহাতে সকলেরই একরূপ ক্ষতি কিম্বা লাভ, তাহাতে একত্র হঁইয়া কার্য্য না করা কি বুদ্ধিমানের পরিচয়? দেখ আজ উভয়ের মনে কি আনন্দের উদয় হইতেছে। বিপদ যে সম্মুখীন, তাহাত সকলেই বুঝিতে পারিতেছে তত্রাচ যেন মনে হইতেছে যে, কিসের যেন অভাব ছিল, কি যেন বহুকাল হারাইয়াছিল ; তাহাই যেন আজ পাইয়াছি, হৃদয়ে যেন কোন অননুভূত–শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। কারণ যাহার নাম শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, আজ যেন তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহার কার্য্যে প্রতিবাদ করিতে সাহস হইতেছে। এরূপ শক্তি–সঞ্চারিণী একতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেন দুর্ব্বল ও ভগ্ন হৃদয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে? এস, সকলে এক হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে থাকি।

এই সভার পর হইতেই নীলকরের সহিত মামলা মোকদ্দমার খরচাদি চালাইবার নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহেব আবশ্যক হইল। এই কার্য্য সম্পাদনে আলুকদিয়া নিবাসী মীর মোয়াজেব হোসেন, ঘুল্লিয়া নিবাসী শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও পূণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, উড়ুয়া নিবাসী কেদার নাথ ঘোষ, বিনোদপুর নিবাসী বরদা কান্ত সরকার ও বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় খোর্দ্দনাওডাঙ্গা নিবাসী জগদীশ্বর চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণপুর নিবাসী কৃষ্ণলাল দেও শত্রুজিৎপুর নিবাসী বিষ্ণুভূষন সিংহকে লইয়া একটী কার্য নির্ব্বাহিকা সমিতি সংগঠিত হয়। স্থির হইল কার্য্য নির্ব্বাহ সমিতি, মোকদ্দমাদির তদ্বিব এবং ইহার ব্যয়ার্থ চাদা সংগ্রহ করিবেন এবং জোটবদ্ধ প্রজাগণের মধ্যে একতার বলে বলীয়ান হইয়া কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার না করে তাহা দেখিবেন। প্রথম প্রথম নবোৎসাহে নবোদ্যমে সকলেই কায্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। গ্রামে গ্রামে সভা হইয়া চাঁদা আদায় করিতে লাগিল। বষাপগমে প্রজাগণ, তাঁহাদের জমীতে আর "ছিটে নীল" বুনিতে দিলেন না। তাহারা জমীতে অন্যান্য খন্দ বুনিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় মাগুরার ডেপুটি বাবু বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় নীলকর ও প্রজাগণের মধ্যে কোনরূপ হাঙ্গামা উপস্থিত না হয় তজ্জন্য স্থানে ২ শান্তি–রক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং বিনোদপুরে তাঁবু সংস্থাপন করিয়া রহিলেন। শত্রুজিৎপুরের চরে গোপাল চন্দ্র সিংহ এবং বিধূভূষণ সিংহের যে সমুদয় স্থান লইয়া গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা সেই সমুদয় স্থানের বাবদ ১৪৫ ধারায় মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া উভয় প্রজা ও নীলকর সাহেবের উপর নোটীস জারি করিয়া রহিলেন। এবং উভয় পক্ষের প্রমাণাদি গ্রহণে উচিত মীমাংসা করিয়া দিলেন। ডেপুটী বাবু নিরপেক্ষ ভাবে অতীত তেজস্বীতা ও কৌশলের সহিত কার্য্য করায় যে পর্যন্ত তিনি সবডিভিসনের কর্ত্তা ছিলেন যে পর্যন্ত কোথাও বিন্দুমাত্র হাঙ্গামা হয় নাই।

বিবিধ।

ছাপাখানার নানাপ্রকার অসুবিধা থাকায়, আমাদের বহুচেষ্টা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যতা প্রযুক্ত "কল্যাণী" যথা সময়ে বাহির করিতে পারি নাই। এই জন্য গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। দৈব দুর্ব্বিপাক না ঘটিলে কল্যাণী আগামী আষাঢ় মাস হইতে যথা নিয়মে

প্রকাশিত হইবে এমত আশা করি। কারণ মাগুরার 'প্রেস' আসায়, নিজের তত্ত্বাবধানে মুদ্রাঙ্কনাদি কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিবার সুবিধা হইয়াছে।

আগামী বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশিত হইলেই বর্ত্তমান বৎসর শোধ হইবে। গ্রাহক বর্গের নিকট সানুনয় প্রার্থনা যেন তাঁহারা মূল্যাদি প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন।

পরিষদ

জেলা যশোহরের মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত, বহুতর পণ্ডিতের আবাস স্থান বারইখালী, শত্রুজিৎপুর ও ধলহরা গ্রামের বৈদিক ব্রাহ্মণগণ নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন। -

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্করত্ন।
২। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সাংখ্যতীর্থ।
৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কাব্যতীর্থ।
৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন।
৫। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ স্মৃতিভূষণ।
৬। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ।
৭। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র কাব্য তীর্থ।
৮। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৯। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্ত্তী।

যশোহর মাগুরার অন্তর্গত ভাটিপাড়া গ্রামের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ, নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত জানকী চক্রবর্ত্তী।
২। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৩। শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম চক্রবর্ত্তী।

আমাদের ভাবি সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে আগামী জুন মাসে ভারতবর্ষের অনেক রাজন্যবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র ২ ভবনে বাসস্থান দেওয়া হইবে। কাহার কোথায় থাকিবার বন্দবস্ত তাহাও ঠিক হইয়া গিয়াছে। জয়পুরের মহারাজা নিজে এক জাহাজে ছয় মাসের খাদ্য দ্রব্য ও পাচক ব্রাহ্মণাদি লইয়া হিন্দুত্ব রক্ষা করিয়া ইংলণ্ডে রওনা হইতেছেন। আমাদের বাঙ্গালা হইতে মহারাজাকুমার প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর যাইতেছেন।

যশোর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান, হিন্দুপত্রিকা[৮৮] ও ব্রহ্মচারিণের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মজুমদার এম এ, বি এল, জাতিভেদ প্রথার অনুকূলে ও প্রতিকূলে দুইটী প্রবন্ধে জন্য ১০০ টাকা করিয়া ২০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। যদু বাবু স্বয়ং, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[৮৭] এম এ ও হাইকোর্টের এটর্ণি বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্ত[৮৫] এম এ বিএল পরীক্ষক ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেকেই

প্রবন্ধ পাঠান। রামকৃষ্ণ মিশনের ভগিনী নিবেদিতা (মিস মার্গারেট নোবেল)[৬৬] প্রথমোক্ত বিষয়ের এবং রাজসাহীর বাবু রাজেন্দ্র লাল আচার্য্য[৬৭] বিএ অপরটীর পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি ব্রহ্মচারিন ও হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৪র্থ বর্ষ, ১১শ-১২শ সংখ্যা, চৈত্র-বৈশাখ ১৩১১

কল্যাণী, আমাদের কর্ত্তব্য, শিবানন্দ স্বামী : শিবে পাগলার সিদ্ধির লোক

সীতারামোৎসব।

বিগত ১লা চৈত্র হইতে ১২ই চৈত্র পর্যন্ত কয়েক দিবসে সীতারামের রাজধানী বাঙ্গালীর পুণ্যক্ষেত্র মহম্মদপুরে মহাসমারোহে সীতারাম উৎসব হইয়া গিয়াছে। সীতারামের তিরোধানের পরে মহম্মদপুরে এই উৎসবের ন্যায় পবিত্র মহান দৃশ্য আর কখনও পরিদষ্ট হয় নাই। উৎসবের সেই আনন্দ কোলাহল, সেই ঘন ঘন জয় সীতারাম ধ্বনি, সেই হিন্দু মুসলমানের পবিত্র সম্মিলন উৎসব সমাগত ব্যক্তিবর্গের প্রাণে কিযে এক ব্যাকুলতা, মাতৃভূমির উন্নতি সাধনের নিমিত্ত কি যে এক আগ্রহের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল, তাহা যাহারা উৎসবে যোগদান করেন নাই তাহাদিগকে বুঝান সম্ভব হইবে না। মাগুরা, বিনোদপুর, লোহাগড়া প্রভৃতি বিদ্যালয়ের সুকুমারমতি বালকবৃন্দ বাসন্তী বর্ণের শিরস্ত্রাণে শোভিত স্বেচ্ছাসেবকরূপে যেরূপ তৎপরতা দেখাইয়াছিল ও যেরূপ কষ্ট স্বীকার ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছিল তাহাতে দেশের ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে বাস্তববিকই আশা হয়। উৎসবে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে গণ্যমান্য স্বদেশ হিতৈষীগণ উপস্থিত হইবেন, উৎসব কমিটির কার্য্যাধ্যক্ষগণের এইরূপ আশাছিল। তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই বটে কিন্তু মাগুরা, বিনোদপুর, গঙ্গারামপুর, লোহাগড়া, লক্ষ্মীপাশা প্রভৃতি স্থানের অনেকানেক ভদ্রলোক ও স্থানীয় ইতর ভদ্র সর্ববশ্রেণীর লোকে উৎসবে যেরূপ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন তাহাতে উৎসব আশাতীতরূপ সফল হইয়াছে এ কথা সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে প্রতিনিধি স্বরূপ বিখ্যাত বিশ্বকোষ অভিধান ও সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র বসু[৬৮] মহাশয় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি উৎসবের অনুষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করিয়া বাস্তবিকই মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি মহম্মদপুরে উৎসব সমিতির কার্যাধ্যক্ষগণের নিকট নিজের মনের ভাব যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন ও কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ বাবু বসন্ত কুমার বসুর নিকট যেরূপ উৎসাহ উদ্দীপক পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে আশা হয় যে, আগামীবারের উৎসব ক্ষেত্রে কলিকাতা হইতে বহু সংখ্যক ভদ্র ব্যক্তিগণের সমাগম হইবে। তিনি যাহাতে আগমী বারের উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় তৎপক্ষে সমিতির নিকট দশটি টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। ফরিদপুর হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার[৬৯] মহাশয় অনিবার্য্য কারণ বশতঃ নিজের অনুপস্থিতির নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া সমিতির উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতিপূর্ণ একখানি পত্র সমিতি সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। বরিশাল হইতে বিখ্যাত বাবু অশ্বিনী কুমার দত্তও[৭০] উৎসবে যোগদান করিতে না পারায় দুঃখ করিয়া

পত্র লিখিয়াছিলেন। বঙ্গললনা কুল গৌরব, মাতৃভূমির সুসন্তান শ্রীমতী সরলা দেবী ঘোষাল[১] লিখিয়াছেন যে, তিনি উৎসবের শেষ দিন পর্যন্ত উৎসবক্ষেত্রে একবার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত যত্নবতী ছিলেন। কিন্তু তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় পারিবারিক ব্যাপারে নিতান্ত বিব্রত থাকায় আসিতে পারিলেন না। তন্নিমিত্ত তিনি সবশেষে দুঃখিত। তারক ব্রহ্ম ব্রহ্মচারী নামক এক জন পরিব্রাজক সুদূর বৃন্দাবন ভূমি হইতে প্রানের টানে মহম্মদপুর আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়া সকলকে উৎসাহান্বিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থান হইতে আরও অনেক অনেক ভদ্রলোক সমাগত হইয়াছিলেন। উৎসব সমিতিকে কয়েক দিন পর্য্যন্ত প্রতি বেলায় দুই শতর অধিক লোককে আহার যোগাইতে হইয়াছে। তাহা বাদে স্থানীয় ভদ্রলোকগণের প্রায় প্রতি বাটীতেই ৫৭১০ জন করিয়া দূর দেশীয় আত্মীয় স্বজন উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবের প্রথম ২/১ দিন বেশী লোক সমাগম হয় নাই। প্রথম দিন নগর ভ্রমণ ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। তৃতীয় দিন মুসলমানগণেব নমাজ ও সিন্নির সহিত উৎসব বাস্তববিক আরম্ভ হয়। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে প্রায় দুই তিন শত সর্ব্বশ্রেণীব মুসলমান আসিয়া এই নমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছা সেবকগণ তাহাদিগকে পদ প্রক্ষালণের জল পয্যন্ত যোগাইয়াছিল। নমাজ অন্তে উৎসব সমিতির অন্যতম সম্পাদক বাবু হীরালাল রায় সাধারণের বোধগম্য ভাষায় সমাগত ব্যক্তিগণকে উৎসবেব উদ্দেশ্য ও দেশেব উন্নতি সাধনেব নিমিত্ত হিন্দু মুসলমানের একতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটী সুললিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎপরে সমাগত মুসলমানগণেব মধ্যে সিন্নি বিতরণ হইয়াছিল।

ঐ রাত্রে স্থানীয় যাত্রাব দল অভিনয় করেন। অভিনয় ভালই হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে কথক শ্রীকেদারেশ্বর তর্করত্ন সীতারামের জীবনী অবলম্বনে কথকতা করিয়া সকলকে মোহিত করিয়া ছিলেন।

অপরাহ্নে একটী মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় সর্ব্বশ্রেণীর লোক যোগ দান করিয়াছিলেন। মধ্যস্থলে ভদ্র লোকগণের বসিবাব আসন বিস্তৃত হইয়াছিল ও চারি পার্শ্বে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ দাড়াইয়াছিল। এ দিন নড়াইল নিবাসী বিখ্যাত ডাক্তাব বাবু বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী এল. এম. এস. সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। সভায় কথক, পণ্ডিত শ্রী কেদারেশ্বর তর্করত্ন, মৌলভি আজিজদ্দিন, লোহাগড়া স্কুলের শিক্ষক শ্রী বিভূতি ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণী সম্পাদক শ্রীবিশ্বেশর মুখোপাধ্যায়, পরিব্রাজক তারক ব্রহ্ম ব্রহ্মচারী, সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত কেদারেশ্বর তর্করত্ন দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও তাহার কারণ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন বিভূতি বাবু ভারতের সর্ব্বত্র এক লিখিত ভাষা প্রচলন সম্বন্ধে একটা সুললিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক তারক ব্রহ্ম ব্রহ্মচারী সর্ব্ব সাধারনের বোধগম্য ভাষায় আমাদের কৃষি প্রধান দেশে গোরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার বক্তৃতায় সর্ব্ব সাধারণে বিশেষতঃ নিরক্ষর কৃষকগণ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিল। মৌলভি আজিজদ্দিন, ব্রহ্মচারীর প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া মুসলমানগণের গো হত্যাব বিরুদ্ধে একটী

যুক্তিপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি কোরাণ ও মুসলমানগণের অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে আহারের নিমিত্ত গোহত্যা বাস্তবিক মুসলমান ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় দেশের প্রত্যেক সন্তান কেহ দেশ হিতকর ব্রতে স্বীয় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়া একটি উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সোদাকার সভ্যর কার্য্য শেষ করেন।

পরদিন প্রাতে বাবু অটল বিহারী বসুর যাত্রা সম্প্রদায় মাগুরায় ডাক্তার বাবু মোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক উৎসবের সময় অভিনয়োপলক্ষে প্রণীত সীতারাম গীতাভিনয় নামক নাটক খানি অভিনয় কারিয়া সর্ব্ব সাধারনের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। সীতারাম নাটকের ন্যায় নাটক যাত্রা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনয়ের উদ্যম এদেশে এই প্রথম।

যাত্রা সম্প্রদায় সচরাচর যে শ্রেণীর নাটক অভিনয় করা হইয়া থাকে। ইহার সহিত তাহাদের কিছুই মিল নাই। সেগুলিতে রামায়ণ মহাভারত অথবা কোনও পুরাণ হইতে কোনও উপাখ্যান লইয়া তম্মুলে শ্রোতৃবর্গকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। এখানিতে সীতারাম রায়ের জীবনী লইয়া জন সাধারণকে দেশহিত ব্রতে জীবনোৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করার চেষ্টা করা হইয়াছিল। আমরা দেশের শিক্ষিত ব্যাক্তিগণের ও যাত্রা সম্প্রদায়ের নিমিত্ত নাটকাদি প্রণেতাগণের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষন করিতেছি। তাঁহারা সকলে এ দিকে একটু চেষ্টা করিলে অচিরে এই শ্রেণীর নাটক যাত্রার আসরে অভিনীত হইয়া যাত্রাভিনয়কে লোকশিক্ষার একটি প্রাধান উপকরণে পরিণত করিবে। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের নাটক আজকাল স্বদেশ ভক্তিমূলক নাটকাদির অভিনয় মাঝে মাঝে হইতেছে বটে কিন্তু তাহা শুনিবার অবসর ও সুবিধা অতি সামান্য সংখ্যক লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। যাত্রাভিনয় কিন্তু দেশের সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই তাহা অতি মনোযোগের সাহিত শুনিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ শ্রেণীর নাটক যাত্রায় অভিনয়ের উদ্যম এ দেশে এই প্রথম। বাবু অটল বিহারী বসুর যাত্রা সম্প্রদায়ও ঐ নাটক খানি অন্যকোথায়ও পূর্ব্বে একবার অভিনয় করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। উৎসবের এক মাস পূর্ব্বে নাটকখানি তাহাদিগের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল এবং উৎসবে অভিনয় করিবার নিমিত্ত নাটককানি একটু তাড়তাড়ি রচনা করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত বিবেচনা করিতে গেলে অভিনয় ভালই হইয়াছিল বলিতে হইবে। নাটকে দেশের দুর্দ্দশাব্যঞ্জক জাতীয় সঙ্গীতগুলি অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী করিয়াছিল।

ঐ দিন অপবাহ্নে, আর একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়, ঐ দিনকার সভায় কলিকাত হইতে আগত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু সভাপতির কার্য্য করেন। সভায় মৌলবি আজিজুর রহমান, মৌলবি আজিজদ্দিন বিভূতি ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মৌলভি আজিজ রহমান ও মৌলবি আজিজদ্দিন এ দিনও গো হত্যার বিরুদ্ধে সমবেত মুসলমানগণকে উপদেশ দেন। সভাপতি মহাশয়ের বঙ্গের ভাষা বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পরিশেষে বাবু বিভূতি ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় দেশহিতব্রতে সকলকে উত্তেজিত করিয়া যে একটি উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দেন

তাহা অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতায় ডাক্তার মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যকৃত সীতারাম নামক পুস্তক পানির [পনের ?] শতাধিক সংখ্যা প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিক্রীত হইয়াছিল। মোক্ষদা বাবু এই বিক্রয় লব্ধ মুদ্রা হইতে তাঁহার মুদ্রাঙ্কন ব্যয় রাখিয়া আর সবই সীতারামোৎসব সমিতিতে দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে তিনি তাহাব এক পয়সাও উৎসব সমিতিতে দেন নাই।

ঐ দিবস রাত্রিতে কলিকাতার সুবিখ্যাত রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি তাঁহাদের জীবন্ত চিত্র প্রদর্শন সকলকেই অত্যন্ত মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন।

ঐ রাত্রিতে ধুলজুড়ীর জমিদার বাবু হবলাল বসু মহাশয় উৎসব কমিটির সভাগণকে ও ভলন্টিযারদিগকে স্বীয় ভবনে আমন্ত্রণ করিয়া অতি পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন কবাইয়াছিলেন।

পব দিবস প্রাতে বাবু অতল বিহাবী বসুর যাত্রা সম্প্রদায় একখানি পৌরাণিক নাটকাভিনয় করেন। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল। ঐ দিন সকালবেলা কলিকাতাব বয়েল বায়াস্কোপ কোম্পানি সীতাবামের প্রসাদেব ভগ্নাবশেষগুলির কযেক খানি ফটো লইযাছিলেন। দশভূজাব মন্দিরের দেয়ালে হস্তী পৃষ্ঠোপরি আসীন সসৈন্য সীতাবাম রায়ের যে চিত্রটি আছে তাহার ফটো লওয়া হয। ঐ মন্দিরের পার্শ্বস্থিত অপর একটা মন্দিরের ছবিও তোলা হয়। এতদ্ব্যতীত সীতাবামেব অন্দব মহালেব দুই খানি, বামসাগবেব তিনটি, হরে কৃষ্ণ ঠাকুবেব মন্দিবেব একখানি ও স্বেচ্ছা সেবকগণেব একখানি ছবি তোলা হয।

অপরাহ্নে, মাগুবা, বিনোদপুব, লোহাগাড়া, লক্ষ্মীপাসা, ফুকরা, গঙ্গারামপুর প্রভৃতি বিদ্যালযের বালকগণেব শারীরিক বল সম্বন্ধীয় নানারূপ ক্রীড়ার অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে প্রতিযোগীতায নিম্নলিখিত বালকগণ পুরস্কাব পাইবার উপযুক্ত বলিয়া স্থিব হইযাছে।

লাঠি খেলা – মাগুরা ইংরাজী স্কুলেব ছাত্র সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায।

কুস্তি-- জয়পুব লোহাগাড়া স্কুলের ছাত্র যোগেন্দ্র নাথ দাস (১ম পুরস্কাব) বিনোদপুব ইংরাজী স্কুলের ছাত্র গোপাল চন্দ্র বায় (২য় পুরস্কার)।

উল্লম্ফন- -(High Jump) জযপুব লোহাগাড়া ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র কাশীনাথ সরকার।

দূরলম্ফন—(Long Jump) জয়পুর লোহাগড়া ইনষ্টিটিউসনের ছাত্র কাশীনাথ সরকার।

সন্তরণ—নড়াইল ভিকটোরিয়া কলেজের ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

রাত্রে রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানির জীবন্ত চিত্র প্রদর্শন হইয়াছিল।।

উৎসবের প্রধান অনুষ্ঠানগলি এই দিনই প্রায় শেষ হইয়াছিল। এই দিন আগন্তুক ভদ্রলোকগণ প্রায় সকলেই মহম্মদপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরদিন অপরাহ্নে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের লাটিয়ালগণের লাঠি খেলা হইবার কথা ছিল কিন্তু দ্বিপ্রহরে ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হওয়ায় তাহা হইতে পাবে নাই। অসংখ্য শিলাপাতে চন্দ্রাতপাদি ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উৎসব কমিটির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। রাত্রে রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানির আর এক অভিনয় হইবার কথা ছিল, কিন্তু উক্ত কারণে তাহাও হইতে পারে নাই।

ইহার পরও প্রায় সাত দিন মেলা ছিল ঐ কয়েক দিবস নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের নিমিত্ত জারি ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। বাবু হীরালাল রায় ব্যতীত উৎসব কমিটির অন্যান সভ্যগণ মেলা ভাঙ্গিবার আগেই মাগুরায় প্রত্যাবর্ত্ত করেন।

সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে উৎসব এবারে আশাতীত ভাবে সফল হইয়াছে। উৎসবের কয়েক দিন সর্ব্বশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা গিয়াছে তাহা অন্যত্র কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। নগেন্দ্র বাবু বলিয়া গিয়াছেন যে, এই শ্রেণীর জাতীয় উৎসবসমূহ ভবিষ্যতে সীতারামোৎসবের আদর্শে গঠিত হইবে। তাহা যদি কোনও দিন হয় তবে তাহা সীতারামোৎসবের উৎসবকমিটির সভাগণের পক্ষে গৌরবের দিন হইবে। কিন্তু তাই না হইলেও মহম্মদপুরে এই উৎসবটীর বৎসর বৎসর অনুষ্ঠান হওযা একান্ত আবশ্যক তাহা সকলেই বলিবেন। আমাদের উৎসাহ উদ্যম দুদীনের জন্য স্ফূর্ত্ত পাইয়া তাহার পরেই চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। এক্ষেত্রেও সেই চিরন্তন প্রথার অনুসরণ হইলে বড়ই দুঃখের বিষণ্ন হইবে। উৎসব কমিটির সভ্যগণের এবার বিস্তর পারিশ্রম স্বীকার ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। এরূপ মহৎ কার্য্যে প্রাণপনে পরিশ্রম করিতে তাহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। কিন্তু পুনরায় এরূপভাবে অর্থ ব্যয়করা তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে বলিয়া বোধ করি না। দেশের সুসন্তানগণ এই জাতীয়মহোৎসবে যোগদান না করিলে ইহার অধিককাল স্থায়িত্বের আশা করা যায় না। আমরা আশাকরি বঙ্গদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই এই উৎসবে ভবিষ্যতে যোগদান করিয়া দেশের হিতও স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

মহম্মদপুর দর্শনে

কি দেখিতে আসিলাম
কি বা আসি দেখিলাম,
অতীতের চিহ্নমাত্র রয়েছে পতিত,
কালের কুটিল চক্রে হয়ে নিস্পেসিত।
বিজয় পতাকা যার
উড়িত বঙ্গ মাঝার,
সে গৌরব রবি হায় হলে অস্তমিত
ডুবেছে তিমিরে তার কীর্ত্তি শত শত।

রাখিতে দেশের মান
যে করে ভীম কৃপাণ
বিদ্যুৎ প্রতিভা সম ঝলিসিত সদা,
কোথা সই মহাবীর বঙ্গের দেবতা?

হিন্দু কি মুসলমানে
সকলে অভেদ জ্ঞানে
পালিতেন সদা যিনি অপত্য সমান,
তাঁর রাজধানি এযে পুণ্যময় স্থান!

বাব মধুমতী তীবে,
বাঁধ নগব প্রাচীবে,
গবজিত ভীমনাদে ভীষণ কাম্পান,
অবাতি হৃদয বাহে হ'ত কম্পমান

ছিল যে বাজভবন
শৃগাল ববাহগণ
কবিযাছে হায হায পূণ অধিকাব
মহাবাজ আসি কুসি দেখ একবাব।

যাহে নানা আভবণে
সাজাতে কত যতনে,
সে নগবী মুখ ঢাকি অবণ্য-বসনে
নীববে কাঁদিছে আহা, তোমাব কাবণে

দুস্তব ফুবসি* জলা
আছিল যাব মেখলা
এবে তাব চিহ্ন মাত্র বযেছে পডিযা,
যেন শোক–অশ্রু ত্যাজ গেছে শুকাইযা

ক্ষণ বিবামেব তবে
প্রশস্ত পবিখাপাবে
ছিল যে সুখসাগব* শান্তি নিকেতন,
নাবিনু দেখিতে তাহা, অবণ্য ভীষণ।

সুশীতল সুনিস্মল
জল বাশি ঢল ঢল
খেলিতে যে সবোববে সমীবণ সনে
শেবাল পূবিত তাহা তোমাব বিহনে।

মধুমতি সুধা ধাবে
স্নিগ্ধ বাবি পান তবে
যোগাইত দাসীৰূপে নিকটে থাকিযা,
তোমাবিনা মনদুঃখে গিযাছে সবিযা।

বীব পদ বজঃ যশা
দেখিলাম গিযা তথা
বনমাঝে দোলমঞ্চ প্রশস্ত প্রাঙ্গণ

মহম্মদপুব অৰ্দ্ধচন্দ্রাকাবে বেষ্টিত বিল।
সবোবব মধ্যস্থিত ভগ্ন বাজবাড়ী।

বীব মেনাহতী* সেথা শিক্ষা দিত বণ।

যে জন দেশেব তবে
আত্মবলি দিতে পাবে
অনন্ত স্ববগে তাব বাস সুনিশ্চয,
নশ্বব জগতে স্মৃতি যশ গাঁথা বয।

চাহি আকাশেব পানে
কহিনু কাতব প্রাণে
যত বীবগণ আছ অমব নগবে,
এস হৃদি সিংহাসনে পূজি সবাকবে?

বলিলাম, দশভজে
যে জন তোমায পূজে
হয কি মা সে জনাব এই পবিণাম,
বীবেব জননী তুমি বীব সীতাবাম—।

নানা। অসুব নাশিনী
তুমি যে বণ বঙ্গিনী
হযেছিল পুত্র তব আত্ম বিস্মবণ,
বীবোচিত কায্য ভুলি পাইল নিধন।
নহিলে মা দশ কবে
বিবিধ আযুধ ধবে
কবিতে সমবে তুমি অবাতি সংহাব,
ত শক্তি বোধে মাতঃ হেন শক্তি কাব?

ভাবত সন্তান তোবে
মাটি খড দিযে গড়ে
অজ-শিশু আনি ভীরু বধে তাব প্রাণ,
ইচছাময়ি তব ইচ্ছা বুঝেনা অজ্ঞান।

কি দোষ তোমাব মাতা,
তব পুত্র কি দুহিতা
বিজয উৎসব কবে বসন ভূষণে,
বিলাসিতা বীবমাতা সহিবে কেমনে?

মাভৈ মাভৈ ববে
কব মা অভয সবে,
জানি ভাল বাস মাগো থাকিতে মশানে,

* সীতাবামেব সেনাপতি মৃণ্ময ঘোষ।

তাই বলি ফিরে এসো ভারত শ্মশানে?

সহসা জ্ঞান আলোকে
দেখিলাম চারি দিকে
বর্ত্তমান সীতারাম বীরেন্দ্র কেশরী,
অনন্তে অমর নামু লেখা সারি সারি!

অরণ্য প্রান্তর থাকি
কে যেন বলিল ডাকি
যাও বঙ্গ সমস্বরে জয় সীতারাম
বঙ্গ শেষ বীররাজে পূজ অবিরাম।

বসন্ত যোগাশ্রমী
(স্বামী) কেশবানন্দ।

ওমেদারের স্বপ্ন,

বিবিধ।

বিনোদপুর হাই. ইং, স্কুলের পুরস্কার বিতরণ অতি সমারোহ সম্পাদিত হইয়াছে। অনেক গণ্যমাণ্য ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মাগুরা হইতে বাবু রমণী মোহন দাস এম. এ. সবর্ডিভিসনাল অফিসার বাবু হেম চন্দ্র মিত্র বি. এল. ১ম মুনসেফ, রেভারেন্ড ভগবতী চরণ ঘোষ, বাবু সুরেশ চন্দ্র সেন এম. এ. বিএল. বাবু সুরেন্দ্র নাগ বিশ্বাস, বাবু রেবতী কান্ত সরকার, সীতারামরায়ের ইতিহাস লেখক বাবু, যদু নাথ ভট্টাচার্য্য, বাবু হীরালাল রায়, বাবু সৌরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, শ্রীপুরের সাবরেজিষ্টার, নলডাঙ্গার দেওয়ান বাবু শ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নায়েব বাবু কালীবর মিত্র, এতদ্দেশীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় আলুকদিয়া নিবাসী মির মোয়াজ্জেম হোসেন, বিদ্যালয়ের সম্পাদক বাবু বসন্ত কুমার বসু সহকারী সম্পাদক বাবু পূর্ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কল্যাণী সম্পাদক বাবু বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ইহা ব্যতীত স্থানীয় ৫০০/৬০০ লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন বাবু রেবতী কান্ত সরকারের প্রস্তাবানুযায়ী সর্ব্বসম্মতিক্রমে বাবু রমনী মোহন দাস এম. এ. সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই উৎসবোপলক্ষে রচিত একটি গান হারমনিয়াসহ গীত হইয়া কার্য্যারম্ভ হয। কয়েকটি ছাত্র আবৃত্তি করে, আলেকজেন্ডর ও ববারের গল্পটির আবৃত্তি মন্দ হয় নাই. সহকারী সম্পাদক বাবু পূর্ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করেন। ইহা হইতে জানা যায় যে. বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা অতীব আশাপ্রদ, এক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা দুই শত হইয়াছে। যে সমুদয় মহোদয়ের বদান্যতায় বিদ্যালয়টি বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত মহাত্মাগণ অগ্রগণ্য, বাবু রমণী মোহন দায় মাগুরার সবডিভিসনাল অফিসার, বাবু ইন্দুভূষণ বসু সাং ধুলজুড়ি, বিহারী লাল বসু সা বগীয়া, মহম্মদ ওমেদ মোল্লা সাং বেলনগর, মির মোয়াজ্জেম হোসেন সাং আলুকদিয়া। সভায় বাবু সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, বাবু যদু নাথ ভট্টাচার্য, বাবু কালিবর মিত্র বালকদিগকে সুযুক্তিপূর্ণ

উপদেশ দিয়া বক্তৃতা করেন এবং দ্বিতীয় শিক্ষক মহম্মদ গোলাম হোসেন সাহেব এই উপলক্ষে লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা স্থানাভাবে এবার প্রকাশিত হইল না। পরে সভাপতি মহাশয়ের উপদেশপূর্ণ সুললিত বক্তৃতায় সভ্যগণ মুগ্ধ হয়েন। ইনি সত্যই বলিয়াছিলেন যে, যাঁহার অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায় ও অজস্র অর্থ ব্যয়ে এই বিদ্যালয়টি সংস্থাপিত এবং যাঁহারা চেষ্টায় এই মহতী সভা, বিদ্যালয়ের সম্পাদক সেই বাবু বসন্ত কুমাব বসুকে. কে, পুত্রহীন কহে? দেখা যাইতেছে, তিনি আজ দুই শত পুত্রের পিতা। কল্যাণী সম্পাদক, সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য সভ্যগণকে ধনবাদ দেওয়ার পর সভা ভঙ্গ হয়। পরে সম্পাদক মহাশয় দূরস্থিত ভদ্রলোকদিগকে পরিতোষ করিয়া ভোজন করান। বিনোদপুর এবং তাহার নিকবর্ত্তী গ্রামসমূহের লোক বসন্ত বাবুর নিকট চিবকৃতজ্ঞ।

মাগুরার প্রসিদ্ধ উকিল, বিনোদপুরের ইংরাজি বিদ্যালয়ের সম্পাদক বাবু বসন্ত কুমার বসুর বিদুষী স্ত্রী সাগরদাড়ের প্রসিদ্ধ দত্ত বংশের কন্যা শ্রীমতী মহালক্ষ্মী বসু মাগুরার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য পাকা ভিত্তির উপর একখানি টিনের ঘর নিম্মাণ করিয়া দিতেছেন, ইহাতে অন্যুন পাচশত টাকা ব্যয় হইবে। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, ইহারা দীঘ জীবন লাভ করিয়া দেশ হিতকর কায্যে ব্রতী থাকুন।

মাগুরা ইংবাজি বিদ্যালয়ের সম্পাদক সবর্ডিভিসনাল অফিসার বাবু রমণী মোহন দাস এম এ মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় হিন্দু বোর্ডিংটি পাকা হইতে চলিল। পাঁচ হাজার টাকা এষ্টিমেট হইয়াছে, গবর্ণমেন্ট ১৯০০ টাকা দিবেন। ইহাব মধ্যে এক হাজার টাকা দিয়াছেন, স্কুল ফান্ড হইতে ৬০০ টাকা পাওয়া যাইবে, বাকি ১৫০০ সাধাবনের দানের উপর নির্ভর কবে। টাকা সংগহের নিমিত্ত ইতিমধ্যে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মাগুরার ১ম মুনসেফ বাবু হেম চন্দ্র মিত্র মহাশয় সভাপতিব আসন গ্রহণ কবেন, সভায় প্রায় ৩০০ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, কতক তখনই সংগৃহীত হইয়াছে, মহম্মদ ওমেদ মোল্লা ১০০টাকা, বাবু বমনী মোহন দাস ৫০টাকা, বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস ২৫ টাকা, বাবু নৃপেন্দ্র নাথ পাল ২৫ টাকা দিতে স্বীকার করিযাছেন। একটি কার্য্যনির্ব্বাহ সমিতি গঠিত হইয়াছে যশোহরের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু সূয্যকুমার অগস্তি বাহাদুর উক্ত সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আশা করি স্বদেশ হৈতৈশী মহোদয়গণ এই হিতকর কার্য্যে যথা সাধ্য সাহায্য দান করিবেন।

মাগুরায় একটি চোরের দল গঠিত হইয়াছিল, মাঝে মাঝে প্রায়ই চুরি হইত, স্থানীয় পুলিশের চেষ্টায় সম্প্রতি এই দল ধরা পড়িয়া শাস্তি পাইয়াছে, বোধ হয় চুরি এখন অনেক কমিবে এবং লোকে নিরাপদে নিদ্রা বাইতে পারিবে, যে যে পুলিশের চেষ্টায় এই দল ধৃত হইল. আশা করি গবর্ণমেন্ট ইহাদের পদোন্নতি করিয়া উৎসাহিত করিবেন।

যশোহরের প্রসিদ্ধ উকিল ধোমাইলের জমিদার রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর রেকর্ড অব রাইটের দ্বারা ধোমাইলের প্রজাবৃন্দের কর বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন একারণ উভয় পক্ষ হইতে মাগুরার ডে ম্যাজিস্ট্রেট বাবু রমণী মোহন দাস এম. এ. মহাশয়ের নিকট প্রায় ৫০০/৬০০ মোকদ্দমা রুজু হইয়াছে। মোকাদ্দমা দ্বারা শর্ত সব্যস্ত করিতে হইলে উভয় পক্ষেরই বহু অর্থ ব্যয়িত হইত, গরিব প্রজাবৃন্দ একে কালেই উৎসন্ন যাইত, যাহা হউক আমরা সুখী হইলাম যে উভয় পক্ষই ডেপুটি বাবুকে শালিস মান্য করিয়াছেন। রায় বাহাদুর মহাশয় শিক্ষিত আইনজ্ঞ, এবং নীল বিদ্রোহের সময় তিনি যেরূপ প্রজাপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন তাহা আমাদেব অবিদিত নাই। তাঁহাকে প্রজাবঞ্জক বলিয়াই আমরা জানি, আশা করি, তিনি প্রজাবৃন্দকে যাহার যে স্বত্ব আছে তাহা বজায় বাখিযা যাহাতে তাহারা ভিটায় থাকিতে পাবে সেইরূপ মীমাংসা করতঃ একেকালে ঢোলে দাখিল করিয়া তাঁহার সুখ্যাতি অক্ষুণ্ন বাখিবেন।

সম্প্রতি কল্যাণীতে মাগুবাব মুনসেফ আদালতে নিলামী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার আদেশ হইয়াছে। ভূতপূব্ব মুনসেফ বাবু চারুচন্দ্র মিত্র বাবু শশীকুমার ঘোষ, বাবু জগদীশচন্দ্র সেন, বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, সকলেই ইহাব উপকারিতা একবাক্যে স্বীকাব করিয়াছেন এবং বত্তমান সুযোগ্য জজ মিঃ বি বি মিত্র বাহাদুবেব নিকট তাঁহাদেব অভিমত প্রকাশ করিয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা কবিযাছেন জজবাহাদুও অনুমতি দিয়াছেন। সম্প্রতি মুনসেফ বাবু হেম চন্দ্র মিত্র এবং বাবু সতীশচন্দ্র ঘোয মহোদয়গণ সমুদয় নিলামী বিজ্ঞাপন ইহাতে প্রকাশ করিবাব আদেশ দিয়াছেন। নিম্নলিখিত হাবে বিজ্ঞাপনের ফি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :

১ টাকা হইতে ৫ টাকা পর্যন্ত দাবিব ডিক্রিজাবিতে চারিআনা।

২৬	"	৫০	"
৫১	"	১০০	"
১০১	"	উদ্ধ	"

মাগুবার অনুশীলন সমিতির মাসিক আয় প্রায় ১২টাকা হইয়াছে। সমিতির এক অধিবেশনে এই বিল হইতে একটি অশিতি বষ বযস্কা নিরাশ্রয় গরিব বিধবাকে একখানি বস্ত্র দিবার প্রস্তাব হয় কিন্তু সমিতির সভাপতি বাবু বসন্তকুমার বসু মহাশয় নিজেই তাহাকে এক খানি নূতন কাপড় দিয়াছেন। সামিতির তহবিলে আরও কিছু টাকা সংগৃহীত হইলে একটি সাধারণ ব্যায়ামাগার খুলিবার কথা হইয়াছে। সমিতি হইতে সাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে একজন উপদেষ্টা পাঠাইবার প্রস্তাব হইযাছে।

পাঠকগণ অবগত আছেন গত বৎসর মাগুরায় দেশীয় ভাণ্ডার খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু সীতারামোৎসবের আগ্রহাতিশয্যে এবং অন্যান্য কয়েকটি কারণ বশতঃ এতদ্বিষয়ে

সাধারণে বিশেষ মনযোগ দিতে পারেন নাই সম্প্রতি দেশীয় ভান্ডার খোলা হইয়াছে, স্বদেশীয় বস্ত্রাদি এখানে এক দরে বিক্রয় হইতেছে। ইহা ৫০০ অংশে বিভক্ত। প্রতি অংশের মূল্য ১০টাকা।

মাগুরা সবডিভিসনের অধীন কছুণ্ডি ও কাদির পাড়া গ্রামে দুইটি পুস্তকাগার সংস্থাপিত হইয়াছে। ভাল ভাল পুস্তক অধ্যয়নই জ্ঞানার্জনীবৃত্তি অনুশীলনের প্রধানতম উপায়। ভরাসা করি ভদ্রপল্লিসমূহ এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন। আমরা সীতারামোৎসব প্রবন্ধটীর টীকায় মোক্ষদায়বাবুর টাকা দেওয়ার কথা লিখিয়াছি, উক্ত টাকা, প্রবন্ধটি হস্তগত হইবার পর মোক্ষদা বাবু উৎসব সমিতির সম্পাদকের নিকট দিয়াছেন।

মশাদ্বারা ম্যালেরিয়া বিষ মানব দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে ইহা কিছু দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। আফ্রিকার কোন কোন স্থানে পরীক্ষাদ্বারা এই তত্ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় আমাদের গবর্ণমেন্টও এই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি দমদমায় ম্যালেরিয়া দমনের জন্য কেরোসিনের দ্বারা মশা বিনষ্ট করা হইতেছে, ইহার ফল সন্তোষজনক হইয়াছে যে স্থল ম্যালেরিয়া বিষে জর্জ্জরিত, মশা বিনষ্ট হওয়ার সে স্থল স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। ম্যালেরিয়াই যশোহর জিলা বিশেষতঃ মাগুরা মহকুমার উৎসন্নের প্রধানতম কারণ। স্থানীয় ডেপুটি বাবু বাটীর চতুদ্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার এবং ইহার নিকটবর্ত্তী বাশের ঝাড় নিস্মূলের যে আদেশ দিয়াছেন তাহা প্রকৃতই লোকহিতকর। প্রজাগণের অবস্থা নিতান্ত হীন তাই তাহাবা এই মঙ্গলকর আদেশকেও অত্যাচার বলিয়া মনে করেন, কারণ বাশের ঝাড়, বর্ত্তমানে লোকের একটি প্রধান আয়ের জিনিস কিন্তু মশায় আবাস স্থল। যদিও স্বাস্থ্যের সহিত তুলনায় এই আয় অকিঞ্চিৎকর তবুও গরিব প্র[illegible]। ইহা বুঝিতে পারেনা কাজেই রাজ আদেশেব দরকার হইয়া পড়ে। ভরসা করি সাধারণে মশক নিবারণের উপায় অবলম্বন করিয়া ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিবেন।

বাবুখালি পোষ্টাফিস, নীলকর সাহেবের আমলে বাবুখালি কুঠিতেই স্থাপিত। সাধারণের নানাবিধ অসুবিধা স্বত্বেও সাহেবের ভয়ে কেহই কখন পোষ্টাফিস সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিতে সাহস করিতেন না। পরে উক্ত পোষ্টাফিসের এলাকাস্থিত অনেক গণ্যমান্য লোকের পোষ্ট বিভাগের সুপারিনটেনডেনট বাবু ও ইনেস্পেক্টার বাবুর নিকট পৃথক২ দুইখানি দরখাস্ত করিয়াছিলেন কিন্তু এযাবৎ তাঁহারা তাহার কোনই প্রতিবিধান না করায় এলাকাস্থ প্রজাগণ জেনারাল পোষ্টমাষ্টারের নিকট নানাবিধ অসুবিধা দর্শাইয়া একখানি দরখাস্ত করিয়াছেন এক্ষণে সাধারণের উপর জেনারাল পোষ্ট মাষ্টার বাবু কিরূপ অনুগ্রহ করেন তাহা জানিবার জন্য আমরা সমুৎসুক।

বাবুখালি পোষ্টাফিস, এলেকার উত্তর পার্শ্বে স্থাপিত। পোষ্টাফিসের উত্তরেই গড়ই নদী প্রবাহিত। পর পারেই অন্য পোষ্টাফিসের এলাকা। দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্ব হইতে

বাবুখালি যাতায়াতে অনেক সময় লাগে, একারণ দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের লোকগণ বাবুখালি না গিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের লোকে মহম্মদপুর, পশ্চিম পার্শ্বের লোকে বিনোদপুর পোষ্টাফিসে চিঠিপত্র দেয় ও মনিঅর্ডার প্রভৃতি কয়িয়া থাকে একারণ বাবুখালি পোষ্ট অফিসের আয় সামান্য এবং এলাকাস্থ প্রজাগণের ভয়ানক অসুবিধা, বন্যার সময় দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, পার্শ্ব হইতে পোষ্টাফিসে যাইতে হইলে নৌকা ব্যতীত যাওয়া যায় না, চিঠিপত্র পিওনে সপ্তাহে একদিন মাত্র হাটবাড়িয়ার হাটে বিলি করে। প্রার্থনা, উক্ত পোষ্টাফিস এলাকার কেন্দ্র স্থলে ফলসিয়া কিম্বা হাটবাড়ীয়া গ্রামে স্থাপিত করিলে সাধারণের উপকার হয়। আশা করি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইবে।

৫ম বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩১২

আমাদের মাতৃভাষা।

সকল সভ্য জাতিরই একটী জাতীয় আদশ এবং জাতীয় ভাষা থাকা আবশ্যক জাতীয় শিক্ষা ব্যতিরেকে কখনও কোন জাতি সংগঠিত হইতে পারে না। বৈদেশিক কোন ভাষার আলোচনায়, দুই চারি জন পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু একটী সমগ্র জাতি কোন বৈদেশিক ভাষার উপর নিভর করিয়া, জাতীব উন্নতির প্রত্যাশা কবিতে পাবে না। জগতের ইতিহাসে অদ্যাপি এমত একটী দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায নাই যে, জাতীয় ভাষাহীন কোন একটী জাত কেবলমাত্র বৈদেশিক- শিক্ষায়ই সমুন্নতি লাভ কবিযাছেন।

আমরা বৈদেশিক ভাষাশিক্ষার বিরোধী নহি। নানা বৈদেশিকভাষাব সংস্পশে জাতীয় ভাষা যে যথেষ্ঠ পরিপুষ্টি লাভ কবিতে পারে তাহাও সববান্তঃকরণে স্বীকার কবি। ইউরোপেব রোমীয় ও গ্রাসীয় ভাষার সহিত ইংরাজি ভাষার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইংরাজি ভাষা ঐ দুই সারবান ভাষা হইতে বহুল সম্পদ সংগ্রহ কবিয়াছে। ইংরাজী ভাষার সহিত রোমীয় ও গ্রীসীয় ভাষার যেরূপ সম্বন্ধ ; ভাবতীয ভাষা নিচয়ের সহিত সংস্কৃত ভাষারও সেইরূপ সম্বন্ধ। এমন একদিন ছিল, যখন সংস্কৃত ভাষাই আমাদের কথিত ভাষা ছিল। কালক্রমে সে সৌভাগ্য সম্পদের দিন আমদিগের গিয়াছে। বেদ-নিনাদিত ভারতের সেই দিপ্য জ্যোতিঃ দুর্দ্দিনের গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। আমাদিগেব সে ঘরের বন্ধন, ভাষার বন্ধন প্রভৃতি ধাতব বন্ধন-গ্রস্থ একেবারেই শিথিল, আমাদিগকে অবনতির নিম্নতব স্তরে অধঃপতিত করিয়াছে। ধর্ম্মের বন্ধন, বহুকাল হইল, খসিয়া গিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতেও তাহা পুণর্গ্রথিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। এইক্ষণে যাহাতে ভাষাগত সাম্যের বন্ধন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় তদ্বিষয়ে বিশিষ্ট প্রয়াস পাইবার সময় আসিয়াছে। নানা বিরোধী চেষ্টা সত্বেও আমাদিগকে এই পবিত্র বৃত গ্রহণ করিতেই হইবে ; নতুবা কেবল স্বদেশ প্রীতির তীব্র বক্তৃতায় ভারতের বিন্দুমাত্রও উপকার সাধিত হইবে না।

যৎসামান্য জীবিকার্জ্জন ও জাতীয় ভাষার পরিপুষ্টির উদ্দেশ্যে বৈদেশীক শিক্ষা ভিন্ন, অন্ধের ন্যায়, কেবল মাত্র বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার জন্যই বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করা, কদাচ

উচিত নহে। প্রত্যেক বৈদেশিক ভাষার শিক্ষার্থীরই মনে, এ ভাব নিবিড়-নিবদ্ধ থাকা উচিত যে, এই বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিয়া আমরা জীবিকার্জনের সুবিধা হইবে বটে, কিন্তু সর্বোপরি আমি উহা হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া, মাতৃভাষার সম্পাদক বৃদ্ধি করিতে সযত্ন রহিব। এরূপ না করিয়া যাহারা কোন বৈদেশিক ভাষাকেই কোন জাতীয় ভাষা করিবার দুরাশা, হৃদয়ে পোষণ করেন ; তাঁহারা জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় তাহাতে সন্দেহ নাই।

বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়, কথোপকথনে, বক্তৃতা দিতে ও পত্র লিখনে ভুলিয়াও মাতৃভাষা ব্যবহার করেন না। তাঁহাদের স্বদেশ প্রীতির বক্তৃতাগুলি বৈদেশিক ভাষাতেই উচ্ছ্বসিত হয় ভাল। তাঁহারা বলেন, বঙ্গভাষা অসম্পূর্ণ, একারণে তাহাতে সমস্ত মনোভাব সম্যক ব্যক্ত করা যায় না। বঙ্গভাষা যে অসম্পূর্ণ, তাহা অবশ্য স্বীকার্য ; কিন্তু তাই বলিয়া যদি সকলেই সে ভাষায় ভাব প্রকাশে বিরত থাকি, তাহা হইলে ত কোন কালেই তাহা সম্পূর্ণ হইবে না। যে অসম্পূণ বা অনুন্নত, তাহারা কর্তব্য কি? নিশ্চেষ্ট ভাবে, সেই অসম্পূর্ণতাকেই প্রশ্রয় দিয়া একেবারেই অধঃপাতে যাওয়া? না, সকলেই অযথা ঔদাসিন্য পরিত্যাগ করিযা সেই অসম্পূণতা দূরীকরণ কল্পে বিধিমতে চেষ্টা করা? অভাবের মোচন না হইলে ত চিরকালই সে অভাব থাকিয়া যাইবে, ইহা কে না বুঝে যাহারা বলেন, বঙ্গভাষা অসম্পূণ, তাঁহারা কি ইহা বুঝেন না, যে তাহা হইলে তাহারাও অসম্পূণ? যে হেতু বঙ্গভাষা আমাদিগেরই ভাষা। সেই সকল সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা, তাঁহারা এমত একটী দৃষ্টান্তও দেখাইতে পারেন কি, যে একটী জাতি খুব উন্নত, কিন্তু তাঁহাদিগের ভাষাব অবস্থা অতি হীন?

ইহা নিশ্চিত যে, জাতীয় উন্নতি সববতোভাবে ভাষার উন্নতি সাপেক্ষ, উন্নতি প্রাপ্ত জাতি মাত্রেরই ভাষাও উন্নত। ভাষার উন্নতি ব্যতীত জাতীয় উন্নতি আকাশ কুসুম।

এই অভাব পূরণ করিতে হইলে, আমাদিগকে দেশীয় ভাষায় কথোপকথন, পত্রাদি লিখন এবং হৃদয়ের যাবতীয় সাময়িক উচ্ছ্বাস দেশীয় ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইবে। আমরা সাধারণতঃ আত্মীয় স্বজনের সহিত যে আলাপ করি, তাহার ভাব এত উচ্চ নহে, যে তৎপ্রকাশক ভাষা বাঙ্গলায় খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। উহা বঙ্গভাষার অনভিজ্ঞতা বা বলিবার অনভ্যাস বই আর কিছুই নহে। হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইলে উহার অনুরূপ ভাষা, আপনা হইতেই আসিয়া জুটে। কাব্য জগতের সেই দূরাতীত প্রান্তে, নিষাদকে ক্রৌঞ্চ মিথুনের একেতবকে বধ করিতে দেখিয়া অপরিজ্ঞাত, শ্লোকলেশ, বল্মিকের হৃদয় হইতে স্বতঃই উৎসাবিত হইয়াছিল,—

"মানিষাদ, প্রতিষ্টান্ত সগমঃ শাশ্বতীঃসমঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধিঃ কামমোহিতম্'॥

এই ছন্দোময় গুঞ্জরণ, সংস্কৃত ভাষার প্রথম শ্লোক। ভাবের আবির্ভাব হইলে, সঙ্কেতের অভাব হয় না। ভাষা ভাব ব্যক্তির সঙ্কেত মাত্র। আকাশ মার্গে উড্ডীয়মান ঘনীভূত বাস্পপিণ্ড দর্শনে, আমি বলিলাম "মেঘ" ; আর এক জন বলিলেন "জলদ" ; তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিলেন "বারিবাহ" মিহ্ ধাতুর অর্থ ক্ষরণ ; বৃষ্টি মেঘ হইতে ক্ষরিত হয়, একারণ উহাকে মেঘ বলা

যায়। মেঘ পৃথিবীতে জল দান করে, এই অর্থে উহাকে জলদ এবং নিয়ত বারি বহন করে এজন্য উহাকে বারিবাহও বলা যায়। ভাবনুযায়ী এইরূপ না না সঙ্কেত ক্রমশঃ ভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় যে অসংখ্য প্রতিশব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপে তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। যিনি যে উপযুক্ত সঙ্কেত ব্যবহার করিয়াছেন, ভারতীয় আর্য্যেরা যত্ন পূর্ব্বক তাহাকে ভাষায় স্থান দান করিয়াছেন। এই জন্যই সংস্কৃত ভাষা এত পরিপুষ্ট, এত সুমধুর ও এত বৈচিত্রময় ! এরূপ' অল্পভাবই আছে যাহা সংস্কৃত ভাষার আশ্রয়ে পরিব্যক্ত হয় না। বঙ্গভাষা সেই সংস্কৃত ভাষারূপ অপূর্ব্ব অলঙ্কারের দ্যুতিমান মধ্যমণি। ইংরাজী ভাষায় বোধ হয় এরূপ অল্প ভাবই আছে, যাহা সংস্কৃত ভাষার আশ্রয়ে বঙ্গভাষার প্রকাশ করা হয় না। হয় ত আজ সেই নব নব ভাবের অনুরূপ শব্দ জাতি সাধারণের মনে সমুদিত হইবে না ; কিন্তু এমন এক দিন আসিবে, যখন ভাবোদয় হইলে সেই ভাবের অনুরূপ সঙ্কেত ভাষায় রহিযাছে দেখিয়া জাতীয় হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে ! যাঁহারা সে সময়ের কিঞ্চিৎ আগ্রে আসিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত তাঁহাদিগের জীবদ্দশায়, বিফল মনোরথ হইতে পারেন ; কিন্তু অদর ভবিষ্যতে,—তাঁহাদিগের আন্তরিক চেষ্টা থাকিলে,—পর বংশ্যেরা সেই দূর প্রত্যাশিত শুভ কামনা সিগ্ধ করিবে।

বঙ্গভাষায় যখন প্রথম গণিত গ্রন্থের প্রণযন প্রয়োজন হইল, তখন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজেব ভত পূব্ব মহামনাঃ অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমাব সর্ব্বাধিকাবী মহাশয় স্বযং বিশেয আয়াস স্বীকার ও বিবেচনা করিয়া এবং ইংবাজী সংস্কৃত উভয় ভাযাবিজ্ঞ কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তির সহিত পবামর্শ করিয়া গণিত-শাস্ত্রেব আবশ্যকীয পাবিভাযিক শব্দগুলি, পূণ ভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষা হইতে সঙ্কলন করিয়া স্বপ্রণীত গণিত গ্রন্থাদিতে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎপববর্ত্তী যাবতীয় গণিত গ্রন্থকার তাঁহার ব্যবহৃত সেই সকল পাবিভাষিক শব্দই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এইরূপে বিজ্ঞান-বিষযক গ্রন্থাদিতে অক্ষয় কুমার দত্ত. মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, যোগেশ চন্দ্র বায[১২] প্রভৃতি এবং জ্যোতিষ গ্রন্থাদিতে নবীন চন্দ্র দত্ত, গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ও শিক্ষাদান প্রণালী বিষয়ক গ্রন্থে, গোপাল চন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় দীন নাথ সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়[১৩] প্রভৃতি, অর্থনীতি শাস্ত্রে কৃষ্ণ কুমার চৌধুরী প্রভৃতি মহাত্মাগণ, সংস্কৃত ভাষা হইতে বহুল শব্দ সঙ্কলন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কয়েকটী শব্দ শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, কত সুবিবেচনা ও অভিজ্ঞতার সহিত সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে ঐ সকল শব্দ সঙ্কলন কায্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। যথা —

গণিত শাস্ত্রে।

Greatest common measure	গরিষ্ঠ সাধরণক গুণনীয়।
Lowest common multiple	লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক।
Factor	উৎপাদক।
Equation	সমীকরণ।
Quadratic Equation	বর্গীর সমীকবণ।
Simultineous equation	সমসাময়িক সমীকরণ।

Coefficient	প্রকৃতি।
Progression	শ্রেঢী।
Binomial theorems	সূচকোন্নতি।
Factorial	গুণনী।
Logarithms	লগ্ন নিস্পত্তিক।
Algebraical Demonstration	বৈজিক উপপত্তি।
	ইত্যাদি

বিজ্ঞান শাস্ত্রে

Porosity	সান্তবতা।
Elastisity	স্থিতি স্থাপকতা।
Capillarity	কৈশিকতা।
Reflection	প্রতিফলন।
Refraction	বিবর্ত্তন।
Focus	অধিশয়।
Freezing point	দ্রবনাঙ্ক।
Boiling point	স্ফুটনাঙ্ক।
	ইত্যাদি।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে

Centripetal force	কেন্দ্রাভিকর্ষণী শক্তি
Centrifugal force	কেন্দ্রা পসারণী শক্তি
Horizon	চক্রবাল বা দিগ্বলয়।
Direct	অনুলোম।
Invert	বিলোম।
Intersection	সম্পাত।
Parallax	লম্বন।
Convergent	সমাহারী।
Divergent	বিসারী।
Parabola	ক্ষেপণী রেখা।
Ellipse	বৃত্তভোগ।
	ইত্যাদি।

শিক্ষাদান প্রণালী।

Recollection	অনুস্মরণ।
Investigation	গবেষণা।
Faculty	বৃত্ত।

Perception	পদার্থ গ্রহ।
Pictorial	প্রতরূপাত্মক।
Association of Ideas	ভাব সংসর্গ।
Demonstrative	সোপপত্তিক।

ইত্যাদি

অধুনা "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ"[৭৪] নামক সমিতি, বাঙ্গালার প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে এইরূপ সকল শাস্ত্রীয় শব্দ সঙ্কলনে ও বঙ্গভাষার যে জাতীয় গ্রন্থের অভাব আছে, সেই প্রকারের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, বঙ্গভাষায় উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। ইহা আমাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু ভাই, একবার ভাবিয়া দেখ, তুমি যদি এ সকল পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া, তোমার হৃদয়ের ভাবগুলি প্রাপণ সুলভ বৈদেশিক ভাষায় ব্যক্ত করিয়া চলিলে, তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে চিত্রিত তোমার জাতিত্বে রাখিয়া গেলে না। বৈদেশিকেরা অবশ্য তোমার হৃদয়েরও চিত্র কখনই সাদরে বক্ষে ধারণ করিবে না। কিন্তু ভাই, তুমি যদি একটি নূতন ভাব নূতন সঙ্কেত দ্বারা তোমার জাতীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়া যাও, তোমার জাতি, মৃত বন্ধুর স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ তাহা অনন্ত কাল সমাদরে বক্ষে ধারণ করিবে।। বঙ্গের অলঙ্কার, মূর্ত্তিমান প্রতিভা, কবিবর মাইকেল মধুসূদন[৭৫] বৈদেশিক ভাষার অযথা প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, পরে অনুতাপ তপ্তহৃদয়ের অন্তরের দ্রবভাবে গাহিয়া গিয়াছেন :

"হে বঙ্গ। ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা'সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচার।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি।
অনাহারে, অনিদ্রায় সঁপি কায়মনঃ
মজিনু বিফল তাপে অবরেণ্যে বরি';
ফেলিনু শৈবালে, ভুলে কমল কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,
"ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তোর কেন তবে আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান, তুই যারে ফিরি ঘরে"।
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে,
মাতৃভাষা রূপে খনি পূর্ণ মণিজালে।[৭৬]'

(চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী)

তবে কেন ভাই, এ বিড়ম্বনা? কেন দুই জনে একত্র হইলে, জাতীয় ভাষায় উভয়ের মনের দ্বার উদঘাটন কর না? কেন ভাবব্যক্তির অস্ফুটতা লুকাইবার জন্য বৈদেশিক ভাষায় কথা কহিয়া বা লিখিয়া পরস্পরকে ঠকাইবার চেষ্টা কর? বলিতে দুঃখ হয়, আমরা এতই

অন্তঃসারহীন হইয়া পড়িয়াছি যে, আমি আমার কোন ইংরাজী শিক্ষিত বন্ধুকে কথা প্রসঙ্গে কোন একটী দেশীয় নীতি বাক্য (মাতৃভাষায়) বলিয়াছিলাম ; কিন্তু তিনি সে দিন উহাতে কিছু মাত্র মনোযোগ করিলেন না ! পরে সময় অন্তরে ঐ নাতি বাক্যটীর ইংরাজী অনুবাদ, অন্য কথা প্রসঙ্গে বলিবামাত্র বন্ধুবর স্তম্ভিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন ! দেখিয়াছি কেমন মহান্ ভাব।

ইংরাজীতে আছে"। হায়, ইহা ঘৃণিত অন্ধতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ভাই আমাদিগকে এ জীবন-মরণ-সংগ্রামের সময়। পরস্পরকে ঠকাইবার সময় নহে ! এ জাতীয় দুর্দ্দিনে পরস্পরেব অভাব, পরস্পরকে জানাইয়া. পরস্পরেব সাহায্যে সে অভাব মোচন করিয়া লইতে হইবে। জাতীয় দুর্গের যেখানে ভগ্ন ও শিথিল আছে, পরস্পর লাগিয়া পড়িয়া তাহা সারিয়া লইতে হইবে। শুষ্ক পত্রাবরণে সে ভগ্ন স্থান লুকাইলে চলিবে না। কখন্ কোন্ অজানিত বিপ্লব ঝঙ্কাবাতে উহা কোন অনির্দ্দেশ্য প্রদেশে উড়িয়া যাইবে। হায় তখন যাবতীয় ভগ্ন দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া, উপবাস-নৈরাশ্যের মর্ম্মান্তিক আঘাতে এ বিশ্ব সংসার হইতে আমাদিগকে ধূলিরাশির মত নিঃশেষে বিলীন হইতে হইবে। তাই বলি ভাই কপটতা পরিত্যাগ কব তুমি কি, তাহা চিন্তা কব ; তোমার কি তাহা ভাবয়া দেখ ! দেখিয়া বুঝিয়া যেখানে অভাব থাকে পূরণ কবিয়া লও ! ভাবের অভাব থাকে, ভাবিতে আরম্ভ কর ! বলের অভাব থাকে ; যাহাতে বলোপচয় হদ. তদনুশীলনে ব্রতী হও ! পরের বলে, পরের ভাবে ও পরের ভাযার নিষ্ফল মোহে মুগ্ধ হইয়া, আপনাব অনন্ত দায়িত্বময জাতীয় ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করিও না।। আমাদেব মাতৃভূমির বরেণ্য সন্তান স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নিজের কথা লিখিয়া গিয়াছেন ;—"আমি ইংরাজী বহি পড়িতাম ও ইংরাজীতে অনেক সময় বাধ্য হইয়া পত্রাদি লিখিতাম বটে, কিন্তু ইংরাজ ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত ইংরাজীতে কথা কহিতাম না। আর ইংরাজীতে চিন্তা করিবার নিমিত্তও কখনও চেষ্টা করি নাই। প্রত্যুতঃ যদি কখনও চিন্তা কালীন পাপড়ি ভাঙ্গা ইংরাজী গৎ মনে হইতেছে জানিতে পারিতাম তৎক্ষণাৎ নিজ মাতৃভাষায় সেগুলির অনুবাদ বা পুনরালোচনা করিয়া বুঝিতাম, ভাবগুলি যথার্থ কি না।

* * *

কয়েকখানি পুস্তক ভিন্ন ইংরাজী বইগুলিতে এত শব্দের আধিক্য ও পৌনরুক্তের বাহুল্য যে, মাতৃভাষায় তাহাদিগকে মানসিক অনুবাদ করিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপে একবার ঝাড়িয়া না লইলে তুষের ভাগ অধিক ও তণ্ডুলের ভাগ নিতান্ত অল্প হইয়া থাকে। ফলতঃ মাতৃভাষার অনুবাদরূপ সূর্প দ্বারা ইংরাজী গ্রন্থগুল একবার ঝাড়িয়া লইবার পরামর্শ আমি সকল ইংরাজী পাঠককেই দিতেছি।"

মাগুরায় ম্যালেরিয়া।।

যশোর জেলার মধ্যে মাগুরা সাবডিভিসন একদিন স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। দশ-পনর বৎসর পূর্ব্বে মাগুরায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না। অল্প দিন মধ্যে মাগুরায় ম্যালেরিয়া জ্বরের আধিক্য দেখা যাইতেছে। বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে আর এই স্থান উত্তরোত্তর অস্বাস্থ্যকর হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে লোক সংখ্যা. কমিতেছে। ১৮৯১ অব্দে

আদমসুমারিতে মাগুরা মহকুমায় যত লোকসংখ্যা দেখা গিয়াছিল ১৯০১ অব্দের আদমসুমারিতে তদপেক্ষা প্রায় ১৩০০০ হাজার লোক কম দেখা গিয়াছে! দশ বৎসরে তের হাজার লোক কম হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। এইরূপ হারে প্রতি বৎসর লোক সংখ্যা কমিতে থাকিলে মাগুরা জনশূন্য হইতে বেশী সময় লাগিবেনা। কি কারণে দেশের এই শোচনীয় অবস্থা হইল তাহা নির্ণয় করিতে অনেকে সচেষ্ট হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের এ সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ায় উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু আজিও সর্ব্ববাদ সম্মত কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই যত দিন রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণীত না হইবে ততদিন প্রকৃত প্রস্তাবে রোগ নিবারণের উপায় উদ্ভাবিত হইবে না। বর্ত্তমান যে সমুদয় মত প্রচলিত আছে, সেগুলি মাগুরা সম্বন্ধে খাটে কি না তাহাই পর্য্যালোচনা করা এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১। মশক দংশনে ম্যালেরিয়া বিষ সংক্রামিত হয় বলিয়া একটি মত অধুনা সব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। কল্যাণী সম্পাদক এই মত ইতিপূর্ব্বে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, মশক কি মাগুরায় নূতন আমদানী হইয়াছে? পূর্ব্বে যখন মাগুরা স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল তখন কি মাগুরা অঞ্চলে মশক ছিল না? মশক পূর্ব্বেও ছিল এখনও আছে। বরং স্থান বিশেষে পূর্ব্বাপেক্ষা মশকের দৌরাত্ম্য হ্রাস হইয়াছে। মশকের আধিক্য থাকা সময়ে ম্যালেরিয়া নাম শুনা যায় নাই অথচ বর্ত্তমান সময়ে মশকের হ্রাস হইয়া স্বত্বেও ম্যালেরিয়া জ্বরে অধিবাসীগণ শীর্ণ হইতেছে, এরূপস্থানের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নড়াইল সাবডিভিসনে কালিয়া সিদ্ধেপাশা প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্বে মশকের দৌরাত্মে সন্ধ্যার পর বসিবার সাধ্য ছিল না, তখন ঐ স্থানে ম্যালেরিয়া ছিল না এখন ঐ গ্রামে পূর্ব্বের তুলনায় মশক শূন্য হইয়াছে। বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ গ্রাম ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি হইয়াছে। কালিয়া গ্রাম সম্বন্ধে পূর্ব্বে একটা গ্রাম্য ছড়া প্রচলিত ছিল :

"ডাঙ্গায় মশা জলে জোক
কেমনে বাঁচে কা'লের লোক"
"হাতে বিঘাতে কৈটা খায়
পেটে খেলে পিঠে সয়"

এখন সেই কালিয়া গ্রামে রাত্রি কালে বিনা মশারিতে শয়ন করিলে নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু কালিয়া ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। দেশের পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে মশকদংশনকে ম্যালেরিয়ার কারণ বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। ম্যালেরিয়া গ্রস্ত রোগীর রক্ত মধ্যে এবং মশকের গলমধ্যে একই আকৃতি বিশিষ্ট কীটানু বিদ্যমানতা পরীক্ষাসিদ্ধ সত্য হইলেও মশক দংশনকে ম্যালেরিয়া উৎপাদনের বা প্রসারণের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত মনে করিতে পারি না। তবে অপর কারণে উৎপাদিত ম্যালেরিয়া এক শরীর হইতে শরীরান্তরে সংক্রমিত মশকের দ্বারা হওয়া অসম্ভব নহে।

২. কেহ কেহ বলেন, ভিজা মাটি হইতে ম্যালেরিয়া বিষ উৎপন্ন হইয়া মনুষ্য শরীর আক্রমণ করিয়া থাকে। এই মতে বাসগৃহের মেঝে উন্নত ও শুষ্ক, প্রাঙ্গন ও গৃহের নিকটবর্ত্তী

স্থান উচ্চ ও শুষ্ক রাখিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ নিবারণ করা যায়। মাগুরার পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া দেখা যাউক, এই কারণে মাগুরায় ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়াছে কি না? ১৮৮৮ হইতে ১৮৯০ অব্দ পর্য্যন্ত মাগুরার অবস্থা যাহা দেখিয়াছিলাম এবং বর্ত্তমান সময়ে যাহা দেখিতেছি তাহাতে মাগুরা সাবডিভিসনের ভূমি যে কোন প্রাকৃতিক কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা নিচু হইয়াছে তাহাও অনুভব করা যায় না। বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত ঋতুই ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাবের সময়। পূর্ব্বে বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে মাগুরা সাবডিভিসন যে বর্ত্তমান সময় হইতে শুষ্ক থাকিত একথা বোধহয় কেহ বলিতে পারিবেন না। বরং পূর্ব্বে আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মাগুরা সাবডিভিসনের অধিকাংশ স্থান বন্যার জলে প্লাবিত হইত। অনেক গৃহস্থের প্রাঙ্গন জলমগ্ন থাকিত। ঘরের পোতা ভিজিয়া উঠিত। আমার বেশ স্মরণ হয় ১৮৯০ অব্দে আমি যখন মাগুরা স্কুলে শিক্ষকতা করিতাম, সেই সময়ে বাসার ঘরের মেঝেয় বসিয়া পার্শ্বের দরজা দিয়া শিপবড়শী ফেলিয়া মৎস্য ধরিযাছি এবং এক ঘর হইতে অন্য ঘবে যাইবার জন্য বাঁশের সাঁকো প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। তখন কিন্তু ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া জ্বর দেখি নাই--প্লীহা যকৃৎ বৃদ্ধির এত প্রাবল্য দেখি নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব ভিজা মাটীতে বাস করিয়া মাগুরাবাসী আজি ম্যালেরিয়া গ্রস্ত হইয়াছে।

৩। কেহ কেহ বলেন আগাছা, জঙ্গল, বাঁশঝোড়, তেঁতুলগাছ প্রভৃতি গৃহ প্রাঙ্গনের নিকট থাকিলে বসতি বাটিতে রৌদ্র ও বায়ু প্রবেশের বাধা জন্মে তজ্জন্য ম্যালেবিয়া জন্মে। "বাঁশেব ঝাড ও তেঁতুলগাছ তলায় বাস স্বাস্থ্যের হানিকর বলিয়াই" কল্যাণী সম্পাদক জানেন এবং মাগুরা সাবডিভিসনের্র বাশ ঝাড় ও তেঁতুল গাছ কাটা সম্বন্ধে বঙ্গবাসী, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রতিবাদ দেখিয়া কল্যাণী সম্পাদক বিস্মিত হইয়াছেন। কল্যাণী সম্পাদকের উদ্ভিদের অপকারিতা সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা পরীক্ষাসিদ্ধ কিনা, তাহা তিনি স্পষ্ট প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং সম্পাদক মহাশয়ের উক্তি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বাসস্থান নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নিম্নে খনার একটী বচন উদ্ধৃত করিলাম।

"পূবে হাঁস উত্তরে বাঁশ
পশ্চিমে গুয়া, দক্ষিণে ধূয়া।"

অর্থাৎ বসতি বাটীর পূব্ব দিকে জলাশয়, উত্তর দিকে বাঁশ ঝাড়, পশ্চিম দিকে সুপারি বাগান এবং দক্ষিণ দিকে ফাকা স্থান রাখিবে। বসতি বাড়ীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ খোলা থাকিলে আলো এবং বাতাস পাইবার ব্যাঘাত হয় না। উত্তরে বাঁশ থাকিলে শীত ও ঝড়ের প্রভাব কম হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দিনে খনার বচনের আদর হইবে বলিয়া ভরসা করা যায় না। বাল্যকালে স্কুলে পড়িয়াছিলাম—উদ্ভিদগণ (দিবসে) বায়ু হইতে অঙ্গারত বাষ্প আকর্ষণ করিয়া লয় অম্লজান বাষ্প বায়ুতে ত্যাগ করে এবং প্রাণীগণ শ্বাসের সহিত বায়ু হইতে অম্লজান গ্রহণ করে এবং প্রশ্বাস দ্বারা অঙ্গারক বাষ্প পরিত্যাগ করে। অম্লজান বাষ্প প্রাণী শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে, অঙ্গারক বাষ্প প্রাণীর পক্ষে বিষ। সুতরাং উদ্ভিদ দ্বারা প্রাণী জগতের নিয়ত উপকার সাধিত হইতেছে। এ সকল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা। এখন আবার শুনিতেছি উদ্ভিদ সকল প্রাণীগণের অস্বাস্থ্যের হেতু—এখন জিজ্ঞাসা করি কোন্ কথাটা সত্য,

কোন কথাটা বিশ্বাস করিব? তাহা কি সম্পাদক মহাশয় বলিয়া দিবেন? আমরা বাঙ্গালী মানুষ—বাঙ্গালা ডাক্তারের কথাই বলি। ডাক্তার যদু নাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—বসতি বাড়ীর অদূরে বড় বড় বৃক্ষের সারি থাকিলে বায়ু শোধন করে এবং ম্যালেরিয়া নিবারণ করে। এখন কর্ত্তৃপক্ষের মুখে শুনিতেছি—বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের দ্বারা স্বাস্থ্যের হানী হয়—কাহাব কথা শুনিব? বলুন! উদ্ভিদ জগতের অভিজ্ঞতা আমাদের নাই—তবে উদ্ভিদ সম্বন্ধে পরীক্ষা লব্ধ সামান্য জ্ঞান যাহা আছে তাহাতে উদ্ভিদ দ্বারা অপকার অপেক্ষা উপকার বেশী হয় বলিয়া আমাদের ধাবণা আছে। উদাহবণ স্বরূপ দুই একটা কথা বলিব। আঁইস-সেওড়া আকছটী, বা দাঁতন গাছ যে অবশ্য আগাছা এবং জঙ্গল মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষ গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি অনেক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—ম্যালেরিয়া জ্বর যখন পালা জ্বরে পরিণত হয় তখন আইস সেওড়ার পাতার ঘ্রাণ লইলে ঐ জ্বর বন্ধ হয়। পালিটামান্দারের পাতাবও ঐ গুণ আছে। যাঁহাব বিশ্বাস না হয় তিনি পবীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যে দিন জ্বর হইবার পালা, সেই দিন ভোবে শয্যা হইতে উঠিয়া (বাসি হাতে) আইস সেওড়ার কতকগুলি কচি পাতা হাতে রগড়াইয়া কাপড়ে পোটলা বান্ধিয়া ঐ পোটলাব ঘ্রাণ লইতে থাকিবেন সমস্ত দিন মধ্যে মধ্যে ঘ্রাণ লইতে হইবে—সে দিন যদিও সামান্য জ্বর হয় পরের পালায় আর জ্বর হইবে না। পালিটামান্দাবের পাতাও ঐরূপ ঘ্রাণ লইলে উপকার পাওয়া যায়। আকান্দি লতা বাহুতে জড়াইয়া রাখিলেও ঐ রূপ ফল পাওয়া যায়। এখন সম্পাদক মহাশয় বলুন, এই আগাছাগুলিতে ম্যালেবিয়া উৎপাদন করে, না নিবারণ করে?

যে তেঁতুল গাছ কাটা সম্বন্ধে বঙ্গবাসী[১১] এবং বসুমতি[১১] প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই তেঁতুলগাছ উপকারী কি অপকারী তাহাই একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। তেঁতুল জ্বরঘ্ন—তেঁতুলকে জ্বরঘ্ন বলিলাম বলিযা কেহ চমকিত হইবেন না, যাহারা ঔষধ ব্যবহার করে না হরিবোলা হয়, তাহাবা তেঁতুল গুলিয়া খায়--তেঁতুল গোলা খাইয়া জ্বর সাবে—তেঁতুল জ্বরঘ্ন না হইয়া জ্বব উৎপাদক হইলে হরিবোলা লোক একটাও বাঁচিত না। তেঁতুল হাপি কাশির ঔষধ। হাঁপির টানে যখন রোগীব দম আটকাইতে থাকে, তখন কতকটা পাকা তেতুল গোলা খাওয়াইযা দিলে বমন বা বাহ্যে হইয়া কতকটা শ্লেষ্মা নির্গত হয়—তাহাতে রোগী অনেকটা শান্তি লাভ করে। ম্যালেরিয়া জ্বরের পরিণামে যে আমাশয় সচরাচর হয়—তেঁতুল পাতার ঝোল রাঁধিয়া খাইলে ঐ আমাশা উপশমিত হইয়া থাকে। তেঁতুল দ্বারা আমাদের আরও অনেক প্রয়োজন সাধিত হয়। কাঁচা তেঁতুল স্বণকারদিগের গহণা পরিষ্কার ও রঙ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তেঁতুলের বীজ দ্বারা শিবিষ প্রস্তুত হয়—তেঁতুল বীজ দ্বারা সাটের বোতাম প্রস্তুত হইতে পারে। তেঁতুলের ছালের ছাই দ্বারা অজীর্ণ ও অম্ল রোগের উপকার হয়। তেঁতুল গাছের সার চন্দনের ন্যায় ঘসিয়া চক্ষুর পাতায় মাখাইয়া দিলে অনেক চক্ষুরোগ বিশেষতঃ চক্ষু উঠা, চক্ষুর জ্বালা নিবারণ হয়। জ্বালানী কাষ্ঠের জন্য তেঁতুল গাছ ব্যবহৃত হয়। অধিক উত্তাপ প্রয়োজন স্থলে তেঁতুল কাঠ দরকার। পাজা পোড়াইতে হইলে তেঁতুল কাঠই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তেঁতুলের ছাই দ্বারা কতকপরিমাণে সোডাএ কার্য্য হইয়া থাকে। তেঁতুল হইতে Tartaric Acid প্রস্তুত করা হয়। তেঁতুল গাছ নিকটস্থ ভূমির রস আকর্ষণ

করিয়া লইরা, ভূমি শুষ্ক রাখি। এ-হেন তেঁতুল গাছ মাগুরা সবডিভিসন হইতে নিম্মূল হইতে বসিয়াছে শুনিয়া বঙ্গবাসী ও বসুমতী প্রতিবাদ করিয়াছেন বলিয়া কল্যাণী সম্পাদক মহাশয় বিস্মিত হইলেন কেন? তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

তেঁতুল গাছ দ্বারা লোকের স্বাস্থ্য হানি হয় এই মতটী অনুমান সিদ্ধ ব্যতীত পরীক্ষা সিদ্ধ নহে। একটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মাগুরা, সবডিভিসনের অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের তেঁতুল গাছ কাটান ব্যাপার তাহারা উহা সঙ্গত বলিতে চায় না। যে সকল দরিদ্র লোক তেঁতুল বিক্রয় করিয়া বসতি বাটীর খাজনা দিয়া কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করিত—যে সকল লোকের তঁতুল গাছ কাটার ব্যয় সংগ্রহ করিতে থালা-ঘটী বন্ধক দিতে হইয়াছে— তাহারা বলিতেছে—তেঁতুগাছ কাটার ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের আমোদ হইতে পারে কিন্তু তাহাদের মরণ। কর্ত্তৃপক্ষ যদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া বাঁশ ঝাড় এবং তেঁতুলগাছ কাটাইয়াছেন সে বিষয়ে অবশ্য কেহ সন্দেহ করে না, কিন্তু তাহা বলিয়া অস্ত্র চিকিৎসার সহিত এই কার্য্যের তুলনা করাটা ভাল দেখায় না।

মাগুরা সাবডিভিসনের এলাকায় যতগুলি বাঁশ ঝাড় এবং তেঁতুল গাছ চৌকীদার ও দফাদার মোতাইন থাকিয়া কাটাইয়াছে তাহারা এ দেশে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রবেশের বহু পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং তেঁতুল গাছ এবং বাঁশ ঝাড় দ্বারা এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়া আনীত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায না।

কেহ কেহ বলেন এ দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব এবং মুচিখালীব মুখ বদ্ধ হওয়াই বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ। এই মতটি আমরা সমাচীন বলিয়া মনে করি। একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে সকল নতুন চরে নুতন বসতি স্থাপিত হইয়াছে সেই সকল স্থান স্বাস্থ্যকর আছে এবং যে সকল প্রাচীন গ্যামে দুই তিন শত বৎসব হইতে বসতি আছে তাহার লোক সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে এবং সেই সকল গ্রাম দিন দিন অস্বাস্থ্যকর হইতেছে। ইহার কারণ এই যে মনুয্যগণ মল, মূত্র, শ্লেষ্মা, নিষ্ঠীবন, স্বেদ, প্রশ্বাস ইত্যাদি দ্বারা স্ব স্ব শরীরের ক্লেদ নিযত পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ঐ সকল ক্লেদ নিকটস্থ বায়ু, মৃত্তিকা এবং সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে। বায়ু বা জলের সহিত ঐ ক্লেদ মনুষ্য শরীরে পুন: প্রবেশ করিলে স্বাস্থ্য নষ্ট করে। ঝাটকা দ্বারা বায়ু স্থানান্তরিত ও শোষিত হয়। বর্ষার জল ও বন্যার জল দ্বারা মৃত্তিকা বিধৌত ও জলাশয়েব জল প্রবাহিত হইয়া শোধিত হইয়া থাকে। মুচিখালি হওয়ায়, নবগঙ্গা নদীর জল দূষিত হইতেছে বন্যা প্লাবন না হওয়ায় মৃত্তিকা ধৌত হইতেছে না। তাহাতেই মাগুরা অঞ্চলে ম্যালেরিয়া ও কলেরার ভীষণ মূর্ত্তি দেখা দিতেছে। মাঘ, ফাল্গুণ হইতে নবগঙ্গার জলে ডিম্বাকৃতি পদার্থ দেখা দেয়, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে জল সবুজ বণ ধারণ করে এবং স্থান ছেদ্‌লা জমাট বান্ধিয়া মজুত হয়। সেই দূষিত জল পান করা অস্বাস্থ্যের একটা কারণ। বন্যার জলে দেশ প্লাবিত না হওয়ায় গৃহস্থের বাটার নিকটবর্ত্তী যে সকল স্থান মল মূত্রাদির দ্বারা দূষিত হইয়া থাকে, তাহা বিধৌত হয় না। ইহাও একটী অস্বাস্থ্যের কারণ। স্রোতস্বতী নদী প্রবাহিত দেশে সচরাচর কতকগুলি কুরীতি প্রচলিত দেখা যায়। মাগুরা অঞ্চলেও সেগুলিও প্রচলিত আছে। নদী তীরে বা নদী গর্ভে মল মূত্র পরিত্যাগ

এবং শব দাহ করিয়া অবশিষ্ট অংশ নদী জলে নিক্ষেপ করায় নদীর জল দূষিত হইয়া অস্বাস্থ্যের কারণ ঘটান হয়। যে সময়ে নদীতে প্রবল স্রোত থাকে সে সময়ে ঐ সকল দূষিত পদার্থ শীঘ্রই স্থানান্তরিত হয়—কিন্তু নদীর বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ সকল কুরীতি নিবারিত হওয়া আবশ্যক।

উপসংহার কালে দেখা যাউক কি কারণে মাগুরা অঞ্চলে বন্যা প্লাবন রহিত হইল—কি কারণে মুচিখালি ভরাট হইল? সকল জিনিষের দুই দিক আছে—সকল কাজেরও দুই দিক আছে—যাহার দ্বারা উপকার হয়—তাহার দ্বারা অপর দিকে কিছু না কিছু অপকার সাধিত হইয়া থাকে। নিরবিচ্ছিন্ন ভাল বা নিরবিচ্ছিন্ন মন্দ জিনিস জগতে নাই। এ দেশে রেলওয়ে বিস্তার হওয়ায় যাতায়াতের এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে কিন্তু রেল রাস্তার দ্বারা এবং পুলের দ্বারা জল প্রবাহ অনেক স্থলে রুদ্ধ হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কেনাল প্রভৃতি দ্বারা জল নদী গভ হইতে স্থানান্তরে নীত হইয়া জলের ভাপ হ্রস্বীকৃত হইতেছে এবং বেলেব রাস্তা ও পুলের দ্বাবা জলেব গতি রুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে এ দেশে বষাকালে বেশী জল অপর স্থান হইতে আসিতে পারে না, সেই জন্য বন্যা প্লাবন রহিত হইয়াছে এবং খালগুলি শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি মুচিখালি খনন করার প্রস্তাব হইতেছে ; মুচিখালি খনন করিলে যে এ অঞ্চলের বিশেষ উপকার হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু মুচিখালি প্রবল হইলেই যে আবার এ দেশে বন্যাপ্লাবন আসিবে সে আশা কবা যায় না। যে গড়াই নদীর জলে এ দেশ প্লাবিত হইত সেই গড়াই নদী পুলের বন্ধনে মুমূর্যু দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

স্রোতের জল স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকাবী নহে—বদ্ধ জলই স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী। রেলের রাস্তায় যে অপকার করিতেছে তাহা নিবারণের উপায় নাই। কিন্তু স্থানে স্থানে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের নিম্মিত রাস্তা বা লোকাল বোডের নিম্মিত রাস্তায় বৃষ্টির জল নিকাশের পথ রোধ করিয়া লোকের স্বাস্থ্যের হানি ঘটাইতেছে তাহার প্রতিকার করা কঠিন নহে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা পরিষ্কার কবিব। মনে করুন, বিনোদপুর গ্রামের মধ্য দিয়া একটী রাস্তা মামুদপুরে গিয়াছে আর একটী রাস্তা নহাটায় গিয়াছে—ঐ দুই রাস্তার জল নিকাশের উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা নাই তজ্জন্য উপস্থিত বষায় বৃষ্টিব জল ঐ দুই রাস্তার পার্শ্বস্থিত গৃহস্থের বাড়ীতে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—সেই জলের গলিত পত্র—আবর্জ্জনা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পচিয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে—এ অবস্থার অনিবার্য্য পরিণাম ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব। কর্ত্তৃপক্ষ যদি দয়া করিয়া রাস্তাগুলির স্থানে স্থানে জল নিকাশের জন্য নর্দ্দমা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহা হইলে লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে। তেঁতুল গাছ ও বাঁশ ঝাড় নিব্বংশ করিতে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে সে অর্থ দ্বারা রাস্তায় কতকগুলি নদ্দমা বসাইবার ব্যবস্থা করিলে যথেষ্ট উপকার হইত।[৭৭]

শ্রীকালীবর মিত্র
চাউলিয়া

সখি প্রীত ভবানী [ঐ], জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বিবিধ। উদ্বোধন [কাবিতা]

১২০৮ সালে ঘুল্লিয়া, নারায়ণপুর, নাওভাঙ্গা, ধলহরা, বারইখালি, শত্রুজিৎপুর, ভাটপাড়া প্রভৃতি গ্রাম লইয়া একটী সামাজিক পরিষদ স্থাপিত হয়। হিন্দু সমাজের সর্ব্ব প্রকার হিত সাধনই এই পরিষদের উদ্দেশ্য, ইহার নিয়মাবলি উক্ত সনের কল্যাণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হইলে গত আশ্বিন মাসে বিনোদপুরে এই পরিষদের অধিবেশনে দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধনার্থে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার এবং বিদেশীর দ্রব্য বর্জ্জন সমাজের হিতের নিমিত্ত অত্যাবশ্যক বলিয়া স্থিরীকৃত হয় এবং যাহারা এই নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন তাহারা সামাজিক নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

ঐ সমস্ত গ্রামস্থ সমুদয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের প্রতিনিধিই পরিষদের সদস্য।

গত ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখে বারইখালি টোলে সামাজিক পরিষদের অধিবেশনে প্রমাণ পাওয়া যায় যে বিনোদপুর নিবাসী উমেশচন্দ্র দাসকে বারণ করা সত্বেও তিনি গত জগদ্ধাত্রী পূজায় বিলাতি কাপড় ব্যবহার করিয়াছেন এ জন্য, যে পর্য্যন্ত তিনি ইহার সন্তোষজনক কারণ না দর্শাইবেন সে পর্য্যন্ত তিনি সমাজচ্যুত থাকিবেন বলিযা স্থিরীকৃত হইয়াছেন। সমাজস্থ অন্যান্য দোকানদারদিগকে জানান হইয়াছে যে তাহারা যেন বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবসা না করিয়া স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবসা করেন। ঐ সভায় পরিষদের আয়তন বৃদ্ধির নিমিত্ত স্বেচ্ছা সেবক নিযুক্ত কবা হয়। ইহাদের চেষ্টায় আলুকদিয়া, বগীয়া, এবং আঠায় খাদার পরিষদের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে সর্ব্বত্রই স্বদেশী গ্রহণ এবং বিদেশী বর্জ্জনের প্রস্তাব সাগ্রহে গৃহীত হইয়াছে এবং সাহারা এই বিধি বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন সামাজিক শাসন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ পরিষদের আয়তন বৃদ্ধির নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

অনেকের বিশ্বাস যে, এই সামাজিক পরিষদে পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য স্থাপিত হইবে, এবং ব্রাহ্মণগণ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত অন্যান্য শ্রেণীর উপর নানারূপ অত্যাচার অবিচার করিবেন। তাহাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল, যেরূপ ধরণে পরিষদ গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে যদি সমুদয় বঙ্গদেশ লইয়া কেন, সমুদয় ভারতবর্ষ লইয়া সেইরূপ পরিষদ গঠিত হয় তাহাতে হিন্দু সমাজের অশেষ উপকার সাধিত হইবে। হিন্দু সমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকে সেই সেই শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং কার্য্যক্ষম লোক লইয়া একটী পরিষদ গঠন করিবেন। ঐ পরিষদ উক্ত শ্রেণীর সর্ব্ববিধ হিতকর বিষয় আলোচনা, সিদ্ধান্ত এবং কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রত্যেক শ্রেণীর সদস্যদিগের মধ্য হইতে ১ জন কি দুইজন লোক সাধারণ পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন এই সাধারণ পরিষদে বিধিবদ্ধ নিয়ম দ্বারা সমগ্র হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইবে। কোন শ্রেণী এই পরিষদে উপেক্ষিত হইবেন না, সকলের আবেদনই সাদরে গৃহীত হইবে, উপযুক্তরূপে আলোচিত হইবে এবং যাহা সিদ্ধান্ত হয় তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে। এরূপ পরিষদের দ্বারা বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত হিন্দু সমাজ শৃঙ্খলায় আনীত হইবে, শক্তিশালী হইবে এবং ধীরে ধীরে পুনরায় উন্নততর দিকে অগ্রসর হইতে

থাকিবে। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইতেছে, ভরসা করি, অন্যান্য শ্রেণীয় লোক স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্য হইতে সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

শ্রীপ্রিয়নাথ শাঙখ্যতীর্থ
অধ্যাপক, বারহখালী টোল
বিনোদপুর পোষ্ট আফিস
মাগুরা (যশোহর)

মাগুরার ডেপুটী বাবু রমণী মোহন দাস এম, এ, পূর্ব্ববাঙ্গলায় ফুলারের রাজ্যে বদলি হইলেন এবং বীরভূম হইতে মৌলবী আন্দার ছাদেক এখানে আসিবেন, আদেশ হইয়াছে। রমণী বাবু মাগুরার অনেক উপকার করিয়াছেন, সাধারণের হিতকর কার্য্যে তাঁহার বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা ছিল, মাগুরা বাসীকে ম্যালেবিয়ায় জর্জ্জরিত হইত দেখিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে তাঁহার মনোযোগ প্রথম আকৃষ্ট হয়, বিশুদ্ধ জল বাতাসের অভাবই স্বাস্থ্যের অবনতির প্রধানতম কারণ, এজন্য মহকুমাস্থ প্রত্যেক অধিবাসীর গৃহ প্রাঙ্গণের জঙ্গলাদি পরিস্কার করাইবার চেষ্টা করেন, কল্যাণীর পাঠকগণ তাহা বিদিত আছেন। সুপেয় জলের অভাব তিরোহিত করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে ইন্দিরা এবং পুস্করণী খনন করান এবং প্রজাগণকে অল্প সুদে গবণমেন্টের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ দেওয়াইয়া পুস্করণী কাটাইবার সুবিধা করিয়া দেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় মুচিখালির পঙ্কোদ্ধারেব সম্ভাবনা হইয়াছে। তিনি বিনোদপুর এবং হাজরাপুর স্কুলের জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং তাহার যত্নেই মাগুরার স্কুল বোর্ডিং পাকা হইতে চলিয়াছে। স্থানীয় ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষণে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। সাহিত্য সেবীদেব তিনি একজন প্রধান সহায় ছিলেন, অমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট ঋণী আছি। তিনি যে কখনও কোন রূপ ভ্রমে পতিত হন নাই তাহা আমরা বলিতেছি না কিন্তু যখনই তাঁমার ভ্রন বুঝিতে পারিয়াছেন তখনই বর্ত্তমান বিংশতি শতাব্দীর ইংরেজ নীতি অনুযায়ী মিথ্যা সম্মানের (Prestige) খাতিরে ঐ ভ্রমই বজায় রাখিতে সংকল্প করেন নাই, উহা সংশোধনই করিয়াছেন তাঁহাব অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারীর স্থায়ী কোন ক্ষতি তাঁহার দ্বারা হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনিতে পাই নাই। মধ্যে মধ্যে কোন অনারারি মাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে দুই এক কথা ইঙ্গিত করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি কিন্তু অতি কৌশলে তাহা সংশোধিত হইতে দেখিয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আলো ও পায়খানা সম্বন্ধে যে বন্দবস্ত সংপ্রতি করিয়াছেন তাহা অতীব সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি। ধোমাহলের যে শালিশী করিয়াছেন উহাতে যেরূপ কর বৃদ্ধির কথা শুনা যায় তাহা সত্য হইলে এবং তাহা স্থির থাকিলে অনেক প্রজার যে ভিটা ছাড়া হইতে হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, তবে প্রজাবৃন্দের আপত্তি থাকিলে তিনি তাহা পুনরায় দেখিতে পারেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন কিন্তু প্রজাগণ এ আশার উপর নির্ভর করিতে সাহসী না হওয়ায় আপিল করিয়াছে। পরিশেষে বেসরকারী ইংরাজী বিদ্যালয়টীকে সম্পূর্ণ সরকারী কর্ম্মচারীর শাসনাধীনে আনিতে চেষ্টা

করায় তিনি সাধারণের অপ্রীত ভাজন হইবার উপক্রম করিলেন কিন্তু এই ভ্রম যখন বুঝিতে পারিলেন তখন সাধ্যানুযায়ী তাহার সংশোধন করিতে দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি স্কুলটী সরকারী কর্ম্মচারীর প্রাধান্যের অধীন না থাকায় যে কি উপকার হইয়াছে তাহার একটী দৃষ্টান্ত আমরা দিতেছি। স্কুল গৃহটী মাগুরার মধ্যে সুন্দর স্থানে অবস্থিত এবং স্বাস্থ্যকর। কোন এক মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই গৃহটী সন্দর্শন করিয়া ইহাকে সাবডিভিসনাল অফিসেব আবাস গৃহে পরিণত করিবার ইচ্ছা করেন, তৎসময়ের সাবডিভিসনাল অফিসের দ্বারা তাহার অভিপ্রায় স্কুল কমিটীর নিকট জানান। সে সময় বেসরকারী সভ্যের সংখ্যাধিক্য থাকায় তাঁহাদের সাহসপূণ প্রতিবাদে এই স্বাস্থ্যপ্রদ অনেক ঘটনা ঘটিতে পারে যাহাতে সরকারী কর্ম্মচারীগণ ইচ্ছা থাকিলেও চাকরীর খাতিরে, গবণমেন্টের উচ্চতম কর্ম্মচারীরর খামখেয়ালের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হন না, কিন্তু স্বাধীন চেতা বেসবকারী সভ্যগণ সাহস পূর্ব্বক প্রতিবাদ করিতে পিচপাক খান না এই কাবণে সরকাবী কম্মচারী প্রাবন্যাধীন স্কুলটীকে আনায়ন করিলে ইহার অনিষ্ট সাধিত হইবাব সম্ভাবনা বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তাঁহাব চেষ্টায় মাগুরায় টেলিগ্রাফ আসিয়াছে।

মাগুবা স্কুলের শিক্ষক বাবু হীবালাল রায়, এক জন লোকে ২টি চরকায় সূতা কাটিতে পারে এরূপ চবকা তৈয়াবি করিতেছেন শীঘ্রই সাধারণে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তিনি কতকগুলি হ্যাণ্ডেল তৈয়ারি করিয়াছেন এইগুলি ভালই হইয়াছে ইহাব এক একটীব দাম ১০ পযসা এবং বোতাম তৈয়ারি করিবাব প্রয়াস পাইতেছেন, তাহার উদ্যম প্রশংসনীয়, আশা করি সাধারণে ইহা সাদরে গৃহীত হইবে।

স্থানীয় দোকানদারগণ গত পূজাব সময় এক সভা করিয়া আর বিলাতী দ্রব্যাদি আনিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেককেই এই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কবিতে দেকিয়া আমরা অতীব দুঃখিত হইয়াছি। শিক্ষার অভাবই দোকানদারগনের নৈতিক দুর্ব্বলতার কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ইহারা যে দেশের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন তাহা স্বদেশীগণ ভালরূপ বুঝাইয়া সৎপথ অবলম্বন করাইবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার বৈধ উপায় অবলমবন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

বর্ত্তমানে মাগুরা সাবডিভিসনে যত ঘর জোলা ও তাঁতি আছে তাহারা সকলেই কাপড় বুনাইলে, মহকুমার সমুদয় কাপড় কুলাইয়া বাহিরে বিক্রয় হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে যাঁহার তাঁতের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছিল স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগে তাহারা পুনরায় ঐ ব্যবসা আরম্ভ করিতেছে। আজ কাল প্রতি হাতে জোলা তাঁতির কাপড় আমদানি হইতেছে এবং ইহাদের কাপড় স্থানান্তরে চালান যাইতেছে। সমুদয় জোলা ও তাঁতী এই ব্যবসা অবলম্বন করিলেও সত্বরই সাধারণেব অভাব মোচন হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

৫ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩১২

মরিব কি, বন্দেমাতরং, হরিষে বিষাদ, বিবিধ।

বিজ্ঞাপন

মহামেদ-রসায়ন

১। "মহামেদ রসায়ন" বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাগণের মেধা বা স্মৃতি শক্তি বর্দ্ধক এবং বিলুপ্ত নষ্ট স্মৃতিশক্তির পুনরুদ্ধারক।

২। "মহামেদ রসায়ন" স্নায়বিক দুর্ব্বলতার আশ্চর্য্য মহৌষধ ; অর্থাৎ অতিরিক্ত অধ্যয়ন, মাসিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণ জনিত নারভাস ডেবিলিটি তজ্জনিত উপসর্গ গুলির ঔষধ "মহামেদ রসায়ন"।

৩। "মহামেদ রসায়ন" মস্তিষ্ক পরিচালনাশক্তি বর্দ্ধক অর্থাৎ অধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক পরিচালন করিবার জন্য ক্লান্তিনাশ করিতে এবং মস্তিষ্কের পরিচালনাশক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা।

৪। "মহামেদ রসায়ন" বায়ুরোগ, মূর্চ্ছারোগ, (হিষ্টিরিয়া) উন্মাদরোগ এবং হৃদরোগের (প্যালপিটিসন অব দি হার্ট) অদ্বিতীয় ঔষধ। অধিকন্তু "মহামেদ রসায়ন" সেবনে স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত প্রদর, বন্ধ্যাদোষ, মৃতবৎসা দোষ এবং পুরুষদিগের পুরাতন প্রমেহ প্রভৃতি ও তাহার উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। "মহামেদ রসায়ন" ঘৃত বিশেষ, দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে হয়। এক শিশি ঔষধে ২০ দিন চলে। "মহামেদ রসায়ন" রেজেষ্টারী করা এবং ক্রয় কালীন শিশিতে খোদিত ইংরাজীতে আমার নাম ও ট্রেডমার্ক দেখিয়া লইবেন। ১ শিশি মহামেদ রসায়নের মূল্য ১৲ টাকা, ডাঃ মাঃ । ✓- আনা, ৩ শিশি ২৷৷. টাকা, ৬ শিশি ৫ টাকা, ডাঃ মাঃ পৃথক। অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলে রোগের ব্যবস্থা অথবা অন্যান্য ঔষধের তালিকা পৃথক অর্থাৎ ক্যাটালগ পাঠান যায়। এই ঔষধালয় আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল, ঘৃত, বটিকা প্রভৃতি সকল প্রকার ঔষধ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। রোগীদিগকে যত্নসহকারে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা করা হয়।

শ্রীহরলাল গুপ্ত কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়। ৪ নং বাবুরাম ঘোষের লেন, আহিরিটোলা কলিকাতা।

[৫/৭, কার্ত্তিক, ১৩১২]

সংকলন

আরতি

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩০৭

আমি [প্রবন্ধ],

রমণী

রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তার,
পৃথিবীতে হেন শত্রু কেহ নহে কার !
শশাঙ্কের রাহু শত্রু সেত গিলে, ছাড়ে,
আমি করি চির গ্রাস পাইলে তাহাবে !
সে যদি সাগর হয়, পৃথিবী প্লাবিয়া,
আমি সে অগস্ত্য মুনি গিলি তাবে গিয়া !

কঠিন পাষাণময় সে হ'লে পাহাড়,
আমি হয়ে মহাবজ্র শিরে পড়ি তার !
সে যদি জলদ হয় স্নিগ্ধ সুশীতল,
আমি হই বুকে তার অশনি অনল !
সে যদি পৃথিবী হয় লোক রক্ষা হেতু,
আমি তার মহারিষ্টি হই ধূমকেতু !

যদি কেহ দিয়ে থাকে চির অশ্রু জল,
সে আমার মহাশত্রু রমণী কেবল !
যদি কেহ মহাশত্রু রমণী আমার !
যদি কেহ ক'রে থাকে মম সর্ব্বনাশ,
সে আমরা মহাশত্রু রমণী নির্যাস !
মুহূর্ত্ত তাহার কথা ভুলিতে না পারি,
সে আমার মহাশত্রু আমি শত্রু তারি !

পুরুষের তীক্ষ্ণ অসি, তীক্ষ্ণ তরবার,
অমৃত মরণে করে যাতনা উদ্ধার !
নারী করে গুপ্ত হত্যা আঁখির আঘাতে
অনন্ত বিষাক্ত মৃত্যু ঢেলে দেয় তাতে !
জীবনের দিন, দণ্ড, পল, অনুপল
মরণ ! মরণ ! মম মরণ কেবল !
মৃত্যুময় এ জীবন বহিতে না পারি,
রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তারি !

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।[৭৯]

বাজমালা ও ত্রিপুরা রাজবংশ, রজনীকান্ত চৌধুরী ; সম্প্রদান, বেদ মাসিক সাহিত্য সমালোচনা—

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

নির্ম্মাল্য—৩য় বর্ষ, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। নির্ম্মাল্য আমাদিগের বিদ্যোৎসাহী মহারাজ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষিত পত্র। বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি মহারাজ্যের অনুরাগ মঙ্গলের বিষয়। "আমার শিকার কাহিনী" বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে নূতন আমদানী। শিকার কাহিনী টা ইংরেজি সাহিত্য ভাণ্ডারের রত্ন বলিয়াই জানিতাম মহারাজের যত্নে তাহা বঙ্গ সাহিত্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া সুখী হইলাম। "শিকার কাহিনীর" ভাষা ও বর্ণনা কৌশল চিত্তাকর্ষক হইতেছে। "বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা ও চন্দ্রনাথ বাবু" অসম্পূর্ণ সন্দর্ভ পূর্ব্ব ভাগও আমরা দেখিতে পাই নাই। আলোচিত অংশে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। "বাঙ্গালা ভাষার বর্ণ বিন্যাস ও তাহার সংস্কার" প্রভৃতির ন্যায় প্রবন্ধ যত লিখিত হয় ততইভাল। জলধর বাবুর গল্প দুইটী পড়িয়া নিরাশ হইতে হইল।

প্রয়াস—২য় বর্ষ, জুন, "সন্তান শিক্ষা" এবং "বিহারী লাল" দুইটী সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। "ফুলের সাজিতে" সুগন্ধি ফুলের অভাব।

মালঞ্চ

তুমি যদি

তুমি যদি দায়ময় ! প্রাণে থাক ছেয়ে,
বুকে থাকে যদি অই অভয় চরণ,
সংসারের কোলাহল কে দেখিবে চেয়ে,
কিসে সুখ কিসে দুঃখ কে করে গণন ?

যা'ক বা অমুক শত বসন্ত বরষা,
হাসুক কাঁদুক বিশ্ব স্বভাবের তরে,
নিরাশা থাকুক হৃদে অতবা ভরসা,
তাহে কিবা লাভ ক্ষতি কেবা মনে করে ?
তুমি শুধু থেকো প্রাণে সম্পদে বিপদে,
দিও দয়া, দিও স্নেহ, মাখিয়া আদর,
লুটাইব শ্রান্ত শির ও রাজীব পদে
জীবন সমরে কভু হব না কাতর।

যদি তুমি কাছে—আরো কাছে এস স'রে
বুঝিবা "বিজয়ী" হয়ে সুখে যাব ম'রে !

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।৮০

তৃষিত

আমি নবঘন আশে, রহিয়াছি বসে,
কখন ঝরিবে বারি?
কখন কহিবে শীতল বাতাস
গলিবে হৃদয় তারি?
অই আসে আসে, যায় ভেসে ভেসে,
আমার পরাণ চোর।
কখন করুণা হইবে তাহার
ভিজিবে রসনা মোর?
মোর সকলে দেখায় তড়াগ পল্বল
সরিৎ সলিল রাশি,
সংসারের শত আবিলতা মাখা,
আমি নীম ভালবাসি।
হয় হোক্ মোর দারুণ যাতনা,
যায় যদি যাক্ প্রাণ।
আমি শপথ করেছি করিব না কবু অধোমুখে বারিপান।
যাক্ দূরে যাক্ বসন্ত নিদাঘ.
রহিব ধেয়ান ধরি।
আমি কাটিব বরষ এ পিপাসা ল'য়ে
বরষা ভরসা করি।

শ্রীমনোমোহন সেন[৮১]

পাপ স্বপ্রকাশ

বসনে রোধিতে চাও আগুনের কণা?
রোধিবে পদ্মার স্রোত বালির বন্ধনে?
ঢাকিয়া রাখিবে পাপ করি প্রতারণা?
হা মূর্খ, তা(ও) কি হয়? হবে বা কেমনে?
অদৃশ্য প্রহরী এক বসি অন্তরালে
জাননা, তোমরা পাপ করে দরশন?
রোধিবে তাহার আখি কোন মায়াজালে?
সে নহে সামান্য কেহ—জগত-লোচন।
সে সদা বাজাবে ডঙ্কা বিরলে বসিয়া
সে সদা করিবে তব কলঙ্ক ঘোষণ,
দহিবে নরকানলে তব পাপ হিয়া
কেমনে করিবে বল তারে নিবারণ?

যত যত্ন কর, পাপ রবে না গোপনে
জলন্ত অনল ঢাকা থাকে না বসনে!

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ

কদম্ব

নিদাঘের অবসানে,
তৃপ্ত পাপিয়ার গানে,
পুলকে শিহরি উঠে কদম্ব কুসুম।
সজল সমীরে তার
বহিয়া সৌরভ ভার,
বাঙ্গে জগতের চোকে বিবহের ঘুম।

তাহারি মধুর বাসে
স্মৃতি পরশিয়া আসে,
দুর দ্বাপরের সেই অতীত কাহিনী,
বিধুরা ব্রজের বালা,
কপট কঠিন কালা,
কালো কালিন্দীর ধারা আনন্দ বাহিনী।

হেরিয়া রোমাঞ্চ তার,
মনে পড়ে রাধিকার,
সুখ-সান্ধ্য অভিসাব, নিধুবন বাসে।
মধুব ঝুলন খেলা
সে যখন কেঁপে উঠে পুবাল বাতাসে।

তাহারি শ্যামল শাখে
পাপিয়া যখন ডাকে
মনে পড়ে মধুময় শ্যামের বাঁশরী।
প্রোষিত আভিরি বাসা
কি দ্রুত বিরহ জ্বালা,
বিরলে বাঁশীর ডাকে আপনা পাসরি।

হে কদম্ব! তব তলে
নিতি গোচারণ ছলে
সজ্জিত খাল রাজ, রাধিকারমণ;
তোমার শতিল ছায়ে
বসিলে, এখনো গায়ে
লাগিয়া, শীতলে তার পূত পরশন।

তোমারি সুন্দর শাখে
জড়াইয়া পাকে পাকে,

লুণ্ঠিত বসনরাশি রীক শ্যাম রায় ;
উলঙ্গ গোপিনীগণে
সাধাইয়া প্রাণ-পণে,
আটকি রাখিয়াছিল নীল-যমুনায়।

পুণ্যময় যদুবংশ
সমুলে হইলে ধ্বংস,
শ্যাম-শস্প শয্যা তলে—তব পুণ্য মূলে
ত্যজিয়ে ছিলেন প্রাণ,
বিশ্বপতি ভগবান,
অতি ক্ষীণজীবী সম ব্যাধ বিদ্ধ শূলে !

তোমারে দেখিয়া তরু,
সিক্ত এ হৃদয় মরু,
শ্যাম-স্মৃতি-সুধা- সিন্ধু উথলে প্রবল।
তোমাবি পল্লব পত্রে
পড়ি আমি ছত্রে ছত্রে,
অতীতের ইতিহাস অতি অনর্গল।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩০৮

আরতি

১
দিন যায়—অই দিনমণি
অস্তাচলে পরিছে ঢলিয়া,
কত আয়ু কত আশা, কত বা অব্যক্ত ভাষা,
অলক্ষ্যে ও রবি সহ
যেতেছে চলিয়া।

২
যাহা যায়, চিরদিন তরে,
এ জনমে ফিরিবে না আর,
কেন রে পথিক মন ! বৃথা কর অন্বেষণ,
এ পথে সে স্নিগ্ধ-ছায়া
পাবে না আবার !

৩
যেতে হবে তাই শুধু জানি
জানি না পথের বিবরণ,

বিঘ্ন বাধা কতরূপ, কণ্টক কঙ্কর স্তুপ,
কোথা বা লুকিয়া আছে,
নির্ম্মম মরণ !

৪
তাই ভেবে পিছনে ফিরিব,
এতই কি আরামের আশা ?—
আর কি কিছুই নাহি, কেবলি বাঁচিতে চাহি,
নির্জ্জীব জীবনে—ছি ছি
এত ভালবাসা ?

৫
আমি যে গো দেবের সন্তান
দেব-রক্ত বহিছে ধমনী,
এত উচ্চ পূত সাধ, এত শুভ আশীর্ব্বাদ,
মৃকের চিন্তার সম
যাবে কি অমনি ?—

৬
—না না, সে তো স'বে না আমার
সবে না সে জীবন্ত মরণ,
যা' থাকে থাকুক পথে, ফিরিব না কোন মতে,
যা'ব সে অমর ধামে
আনন্দ ভবন।

৭
আজি এই শ্যামা স'্যাকালে
লহ দেব ! মঙ্গল আরতি,
আজি এ সমস্ত প্রাণ. ও পদে করিয়া দান,
মেগে নিব, মানবের
মহতী শকতি।

৮
উজলি উঠ গো চন্দ্র তারা !
হইয়া প্রদীপ মণিময়,
ফুল বাস হোক ধূপ, পবন ব্যজনী রূপ,
বাজাও কাঁসর শঙ্খ
বিহঙ্গম চয় !

৯
আমি পূজি অভয় চরণ,
করি আজি মঙ্গল আরতি,
তুমি বিভো ! দয়াময়, নাশি বিঘ্ন নাশি ভয়,
দেহ বল, দেহ প্রাণে
নির্ম্মলা ভকতি।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।[৮২]

দুর্গাদাস ঠাকুর : অধিকারভেদ [প্রবন্ধ], রসিকচন্দ্র বসু : বালিকা নাম [ঐ], মালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রেমের চারি অবস্থা [ঐ], রমণীমোহন সেন : আবাহন [কবিতা], রামপ্রাপ্ত গুপ্ত : মোসলমানেব সংস্কৃতচচা, কেদারনাথ মজুমদার : বানর প্রসঙ্গ [প্রবন্ধ], শ্রী ২০ র কবি : অনুবোধ [কবিতা]।

২য় বর্ষ ২ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩০৮

শ্রী নিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় : সজীবাণুবাদ, জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : এপিকিউরাস ও তাঁহার নীতি, বজনীকান্ত চক্রবর্তী : শ্রী হর্ষ ও নাগানন্দ, শ্রী শ্রী বামকৃষ্ণ কথামত, শ্রী নাথ চন্দ : সতীব স্পর্শ [গল্প]।

২য় বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৮

কোকিলেশ্বব ভট্টাচার্য্য : দার্শনিক মতের সমন্বয়, শ্রী সঙ্গিনী বচয়িত্রী : তপোবন গিরি [কবিতা], জীবানুবাদ, শ্রীশচিন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : একটী মরণ [গল্প], অনুজাসুন্দরী দাস : শ্রী ক্ষেত্রে ৺লাকনাথ, কেদারনাথ মজুমদার : সিনেস্ত্রিসের ভাবত আক্রমণ।

২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩০৮

যোগেশচন্দ্র রায় : ধূলি [প্রবন্ধ], রসিকচন্দ্র বসু : বঘুনাথ খোঁসাই [ঐ], রমণমোহন সে : বলদিয়া বাড়ীর যুদ্ধ, মহেশন্দ্র সেন : বিধবা [সমালোচনা], চন্দ্রকিশোর তরফদার : জ্যোতিষ মন্দ সংশোধন [ঐ, ২/৬ সংখ্যায়ও], জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : সুখ ও দুঃখ [প্রবন্ধ], পাঁচকড়ি দে : হত্যাকারী কে ? [ডিটেকটিভ গল্প, পরবর্তী ৫ সংখ্যায় ধারাবাহিক]

২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩০৮

মনোমোহন সেন : মঙ্গল খান, রামপ্রাণ গুপ্ত : সতীদাহ, জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনে প্রীতি, রাধাকৃষ্ণ গোশ্বামী : কোস্টার চাষ, চন্দ্রকিশোর তরফদার ; জ্যোতিষ, কেদারনাথ মজুমদার : সঞ্জয়ের নূতন গ্রন্থ, রাজকৃষ্ণ নন্দী : ভারত-সাবিত্রী [কবিতা], রমনীমোহন সেন : পীব সাহাজালাল মজুরথ, তোমরা কে ?

২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মাঘ ১৩০৮

কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য : দার্শনিকমতের সমন্বয়, অনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ : চক্রগণি, শ্রী বামকৃষ্ণ কথামৃত,

ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি

১। মুক্তারাম নাগ।

আজ আমরা যাঁহার নাম লইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি, অনেক শিক্ষিত ময়মনসিংহবাসীও বোধ হয় তাঁহার বিষয় কিঞ্চিৎমাত্রও অবগত নহেন। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট তিনি অপরিচিত হইলেও প্রাচীন গৃহস্থদের নিকট তাঁহার নাম অতি আদরের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে, পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অনেক গৃহস্থ গৃহ বর্ত্তমান কালেও শারদীয় পূজার দিবসত্রয়ে "দুগাপুরাণেব" 'খোল' 'করতালের' উচ্চ নিনাদে মুখরিত থাকে। এই "দুগাপুরাণের" রচয়িতা মুক্তারাম নাগ।

মুক্তারাম কবি কি না? এবং কবি হইলে তাঁহাব স্থান কোথায়? তিনি কাশীদাস অপেক্ষা কত উচ্চে এবং কৃত্তিবাস হইতে কত নিম্নে এই সকল বিচাব কবিবার জন্য আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। দেশীয় জন সাধারণের নিকট এ দুভাগ্য দেশেব হতভাগ্য কবিকে পরিচিত করিতেই বর্ত্তমান প্রবন্ধেব অবতারণা কবিয়াছি। কৃত্তিবাস কাশীদাসের ন্যায় পশ্চিম বঙ্গের সরস ক্ষেত্রে মুক্তারাম জন্মগ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই আজ তিনি এত উপেক্ষিত হইয়া থাকিতেন না। পূর্ব্ব বঙ্গের এই ক্ষুদ্র পত্রিকায়ও তাহার নাম আমরা সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করিতে অবসব প্রাপ্ত হইতাম না। তিনি কবি ছিলেন কি না; এবং কবি হইলে তাহাব আসন কোথায়, সে বিচার ভার সহৃদয় পাঠকগণের হস্তেই ন্যস্ত বহিল।

মুক্তারাম অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। তিনি একমাত্র দুর্গাপুরাণ গ্রন্থ রচনা করিয়াই সেই সময়ে প্রভূত যশোপার্জ্জন কবিযাছিলেন।

দুর্গাপুরাণ গ্রন্থ সমাপ্ত করিযা তিনি যে ভণিতা দিয়াছেন তাহা হইতেই পাঠক তাঁহার সম্যক পবিচয় পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। আমরা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত জীণ কীট দষ্ট পুঁথির সংগ্রহ করিযাছি এবং অতি কষ্টে পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি।

ঐ গ্রন্থ ১১৮০ সনের লিখিত। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে :—

"ইতি সন ১১৮০ তেরিখ ১০ আশ্বিন বাবে শুক্কোরবার বেলা দুই প্রহর গত মাত্র মং মুমুরদিয়া নিজ বাড়ীতে।"

গ্রন্থ শেষে কবি নিজ পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন,

"বিদ্যানন্দ নাপ আইলেন ছাড়ি রাঢ় দেশ।
ধন লৈয়া বঙ্গদেশে করিলেন প্রবেশ।
শ্রীধর ব্রাহ্মণ সঙ্গে কুল–পুরোহিত।
বিনোদ বারৈ আর রূপ নাপিত॥
বাত্তা পাইয়া সঙ্গে আইল জগন্নাথ ধুবী।
ভুঁই মালী নিতাই আইল মনে মনে ভাবি॥
লৌহিত্যের পূর্ব্ব ভাগে নদী ছাড়াচর।
গহন অরণ্য কাটি কৈলা বাড়ী ঘর॥
কত দিন পরে আইলেন শ্রীকান্ত দ্বিজ।

গ্রামের উত্তরে আসি মিরাশ কৈলেন নিজ॥
বল বিদ্যা বিশারদ রহিলেন সম্পাসে।
কাশীরাম চক্রবর্ত্তী আছেন সেই বংশে॥
এই মতে আসিলেন নাগ বিদ্যানন্দ।
বঙ্গদেশে রহিলেন করিয়া সম্বন্ধ॥
দিনে দিনে ব্রাহ্মণ কায়েস্থ বৈদ্য আইয়া।
মহন্ত লোক বসে গ্রামের নাম মুমুর দিয়া॥
বায়ুস্তে করিল কৃপা তান শুভ দশা।
হাজরাদীর মধ্যে কৈলাইন কুড়িকাইয হিস্যা॥
পুত্রের ঘরে নাতি হইল দিনে দিনে রঙ্গ।
শিষ্ট লোক সঙ্গে রৈল দুষ্ট দিন ভঙ্গ॥
তিনি আদি সপ্ত পুরুষে স্বর্গ পাইল।
অতি বিচক্ষণ লোক সেই বংশে হইল॥
রামনাবায়ণ নাগ বুদ্ধি বিদ্যা জ্ঞাতা।
পাইলা পবম বেদ সকণ্ঠেত গীতা॥
নানা শাস্ত্র বিচার করিলা অতিশয়।
নাগ মুক্তা বামে ভণে তাহাব তনয॥
পরাসর গোত্র মঙ্গল কুট গাঁই।
ভবানী ভরসা বিনে আর লক্ষ্য নাই॥"

উপর্য্যুক্ত বিববণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পবাশব গোত্রজ মঙ্গল কূট গাঁই মুক্তারামের উদ্ধতন ৯ম পুরুষ, বিদ্যানন্দ নাগ রাঢ দেশ ছাডিযা আবশকীয় লোকজন-পুরোহিত, নাপিত, ধোপা, মালী প্রভৃতি সহ বহু আড়ম্বরের সহিত ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব পারে মুমুরদিয়া নামক কোন জঙ্গলাকীণ স্থানে আসিয়া সম্বন্ধ সংস্থাপনপূর্ব্বক বাসস্থান নিদ্দেশ করেন।

মুমুরদিয়া জেল' ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন একটী সুপরিচিত গ্রাম। কিশোরগঞ্জ হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে এবং ব্রহ্মপুত্র তট হইতে প্রায় ৯/১০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। বর্ত্তমান মুমুরদিয়া যে দত্ত বংশের বাসস্থানের জন্য বিখ্যাত ঐ দত্ত বংশীয়েরা অনূর্দ্ধ দশ পুরুষ যাবৎ মুমুরদিয়া আসিয়া বাস্তব্য করিতেছেন। পঁচিশ বৎসরে এক এক পুরুষ গণনা করিলে প্রায় ২০০ বৎসর হইল দত্ত বংশের আদি পুরুষ শ্রীনাগ দত্ত পত্রনবিশ মুমরদিয়া গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এই অনুমানে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই হিসাবে মুক্তারামের পূর্ব্ব পুরুষ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই মুমুরদিয়া গ মে আসিয়াছিলেন, অনুমান করা যায়। আমরা বহু অনুসন্ধানের পর যে বংশাবলী সংগ্রহ কবিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা এস্থলে উল্লেখ করিলাম।*

এই প্রবন্ধেব সংগ্রহ ব্যাপাবে কিশোবগঞ্জেব মুমুবদিযা নিবাসী প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত বায মহাশয আমাকে বিশেষ সাহায্য কবিয়াছেন। সে জন্য পূর্ণ বাবুব নিকট আমি কৃতজ্ঞ বহিলাম।
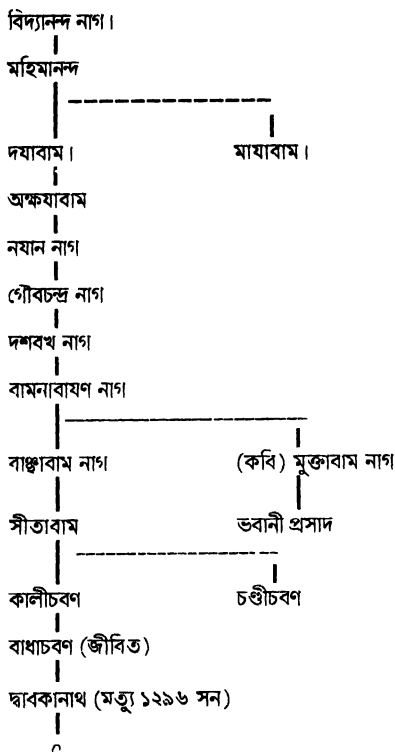
মুক্তারামের বংশ নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে। ঐ বংশে বাধাচবণ নাম নামক এক অশীতি পর বৃদ্ধ মাত্র জীবিত আছেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র দ্বারকা নাথ ১২৯৬ সালেব ভীষণ ভূকম্পে মুর্শিদাবাদে দালান চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মুমুরদিয়াব প্রাচীন নাগবংশ নির্ব্বাণোন্মুখ।

মুক্তারামের পূর্ব্বপুরুষ বিশেষ প্রতিপত্তি শক্তিশালী ছিলেন। সম্পূর্ণ মুমুরদিয়া গ্রাম পূর্ব্বে তপে হাজরাদীর অন্তর্গত ছিল। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের চেষ্টাতেই গ্রামের দক্ষিণ অংশ কুড়ি খাইর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। উদ্ধৃত অংশেব এই ঐতিহাসিক সত্য টুকুর নিদশন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বায়ুস্তে করিল কৃপা তান শুভ দশা।
হাজরাদীর মধ্যে কৈলাইন কুড়িখাইর হিস্যা।"

পূর্ব্ব ময়মনসিংহ জঙ্গল বাড়ীর দেওয়ান ও ভাগলপুরের দেওয়ান বংশ বিশেষ সম্মানিত। ঐ প্রদেশের ভদ্রলোকগণ সেই সময়ে এই দুই সরকারের কার্য্য করিয়া নিজ নিজ পদ গৌরব ও বংশ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া নিতে যত্ন করিতেন। যে সময়ে মুমুরদিয়ার সম্মানিত দত্ত বংশের

উর্দ্ধতন পুরুষেরা আত্মমর্যাদার পুষ্টিসাধনে যত্নবান ছিলেন, মুক্তারামের পূর্ব্বপুরুষগণও সেই সময়ে তাঁহাদের সমকক্ষরূপে বিচরণ করিতেছিলেন।

কথিত আছে, মুমুরদিয়ার দত্ত বংশের অত্যুন্নতির সময়ে তাঁহারা নাগ বংশকে বিশস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নাগেরা তাঁহাদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া কিছু দিনের জন্য মুমুরদিয়া পরিত্যাগ করিয়া তাহার দুই মাইল উত্তরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ঐ গ্রাম এখনও "নাগের গ্রাম" বলিয়া পরিচিত। নাগ বংশের বাসের জন্যই নাগের গ্রাম পরিচিতি, স্থানীয় জন সাধারণও এ কথা বিশ্বাস করেন। স্থানচ্যুত হইয়া নাগেরা ভাগলপুরের দেওয়ানদিগের শরণাপন্ন হন। তাঁহাদের যত্নে ও অনুগ্রহে মুমুরদিয়া পুনরায় নাগবংশের আবাসস্থল নির্দ্ধারিত হয় এবং প্রতাপশালী দত্তদিগের সহিত ভবিষ্যত বিবাদ নিবৃত্তির জন্য সেই সময়েই মুমুরদিয়ায় তাঁহাদের বাসোপযোগী কতক অংশ কুড়িখাইপরগনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। তৎকালের দত্ত বংশীয়েরা জঙ্গল বাড়ীতে ও নাগ বংশেরা ভাগলপুরে কার্য্য করিতেন।

পূর্ব্ব রীতি অনুসারে মুক্তারামও পৈত্রিক কার্য্যের অধিকারী হইলেন। অতি অল্প. বয়সেই তিনি ভাগলপুরের দেওয়ান বাড়ীতে সুমারনবিশের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তিনি খুব সুপুরুষ ছিলেন। তখনকার প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁহার নারীজন সুলভ দীর্ঘ কেশ বিলম্বিত ছিল। সাহেবেরা তাঁহাকে তাঁহার সৌন্দর্য্যের খাতিরে বড়ই ভাল বাসিতেন। প্রবাদ এই যে একদিন দেওয়ান সাহেব মুক্তারামকে স্ত্রীজনোচিত অলঙ্কার পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া তাঁহার রূপলাবণ্য অনুভব করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই কারণে মুক্তারাম ক্ষোভে ও দুঃখে দেওয়ানবাড়ীর কাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন এবং ঘাগইর গ্রামে তাহার কুলপুরোহিতের গৃহে উপস্থিত হন। ঘাগইরের বর্ত্তমান চক্রবর্ত্তী বংশের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীধর শর্ম্মাই (চক্রবর্ত্তী) বিদ্যানন্দ নাগের সহিত রাঢ় পরিত্যাগ করিয়া আসেন।

"শ্রীধর ব্রসঙ্গে কুলপুরোহিত।"

পুরাহিত বাড়ীতে থাকিয়া মুক্তারাম পুরাণাদি পাঠ করেন। তাহাতেই তাহার মন ধর্ম্ম পথে ধাবিত হয়। এবং তিনি দুগাপুরাণ গ্রন্থ রচনা করেন।

বর্ত্তমান সময়ে গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া যেমন প্রশংসা পত্রের লোভে with the author's best compliments লিখিত উপহার দিবার রীতি প্রচলিত আছে। অতি প্রাচীন সময়েও এ রীতির অনুশীলন ছিল, পূর্ব্বকালেও কবিগণ অক্লান্ত মনে স্বরচিত বৃহৎ হস্ত লিখিত পুঁথির বহু বহু কাপি প্রস্তুত করিয়া সমাজে এবং দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে প্রদান করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে গ্রন্থের প্রচার দ্বারা স্বীয় সুনাম অর্জ্জন ও সম্মান বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইতেন। মুক্তারামের দুর্গাপুরাণ গ্রন্থেও ইহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্গপুরাণ যে কাপি হস্তগত হইয়াছে তাহা এই প্রবন্ধ লেখকের তিন পুরুষ উর্দ্ধতন জ্ঞানি স্বর্গীয় রামশরণ নন্দীর নামে কবি কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত। গ্রন্থ শেষে এই লিখিত আছে।

দেশভাষা মুখ দোষ ভ্রাকি আছে কত।
সজ্ঞানীয়ে পুরিয়া লইব ভ্রম হইছে যত॥

স্ব অক্ষরে লিখি দিন করিতে প্রচার।
রাম শরণ নন্দীর এই পুস্তকের অধিকার॥

এই দুর্গাপুরাণ গ্রন্থখানা কবি কোন্ সময়ে রচনা করিয়াছিলেন গ্রন্থ তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে আট মাসের শ্রমে যে পুস্তক শেষ করিয়াছিলেন এরূপ আভাস পাওয়া যায়।

শিবের আজ্ঞায় কৈলাম অষ্টমাস শ্রম।
জীবন জঞ্জালে কত হইল মন ভ্রম॥

এই গ্রন্থ রচনার পর আর মুক্তারাম চাকুরি করিতে যান নাই। তারপর হইতে তিনি একজন সাধক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। অবসর পাইলে সঙ্গীত রচনা করিতেন। তাঁহার সকলগুলি সঙ্গীতই শক্তি বিষয়ক। তাঁহার কবিত্বের সমালোচনা হওয়ার সম্ভাবনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অতি অল্প, কেননা গ্রন্থ লেখক কাব্যরসবিহীন তথাপি যথা শক্তি তাঁহার দু-একটা সঙ্গীতের আলোচনা ও উল্লেখ করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

দুর্গাপুরাণে কবি ভগবতী কাত্যায়নীর মর্ত্ত্যলোকে আগমনের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। রাজা জন্মেজয় মহামুনি ব্যাসের নিকট ভগবতীর পিত্রালয় আগমন বিষয়ক যাবতীয় প্রসঙ্গ শুনিতে সমুৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন,

এক নিবেদন মুনি করি তোমার পদে।
শুনিলাম (পুণ্য কথা) তোমার প্রসাদে॥
অষ্টাদশ পুরাণ আর নব ব্যাকরণ।
গীতা ভাগবত আদি সগোত্র কথন॥
(ইসকল) শুনি মুক্ত হইল কিঙ্কর।
শুনিবার শ্রদ্ধা মনে গৌরীর নাইয়র॥
পুরাণে শুনিছি মাত্র হর গৌরীর বিহা।
সুরনর রক্ষা কৈলেন কৈলাসেত গিয়া॥
পুনি তানে কেন মতে আনিল নাইয়র।
(কত দিন আছিলেন) বাপ মায়ের ঘর॥
কেমন আরম্ভে আইলেন কারে সঙ্গে করি।
কি কি দ্রব্যে মেনকায় তুষিলেন গোরী॥
দেখিয়া দুহিতা মায়ের খণ্ডিলেক তাপ।
মায়ে ঝিএ কি কি মতে আছিল আলাপ॥
পাষাণের মাইয়া তেনি শুনিতে অসম্ভব।
হিমালয়ে কি মতে কৈল দুর্গার উৎসব॥
সেইকালে সুরেনরে পূজে কুতূহলে।
কেহ বা বসন্তে পূজে কেহ শরৎকালে॥
ইসকল শুনিবারে চিত্তে হৈল রঙ্গ।
শুনিতে দুর্গতি নাশ ভবানী প্রসঙ্গ॥

ব্যাস বোলে কহিবাম শুন রাজপুত।

পাণ্ডু কুলের রাজা তুমি পরীক্ষিত সুত॥
*   *   *   *   *
যে কথা পুছিলা রাজা শুন মন দিয়া।

এইরূপে দুর্গার পিত্রালয়ে যাইবার প্রার্থনা হইতে গ্রন্থারম্ভ হইয়া মেনকার স্বপ্ন, হরেক আদেশ, পিত্রালয়ে যাত্রা, গঙ্গার উৎপত্তি, সগরবংশ উদ্ধার, যমুনার বিবরণ, মর্ত্ত্যে ঈশ্বরীর পূজা ইত্যাদি বহুবিষয়ের আলোচনার পর মহামায়ার কৈলাস প্রত্যাগমন ও হর গৌরীর কলহে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার ১২৫ পাতা। প্রথম পাতা এক পৃষ্ঠা লেখা। শ্লোক সংখ্যা অনুমান ২৫০০।

গ্রন্থের লেখা সরল। অথচ ভাবময়। বর্ণনা অনেকস্থলে গ্রাম্য ভাবাপন্ন ও স্বাভাবিক। নমুনা স্বরূপ একটী সুদীর্ঘ বর্ণনা৷ উদ্ধৃত কবিলাম।

অরুণ উদয়ে দেবী প্রাতঃ কর্ম্ম শেষে।
স্নান করিবার বস্ত্র সিংহাসনে বৈসে॥
সখীগনণ ধাইলেক জল আনিবারে।
বারক্ষেত্রগণে আসি সিংহাসাজ করে॥
সোন্ধামেতি, পিঠালী হবিদ্রা আমলকি।
তামাদিয়া অঙ্গমাথে যত সব সখী॥
বৃম্ব তৈল গন্ধরাজ লেপি সব্বগায়।
কেহ কেহ অঙ্গমাজে কেহ দুই পায়।
বাপের ঘরের দুই-সখী যারে বেশ দয়া।
কলঙ্কার মাঝে সেই জয়া বিজয়া॥
শঙ্খ কঙ্কন মাজে হইয়া আগুসার।
কৈউব কিঙ্কিনি মাজে মণিরত্নহার॥
শত বারি আসিলেক মন্দাকিনীর জল।
[অস্পষ্ট] আইল দেখিতে নির্ম্মল॥
সহস্রেক ঝারি আসি হইল আগুসার।
শরীরে ঢালিতে জল হইল অঙ্গীকার॥
সে খানেতে যে উচিত ঢালে সেই ঝারি।
শিরে ঢালিলা জল নিজ হস্তে করি॥
স্নান আহ্নিক করি বড় হরষিতে॥
সখীগণে অঙ্গ মুছিল শুষ্ক নেতে॥
আসিল বসন শাড়ী অতি দীপ্তিময়।
রবিশশী সঙ্গে তাতে নক্ষত্র বৈসয॥
অঞ্চলেত পুষ্পের কুসুম ভাগে ভাগ।

(*) বন্ধনী বিশিষ্ট স্থানগুলি কবিব স্বহস্ত লিখিত জীর্ণ পুস্তক হইতে চ্যুত হইয়াছে। একখানা প্রতিলিপি হইতে তাহা সংগৃহীত হইল। সেই গ্রন্থ ১২২ পাতায় সমাপ্ত প্রথম পাতা একপৃষ্ঠা লেখা।

লেখক।

দুই পাশে শিখীচক্র মধ্যে কাল নাগ॥
সেই শাড়ীহস্তে করি পরিয়া যতনে।
ত্যাগ কৈলা তিতা বস্ত্র নিল সখীগণে।
অতসী কুসুমবর্ণ অরুণ নিন্দিত।
দ্বিতীয় আসনে আসি বসিলা ত্বরিত॥
কাকৈ করিয়া কেশ বিষ্ণু তৈল শিরে।
জয়া বিজয়া তান কেশ বেশ করে॥
চাচর চিকুরে ঝাপি বান্ধিল কবরী।
দুই মতে সাজাইল ত্রিভঙ্গ ভঙ্গকরি॥
মণিমুক্তা বহুমূল্য তাহাতে দুলনি।
উৰ্দ্ধে কামটঙ্গি ঘর হেটে দোলে বেণী॥
নানা পুষ্প হারমালা তাহাতে দোসর।
বসন্তে সাজিল যে নবীন জলধর॥
সম্মুখে দর্পণ দৃষ্টি ছায়া আলোকন।
দেখিতে নয়নমুখ ভুবন মোহন॥
সীমন্তে দিলেন কাম সিন্দুরের ফোটা।
ডাইনে সীতা রঙ্গপতি বামে চন্দ্রছটা॥
পরিলা অরুণ শশী সীমান্তের আগে।
নববঙ্গ লাগিয়াছে তাহার প্রভাবে॥
চতুর্দ্দিগে ফল পাত শতদল ফুল।
তরুণ কনকে তার জড়িয়াছে মূল॥
কুসুমেতে খণ্ড খণ্ড চিত্র মধুকর।
মণিমুক্তা হীরা কলি লাগিছে বিস্তর॥
নিশিপতি দিবাকর একত্রে বসতি।
অনিমিকে চাহিতে চক্ষের হানে জ্যোতি॥
কেশব বান্ধিল তার পেছি কালসুত।
ঝিকি মিকি করে যেন সহস্র বিদ্যুৎ॥
ভালে বিরাজিত সে সীমান্ত আগে দোলে।
আছেএ উজ্জল তারা ভূরূযুগ মূলে॥
দুই পাশে কেশে কেছুরা সারি সারি।
রঙ্গিলা পাথরের কলি মাণিকেলর অঙ্গুরী॥
নয়নে অঞ্জন দিলেন কাজলের কণা।
কুঙ্কুম কস্তুরী পরেন চন্দন গোরোচনা॥
মণিচুরি মতিচুরি তাহাতে বান্ধান।
সারি সারি দুই পাশে অলকা নির্ম্মাণ॥
অঙ্গে বেশর দোলে বহুমূল্য নিধি।
কুঞ্জনা দিবার যোগ্য না নির্ম্মিল বিধি॥

'মণিমাণিক্য তাতে রঙ্গিমা কাজর।
উড়ি উড়ি নৃত্য করে নিঃসরিতে স্বর॥
কণে কুণ্ডলাবলি তিমিরের আভা॥
কনক জড়ানু পাতে পারিলেন গ্রীবা।
কর্ণে মুকুতা বলি তিমিরের আভা॥
[অস্পষ্ট] মুকুতা গাথি কণ্ঠে মোহন মালা।
কার বাজুবন্ধ ভুলে অধিক উজ্জ্বলা॥
শঙ্খ কঙ্কণ শোভে সুবর্ণ অঙ্গুরী।
পরলা কেয়ুর হার দুসারি তেসাবি॥
ঘটিতে কিঙ্কিণি শোভে ভুবন মোহন।
অঙ্গুষ্ঠেতে রত্নাঙ্গুরী ক্ষুদ্র দর্পণ॥
ডানপায় মতি মুগা কনক খারুয়া।
নুপুর পঞ্চম পৈবে বিচিত্র–নালুয়া॥
স্বর্ণ অলঙ্কাব পরি বসিলা হরিবে।
তুলনা দিবার যোগ্য ব্রহ্মাণ্ডে না ভাসে॥
পুষ্পমালা বিরাজিত পদ্মগন্ধ গায়।
চন্দ্র রশ্মি ছাড়িয়া চকোরগণ ধায়॥
মকরন্দ লোভে তথা ভ্রমরার গতি।
কিঙ্কিণির ধ্বনি শুনি জন্মায় আরতি॥
প্রকাশ করিলা রূপ তরঙ্গ তরল।
বাম পাশে পলাইল ভরমে সকল॥
লজ্জা পাইয়া গঙ্গা শিবের আচ্ছাদিলেন জটা।
চন্দ্র লুকাইল লাজে আভেকরি ঘটা॥
পরিল মুকুটমণি বিচিত্র উরনি।
সন্তোষে সাজিলা দেবী হয়ের ঘরণী॥
সেইরূপে দশদিক সর্ব্ব দীপ্তি কৈল।
তুলনা দিবার নারি এই সে দুঃখ রৈল॥
শশধর যোগ্য নয় অন্তরে কলঙ্ক।
সেইরূপ দেখিয়া হরের যোগ ভঙ্গ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী যুগ্ম হেন মনে লয়।
তুলনা না খাটে তানা দশভুজা নয়॥
অলঙ্কার রত্নবস্ত্র লিখিতে নাই সীমা।
সংক্ষেপ রচিল অপরাধ কর ক্ষমা॥
নাগমুক্তা রামে কহে ওপদ কমলে।
আর কোন ভরসা নাই জীবন জঞ্জালে॥

গ্রন্থের বর্ণনাস্থান মাত্রেই এরূপ কবিত্ব পূর্ণ।

পয়ার ব্যতীত গ্রন্থের স্থানে স্থানে অনেক ছন্দোবন্ধে কবিতাও দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি অধিকাংশ গীত। গীতগুলি অতি মনোহর। আমরা তাহার করেকটি সঙ্গীত নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

সাজিয়াছে দেবী কার ঘরে যাইতে মনোরঙ্গে।
যোগীন্দ্র দেখি, মুদ্রিত আঁখি এই রূপতরঙ্গে॥
কোটী জলধর তাহে বিধুবর চাঁচব চিকুর ছান্দে।
চকোর ভুকিত, দেখিয়া শুকিত চান্দ পড়িয়াছে ফান্দে॥
শঙ্খ কঙ্কণ দশ দরপণ তসন্দু রে অরুণ ঘটা।
অলকা ভরিয়া ইন্দু বিন্দু রঞ্জিত রঙ্গিম ছটা॥
পরি যথোচিত মণি বিরাজিত রূপেব কি তুলনা আছে।
সেইরূপ দেখিতে অমর ভাঙ্গিয়াছে গঙ্গা না রহিল কাছে॥
চরণ যুগল অতি সুকোমল নাগ মুক্তা রামে গায়।
নুপুব কিঙ্কিণ রুনু ঝুনু শুনি রবে চিত্তমোব ধায়॥

উদ্ধৃত অংশগুলির আলোচনা করিলে, বুঝা যায় যে ভাষা ও ভাব উভয়ের প্রতিই কবির সমান অধিকার ছিল।

কবি সময় সময় ভাবময় চিত্তে যে সকল সঙ্গীত রচনা করিতেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে নিবদ্ধ করিতেন ; আমরা তাঁহার বহুসঙ্গীতের আর একটি মাত্র পাঠক বগকে উপহার দিতেছি।

ত্রাণ কর বিষম কলি ভয়।

হেলায় জনম যায় না ভজিলাম রাঙ্গা পায়,
জীবন যৌবন মিছে সব।
ভাবিয়া উমার পদে, আছিল অনেক সাধে,
ঠেকিয়া দারুণ মায়া জালে।
দিন দিন হইলাম হীন, জীবন আর কত দিন
না জানি কি হয় অন্তকালে॥
সুত সম্পদ জয়, তুমি হতে সব হয়,
ভাবিয়া বুঝিল আপন মনে।
সেবকের দয়া সাব, মায় বিনা কে আছে আর,
আমি বঞ্চিত তাতে কেনে।
চিন্তিতে চঞ্চল আঁখি, পলকে সঙ্কট দেখি
শমন দারুণ কাল পাছে।
আমি বড় অপরাধী, বিপাকে ঠেকাইল বিধি
তোমাতে বিদিত সব আছে॥
গজ মুণ্ডে জন্ম নাম তাহার অপরে নাম

ভনে সেই পন্নগ পদ্ধতি।*

মিনতি করিয়া কয় না যায় মনের ভয়

উপায় বলহ বেকুল গতি।

মুক্তা রামের অনুকরণে জগন্নাথও দুর্গাপুরাণ রচনা করেন। দুই জনের দুই খানা সম্পূর্ণ পৃথক গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও "গায়ন" দিগের সংগ্রহ দোষে "মুক্তারাম জগন্নাথ" "দ্বিজবংশী-নারায়ণদেব" হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমরা দুই একজন "গায়নের" মুখে যে পদাবলী শুনিয়াছি তাহাতে মুক্তারাম ও জগন্নাথ উভয়ের ভণিতা মিশ্রিত পদ পাইয়াছি, কিন্তু লিখিত দুর্গাপুরাণ আজও এতাদৃশ বিকৃত অবস্থাপন্ন হয় নাই। 'গায়ন' দিগের অনুগ্রহে এরূপ দুর্ঘটনা হওয়াই সম্ভবপর। আমার বোধ হয় 'গায়ন' দিগের নিকট যে পুঁথি আছে তাহাতে তাহারা উবয় কবির ভণিতা যুক্ত পদ একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। তবেই ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

দুর্গাপুরাণ রচনা করিয়া মুক্তারাম "কালীপুরাণ" রচনা করেন।

দুর্গাপুরাণ শুনি রাজা জন্মেজয়।
করজোড়ে (**) ব্যাস স্থানে কয়॥
দশভুজা চণ্ডিকা হিকালয়ের ঝি।
কালরূপ হইলেন এবিযয় কি॥
বামা হইয়া সংগ্রাম দেখিতে অসম্ভব।
পদতলে তান কেন শিব হইলেন শব॥
উলঙ্গ উন্মত্ত হইয়া না করেন লাজ।
কেমতে (**) দুষ্ট রণ ভূমি মাঝ।
কেমতে ধবাইলা হিয়া শুনিয়া মেনকা।
নিশাকালে কি মতে মায়েরে দিলা দেখা॥
প্রথমে কালীয় পূজা হৈল কোন ঠাঞি।
সেহি সব বিববণ শুনিবার চাই॥

উল্লিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর কালীপুরাণে বিবৃত হইয়াছে। কালীপুরাণ গ্রন্থ ছোট আকার ৩৭ পাতা। প্রথম ও শেয পাতা এক পৃষ্ঠা লেখা প্রাপ্ত গ্রন্থ ১২৫০ সনের লিখিত*

মুক্তারাম "পদ্ম পুরাণ"ও রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার ভণিতা যুক্ত পদ্মা-পুর‍্যাণের প্রথম অংশ কয়েক খানা পাতা মাত্র আমরা পাইয়াছি। "নারয়াণ দেব" প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিবার ইচ্ছা রহিল।

লিখিত পুঁথিগুলি এক এক খানা বর্ণাশুদ্ধির বিরাট নিদর্শন।

* মুক্তা + বাম+ নাগ।

* এই পুঁথি এবং আরও অন্যান্য অনেক পুঁথি আমি কবি জগন্নাথের জন্মস্থান ধারীশ্বর হইতে শ্রীযুক্ত বজনা নাথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্যে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। রজনী বাবুর নিকট সেই জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ লেখক।

গৌড়ীয় সাধু ভাষার সহিত পূর্ব্ব ময়মনসিংহের গ্রাম্য ভাষার সংমিশ্রণ ক্রিয়া পদ—যাইতাম না, খাইতাম না, করবাম প্রভৃতির অপূর্ব্ব সংযোগ সকল গ্রন্থে বিরল নহে। উত্তম পুরুষের কর্ত্তায় পুরুষের ক্রিয়াপদ নাম হরুষ কর্ত্তায় উত্তম পুরুষের ক্রিয়া পদের ব্যবহারও মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়।

যথা—

১. কামে মত্ত হৈছ আমি দেখি তবরূপ।"

২. ইন্দ্র আদি দেবগণ যাহাকে ডরাই।"

ইত্যাদি।

এই সকল অপ-প্রয়োগ সে সময়ে দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত এবং সেজন্য আমাদের দুঃখ করিবারও কোন কারণ নাই।

মুক্তারামের ন্যায় কত কবি যে এই ব্রহ্মপুত্রের উষর ক্ষেত্রের ধূলি করিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছেন কে তাহার সংখ্যা করিবে? 'পুদ্মাপুরাণ' প্রণেতা নারায়ণ দেব "ভাগবত" প্রণেতা দ্বিজবংশী দাস "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" প্রণেতা মাধবাচার্য্য চার্য্য ও "মহাভারত" রচয়িতা রামেশ্বর নন্দী এই ময়মনসিংহ ভূমিই [অস্পষ্ট] করিয়াছিলেন। এইরূপ "রামায়ণের" কবি অনন্তরাম, রাগ মামা প্রণেতা রাজারাজ সিংহ "দারা শেকো" প্রণেতা সদানন্দ মুন্সী, "নিগম" প্রণেতা জগন্নাথ, উদ্ধব গীতার রচয়িতা বিষ্ণু রাম নন্দী প্রভৃতি আরও বহু কবির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'আরতি'তে ক্রমে ইহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের বিগত সংখ্যায় আলোচিত সঞ্জয় কবির রচিত "ভারত সাবিত্রী" ময়মনসিংহ সাহিত্য সভার যত্নে ও অর্থে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে। সঞ্জয়ের ভগব গীতা ও কোন সদাশয় ব্যক্তির অর্থে উক্ত সাহিত্য সভার যত্নে মুদ্রিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে। মুক্তারামের দুগাপুরাণও কোন স্বদেশ বৎসল সাহিত্যপ্রিয় ধনবানের অনগ্রহে মুদ্রিত হইতে পারে না কি?

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।[৮৩]

মালঞ্চ

উদ্দেশ্য

আর কতকাল রহিবি লো দূরে,
কুসুম বালা?
আর কতকাল রাখিবি দেখায়ে
ফুলের মালা?
[অস্পষ্ট] আকাশ-কামিনী দামিনীর মত,
পলকে ঢালিয়া রূপের স্রোত,
উলট পালটি করি ওত প্রোত

হৃদয় মোর,
আর কতকাল রহিবি লুকায়ে
মানস চোর !
আশার প্রদীপ জ্বালি নিশি নিশি,
[অস্পষ্ট] জাগরণে অশ্রু জলে ভাসি,
আর কতকাল রহিব রূপসি
ধেয়ানে তোর ?
সদা দূরে দূরে শুনি সুধারব,
রণু রণু ধ্বনি নুপুর—সম্ভব,
কহলো সমীব, তোঁহারি সৌবভ—
মদিরা ভোর ?
আর কতকাল রহিবি লো দূরে
মানস চোর !
শত অনুনয়ে নাহি সরে কথা,
মুখে মৃদুহাসি মনে দিযে ব্যথা,
অবলাব মন মাখা সবলতা
কেবলে ধনি ?
ধরা দিতে যেনসাধ প্রাণ ভবা,
ধবিতে চাহিলে নাহি দিস্ ধরা,
পত নাহি তোর মোর পথ ছাড়া
উন্মাদিনি !
একেমন বীতি বুঝিনা লো তোর
মনমোহিনি !
মিষে আববণে ঢেকেছিস দেহ,
দুহাতে বোধিস হৃদয়-প্রবাহ,
উচ্ছ্বাসি ওঠে প্রেম প্রীতি স্নেহ
নয়ন জলে !
ফেটে যায় বুক, নাহি ফোটে মুখ,
বিধির মধুর রহস্য-কৌতুক,
নয়নেবে সেযে করেদিতে মুক
গিয়েছে ভুলে।
শত যত্নে যাহা চাপা দিতে চাস্
নিরদয় আঁখি করেলো প্রকাশ
তোর নাহি দোষ এরা সর্ব্বনাশ
করেছে বালা !

তবে, কি কাজ বিলম্বে আয় সখি আয়
দেলো ফুল মালা পরায়ে গলায়,
মধুর রজনী আজি লো সজনি
জ্যোছনা ঢালা।
আর কতকাল রহিবি লো পর
কুসুম বালা?
শ্রীমনোমোহন সেন।

জীবনে মরণে।

এজীবনে আর কোন সাধ নাই মোর
হে কল্যাণি মনোরাণি! শুধু মন ডোর
বাঁধা থাক্ দুজনার নীরব নিক্ষণ
জেগে থাক্ দু'অধরে। তৃষিত নয়ন
থাক্ চির তৃষাতুর। অনুভবে হোক্
তোমাতে আমাতে শুধু অন্তরে সম্ভোগ।
তার পর একদিন বিশ্রদ্ধ সন্ধ্যায়
বিশ্রান্ত পাখীর ন্যায় ফিরিব কুলায়
পশ্চিম পার্খির ন্যায় ফিরিব কুলায়
পশ্চিম গগণে; —দূরে হের রবিরেখা।
আমার নয়নে যেন হয় সখি, দেখা
তোমার নয়ন। মূর্ত্তিময়ী রূপে আসি
একটী চুম্বনে দিও দুই চক্ষু ভাসি।
আমার বুকেতে যেন তোমারি চরণ
পড়ে থাকে; —তার পর আসুক মরণ।
শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

ময়মনসিংহ সাহিত্যসভা

মাতৃভাষার সেবা ব্রত শিরে লইয়া এখানে 'ময়মনসিংহ সাহিত্যসভা' নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিগত ১লা মাঘ তারিখে 'আরতি' কার্য্যালয়ে এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়।

উপস্থিত সভ্যগণের সম্মতি ক্রমে "আরতি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সারদা চরণ ঘোষ এম. এ. বি. এল গবর্ণমেন্ট উকীল মহাশয় সভাপতির আসনগ্রহণ করেন।

সভাপতি নির্ব্বাচনের পর সভার উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয়।

নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্য লইয়া এই সভা গঠিত হইয়াছে।

ক. আরতির উন্নতি বিধান ও নিয়মিত প্রচার।

খ. ময়মনসিংহ জেলার প্রাচীন তত্ত্ব ও ইতিহাস সংগ্রহ।

গ. ময়মনসিংহের প্রাচীন গ্রন্থকার দিগের হস্ত লিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ ও প্রচার।

ঘ. সাহিত্যালোচনা প্রভৃতি।

উপস্থিত সভ্যগণের সম্মতিক্রমে বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ সভার কর্ম্মচাবী নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রমণী মোহন দাস এম. এ ডিপুটী মাজিস্ট্রেট সভাপতি, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমাব গুহ বি এল সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সে হিসাব পরিদর্শক, শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার সম্পাদক।

স্বদেশে হিতৈষী সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের নিকট বিশেষতঃ ময়মনসিংহ বাসী প্রত্যেকের নিকট সাহিত্য সভা বিনীত ভাবে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন।

ময়মনসিংহ
সাহিত্যসভা

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।
সম্পাদক

২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা. ফাল্গুন, ১৩০৮

মহেশচন্দ্র সেন : প্রকৃতি-গ্রন্থপাঠ. বাম প্রাণ গুপ্ত ; সেন্ট থোমা, গিরিশচন্দ্র সেন : খাদ্যাখাদ্য বিচাব, দুখাদাস বায ; বস সভাব ধর্ম্মনন্দ মহাভারতী : বাবা জ্ঞানানন্দ।

মনোবিজ্ঞান।

আমার নয়ন দুটি তোমাতে যেতেছে ছুটি,
বহুদিন পবে পুন বন্ধু জন মাঝে।
তোমাবো কি যেন আসি আমারে সম্ভাষে হাসি,
কতবা'র গৃহান্তব দেশান্তর মাঝে।
এ নীরব অভিনয় কি জানি কেমনে হয়,
মরমে মরম স্পর্শে ; — ঐক্যতান বাজে !
তবু স্থূলেন্দ্রিয় জীব দেখিবাবে উদগ্রীব
ঘন যবনিকা আড়ে কি রয়েছে ফুটে ;—
কোন চিত্র বিকশিত কি গান নীরবে গীত
ধূপ-গন্ধ সম যার পূত গন্ধ উঠে !
জানিতে কৌতুকী চিত্ত কে করে নিত্য এ কৃত্য
—এ অন্তব রহস্যের নায়ক গোপন ;—
হৃদি তাই বৈজ্ঞানিক চিন্তায় মগন।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।[৮৪]

ভিক্ষারী

আমি তোমার দুয়ারে আসি' নিতি নিতি
শুধু হাতে ফিরে যাই,
আমি হৃদয় বেদনা সুকরুণ সুরে
পথে পথে ধীরে গাই।
আমি গাহিতে গাহিতে দুখের কাহিণী
কাঁদিয়া আকুল হই,
আমি অভিমান ভরে নীরবে অদূরে
বন পাশে শুয়ে রই !
আমি ভিখারী বলিয়া তৃণেব অধম
তিলেক আদর নাই !
আমি দীন ভিখারী, তোমার দুয়ারে
নাহি কি আমার ঠাঁই ?
আমি কি ক্ষোভে যে কাঁদি, ব্যথিত মরম
খুলেত দেখিলে না,
আমি কেন নিতি আসি তোমার দুয়ারে
কবু ত ভাবিলে না !
আমি সারাটি জীবন তোমারি নিকটে
স্নেহ প্রীতি বেচে যাই,
আমি করুণা করুণা ভালবাসা বলি,
পথে পথে কেঁদে গাই ;
আমি যাচ্ঞা লইয়া ফিবি পাছে পাছে
কত যে উপেক্ষা সই,
আমি তবু ফিরে ফিরে অপমান ভুলি,
আবার দ্বারস্থ হই !
আমি দীন ভিখারী, দীন পরাণে
এত যে যাতনা বহি,
আমি এত যে লাঞ্চনা এত যে ভ্রূকুটি
সহিয়া, দুয়ারে রহি ;
ওগো কঠিন পরাণে ! একবার শুধু
ডাকিয়া সধালে না !
তুমি আপনার ভাবে আপনি বিভোর
আশ্রিতে চাহিলে না :
আমি তবুত তোমার কণক দুয়ার
ত্যজিয়া যাব না প্রাণ !

আমি লাঞ্ছিত পরাণ তোমারি চরণে
দিব শেষে বলিদান !
তুমি যে দিন পাঠালে ভিখারী করিয়া
বাবিনি তিলেক তরে
আজি দীন ভিখারী প্রেম দয়া চাহি,
পড়িবে চরণ'পরে ! !

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার[৮৫]

স্নেহ বন্ধন।

তুমি এখনো আমারে বুঝিতে পারনি !
তোমারে বুঝেছি আমি।
ওগো আমি যে তোমার চির জীবনের
সুখ দুখ অনুগামী
তুমি ঘৃণায় ফিরাও আঁখি ;
আমি . তৃষিতের মত নিশি দিন ধরে
মুখপানে চেয়ে থাকি।
শুধু অই রূপ রাশি, ও মধুর হাসি,
গোপনে পরাণে মাখি।
তুমি সাধিলে কহ না কথা ;
সদা আঁধার হৃদয়ে জাগাইয়া দাও
নিদারুণ ব্যাকুলতা।
উহুঃ নিমিষের মাঝে বুকের ভিতরে
জেগে উঠে শত ব্যথা।
আমি চির জীবনের তরে
তোমারি মধুর রূপের প্রতিমা
বসায়েছি হৃদি পরে।
সেই নিভৃত নিলয় হ'তে
তুমি ছলনা করিয়া চুপি চুপি বল
পলাই কোন্ পথে ?
সেথা শত আদরের সোণার শিকলি,
নিশি দিন দিবে চরণ বিকলি
বাঁধিয়া স্নেহের বাঁধে।
তুমি আপনা আপনি অবশ হইয়া
পড়িবে আমার ফাঁদে।

ভুলে যাবে সব ছলনা চাতুরী,
সরল হৃদয়ে জাগিবে মাধুরী,
ডুবিবে অতীত কাহিণী।
শেযে দুইটী জীবন মধুর মিলনে
হইবে ত্রিদিব বাহিণী।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত*

২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩০৮

কৃষ্ণহরি গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ : শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার : সৃষ্টি রহস্য, মহেশচন্দ্র সেন ; গায়ত্রী [উপন্যাসের সমালোচনা], শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি : সাবিত্রীর লাল [কবিতা], হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় : পুরাতত্ত্ব, অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা : শ্রী ক্ষেত্র [ভ্রমণ], শ্রী সঙ্গিনী রচয়িত্রী : প্রভাতী [কবিতা]।

মাসিক সাহিত্য

বান্ধব--১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ফাল্গুন—বহুদিন পরে, 'বান্ধব' পুনঃ প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া আমরা নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। অধিকতর প্রীতির বিষয় এই যে 'বান্ধবের' ভূতপূব্ব সম্পাদক পণ্ডিতাগ্রগণ্য রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর স্বয়ংই ইহার সম্পাদনকাযে পুনঃব্রতী হইয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্ব্ববঙ্গ 'বান্ধব' এবং 'বান্ধবের' প্রবীণ সম্পাদক রায় বাহাদুরের নিকট যে কি পরিমাণ ঋণী, বোধ হয় পুরাতন 'বান্ধবের' তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই পূব্ববঙ্গবাসী সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ তাহা একেবারে বিস্মৃত হন নাই। যখন তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদশন, অযাদশন প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকা পশ্চিম বঙ্গে সমস্ত গুণরাশি একত্রিত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যে এক অভিনব যুগ গঠন করিতেছিল, তখন পূব্ববঙ্গে একমাত্র 'বান্ধব' এবং বান্ধবের তৎকালীন যুগব সম্পাদক বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ সেই যুগ গঠনে অপরিসীম সাহস করিয়া পূব্ববঙ্গের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। যুগপ্রবর্ত্তক এই সকল মহারথীদিগের অনেকেই দেখিতে দেখিতে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সেই পুরাতন এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্য কুঞ্জগুলিও একে একে রুদ্ধদ্বার হইয়া অতীত স্মৃতির পথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এক্ষণে নতুন রুচিতে নূতন সামগ্রী লইয়া বহু নূতন মনোহর কুঞ্জ রচিত হইতেছে। কিন্তু ভক্তের হৃদয় নতুন অপেক্ষা পুরাতনেই অধিকতর আকৃষ্ট হয় ; সুতরাং এই সকল অভিনব কুঞ্জের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও সেই পুরাতন কুঞ্জগুলির দ্বার পুনরুন্মুক্ত হইতে দেখিলে, সাহিত্য-সেবীমাত্রই যে আনন্দিত হইবেন, যে বিষয়ে সংশয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রের পাদপীঠস্বরূপ সেই পুরাতন বান্ধব রুদ্ধদ্বার বহুদিন পরে পুনরুদ্ঘাটিত হইয়াছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের সেই পুরাতন বঙ্গদর্শনের দীর্ঘকাল পরে আবার দ্বার খুলিয়া সাহিত্যসেবীদিগকে আহ্বান

* ভ্রম বশতঃ ২৪৯ হইতে ২৭২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ভুল হইয়াছে। ২৪৫ হইতে ২৬৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত হইবে।

করিতেছে। আমরাও প্রণত হইয়া বান্ধবকে এবং তাহার জ্ঞানবৃদ্ধ সম্পাদককে হৃদয়ের সহিত অভিবাদন করিতেছি।

বর্ত্তমান বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য। তাঁহাদের লেখায় কোনও রূপ মৌলিকতার স্পর্দ্ধা না করিলেও, সামগ্রীসংগ্রহে এবং ভাবসমাবেশে বিলক্ষণ যত্ন ও অধ্যাবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু লিপিচাতুর্য্যও যে সাহিত্যের একটী প্রধান অঙ্গ, অনেক লোকেরই তদ্রূপ ধারণা নহে। কোনও একটি ভাবকে যে কোনও ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিলেই তাহারা পরিতৃপ্ত হন। সামগ্রী ইতিহাস ও বিজ্ঞানের প্রধান উপাদান, ভাব দর্শনের প্রধান উপাদান এবং সামগ্রি ভাব ও ভাষা এই তিনই সাহিত্যের প্রধান উপাদান। এই ত্রয়োবিধ উপাদানের উৎকর্ষ ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য গঠিত হইতে পারে না। আমাদের দেশের কোনও কোনও লেখক সামগ্রী-সংগ্রহ কিম্বা ভাবসমাবেশ বিষয়ে ইউরোপীয় সাহিত্য লেখকদিগের অনুকরণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কিন্তু ভাষাবিষয়ে ঔদাসীন্যবশতঃ, তাঁহারাও সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইবেন কিনা, এ বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ আছে। বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের মধ্যে কতিপয় মাত্র ব্যক্তি ভাষাচাতুর্য্যে মৌলিকতা এবং নিপুনতা প্রদশণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের নামোল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে লক্ষণদ্বারা এই পয্যায় নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত হইবে না যে যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি ইহাদের লিখিত কোনও একটি প্রবন্ধ কিম্বা গ্রন্থাংশ পাঠ করিলেই কিন্তু লেখক কে, ভাষাব ছন্দদ্বাবা তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ভাষার ছন্দ ও গঠন পৃথক পৃথক, অথচ প্রত্যেকের ছন্দ ও গঠনের এমন কিছু একটা বিশেষত্ব আছে, যাহা অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, এই সকল পাঠ করিতে ইচ্ছা হইলেও অনুকরণ করা যায় না। এই শ্রেণীর লেখকদিগের মধ্যে বান্ধব সম্পাদক রায় বাহাদুরের নাম আমরা সাহস সহকারে নিদ্দেশ করিতে পারি। ভাষার এই মৌলিকতায় অথবা বিশেষত্বের ফলেই বান্ধব একমাত্র বঙ্গীয় উচ্চশ্রেণীর মাসিক-পত্রিকা সমূহের মধ্যে উচ্চ আসন লাব করিয়াছিল। প্রচারিত বান্ধবের প্রথম সংখ্যার অবতরণিকা 'কিশোরগৌরাঙ্গ' প্রবন্ধটী পাঠ করিলেই পাঠক আমাদের কথার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারিবেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বান্ধব এই নূতন যুগের নূতন রুচির আহার্য্য যোগাইতে বাধা হইলেও স্বীয় বিশেষত্বটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বীয় পৃথকভূত উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে সক্ষম হউক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।[৮৬]

সুধা—১ম খণ্ড, ফাল্গুন—সুধা পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। সমালোচ্য সংখ্যায় প্রেমাতোর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য', 'বঙ্গ আর্য্যসমাগম', 'লঙ্কাদ্বীপে' প্রভৃতি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। মফস্বল হইতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে সুধাই বোধ হয় একমাত্র সচিত্র মাসিক পত্রিকা এই সংখ্যায় প্রকাশিত কুসম কুঞ্জান্তর্বর্ত্তিনী প্রেমের মনোমোহিনী চিত্র খনা বঙ্গীয় চিত্রশালার সম্পদ বৃদ্ধি করিবে। আমরা নবদ্ধন্তিঃকরণে সুধার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩০৯

শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গলা আকারান্তোচ্চরিত শব্দ, শ্রীমতি সঙ্গিনী রচয়িত্রী : উষসী [কবিতা], প্রকৃতি-গ্রন্থপাঠ, বসন্তকুমার পাল : রঘু [গল্প], চন্দ্রকিশোর তরফদার : জ্যোতিষ...।

২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯

পূজা

প্রদোষে দুর্য্যোগ ছিল প্রকৃতি ছাইয়া
ক্লিন্ন দীন যেতেছিনু সে পথ বাহিয়া।
পিচ্ছিল বিষম ; তবু দামিনী বিকাশ
জাগাইতে ছিল মুহুঃ ক্ষুন্ন হৃদি-আশ !
বস্ত্রে আড়াল করি' ক্ষীণ দীন দীপ
পূজা আয়োজন সহ,—অদূরে সে নীপ
কুঞ্জ মাঝে দেবাগারে ছিল লক্ষ্য মম,—
যেতেছিনু উদভ্রান্ত গো !—চির শত্রু সম
কোথা হ'তে দুষ্ট বায়ু রুষ্ট ভাবে আসি'
নিবাইয়া দিল দীপ, উচ্চ আশা রাশি
আঁধারে বুদ্বদ প্রায় পাইল বিলয়,—
তবু অগ্রসারি' যাই, অন্তর সভয়।

কতক্ষণে ভোট দেবে, আশ্বাসিত মন
চির দয়িতের পদে সে পুষ্প চন্দন
—প্রয়াস অর্জ্জিত—ওগো আপনা ভুলিয়া
দিনু ঢালি,—প্রণামান্তে নয়ন তুলিয়া
একি হেরি—মন্দিরের দীপ নির্ব্বাপিত,
অর্চ্চনার উপচার একি বিলুণ্ঠিত
অতর্কিতে ভূমিতলে !—মুদিনু নয়ন।—
*　　*　　*　　*
ভানুদয়ে যবে পুনঃ ভাঙ্গিল স্বপন
কোথা তুমি অন্তর্য্যামি !—নহে দেবাগার,
পতিপদতলে এ যে সুভাগী অপার
বিসুগ্ধা !—সেকিগো হেন হ'য়ে গেল ভুল !—
ভুল নহে, অন্তর্য্যামি, এ লীলা অতুল
কেমনে বুঝিব ?—অর্ঘ্য রয়েছে বিস্তার
পতি পদ তলে, সেকি সুষমা অপার !
সুপ্রভাতে স্বপনের সুখ লীলা স্মরি'

হাসি' দেব সে নির্ম্মাল্য দিলা শিরোপরি
সুভাগীর,—খিল্ খিল্ হেসে উঠে ধরা ;—
স্বপনের পূজা মোর সরমেতে ভরা ! !

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

অনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ : জল ও বায়ু, রমণীমোহন দাস : নাগরক্ষক, মহেশচন্দ্র সেন : বঙ্গদর্শন ; কৃষ্ণহরি গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ : শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, রসিকচন্দ্র বসু : বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত শ্লোকমালা, উপেন্দ্রচন্দ্র রায় : যাত্রী [কবিতা]।

৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩০৯

মাঙ্গলিক [কবিতা], যতীন্দ্রমোহন সিংহ : অৰ্দ্ধবাণী, জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাচীন· সংস্কৃত ও বঙ্গসাহিত্যে নারী।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

পাশ্চাত্য-জ্ঞানারুণ-সমুদ্ভাসিত ভারতবর্ষে যে সকল মহাপুরুষ বৰ্ত্তমান যুগে প্রাচ্য প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানালোচনায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তির পবিত্র পুষ্পচন্দন উপহার পাইতেছেন, আমাদের প্রবন্ধোক্ত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার তাঁহাদের মধ্যে একজন। ভারতবষ বহু প্রাচীন কাল হইতে সার-স্বতগণের পবিত্র লীলা-নিকেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ভারতের সেই স্বর্ণযুগের সুখ সৌভাগ্যের কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে, শক্তি অপেক্ষা ভক্তি এবং শস্ত্র -চচ্চা অপেক্ষা শাস্ত্র-চচ্চার মাহাত্ম্যই আমরা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। বৰ্ত্তমান ভারত সৰ্ব্বস্বান্ত হইলেও সুধীগণের আবাস স্থান বলিয়া সৰ্ব্বত্র সংপূজিত।

বঙ্গদেশে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য দুইটী স্থান চিরপ্রসিদ্ধ,—পশ্চিমবঙ্গে নবদ্বীপ পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর। কিন্তু চন্দ্রকান্তের অভ্যুদয়ে তৃতীয় আর একটী স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রান্তভাগস্থিত ময়মনসিংহ জেলার অরণ্য সস্কুল সেরপুর নামক গ্রামে. শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় বন্দনীয় বন্দ্যবংশে ১২১৬ সনের ১৯শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবারে চন্দ্রকান্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। "একশুদ্ধ স্তমোহন্তি" এক চন্দ্রকান্তের অভ্যুদয়ে অন্ধতমসাচ্ছন্নময়মনসিংহ আজ অত্যুজ্জ্বল গৌরব-প্রভায় দীপ্তমান। চন্দ্রকান্তের পূর্ব্বপুরুষগণ মানকোণের·চক্রবর্ত্তী নামে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ মানকোণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম পুত্রের শাখা সেরী নদীর তীরে সেরপুর নামক গ্রামে বাসস্থান মনোনীত করেন বঙ্গের সুবিখ্যাত সমাজসংস্কারক বল্লালসনে কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, চন্দ্রকান্তের. আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের অন্যতম সুতরাং বংশমৰ্য্যাদায়ও চন্দ্রকান্ত অতি উচ্চ সম্মানের অধিকারী। চন্দ্রকান্ত উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান ; তাঁহার পিতা রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগী মহাশয়ও সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত বলিয়া তাৎকালিক পণ্ডিতসমাজে বিশেষরূপ সম্মানের পাত্র ছিলেন।

উপযুক্ত পিতা রাধাকান্ত বয়সে পুত্রের বিদ্যারম্ভের ব্যবস্থা করিলেন। পিতার পদতলে বসিয়া পুত্র কঠোর ব্যাকরণশাস্ত্রলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু এ সুবিধাভোগ অধিক দিন

ঘটিয়া উঠিল না ;—কালের কঠোর হস্ত রাধাকান্তকে ভবধাম হইতে সরাইয়া লইল। পিতার মৃত্যুতে চন্দ্রকান্তের বিদ্যাশিক্ষার নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইল সত্য, কিন্তু রাধাকান্ত পুত্রের হৃদয়ে যে জ্ঞান-পিপাসার উদ্রেক করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কিছুতেই দমিত হইল না ; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে চলিল। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া বালক চন্দ্রকান্ত বিক্রমপুর পুরাপাড়া-নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট স্মৃতি অধ্যয়ন জন্য উপস্থিত হইলেন। যত জল বাড়ে, পদ্মনাল ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ;—চন্দ্রকান্তের শাস্ত্রজ্ঞান যত বাড়িতে লাগিল তাঁহার শিক্ষাপ্রবৃত্তি ততই বেগবতী হইয়া চলিল। চন্দ্রকান্ত বিক্রমপুরে সম্বৎসরের বেশি তিষ্ঠিতে পারিলেন না। বিদ্যার পবিত্র পীঠস্থান নবদ্বীপ নগরে গমন করিয়া বিখ্যাত স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও হরিদাস শিরোনামণির নিকট স্মৃতি, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ ও প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যায়ন করিলেন ; এবং প্রথিভনামা বেদান্তবিদ্ পণ্ডিত কাশীনাথ নিকট বেদান্ত দশন পাঠ করিয়া তর্কালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত হইলেন । এখানেই তাঁহার টোলের পাঠ পরিসমাপ্ত হইল ; কিন্তু জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি হইল না, বুঝি বা এ জীবনে হইবার নয়। টোল পরিত্যাগের পর চন্দ্রকান্ত ঘরে বসিয়া অশেষ যত্ন ও অদম্য অধ্যবসায় সহকাবে সংস্কৃত সাহিত্য, অলঙ্কার ও দর্শনাদি পাঠ করিয়া ভূয়োর্শন ও অদ্ভুত বিচারশক্তি লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। যড দর্শনে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেও মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শনেই তাঁহার অসীম অধিকাব দেখিতে পাওয়া যায়। ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ সংস্কৃতকারিকাকারে রচিত "তত্ত্বাবলী" নামে তিনি উপর্য্যুক্ত দর্শনের যে ভাষ্য প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্য, তার গবেষণা, অপূব্ব তর্ক ও মীমাংসা শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চন্দ্রকান্তের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন স্মৃতি শাস্ত্রশিক্ষার্থীদিগকে তিনি সমভাবে শিক্ষাদান কয়িা থাকেন। একাধারে এবম্বিধ সুগভীর পাণ্ডিত্য সাতিশয় বিরল।

হুতাশন চিরকাল ভস্মাচ্ছাদনে নিষ্প্রভ থাকিবার সামগ্রী, সুবিধা প্রাপ্ত হইল সে আপনার লেলিহান বসনা সম্প্রসারিত করে। যে প্রতিভাবহ্নি সেরপুরের নিবিড় কাননান্তরালে লুক্কায়িত ছিল, কালক্রমে আগ্নেয়গিরির অগ্নিপ্রবাহেব ন্যায় তাহা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র চন্দ্রকান্তের প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা কায্যে ব্রতী করিবার জন্য বিশেষরূপ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পরসেবাবাদ্বেষী স্বাধীনচেতা চন্দ্রকান্ত এ কায্য গ্রহণে সহসা স্বীকৃত হইবেন না জানিতে পারিয়া মিত্র মহাশয় তাঁহাকে স্বীক অভিপায় জ্ঞাপন করেন নাই। সংস্কৃত কলেজের বৃদ্ধ পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন[৮৭] মহাশয়ের অবসর গ্রহণের কাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে, কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন[৮৮] মহাশয় চন্দ্রকান্তকে উক্ত পদ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। চন্দ্রকান্ত উত্তরে লিখেন "এখনও সময় আছে, ইতিমধ্যে মতামত স্থির করিয়া জানাইব।" বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অবসর গ্রহণকালে ন্যায়রত্ন মহাশয় পুনরায় চন্দ্রকান্তকে ঐ কার্য্যে ব্রতী হওয়ার জন্য অনুরোধপত্র প্রেরণ করেন। চন্দ্রকান্ত এবারও লিখিয়া পাঠান "আত্মীয় স্বজনের অভিমত জানিয়া পরে জানাইব।" তিনি

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কৃষ্ণদাস পালের[৮৯] নিকট এ বিষয়ের পরামর্শজিজ্ঞাসু হইয়া চিঠি প্রেরণ কবিলেন, তাঁহারা উভয়ে তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

ইতিমধ্যে কলিকাতার স্বনাম প্রসিদ্ধ রেজিস্ট্রার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ সংক্রান্তি (চল ও স্থিতি) বিষয়ক একটী প্রশ্নের উত্তর প্রার্থী হইয়া অনেক প্রসিদ্ধ নামা পণ্ডিতের নিকট লিপি প্রেরণ করেন। উত্তরে চন্দ্রকান্ত যাহা লিখিয়া পাঠান তাহাই তাঁহার নিকট অধিকতর মনঃপূত হইয়াছিল। চন্দ্রকান্তকে কলিকাতায় আনিবার জন্য প্রতাপ বাবু স্বতঃ পরতঃ বহুবিধ চেষ্টা করিতে পারিলেন। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ[৯০] এই সময় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর এসিস্টান্ট সেক্রেটারী ছিলেন এবং সংস্কৃত গ্রন্থালোচনায় তাঁহার সমধিক আসক্তিও জন্মিয়াছিল। "গোভিল সূত্র" নামক গ্রন্থের কোন পরিশুদ্ধ ভাষ্য না থাকায় প্রতাপ বাবুর অনুরোধে চন্দ্রকান্ত ঐ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়দ্বয়ের ভাষ্য প্রস্তুত ও মুদ্রিত করিয়া নমুনা স্বরূপ পাঠাইয়া দেন।

প্রতাপ বাবু কর্ত্তৃক এই ভাষা গ্রন্থ এসিয়াটিক্ সোসাইটির[৯১] একটি বিশেষ অধিবেশনে উপস্থাপিত হইলে সমবেত সভ্যগণেব সকলেই এক বাক্যে টীকাকারেব গভীব জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ভূয়সী লশংসা করেন ; এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ কয়েকজন প্রধান সভ্য ঐ টীকা সম্পূর্ণ কবিবার জন্য চন্দ্রকান্তকে লিখিয়া পাঠান। তদনুসারে চন্দ্রকান্ত "গোভিল সূত্র ভাষ্য" নামক যে গ্রন্থ বচনা কবেন তাহাই এসিযাটিক সোসাইটির ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া বিদ্যার্থীব জ্ঞানানুশীলনের সহায়তা কবিতেছে। এই গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রকান্তেব যশোগীতি সহস্র কণ্ঠে গীত হইতে আরম্ভ হইল এবং সমুদ্রের পবপারে জর্ম্মনী, ফ্রান্স, আমেবিকা, হল্যণ্ড ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের বুধমণ্ডলীর রসনা হইতে সে সঙ্গীতধ্বনির প্রতিধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে প্রতাপচন্দ্র, কৃষ্ণদাস ও রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি তর্কালঙ্কারকে কলিকাতায় পাইবার জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করায় মহেশচন্দ্র ন্যাযরত্ন চন্দ্রকান্তকে কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ জন্য তৃতীয় বার চিঠি লিখেন। উত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখেন "আমি এ পর্য্যন্ত চাকুরী করি নাই এবং ককরিবার প্রবৃত্তিও বড় নাই। তবে কলিকাতা গেলে গঙ্গাতীরে বাস হইবে, ও আপনাদের মত মহোদয় ব্যক্তিগণের সহিত সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবে, বিশেষতঃ বিবিধ প্রকারের গ্রন্থাদি পাঠেরও সুবিধা হইতে পারে, এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমার কলিকাতা যাওয়ার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে।"

তদনন্তর ১৮৮৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে তর্কালঙ্কার মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা-কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি গভীর জ্ঞান সম্মানের অধিকারী হইলেও কলেজের অধ্যাপনা-কার্য্যে সম্যকরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কি না তদ্বিষয়ে অনেকেই আশঙ্কান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপকের আসনে বসিয়াই চন্দ্রকান্ত সাংখ্য তত্ত্ব ও নৈষধের জটিলতম অংশ সকল অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহাব শিক্ষাদান প্রণালী ও অত্যদ্ভুত শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে সকলকেই স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল।

এই সময় পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয় তর্কালঙ্কারের দর্শনেচ্ছু হইয়া তাহাকে স্বীয় আবাস- ভবনে সসম্মানে আহ্বান করেন। চন্দ্রকান্ত তথায় উপস্থিত হইলে, পণ্ডিতে পণ্ডিতে আলাপ পরিচয়ে উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতি সংস্থাপিত হয়।

১৮৮৭ সনে ভারত সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে চন্দ্রকান্ত "মহামহোপাধ্যায়" এই সম্মানসূচক উপাধি লাভ করেন। চন্দ্রকান্ত প্রতিবৎসরই বিনা প্রার্থনায় রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ ও এম. এ. পরীক্ষার পরীক্ষক মনোনীত হইয়া থাকেন।

.তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সর্ব্বদর্শিনী প্রতিভা "গোভিল সূত্র ভাষ্য" ও "তত্ত্বাবলী" নামক গ্রন্থ প্রণয়নেই পর্য্যবসিত হইয়া যায় নাই। তিনি কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, বৈদিক ব্যাকরণ সূত্র, স্মৃতি, দর্শন ও ন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে এ পর্য্যন্ত ন্যুনধিক ৪০ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রত্যেক গ্রন্থই তাহার স্বাধীন চিন্তা, গভীব পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব্ব গবেষণা শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। উপরি উক্ত গ্রন্থ সকলের মধ্যে "বৈদিক ব্যাকরণ", "কাতন্ত্র ছন্দঃ প্রক্রিয়া" ও "কুসুমাঞ্জলির টীকা" পাশ্চাত্যভূমে সমধিক আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। পণ্ডিতাগ্রগণ্য মোক্ষমূলর, বেণ্ডেল, ডাক্তার রোষ্ট, অধ্যাপক কাউয়েল ও ডাক্তার বেবর প্রমুখ মনীষীগণ চন্দ্রকান্তের অসীম পাণ্ডিত্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া আবেগসংক্ষুব্ধহৃদয়ে যে সকল দীর্ঘায়তন চিঠি প্রেরণ করেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, চন্দ্রলকান্তের জীবন ধারণ সার্থক হইয়াছে এবং চন্দ্রকান্তের জননী বলিয়া আজ বঙ্গভূমি অতি উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী হইয়াছেন। স্থানের অল্পতা হেতু পাঠকবগকে সে চিঠিগুলির চিত্তপ্রফুল্লকর অমৃতরসাস্বাদনে বঞ্চিত করিতে হইল।

১৮৯৩ সনে তর্কালঙ্কার মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সভ্যরূপে গৃহীত হন। ১৮৯৬ সনের ২রা নভেম্বর তিনি কলেজের অধ্যাপনা-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আজ ৫ বৎসর যাবৎ কলিকাতার বিখ্যাত শ্রীগোপাল মল্লিক প্রদত্ত বেদান্ত দর্শনের প্রবন্ধেব জন্য বার্ষিক ৫০০০ টাকা বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত টোলের সাহায্য স্বরূপ গবর্ণমেন্ট হইতে মাসিক ২৫ টাকা প্রদত্ত হইতেছে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় একাদিক্রমে ৫টী দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ বয বযঃক্রমে তাঁহার প্রথম পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রায় চতুর্দ্দশ বয অতীত হইল তাঁহার পঞ্চম পত্নীও পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা বর্ত্তমান।

প্রাকৃতিক নিয়মে জগতের যাবতীয় বস্তুরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ধ্বংশ। কিন্তু মহাপুরুষগণের অমর নাম ধরা পৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় না। কালের অবশ্যম্ভাবী নিয়মাধীনে চন্দ্রকান্তের পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গেলেও যতদিন জগতে সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, যত দিন মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানালোচনাকে পরম পুরুষার্থ মনে করিবে, তত দিন মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের নাম স্মৃতির সুবর্ণমন্দিরে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত থাকিবে।

রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : কবে [কবিতা], শ্রী নিবাসন বন্দ্যোপাধ্যায় : বৈজ্ঞানিকের কুটীর [ধারাবাহিক] রমণীমোহন দাস : পিতৃবৎসলা [গল্প]।

৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩০৯

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী : কৈলাসপতি কপিলান্দন, কুমুদ চন্দ্র সিংহ শার্মণ : ভারতের ব্রাহ্মণ, বিন্দুবাসিনী সরকার : সে দেশ [কবিতা], রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য : ল্যাপচা জাতির

ইতিবৃত্ত, শ্রী ক্ষেত্রে জগন্নাথ, রাম প্রাণ গুপ্ত : দিল্লীর আফগান শাসনের প্রকৃতি [ধারাবাহিক], সুভাষিণী দেবী : সই [কবিতা]।

৩য় বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩০৯

বিনয়কুমারী ধর : সতীর দয়, পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : জাতিভেদ ও অর্থনীতি, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় : ইন্‌স্‌পেকিটং গুরুর আত্মনিবেদন [ব্যাঙ্গরচনা],

দক্ষিণ বঙ্গ

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের কথা বেশ মনে আছে। এই কালের মধ্যে দক্ষিণ বঙ্গের অনেক বিষয়ে বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

নদনদী—জোয়ারের জল এখন বহুদুর উত্তর পয্যন্ত ধাবিত হইতেছে। ইহাতে নদীর জল লোণা সুতরাং বিস্তাদ হইতেছে। কোন কোন নদীর পরিসর বাড়িয়াছে ও গভীরতা কমিয়াছে। কোন কোন নদী মজিয়া যাইতেছে। নিম্ন বঙ্গের অধিকাংশ নদী, গঙ্গা ও পদ্মা হইতে নির্গত হইয়াছে। নিগমস্থান বালুকাপূণ হওযায় একন তৎসমুদায় দিয়া গঙ্গা ও পদ্মার জল প্রবাহিত হয় না। উত্তরের জলেব স্রোত বন্ধ হওয়ায় সমুদ্র জলের স্রোত অর্থাৎ জোয়ার প্রবলবেগে নদীতে প্রবেশ করিয়া বহুদব উত্তর পয্যন্ত ধাবিত হইতেছে। সৈকতময় নদীতীব এখন কর্দ্দমময় হইয়াছে। পূর্ব্বে জোযাব ভাটার এমন প্রাবল্য ছিল না। জোয়ারের সময়ে সমুদ্রবৈপবীত্যে ও ভাটাব সময়ে সমুদ্রের দিকে অর্থাৎ জোয়ার ভাটাব অনুকূলে গমন করাকে গোণে বাওযা বলে। গোণের বিপরীত বেগোণ। বেগোণে যাওয়ার কষ্ট, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক বেশি হইয়াছে। রাত্রিকালে নদীর জল চক্‌চক করিযা থাকে। উহা সামুদ্রিক কীট বিশেষেব দেহনিঃসৃত আলোক।

ভৈরব যে একটী প্রবল নদ ছিল নামদ্বারা তাহা সূচিত হইতেছে। ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব বলিতেন, বৈরব গঙ্গা অপেক্ষা প্রাচীন। ভৈবব হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্রে মিলিযাছিল, কালক্রমে গঙ্গা দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। আমাদেরও বোধ হয় উত্তরবঙ্গের মহানন্দা ও দক্ষিণ বঙ্গের ভৈরব, একই নদীর দুটী অংশ মাত্র। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে এই নদে পদ্মার জল প্রবেশ বন্ধ হইয়া যায়। কপোতাক্ষ অতি সুজল নদ ছিল। বহুদূর দক্ষিণপর্য্যন্ত এই নদীর উভয়তীর শিষ্টজনাধ্যুষিত গ্রামসমূহে সুশোভিত ছিল। কপোতাক্ষ ও ইছামতীর মধ্যমর্ত্তী ভূভাগ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের প্রধান অংশ ছিল। এখন এই সকল নদীর তীরবর্ত্তী স্থানের অত্যন্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কারণে নদীর জল প্রায় অপেয় হইয়াছে। এখন কপোতাক্ষ নদের দক্ষিণ প্রদেশ, ক্রমশঃ লোকবসবাস শূন্য হইতেছে।

জঙ্গল—জঙ্গল বাড়িয়াছে। কয়েক বারের দুর্ভিক্ষে ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলার দক্ষিণাংশ ত্যাগ করিয়া বিস্তর লোক অবস্থানে প্রস্থান করিয়াছে। সুতরাং সে সকল স্থান জঙ্গলে ভরিয়াছে। জঙ্গল বৃদ্ধি হওয়ায় হিংস্রা জন্তুর উপদ্রব্য বাড়িয়াছে। অস্ত্র আইনের

প্রভাবে, লোকে অস্ত্রহীন হওয়ায় উপদ্রব বাড়িয়া চলিতেছে। শৃগালের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। কুকুর শৃগালের বৈরভাব চিরপ্রসদ্ধি। পূর্ব্বে শৃগালের এত উপদ্রব ছিল যে, শয়ান কুকুর সমীপাগত শৃগালকে কর্ত্তৃক জঙ্গলে নীত হইত। অল্পোচ্চ ঘরের চালের উপর উঠিয়া শৃগাল ডাকিতেছে, ইহা দেখিয়াছি। এখন তেমন দেখা যায় না। শৃগাল কমিল কেন? ইহা জিজ্ঞাসার যেরূপ উত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা লিখিতেছি;—

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক বন্য জাতীয় মনুষ্য এই প্রদেশে আগমন করে। তাহারা তাঁবুতে বাস করিত। শৃগালমাংস তাহাদের উপাদেয় খাদ্য ছিল। তাহাদের কেহ কম্বলাবৃত শরীরে জঙ্গলে গিয়া শৃগালের ন্যায় অবিকল চীৎকার করিত। উহার অনতিদুরে অন্য কয়েক ব্যক্তি কয়েকটী শিকারী কুকুর লইয়া নিস্তব্ধভাবে গোপনে বাস করিত স্বজাতির শব্দ মনে করিয়া শৃগাল যেমন নিকটবর্ত্তী হইত, অমনি কম্বকাবৃত ব্যক্তি কত্তৃক ধৃত হইত। তখনই শিকারী কুকুর আসিয়া ধৃত শৃগালকে মারিয়া ফেলিত। এইরূপ বহু শৃগাল মারা গিয়াছিল শৃগালজগত এইজন্য দারুণ ভয়ের সঞ্চার হয়। এই জন্য অনেক শৃগাল এতদঞ্চল ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ভয়দুর হইলে আবার তাহারা ফিরিয়া আসিবে।. কেহ কেহ বলেন আবার ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে, কাকও কমিয়াছে, কাক কেন কমিল, ইহার উত্তর কেহ দিতে পাবেন না। কাকাভোজী, নব্যজাতিও বাঙ্গালার নানা স্থলে দেখিয়াছি।

লোকের অবস্থা--ভদ্রলোকের অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অনেক গৃহস্থ, দুবেলা পেট পড়িয়া আহার করিতে পায় না। "অভাবে স্বভাব নষ্ট"—দারিদ্র্য দশায় পড়িয়া ভদ্রলোকে বিস্তর সদ্‌গুণ হারাইতেছেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ, বৈদ্য, বাঙ্গালী জাতির গৌরব স্বরূপ, বাঙ্গালী বুদ্ধিমান জাতি, এই তিন জাতিকে দেখিয়াই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকের বিশ্বনাস হইয়াছে। এই তিন জাতির সংখ্যা ক্রমশ: কমিয়া যাইতেছে। বারুই, তাঁতি প্রভৃতি নবশাখ শ্রেণীস্থ জাতিব উন্নতি দেখা যাইতেছে। তাঁতিজাতি ক্রমশঃ সামলাহয়া উঠিতেছে। বারুই অতি পরিশ্রমী জাতি। ভগবান্, পরিশ্রমীকে স্বপুরস্কৃত রাখেন না। ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ব্রাহ্মণ আয়স্থের বিষয় সম্পত্তি ক্রমশঃ ইহাদের হাতে আসিয়া পড়িতেছে। এখন যেমন দেখা যাইতেছে, তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে, ভবিষ্যতে নবশাখ শ্রেণীস্থ জাতিগণ, হিন্দুসমাজের শীষস্থান অধিকাব করিবে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতির অবনতি হইবে।

এতদঞ্চলে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতির ব্যয় বাড়িযাছে। লোকের অবস্থা মন্দ হওয়ায় পূজা পাব্বণ কমিয়া যাইতেছে। বনিয়াদি গৃহস্থদের অনেকের চাকরাণ জমি বন্দোবস্ত আছে। কেহ প্রতিমা গড়ে, কেহ চিত্র করে, কেহ পাঁঠা দেয়, কেহ নৈবেদ্য বয়। অর্থের পরিবর্ত্তে তাহাদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত আছে। যাহাদের এরূপ বন্দোবস্ত আছে তাহাদের পূজা বাদ যায় না। নূতন করিয়া আর কেহ প্রায় পূজা করে না। ভোজের ব্যয় বাড়িয়াছে। চিড়া দধির ফলার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। লুচির পাতে পূর্ব্বে ছোলা বুট মুগাঙ্কুর দেওয়া হইত, এখন তাহা দেওয়া হয় না। নানারূপ মিষ্টান্ন দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আত্মীয় স্বজন বাটীতে আসিলে নারিকেল কোরা ও চিনিবাতাসা তাহাকে জল খাইতে দেওয়া হইত, এখন তাহা দিতে লোকে লজ্জা বোধ করিতেছে! হিন্দুর দেখাদেখি মুসলমানেরা ভোজের সময় নানা দ্রব্য

সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটু ত্রুটি হইলে হিন্দুরা যেমন ভোজদাতার নিন্দা করে, মুসলমানেরা সেরূপ করে না। মুসলমানদের ভোজে মাংস প্রায় বাদ যায় না। প্রতি পাঁচ সাত বা দশ বার জনকে এক এক মালসা মাংস দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে যে প্রধান তাহার নিকট মালসা দেওয়া হ, অপরে সেই মাংস উঠাইয়া লয়। এই মালসার অধিকার লইয়া কখন কখন ইহাদের মধ্যে মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মবিশ্বাস—ধর্ম্ম লইয়া কেহ আর মাথা ঘামায় না। দেবালয়ে পূর্ব্বের ন্যায় সেবার বন্দোবস্ত নাই। স্থানান্তরে গমনকালে প্রাচীন লোক ভিন্ন প্রায় কেহ দেবালয়ে প্রণাম করিয়াযায় না। পূর্ব্ব পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর সেবায় লোক বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে এবং উহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছে। ঠাকুর ঘরের জীর্ণক সংস্কার হইতে বিস্তর বিলম্ব হইতেছে। পূবের্ব ন্যায় ব্রাহ্মণদের বাটীতে সর্ব্বত্র শালগ্রামশিলা নাই। পূর্ব্বে ঠাকুর পূজা না হইলে গৃহস্থ বাটীর বয়স্থ স্ত্রীপুরুষে জলগ্রহণ করিত না, এখন কেহ ক্বচিৎ সে নিয়ম পালন করে। ঠাকুর দুই একদিন উপবাসীও থাকেন। সন্ধ্যা আহ্নিক প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত লোকদের আনা কেবল পৌত্তলিকতা বিরোধী নয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও নিতান্ত উদাসীন। পুরোহিত হাসিয়া হাসিয়া মন্ত্র পড়ান, যজমানও হাসিতে হাসিতে মন্ত্র পড়েন, এমন ঘটনা আমবা চোখ দেখিয়াছি। পুরোহিত কখন কখন মন্ত্র সংক্ষেপ করেন, যজমান তাহাতে তুষ্ট বৈ রুষ্ট হন না।

যে জাতির মধ্যে ধর্ম্মভাবের এমন দুরবস্থা সে জাতির পতন অনিবার্য্য। ইতর লোকে ভদ্রলোকের আচার ব্যবহারের হাস্যজনক অনুকরণ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে হরিসংকীত্তনের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া নানারূপ কৌতুককর মতের সৃষ্টি করিতেছে। "বন্দে গুরুণীশভীন্" চৈতন্য চরিতামৃতের এই শ্লোকের কতরূপই ব্যাখ্যা শুনিলাম। কোন ব্যক্তি ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছিল, "বন্দে গুরু তুই নীশ্"। ধড়বিচারী অর্থাৎ দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে নানারূপ কূট হিয়ালী ইহাদের অতি প্রিয় বস্তু। একবার চণ্ডালজাতীয় একটী লোক কোন শ্রাদ্ধ সভায় সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলীকে প্রশ্ন করিয়াছিল, "পিশাচ কারা?" পণ্ডিতগণ শাস্ত্রানুসারে ইহার যে উত্তর দেন, তাহা তাহার মনঃপুত হয় নাই। সে স্থানে উপস্থিত একজন মুসলমান উত্তর দেয় যে, "পিশাচ তিন জন, মা, মাটী ওনদী। নদী সমস্ত অপবিত্র পদার্থ বহন করে, মাতা ঘৃণাশূন্য হইয়া সন্তানের মল মূত্র পরিষ্কার করেন, মাটী সমস্ত অপবিত্র পদার্থ ধারণ করে, অতএব এই তিন জন পিশাচ'। এই উত্তর চণ্ডালের' দেলে লাগিয়াছিল" অর্থাৎ মনোমত হইয়াছিল। একবার একজন পাটনী আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কয় "থোতে" কায়স্থ হয়। আমি ইহার উত্তর দিতে পারি নাই। সে বলিল, তিন থোতে কায়স্থ হয়। খাজানা আদায় করিতে যাইয়া বলে, খাজানা থো, সঙ্গের পাইককে বলে, এই টাকা থলিয়াতে থো, কাছারীতে আসিয়া বলে, ইহা সিন্দুকে থো, এই তিন থোতে কায়স্থ হয়।

পূর্ব্বে লোকে যত ব্রতোপবাস করিত এখন তত করে না। লোকের ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করার ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে। মুসলমানদের ধর্ম্মবিশ্বাস প্রায় অটুট রহিয়াছে। জোর করিলে

এতদঞ্চলের দুর্ব্বল বিশ্বাসী হিন্দুদের অনেককে ধর্ম্মান্তরে আনা যায়। ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানও অন্তরের সহিত রোজা নামাজে যোগ দোন না। ইংরেজী শিক্ষার দুষিতাংশ হিন্দুদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দু জাতির অন্য বল অনেকদিন হইল চলিয়া গিয়াছে। এক মাত্র ধর্ম্মবলে তাঁহারা বলীয়ান্ ছিলেন, সে বলও যখন যাইতে বসিয়াছে তখন হিন্দু কিরূপে বর্ত্তমান সময়ে আত্মরক্ষা করিবেন? যে কোন ধর্ম্ম গভীর বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ অসাধারণ মানসিক বলে বলীয়ান্ হয়। নাস্তিক কি দেশের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে পারে? শিখ হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিয়াছে, খৃষ্টান সিংহ ব্যাঘ্র ও অনলমুখে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছে। ইতিহাসে লিখিত না হউক, হিন্দুও ধর্ম্মের জন্য প্রাণত্যাগে কুণ্ঠিত হয় নাই। মুসলমানদের চেষ্টার বিরাম ছিল না, কিন্তু ভারতবর্ষ মুসলমানদের দেশ হইয়া যায় নাই। দুঃখের বিষয় এই যে হিন্দুর আর সে গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস নাই। আমি বাঙ্গালার হিন্দুদের কথাই বলিতেছি।

আমরা কোমলতার দিকে অগ্রসর হইতেছি এবং দৃঢ়তা হারাইতেছি। আমরা পুত্রের নাম সজনীকান্ত, রমনীরঞ্জন, কামিনীকুমার, ননীগোপাল ও মাখনলাল বাখিয়া থাকি। এই সকল সজনী, রমনী, কামিনী ননী, মাখন রবির অল্প উত্তাপে গলিয়াযায়। ইহাতে একখানা মোটা লাঠি বহন করার ক্ষমতাও নাই। মুসলমানদের এতদুর অধঃপতন হয় নাই, কিন্তু দক্ষিণ বাঙ্গালার মুসলমানদের নৈতিক দুর্ব্বলতা অধিক। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালায় যত রমণী হবণ হয় তাহার প্রধান নায়ক প্রায় মুসলমান। ঈশ্বর না করুন, আজি যদি কোন রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ বাঙ্গালার হিন্দু দিগের জাতি, ধর্ম্ম ও কুলকামিনী রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। রাজা রক্ষা না কলি, একজন সশস্ত্র সৈনিক পুরুষ এই অঞ্চলের হাত-কাটাপিরাণ ও টেরিকাটা-মাথাওয়ালা সহস্রাধিক অপদার্থকে তরবারি মুখে অর্পণ করিতে পারে। কথাগুলির মধ্যে একটুকুও অতিরঞ্জন নাই। গুণে না হউক, জাতিতে বড় হওয়ার চেষ্টা সকলেরই দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব স্বীকারে শৈথিল্য দৃষ্ট হইতেছে। বৈদ্য, ব্রাহ্মণ সদৃশ হওয়ার চেষ্টা কবিতেছেন, কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইতে চাহেন, বারুই পণব্রাহ্মণের প্রভুত্ব স্বীকারে শৈথিল্য দৃষ্ট হইতেছে। বৈদ্য, ব্রাহ্মণ সদৃশ হওয়ার চেষ্টা করিতেছেন, কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইতে চাহেন, বারুই পর্ণবৈশ্য হইতেছেন। যাহাদের পৈতা ছিল, তাহারা ফেলাইতে চাহে, যাহাদের পৈতা ছিল না, তাহারা পৈতা লইতে ব্যস্ত। চণ্ডাল ভাবিয়া বাসয়াছে, তাহারা নমশূদ্রনামক জাতি। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও মুনিগণ তাহাদের জাতি হইতেই উৎপন্ন। আমরা দেবতাভ্যোনমঃ ব্রাহ্মণেভ্যোনমঃ ঋষিভ্যোনমঃ বলিয়া থাকি। চণ্ডালেরা বলে, দেবতা ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ যে নমঃ নামক জাতি উহাতে তোমরা স্বীকারই করিলে। ইহারা আপনাদের স্ত্রীলোকদিগকে ক্রমশঃ অন্তঃপুর বদ্ধ করিতেছে। এখন উহাতে পূর্ব্বের ন্যায় বৈদ্য কায়স্থাদি জাতির অন্ন গ্রহণ করে না। এই শ্রমশীল জাতি, আপনাদের মৌলিকত্ব হারাইতেছে। হিন্দু সমাজে চণ্ডাল জাতির কার্য্যকারিতা অসামান্য। ইহারা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগকে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। এক চণ্ডাল ভিন্ন, দক্ষিণ বঙ্গের কোন জাতি মুসলমানদের প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ নহে। বাঙ্গালার ভদ্রলোক আত্মরক্ষণে অসমর্থ। ইহারা পূর্ব্বে চণ্ডাল, মুচি ও মুসলমানদিগকে যেরূপ ঘৃণা করিত, এখন সেরূপ করে না, বরং ইহাদিগকে হাতে রাখিতে চেষ্টা করে। কাহারও কতকগুলি চণ্ডাল, কাহারও কতকগুলি মুচি, কাহারও কতকগুলি মুসলমান বশীভূত থাকে। ইহাদের দ্বারা সুকার্য্য ও দুস্কার্য। সংসাধিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ কায়স্থের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। মুসলমান বাড়িয়াছে। নিকা প্রথা প্রচলিত থাকায় ইহাদের মধ্যে সুস্থকায় সন্তান জন্মিতেছে। ধোপা নাপিত, কাহারও পাটনার সংখ্যা কমিয়াছে। ইতর হিন্দুদিগের মধ্যে পূর্ব্বে নিকার চলন ছিল, এখন তাহা উঠিয়া যাইতেছে। এ দেশ যে, দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে হিন্দুশূন্য হইবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

বিবাহ করিতে না পারায় অনেক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বংশ লোপ পাইতেছে। কন্যাপণ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু বরপণ বাড়িয়াছে। কুলীনের আদর কমিয়া গিয়াছে। মধ্যে পাশ্‌করা ছেলের আদর বড়ই বাড়িয়াছিল, এখন লোকে দেখিতেছে, পাশ্‌করা ছেলের অনেকে ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেতনে বিদেশে পড়িয়া থাকে। পরিবার ঘারে করিয়া বেদের জাতির ন্যায় নানা স্থানে বেড়ায়। এখন লোকে বরও দেখে, বরের ঘরে খাওয়ার সংস্থান আছে কিনা তাহাও দেখে।

ইংরাজী শিক্ষা প্রথমে যেমন চমক লাগাইয়াছিল, এখন সেরূপ পারিতেছে না, তথাপি ইংরাজী শিক্ষার প্রসার বাড়িয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা যে আবশ্যক তাহা সকলেই বুঝিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষিতদিগকে একটা উৎকৃষ্ট জীব বলিয়া আর কেহ বিশ্বাস করে না। এমনটী হইয়াছিল, অমুক দোকানদার ভাল লোক এ কথার পর অমনি প্রশ্ন হইল, সে ইংরাজী জানে কিনা? ইংরাজী জানিলে যেন তাহার দোকানের জিনিস মিঠা হইবে। এখন সে ভাবটী নাই। চাকরীর প্রতি শ্রদ্ধা কমিতেছে। যাহাদের কিছু জমি জমা আছে, তাহারা যে পরিশ্রমী হয় তবে চাকরিয়াদের অপেক্ষা সুখে কাল কাটাইয়া থাকে।

ব্যভিচার বাড়িয়াছে। লেখক ব্রহ্মচারিণী বিধবাকে অন্তরের সহ গভীর শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু বালবিধবাগণের পুনর্বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী। বিধবা-বিবাহের, সুসংযত প্রচলন না হইলে হিন্দুসমাজ ছারে খারে যাইবে। পূর্ব্বের ন্যায় বধূর প্রতি শাশুড়ীর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা নাই। পূর্ব্বে শাশুড়ী ননদ, বধুর প্রতি অকারণ কর্কশ ব্যবহার করিতেন। এখন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার বেগ যেন কিছু প্রখর হইয়াছে। পূর্ব্বের ভ্রাতার সংসারে অনাথাবিধবা ভগিনীর পরম যত্ন ছিল, এখন ভ্রাতৃবধূর তাড়নায় তাহাদের কষ্টের সীমা নাই। এজন্যও বলি, বিধবা বিবাহ স্থল বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে সমাজের কল্যাণকর।

পূর্ব্বের ন্যায় বধূগণের পাকের প্রতি অনুরাগ নাই। ক্রিয়াকর্ম্মের রন্ধন ও পরিবেশনের লোক পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বাড়ী আহার করিয়া ব্রাহ্মণেতর জাতি উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করিত, এখনতাহা করিতে চায় না। একান্নবর্ত্তী পরিবার কলহের বসতি হইয়া উঠিয়াছে। স্বার্থপরতার বৃদ্ধি হওয়ায় ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইতেছে। বিষয় বিভক্ত হওয়ায়, কাহারও স্বচ্ছন্দতার সহ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হয় না, সকলেই দরিদ্র হইয়া পরিতেছে। পূর্ব্বকালে বোধ হয় একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিল না। বিবাহ করিয়া অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক প্রত্যেক গৃহস্থকে পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত। এমন অবস্থায় যৌথ পরিবারের সৃষ্টি হইতে পারে না। মামলা মোকদ্দমায় অনুরাগ বাড়িয়াছে। উকীলের বাক্‌সে টাকা জমিতেছে।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দার্শনিক মতের সমন্বয়. করুণা নাথ ভট্টাচার্য্য : পূর্ণানন্দ পরমহংস

মাসিক সাহিত্য

অতিথি—ঢাকা, ৭৭নং দিগবাজার হইতে শ্রীপ্রমথনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ; বালক পাঠকদের উপযুক্ত সচিত্র মাসিক পত্র। আমরা ক্রমান্বয়ে ইহার ৪র্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। বাঙ্গালার শিশুরঞ্জন মাসিক পত্রের একান্ত অভাব। কোমলমতি বালক বালিকাগণের সরল প্রাণে পাঠের প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসা জন্মাইবার জন্যই এইরূপ মাসিক পত্র পত্রিকার প্রয়োজন। মুখে মুখে আবৃত্তি করিবাব উপযোগী সরস মধুর কবিতা, আমোদজনক ও উপদেশপ্রদ গল্প, আদর্শ ও শিক্ষণীয় চরিতাবলী বালক বালিকাদিগকে অসৎ কার্য্য ও কুচিন্তা হইতে বহু পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, এবং উত্তর পাঠের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলে। সুতরাং এই শ্রেণীর মাসিক পত্র পত্রিকার দ্বারা যে সমাজের বহু কল্যাণ সাধিত হয় তাহা বলা বাহুল্য। অতিথি সেইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া পরিচালিত হইতেছে। শ্রাবণ সংখ্যা পর্য্যন্ত যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ প্রবন্ধই শিক্ষণীয় বিষয়ের সমাবেশে উজ্জ্বল হইয়াছে। "অদ্ভুত ডাকাত" একটী সুন্দর গল্প, "কুম্ভীর" "বেঙ্গ" "আমার বিড়ালী" প্রভৃতি ও সুলিখিত এবং জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। "আমার বিড়ালী" উপদেশপূর্ণ তত্ত্বের সমাবেশে উপসংহার ভাগ একটু কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "পৃথিবীর কথা" সহজ ও সুখপাঠ্য এখন কোমল মস্তিষ্ক "ইচরে না পাকিলে" ভাল। আমরা সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।[৯২]

প্রবাসী—শ্রাবণ। 'সূর্য্যসম্ভব' সূর্য্যের উৎপত্তি ও লয় বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনা 'ধর্ম্মের রূপ ও স্বরূপ' একটী উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ প্রবন্ধ। নবমীতে বিসর্জ্জন একটী অসার গল্প। এরূপ গল্প লিখিয়া প্রবাসীর সুদীর্ঘ ১৪ কলম পূরণ না করিলেও বোধহয় ক্ষতি হইত না। গল্পাংশ এইরূপ—বিজয়ী গ্রামের রায় ও চৌধুরী পরিবার বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। রায় পরিবারের পুত্রটী বিশেষ যোগ্য সুতরাং নামটীও বেশ মোলায়েম রমেশচন্দ্র!। চৌধুরী পুত্র মূর্খ নামটিও সুতরাং গদাধরচন্দ্র! গদা তৃতীয় গৃহের কুমারী কন্যা মানসীকে পাইবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু পাইবার উপায় নাই! অগত্যা গদাধর একদিন (মহানবমীর দিনে) পুকুরে ডুব দিয়া রহিল! আর যেই মানসী স্নান করিতে আসিয়া জলে পা দোলাইয়া সোপানোপরি উপবেশ কবিল অমনি কুমীর রূপে জলে টানিয়া লইয়া গেল। বালিকা চিৎকার করিতে লাগিল। পশ্চাৎ হইতে রমেশচন্দ্র আসিয়া বালিকাকে উদ্ধার করিলেন কিন্তু নিজে বিপন্ন হইলেন। মানসী দৌড়াইয়া গিয়া রমেশের পিতাকে খবর দিল। রায় মহাশয় লোকজন লইয়া আসিয়া পুত্রকে জল হইতে তুলিয়া ঝাড়া ফোঁকা করিয়া সুস্থ করিলেন। রমেশ সুস্থ হইয়া বলিল "আর একজন জলে ডুবিয়াছে তাহাকে তোলা হইয়াছে কি? আমার বোধ হয় সে গদাধর।" তখন গদাধরের মৃত দেহও তোলা হইল। ঘটনাস্থলে রমেশ ও মানসী দুইটী বক্তৃতা দ্বারা ঘটনাটা লোককে বুঝাইয়া দিলেন। গদাব মৃত্যুতে চৌধুরী মহাশয় গৃহে গিয়া নবমীতেই প্রতিমা বিসর্জ্জন করিলেন। গদা মরিল প্রতিমা বিসর্জ্জন হইল, গল্প কিন্তু ফুরাইল না। ফুরাইবেই বা কেমন করিয়া ; গল্পের যে গল্পত্বই রহিয়া গিয়াছে।[৯৩]

৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩০৯

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী : শারদীয় পূজা, বিজয়চন্দ্র মজুমদার : সখী-সমীপে, সরোজনাথ ঘোষ : দিদি [গল্প], অনুকূলচন্দ্র গুপ্ত : বসন্ত সেনা [ঐতিহাসিক কাহিনী], রমণীমোহন ঘোষ : মালঞ্চ [কবিতা]. গ্রন্থ-আলোচনা, শ্রীম : স্বামী বিবেকানন্দ ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩০৯

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : কুহেলিকা, গর্ব্বিত প্রেমিকা [কবিতা], যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় : অগ্নিমন্থন, কোথায় [কবিতা],

ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি

৺রাজা রাজসিংহ

আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺রাজা রাজসিংহ বাহাদুর এক জন পরম ধাম্মিক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন। সুসঙ্গ রাজ্যে যে সকল ব্রহ্মত্র প্রভৃতি বিদ্যমান আছে তাহার অধিকাংশই তাঁহা কর্ত্তৃক প্রদত্ত। তাঁহার দানশীলতায় উপকৃত হয় নাই, সুসঙ্গ বাজ্যে এমন প্রায় কেহই নাই ; কেবল তাহাই নহে তিনি একজন সুকবিও ছিলেন, তাঁহার রচিত একখানা হস্ত-লিখিত কাব্য ও দুই তিন খানা খণ্ড কাব্য অদ্যাপি আমাদের পুস্তাকালয়ে বর্ত্তমান আছে। সুখের বিষয় এই যে, বিগত ১৩০৪ বঙ্গাব্দেব প্রলয়ঙ্কর ভীষণ ভূকম্পনে আমাদেব অনেক বহুমূল্য ধনপ্রাণ নষ্ট হইলেও কবির, বহু-আযাস-রচিত কাব্যগুলি বিলুপ্ত হয় নাই ; কিন্তু সে গুলি লিপিকব-প্রমাদে এত দূষিত যে একপ্রকার অপাঠ্য বলিলেও হয়। কবির রচিত "রাজ-মালা" ও "মনসা-পাচালী" নামক খণ্ড-কাব্যদ্বয়, আমাব পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুবের যত্নে মুদ্রিত হইয়া, জন সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অধুনা আমি "ভারতীমঙ্গল" কাব্যখানা প্রচারিত করিতে ইচ্ছা করিযা, বহুচেষ্টাতে পাঠোদ্ধার করিয়াছি। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি-বক্ষা-দ্বারা পুণ্যলাভ এবং কর্ত্তব্যপালন এই উভয় কার্য্যই সম্পন্ন হয়, এতদভিপ্রায়েই গ্রন্থ-প্রচারের ইচ্ছা, যশ অথবা ধন-লাভের আশায় নহে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল "ভারতী মঙ্গল" সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। "ভারতী মঙ্গল" কালিদাসের সরস্বতী কুণ্ডে স্নানান্তে ভারতীদেবীর বরলাভবিষয়ক প্রচলিত-প্রস্তাব অবলম্বনে বচিত। যদিও এই কাব্যে কবির চরিত্রাঙ্কনী-প্রতিভা ততদূর পরিস্ফুট হয় নাই, তথাপি বচনা-মাধুর্য্যে, রস-বৈচিত্রে এবং ভাষার পারিপাট্যে ইহা বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে কেবল নগণ্য স্থান অধিকার করিবে, এমন বোধ হয় না। কবির ভাষা যে প্রকার সংস্কৃত আভিধানিক শব্দে পরিপূর্ণ, তাহাতে অনুমান হয় তিনি একজন সংস্কৃত-ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় এই যে,—মিথিলা-নগরীতে শক্রজিত নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা হয়। পুত্রদ্বয় ও রাজকন্যা যথাশাস্ত্র সুশিক্ষালাভ করিলেন, অত:পর কন্যাটী বাল্যবসানে যৌবনে পদার্পণ করিলেন ; কবির ভাষায় বলিতে গেলে,—

"বাল্যবস্থা হৈল শেষ, যৌবনেতে পরবেশ,
ভূপাত্মজা বাড়ে দিনে দিনে।
দেখি তার মুখছন্দ, চকোরদ্বিরেকে দ্বন্দ্ব,
সোম, পদ্মা-ভ্রম ভাবি মনে॥"

তখন কন্যাকে রাজা—"সমর্পিব তারে যেবা জিতিবে বিচারে" এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। কন্যালাভার্থী বহুপণ্ডিত বিচারে পরাভূত হইয়া লজ্জিত হইলে, তাঁহারা কালিদাস নামক এক মূর্খ ব্রাহ্মণকে পণ্ডিত কল্পনা করিয়া সকলে তাঁহার শিষ্যরূপে কন্যার সহিত বিচারে উপস্থিত হইলেন, তখন কালিদাস,—

"মধ্যে অধ্যাপক আছে পরম-কৌতুকে।
মস্তক ঢুলায় মাত্র বাক্য নাই মুখে॥"
এই ভাবে বহিলেন,—বিচারের ফল হইল যে,—
"না পায় পণ্ডিতে যাকে বিস্তর পড়িয়া।
কালিদাস লভে তাকে মস্তক ঢুলায়া॥"

কন্যা-লাভান্তে কালিদাস স্বকীয় জ্ঞানগরিমা প্রকাশিত হওয়ার আশঙ্কার, মৌনাবলম্বনই কর্ত্তব্য মনে করিলেন,—কিন্তু দৈবাৎ অসাবধানতাবশতঃ একদিন তাঁহার মুখে অত্যন্ত প্রাকৃত-ভাষা ব্যক্ত হইয়া পড়িল ; ইহাতে রাজকুমারী তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিলেন। অত্রাস্থায় কালিদাস নিতান্ত মনঃ ক্ষুণ্ণ হইয়া, নৈমিযারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর শনকমুনি তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, সরস্বতী-সরিতে অবগাহন করিতে উপদেশ দিয়া, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পূরণের বিবরণ শ্রবণ করাইলেন ; এতদুপলক্ষে কবি, উক্ত পুরাণের কাহিনী সংক্ষেপে এবং সুকৌশলে ভারতীমঙ্গল কাব্যে সন্নিবেশিত করিযাছেন। অতঃপর কালিদাসের অনুরোধে শনক-মুনি, সবস্বতীদেবীর উৎপত্তি, দেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার অর্চ্চনা ও মুনিগণ কর্ত্তৃক জগতে দেবীর পূজা প্রচারেব বিষয় আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। তদনন্তর শনকমুনি, কালিদাসকে কিছুকাল সংযমী অবস্থায় রাখিয়া, সরস্বতীমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। অভীষ্টমন্ত্র লাভ করিয়া কালিদাস,—

"শরৎ-শশাঙ্ক-সম নির্ম্মল-শরীর।
চপলতা খণ্ডি দ্বিজ হইল সুস্থির॥"

অতঃপর কালিদাস মুনির উপদেশানুযায়ী,—

"জপে দিবা রাতি, ভাবিয়া ভারতী,
মনে নাহি কিছু আর।
শিশির-সময় যথা বারিচয়,
তাহে তনু মজাইয়া।
সকল যামিনী, দ্বিজ জপে বাণী
অত্যন্ত আরদ্র হ'য়া॥"

কঠোর তপস্যান্তে ভারতীদেবী, কালিদাসের সমক্ষে প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূতা হইয়া, বর প্রদান করিলেন ; তখন কালিদাসের :

"সর্ব্বশাস্ত্র অধিষ্ঠান কণ্ঠে কৈল আসি।
রাহু গ্রাস হৈতে যেন মুক্ত হৈলা শশী॥
কৃষাণু মূর্চ্ছিত যেন থাকে ভস্ম মেলে
ইন্ধন-সংযোগ হৈলে প্রজ্জ্বলিতে জ্বলে॥"

কিন্তু ভ্রান্তি বিমূঢ়-চিত্তে কালিদাস সব্বাদৌ বাগ্‌বাণীর রূপ-বর্ণনা আরম্ভ করিলে. দেবী কুপিতা হইয়া তাঁহাকে অভিশপ্ত করিলেন। ইহাতে তিনি প্রখ্যাতনামা রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ হইয়া, অখণ্ডনীয় শাপ-প্রভাবে বারবণিতা-গৃহে নির্ব্বাণ লাভ কবিলেন। জগদ্বিখ্যাত কবিকুল-চূড়ামণি মহাকবি কালিদাসের এই শোচনীয় পরিণাম পরিতাপের বিষয় বটে। এই প্রবাদ বাক্য কতদূর সত্য, আমি তাহা বলিতে পারি না।

কবির জন্মকাল ও গ্রন্থরচনার সময় নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়া, এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। দুর্ভাগ্যের বিষয়, "ভারতীমঙ্গল কাব্যে" রচনার সময় নির্দিষ্ট হয় নাই ; গ্রন্থপাঠে বোধহয়. কবির অগ্রজ রাজা কিশোর সিংহের জীবিতকালেই ইহা রচিত হইয়াছিল ; প্রায় প্রত্যেক কবিতার শেষভাগে কবি অগ্রজের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের সৌভ্রাত্র আদশস্থানীয় ছিল। রাজা কিশোর সিংহ ৩৬ বৎসরমাত্র বয়সে ১১৯২ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন, অতএব তাহার জন্মকাল ১১৫৭-৫৮ বঙ্গাব্দ হইতেছে ; রাজা রাজসিংহ প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে ১২২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে স্বর্গারোহণ করেন ; ইহাতে অনুমিত হয় যে, কবি ৩০।৩২ বৎসর বয়সে "ভারতী মঙ্গল" রচনা করিয়াছিলেন ; অতএব গ্রন্থখানা প্রায় ১২০/১২২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, একথা নিশ্চিত।

আমাদেব বংশে দত্তকপুত্রগ্রহণের পদ্ধতি বত্তমান নাই। রাজা কিশোর সিংহ অপুত্রক ছিলেন, তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার অনুজ রাজা রাজসিংহের সুসঙ্গ রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া যান ; ইহার সহিতই ব্রিটীস্ গবর্ণমেন্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত করেন। আমাদের বংশে ইতিপূর্ব্বে জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যাধিকারী হইতেন ; অধুনা বহুকারণাধীনে সম্পত্তি, দায়ভাগানুসারে বিভাজ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, অতএব জ্যেষ্ঠাধিকারিত্বের নিয়ম রহিত হইয়া গিয়াছে। প্রসঙ্গাধীনে আমি মূল বিষয় হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন প্রকৃতানুসরণ করা যাউক।

কবির জন্মকাল যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক লোক বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে ; কিন্তু তিনি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। যাহা হউক, এত প্রাচীনকালেও কবি যে এত মার্জ্জিত বঙ্গভাষা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা আশা করি, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যামোদী সুধীগণ "ভারতীমঙ্গল" পাঠে অপরিসীম আনন্দানুভব করিবেন এবং কবির শ্রমও সফল হইবে এবং তাঁহার বংশধর বলিয়া আমরাও কথঞ্চিৎ গৌরবান্বিত হইব।

অতঃপর রাজা রাজসিংহ হইতে আমাদের বংশাবলী নিম্নে প্রদান করিয়া, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

বংশপ্রবর্ত্তক ˚সোমেশ্বর পাঠক (ইনি কান্যকুব্জ হইতে পরিব্রাজকবেশে বঙ্গদেশে আসিয়া সুসঙ্গে রাজ্য স্থাপিত করেন, ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ সুসঙ্গের ইতিহাসে বিবৃত করার ইচ্ছা আছে।

রাজা রাজসিংহ (সোমেশ্বর পাঠক হইতে দ্বাদশ পুরুষ)

আঃ সঃ।
সুসঙ্গ দুর্গাপুর
রাজবাটী।

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ।[৮৪]
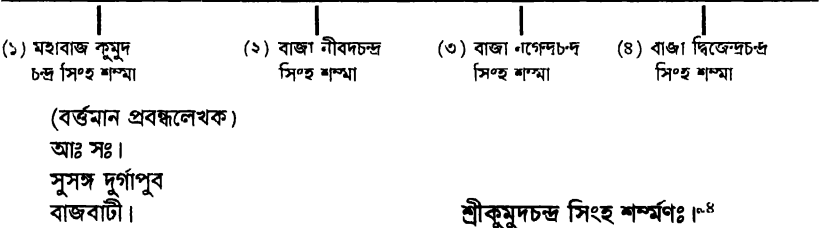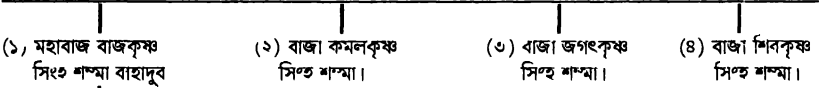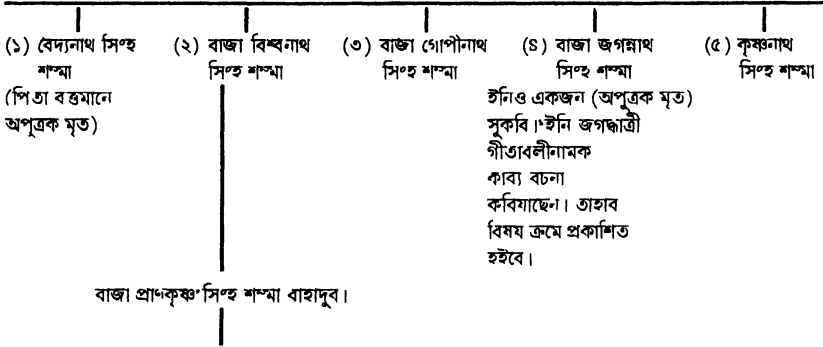
করুণানাথ ভট্টাচার্য্য : নদীর গতি–পরিবর্ত্তন. রাজেন্দ্র লাল আচার্য্য : সরযু [গল্প]।

৩য় বর্ষ ৭ম–৮ম সংখ্যা, পৌষ–মাঘ ১৩০৯

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী : ফটিকজল,

তুলনা

তুমি সুখদ যেমন, স্বপন মোহন
স্মৃতির মৃদুল ছায়া।
তুমি মধুর যেমন, হৃদয় মগন,

সলাজ সরস মায়া !
তুমি বাঞ্ছিত যেমন, লাঞ্ছিত জীবনে
সোহাগ শীতল ভাষা।
তুমি স্নিগধ যেমন, নিরাশা নিলীন,
হৃদের গোপন আশা !
তুমি অমল যেমন সজল নয়নে
চাহনি করুণা আঁকা।
তুমি কোমল যেমন ক্লান্তি অবসানে
'তৃপ্তি আবেশ মাথা।
তুমি অতুল যেমন মায়ের হৃদের,
স্নেহের রজত ধারা
তুমি কি জানি কেমন সুখের মতন
অলস লালস ভরা !
তুমি হৃদি নভে যেন ফুটিয়া উঠেছ
জ্যোছনা বিমল শোভা !
তুমি ভাষাব আড়ালে, হৃদয়ের কোলে,
উজল মধুর 'কবা !

শ্রীসুবেশচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।[৯৫]

মোহাম্মদ

পয়গম্বর নোয়া সুবিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। তদীয় অন্যতম পুত্র শ্যাম (নোয়ার তিন পুত্র ছিল) তাঁহার পরলোক গমনের পর সেই সুবিশাল সাম্রাজ্যের একাংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। শ্যামের অধস্তন পঞ্চম পুরুষের নাম যারব যা আরব। আরব পিতার কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন, এ কারণে পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এক স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শাসনাধীন দেশ তাঁহার নামানুসারে আরব নামে প্রসিদ্ধ হয়। আরব দেশ অনুর্ব্বর ও বালুকাময় মরুস্থলীতে পরিপূর্ণ। পুরাকালে এই ভীষণাদৃশ্য দেশের অধিবাসিগণ একান্ত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও পরজাতিদ্বেষী ছিল। এ জন্য পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের সঙ্গে আরবদেশের ঘনিষ্ঠ যোগ সংসাধিত হইয়াছিল না। ইহার ফলে আরব দেশ সুপ্রাচীন হইয়াও সভ্যতা আলোক লাভ করিতে পারিয়াছিল না ; বহুকাল পয্যন্ত অজ্ঞান তিমিরা সমাচ্ছন্ন ছিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও আরবজাতি সভ্যতার অতি নিম্ন স্তরে অবস্থিত ছিল। এই সময় আরবজাতি বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এই সকল সম্প্রদায় স্ব স্ব প্রধান ছিল ; একে অন্যের আধিপত্য স্বীকার করিত না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র অধিপতি ছিল। তাঁহার বংশানুক্রমে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু উৎপীড়ক অধিপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিবার অধিকারও সামর্থ প্রকৃতিপুঞ্জের ছিল। ফলতঃ প্রজারঞ্জনই

অধিপতিগণের প্রভুত্বের মূল ভিত্তি ছিল। শাসন কার্য্যেও তাঁহাদিগকে প্রজার পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত। কোন বিজাতীয় শত্রু আরবদেশের দ্বারদেশে উপনীত হইলে অধিপতিগণ সম্মিলিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন। কিন্তু দেশমধ্যে এক দণ্ডের জন্য আত্মকলহের বিরাম ছিল না। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিত। আরব দেশীয় লোকের বীরত্বের অভাব ছিল না। ব্যাঘ্রের বলের সঙ্গে তাহাদের বীরত্বের তুলনা করা যাইতে পারে। বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে কলহসৃজন, নররক্তে পৃথিবীরঞ্জন এবং দুব্বলের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনই তাহাদের বীরত্বের স্বার্থকতা ছিল। এই সময় আরবদেশ অজ্ঞানতিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল। দাম্পত্য-বন্ধন একান্ত শিথিল এবং নৈতিকজীবন ঘোর দুদ্দশাগ্রস্ত ছিল। নরনারী সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া কাবা মন্দিরের[১] চুতর্দ্দিকে উলঙ্গভাবে নৃত্য করিত। পুরুষসমাজের পশুবৎ আচরণে নারীজাতির দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। বহুবিবাহ, দাসী-সংসর্গ এবং যথেচ্ছা স্ত্রী পরিত্যাগের কোন বাধাই ছিল না। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সকলেই দাস-দাসীগণের সঙ্গে নিষ্ঠুরাচরণের একশেষ করিত। তৎকালের আরবসমাজের ধম্ম-জীবন নৈতিকজীবন অপেক্ষাও অধিক শোচনীয় ছিল। কাষ্ঠ এবং লোষ্ট্রও দেবতা বলিয়া পূজিত হইত। এক কোরেশ সম্প্রদায়েরই দেবতার সংখ্যা পনর শতের ন্যূন ছিল না। এ ধম্ম কুসংস্কারবিদ্ধ ও আত্মার অবনতিকর হইলেও আরবগণের ধর্ম্মবিশ্বাস সুগভীর ছিল। তাহাদের প্রকৃতি সাতিশয় তেজস্বিনী ছিল। তেজস্বিনী প্রকৃতির সঙ্গে সুগভীর ধর্ম্মবিশ্বাস সম্মিলিত ছিল বলিয়া আরবগণ ধর্ম্মের নামে অনেক সময় উন্মত্ত হইয়া উঠিত।

আরবদেশের ঈদৃশ দুরবস্থার সময়—৫৭০ খ্রীষ্টাবেদ মহাপুরুষ মোহাম্মদ জন্মপরিগ্রহণ করেন। মোহাম্মদের জন্মপবিগ্রহের পূর্ব্বেই তদীয় পিতার দেহান্তর হইয়াছিল। মোহাম্মদ কোরেশ সম্প্রদায়ের হাশিমবংশ সম্ভূত ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম আমিনা। আমিনা রূপবতি, গুণবতি ও বুদ্ধিমতি রমণী ছিলেন। তিনিও মোহম্মদের অতি শৈশবকালেই পরলোকগমন করেন। পিতৃমাতৃহীন মোহাম্মদের লালন-পালনেব ভার তদীয় বৃদ্ধ পিতামহ আব্দুল মুতালিবের উপর পতিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ আব্দুল মুতালেবেয় হৃদয় বড় স্নেহ প্রবণ ছিল। মোহাম্মদের পিতার নাম আবদুল্যা ; আবদুল্যা অতি সজ্জন ছিলেন। তিনি পিতাব কনিষ্ঠ পুত্র এবং তাঁহার শেষ বয়সের স্নেহপুত্তলি ছিলেন। তাঁহারে অকালমৃত্যুতে বৃদ্ধ পিতার হৃদয় শোকে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাঁহার তাদৃশ মর্ম্মভেদী শোকের সময়ও মোহাম্মদের সুন্দর সহাস্য মুখ শান্তি আনয়ন করিয়াছিল। শিশুর ভাবভঙ্গী, আকার প্রকার বৃদ্ধের স্মৃতিতে বালক আবদুল্যাকে জাগাইয়া দিত। তিনি শিশুর মুখে চোখে আবদুল্যার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া নয়নের বারি নয়নেই নিবারণ করিতেন। তিঁনি পরিজনদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেন, তোমরা মোহাম্মদকে সযত্নে প্রতিপালন করিও। এই সুন্দর শিশুই আমার বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ট সম্পদ।

১. আববদেশেব সর্ব্ব প্রধান ভজনালয়। একেশ্বরবাদেব আদি প্রবর্ত্তক এব্রাহিম এই মন্দির স্থাপিত কবেন, এক এবং অদ্বিতীয় নিবাকাব পবমেশ্বরের উপাসনাব জন্যই এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে আববাসীবা পৌত্তলিক ধর্ম্মবলম্বী হইয়া উঠে এবং কাবা মন্দিবে বহুসংখ্যক দেব-দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কবিযা তাঁহাদেব পূজা কবিতে আরম্ভ কবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে মোহাম্মদ বাল্যকালেই স্নেহশীল প্রতিপালক পিতামহকেও হারাইয়াছিলেন। বৃদ্ধ মৃত্যুকালে পৌত্রকে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু তালেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। আবু তালেব ন্যায়বাদী এবং ধীমান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতষ্পুত্রের প্রতিপালনের জন্য আরব দেশের তৎকালোচিত কোন বন্দোবস্তেরই ক্রটী করিয়াছিলেন না। তিনি তাঁহাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন।

আবু তালেবের আশ্রয়ে মোহাম্মদের বাল্য অতিবাহিত হয় ; কৈশোর আগমন করে। তিনি কৈশোরে পদার্পণ করিয়াই বাণিজ্যোপলক্ষে সিরিয়া রাজ্যে গমন করেন। সিরিয়া গমনকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চুতর্দ্দশ বৎসরের অধিক ছিল না। বিজাতীয় ভাষার বিন্দু বিসর্গও তাঁহার বোধগম্য ছিল না। একারণ সিরিয়ার সমস্তই তাঁহার নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তথাপি এখানেই খৃষ্টবিশ্বাসীদের সংসর্গে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। এখানে তাঁহাব তরল হৃদয়ে যে ভাববীজ উপ্ত হয়, তাহাই কালক্রমে ক্রমবিকাশের নিয়মে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংসার-তাপক্লিষ্ট অসংখ্য নরনারীর আশ্রয়স্থল ছায়া শীতল মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছিল।

কোন বিদ্যালয়ে মোহাম্মদের শিক্ষালাভ হইয়াছিল না। তাঁহার আবির্ভাবকালে আরবদেশে লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। কিন্তু উহার শৈশবাবস্থা তখনও অতিক্রান্ত হইয়াছিল না। মোহাম্মদ লিখিতে পারিতেন না। প্রকৃতির গ্রন্থপাঠেই তাঁহার শিক্ষালাভ হইয়াছিল। কিন্তু এই অনন্ত বিশ্বের যে কণা মাত্র প্রত্যক্ষভাবে তদীয় দৃষ্টির গোচরীভূত হইত, প্রকৃতির বহস্য নির্ণয় জন্য তাঁহাই তাঁহার আয়ত্ত ছিল ; তদতিরিক্ত ক্ষেত্রে তাঁহার প্রবেশপথ রুদ্ধ ছিল। মানব-মস্তিষ্ক উদ্ভাবিত গ্রন্থবাজি তাঁহার জ্ঞান-সম্পদ পবিবর্দ্ধিত করিতে পাবিয়াছিল না। পূর্ব্বগামী আচার্য্যগণর সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহার নিকট অর্গলবদ্ধ ছিল। নিঃসঙ্গ মোহাম্মদ মরুস্থলীপূর্ণ আরবদেশের ক্রোড়ে নিজের চিন্তা ও চুতর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য লইযাই আবিষ্ট থাকিতেন এবং এই তন্ময়তাই তাঁহার মনোবিকাশের হেতু স্বরূপ হইয়াছিল।

মোহাম্মদ বাল্যকাল হইতেই চিন্তাশীল, সত্যনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কার্য্য, বাক্য ও চিন্তা সকলি সত্যানুপ্রাণিত ছিল। তিনি কখনও নিরর্থক বাক্যব্যয় কবিতেন না। তিনি যাহা কিছু বলিতেন, তাহাই কার্য্যোপযুক্ত, জ্ঞানগর্ভ সারল্যপূণ বলিযা প্রতীযমান হইত। অকাপট্য, গাম্ভীর্য্য ও আন্তরিকতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে অমায়িকতা, বন্ধুবাৎসল্য এবং রঙ্গরসেরও অভাব ছিল না। যাদ্যকালের মোহাম্মদকে স্মরণ করিলে আমাদের মানসপটে একটী সুন্দর নবীন যুবকের চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে ; এ যুবকের সর্ব্বঙ্গ জীবিকা অর্জ্জনের পরিশ্রমে স্বেদসিক্ত, চিত্ত নবাগত ভাবের আবেশে অশান্ত, পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার অভাবে হৃদয় অমার্জ্জিত ; কিন্তু তাঁহার বদনমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় এবং তেজোদীপ্ত।

এই সময় মোহাম্মদ খাদিজা নাম্নী ধনবতী বিধবা রমনীর কার্য্যাধক্ষের পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাঁহার কার্য্যে পুনর্ব্বার সিরিয়া রাজ্যে গমন করেন। সেখানে তিনি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশ্বস্তভাবে যোগ্যতা সহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র ও

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা খাদিজার হৃদয়ে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়াছিল, এই শ্রদ্ধা ক্রমে অনুরাগে পরিণত হয়। খাদিজা অতি গুণবতী রমণী ছিলেন। তাঁহার অঙ্গুলীস্পর্শে মোহাম্মদের হৃদয় তন্ত্রীতে অপূর্ব্ব রাগিণী বাজিয়া উঠে। তৎকালে তিনি পঞ্চবিংশ বর্ষের যুবক ; খাদিজার বয়ক্রম চত্বারিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু গুণমুগ্ধ মোহাম্মদ বয়সের ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া খাদিজার করধৃত প্রেমসুধী আকণ্ঠপূর্ণ কবিয়া পান কারিয়াছিলেন। মোহাম্মদ সিরিয়া রাজ্য প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই যে প্রেমের অভিসিঞ্চনে মোহাম্মদের হৃদয় ফুলের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তাহা যত দিন খাদিজা জীবিতা ছিলেন, ততদিন একদিনেব জন্যও মলিন হইয়াছিল না ; তাঁহাদের প্রেমসিক্ত হৃদয়ে সদ্যোবিকশিত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় সর্ব্বক্ষণই সৌরভপূর্ণ থাকিত। সেই শিথিলবন্ধন দাম্পত্য-প্রেমেব যুগে মোহাম্মদের একনিষ্ঠ প্রেম বিস্ময়ের বিস্ময় ছিল।(১)

ধনবতী খাদিজার সঙ্গে পবিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় মোহাম্মদের আগের অভাব বিদুরিত হইয়াছিল। তিনি বিষয়কর্ম্ম করিযা আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হন। সৃষ্টিরহস্যের অন্তস্থলে কোন মহাশক্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহার স্বরূপ কি, মানবের সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদের আবর্ত্তন কোন্ কারণে হইয়া থাকে, বিপুল বিশ্বের নানা বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসূত্র কোথায় নিহিত আছে, এই সব তত্ত্বানুসন্ধানেই তিনি ধ্যানরত তাপসের ন্যায় সমাহিত হইতে আরম্ভ করেন। তিনি এরূপ এক সৌন্দর্য্যালোকের আভাষ পাইয়াছিলেন, যেখানে সমস্ত বিশ্বের অসংখ্য ধ্বন্যাত্মক সঙ্গীত এক মহাশক্তির পদতলে লয় প্রাপ্ত হইয়া শ্রোতামাত্রেবই হৃদয় পুলকাবিষ্ট করিতেছে। এই অপরূপ সৌন্দর্য্যালোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্যই তিনি অহোরাত্র ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। এইভাবে পঞ্চদশ বর্ষ অতিবাহিত হয়। মোহাম্মদ ৬০৯ খৃষ্টাব্দের রমজান মাসে নির্জ্জন গিরিকন্দরে আত্মচিন্তা করিতে মক্কার নিকটবর্ত্তী হরপববতে গমন করেন। খাদিজা তাঁহাব সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহার হরপর্ব্বতে একমাস অবস্থান করেন। এই সময় মোহাম্মদ একদা খাদিজাকে আনন্দবিহ্বল হইযা বলেন, "আমি পবমেশ্বরেব অনির্ব্বচনায় কৃপালাভ করিয়াছি, আমার সমস্ত সংশয় ও অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে, আমার মানসনয়নে এক অপরূপ আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছে। কাবামন্দিরের দেব মূর্ত্তি সকল নির্জ্জীব পদার্থমাত্র। পরমেশ্বরই মনুষ্যের একমাত্র উপাস্য।

---

(১) খাদিজা মোহাম্মদেব সহিত পবিণীতা হইবাব পব ২৫ বৎসব জীবিতা ছিলেন, তাঁহাদেব দাম্পত্য-জীবন বড মধুব ছিল। সেই বহু বিবাহেব যুগেও মোহাম্মদ তাহাব জীবদ্দশায় দ্বিতীয় দাবপবিগ্রহ কবিযাছিলেন। খাদিজা সর্ব্বাগুণালঙ্কৃতা স্বাধ্বী বমণী ছিলেন। তাহাব পবলোক গমনেব পব মোহাম্মদ আযেসাকে বিবাহ কবেন। আযেসাও পতিপবাযণা গুণবতী পত্নী ছিলেন। তিনি এক দিন কথা প্রসঙ্গে মোহাম্মদকে বলেন, "আমি কি খাদিজা অপেক্ষা ভাল নহি, তিনি বৃদ্ধা ও বিধবা ছিলেন। আমি কি খাদিজা অপেক্ষা আপনাব অধিক প্রিয় নহি।" মোহাম্মদ প্রত্যুত্তবে বলেন, "ঈশ্বব সাক্ষী, ইহা তোমার ভুল, যখন কেহ আমাব বাক্যে বিশ্বাস কবিযাছিল না, তখনও খাদিজা আমাব অনুগামিনী ছিলেন , সেই দুঃসময়ে সমগ্র পৃথিবীতে খাদিজা আমাব একমাত্র সঙ্গিনী ও হিতাকাঙ্ক্ষিনী ছিলেন।' ফলতঃ "Khadija was ever his angel of hope and consolation "

তিনি মহান, জীবন্ত ও সত্যস্বরূপ। পরমেশ্বরই সমস্ত বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা।" মোহাম্মদের ধ্যাননিরত অনন্যসাধারণ হৃদয়ে এক মহাসত্য প্রকটিত হইয়া তাঁহাকে বিমল আনন্দরসে পরিপ্লুত করিল ; তিনি মনুষ্য মাত্রকেই এই আনন্দের অংশীদার করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি একেশ্বরবাদ ও বিশুদ্ধ নীতি প্রচার করিতে উত্থিত হইলেন। এই নব ধর্ম্মের নাম এসলাম (২) প্রথমে এসলাম অতি মন্দগতিতে আরবসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। মোহাম্মদ

---

(২) এসলাম শব্দের অর্থ ঈশ্বরনির্ভর। কাহার কাহাব মতে এসলাম শব্দেব অর্থ পবিত্রাণ। "পরমশ্বেব ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ তাঁহার প্রেবিত ও ভৃত্য", ইহাব এসলাম ধর্ম্মেব মূল সূত্র। সাধু ভজনা, মূর্ত্তি নির্ম্মাণ, চিত্র অঙ্কন এসলাম ধর্ম্মবিরুদ্ধ।" পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি শক্তিমান, দয়ালু ও পবম প্রেমিক। মনুষ্য মাত্রেই সমান এবং দয়ার পাত্র, প্রবৃত্তি সংযম করা আবশ্যক, ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞ আদবে স্মবণ করা কর্ত্তব্য, মনুষ্য মাত্রেই স্বীয় দুষ্কর্ম্মের জন্য পরলোকে দায়ী" ইত্যাদি বিশ্বাসই এসলাম ধর্ম্মেব ভিত্তিভূমি। উপাসনা, উপবাস, দান ও তীর্থপর্য্যটন এসলাম ধর্ম্মচর্য্যার উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতন্মধ্যে উপাসনাই এসলামধর্ম্মাবলম্বীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মোসলমান সমাজে দৈনিক পাঁচ বার ঈশ্বরোপাসনার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিবাব জন্য মোহাম্মদ ঈশ্বরের আদেশবাণী লাভ করিয়াছিলেন। তিনি উপাসনাব উপকাবিতা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান কবিয়াছেন। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, "দেবদূতগণ দিবারাত্রি তোমাদেব নিকট আবির্ভূত হইয়া থাকেন। দিবাচর দেবদূতগণ বাত্রিকালে স্বগে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পরমেশ্বব জিজ্ঞাসা কবেন, জীব সকলকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ? তাঁহারা উত্তব কবেন, আমবা মর্ত্ত্যে গমন করিয়া জীব সকলকে উপাসনারত দেখিয়াছিলাম, ফিরিযা আসিবার সময় তাহাদিগকে উপাসনা-বত দেকিয়া আসিয়াছি।" তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, 'সর্ব্বদা উপাসনা করিও, উপাসনা আমাদিগকে পাপ ও দুষ্কার্য্য হইতে বক্ষা করে। ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ পরম পবিত্র কর্ম্ম।" এক জন পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন, "মোসলমানেব প্রার্থনামন্দির মানবহস্ত নির্ম্মিত নহে। ঈশ্বর সৃষ্ট পৃথিবীর সবব স্থানে অথবা তাঁহার আকাশতলে মোসলমানেব উপাসনা মন্দিব। ইহা এসলাম ধর্ম্মের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ মোসলমানের নিকট স্থানাস্থানভেদ নাই ; উপাসনার সময় সমাগত হইলে সর্ব্বত্র ব্যাকুল হৃদয়ে ঈশ্ববে গুণানুবাদ কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। ইহা এসলাম ধর্ম্মের একটী বিশেষত্ব।" এসলাম ধর্ম্মানুমোদিত ঈশ্বর স্তুতি অতিশয় মনোহর, আমরা উহার শেষাংশ হইতে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিতেছি। "পরমেশ্বর ব্যতীত-আর কোন উপাস্য নাই। তিনি জীবন্ত,— চিরকাল জীবন্ত। তাঁহার নিদ্রা নাই, তন্দ্রাও নাই। স্বর্গ্য মর্ত্ত্য এবং স্বর্গ মর্ত্ত্যের যাবতীয় পদার্থ তাঁহার। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতে পারে। ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই তাঁহার নখদর্পণে ; কিন্তু তিনি আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনো তত্ত্বই মানবের জ্ঞানায়ত্ত নহে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে তাঁহাব প্রভুত্ব, এ প্রভুত্ব রক্ষার জন্য তাঁহাকে কষ্ট স্বীকার কবিতে হয না। তিনি মহান, শক্তিমান।" আমরা আর এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "হে পরমেশ্বর, আমাকে তোমার প্রেম বিতরণ কর, যেন আমি তোমাকে ভক্তি করিতে পারি। যেন তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি। আমার নিকট তোমরা প্রেমকে আত্মপ্রেম অপেক্ষা গরীয়ান কর। দেবদূতগণ মানবের নিকট ঈশ্বরের বার্ত্তা বহন করিয়া আনেন, ধর্ম্ম প্রচাব জন্য সময় সময় "প্রফেট"গণ জন্মগ্রহণ কবেন, পরলোকে পাপ পূণ্যের তিরস্কার ও পুরস্কার হইয়া থাকে, মোহাম্মদ এসকল মতও প্রচার করিয়াছিলেন। অদৃষ্টবাদ, পুনরুত্থান (Resurrection of the body) এবং শেষ বিচার দিন ইত্যাদি তত্ত্বও এসলাম ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। মোহাম্মদের প্রচারিত একেশ্বর বাদ তাঁহার নিজের উদ্‌ঘাটিত নতুন তত্ত্ব নহে। এ সম্বন্ধে আমরা কোরাণের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। "এব্রাহিমের ধর্ম্ম সত্য, এব্রাহিম অনেকেশ্বরবাদী ছিল না। ১৩২। বল, আমরা ঈশ্বরের বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। এবং যাহা এব্রাহিমেব প্রতি ও যাহা এসমাইল, এসহাক, ইয়াকুব এবং তাহাদের সন্তানগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা অপর তত্ত্বগ্রাহকগণের প্রতি তাহাদের ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

লোকলোচনের অন্তরালে নির্জ্জনে কতিপয় অন্তরঙ্গ নবীন যুবককে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। একাদিক্রমে তিন বৎসরকাল ধর্ম্ম প্রচারের পর তাঁহার শিষ্যসংখ্যা চল্লিশের অধিক হইয়াছিল না।

মোহাম্মদের অন্যতম শিষ্যের নাম আবুবেকর ছিল। আবুবেকরের ধর্ম্মোৎসাহ একান্ত প্রবল ছিল। তিনি বৎসর পর এসলাম ধর্ম্ম বিশ্বাসীর সংখ্যা চল্লিশ পূর্ণ হইলে তিনি প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য মোহাম্মদকে অনুরোধ করিলেন। প্রিয়তম শিষ্যের ঐকান্তিক

করিলাম। তাহাদের কাহাকেও প্রভেদ করিতেছি না এবং সেই ঈশ্বরের অনুগত। ১৩৩। মুসায়ী ও ঈসায়ী লোকেরা বিশ্বাস করিলে আলোক পাইতে পারে। ***" ১৩৪। (গিরিশ বাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ, ২য় অধ্যায়।) এসলাম ধর্ম্মের নীতিও অতি বিশুদ্ধ। "অন্যের নিকট তুমি যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, তুমিও অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিও।" এসলাম ধর্ম্মাবলম্বীকে এই মহৎ বাক্যেই সংসারসমুদ্র দিগ নির্ণয় যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে মোহাম্মদ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। "কাহার সঙ্গে ব্যবহার কালে ন্যায়পথভ্রষ্ট হইও না।" এই মহদ্বাক্যও মোহাম্মদের উপদেশ। দানধর্ম্ম আচরণ জন্য মোহাম্মদ মোসলমানদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিয়াছেন এবং মনুষ্য মাত্রকেই তাহার আয়ের এক নির্দিষ্ট অংশ পরোপকারার্থে প্রদান করিতে অনুশাসন করিয়াছেন।" ঈশ্বরসৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন না করিলে কেহ তাঁহার প্রেম লাভ করিতে পারে না, ইহাই মোহাম্মদ কথিত দান-মাহাত্ম্য। মোহাম্মদ এক দিন উপদেশদান কালে বলিয়াছিলেন, " সৃষ্টিকালে পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল। এ কারণ ঈশ্বর পৃথিবীর গুরু ভার স্থাপন করিয়া উহাকে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। পর্ব্বত অপেক্ষা লৌহ অধিক শক্তিশালী, কারণ লৌহের আঘাতে পর্ব্বত ভগ্ন হইয়া পড়ে। লৌহ অপেক্ষা অগ্নি অধিক শক্তিশালী, কারণ অগ্নি লোহকে দ্রব করে। অগ্নি অপেক্ষা জল অধিক শক্তিশালী কারণ জল অগ্নিকে নির্বাপিত করে। বায়ু জল অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী কারণ বায়ু জলকে সঞ্চালিত করে। কিন্তু যদি কোন সজ্জন দক্ষিণ হস্তে দান করিয়া বাম হস্তকে তাহা জানিতে না দেন তবে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহার নিকট সকলেই পরাজিত হয়।' এসলাম ধর্ম্মের উপদেশ সর্ব্বব্যাপী। প্রতিবেশীর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক কোরাণে তৎসম্বন্ধেও উপদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। বিশ্বাসীগণ, তোমরা আপন গৃহ ব্যতীত (অন্য) গৃহে যে পর্য্যন্ত তাহার স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা ও সালাম না কর, প্রবেশ করিও না। (গিরিশ বাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ, ১১শ অধ্যায়।) মহাম্মদের আবির্ভাব কালে আরব রমণীর অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। আরব সমাজে ব্যভিচার, দাসী-সংসর্গ সাময়িক বিবাহ ও বহুবিবাহ দোষে কলঙ্কিত ছিল। পিতামাতা আবশ্যক মত কন্যাসন্তানকে গৃহপালিত পশুবৎ বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না। আরব রমণী পিতা বা স্বামীর সম্পত্তি স্বরূপ ছিল। তাহারা স্বামীর মৃত্যুর পর অন্যান্য ত্যক্ত সম্পত্তির ন্যায় উত্তরাধিকারীর হস্তগত হইত। এ জন্য সৎপুত্রের সঙ্গে বিমাতার বিবাহের ন্যায় বীভৎস প্রথা আরবসমাজে দেখা যাইত। আরব-পিতামাতা অনেক সময় কন্যাসন্তানকে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া বধ করিত। আরব সমাজে নারীজাতির কোন অধিকারই ছিল না। ফলতঃ তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। মোহাম্মদ নারীজাতির উন্নতি বিধানকল্পে বহু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মোহাম্মদের সমস্ত ব্যবস্থার মূলে নারীজাতির প্রতি সম্মানের ভাব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে ব্যভিচার নিবারণ কল্পে অবরোধ প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। মোহাম্মদ দাসী-সংসর্গ নিষেধ করিয়াছিলেন। বিশ্বাসী শুদ্ধাচারিণী রমণীকেও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাধিকারীদিগের শুদ্ধাচারিণী কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইতেছে। তোমরা গুপ্ত প্রণয়-লোলুপ ব্যভিচারী না হইয়া এবং উপপত্নী গ্রহণ না করিয়া শুদ্ধাচারে কালযাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে তাহাদের যৌতুক দান করিলেই এরূপ করিতে পার।" ৭। (কোরাণ, ৫ম অধ্যায়, দাসী সংসর্গ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এই নিষেধ বিধি কার্য্যকারী করিবার জন্য দাসী বিবাহ বৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। (কোরাণ ৪র্থ অধ্যায় ২৫শ আয়ত) মোহাম্মদ সাময়িক বিবাহের প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন। পুরুষের বিবাহের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল। তোমাদের যেরূপ

অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া মোহাম্মদ সর্ব্বজন সমক্ষে স্বীয় ধর্ম্মমত ঘোষণা করিবার জন্য আরব দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনালয় কাবামন্দিরে গমন করিলেন। আবুবেকর প্রথমতঃ একেশ্বরবাদের মহিমা বর্ণনা করিয়া তারপর পৌত্তলিক ধর্ম্মের দোষ প্রদর্শন করিলেন। উগ্রস্বভাব আরবগণ স্বধর্ম্মের নিন্দা শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া বিধর্ম্মীদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসৃত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কাবামন্দিরে কোলাহল উত্থিত হইল। দয়ার্দ্রচিত্ত তমিম পরিবারের লোকেরা দৌড়িয়া আসিয়া তাহাদিগকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিল। তাহাদের তাদৃশ সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে মোহাম্মদ ও তদীয় অনুচরবর্গের প্রাণনাশ ঘটিত। -১

মোহাম্মদের প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মপ্রচারে প্রথম উদ্যম এইরূপ শোচনীয় হইয়াছিল। কিন্তু মোহাম্মদ ও তাহার শিষ্যবৃন্দ ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন না। এই ঘটনার কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলেই তাহারা পুনর্ব্বার নবোৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। একে একে শিষ্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মোহাম্মদ কোরেশ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কোরেশগণ আরবদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনালয় কাবামন্দিরের পুরোহিত ছিল। সুতরাং অন্যান্য সম্প্রদায় ধর্ম্মবিষয়ে তাহাদের প্রভুত্বাধীন ছিল। একারণ মোহাম্মদের নবধর্ম্মপ্রচারে কোরেশগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীত হইল।

আভরুচি তদনুসারে দুই তিন ও চারি নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পার পরন্তু যদি আশঙ্কা কর ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না তবে এক নারীকে বিবাহ করিবে অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছে তাহাকে (পত্নী স্থলে গ্রহণ করিবে।) ইহা অন্যায় না করার নিকটবর্ত্তী।" ৪। (গিরিশ বাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ ৪র্থ অধ্যায়) নারী জাতির প্রতি অসদাচরণ নিবারণ জন্য মোহাম্মদ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন"। বেধরূপে তাদের সঙ্গ করিবে, পরন্তু যদি তোমরা তাহাদিগকে অবজ্ঞা কর, তবে হয়ত এমন এক বস্তুকে অবজ্ঞা করিলে যে তাহাতে ঈশ্বর প্রচুর কল্যাণ করিয়া থাকেন। "(গিরিশ বাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ ৪র্থ অধ্যায় ২৭শ আয়ত) মোহাম্মদের ব্যবস্থায় সৎপুত্রের সঙ্গে বিমাতার বিবাহের প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছিল। মোহাম্মদ নারী জাতিকে বিবিধ অধিকারে স্বত্ববতী করিয়াছেন। "যাহা পিতা মাতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে পুরুষের অংশ এবং যাহা পিতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করে, তাহা অল্প বা অধিক হউক, তাহা হইতে নারীর অংশ, অংশ নির্দ্ধারিত।" ৫-৭। "বিশ্বাসিগণ বলপূর্ব্বক স্ত্রীগণের স্বত্ব গ্রহণ করা তোমাদের জন্য অবৈধ। স্পষ্ট তাহাদের যোগ দেওয়া ব্যতীত তোমরা তাহাদিগকে যে কোন দ্রব্য দান করিয়াছ, তাহা গ্রহণে নিষেধ করিও না।" (গিরিশ

বাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ, (৪র্থ অধ্যায়) এসকল সুব্যবস্থা সত্ত্বেও মোসলমান সমাজে নারী জাতির অবস্থা নানা কারণে সবিশেষ উন্নত হইতে পারিয়াছিল না। কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

(১) এই ব্যাপারে আবুবকরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রহৃত হইয়াছিলেন। তিনি ২৪ ঘণ্টা অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন। আবুবকর মোহাম্মদের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি দিবারাত্রি সংজ্ঞাহীন থাকিয়া যখন প্রথম চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখনই মোহাম্মদ কেমন আছেন তাহা জানিতে সমুৎসক হইলেন। একজন অনুচর তাঁহার সংবাদ লইয়া আসিয়া বলিল, তিনি কুশলে আছেন। আবুবকর এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আমি মোহাম্মদকে না দেখিয়া অন্ন জল কিছুই গ্রহণ করিব না। তিনি সমস্ত দিন অনাহারে রহিলেন, তারপর রাত্রিকালে রাজপথ নির্জ্জন হইলে মোহাম্মদের বাসভবনে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিয়া উপবাস ভঙ্গ করিলেন।

মোহাম্মদ সফলকাম হইলে আপামর সাধারণ সর্ব্ব শ্রেণীর ধর্ম্মবিশ্বাসের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিবে এবং তাহাতে তাহাদের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি সাংঘাতিকরূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইবে, তাহারা ইহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। মোহাম্মদ সাম্যবার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন। জলদগম্ভীরস্বরে প্রচার করিয়াছিলেন, জগদীশ্বরের দৃষ্টিতে মনুষ্য মাত্রেই সমান, এ মতের প্রবর্ত্তনে কোরেশগণের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া তাহারা অঙ্কুরেই মোহাম্মদকে বিনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

কোরেশগণ একযোগে মোহাম্মাদ ও তদীয় শিষ্যবৃন্দকে উৎপীড়ন করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। প্রত্যেক গৃহস্বামী আপন অধিকারে নবধর্ম্মকে কণ্ঠাবরোধ করিয়া বিনাশ করিবার ভার গ্রহণ করিল। এসলামধর্ম্ম-বিশ্বাসীগণের অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা রহিল না। তাহারা কারারুদ্ধ, অনাহারে ক্লিষ্ট এবং প্রহৃত হইতে লাগিল। রমধা পর্ব্বত এবং বথা এসলাম ধৰ্ম্ম-বিশ্বাসীদের নির্য্যাতনের স্থান ছিল। কেহ পৌত্তলিকতায় আস্থাহীন বলিয়া প্রকাশ পাইলেই তাহাকে কোরেশগণ মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার উপর সূর্য্য কিরণে দগ্ধ করিত। যখন ঈদৃশ নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাহাদের কণ্ঠ, তালু শুষ্ক হইয়া পড়িত এবং মৃত্যু আসন্ন হইত, তখন তাহাদিগকে হয় নবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে, না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বলা হইত। কেহ কেহ পরিত্রাণ লাভ জন্য নবধর্ম্ম পরিত্যাগ কবিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মুক্তি লাভের পরক্ষণেই পুনর্ব্বার মোহাম্মদের শরণাপন্ন হইত। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই আপন ধর্ম্মমতে অটল থাকিত।(১)

এইরূপ কঠোর উৎপীড়নেও কোন ফলোদয় হইল না। এসলাম ধৰ্ম্ম বিশ্বাসিগণ কিঞ্চিৎমাত্রও বিচলিত বা ধর্ম্মপ্রচারে বিরত হইলেন না, দিন দিন তাঁহাদের দল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কোরেশগণ পাশব বলে নবধর্ম্ম বিশ্বাসীদিগকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া প্রলোভনে মোহাম্মদকে বশীভূত করিতে সঙ্কল্প করিল।

একদিন্ মোহাম্মদ কাবা মন্দিরে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সময় মক্কার অন্যতম নেতা ওত্বা তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, হে মোহাম্মদ, তুমি কোরেশ সম্প্রদায় মধ্যে ভেদ নীতি আনয়ন করিয়াছ, আমাদের ধর্ম্মের নিন্দা করিতেছ, পূর্ব্ব পুরুষদিগকে পাষণ্ড বলিয়া ঘোষণা করিতেছ। তোমার উদ্দেশ্য কি? ধন, মান, যশ, প্রভুত্ব, রাজত্ব তুমি কোন্ আকাঙ্ক্ষায় আমাদের বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তোমার যাহা কামনা, তাহাই তোমার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইবে। এ বিদ্রোহাচরণ পরিত্যাগ কর। ওতবাব এই প্রলোভন বাক্যে মোহাম্মদ কিঞ্চিৎমাত্রও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, আমি

(১) বিল্লাল নামক একজন কাফ্রি ক্রীতদাস এসলামধৰ্ম্ম গ্রহণ কবিযাছিল। তদীয প্রভু উম্মিয়া একাবণ তাহাকে উৎপীবণেব একশেষ কবিত। বিল্লালকে প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে বথাব উত্তপ্ত বালুকাব উপর উর্দ্ধমুখে শয়ান করাইযা তাহাব বুকে গুরুভাব প্রস্তব স্থাপন কবা হইত। উম্মিয়া কহিত, বিল্লাল, হয তুমি নবধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, না হয় এইরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ কবিযা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে প্রস্তুত হও। কিন্তু বিল্লাল কিছুতেহ স্বমত পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইত না এবং পিপাসায় মৃত্যু দশা উপস্থিত কালে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ করিত। প্রত্যহ এইরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ কবিতে কবিতে তাহাব প্রাণ সংশয় অবস্থা উপস্থিত হইযাছিল। বিল্লাল এই অবস্থায় একদিন আবুবকরের দৃষ্টি পথে পতিত হওযায তিনি তাহাকে ক্রয করিয়া তাহার জীবন রক্ষা কবেন।

তোমাদের ন্যায়ই একজন মনুষ্য মাত্র। আমি প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছি যে, তোমাদের ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তোমরা কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া তাঁহাকে ভজনা কর এবং যাহা গত হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত অনুশোচনা কর। যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না এবং শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মত দান করে না, তাহারা দুঃখ পাইবে। কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মান্বিত, তাহারা পুরস্কার লাভ করিবে। হে ওতবা, তোমার নিকট সমস্ত প্রকাশ করা হইল, এখন তুমি যে পথ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা কর, তাহাই অবলম্বন কর।

কোরেশগণ মোহাম্মদকে প্রলোভনে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার নববিশ্বাসীদলের প্রতি ঘোর উৎপীড়ন করিতে সঙ্কল্প করিল। তাহারা মোহাম্মদের পবিত্র অঙ্গে হস্তাপর্ণ করিল। তারপর নানা প্রকারে এসলামধর্ম্ম-বিশ্বাসীদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। তাহাদের পাশব অত্যাচারে অনেকের জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। মোহাম্মদ প্রাণাধিক শিষ্যবৃন্দকে তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া একান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। এবং তাহাদিগকে আবিসিনিয়া রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোরেশগণের পাশব অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে আদেশ করিলেন। এই সময় যিনি আবিসিনিয়া রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, উদারস্বভাব ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। এজন্যই মোহাম্মদ শিষ্যবৃন্দকে তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে এসলাম ধর্ম্ম ঘোষণার পঞ্চম বর্ষে বীরপুরুষ ওসমানইবন আফানের নেতৃত্বাধীনে কিঞ্চিদধিক অশীতি সংখ্যক নর-নারী আবিসিনিয়া রাজ্যে গমন করিল! প্রতিহিংসাপরায়ণ কোরেশগণ ঈদৃশ বহু সংখ্যক নব বিশ্বাসীকে গ্রাসমুক্ত দেখিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং তাহাদিগকে প্রত্যার্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া আবিসিনিয়া রাজ দরবাবে দূত প্রেরণ কবিল। কোরেশদূত গৃহীত-আশ্রয় মোসলামদিগকে রাজ দরবারে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত করিল। রাজা তাহাদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেন ধর্ম্মান্তর করিয়াছ? আলী কনিষ্ঠ ভ্রাতা জাফর সমাগত মোসলমানদের মুখপাত্র স্বরূপ বলিতে লাগিলেন, "হে রাজন, আমরা অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন বর্ব্বর ছিলাম; আমরা দেব-দেবীর পূজক ছিলাম, নিত্য ব্যভিচারে লিপ্ত হইতাম, মৃত দেহের মাংস ভক্ষণ করিতাম, জঘন্য অশ্লীল বাক্যে জিহ্বা কলুষিত করিতাম, মনুষত্যে জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম, আতিথ্য ধর্ম্মপালন করিতাম না। আমাদের এইরূপ দুর্দ্দাশার সময় পরমেশ্বর আমাদের সমাজে একজন মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়াছেন; এই মহাপুরুষের বংশ মর্য্যাদা, সত্যবাদিতা, সাধুতা এবং নির্ম্মল চরিত্রের বিষয় আমরা সম্যক পরিজ্ঞাত আছি। তিনি আমাদিগকে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন এবং পরমেশ্বরের সহিত অন্য কোন পদার্থের সংযোগ সঙ্গত নহে বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে দেব দেবীর অর্চ্চনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং সত্য কথা কহিতে, ন্যস্ত ধনের সদ্ব্যবহার করিতে, দয়ার্দ্রচিত্ত হইতে এবং প্রতিবাসীর স্বত্ব রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে নারী জাতির কুৎসা করিতে এবং অনাথ বালক বালিকার অর্থ অপহরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে দূরে গমন করিতে, দুষ্কার্য্য পরিত্যাগ করিতে, ঈশ্বরোপাসনা করিতে, দরিদ্রের উপকার করিতে এবং পবিত্র দিনে

উপবাস করিতে আদেশ করিয়াছেন।" আবিসিনিয়ার অধিপতি এই উত্তরে প্রীত হইয়া কোরেশ দূতকে দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

কিঞ্চিদধিক অশীতি সংখ্যক মোসলমান আত্ম রক্ষার জন্য আবিসিনিয়া রাজ্যে প্রস্থান করাতে মোহাম্মদের শিষ্য সংখ্যা খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল ; কিন্তু ইহাতে তিনি কিঞ্চিৎ মাত্রও ভগ্নোদ্যম না হইয়া পূর্ব্ববৎ অটল ভাবেই ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। নববিশ্বাসীদলের খর্ব্বতা নিবন্ধন এসলাম ধর্ম্ম প্রচাবের বিঘ্ন উপস্থিত না হওয়ায় কোরেশগণ একান্ত ক্ষুণ্ন হইয়াছিল। একারণ তাহারা মস্তিষ্কের বহু আলোড়নে মোহাম্মদকে নিষ্প্রভ করিবার জন্য এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। কোরেশগণ পূর্ব্বগামী প্রেরিত মাহাত্মাদের ন্যায় তাঁহাকেও অলৌকিক প্রদর্শন করিয়া নব ধর্ম্মের অপার্থিবতা প্রমাণিত করিতে বলিল। অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। মোহাম্মদ কখনও ঐশী শক্তির ভান করিয়া আত্ম প্রাতিষ্ঠা করেন নাই। সত্যনিষ্ঠা তাঁহার চরিত্রের মূলভিত্তি ছিল। তিনি কোরেশ গণের বিদ্বেষ বুদ্ধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ কল্পে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে স্বীকৃত হইয়া প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন না। মোহাম্মদ তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন "পরমেশ্বর আমাকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন জন্য প্রেরণ করেন নাই। তিনি আমাকে তোমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রভু পরমেশ্বরের অপার মহিমা ! আমি একজন ঈশ্বর প্রেরিত ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্যতীত অন্য কেহ নহি। দেব দূতগণ সাধারণত: মর্ত্ত্যে আগমন করেন না, নতুবা পরমেশ্বর একজন দেব দূতকেই তোমাদের নিকট তাঁহার সত্য, ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রেরণ করিতেন। আল্লার ভাণ্ডার আমার হস্তে ন্যাস্ত, গুপ্ত তথ্য আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত, অথবা দেব দূতের আত্মা আমার দেহে সংযুক্ত, আমি এরূপ ঘোষণা কখনও করি নাই। ঐশ্বরিক কৃপা ব্যতীত আমি নিজেই আমার আত্ম শক্তিতে প্রত্যয় করিতে পারি না। পরম কারুনিক দয়ালু পরমেশ্বরের নামে বলিতেছি যে, স্বর্গমর্ত্ত্যস্থ প্রাণী মাত্রেই সর্ব্বজ্ঞানাধার, সব্বশক্তিমান পরম পবিত্র প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। প্রভু পরমেশ্বরই অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন আরব সমাজে আলোক প্রদান কল্পে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ সংস্থাপন জন্য এবং কোরাণ ও পরমজ্ঞান প্রচার জন্য নিরক্ষর আরবগণের মধ্য হইতে আমাকে ধর্ম্ম সংস্থাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা পরমেশ্বরের স্বেচ্ছাকৃত করুণা, তাঁহার ইচ্ছা হইলে সকলেই তাঁহার করুণা লাভ করিতে পারে। ঈশ্বর পরম দয়ালু।" ফলতঃ মহাপুরুষ মোহাম্মদ কখনও অলৌকিক শক্তির মাহাত্ম্যে এসলাম ধর্ম্মকে আরব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন না। তিনি জ্ঞান ও বিবেকের বর্ত্তিকা হস্তে কুসংস্কারবিদ্ধ আরব সমাজের অন্ধকার-রাশি ধ্বংস করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; আরবগণের কুসংস্কার পরিপুষ্ট করিয়া আত্ম প্রধান্যের প্রতিষ্ঠা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। প্রকৃতির রুদ্র গম্ভীর "স্নিগ্ধ মধুর মহোজ্জ্বল সৌন্দর্য্য" পরিস্ফুট ভাবে প্রদর্শন করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি মানব হৃদয়কে অনুরক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই মোহাম্মদ মহাসাধনায় সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। একারণ তিনি কোরেশগণের কথামত অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন না। কিন্তু তাহারা তাঁহার সবল বাক্যে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে

বিদ্রূপ ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে। তাহারা বলিয়াছিল, "হে মোহাম্মদ, নিশ্চয় জানিও যে, তোমার অথবা আমাদের বিনাশ না হইলে এ বিরুদ্ধাচরণ বিরাম লাভ করিবে না।"

কোরেশগণের অত্যাচারের মাত্রা—অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। মোহাম্মদ নিজে অশেষ প্রকারে নিগৃহীত হইতে লাগিলেন, তাঁহার শিষ্যবৃন্দের লাঞ্ছনা ও অপমানের পরিসীমা রহিল না। পঞ্চবর্ষব্যাপী অশেষ অত্যাচারে উৎপীড়নেও মোহাম্মদের হৃদয় এক মুহুর্ত্তের জন্যও স্পৃষ্ট হইয়াছিল না ; তিনি আপন ব্রতে সর্ব্বদা অটল ছিলেন। কিন্তু হিমালয় সদৃশ নিষ্কম্প মনুষ্য হৃদয়েও কোন না কোন এক সময় সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। যিনি পঞ্চবর্ষব্যাপী হৃদ্‌পঞ্জরভেদী পাশবউৎপীড়নেও অবিচলিত ছিলেন, তাঁহার চিত্তেও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। একদিন প্রার্থনাকালে মোহাম্মদ তিন জন চান্দ্রদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কোরেশগণের সমস্ত বিরুদ্ধাচরণের মূলোৎপাটন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে তিন জন চান্দ্রদেবীর উল্লেখ করিয়া প্রচার করেন যে, ইহারা ঈশ্বরকৃপা লাভ জন্য মনুষ্যকে সাহায্য করিতে পারেন। অতএব প্রভু পরমেশ্বরের নিকট অবনত হও এবং তাঁহাব সেবা কর। সমগ্রে শ্রোতৃবর্গ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মহাপুরুষের মনুষ্যসুলভ দুব্বলতা বিদ্যুৎচ্ছটার ন্যায় মুহুর্ত্ত মধ্যেই বিলীন হইল। তিনি পরমুহূর্ত্তেই বলিলেন, "তোমাদের দেবদেবী অন্তঃসারশূন্য নাম মাত্র। এই সকল দেবদেবী তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মস্তিষ্কেই সৃষ্ট হইয়াছে।" মোহাম্মদ মুহূর্ত্তের জন্য প্রলোভনে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আত্ম অপরাধ স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার কোরেশ জাতির সমস্ত উৎপীড়িন অম্লানবদনে সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। মোহাম্মদ আত্ম অপরাধ স্বীকার করিয়া মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন ; কিন্তু কোরেশগণ তাঁহার ব্যবহারে একান্ত ক্ষুণ্ণ হইল ; তাহাদের অত্যাচারস্রোত পুনব্বাব প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল।

কোরেশ সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা আবুজ্জহল ধর্ম্মদ্রোহী মোহাম্মদকে হত্যা করিবার জন্য অনুচরদিগকে আদেশ করিলেন। এবং আজ্ঞা-প্রতিপালনকারীকে একশত লোহিত উষ্ট্র ও সহস্র রৌপ্য মুদ্রা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ওমর নামক একজন অমিতবলশালী ধীসম্পন্ন কোরেশ মোহাম্মদের শিরশ্ছেদন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া উন্মুক্ত-কৃপাণ হস্তে ধাবিত হইলেন। তিনি কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়াই তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতির এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি এই সংবাদে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ভগিনীব গৃহে গমন করিলেন এবং মূঢ়ের ন্যায় দিগ্বিদিকব্যেধ-শূন্য হইয়া ভগিনী ও ভগিনীপতিকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার দারুণ প্রহারে তাঁহারা ক্ষতবিক্ষত হইলেন ;— ক্ষতস্থান হইতে রক্তধাবা বহিল। কিন্তু তাঁমারা নবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য। ওমর তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি অপ্রতিভ হইয়া ভগিনীর বাটীতেই সেদিন যাপন করিতে মনন করিলেন। রাত্রিকালে তদীয় ভগিনীপতি কোরাণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ওমরের অশান্তচিত্ত তাঁহাদের মধুর

আবৃত্তিতে আকৃষ্ট হইল ; তিনি মনোযোগ সহকারে কোরাণ পাঠ শুনিতে লাগিলেন। কোরাণের চিত্তবিমোহিনী বাণী শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল ; তিনি এসলাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। মোহাম্মদকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার মনোপ্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রাত্রি প্রভাত মাত্র তিনি কাবামন্দিরের অভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। মোহাম্মদ শিষ্যগণসহ কাবামন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার শিরশ্ছেদন জন্য ওমরের ভীষণ প্রতিজ্ঞার সংবাদ ইতিপূর্ব্বেই মক্কাব সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ওমর আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। শিষ্যগণ ওমরের আগমনে শঙ্কাকুল হইলেন। কিন্তু নির্ভীক মোহাম্মদ কাবামন্দির হইতে বহির্গত হইয়া ওমরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ওমর তাঁহাকে দেখিবামাত্র জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন,-আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি, পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, এবং মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য। অতঃপর তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিতেছিল, তাহার পরিচয় দিলেন। মোহাম্মদ ওমরকে সত্য ধর্ম্মানুরক্ত দেখিয়া একান্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের নামে জয়োচ্চারণ করিলেন।

অমিত বলশালী ধীশক্তিসম্পন্ন ওমর বিশ্বাসী দল ভূক্ত হওয়ায় তাহাদের বল সঞ্চয় হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোরেশগণ ইহাতে একান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলভাবে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে। কোরেশ দূত আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসিল। এই সময় কোরেশগণ তাহার নিগ্রহের কথা শুনিয়া দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। এবং তাদৃশ অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য বিশ্বাসীদলের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

হাসিম ও মুতালিব বংশের অধিকাংশলোকই এসলামধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ঐজন্য কোরেশগণ এই দুই বংশকে সমূলে বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়া তাহাদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ না হইতে ও তাহাদের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় না করিবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। ক্ষুধার্ত্ত শিশুর ক্রদনে চতুর্দ্দিক মুখরিত হয়া উঠে। শিশুর আর্ত্তনাদ ও বিশ্বাসীদলের হৃদয় চঞ্চল করিতে পারিয়াছিল না। কিন্তু মক্কার ঈদৃশ দুর্দ্দশা দর্শনে অনুতপ্ত হইয়া আপনাদের ধর্ম্মঘট শ্লথ করিতে যত্নশীল হইলেন। তাঁহাদের যত্নে এসলামধর্ম্ম-বিশ্বাসীগণ মক্কায় বাসোপযোগী কতিপয় অধিকার লাভ করিল।

তদনুসারে তাঁহারা মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন ; কিন্তু শান্তি সুখ তাঁহাদের অদৃষ্টে ছিল না। তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পব এসলামধর্ম্ম-বিরোধীগণ তাহাদের প্রতি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ কারিল। মোহাম্মদ মক্কাবাসীদিগকে কোন ক্রমে নব ধর্ম্মের অনুরাগী করিতে না পারিয়া অভিনব ক্ষেত্রে প্রচার করিলে সমধিক ফল লাভ হইবে বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এজন্য তিনি মক্কার সত্তর মাইল দূরবর্ত্তী তায়েফ নগরে গমন করিলেন। এখানে তিনি প্রবোলৎসাহে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি এই স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন না। ...পৌত্তলিক অধিবাসীরা বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া

তাঁহাকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে এবং তাহাতে তিনি ক্ষুণ্ন হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।(১)

এই সময় মোহাম্মদের যশোপ্রভা দেশ বিদেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল বিদেশীয় লোক বাণিজ্য বা তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে মক্কায় আসিত, তাহাদের অনেকে মোহাম্মদের প্রাণোন্মাদকর উপদেশে উদ্দীপিত হইয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এইভাবে ইসলাম ধর্ম্মের বীজ দেশ বিদেশে সর্ব্বত্র উপ্ত হইয়াছিল। মোহাম্মদের তায়েফনগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অত্যল্প পরেই মদিনার দ্বাদশজন ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার মহিমা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া মক্কায় আগমনপূর্ব্বক এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহারা প্রত্যাগমনকালে মদিনায় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য একজন প্রচারক সঙ্গে লইয়া যান। ইঁহার চেষ্টায় মদিনায় এসলাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং আপামর সকলেই এসলাম ধর্ম্মের শরনাপন্ন হয়। এইভাবে মক্কার বহর্ভাগে এসলাম ধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু মক্কার অধিবাসীরা মোহাম্মদের সহস্র উপদেশেও এসলাম ধর্ম্মের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিল না। তাহাদের উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে মোসলমানদের মক্কায় বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। মোহাম্মদ সশিষ্যে মদিনায় আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিলেন। মদিনার অধিবাসীরা মোহাম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণকে আনয়ন করিবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আবুবকর মোহাম্মদকে আহ্বান করিলেন। মোহাম্মদ গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন ; আবুবকর রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। তিনি যে একটি ছিদ্রপথে পদস্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে পথে একটী বৃশ্চিক তাঁহাকে দারুন দংশন করিল, তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু মোহাম্মদকে জাগরিত না করিয়া সমস্ত নীরবে সহ্য করেন।

এদিকে বিরুদ্ধবাদিগণ মোহাম্মদকে গ্রাসমুক্ত দেখিয়া শোণিত–লোলুপ ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার অনুসন্ধানে ধাবিত হইল এবং তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া গারসুরা গুহার নিকট আসিয়া পৌঁছিল। মোহাম্মদ ও আবুবকর শঙ্কাকুল হইয়া বলিলেন, "আমরা দুইজন শত্রু সংখ্যা বহু, আর রক্ষা নাই।" মোহাম্মদ বলিলেন, "আমরা দুইজন নহি, তিনজন, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গী, ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" আবুবকর ও মোহাম্মদের গুহার ভিতরে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই উর্ণনাভ উহার মুখে জাল পাতিয়াছিল, এবং বন্য কপোত

(১) মোহাম্মদ তায়েফনগর হইতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে ভগ্ন হৃদয়ে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "হে প্রভু, আমি দুর্ব্বলতা ও আত্মম্ভরিতাবশতঃ তোমার নিকট আমার দুঃখজনক কাহিনী নিবেদন করিয়া থাকি। মনুষ্যের নিকট আমি নগণ্য। হে দুর্ব্বলের পরম কারুনিক প্রভু, তুমি আমার নিয়ন্তা, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। অপরিচিত বা শত্রুশঙ্কুল স্থানে আমাকে পরিত্যাগ করিও না। তুমি রুষ্ট না হইলে আমার কোন বিপদ নাই। তোমার জ্যোতিই আমার আশ্রয়স্থল ; তোমার জ্যোতিতে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং ইহকালে ও পরকালে শান্তিলাভ করা যায়। তুমি আমার প্রতি রুষ্ট হইও না। তোমার যেরূপ ইচ্ছা সেইভাবে আমার বিপদ দূর কর। তোমার করুণা ব্যতীত শক্তি ও সাহায্য নাই।"

দ্বারমূলে ডিম্ব প্রসব করিয়া রাখিয়াছিল। গুহার মুখে জাল ও দ্বারমূলে ডিম্ব দেখিয়া শত্রুগণ উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়াই অন্য দিকে চলিয়া গেল, মোহাম্মদ ও আবুবেকর রক্ষা পাইলেন। তাঁহারা তিন অহোরাত্রি এই গুহার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিলেন। প্রতি রজনীতে আবুবেকরের কন্যা দুগ্ধ আনয়ন করিতেন ; তাঁহারা এই দুগ্ধ পান করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। তাঁহার চতুর্থ রজনীতে গারসুরা গুহা পরিত্যাগ করিয়া মদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা রাত্রিকালে পথ অতিবাহিত করিতেন, সূর্য্যোদয় হইবামাত্র লুক্কায়িত হইতেন। এইভাবে পথ অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা চতুর্থ রজনীতে মদিনার নিকটবর্ত্তী কোবা নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এখানে চারিদিন যাপন করিয়া মোহাম্মদ আবুবেকরকে সঙ্গে লইয়া রবি–অল–আউন মাসের ষোড়শ দিবসে (শুক্রবার) মদিনায় প্রবেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

হিন্দুর দেবতা, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী : বিশ্বনাথ কবিরাজ, সিদ্ধবকুল, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : চাহিয়া পিযোয়ে [কবিতা], শ্রীম : বামকৃষ্ণ কথামৃত [ধারাবাহিক]।

৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩০৯

রসিক চন্দ্র বসু : বঙ্গভাষার আদিম গদ্য, বিজয় চন্দ্র মজুমদার : উষা [কবিতা], শ্রী অম্বুজাসুন্দরী দাসী : শ্রীক্ষেত্রে

মোহাম্মদ

(পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মদিনার আপামব সাধারণ সকলেই মোহাম্মদেবই শুভাগমনে আনন্দে জয়ধ্বনি কাঁরয়া উঠিল এবং তাঁহাকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা করিল। এখানে তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায় আবম্ভ হইল। মোহাম্মদ মক্কায় বাস কালে স্বহস্তে নিজেব পরিধেয় বস্ত্রের সংস্কার করিতেন এবং এক এক দিন অন্নভাবে অনাহারে থাকিতেন। তাঁহাব জীবনের নূতন অধ্যায়েও এ বিষয়ে অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল না। কিন্তু তিনি পৃথিবীর প্রবলতম সম্রাট অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা অনুশীলন–যোগ্য। আমবা এই বিচিত্র কথা সংক্ষেপে বণনা করিতেছি।

মোহাম্মদ মদিনায় আগমন করিয়া সমস্ত অধিবাসীকে এসলাম ধর্ম্মানুরাগী দেখিয়া তাহাদের ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমেই একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য মন্দির এবং গৃহতাড়িত মোসলমানদের জন্য বাসভবন নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বহস্তে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম মন্দির সৌষ্ঠবশালী ছিল না। মন্দিরের প্রাচীর ইষ্টক ও কর্দ্দমের এবং ছাদ তাল পাত্রের ছিল। মন্দিরের একাংশ নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণের বাস জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই অনাড়ম্বর মন্দিরের প্রত্যেক অনুষ্ঠানও বিনা জাঁকজমকে সম্পাদিত

হইত। মোহাম্মদ কখনও আবরণহীন গৃহ তলে দণ্ডায়মান হইয়া, কখনও বা একটি তাল বৃক্ষে ভর দিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন এবং অনুরক্ত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার প্রাণোন্মাদকর উপদেশে আত্মহারা হইত।

এই সময় মদিনার অধিবাসীগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এক সম্প্রদায়ের নাম আউস, অপর সম্প্রদায়ের নাম খজরাজ। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, তাহারা একে অন্যের রক্তপাত জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। আউস ও খজরাজগণ ধর্ম্ম বিশ্বাসের গুণে আপনাদের চিরায়ত শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া এসলাম ধর্ম্মের পতাকামূলে মিলনের মোহন মন্ত্রে সমবেত হইল। মোহাম্মদ মদিনাবাসীদের সমস্ত বিবাদের নিরসন করিয়া তাহাদিগকে এক সূত্রে সন্নিবদ্ধ করিলেন এবং এই সম্মিলন সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশে তাহাদিগকে এক সাধারণ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এই উপাধির নাম আনসার। আনসাব শব্দের অর্থ সহায়তাকারী। মদিনাবাসীরা সঙ্কটকালে এসলাম ধর্ম্মের সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া এই গৌরবসূচক উপাধি লাভ করিল। যে সকল মক্কাবাসী স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমি এবং স্নেহ মমতার পীঠস্থান গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তাঁহাদিগকে মুহাজেরিণ (নির্ব্বাসিত) উপাধি প্রদত্ত হইল। মোহাম্মদ মুহাজেরিণ ও আনসারদের মধ্যে অচ্ছেদ্যবন্ধন সংস্থাপন জন্য তাহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। মণ্ডলীর বিশ্বাসী মাত্রেই ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত এবং সুখে দুঃখে এক সূত্রে সন্নিবদ্ধ হইল।

মোহাম্মদ নব প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমণ্ডলীকে একমাত্র ধর্ম্মবলে অনুবিদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনার প্রতিষ্ঠা, পাপে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত আরব সমাজের উদ্ধার এবং বহুধা-বিভক্ত আরব-জাতির ঐক্য-বন্ধন মোহাম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কেবল ধর্ম্মবলই যথেষ্ট ছিলনা, রাজশক্তিরও প্রয়োজন ছিল। দুদ্ধর্ষ আরবজাতিকে এসলাম-ধর্ম্ম-মূলক নৈতিক ও সামাজিক অনুশাসনের সম্যক অনুগত করিবার জন্য রাজশক্তির প্রয়োজন ছিল। এজন্য মোহাম্মদ নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমণ্ডলীকে রাজশক্তিসম্পন্ন করিয়া এক প্রজাতন্ত্র রাজ্যের সূত্রপাত করিলেন। কোনস্থানের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক এসলামধর্ম্ম পরিগৃহীত হইলেই সে স্থানকে এই মণ্ডলীর শাসনাধীন করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল। মোহাম্মদ আপনাকে মণ্ডলীর অধিনেতৃ পদে প্রতিস্থাপিত করিলেন। তিনি এইরূপে একাধারে ধর্ম্ম-সংস্থাপক, শাসনকর্ত্তা, অধিনেতা, ব্যবস্থাপক ও বিচারক হইলেন।[১]

(১) নবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া মানবজাতির কল্যাণ সাধন করাই মোহাম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। রাজ্য-লালসা কখনও তাঁহার হৃদয় অধিকার করে নাই, নবধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক বলিয়াই তিনি এক অভিনব সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সংসার-নির্লিপ্ত মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে অতি বিরল। মোহাম্মদের আশ্চর্য্য বৈরাগ্য ছিল। নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ একদা তদীয় প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমার গৃহে গমন করেন। এই সময় ফাতেমা অন্নাভাবে তিনদিন উপবাস-ক্লিষ্টা ছিলেন। প্রিয়তমা কন্যার মুখে এই দুরবস্থার কথা শুনিয়া মোহাম্মদ ধীরচিত্তে বলেন, ফাতেমা দুঃখিত হইওনা ; তোমার পিতাও অদ্য চারিদিন উপবাসক্লিষ্ট। এই বলিয়া তিনি গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণা উপশম করিবার জন্য উদরে যে প্রস্তরখণ্ড বন্ধন করিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করেন। আমরা আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদিন মোহাম্মদ দিবাভাগে মোটা দড়ির জাল বোনা খাটিয়ার উপর বিনা শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলেন। ঐ

এই সময় মদিনা ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ বহুসংখ্যাক ইহুদির বাসভূমি ছিল। এই সকল কনিকা, বনি নজির, করিজা প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল।মোহাম্মদ ইহুদিদিগকে সন্তুষ্ট করিতে উদ্যোগী হইয়া তাহাদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে মোহাম্মদ তাহাদিগকে সচ্ছন্দভাবে স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিলেন এবং ইহুদিরাও মোসলমানদের সঙ্গে কোন প্রকার শত্রুতাচরণ না করিতে অস্বীকার করিল। এসলাম ধর্ম্মের সঙ্গে তাহাদের ধর্ম্মমতের প্রভূত পার্থক্য ছিল। একারণ তাহারা মোহাম্মদের প্রতি কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তাঁহার উদার ব্যবহার নিবন্ধন তাঁহারা প্রকাশ্য তাঁহার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাদের অন্তরে অন্তরে বিদ্বেষভাব পরিপুষ্ট হইতে লাগিল।

মদিনাবাসীর প্রাণগত আনুকূল্যনিবন্ধন এসলাম ধর্ম্মের মূল সুদৃঢ় হইয়া উঠিল এবং মোহাম্মদ জ্বলন্ত উৎসাহে আরবদেশের সর্ব্বত্র একেশ্বরবাদের মহিমা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রচার ফলে বহুস্থানের অসংখ্য নরনারী পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একেশ্বরবাদের দীক্ষিত হইয়া মদিনার ধর্ম্মমণ্ডলীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ইহাতে প্রত্যহ মোহাম্মদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একারণ কোরেশদের ক্ষোভের সীমা রহিল না। তাহারা মোহাম্মদকে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। মদিনাবাসী ইহুদিদের এসলাম ধর্ম্ম-বিদ্বেষের কথা মক্কায় অপরিজ্ঞাত ছিল না। অনেকেশ্বরবাদী কোরেশরা একমেবাদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসক মোহাম্মদের ধ্বংস কামনায় ষড়যন্ত্র করিবার জন্য একেশ্বরবাদী ইহুদিদের নিকট দূত প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলে। একারণ মোহাম্মদ আশ্রয়দাতা শিষ্যবৃন্দকে রক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন।

কিছুতেই কোরেশদের উৎপীড়নের নিবৃত্তি না দেখিয়া, মোহাম্মদ বুঝিতে পারিলেন যে, অস্ত্রবলের প্রয়োগ ব্যতীত দেশব্যাপী শত্রুতাচরণের মূলোচ্ছেদ করিবার অন্য উপায় নাই এবং তরবারি হস্তে অগ্রসর না হইলে দেশ মধ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে। এজন্য তিনি কোরেশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাই আবশ্যক বলিয়া বোধ করিলেন এবং তদনুরূপ প্রত্যাদেশও প্রাপ্ত হইলেন।[১] ইহার পর মোহাম্মদ যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কোরেশরাও উদাসীন রহিলেন না, দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। এই উদ্যোগ

সকল মোটা দড়ির স্পর্শে তাঁহাব কোমল অঙ্গে রক্তাভ দাগ পড়িয়াছিল। ওমর তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন না। মোহাম্মদ জাগ্রত হইয়া তাঁহার অশ্রুজল মোচনের কারণ জিজ্ঞাসু হন, তিনি ওমরের কথা শুনিয়া বলেন, "ইহকালের সুখ আমাব লক্ষ্য নহে, আমি পরলোকের সম্পদপ্রার্থী, তুমি সে ইচ্ছা কর না?"

(১) আমবা এই প্রসঙ্গে গিরিশ বাবুর গ্রন্থাবলী হইতে কোরাণের দুইটি বচন উদ্ধৃত করিতেছি। "তুমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, যেহেতু তাহারা অত্যাচার করিতেছে, ঈশ্বর সাহায্য করিতে সক্ষম এবং যাবৎ দৌরাত্ম থাকে তাবৎ যুদ্ধ করিতে থাক।" "স্বর্গলোক তরবারির নিম্নে।" মোহাম্মদ এই সকল প্রত্যাদেশ এই সময়েই লাভ করিয়াছিলেন।

পর্ব্বকালে মোহাম্মদ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহকারী একদল কোরেশ-বণিককে আক্রমণ কারবার জন্য সসৈন্যে বদর নামক স্থানে গমন করিলেন।(২)

দ্বিতীয় হিজরীর (৬২৩ খৃঃ) রমজান মাসের দ্বাদশ দিবসে উভয় দল পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইল। কোরেশ বণিকেরা শত্রুর আগমন সংবাদ অবগত হইয়া মক্কায় সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে একসহস্র বীরপুরুষ তাহাদের সাহায্যার্থে বদরে আসিয়া উপনীত হইল। মোহাম্মদের সঙ্গে কেবল মাত্র তিনশত পাঁচ জন যোদ্ধা ছিল। কিন্তু তিনি শত্রুর সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন ভীত হইলেন না, ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোরেশ সৈন্য মোসলমানের প্রবল পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। মোহাম্মদ জয়শ্রী লাভ করিয়া সপ্ততিজন বন্দীসহ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।(১)

(২) শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবুর পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, বদরের যুদ্ধের পূর্ব্বে মোসলমানগণ সাত বার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু এই সময় যুদ্ধ সামান্য ছিল। বিদেশগামী কোরেশ-বণিকদিগকে আক্রমণ করাই একল অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম অভিযানে যুদ্ধ হইয়াছিল না, মোসলমানগণ কোরেশদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া মদিনায় ফিরিয়া আইসে। দ্বিতীয় অভিযানে মোসলমানগণ কোরেশ-বণিকদের সম্মুখবর্ত্তী হইলে তাহারা ভয় পাইয়া পলায়ন করে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বার মোসলমানগণ কোরেশ-বণিকদের আগমনসংবাদ পাইয়া মদিনা হইতে বহির্গত হয়। কিন্তু প্রতিবারেই তাহাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বে কোরেশরা চলিয়া যায় এবং তাহারা নিরাশ হইয়া মদিনায় ফিরিয়া আইসে। একজন মক্কাবাসী মদিনার প্রান্ত হইতে উষ্ট্র সকল অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়ায় ষষ্ঠ অভিযান করা হয়। এবারও মোসলমানদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কোরেশরা চলিয়া গিয়াছিল। সপ্তম অভিযানে বতনন খেলা নামক স্থানে মোসলমানদের সঙ্গে একদল কোরেশ-বণিকদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কোরেশরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয় এবং মোসলমানগণ তাহাদের সমস্ত পণ্য দ্রব্য হস্তগত করে। এই যুদ্ধ রজত মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। তৎকালের আরব সমাজে রজত মাসে যুদ্ধ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এজন্য রজত মাসে যুদ্ধ হওয়াতে মোহাম্মদের বহু নিন্দাবাদ হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার সম্মতি ছিল না। যুদ্ধ-কর্ত্তৃগণ মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন। তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিঞ্চিৎমাত্রও গ্রহণ করিয়াছিলেন না।

(১) অইরভিং প্রভৃতি খৃষ্টান-লেখকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কোরেশ-বণিকদের ধন লুণ্ঠনের জন্যই মোহাম্মদ বদরের যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমীর আলী প্রভৃতি মোসলমান লেখকগণের মতে, মোসলমানদিগকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য মদিনা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হওয়াতেই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আমরা গিরিশ বাবুর গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, মোহাম্মদের সমসময়ে একদল মদিনাবাসীর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অর্থ লোভেই বদরের যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কতিপয় মোসলমান যুদ্ধ করিবার জন্য মোহাম্মদের সহিত মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছি, কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়াই প্রাগুক্ত বিশ্বাসেরবশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ না করিয়াই মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। কয়স নামক একজন বীরপুরুষ যুদ্ধ করিবার জন্য মোহাম্মদের সঙ্গে বহির্গত হয়। মোহাম্মদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কিজন্য যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।" কয়স উত্তর করে, মক্কার বণিকদের পণ্যদ্রব্যই আমাকে যুদ্ধে ব্রতী করিয়াছে। কয়স এসলাম ধর্ম বিশ্বাসী ছিল না ; এজন্য মোহাম্মদ তাহাকে ফিরাইয়া দেন। মোসলমানগণ এসলামধর্ম বিরোধী কোরেশদিগকে দলন করিবার জন্যই বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এরূপ সমসাময়িক প্রমাণেরও অভাব নাই। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে মোহাম্মদ সহচর ..গণের জন্য জিজ্ঞাসা করেন।আবুবেকর তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "কোরেশ-দলপতিরা কখনও এসলামধর্ম গ্রহণ করিবে না এবং সর্ব্বদা অন্যের ধর্মাচরণে ব্যাঘাত জন্মাইবে। একারণ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই শ্রেয়।"

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই কোরেশ বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন। মোসলমানগণ বন্দীদের সঙ্গে যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছিল। তাহারা পদব্রজে চলিয়া বন্দীদের কষ্ট নিবারণের জন্য অশ্ব দিত, নিজেরা খর্জ্জুর দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিয়া তাহাদের তৃপ্তির জন্য রুটী সংগ্রহ করিত। মোহাম্মদ বদরের যুদ্ধে অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক কোরেশ–সৈন্য পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহাতে মোসলমানদের ধর্ম্মবিশ্বাস সুগভীর হইল। ইসলাম ধর্ম্ম ও তাহার প্রতিষ্ঠা ঈশ্বরেরই বিধান বলিয়া তাহাদের সুদৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তাহারা ধর্ম্মের জন্য জীবন পণ করিল। ফলতঃ মোসলমানেরা বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া সমধিক দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল।

কোরেশরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জ্বলিতে লাগিল এবং অপমানের প্রতিশোধ লইবার কল্পনায দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য গুপ্তভাবে মদিনায় গমন করিয়া মোসলমানদিগকে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। মোসলমান বীরপুরুষগণ কোরেশদের আগমনের সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া রণসজ্জা পরিধান পূর্ব্বক বহিগত হইল। কোরেশ–সৈন্য তাহাদিগকে দর্শন করিয়া ভয় বিহ্বল–চিত্তে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। মোসলমানগণ পলায়নমান সৈন্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল[১]।

কোরেশরা বার বার দুই বার এই ভাবে পরাজিত লইযা কিছু কালের জন্য শত্রুতাচারণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীরব হইল। বদরের যুদ্ধে মোহাম্মদ জয়শ্রী লাভ করাতে এসলাম বিদ্বেষী ইহুদিদিগেব ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। তাহারা নানা প্রকারে মোসলমানদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা মোহাম্মদ এবং এসলাম ধর্ম্মকে লোকের নিকট অবজ্ঞাত কবিবার অভিপ্রায়ে বিদ্রুপাত্মক কবিতার প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। কবি নামক এক জন ইহুদি মক্কা নগরে গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত কোরেশ–বীরদের শৌর্য্য বীর্য্যের কাহিনী গৃহে গৃহে প্রচার কারয়া তাহাদের পরিবারবগের শোকভারাবনত হৃদয় উত্তেজিত করিয়া বিশেষভাবে পরিপুষ্ট কবিতে লাগিল। এক দিন কতিপয় কনিকা বংশীয় ইহুদী ইন্দ্রিয়–পরবশ হইয়া একজন মোসলমান–কিশোরীর লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত করিল। মোহাম্মদ ইহাতে উত্যক্ত হইয়া তাহাদিগকে এসলাম ধর্ম্মগ্রহণ কব্বিতে অথবা অঙ্গনা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাহাবা মোহাম্মদেব আদেশ অবহেলা করিয়া আপনাদের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মোহাম্মদ সসৈন্যে তাহাদের দুগ পবিবেষ্টন করিলেন। পঞ্চদশ

আবুবেকব মোহাম্মদেব একান্ত অন্তবঙ্গ ছিলেন মোহাম্মদেব কোন মনোভাব আবুবিকাবেব নিকট লুক্কাযত থাকিবাব সম্ভাবনা ছিল না।।

[১] এই অনুকবণকালে একদা শিবিব হইতে কিযদ্দুবে একাকী বৃক্ষেব তলে শযন কবিযাছিলেন। ডাবথাব নামক একজন অমিত বলবান দুৰ্দ্দান্ত কোবেশ তাহাকে তদবস্থায আক্রমণ কবে এবং তাহাকে বধ কবিবাব জন্য তববাবি নিকাশিত কবিযা বলে, 'হে-মোহাম্মদ, এখন তোমাকে কে বক্ষা কাববে?' কিন্তু মোহাম্মদ কিঞ্চিৎমাত্র ভীত না হইযা বজ্রকঠোব স্ববে উত্তব কবেন 'ঈশ্বব'। এই উত্তবে ডাবথাবেব হৃদয কম্পিত হইয়া উঠিল, তববাবি তাহাব মুষ্ঠ হইতে খসিয়া পড়িল। মোহাম্মদ বিদ্যুৎবেগে সে তববাবি তুলিযা লইযা তাহাকে জিজ্ঞাসা কবেন, 'এখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে?' ডাবথাব ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'আমাব আব কেহ নাই, তুমি আমাকে বক্ষা কব।' মোহাম্মদ তাঁহাকে ক্ষমা কবিলেন। তাহাব তববারি তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। ডাবথাব ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

অহোরাত্রি ব্যাপী অবরোধের পর তাহারা তাঁহার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিল। তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন ; তাহারা (সাতশত) স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র মোসলমানদের হস্তে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিরিয়া রাজ্যে প্রস্থান করিল।

কোরেশরা মোসলমানদের হস্তে দুইবার পরাজিত হইয়া কিছু কালের জন্য নীরব হইয়াছিল ; কিন্তু মোহাম্মদকে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিল না। তৃতীয় হিজিরীতে তাহারা পুনরায় মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তিন সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মদিনার অভিমুখে ধাবিত হইল। এই বিপুল বাহিনী দশম দিনে মদিনার অদূরবর্ত্তী (৩ মাইল) ওহদ পর্ব্বত শৃঙ্গে আসিয়া পৌছিল। মোহাম্মদ এক সহস্র মোসলমান সৈন্য লইয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে আগমন করিলেন। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোসলমানগণ শত্রুসৈন্যের অস্ত্রাঘাতে দলে দলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। স্বয়ং মোহাম্মদ অত্যন্ত আঘাত পাইলেন। বিজয়শ্রী কোরেশদের অঙ্কশায়িনী হইলেন। কিন্তু এই বিজয়শ্রী লাভ করিতে তাহাদের বহু সংখ্যাক বীরপুরুষ শত্রুহস্তে প্রান পরিত্যাগ করে। ইহাতে কোরেশ সৈন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এজন্য তাহারা জয়লাভ সত্ত্বেও মদিনা আক্রমণ না করিয়াই মক্কায় প্রস্থান করিল।[১]

কোরেশরা মক্কায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মদিনা আক্রমণ না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য অনুশোচনা করিতে আরম্ভ করিল। এজন্য তাহারা অচিরে যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হইল। এই সংবাদ মদিনায় পৌঁহুছিলে মোহাম্মদ মোসলমানের প্রতাপ প্রদর্শন করিয়া শত্রুকুলের মনে ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে মনন করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সসৈন্য মদিনা পরিত্যাগ করিয়া জমরাল আসাদ নামক স্থানে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। কোরেশরা এই সংবাদ অবগত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল এবং সমস্ত যুদ্ধায়োজন পরিত্যাগ করিল। মোহাম্মদ সসৈন্যে মদিনায় ফিরিয়া গেলেন।

ইহার পর (হিজিরী চতুর্থ অব্দে) মোহাম্মদ ইহুদিদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন।[১] আবুরা নামক একজন আরব অধিনেতা মদিনা হইতে চারি দিনের পথ দূরবর্ত্তী নাজেদ নামক স্থানে

(১) সাত শত ইহুদির মদিনা পরিত্যাগের পর এবং উদের যুদ্ধের পূর্ব্বে মোসলমানগণ তিনবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। আমরা গিরিশ বাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই অভিযান বিবরণ প্রদান করিতেছি। কর করতোলে কদর নামক স্থানের কতিপয় লোক মোহাম্মদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া দুই শত মোসলমান সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোন শত্রু না দেখিয়া তাহারা ফীরয়া আইসে। মোহাম্মদ নিজে এই সৈন্যদলের সঙ্গে ছিলেন। সালবা ও মহাতেল কুলের কতিপয় লোক দলবদ্ধ হইয়া মদিনার প্রান্তে তস্করবৃত্তি আরম্ভ করে। ইহাতে মোহাম্মদ তাহাদের বিরুদ্ধে সসৈন্য যাত্রা করেন। এবারও বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে মোসলমান সৈন্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল না। এই অভিযানের ফলে জব্বার নামক একব্যক্তি এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। তুরস্কগামী একদল কোরেশ–বণিককে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যেই তৃতীয় অভিযান হইয়াছিল। এজন্য একশত পলায়িত বণিকদের পরিত্যক্ত অর্থাদি হস্তগত করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করে।

(১) চতুর্থ হিজিরীতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র বারণ করিবার পূর্ব্বে তলহা ও সলনা নামক দুইজন আরব অধিনেতা দলবদ্ধ হইয়া মদিনার পাশ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ লুণ্ঠন করিতে উদ্যত হওয়ায় মোসলমান সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করে। শত্রুগণ তাহাদিগকে দেখিয়া ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পলায়ন করে। মোসলমান সৈন্য তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিয়া মদিনায় ফিরিয়া যায়।

ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য মোসলমানদিগকে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে মোহাম্মদ সত্তর জন মোসলমানকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তত্রত্য অধিবাসীরা প্রেরিত মোসলমানদিগকে আবুরার অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করিল। সমস্ত মোসলমান নিহত হইল। কেবলমাত্র আমরু প্রাণ রক্ষা করিয়া মদিনার অভিমুখে যাত্রা করিলনে। আমরু পথিমধ্যে দুইজন নাজেদ অধিবাসীকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে তদবস্থাতেই বধ করিলেন। অতঃপর তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মোহাম্মদের নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। মহাপুরুষ মোসলমানদের শোচনীয় মৃত্যুতে একান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। পথিমধ্যে নিহত দুই ব্যক্তি তাঁহার নিকট অভয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। এজন্য তিনি তাহাদের হত্যার সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমরুকে তাহাদের হত্যার জন্য ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ করিলেন। নাজেদের অধিবাসীরা বনি নজিরবংশীয় ইহুদিদের সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। মোহাম্মদ ইহাদের অধিনেতার যোগে প্রাগুক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে তাহার গৃহে গমন করিলেন। বনি নজির বংশীয়গণ আন্তরিক বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। মোহাম্মদ এই বিষয় গোপনে অবগত হইয়া তাহাদের গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইলেন। তিনি গৃহে তাহাদিগকে এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ অথবা মদিনা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা কিয়ৎকাল প্রতিকূলাচরণ করিল। কিন্তু অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া অস্ত্র শস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া মদিনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেল।

বনিনজির বংশীয় ইহুদিদের নির্ব্বাসনের অল্প দিন পরেই অর্থাৎ পঞ্চম হিজিরীতে মোহাম্মদকে আবার অস্ত্রধারণ করিতে হইল।[১] লোহিত সাগরের অনতিদূরে মস্তলক বংশীয়দের বাস ছিল। হারেশ নামক একজন বীর পুরুষ তাহাদের অধিপতি ছিল। মস্তলবংশীয়েরা কোরেশদের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত এবং তাহাদের ন্যায় পৌত্তলিক ছিল। তাহারা পঞ্চম হিজিরীতে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত হয়। মোহাম্মদ এই সংবাদ অবগত হইযা সসৈন্যে তাহাদের আবাসভূমিতে উপনীত হইলেন। মস্তলকেরা মোসলমান সৈন্যের গতিরোধ জন্য আগমন করিল। উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইলে ওমর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তোমাদের জীবন ও ধর্ম্মসম্পত্তি রক্ষা পাইবে।" তাহারা অস্বীকার করিল। তখন মোসলমান সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের প্রবল আক্রমনে মস্তলকেরা পরাজিত হইল। মোসলমান সৈন্য বিজয়োল্লাসে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

(১) বনি নজির বংশীয় ইহুদীদের নির্ব্বাসনেব পবে এবং এই যুদ্ধের পূর্ব্বে মোসলমান সৈন্য দুইবাব যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। আল্‌মার ওসালন কুলের লোকেবা মোহাম্মদের বিকদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করিযাছিল। একারণ তাহাদিগকে দমন কবিতে সৈন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তাহারা মোসলমান সৈন্যের আগমণে লুক্কায়িত হয়। একারণ কোন যুদ্ধ হইয়াছিল না। ইহার অব্যবহিত পরেই দোমতল জন্ধন নামক স্থানে মোহাম্মদ সসৈন্যে গমন কবেন। এই স্থানে খোর্ম্মা ও যবের আমদানী হইত। এই স্থানের কতকগুলি দুষ্টলোক দলবদ্ধ হইয়া বিদেশীয়দের প্রতি অত্যাচাব করিত। মোহাম্মদ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্যই সসৈন্যে অভিযান করেন। কিন্তু শত্রুকুল তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিযাই পলায়ন কবে; মোসলমান সৈন্য বিনা যুদ্ধে মদিনায় ফিরিয়া যায়।

মোহাম্মদ মস্তকলকের যুদ্ধ হইতে মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই অভিনব বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনের অল্পদিন পরেই দশ সহস্র কোরেশ সৈন্য মদিনা বিধ্বস্ত করিবার জন্য মক্কা হইতে বহির্গত হইল। করিজাবংশীয় ইহুদীরা তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মোহাম্মদ শত্রুর গতিরোধ জন্য তিন সহস্র সৈন্য সহ মদিনার অদূরবর্ত্তী যানা পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইলেন। শত্রুসৈন্য আসিয়া মোসলমান সৈন্যের সম্মুখে শিবির সংস্থাপন করিল। তাহারা ভীত হইয়া পড়িল। যুদ্ধ স্থান পরিত্যাগের কল্পনা তাহাদের মনে ইত্থিত হইল। তাহাদের ঈদৃশ মানসিক অবস্থার সময় দুরন্ত ঝটিকা উপস্থিত হইয়া তাহাদের সমস্ত শিবির বিশৃঙ্খল ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। তাহারা এই ঘটনায় ভীতি বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিল। যানা পর্ব্বতের পাদদেশে মোসলমান সৈন্যকে এই ঝটিকায় উনত্রিশ দিন অবস্থান করিত হইয়াছিল। এই সময় মধ্যে দুরন্ত শীত এবং খাদ্যাভাব নিবন্ধন তাহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। মোহাম্মদকে এই যুদ্ধে যেরূপ কষ্টভোগ ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, অন্য কোন যুদ্ধে সেরূপ হয় নাই।

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই করিজা ইহুদিদের বাসস্থান অবরোধ করিলেন। তাহারা পঞ্চবিংশতি দিন ব্যাপী অববোধের পর আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক জীবন ভিক্ষা করিয়া নির্বাসন দণ্ড প্রার্থনা করিল। মোহাম্মদ তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না ; কিন্তু তাহারা নিরাশ না হইয়া পুনঃ পুনঃ কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। সাদ নামক মোহাম্মদের একজন প্রধান শিষ্য করিজা ইহুদিদের বন্ধু বলিয়া খ্যাত ছিলেন। মোহাম্মদ তাঁহার হস্তে তাহাদের বিচার ভাব অর্পণ করিলেন। ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু সাদের নৃশংস বিচারে পুরুষদিগের প্রাণদণ্ড এবং রমণী ও বালকদের দাসত্ব বিধান হইল। সাদ প্রাগুক্ত যুদ্ধে অত্যন্ত আহত হন, এ জন্যই তিনি করিজাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাদৃশ কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

করিজা ইহুদিদের নির্ব্বাসনের পর মোহাম্মদ এক বার জন্মভূমি মক্কা দর্শন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন।[১] তিনি পুণ্যমাসে (জেলকদ মাসের প্রথম সোমবার) ছয় শত মোসলমান সৈন্য সমভিব্যাহারে নিরস্ত্র হইয়া মক্কা যাত্রা করিলেন। কোরেশরা এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিল। মোহাম্মদ তাহাদের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কোরেশরা তাঁহার দূতকে অবজ্ঞা করিয়া ফিরাইয়া দিল। নির্ব্বিবাদে

(১) কবিজা ইহুদিদেব হত্যাব পব এবং মোহাম্মদেব মক্কা যাত্রাব পূর্ব্বে মোসলমান সৈন্য পাঁচটা ক্ষুদ্র অভিযান কবিযাছিল। আমবা গিবিশ বাবুব গ্রন্থ অবলম্বন কবিযা এই সকল অভিযানেব সংক্ষিপ্ত বিববণ প্রদান কবিতেছি।(১) [২] সযফলকাব অভিযান, কোন যুদ্ধ হইযা ছিল না। (২) [৩] মদিনাব নিকটবর্ত্তী কোন–স্থানেব আধবাসীবা দুইজন মোসলমানকে হত্যা কবিযাছিল। মোহাম্মদ তাহাদিগকে প্রতিফল দিবাব জন্য সৈন্য প্রেবণ কবেন। তাহাদেব আগমনে অধিবাসীবা পলাযন কবে। মোসলমান সৈন্য বিনা যুদ্ধে ফিবিযা যায়। (৪) মোহাম্মদ ফদকের সাদ বংশীযদেব বিকদ্ধে মহাবীব আলীকে প্রেবণ কবেন। আলী যুদ্ধে জয়লাভ কবিযা মদিনায প্রত্যাবৃত্ত হন। (৫) কতিপয তস্কব মোহাম্মদেব দুইটী উষ্ট্র অপহবণ কবায মদিনাব বহির্ভাগে একটী যুদ্ধ হয। তস্কাবেবা মোসলমান সৈন্যেব অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে না পাবিযা পলায়ন করে।

মক্কা দশন করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করাই মোহাম্মদের ইচ্ছা ছিল। এ কারণ তিনি পুনর্ব্বার দূত প্রেরণ করিলেন। বহু আন্দোলনের পর দশ বৎসরের জন্য সন্ধি স্থাপিত হইল।. মোসলমান এবং কোরেশ কেহই দশবৎসরের জন্য কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না, প্রতিশ্রুত ছিল। মোহাম্মদ মক্কায় প্রবেশ না করিয়াই মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং কোরেশরা পর বৎসর তাঁহাকে সশিষ্যে কোষবদ্ধ তরবারি লইয়া তিন দিন মক্কায় যাপন করিতে দিতে অঙ্গীকার করিল। মোসলমানগণ মক্কায় ফিরিয়া আসিল। এই সন্ধির নাম হোদয়বিয়ার সন্ধি।

মোহাম্মদ মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া খয়বারের ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। খয়বারের ইহুদিরা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিল। তাহারা মোসলমানদের উচ্ছেদ সাধনার্থ যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিল। মোহাম্মদ এ জন্যই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। মোসলমানগণ খয়বার অধিকার করিল। ইহার পর মোহাম্মদ ফদক এবং ওয়াদি উল করার ইহুদিদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (৭ম হিজিরী।)

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হোদয়বিয়ার সন্ধির নির্দ্দিষ্ট সময় মত দুই সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে মক্কা গমন করিলেন। কোরেশরা তাঁহার আগমনে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩০৯

শ্রী নিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ,

চোখের বালি*

চোখের বালি উপন্যাস এতদিনে সমাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এইক্ষণ সে সম্বন্ধে কোনরূপ অভিমত ব্যক্ত করিলে, বোধহয়, নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। গ্রন্থোক্ত নায়ক নায়িকাগণের মধ্যে মহেন্দ্র, বিহারীলাল এবং আশালতা ও বিনোদিনীই সমালোচ্য গ্রন্থের অনেক স্থান অধিকার করিয়াছে। অপিচ মহেন্দ্র ও বিহারীলালের সহিত বিনোদিনীর প্রেম, বিরহ, পূর্ব্বরাগ ও মিলন, বিচ্ছেদ প্রভৃতি প্রেমবৈচিত্র্য, এই অভিনব কৃষ্ণলীলার বর্ণনীয় বিষয়। আমরা জানি, যেখানে রাধাকৃষ্ণ সেখানেই বৃন্দা দূতী। কবিবব ভারতচন্দ্র মালিনী মাসীকেও বোন্‌পো'র দৌত্যে অভিনিযুক্ত করিয়াছিলেন ; কিন্তু গ্রন্থাকারের অভূতপূর্ব্ব কল্পনা তাহা অপেক্ষাও এক ডিগ্রি উপরে উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর প্রতি বিনোদিনীর উক্তিই তাহার জলন্ত প্রমাণ।

"সে কথা ঠিক পিসিমা,—কেহ কাহাকেও জানে না। নিজের মনও কি সবাই জানে? তুমি কি কখন তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মাযাবিনীকে দিযা তোমার ছেলের মন ভুলাতে চাও নাই? একবার ঠাহর করিয়া দেখ দেখি?"

* চোখেব বালি, উপন্যাস—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব প্রণীত।

রাজলক্ষ্মী অগ্নির মত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন—কহিলেন—"হতভাগিনি, ছেলের সম্বন্ধে মা'র নামে এমন অপবাদ দিতে পারিস? তোর জিব্ খসিয়া পড়িবে না?"

আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি ইহা বিনোদিনীর স্বকপোল-কল্পিত বাক্যই হয়, তবে এরূপ বেফাস কথাটা বিনোদিনীর মুখ দিয়া বাহির না করিলে কি ভাল হইত না? বলিহারি কল্পনা!

বিনোদিনী যুবতী ও বিধবা। রাজলক্ষ্মীর সাদর আহ্বানে আপ্যায়িত হইয়া তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিতেছেন। মহেন্দ্রের প্রণয়িনী আশালতার সহিত তাহার সখীত্ব ভাবটুকু নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্তু এদিকে মহেন্দ্রকে প্রেমের ফাঁদ ফেলিবার জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন। সুতরাং মহেন্দ্রের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া বিনোদিনী মনে মনে গভীর দুঃখ অনুভব করেন।

দেখিতে দেখিতে বিনোদিনীর অশান্তি উপস্থিত হইল।

"মহেন্দ্রকে প্রতিদিন সে নানা পাশে ও নানা বাণে বিদ্ধ করিতেছিল, সে কাজ গিয়া বিনোদিনী যেন এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। * * *

কিন্তু যে কারণেই হোক মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষদিগ্ধ অগ্নিবাণ জগতে কোথায় মোচন করিবে!"

এইরূপে প্রেমের লুকোচুরি খেলা কিছুদিন চলিল। নদীতে জোয়ার ভাটা আছে, প্রেম তরঙ্গিণীতেও না থাকিবে কেন? দেখিতে দেখিতে মহেন্দ্রের প্রতি বিনোদিনীর অনুরাগ স্রোতে ভাটা দেখা দিল। কিন্তু আর এক দিকে কোটালের বাণে জোয়ারের প্রবল তরঙ্গ উঠিল। জানি না কি কারণে বিহারীর প্রতি বিনোদিনীব চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সে আসক্তি কতদূর প্রবল, উল্লিখিত বণনাটা এস্থলে পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

"বিনোদিনী তাহার পশ্চাতে গিয়া গিয়া কহিল, বলিহারী ঠাকুরপো, আমাকে কি তোমার কোন কথা বলিবার নাই? যদি তিরস্কাবের কিছু থাকে তবে তিরস্কার কর।"

"বিহারী যখন কোনও উত্তর না করিয়া চলিতে লাগিল, বিনোদিনী সম্মুখে আসিয়া দুই হাতে তাহার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল। বিহারী অপরিসীম ঘৃণার সহিত তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সেই আঘাতে বিনোদিনী যে পড়িয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।"

মদনাবেশে-বিহ্বলা-বিলাসিনীগণ কুরঙ্গ-লাঞ্ছন নেত্রে তরঙ্গ তুলিয়া নয়নবাণে নায়কের হৃদয় বিদ্ধ করেন; তাঁহাদের মধ্যেও রমণী জনোচিত শালীনতার বিরোধী এরূপ প্রগল্‌ভতা দৃষ্ট হয় না।

বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া, মহেন্দ্র ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে বিনোদিনীর ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি অনায়াসে মহেন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত। এখন বিহারীই তাঁহার একমাত্র প্রণয়ের আরাধ্য দেবতা! বিহারীকে প্রেমের বাগুরায় বদ্ধ করিবার জন্য বিনোদিনী এখন ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু বিহারী ভ্রমেও একবার তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহেন না। তথাপি বিহারীর জন্য বিনোদিনী এবং বিনোদিনীর জন্য মহেন্দ্র উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আশালতা ফলবতী হইল না। সুতরাং প্রেমিক প্রেমিকা যুগল (মহেন্দ্র ও বিনোদিনী) অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণায় দিনে দিনে দগ্ধ

হইতে লাগিলেন। এই নিরাশ প্রেমকাহিনী হা হুতাশ দীর্ঘনিশ্বাসে পর্য্যবসিত হয় নাই ;— ঘরকন্নারূপ আবর্জ্জনার সঙ্গে মিশিয়া, ঘৃষ্ট ঘর্ষণ, পৃষ্ঠ পেশণ অথবা চর্ব্বিত চর্ব্বনরূপ প্রক্রিয়া প্রভাবে মেদস্ফীত রোগীর ন্যায় অযথা গ্রন্থ কলেবর পরিপুষ্ট হইয়াছে।

সমালোচ্য গ্রন্থের নায়িকাগণের মধ্যে আশালতার চিত্রই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিতে হইবে। আশালতা যেমন সাধ্বী সতী, তেমনি পতিপ্রাণা। পতিই তাঁহার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান ও উপাস্য দেবতা। আশা একদিন অভিমান করিয়া স্বামীকে পত্র লিখিতেছেন ;—

"তুমি আমার চিঠির উত্তর দিলে না? ভালই করিয়াছ!* * * ভক্ত যখন তাহার দেবতাকে ডাকে, তিনি কি মুখের কথায় তাহার উত্তর দেন? দুখিনীর .....চরণতলে বোধ করি স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু ভক্তের পূজা লইতে গিয়া শিবের যদি তপোভঙ্গ হয়, তবে তাহাতে রাগ করিয়ো না হৃদয়-দেব ! তুমি বর দাও বা না দাও, চোখ মেলিয়া চাও বা না চাও, জানিতে পার বা না পার, পূজা না দিয়া ভক্তের আর গতি নাই !"

এ অভিমানটুকুও ভক্তিমাখা। বস্তুতঃ মহেন্দ্রের ন্যায় কাপুরুষ লম্পট স্বামীর প্রতি সমস্ত হৃদয় মন সমপণ করিয়া যিনি ভক্তিভাবে পূজা করিতে পারেন,—স্বামী পরদার-নিরত হইয়াছে জানিয়াও মান নাই; অভিমান নাই, অটল ভক্তি ও অবিচলিত ভালবাসা উপহার দিতে পারেন, তিনি আদর্শ হিন্দু ললনার লীলাভূমি ভারতে বঙ্গগৃহলক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যা, সন্দেহ নাই। বস্ততঃ বর্ত্তমান স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য আশালতার চিত্র আদশ স্থানীয় !

বিহারীলালের চরিত্রও অতি সুন্দর বর্ণে অনুরঞ্জিত হইযাছে। বিহারী মহেন্দ্রের বাল্যসখা, অকপট বন্ধু ও পবামর্শদাতা মন্ত্রী। কিন্তু বৈশাখের প্রবল ঝড়ে শিমুল তুলা যেমন দিগ্‌দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হয়, বিনোদিনীর অবৈধ প্রেমের প্রলোভনে বিহারীর প্রতি মহেন্দ্রের ভালবাসা সেইরূপ অন্তর্হিত হইয়াছিল। বিনোদিনীর প্রেমে বিহাবীকে প্রতিযোগী মনে কবিয়া মহেন্দ্র তাহাকে বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। অযথা বাক্য বাণে জর্জ্জরিত করিতে অথবা কাপুরুষের ন্যায় তাঁহাব প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু বিহারী সেস্থলে প্রতিযোগিতা করা দূরে থাকুক, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই বিনোদিনী হইতে শত হস্ত দূরে রহিতেন। অথচ মহেন্দ্রের দুর্ব্ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়াও তাঁহার প্রতি অকপট বন্ধুত্ব হৃদয়ে পোষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এরূপ সখ্যতাও নিতান্ত অনায়াসলভ্য নহে। এদিকে রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার প্রতি বিহারীর মাতৃভাবে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অনন্যসাধারণ।

বিহারীর চরিত্র যেমন পবিত্র তেমনি সরলতাময়। তিনি বিনোদিনীব সঙ্গে কোন কালেই সহানুভূতি দেখান নাই। তাহার সুখ দুঃখের পথে আসিয়া দাঁড়ান নাই। কিন্তু বিনোদিনী যখন তাঁহাব জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, তখন বিনোদিনীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহার দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি সেচনের জন্যই বিহারী তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। এরূপ উদারতাও মহত্ত্বের পরিচয়। তথাপি বিহারীর চরিত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। আশালতার প্রতি একটু ভালবাসার উচ্ছ্বাস—যাহা বিনোদিনীর মুখে ব্যক্ত হইয়াছে, গ্রন্থ পাঠেও তাহা

নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। পরস্ত্রীর প্রতি এরূপ ভালবাসা অবৈধ, সন্দেহ নাই, এবং তাহা দাম্পত্য ধর্ম্মেরও বিরোধী। বলিতে গেলে, এইটুকুই বিহারীর চরিত্রের দুর্ব্বলতা।

বিনোদিনী ষোড়শী ও বিদূষী অথচ রসিকা। সুরুচি-সম্পন্ন গ্রন্থকার অভিসারিকাবেশে তাহার চিত্রটি কিরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, পাঠক তৎপ্রতি লক্ষ্য করুন।

"বিনোদিনী। আজ রাত্রে তবে আমি এইখানেই থাকি।

বিহারী। না, এত বিশ্বাস আমার নিজের প'রে নাই!"

বিনোদিনী বিহারীর এই স্তব্ধ বিহ্বল ভাব অনুভব করিয়া তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিল, এবং চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল, "জীবনসর্ব্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে ভালবাস। * * * মরণ পর্য্যন্ত মনে রাখিবার মত আমাকে একটা কিছু দাও!"—বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া তাহার ওষ্ঠাধর বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। মুহূর্ত্ত কালের জন্য দুইজনে নিশ্চল এবং সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।"

যে মকরকেতন নিবাভ-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় ধ্যানমগ্ন মহাদেবের যোগভঙ্গ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, বিনোদিনী অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেও মীনকেতুর দয়া হইল না। কারণ কিছুতেই বিহারীর মন টলিল না। হায! বিনোদিনীর প্রেমেব স্বপ্ন আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল!

ধর্ম্মপরিণীতা পত্নী স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা হইলে অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া এরূপ প্রেম যাজ্ঞা করা স্ত্রীস্বাধীনতার লীলাভূমি ইউরোপে ক্বচিৎ কুত্র সম্ভবপর হইলেও, তাহা এদেশে আশা করা যায় না। তাহাতে উপনায়ক নায়িকার মধ্যে—যেখানে প্রেমের স্বত্ব সাব্যস্ত হয় নাই, সেস্থলে প্রেমলীলার এরূপ অপূর্ব্ব অভিনয় (!)—লজ্জাহীনতার ঘৃণিত চিত্র আজ পর্য্যন্ত কোন উপন্যাস-লেখক কল্পনা করিতে পারেন নাই। বলি, ইহাই কি এই উপন্যাসের নূতনত্ব?

কপালকুণ্ডলা গ্রন্থের লুৎফউন্নিসা চিত্র ইহা অপেক্ষা কত সুন্দর! বহু-পুরুষভোগ্যা বারবিলাসিনী লুৎফউন্নিসা প্রেমিকার ছায়া স্পর্শ করিবারও যোগ্য নহে। কিন্তু বঙ্কিমবাবু গণিকাকে প্রেমিকার বেশে সাজাইয়া নিরক রাজ্যে স্বর্গের শোভা ফলাইয়াছেন। পাঠকের কৌতুহল পরিতৃপ্তি জন্য আমরা সে দৃশ্যটি উপস্থাপিত করিব।[৯৬]

(ক্রমশঃ)

৩য় বর্ষ, ১১শ-১২শ সংখ্যা, বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ ১৩১০

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা : সাহিত্যে সহায়তা, শ্রী নিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় : ইতর প্রাণীর বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় শক্তি, নরেশের জীবন উৎসর্গ [গল্প], গ্রন্থ.আলোচনা, গিরীন্দ্রমোহনী দাসী : মালঞ্চ [কবিতা], প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : লাজময়ী [ঐ], শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী : প্রাণ [ঐ], যতীন্দ্রনাথ মজুমদার : প্রেম [ঐ],

মোহাম্মদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মোহাম্মদ জন্মভূমি দর্শন করিয়া তিন দিন পর মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

মোহাম্মদ সিরিয়ার নিকটবর্ত্তী মুতা নামক স্থানে ধর্ম্মপ্রচার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তত্রত্য খ্রীষ্টান অধিবাসীরা তাহাকে হত্যা করে। মোহাম্মদ এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মোসলমান সৈন্য মুতার সম্মুখবর্ত্তী হইলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া একান্ত বিব্রত করিয়া তুলিল। ক্রমান্বয়ে তিনজন মোসলমান সেনাপতি জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। শেষে বীরশ্রেষ্ঠ সানেদ সেনাপতির পদ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রবল পরাক্রমে শত্রু সৈন্য নাশ করিয়া বিজয় পতাকা উড্ডীন করিলেন। (৮ম হিজিরী) মোসলমান সৈন্য মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইল।(১)

মুতার যুদ্ধের অল্পদিন পরেই কোরেশেরা সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া বেনীসুজা বংশীয় মোসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা কোরেশদিগকে দমন করিবার জন্য মোহাম্মদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি কোরেশদিগকে দমন করিবার জন্য বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন, অবিলম্বে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোরেশ দলপতি আবুসুফিয়ান এবং মোহাম্মদের পিতৃব্য আব্বাস প্রভৃতি অগ্রসর হইয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মোহাম্মদ বিপুলবাহিনীসহ আগমন করায় এবং দলপতিগণ এসলাম ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়া তাঁহার পক্ষাবলম্বী হওয়ায় কেহই আর তাঁহার গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল না। তিনি সগৌরবে মক্কায় প্রবেশ করিয়া কাবামন্দিরের তিনশত ষাইটটী মূর্ত্তি ভগ্ন করিলেন। কোরেশেরা বিস্মিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। অতঃপর মক্কার সমস্ত নরনারী মোহম্মদের শরণাপন্ন হইয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মোহাম্মদ কিয়দ্দিবস মক্কায় বাস করিয়া মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

পৌত্তলিকতার দুর্গস্বরূপ কাবামন্দিরে একেশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এসলাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ আরবদেশের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন নরনারীর হৃদয় আলোকিত করিল। আরবদেশ হইতে দেব দেবীর উপাসনা বিলুপ্ত হইল।

(১) The army, on its return, though laden with spoil, entered the city more like a funeral train than triumphant pageant and was received with mingled shouts and lamentations. While the people rejoiced in the success of their arms, they mourned the loss of three of their favourite generals. All bewailed the fate of Jaafar, brought horne a ghastly cropse to the city whence they had seen him so recently sally forth in all the pride of valiant manhood, the admiration of every beholder. He had left behind a beautiful woman and infant son. The heart of Mahmoed was touched by her aflicition. He took the orphan child in his arms and bathed in his tears. But most he was affected, when he beheld the young daughter of his faithful Zeid approaching him. He fell on her neck and weft in speechless emotion. A bystander expressed surprise that he shall give way to tears for a death which, according to Moslem doctrine, was but a passport to paradise. "Alas!" replied the prophet, these are the tears of friendship for the loss of a friend!" Irving.

হওয়াজন ওসকিফ ব্যতীত আরবের অন্য সমস্ত সম্প্রদায় এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মোহাম্মদের শরণাপন্ন হইল। তাঁহার ঐশ্বর্য্য, প্রভাব এবং প্রতিপত্তি সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। হওয়াজন ওসকিফ বংশীয় অধিনেতৃগণ ত্রিশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মদিনা আক্রমণ করিবার জন্য বহির্গত হইল। মোহাম্মদ এই সংবাদ পাইয়া শত্রু সৈন্যের গতিরোধ করিতে সসৈন্যে.যাত্রা করিলেন। হোলয়ন নামক স্থানে উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোসলমান সৈন্য শত্রুর প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মোহাম্মদ ও আবুসুফিয়ান উৎসাহপূর্ণ বাক্যে উদ্দীপ্ত হইয়া শত্রুদিগকে দুর্জ্জয় পরাক্রমে আক্রমণ করিল। শত্রুকুল তাহাদের পরাক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। বিজয়লক্ষ্মী মোসলমানের অঙ্কশায়িনী হইলেন। শত্রু সৈন্যের ছয় সহস্র অশ্ব, চারি সহস্র উষ্ট্র ও চারি সহস্র রৌপ্য মুদ্রা মোসলমানদের হস্তগত হইল। একদল সাকিফ হওয়াজন সৈন্য রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া আরব নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মোহাম্মদ আরব নগর অবরোধ করিলেন। কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

মোহাম্মদ তায়েফ নগর পরিত্যাগ করিয়া সগৌরবে মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়া অবগত হইলেন যে, রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁহার প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্য আরব সীমান্তে বহু সংখ্যক সৈন্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এজন্য তিনি বিপুল যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আবুবেকর প্রভৃতি প্রচার-বন্ধুগণ আপনাদের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ মোসলমান জাতির রক্ষার জন্য উৎসর্গ করিলেন। মোসলমান রমণিগণ আপনাদের বসন ভূষণ বিক্রয় করিয়া লব্ধ অর্থ মোহাম্মদের হস্তে সমর্পণ করিল। ... বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। মোসলমান সৈন্য সিরিয়ার প্রান্তদেশে উপনীত হইল। এই সময় রোম সম্রাট সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি মোসলমান সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন না। মোহাম্মদ বিনা যুদ্ধে ফিরিয়া আসিলেন।

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আরব দেশের সুশাসন ও আরব দেশের বহির্ভাগে ধর্ম্ম প্রচার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজা সমূহের রাজন্যবৃন্দ মোহাম্মদের সঙ্গে সখ্য সংস্থাপন জন্য দূত প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মোহাম্মদ অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হইতে বিশ্রাম লাভ করিয়া পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণায় নিরত হইলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল শান্তিতে যাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার একমাত্র পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। মোহাম্মদ একমাত্র বংশধরের অকাল মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হইলেন। এই নিদারুণ শোকের সময়েও ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। তিনি প্রিয়তম পুত্রের সমাধির সময় আকুল কণ্ঠে বলিলেন, "হে পুত্র ! আজ সাক্ষ্য প্রদান কর যে, ঈশ্বর তোমার প্রভু, পয়গম্বর তোমার পিতা এবং এসলাম তোমার ধর্ম্ম।" তিনি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া দুঃসহ পুত্র-শোক সহ্য করিলেন। মোহাম্মদ মক্কা গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি দশম হিজিরীর জেলকদ মাসে মক্কা যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে জন্ম ভূমিতে উপনীত হইয়া সমস্ত ক্রিয়া কলাপ সমাপন করিলেন। তারপর সমাগত মোসলমানদিগকে মধুর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পীড়াক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। একাদশ হিজিরীর রবি-ওল-আউল মাসের ৯ই তারিখ শুক্রবার আগত হইল। মোহাম্মদ চিরাগত প্রথাগত মসজিদে উপাসনার জন্য গমন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু দৌর্ব্বল্যবশতঃ দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে আবুবেকর মসজিদে গমন করিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সমবেত উপাসকগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, অনেকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। মোহাম্মদ এই সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া আলী ও আব্বাসের স্কন্ধে ভর করিয়া মসজিদে গমন করিলেন। আবুবেকরের উপাসনা শেষ হইলে তিনি সমবেত মোসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার মৃত্যুর জনরব শুনিয়া ভীত হইয়াছ। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কি কোন পয়গম্বর চিরজীবী হইয়াছে যে, আমিও মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া তোমাদের সঙ্গে চিরকাল বাস করিব? সকলি ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পন্ন হয়; সকলেরি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, তাহার অগ্র পশ্চাৎ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতেছি। তোমরা ঐক্য সূত্রে বদ্ধ থাকিও, পরস্পর প্রেম ও সন্ন্যাস করিও, বিপদের সময় একে অন্যের সাহায্য করিও, একে অন্যকে ধর্ম্ম বিশ্বাসে অটল থাকিতে ও সৎকার্য-সাধন করিতে উৎসাহিত করিও। ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সৎকার্য্যই মানুষের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। অন্য সকল কার্য্যই তাহাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়।"

মোহাম্মদ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার তিন দিন পর [১] তিনি "প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিল।[২] মহাপুরুষ আরব জাতির উদ্দাম স্বভাব সংযত [১] এবং একেশ্বরবাদের পূণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন জীবন ব্রত সাধন পূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

---

(১) ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ, ৮ই জুন, সোমবার।

(২) আমরা মোহাম্মদের ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা এইখানে সমাপ্ত করিলাম। মোহাম্মদ খাদিজার মৃত্যুর পর বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। এজন্য খ্রীষ্টান লেখকগণ তাঁহার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। আমীর আলী প্রভৃতি আধুনিক মোসলমান লেখকগণ নানা কথা বলিয়া তাঁহার কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন। মোহাম্মদের জীবনী লিখিবার সময় তাঁহার বহু বিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে নীরব রহিলাম, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

(১) আরব জাতির উদ্দাম স্বভাব সংযত কবিবার কিরূপ অসাধারণ ক্ষমতা মোহাম্মদের ছিল, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। তৎকালের আরব সমাজে সুরার অতিশয় প্রচলন ছিল। অতি মৃদু প্রকৃতির লোকও সহসা সুরাপান পরিত্যাগ করিতে পারিত না। উগ্র প্রকৃতির আরবীযদের পক্ষে পান-দোষ পরিত্যাগ করা একরূপ অসম্ভব ছিল। চতুর্থ হিজিরীতে মোহাম্মদ সুরাপানের অবৈধতা বিষয়ে প্রত্যাদেশ লাভ করেন। এই প্রত্যাদেশের বিষয় ঘোষণা দ্বারা প্রচার করা হইয়াছিল। এই ঘোষণা প্রচারকালে যাহারা মদ্যপান করিতেছিল, তাহারা পানপাত্র দূরে ফেলিয়া দিল আর সুরা স্পর্শ করিল না। সুরাপায়ারা সমস্ত ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পথে পথে সুরাস্রোত বহিল। এ ঘটনায় কেবল যে মোসলমানদের উপর মোহাম্মদের প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে তাহা নহে, ইহাতে তাহাদের সুগভীর সবল বিশ্বাসেরও প্রমাণ রহিয়াছে।

মোহাম্মদ প্রথমতঃ ত্রয়োদশ বৎসর কাল মক্কায় বাস করিয়া এসলাম ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় পাবকশিখা সদৃশ উপদেশে কঠিন–হৃদয় আরবদিগকে বিগলিত করিতে যত্ন করেন। ইহাতে মক্কার অনেকে এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং মক্কার কোন কোন স্থানে (মক্কার বহির্ভাগের স্থান সমূহের মধ্যে মদিনার নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য) এসলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমগ্র আরবের লোক সংখ্যার তুলনায় এসলাম ধর্ম্ম–বিশ্বাসীর সংখ্যা নগণ্য ছিল। মোহাম্মদ ত্রয়োদশ বৎসরের সাধনায়ও সাফল্যলাভ করিতে অসমর্থ হইয়া এবং বিরুদ্ধবাদী কোরেশদের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া সশিষ্যে মদিনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। মদিনার অনুরক্ত শিষ্যগণের সাহায্যে মোহাম্মদ ধর্ম্মমণ্ডলীর সহায়তায় তিনি এসলাম ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্মোৎসাহ, সর্ব্বগ্রাহী সাম্যবাদ[২] উদ্দীপনা পূর্ণ বাগ্মীতা, নির্ম্মল চরিত্র, বিপুল সাহস এবং সুদৃঢ় সহনশীলতার কথা ক্রমশঃ আরবদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য আরবদেশের নানা স্থান হইতে বহু লোক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। এই ভাবে আরবদেশের সর্ব্বত্র দ্রুতগতিতে এসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। কিন্তু মোহাম্মদের জন্মভূমি মক্কার অধিবাসী কোরেশদের চিত্ত উত্তরোত্তর অধিকতর বিদ্বেষ–বিষে পূর্ণ হইয়া উঠে। মোহাম্মদ পঞ্চ বৎসর মদিনায় অতিবাহিত করিয়া সশিষ্যে মক্কা দর্শন জন্য গমন করেন। এই সময়ে তিনি কোরেশদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করেন। এই সন্ধি ইতিহাস হোদয়বিয়ার সন্ধি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। মোহাম্মদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচার–বন্ধু আবুবকর বলিয়াছেন ;—"হোদয়বিয়ার সন্ধি স্থাপন জন্য এসলাম ধর্ম্মের যেরূপ প্রচার হয়, আর কিছুতে সেরূপ হয় নাই।" যে সকল এসলাম–ধর্ম্মবিশ্বাসী কোরেশদের হস্তে লাঞ্ছনার আশঙ্কায় আপনাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস গোপন রাখিত, তাহারা হোদয়বিয়ার সন্ধিতে স্বাধীন ও প্রমুক্ত হইয়া প্রকাশ্যে এসলাম ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করে। ইহাতে অসংখ্য নরনারীর কুসংস্কার দুর হয় এবং তাহারা এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। হোদয়বিয়ার সন্ধি স্থাপনের পর মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য পারস্যরাজ, রোমক সম্রাট, মিশরের শাসনকর্ত্তা ও আবিসিনিয়ার অধিপতির নিকট দূত প্রেরণ করেন; ইহার ফলে এই সব দেশে এসলাম ধর্ম্মের পক্ষপাতী কতিপয় ব্যক্তির উদ্ভব হয় এবং পারস্য রাজের উওরিভাগত্রর মানবের শাসনকর্ত্তা প্রজামণ্ডলীসহ এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। হোদয়বিয়ার–সন্ধি স্থাপনের এক বৎসর পর মোহাম্মদ পুনর্ব্বার মক্কা দর্শন গমন করেন। এই সময়ে বহু লোক এসলাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করে। ইহার পর

(২) এসলাম ধর্ম্মের সাম্যবাদ যথার্থই সর্ব্বগ্রাহী। মোসলমান মাত্রেই সমান। অতি নীচ মোসেলমানেরও কোরাণ পাঠ ও মসজিদে উপাসনা করিবার অধিকার রহিয়াছে। রাজত্ব ও দাসত্বের মধ্যে কেবল গুণের প্রাধান্যে অনেক ক্রীতদাস বুদ্ধি ও শোর্যবলে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। দাসত্ব প্রথা ঈদৃশ সাম্যবাদের বিরোধী বলিয়া মোহাম্মদ তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না। যে সকল ব্যক্তি যুদ্ধে বন্দী হয়, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই দাসত্বে আবদ্ধ করিবার নিয়ম তিনি অনুমোদন করেন। কিন্তু দাসত্ব মোচনেই পরমেশ্বরের চক্ষে প্রীতিকর কার্য্য বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। বন্দী ব্যতীত আর কাহাকে দাসত্বে নিগড়ে আবদ্ধ করিতে মোহাম্মদ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু মোসলমান সমাজে আজ পর্য্যন্তও দাস বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। এ কথা যে এসলাম শাস্ত্র বিরুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৎছর মোহাম্মদ মক্কার সমস্ত নরনারীকে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মক্কার একেশ্বরবাদ পরিগৃহীত হইবার পর অচিরে সমগ্র আরবদেশে এসলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মোহাম্মদ মক্কায় শান্ত স্বভাব ছিলেন ; বাক্যবলই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। কিন্তু তিনি মদিনায় তেজস্বিতা প্রকাশ করেন, বাহুবল তাঁহার সহায় হইয়াছিল। মক্কায় বাস কালে এসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা মন্দগতিতে হইয়াছিল, মদিনা গমনের পর হইতেই দ্রুতগতিতে এসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। এলারণ অনেকে মনে করেন যে, মোহাম্মদ বাক্যবলে ধর্ম্ম প্রচার করিতে অসমর্থ হইয়া বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হন।

কি প্রণালীতে এসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার রেখাপাত আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। মোহাম্মদ মদিনায় গমন করিয়া যতবার যুদ্ধযাত্রা বা অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহারও সংক্ষিপ্ত অথচ আমুল বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছি। তাঁহার আদেশে মোসলমান সৈন্য তেত্রিশবার যুদ্ধযাত্রা বা অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে তেরবার কোরেশদিগের বিরুদ্ধে, ছয়বার ইহুদিদের বিরুদ্ধে, দুইবার খ্রীষ্টানদের রিরুদ্ধে এবং বারবার বারটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা বা অস্ত্রধারণ করা হইয়াছিল। এসলাম ও মোসলমানের বিরদ্ধবাদীদের মধ্যে কোরেশদের শত্রুতাচরণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ছিল। কোরেশদের নিম্নেই ইহুদিদের বিদ্বেষভাব প্রবল ছিল। কোরেশ ও ইহুদি ধরাপৃষ্ঠ হইতে এসলাম ও মোসলমানদের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিয়া বদ্ধ পরিকর হইয়াছিল। মোহাম্মদ এয়োদশ বৎসর কাল বাক্যবলে শত্রুতাচরণ নির্ব্বৃত্ত করিতে যত্ন করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া বাহুবলের প্রয়োগ করেন। মোহাম্মদ আত্মরক্ষা বা শত্রুনাশ[১] করিবার উদ্দেশ্যেই অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, যাহারা বিদ্বেষভাব যত প্রবল ছিল, তাহার বিরুদ্ধে তত অধিকবার যুদ্ধ যাত্রা বা অস্ত্র ধারণ করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ মোহাম্মদ বাহুবলের সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার করেন। নাই। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, শত্রুকুল যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় নিবন্ধন দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে গৌণভাবে তরবারি এসলাম ধর্ম্মের পর পরিষ্কৃত করিয়াছিল। একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠতা এবং মোহাম্মদের গুণগ্রামই মুখ্যভাবে এসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার হেতু ছিল। আমরা একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। মোহাম্মদ দ্বাদশ সহস্য সৈন্য সমভিব্যাহারে মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁহার বিপুল বাহিনীর নিকট কোরেশরা মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয় এবং শত্রুতাচরণ পরিত্যাগ করে। তিনি তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রেম ও করুণা

[১] কোন কোন খ্রীষ্টান-লেখক লিখিযা গিয়াছেন যে, লুণ্ঠনলোলুপ আববদেব প্রীতিব জন্যই মোহাম্মদ অনেক স্থানে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। আমাদের ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মোহাম্মদ নিজে নির্লোভ মহাপুরুষ ছিলেন। আমরা শ্রীযুক্ত গিবিশ বাবুব গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। মোহাম্মদ অন্তিমকালে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। তিনি নিজ কার্য্যেব জন্য ৬/৭ টা রাখিয়া অবশিষ্টগুলি বিতরণ করিবার জন্য আয়েসার হস্তে অপণ কবেন। ইহার কিছু কাল পরেই তিনি ব্যাধিব যন্ত্রণায় সংজ্ঞাশূন্য হন। তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া মোহরগুলি বিতরণ করা হইয়াছে কি না, তাহাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন। আয়েসা না করেন। তিনি মোহরগুলি দবিদ্রদিগকে দান কবিতে বলিয়া পুনর্ব্বাব সংজ্ঞাশূন্য হন। মোহাম্মদ কিছুকাল পবে সংজ্ঞালাভ করিয়া মুদ্রাগুলি বিতরণ করা হইয়াছে কিনা, পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন। আয়েসা না করেন। ইহাতে মোহাম্মদ মোহরগুলি আলীর হাতে দেন। আলী বিতরণ করিল তিনি বলেন, 'এক্ষণে আমি শান্তিলাভ করিলাম।' ঈদৃশ মহাপুরুষ যে শিষ্যগণের লুণ্ঠন বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নররক্তপাত করিতেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ বিজয়ী বীরে ন্যায় মক্কায় প্রবেশ করিলে অধিনেতৃবৃন্দ দণ্ডভয়ে ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কি ভাবিতেছ?" তাহারা উত্তর করে, '"ক্ষমাশীল পিতার পুত্র, আপনি আমাদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।" মোহাম্মদ প্রত্যুত্তরে বলেন, "পুরাকালে ইউসক উৎপীড়নকারীদিগকে ক্ষমা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, অদ্য আমি তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি। তোমাদিগকে তিরস্কার করিব না, ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি তোমাদের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। তোমরা স্বাধীন, ইচ্ছা করিলে চলিয়া যাইতে পার।" মোহাম্মদের সৌজন্য ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত মক্কা এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

মোহাম্মদের জীবন পরমেশ্বরের সেবা ও মানব জাতির কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এ জীবনের আদ্যন্ত মধুময়। মোহাম্মদ আত্মীয় স্বজনে স্নেহশীল ও বন্ধুবান্ধবে প্রীতিমান ছিলেন, তিনি দাস দাসীর সঙ্গে সাতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার তিরোভাবের পর আলস নামক একজন ভৃত্য বলিয়াছিল, আমি ১০ বৎসর কাল মহাপুরুষের অধীনে কাজ করিয়াছি ; তিনি এক দিনের জন্যও আমাকে কটু কথা বলেন নাই। বালক বালিকা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, অনেক সময় তাঁহাকে পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া বালক বালিকাদিগকে আদর করিতে দেখা যাইত। তিনি জীবনে কাহাকেও কখন প্রহার করেন নাই। অভিসম্পাত বা কটুবাক্য এক দিনের জন্যও তাঁহার রসনা কলুষিত করে নাই।

মোহাম্মদ পীড়িতের সেবা করিতেন, শবাধার দেখিলেই বহন করিয়া সমাধি স্থানে লইয়া যাইতেন। ক্রীতদাসের গৃহে সানন্দে ভোজন করিতেন, স্বহস্তে জীর্ণ বস্ত্র সংস্কার করিয়া পরিধান করিতেন, অনেক সময় স্বয়ং গাভী দোহন করিতেন। তিনি সৌজন্যের আধার ছিলেন। কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎকালে হস্ত মর্দ্দন করিবার সময় তিনি কখন প্রথমে হস্ত পরিত্যাগ করিতেন না। কেহই তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত, বীরহৃদয় ও সত্যনিষ্ঠ ছিল না। তিনি আশ্রিতকে আশ্রয় দান করিতে একান্ত তৎপর ছিলেন। তিনি সাতিশয় মিষ্টভাষী ও প্রিয়বাদী ছিলেন। "সত্য ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, নব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" এই নীতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন। তিনি শোকার্ত্তাকে সান্ত্বনা ও দরিদ্রেকে উৎসাহ প্রদান জন্য অতি দীন হীন ব্যক্তির গৃহেও অকুণ্ঠিত চিত্তে গমন করিতেন। তাহাদের অনেকে তাঁহাকে পথিমধ্যে ধরিয়া আপনাদের দু:খ কাহিনী নিবেদন করিত একবার তিনি অনবসরবশত: একজন ধর্ম্মজিজ্ঞাসু অন্ধকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এ কারণে তিনি আমরণ অনুশোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, আমি ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু অন্ধকে প্রত্যাখ্যান করয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছি। গরিব দুঃখীর জন্য তাঁহার দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। অনেক গৃহহীন নিরাশ্রয় ব্যক্তি তাঁহার গৃহে রাত্রি যাপন করিত। তিনি আমারে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ও আহারান্তে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন তাঁহার জীবনে এক দিনের জন্যও এ নিয়মের ব্যতয় হয় নাই। তিনি প্রবল শত্রুকেও অকুণ্ঠিত চিত্তে ক্ষমা করিতেন।

মোহাম্মদ কোন প্রকার বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার ভোজ্য ও পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল। এক এক দিন তাঁহাকে অন্নাভাবে অনাহারে থাকিতে হইত। অনেক সময়

কেবল মাত্র খৰ্জ্জুর ও জল তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। কোন কোন রাত্রিতে তৈলাভাবে তাঁহার গৃহে অন্ধ্যা দ্বীপ জ্বলিত না। মোসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন, পরমেশ্বর তাঁহার নিকট পৃথিবীর ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

ফলত: আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা আত্মসুখ মোহাম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনার প্রতিষ্ঠা, পাপে আকুণ্ঠ-নিমজ্জিত আরব সমাজের উদ্ধার এবং বহুধা বিভক্ত আরব জাতির ঐক্যবন্ধন মোহাম্মদের প্রতি কার্য্যের মূল মন্ত্র ছিল। তাঁহার সফল জীবন ; তিনি স্বীয় মূল মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক সাধনায় মূর্খতা ও কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন আরব দেশে সত্য ধর্ম্মের রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, সে রশ্মি-সম্পাতে আরব দেশের সর্ব্ব প্রকার কুপ্রথা, কদাচার ও কুসংস্কার দূরীভূত হয় এবং তদ্দেশবাসিগণ ধর্ম্মে ও চরিত্রে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। আরবগণ এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিবাদ বিসম্বাদ বিস্মৃত হয় এবং ঐক্যবলে অসাধ্য সাধন করিতে আরম্ভ করে। আমরা মহাত্মা কার্লাইলের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

'To the Arab nation it was as a birth from darkness into light ; Arabia first became alive by means of it .A poor shepherd people, roaming unnoticd in its deserts since the creation of the world : a Hero-prophet was sent down to them with a word they could believe : see, the unnoticed becomes world-notable, the small has grown world great ; within one century afterwards, Arabia, is at Granada on this hand, at Delhi on that ;---glancing in valour and splendour and the light of genius, Arabia shines through long ages otion becomes fruitful,ver a great section of the world, Belief is great, life giving. The history of a Na soul-elevating, great, so soon as it believes. These Arabs, the man Mahomet, amd that one century, is it not as if spark had fallen, one spark, on world of what seemed black unnoticeable sand ; but to the sand proves explosive powder, blazes heaven-high from Delhi to Granada ' I said, the great man was always as lightning out ot Heaven ; the rest of men waited for him like fuel, and then they too would flame"

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।[৯৭]

চোখের বালি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"লুৎফউন্নিসা কহিলেন, "তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য পৃথিবীতে যাহাকে যাহাকে সুখ বলে, সকলই দিব ; কিছুই প্রতিদান চাহিব না ; কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরবও চাহি না, কেবল দাসী !"

—লুৎফউন্নিসা আবার তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া কহিলেন,

"ভাল, সে যাউক। বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা, তবে চিত্তবৃত্তি সকল অতল জলে ডুবাইব। আর কিছু চাহি না, এক একবার তুমি এই পথে যাইও ; দাসী ভাবিয়া এক একবার দেখা দিও, কেবল চক্ষুঃ, পরিতৃপ্ত করিব।"

* * * সহসা লুৎফউন্নিসা বাতোন্মূলিত পাদপের ন্যায় তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বাহুলতার চরণযুগল বদ্ধ করিয়া কাতর স্বরে কহিলেন, নির্দ্দয় ! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমায় ত্যাগ করিও না !*

উল্লিখিত নায়িকা দুইটীর মধ্যে কোনটী প্রেমিকা এবং কোন্‌টি বিলাসিনীব চিত্র, পাঠকগণ সে গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিবেন। রমণী যেরূপ প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তেমনি অভিমানের জীবন্ত প্রতিমা। উপেক্ষিত, অনাদৃত অথবা প্রত্যাখ্যাত হইলে রমণী-হৃদয়ে অভিমানের অনল জ্বলিয়া উঠে। অভিমান নাবী হৃদয়ের স্বভাবিসিদ্ধ ধর্ম্ম ! প্রেম-নৈরাশে অভিমান নারী হৃদয়ে বল বিধান করে। সে স্থলে অভিমানে জলাঞ্জলী দিয়া প্রেম যাশ্ঞা করা রমণী-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। উপনায়কের প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া বিনোদিনী মান, অভিমান, ঘৃণা, লজ্জায় জলাঞ্জলী দিয়াছেন। বলি ইহাই কি প্রেমিকার চিত্র ?

মহেন্দ্রের চরিত্রও কাপুরুষতায় চরম নিদর্শন। তিনি আত্মীয়, স্বজন, সমাজ, এমন কি আশালতার ন্যায় জীবন-সঙ্গিনী স্বাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াও বিনোদিনী লাভের জন্য উন্মত্ত। অপিচ দিবালোকে প্রকাশ্যভাবে কুলবধূকে কুলের বাহির করিয়া নির্লজ্জতাও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন ; তিনিই আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থের নায়ক। গ্রন্থকার স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই মহেন্দ্রের চিত্র কলুষ পঙ্কিলতার আবিল করিয়াছেন। এ দিকে মহেন্দ্র এম-এ পাশ শিক্ষিত যুবক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী পড়িতেছেন। দীনবন্ধু বাবুর বন্ধু নিমেদত্ত, মাতাল, লম্পট ও কলুষিত চরিত্রের আধার। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়েব সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষোত্তীর্ণ অথবা কোনরূপ শিক্ষিত নামের যোগ্য নহে। সুতরাং সেরূপ কলঙ্ক পঙ্কিলতা মহেন্দ্রের চিত্রে আরোপ করা সুরুচি-সঙ্গত বলিয়া বোধহয় না। উচ্চ শিক্ষার পরিণাম যদি এরূপ বিষময় হয়, তবে উহা যত শীঘ্র এদেশ হইতে বিলুপ্ত হয়, ততই জনসাধারণের মঙ্গল। অপিচ সমাজের শিক্ষা, সংস্কার অথবা উন্নতির জন্য গ্রন্থকার আদর্শ চিত্র কল্পনা করিতে পরেন ; কিন্তু সমাজের অধঃপতনের জন্য নয়।

মহেন্দ্রের মত নির্ব্বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বোধহয় দ্বিতীয় নাই। বিনোদিনী, তাঁহার প্রেমে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, তঁহাকে তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত অথবা পাদলেহী কুক্কুরের মত অপানিত করিতে কুণ্ঠিত নহে। অপিচ সে যে বিহারীকে প্রণের সহিত ভালবাসে, ইহা নিজ মুখে মহেন্দ্রের নিকট ব্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত নহে। হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে স্থাপনা করিয়া যাহার জন্য জীবন উৎসর্গ কবা যায়, সেই প্রেম-প্রতিমা অন্যের প্রণয়াকাঙ্ক্ষা হইলে হৃদয়ে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হয়। তখন সে প্রতিমাকে স্থানচ্যুত করিতে যদি হৃদয় শতধা চূর্ণ

* কপালকুণ্ডলা ৮৭ ও ৮৮ পৃষ্ঠা।

বিচূর্ণ হইয়া যায়, প্রেমিকগণ তাহাতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু মহেন্দ্র সে লোক নয়। হতাশ প্রেমের তীক্ষ্ণ ছুরিকা তাহার স্থূল চর্ম্ম ভেদ করিয়া স্পষ্ট হয় না ;—প্রেম-নৈরাশ্যে অভিমানের তীব্র হলাহল তাহার হৃদয়কে জর্জ্জরিত করে না। বস্তুতঃ মহেন্দ্র প্রেমিকও নহে,--কামুকও নহে,—লীলা-মর্কটের অবতার! বিনোদিনীর প্রেমের শিকল গলায় পরিয়া তিনি মর্কটের ন্যায় অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু বিনোদিনীর কাছে ঘেসিতে পারেন নাই ;—তাহার ছায়া মাড়াইতেও কখনও সমর্থ হয় নাই। এরূপ ভেড়ানন্দ আব দুটী মিলে কি?

মহেন্দ্রর প্রেমের মোহ এখনও অপনীত হয় নাই। কিন্তু বিনোদিনী এবার প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

"মহেন্দ্র কহিল, "তবে তুমি কাহার জন্য সাজিয়াছ? কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছ?"

বিনোদিনী আপনার বুক চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "যাহার জন্য সাজিয়াছি, সে আমার অন্তরের ভিতরে আছে।"

মহেন্দ্র কহিল,—সে কে? সে বিহারী?

বিনোদিনী কহিল—তাহার নাম তুমি মুখে উচ্চারণ করিও না।

মহেন্দ্র। তাহারই জন্য তুমি পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?

বিনোদিনী। তাহারই জন্য।

মহেন্দ্র। তাহারই জন্য তুমি এখানে অপেক্ষা করিয়া আছ?

বিনোদিনী। তাহারই জন্য।

মহেন্দ্র। তুমি মরিলে কত মঙ্গল হইত ভাবিয়া দেখ।

বিনোদিনী। তাহা জানি, কিন্তু যতদিন বিহারীর আশা আছে, ততদিন আমি মরিতে পারিব না।"

প্রেমের অন্তর্জলী ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এই রূপে সম্পন্নহইয়া গেল! এতদিন পরে বিনোদিনী সম্বন্ধে বিহারী স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিলেন।

"বিহারী অপমানের মাত্রা চড়িতে দেখিয়া মহেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "মহেন্দ্র, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব তোমাকে জানাইলাম অতএব এখন হইতে সংযতভাবে কথা কও!"

বোধহয় মহেন্দ্রের এখন চৈতন্য হইয়াছে। তাই তিনি প্রেমের ব্যাপাব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া একেবারে চম্পট দিলেন। পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়া উপসংহারে তাহার বীভৎস পরিমাণ প্রদর্শনে সমাজকে শিক্ষা দেওয়া উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ গ্রন্থে তাহার কিছুই নাই। যে অবৈধ প্রেমের ফলে "রোহিণী" মরিল, "গোবিন্দ লাল" আত্মহত্যা করিলেন, সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল ; তথাবিধ অবস্থায় মহেন্দ্রের কোনরূপ শাস্তি হওয়া কি উচিত ছিল না? বরং বিনোদিনী কথঞ্চিৎ ক্ষমার যোগ্য ; কিন্তু মহেন্দ্রের পাপ কি গুরুতর নহে? রাজলক্ষ্মীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাই কি এ হেন পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত?—যাহার চক্ষু আছে, তিনি বলিবেন,—না।

তার পর বিনোদিনী ও বিহারীর আকাঙ্ক্ষিত মিলন দৃশ্যটী পাঠক দেখিয়া লউন।

"বিনোদিনী তখন বিহারীকে বলিল—"যে কথা তুমি বলিলে, তাহা তোমার মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইল? এ কি ঠাট্টা?"—

বিহারী বলিল—"না, আমি সত্যই বলিয়াছি, তোমাকে আমি বিবাহ করিব।"

বিনোদিনী। এই পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করিবার জন্য?

বিহারী। না। আমি তোমাকে ভালবাসি বলিয়া, শ্রদ্ধা করি বলিয়া!

বিনোদিনী। * * * কিন্তু ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে! তোমার ঔদার্য্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি এ কাজ করি,—তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহ জীবনে মাথা তুলিতে পারিব না।

বিনোদিনী বিহারীর প্রেমে উন্মাদিনী—আত্মহারা তিনি মন-প্রাণ, জীবন-যৌবন সমস্তই বিহারীকে উৎসর্গ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মপত্নীরূপে পরিণত শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে তাঁহার ঘোরতর আপত্তি। এর রহস্যের মর্ম্মোদঘাটন কে করিবে? বিনোদিনী কি সমাজ ভয়ে—লোক গঞ্জনা ভয়ে ভীত হইয়াই হৃদয়ের চির-সঞ্চিত আশা বিসর্জ্জন দিলেন? এ ত প্রেমিকার লক্ষ্মণ নয়! অপিচ দেশাচার-মন্ত্রমুগ্ধ অধঃপতিত সমাজে এরূপ দৃশ্য প্রদর্শন অপেক্ষা কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া—তুচ্ছ সমাজ-ভীতি অতিক্রম পূর্ব্বক—বাল-বিধবার পুনঃ পরিণত রূপ মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনে সমাজকে জীবন্ত শিক্ষা দিলে কি ভাল হইত না? সহৃদয় ও স্বদেশ প্রেমিক শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকারের নিকট আমাদের এ আশা অরণ্য-রোদনে পরিণত হইল, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়!

পরিণয় শূন্য প্রণয় যদি নরকের জিনিষ হয়, তবে বিনোদিনীর প্রণয় অবৈধ সন্দেহ নাই। অপিচ বিনোদিনী যদি বিহারীকে মনে মেন আত্ম সমর্পণ করিয়াই পরিতৃপ্ত রহিতেন, তবে আমরা তাঁহাকে দেবী বলিয়া পূজা করিতে সম্মত হইতাম। কিন্তু গ্রন্থকার আমাদিগকে সে সুযোগ দেন নাই। প্রেমিকা লজ্জা, ভয়, কুল, মানে জলাঞ্জলী দিয়া একদিন অভিসারিকা বৃত্তি অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। "সদা বিকশিত সুগন্ধ পুষ্পমঞ্জরী তুল্য একখানি চুম্বনোন্মুখ মুখের অসম্পূর্ণ ব্যাকুল চুম্বন বিহারীর ওষ্ঠের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন।" কিন্তু বিহারী অনায়াসে সে প্রলোভন জয় করিলেন। ইহা স্বর্গের ছবি, না নরকের চিত্র?

প্রেমাবেশ-বিহ্বলা বিনোদিনী বিহারীর সম্মুখে যেরূপ প্রেমের পশরা খুলিয়া দিয়াছিলেন, সে দিন যদি বিহারী এই অযাচিত প্রেমোপহার প্রত্যাখ্যান না করিতেন, তবে বিনোদিনীর দশা কি হইত? দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপনের বাসনা হৃদয়ে পোষণ না করিয়াও যিনি এরূপ পবিত্র (!) প্রেমলীলার অভিনয় করিতে পারেন, তাঁহাকে প্রেমিক বলিব কি? বস্তুতঃ বিনোদিনী প্রেমিকাও নহে,—ব্যাপিকাও নহে,—অভিসারিকা।

উপসংহারে বিনোদিনী বিহারীকে প্রেমোপঢৌকনস্বরূপ দুই হাজার টাকার নোট দিয়া চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি কোনরূপ প্রেমোপহার পাইয়াছিলেন কি?—না তৎকৃত আঘাত চিহ্ন! এ উপহার প্রেমিকাব উপযুক্ত বটে। তবে প্রেমের বাজারে এ মালের নূতন আমদানী দেখিয়া পাঠক বিস্ময়ে পুলকিত হইবেন। অপিচ বিনোদিনীর চির

অভিলষিত "উদ্যত চুম্বনের" প্রতিদান না করিয়া প্রেমাভিনয়ের যবনিকা পতন করাতে বিহারীকে অপ্রেমিক মনে করিয়া বিনোদিনী মনে মনে ক্ষুব্ধ হইবেন নাত?

আমরা সমালোচ্য গ্রন্থের নায়ক নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দোষ গুণ প্রদর্শন করিয়াছি। সামান্য লেখকের লেখা হইলে আমরা তাহার দোষোদ্ঘাটনে এত উৎসুক হইতাম না। রবিবাবু সুবক্তা, সুলেখক,সুকবি। তাঁহার মত প্রতিশালী চিত্রকরের তুলিকায় আমরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র অঙ্কিত দেখিতে আশা কবি। গ্রন্থাকার ভবিষ্যতে আমাদের সে আশা সফল করিবেন কি? প্রস্তাব দীর্ঘ পড়িল, সুতরাং উপন্যাস সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা না করিয়া, নায়ক নায়িকার চরিত্র সমালোচনা কবিয়াই আমরা এস্থলে প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

শ্রীমতী মানকুমারী বসু, শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ প্রভৃতির
কবিতা,
শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসের
শ্রীক্ষেত্রের কথা,
শ্রীমৎ বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর
কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনাপূর্ণ প্রবন্ধ,
শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রভৃতির
প্রাচীন সাহিত্যালোচনা ও সমালোচনা,
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি. এ. মহাশয়ের
প্রবন্ধ ও গল্প,
শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের
ঐতিহাসিক প্রবন্ধ,
শ্রীযুক্ত বমণীমোহন ঘোষ বি. এল, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. প্রভৃতিব
কবিতা,
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি. এ. মহাশয়েব
"শ্রী শ্রীরাকৃষ্ণকথামৃত,"
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর তরফদার বি. এ. মহাশয়ের
জ্যোতিষ.
শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ গোস্বমী বি. এ. মহাশয়ের
কৃষি বিষয়ক সন্দর্ভ,
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিটেক্টিভের গল্প প্রকাশিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত সাহিত্যসভার সংগৃহীত "ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি," সাহিত্য-প্রভৃতি এবং অন্যান্য প্রবন্ধ থাকিবে।

চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যায়
নিম্নলিখিত প্রবন্ধ গুলি থাকিবে।

১। কনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী বসুর কবিতা
মাঙ্গলিক,
২। দাসীর ভূত পূর্ব্ব সম্পাদক, সুলেখক শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ভৌমিক বি. এ. মহাশয়ের
সামাজিক প্রবন্ধ,

৩। "সাহিত্য", "প্রদীপ" প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. মহাশয়ের

"বৈজ্ঞানিক কুটীর"

বহু বৈজ্ঞানিক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশপূর্ণ উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ

* আরতির প্রতি সংখ্যায় বাহির হইতেছে ও হইবে।

৪। সুসঙ্গাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ কুমুদ চন্দ্র সিংহ বি.এ. বাহাদুরের স্বীয় অভিজ্ঞতা মূলক প্রবন্ধ

"হস্তীখেদা",

৫। সুকবি শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি. এল. মহাশয়ের কবিতা

"প্রেমাকাঙ্ক্ষা",

৬। সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদার বি. এ. মহাশয়ের গবেষণা মূলক

"প্রাচীন কথা।"

"প্রীতি ও পূজা" রচয়িত্রী প্রথিতযশা মহিলা-কবি

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস মহাশয়ার

"শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের বাল্যভোগ।"

৮। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ মহাশয়ের

ক্ষুদ্র গল্প।

৩০ শে শ্রাবণের মধ্যে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

বার্ষিক মূল্য--সহরে মফস্বলে সর্ব্বত্র দেড় টাকা।

বিশেষ সুবিধা—

যিনি ৩০শে শ্রাবণের পূর্ব্বে মূল্য দিয়া গ্রাহক হইবেন, তিনি

এক টাকা মূল্য

দিয়াই এক বৎসর "আরতি" পাইবেন।

গ্রাহক হইলে প্রথম সংখ্যা ভি: পি: করিয়াও মূল্য এক টাকা।

আরতি-কার্য্যালয় শ্রীশচীন্দ্রসুন্দর রায়,
ময়মনসিংহ। কার্য্যাধ্যক্ষ

কেশের জন্য কুন্তলীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০
৩য় বর্ষ.১১-১২ সংখ্যা

সংকলন

আশা

১ম ভাগ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩০৯

উদ্বোধন

অয়ি বঙ্গভাষা!

তোমারি সাধনা করিতে গো আজ
হৃদয়ে জেগেছে "আশা"।
যুগ যুগ ধরি' যে তপঃ আচরি'
ভাষার মন্ত্রবলে,
কোটি কবি–যোগীহয়েছে অমর
বাণীর প্রসাদ ফলে।
সে পূজার শেষ যে যাহা পেয়েছ
বাণীর সন্তানগণ,
"আশা'র কল্যাণে প্রতিভা যোজিয়া
কর তাহা সমর্পণ।
সকল কণ্ঠে সকল রসের
ধরিয়া নবীন তান,
প্রাচীন ঋকের ছন্দ অনুসরি'
(এস) গাইরে আশার গান!

আশীর্ব্বাণী

লভি' অক্ষয় আয়ুঃ.
মুঠায় আঁকড়ি' ধর এ ধরণী,
আকাশে বাড়াও বাহু।
ধাও উদ্দাম–গতি,
ঝঞ্চার মত ধাও আনন্দে
নীল অম্বধি মথি'।
শুভ পক্ষ মেলি'
বাড়ব–কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে পড়
দুর্য্যোগ অবহেলি'।
যাচ সিন্ধুর কাছে,
রতনের খনি মৈনাক–মাঝে
অনেক মাণিক আছে।
লোহার নিগড় ছিঁড়ে,
মত্ত মাতাল বাহিরিয়া পড়
লক্ষ লোকের ভিড়ে।
বর্ষা শানায়ে নিয়ে

অশ্বের ক্ষুরে আগুন ছুটাও
পাহাড়ের পাশ দিয়ে।
এস গো দুঃসাহসি,
ললাট হইতে উঠাও সবলে
দুর্ভাবনার মসী।
উত্তাল গিরি-চূড়া
ভীম বিক্রমে দৃঢ় পদাঘাতে
সদর্পে কর গুঁড়া।
একরোখা, একগুঁয়ে,
"মরীয়া" হৃদয়ে রুদ্র আশায়
পথ কর ফুঁয়ে ফুঁযে।
হও দিশেহারা গোঁয়ার,
ঢেউ গুণে গুণে কাটিও না দিন
কখন আসবে জোয়ার।
কখন উঠবে হাওয়া—
মিথ্যে আশায় পথ চেয়ে থাকা
আকাশের পানে চাওয়া !
কার কাছে হাত পাত।
করুণা কবিতে কেউ নেই হেথা
কাহারে সাধিছ ভ্রাতঃ !
ধনীরে ডরাও মিথ্যে !
গলৎকুষ্ঠ রহিয়াছে ঢাকা
ধন দৌলৎ বিত্তে !
সাধিতে হইবে মন্ত্র,
গাহ্য করো না গুরু-গঞ্জনা,
বৈরীর ষড়যন্ত্র।
আজি যৌবন প্রভাতে,
উজস্বল পৌরুষ ভরে
সত্য সন্ধ শোভাতে,
কর, কর দ্বার মুক্ত,
ন্যায়ের দণ্ড প্রোথিত করিয়া
হও ভাই জয় যুক্ত।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।[৯৮]

তরণীকান্ত দাস : বুদ্ধগযাব সংক্ষিপ্ত বিবরণ, দ্বিজদাস দত্ত : জাতি-বর্ণভেদ, অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি : ন্যায় প্রপঞ্চ [প্রবন্ধ], মহাকবি কালিদাস [ঐ],

জয়নারায়ণের
রাধা-কৃষ্ণ-বিলাস।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব মন্দীভূত হইলে হিন্দুধর্ম্ম আবার মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এই সময়ে হিন্দুব বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে মতদ্বৈধ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধে আত্মপক্ষের বলাধান জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ উপাসকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ উপাস্যগণের মাহাত্ম্য প্রচাবে যত্নশীল হন। এরূপ যত্নের ফলে বঙ্গ সাহিত্যে কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের উদ্ধার কার্য্য শেষ না হইলে, তাহা নিশ্চয় কবিযা বলা যাইতে পাবে না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য যাঁহাবা আলোচনা কবিয়াছেন, তাঁহাবা জানেন যে, বঙ্গীয় কবিগণ ধর্ম্মের গণ্ডী ত্যাগ করিযা অন্যত্র পদার্পণ করিতে সাহস করেন নাই। যাহার মূল কোন না কোন পুরাণাদিতে নিহিত নহে, এমন গ্রন্থ বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে একান্ত দুর্ল্লভ। প্রাচীন কবিগণ বহুদিন পয্যন্ত এই গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া চলিয়া গিযাছেন। একই বিযযে, আমাদের ভূবি ভূরি কবি বর্ত্তমান আছে। একমাত্র মহাভারতেব কবিইত বাইশ জন ! পদ্ম পুরাণের কবিও পঞ্চাশতের ন্যূন হইবে না ! বস্তুতঃ একদিন এরূপে দেশ ধর্ম্মস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল।

আমাদেব বোধহয়, বাঙ্গালীদের প্রধান প্রধান সকল দেবতারই মাহাত্ম্য জ্ঞাপক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল। কালপ্রভাবে ও ধর্ম্মের দিকে লোকেব মতি গতির পরিবর্ত্তনে তাহার অনেকগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়া সম্ভব। প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচকের সংগৃহীত গ্রন্থ তালিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমাদের এই কথার সত্যতা অনেকটা উপলব্ধ হইবে। তবে সকল দেবতাব মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবই বঙ্গভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সাহিত্য বাদ দিলে প্রাচীন সাহিত্যে বিমল আনন্দদায়ক উপভোগের জিনিষ বড় বেশী থাকে না, একথা বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন। বঙ্গের পদাবলী সাহিত্যের তুলনা এখনো বিশেষ মিলে নাই। এই পদাবলী সাহিত্যের "জান" হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ। যাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা বিধৌত হইয়া আমাদের বঙ্গ সাহিত্য আজ এত লাবণ্য-শ্রী-সমুজ্জল ও গৌরবান্বিত, অদ্য সেই রাধাকৃষ্ণেরই লীলাবিষয়ক "রাধা-কৃষ্ণ-বিলাস" সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিব, বাসনা করিয়াছি।

ইহা একখানা প্রাচীন্ গ্রন্থ। ডিমাই আট পেজি আকারেব ১১২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি একটু বড়। যে পাণ্ডুলিপি আমাদের অবলম্বন, তাহা নিতান্ত প্রাচীন না হইলেও মূল গ্রন্থখানি যে প্রাচীন, তাহা দৃষ্টিমাত্রেই বলা যায়।

শ্রীকৃষ্ণচরিত সম্বন্ধে ইহা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। গুণরাজ খাঁর "গোবিন্দ-বিজয়" রামদাসের "গোকুলমঙ্গল", দ্বিজ লক্ষ্মীনাথের "কৃষ্ণমঙ্গল" প্রভৃতির ন্যায় ইহাও ভাগবতের

অনুবাদ কিনা, কবি কোথাও বলেন নাই। তাহা না বলিলেও ইহা যে ভাগবতাবলম্বনে বিরচিত, তাহা "ব্যাসদেবের" বন্দনা হইতেই বেশ বুঝা যায়। কবি কোন কোন স্থলে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতও অবলম্বন করিয়াছেন, বলিয়া লিখিয়াছেন।

ইহার প্রণেতা দ্বিজ জয়নারায়ণ। দুঃখের বিষয়, এই নামটুকু ভিন্ন সমগ্র গ্রন্থে তাঁহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং তিনি কখনকার লোক, তাহাও বলা চলে না। এত দীর্ঘকাল পবে তাঁহার পরিচয় জানিবার আর উপায় কই? বনফুলের সৌরভেই মন মুগ্ধ হইয়া যায়, তাহার জীবনদাতা কে, অনুসন্ধান করা মহত্ত্বের পরিচায়ক বটে, তাহা যে নিতান্ত আবশ্যক, এমন নহে। আমরাও আজ এই বন্যকুসুম-সৌরভে বিমোহিত ; মালীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া, এ সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিতে ইচ্ছা করি না।

গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে এই রকম ভণিতা দৃষ্ট হয় ঃ—

দিবানিশি কান্দি দোহে অন্ধপ্রায় হইল।

গুরুপদে বিকায়ে কবিরায়ে রচিল।

ইহা হইতে হয়ত অনুমতি হইতে পারে যে, তাঁহার উপাধি "কবিরায়" ছিল, অথবা তিনি "কবিরাজ" ছিলেন।

এই গ্রন্থের ভাষা এত পরিমার্জিত যে, ইহাকে প্রাচীন পুঁথি বলিতে সঙ্কোচ হয়, ইহাতে প্রাচীন রীত্যনুযায়ী রাগ রাগিনীর ব্যবহার নাই বটে কিন্তু পয়ার, ত্রিপদী, লঘু-ত্রিপদী, চৌপদী ও তোটক ছন্দের ব্যবহার আছে। প্রত্যেক ছন্দারম্ভের প্রারম্ভে এক একটা "ধুয়া" প্রদত্ত হইয়াছে। এই ধুয়াগুলি কাণে যেন অমৃত ঢালিয়া দেয়। বাস্তবিক, ধুয়ার মত সুন্দর জিনিষ বঙ্গ সাহিত্যে অতি অল্পই আছে। দূরাগত নৈশানিল-সঞ্চালিত বীণানিক্কণবৎ এই ধুয়াগুলি ভাবুকের মনে কি এক অদ্ভুত ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহা বাক্যে বুঝান যায় না।

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যালোচক মাত্রেই জানেন যে, বঙ্গীয় হস্তলিপিগুলি বরাবর পরবর্ত্তী সময়ে কিছু নূতন সাজে সজ্জিত হইযা বাহির হইয়াছে। নকলনবিশগণ অনেক সময়ে স্বীয় মনোমত করিয়া গ্রন্থগুলি নকল করিতেন। এইরূপে "সাত নকলে আসল খাস্ত" হইতে হইতে অবশেষে গ্রন্থগুলি বর্ত্তমানকালে জড়ত্ব লাভ করিয়া আছে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাব হইয়াছে অবধি হস্তলিখিত পুঁথির আর বড় একটা নকল হয় নাই। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানি সম্বন্ধেও যে এই সকল কথা প্রযুক্ত হইতে পারে না, এমন বলা যায় না।

ক্রিয়াদির প্রয়োগ-বিষয়ে এই কাব্যে প্রাচীন সাহিত্য-সুলভ তেমন কোন বিশেষত্ব দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ফল কথা, দুই একটি সামান্য কথা বাদ দিলে, ইহাকে আধুনিক রচনা বলিতে কাহারো দ্বিধা হইবে না।

উপরে একবার ধুয়ার কথা বলা হইয়াছে। উহার সৌন্দর্য্য বুঝাইবার জন্য বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া আমরা নিম্নে কয়েকটি ধুয়া উদ্ধৃত করিয়া দিয়া পাঠকমণ্ডলীকে নিজেই উপভোগ করিবার সুযোগ দিলাম।

(১) ভজো ওরে মন ! সেই কাল
মাধুরী
কালী বলো কিম্বা কৃষ্ণ বলো,
সমান দয়া উভয়েরি ॥

শুন মন তোরে বলি,
কালী কৃষ্ণ কৃষ্ণ কালী,
অভেদ যে ভাবে ভবে,
সেই যাএ তরি ॥

(২) হেন অসম্ভব সাধ কেন হরি
হয় মনে।
ত্রিলোক-বাঞ্ছিত-পদ আমি পাব
কি গুণে ॥
যে পদ পাবার লাগি,
সদাশিব সব্বত্যাগী,
সে পদ-পল্লবে স্থান পতিতে পাবে
কেমনে ॥

(৩) হরি সে দিন কি হবে !
অন্তকালে গঙ্গার জলে কৃষ্ণ বলে
প্রাণ যাবে ॥
আমি হে অত্যন্ত দীন,
ভজন-সাধন হীন,
দেখে অতি দীন ক্ষীণ,
তুমি কি হে চাহিবে ?

(৪) দিন গেল দীননাথ, হৈল না হে
আরাধন !
ভব-মায়া-মুগ্ধ হয়ে, তোমা মনে
পড়ে না।
যদি ভাবি ভজি চরণ,
বিবাদী তাহে ছয় জন,
মজায় দিআ মন্ত্রণা ॥

এইরূপ অনেক ধুয়া ; স্থান থাকিলে আমরা আরো কয়েকটি উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।

কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ে ইহা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, আগেই বলিয়াছি। লেখকের ভাষা জ্ঞান, ভাবুকতা এবং কবিত্বশক্তি (অবশ্য প্রাচীনকালের চক্ষে দেখিতে হইবে) দেখিয়া মোহিত না

হইয়া থাকা যায় না। এতৎ সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে এমন নিখুঁত সুন্দর গ্রন্থ খুব বিরল। গুণরাজ খাঁর মত লোকও তাঁহার কাব্যকে অশ্লীলাংশবিরহিত করিতে পারেন নাই। বস্ত্রহরণ ও রাধা-কৃষ্ণের বিহার-বর্ণনা পাঠ করিতে বীভৎস রসে শরীর রোমাঞ্চিত না হইয়াই পারে না। অতি সুখের বিষয়, এই গ্রন্থে উক্ত বিষয় পাঠ করিতে কাহারো কিছুমাত্র সঙ্কোচ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সম্বন্ধে. এই দুটি ছত্র দেখিলেও গ্রন্থখানি কিরূপে রচিত, তাহা অনেকটা বোধগম্য হইবে।

সেই হেতু বিশেষিয়া লিখি পরিচয়ে।
কৃষ্ণ সনে গোপিকার কাম ভাব নহে।।

আর অধিক বাক্য ব্যয় করিয়া কাজ নাই। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে এ কাব্যের ভাষাদির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সখিগণসহ কুসুমচয়নে প্রবৃত্তা শ্রীরাধাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ঃ—
দূরেতে থাকিআ, কহিছে ডাকিআ,

কুসুম তুলিছ কারা ?
এরূপে আসিআ, কুসুম হরিআ,
কানন করিলি সারা।।
অদ্য সুপ্রভাত, হইল অকস্মাত,
হাতে মিলাইল চোর।
যথ দুঃখ ছিল, সকল ঘুচিল,
বিধি দিন দিল মোর।।

রাধিকা—
অনুভাবে ভাবি তব চৌয্যরীতি হবে।
তা না হলে সাধুজনে চোর কেন কবে।।
কি নাম ধরহ তুমি থাক কোন্ স্থলে ?
আমরা ত কভু তোমাএ দেখি না
গোকুলে।।

শ্রীকৃষ্ণ—
শ্যাম কহে মম নাম জগতমোহন।
আমার পালিত এই রস-বৃন্দাবন।।
উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি—
এত শুনি বলে প্যারী জানিল এক্ষণে।
তুমি না বন্ধন ছিলা ননীর কারণে ?
কৃষ্ণ কন তাহে মম লজ্জা কিছু নাই।
ভক্তের কারণে আমি বান্ধা কত ঠাই।।
যে মোরে বান্ধিতে পারে তার হই বান্ধা
সম্প্রতি বাৎসল্যপ্রেমে বান্ধিছে যশোদা

রাই বলে সেই কথাএ কার্য্য নহি আর
হউক যেন বৃন্দাবন পালিত তোমার॥
বনমাঝে পালে পাল চরয়ে গোধন।
তাহে তব বৃন্দাবন হয় না ভঞ্জন।
গোটা কত পুষ্প কেহ চয়ন করিলে।
চক্ষুরাঙ্গা হইআ বল কানন ভাঙ্গিলে।
কৃষ্ণ কন গাভীগণে মোরে করে ভয়।
ভাঙ্গিতে আমার বন সাধ্য নাহি হয়।
বিশেষত রক্ষা করি সদা এই বন।
বনে থেকে বনমালী নাম সে কারণ।
রাই বলে সদা তুমি বনে যদি রহ।
যমুনাএ তরী বাহে সেবা কে হএ কহ
হাটে ঘাটে দান সাধে কেবল বেড়াও
গোপীর নবনী কেবা চুরি করি খাও।

কৃষ্ণ—

শুন২ রাই শুন বোলি হে তোমায়ে।
চোর বোল মিছামিছি ছিছি একি দায়ে।
রাজ কন্যা হও বলে এতই কি জোর?
কার কি করিছি চুরি কেন বল চোর।।
ভেবে যদি দেখ রাধে আপনি আপনে।
তব সম চোর কভু না দেখি নয়ানে।
চুপে২ চন্দ্রের কিরণ চুরি কৈরে।
প্রকাশি রেখাছ নিজ চন্দ্রানন পরে।।
অবোধ কুরঙ্গী জনে জীবনে বধিয়ে।
হরে তার চক্ষু চক্ষে রাখাছ মিশাইয়ে
চঞ্চলা চপলা শোভা হরে কি প্রকারে।
রাখিআছ হাস্য মাঝে একমন প্রকারে।
হে কিশোরী কেশরীর কটি শোভা হরে
মরি২ সুন্দরী রেখাছ কটিপরে॥ ইত্যাদি

এইরূপে গ্রন্থের অনেক স্থান হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারিত, কিন্তু আমাদের আর স্থানাভাব। আমাদের আশা আছে, বঙ্গীয় ক্যাব্যামোদী। পাঠকগণ এই কাব্যের প্রকৃত গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিলে ইহার সমুচিত সমাদর করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবে না! অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রী আবদুল করিম।

কলা-নিকেতন।

কাঁদাবে কি চিরকাল?

কাঁদাবে কি চিরকাল এইরূপ নিতি নিতি,
দিবে না কি একদিন (ও) হৃদয়ে আনন্দ প্রীতি?
চাঁদ গেলে চকোরিণী,
কাঁদে বসে একাকিনী,
আবার উদিলে চাঁদ-তার মুখে প্রেম-গীতি।

আমি কি এসেছি হেথা বহিতে জীবন-ভার,
চিরকাল (ই) থাকিবে কি বুকে অগ্নি হাহাকার?
নিবাইতে সে অনল,
দিলে কেন অশ্রুজল,
তাই যে অধিক দহি-এ তোমার কোন রীতি?
আমারে এতই কেন নিরদয় হ'লে তুমি,
তোমার ইঙ্গিত পে'লে,
পাষাণে তরঙ্গ খেলে,
এ কোন্ করুণা-কণা বিতরিছ মোরে নীতি?

কাঁদাতে তোমাব মনে যদি থাকে এত সাধ,
কাঁদাও কাঁদিব নিতি—পেত না মায়ার ফাঁদ।
দিন গেলে রাতি আসে,
চকোবী চাঁদের আশে
কত না সহিয়া থাকে,—ভুলি নাই এই নীতি।

শ্রীমহম্মদ মোজাম্মেল হক[৯৯]
ভোলা।

সমর্পণ

এত দিন শুধু প্রিয়!
দিয়েছিনু প্রেম,
হাসি, খুসি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস
আজ হ'তে সঁপিলাম
সকলি তোমারে
ব্যথা, জ্বালা, উষ্ণ-নিশ্বাস।
করম আমার হস্তে,
কর্ম্ম-ফল তব,
কর্ত্তব্যের, আমি চির দাস,
তোমারে সঁপিতে সব

শুধু আকিঞ্চন,
অন্তিমের নাই অন্য আশ।

বসন্তকুমার সেন : বধুর উক্তি (কবিতা) শিক্ষা নবীশ (নাটক), ত্রৈলোক্যনারায়ণ বিশ্বাস : মনের কথা (প্রবন্ধ) যজ্ঞ মঙ্গল সমালোচনা।

সম্পাদকের নিবেদন

"মায়ের পূজা করিব" আশৈশব এ আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি। এ জগতেব মা আমার, স্বর্গগতা হইয়াছেন তাঁহার স্মৃতিই আমার হৃদয়ের বল বিধায়িনী। এক্ষণ সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি আমার স্নেহময়ী জননী। আমার কি সম্বল আছে যে মায়ের পূজা করি ! ভাই ভগ্নিগণের শোকে শান্তি, আনন্দে প্রেমাশ্রু ঢালি ! আছে আমার সারাটী প্রাণ ; ইহাতেই আমার এতগর্ব্ব ! না হইবে কেন মাতৃ ভক্তের গর্ব্ব নয় কিসে? প্রাণত অনন্তের অংশ ; ইচ্ছা শক্তি বলে ইহার যথেচ্ছ বিকাশ সম্ভব। আর কি আছে? আছে, হৃদয়ে প্রকৃতির স্বভাব সুলভ দয়ার দান অমৃত বিন্দু ! এই সাহসে বুক বাঁধিয়া মাতৃ ভাষার সেরা কল্পে "আশার" পশ্চাতে সম্পাদক রূপে নিজকে দণ্ডায়মান করিতে সাহসী হইয়াছি। জানি, বীণা পানির সেবকগণের বিপদ বহুল ; তাহাদের ছিন্ন বস্ত্র জীবনে ঘুচেনা, রুক্ষ কেশ তৈলাক্ত হয় না, ঋণদায়ে জঠর যন্ত্রণায় তাহাদের "ত্রাহি ত্রাহি" কাতর ক্রন্দনে বিলাসীর বিলাস-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। এ দুঃখ, দারিদ্র ত আমার বড় সাধের জিনিষ ; বীণাপানীর পদাশ্রিত বলিয়া কলঙ্ক, আমার ভূষণ। বঙ্গবাসীর সাহিত্যের প্রতি হতাদরের অভ্যাস জানিয়াও, জাতীয় শিথিলতার বিষয় বুঝিয়াও, কার্য্য ক্ষেত্রে সম্পাদকের সাজে বাহির হওয়ার এত সখ কেন? এ কথা যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি গাইয়াছেন : —

"একটী ও প্রাণ নাই, এত বড় দেশে'? তিনি এক সুরে গাইয়াছেন, আমি সুরান্তরে ভাবান্তর গ্রহণ করিয়াছি। প্রাণ আছে, কিন্তু নিদ্রিত, জাগিতে পারে। দেখিব, না হয় প্রাণের বক্ত টুকু মায়ের নামে নিবেদন করিয়া নীলা শেষ করিব। এই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। জানিনা মা, তুমি আমায় কোথায় নেও।

আমার কোন অভিভাবক-কল্প মহাত্মা লিখিয়াছেন "দুইটী উদ্দেশ্যে মাসিক কাগজ বা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে (১) অর্থলাভ (২) মান লাভ। দূরবর্ত্তী নগর হইতে আশা করিয়া অর্থলাভ করিতে পারিবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে কি? পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া খ্যাতিলাভ এদেশে দুর্লভ। ... যদি মাতৃ ভাষার প্রতি কর্ত্তব্য জ্ঞানে পরিচালিত হইয়া এই নূতন উদ্যমে প্রস্তুত হইয়া থাকেন তা হইলে কর্ত্তব্য যে সেই উদ্যমে অন্য মৃতপ্রায় পত্রিকার প্রাণ দান করুণ না। কিংবা স্থলে ২ লেখক সংগ্রহ করিয়া প্রতিষ্ঠালব্ধ পত্রের উন্নতি করুণ না . . ।" যে দুই উদ্দেশ্যের কথা তিনি বলিলেন, আমি সে সব আশায় প্রণোদিত হইয়া কার্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই নাই। অন্য পত্রিকায় যোগদান করিতে যাইয়া বঞ্চিত হইয়াছি !

হৃদয়ের একটী গুপ্ত কথা এস্থলে না বলিয়া পারিলাম না। যে শোচনীয় দিনে আমাদের সাধের "আলো সম্পাদক স্বদেশ প্রেমিক, সর্ব্বতো মুখিনী প্রতিভাবান নবীন উদ্যম শীল যুবক

বাবু নলিনীকান্ত সেন[১০০] মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ "নব্য ভারতে" পাঠ করিয়া অশ্রু প্লাবিত বক্ষঃ হইয়া ভগ্নমনে নিশি যাপন করি, সে দিন এক দিন গিয়াছে (ললিনী—প্রাণের ললিনী দেশের জন্য পরিশ্রম করিতে ২ আত্মহত্যা করিয়াছে বলিতে পারা যায়।) হায়রে সাধের 'আলো' বুঝি নিভিয়া গেল। উদীয়মান কবি শশাংক[১০১] বাবুর মুখের দিকে গোপনে চাহিয়া রহিলাম তিনিও বিষাদে ম্রিয়মান, শিথিল কর্ম্মা তিনিও বিষাদে ম্রিয়মান, শিথিল কর্ম্মা সে দিন হইতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিলাম, মা বলতে দিলেন। নব বলে, নবীন আশায় নোয়াখালীর মত স্থান হইতে ও "আশা"র অবতারণা করিতে কৃত সংকল্প হইলাম কায্য ক্ষেত্রে একা দাঁড়াইলাম। ব্যাস-কল্প গুরুর শ্রীচরণ-সমীপবর্ত্তী হইয়া আশীর্ব্বাদ চাহিলাম, " বৎস ! তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ দিলেন? সেই দিনই আমার হৃদয়-মন্দিরে "আশা"র প্রতিষ্ঠা প্রাণে "আশা"র চিন্তা লইয়া "চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মিলনী" উপলক্ষে তথায় গমন করিলাম। সে সভায়ও নলিনী বাবুর শোক গাথা প্রতিধ্বনিত হইল। অনেকেই কাঁদিল, আমিও কাঁদিলাম। নলিনী বাবুর শোক-সন্তপ্ত পিতা দেব-জ্যোতি :-বিকাশক গম্ভীর মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আমার পার্শ্বেই উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার বদন ভাতি নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণের নলিনীর শোকাশ্রু বক্ষে লইয়া নবীন বলে, অযোগ্য সাহিত্য-সেবক সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ আপ্রাণ চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হঈয়াছি। জননী বঙ্গভূমি, মা বীণাপাণি, আজ তোদের সন্তানের আনন্দ দেখ, হৃদয়ে বল দান কর। কার্য্যারম্ভেই পরীক্ষায় পতিত হইতে হইতেছে। জানি, সৎকার্য্যের সকল পরীক্ষাই মঙ্গলময় ফল প্রসব করে। চট্টগ্রামের জ্বরে স্বাস্থ্য নাশ হওয়ায়, মুদ্রা যন্ত্রের একটু গণ্ডগোল হওয়ায় প্রথম বষের প্রথম সংখ্যার কাগজই শৃঙ্খলানুযায়ী প্রকাশিত ও সাধারণ্যে প্রচারিত হইতে পারিল না !

অবশেষে অনুগ্রাহক গ্রাহক বর্গের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, মহাত্মগণ প্রথম সংখ্যায় কোন কোন বিষয়ের ন্যুনতা দৃষ্টে ভবিষ্যতের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। প্রাণের আশা, প্রাণের "আশা"কে ক্রমলাবণ্যময়ী করিয়া আপনাদের করকমলে সমর্পণ করি।

১ম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩

অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি[১০২] : মহাকবি কালিদাস, কুমুদচন্দ্র রায় : সকল ও নিস্কাম কার্ত্তিক চন্দ্র দাশ : বিবেকের দাশ [ঐ], কামিনীকুমার দাস : ভিক্ষুক [ঐ],শ্রীম বন্দ্যো : আশার বাণী [ঐ], শ্রী শচন্দ্র গুহ : বসন্তের একদিন [গল্প], দ্বিজদাস দত্ত : জাতি বা বর্ণভেদ, মাসিক সমালোচনা।

১ম ভাগ. তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩০৯

অন্নদাচরণ তর্ক চূড়ার্মাণ : ন্যয় প্রপঞ্চ. নলিনীকান্ত কর : কবি ও কাব্য, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী : দুগ্ধ, মি. ইউজিন সেন্ডো [কুস্তিগীর সম্পর্কে],

কলা-নিকেতন।

নিবেদন।

দিও না আমারে ক্ষমতা দিও না
যদি অবিচার করি হে
চাহি না চাহি না ধনের স্বামিত্ব
মঙ্গলময় হরি হে,
দিও না দিও না কোষাগার মম
কনকে মাণিকে ভরিয়ে।
হে প্রাণ বঁধুয়া, পরম পাবন
কি নামে ডাকিব গো?
জীয়াও আজিকে নবীন জীবনে
ঘুচাও নিশীথ ধ্বান্ত।
স্বর্গ নরকে তোমারি করুণা,
যা দাও মাথায় ধরিব।
হে সারাৎসার, আমি তো তোমার
তোমারি তরীতে তরিব।
হরি হরি সে কি! তব মহাদানে
আমি অনাদর করিব!
যে মায়া দিয়াছ প্রিয়ার উপর,
যে মায়া দিয়াছ বিত্তে,
নীল, পিঙ্গল হে বিরূপাক্ষ
কি রঙ্গে আঁকিব গো?
কর দয়া কর তোমারি মাঝারে
ডুবিয়া থাকিব গো।
লজ্জা-বারণ অনাথ-তারণ
ওগো দ্রৌপদী-কান্ত,
তোমারে ছাড়িয়া বৃথা ঢুঁড়িয়াছে
অধম অধ্ব-ক্লান্ত;
সে মায়া পড়ুক তোমারি উপরে
নতুবা জীবন মিথ্যে।
তোমারে লইয়া ঘর করি তবু
ভরিনি তোমারে চিত্তে!
দিও না আমারে ক্ষমতা দিও না
যদি অবিচার করি হে,

চাহি না চাহি না ধনের স্বামিতা
মঙ্গলময় হরি হে,
দিও না দিও না কোষাগার মম
কনকে মাণিকে ভরিয়ে।
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

আশার কিরণ

দাঁড়াও, অমন করি'
যেওনা, যেওনা ওরে
চরণে দলি' ;
সুপ্ত পন্নগ সে যে,
হয়তো উঠিতে পাবে
মরণ ঠেলি'।
বিষদন্ত ভগ্ন বলি'
সদা তা'রে কর তুচ্ছ ;
বৃথা কর আস্ফালন,
উচ্চে তুলি' ক্ষীণপুচ্ছ,
পীড় তা'রে, বধ তা'রে,
করোনা তাহারে ঘৃণা,
ভে'বনা সে অচেতন,
তোমার অধিক তার'
আছে শক্তি অতুলন ;
যে বিশ্ব তোমার বল,
সে যে তা'রো নিকেতন,
যামিনী যাপে—
সে শুধু প্রভাত আশে,
উঠিবে প্রভাতে পুনঃ
অমিত দাপে !
সে ধরেনি কোন দিন,
ধরিবে না কভু বুকে
সুপ্তি--মরণ,
নাশ তাঁর আশা-গুচ্ছ,
মরমে দলি,
কিন্তু সুপ্ত সপ সে যে
হয়তো উঠিতে পার
মরণ ঠেলি' !

অনাদি সে যুগ হ'তে
জ্বলেছে প্রদীপ, পূর্ণ
অমিত দাপে,
সে'দিনের শিশু তুমি,
আজি ওগো আসি' তূর্ণ
নিবা'বে তা'কে ?
স্বরগ হইতে হ'ত,
আজো হয় তাঁ'র মুখে
অমিয় ক্ষরণ !
বুকে তাঁ'রে রাখ বাঁধি,'
করো নাকো হতাদর,
অনাদরে, ধ্রুব–প্রায়
সাধনায় চরাচর
বিভাসি,' জ্বলিতে পারে
কোটিগুণ খরতর
আশার কিরণ,—
সে ধরেনি কোন দিন.
ধরিবে না কভু বুকে
সুপ্তি—মরণ !
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

আকাঙ্ক্ষা

আমার হৃদয় হ'তে
তোমারে দিব গো সুধা—
আত্মবলি–ফল প্রেমোজ্জ্বল ;
তোমারে সোপান করি,'
আমি যেন পে'তে পারি
জগতের পূত লক্ষ্যস্থল।
আমার স্বার্থের কারা
তোমার পরশ পেয়ে,
ভেঙ্গে যাবে ধরণীর বুকে,
আমার আঁধার গেছে,
উঠিবে নক্ষত্র কত,
পূর্ণ হ'বে পূর্ণিমা আলোকে।
হৃদয়–পুষ্পিত তীরে
অনন্ত বাজিবে বাঁশী,
শত ছন্দে উঠিবে আভাষ,

মুগ্ধ–মুক–অন্ধ ভাষা
অনন্ত রাগিণী ভবে,
অনন্তেরে করিবে সম্ভাষ।
সসীম ধূলির বুকে
রচিব অসীম স্বগ,—
জড়াজড়ে মধু সম্মিলন,
আপনার বাহু পাশে
আসবে বিরাট বিশ্ব—
আত্মায় আত্মায় আলিঙ্গন।
বিশাল প্রকৃতি যুড়ি'
প্রীতির সঙ্গীত–সিন্ধু
উদ্ধবেগে হ'বে উদ্বেলিত,
চন্দে, সূর্য্যে উপগ্রহে
ছুটিবে তরঙ্গ রাশি
বিশ্ব রাজ্য করি বিপ্লাবিত
আত্ম–মুগ্ধ নীরবতা
উঠিবে আকাশ ব্যাপি,
স্তব্ধ করি' জগতের ধ্যান,
তুমি আমি ডুবে যাব
বিধির বিশাল দেহে
প্রীতির সঙ্গীত শুনি শুনি'।
শ্রীকৃষ্ণকুমার মজুমদার বি,এ।

বিপদে

কেমনে পাইব গো তোমা?
তুমি যে গো প্রেম ময়!
পুতুল আমি গো, ভরা—
কামে প্রেমে এ হৃদয়।
নরকে ডুবিতে প্রিয়,
প্রেম পূণ্য রক্ষা করে,
তোমারে পাইতে পুনঃ
কাম পাপ টেনে ধরে।
রক্ষা কর, ধ্বংশ কর
যা' ইচ্ছা গো ইচ্ছাময়
সাধ্য নাই এ বিপদে
দয়াময়, শান্তিময়।

আরাম-আসন প্রসঙ্গ

প্রাচীন স্ত্রী-কবি

তারিণী দেবী

বর্ত্তমান কালে ভারতে স্ত্রী শিক্ষার যতটা প্রচলন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতে উহার ততটা বিস্তার না থাকিলেও উহা যে একবারে উপেক্ষিত ছিল না, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। লীলাবতী প্রভৃতির মত কত বিদূষী মহিলার আবির্ভাবে এক দিন ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হইয়াছিল, কে তাহার খোজ করিবে? মুদ্রাযন্ত্র-প্রভাবে দিগ্ দিগন্তে নাম জাহির করিবার এখন যেরূপ সুবিধা হইয়াছে, প্রাচীনকালে সেরূপ সুযোগ নিশ্চয়ই ছিল না। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনাভাবে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যকীর্ত্তির কতই ক্ষতিই সাধিত হইয়াছে! সাহিত্য জগতের কত মহার্ঘ রত্ন ও কত মহাজনের কীর্ত্তিই চিরতরে বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা এখন অসম্ভব। আরও একটা কথা আছে। প্রাচীন কালে ভারতীয় মহিলাগণ শিক্ষিতা হইয়াও বর্ত্তমান কালের মত বোধ হয় অবরোধের সীমা উল্লঙ্ঘন করতঃ পুরুষ-সমাজের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। এই কারণেও অনেকের নাম অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। অধুনা অবরোধ প্রথার মূলে পদাঘাত করিয়া মহিলাগণ সদর্পে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন না। ইহা জাতীয় চরিত্রের উন্নতি, না, অবনতি, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরাই তাহার বিচার করিবেন। ফলতঃ, স্ত্রী পুরুষ সকলের মধ্যেই এখন আত্ম প্রকাশের অভিমানটা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যে আমাদের স্ত্রী কবির সংখ্যা যথেষ্ট। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কবিও আছেন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে একাধিক স্ত্রী কবির আবির্ভাবের কথা এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যে 'শ্যামানন্দ 'দুখী' নিজকে 'দুঃখিনী'ও শিবানন্দ আপনাকে 'শিবা সহচরী' বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। পাঠক মেয়েলী নাম পাইয়া স্ত্রী কবির খোঁজ করিতে করিতে দেখিবেন, ভক্তির ইন্দ্রজালে পুরুষগণ স্ত্রী লোকের প্রতিকৃতিতে প্রতিভাত হইয়াছেন" মাত্র! কেবল "নীলাচলবাসী শিখি মাহিতীর ভগ্নী (প্রসিদ্ধ ৩[১] রসিক ভক্তের [১] জন) মাধবীর পদ 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে পাওয়া যায়।"*

পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, সম্প্রতি আমরা একজন স্ত্রী কবির আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি। তাঁহার নাম তারিণী, তিনি ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভবা। তাঁহার রচিত একটি মাত্র সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে; নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

বঙ্গের, প্রাচীন বড় বড় কবিগণেরই জীবনী পাওয়া যায় না; একটি মাত্র সঙ্গীতের রচয়িত্রী এই কবির জীবনী কোথা হইতে পাইব? গীতটির ভাব দেখিয়া বোধ হয়, তিনি শাক্ত সম্প্রদায় ভুক্তা ছিলেন।

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-১ম সংস্করণ, ১৬৯ প ১৭৪ পৃষ্ঠা। ত্রিপুরা—লাকসামের জমিদার নবাবা চৌধুরাণী মহোদয়া একজন মুসলমান স্ত্রী-কবি। ইনি 'রূপজালাল' নামে এক বৃহৎ মুসলমানী পুঁথির রচয়িত্রী। কাব্যখানি আমরা পাড়তে পাই নাই।

আমাদের এই মহিলা কবি কেবল এই কবিতাটিই রচনা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, বলা বোধহয় সঙ্গত হইবে না। আরও রচনা করিয়া থাকিলে, তাহা পাওয়ার আর উপায় নাই।

কবিতাটি চট্টগ্রাম সুচক্রদণ্ডী গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং কবিকে সুচক্রদণ্ডী বাসিনী না হউক, চট্টগ্রামবাসিনী বলিলে বোধহয় অযৌক্তিক হইবে না। রামপ্রসাদ প্রভৃতির রচিত একখানি হস্তলিখিত গীতা সংগ্রহ পুস্তকে এই কবিতাটি সন্নিবিষ্ট আছে। লিপিকারের নাম* রামতনু দেব শর্ম্মা (নিবাস সুচক্রদণ্ডী) ইনি চট্টগ্রামের "জ্যোতিঃ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পিতা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। পুঁথি খানিতে লেখার তারিখ নাই অনুমান ৪০/৪৫ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। প্রাপ্ত কবিতাটি এই :—

(মালসী)*

শিব দুর্গা নাম লও না কেন
মনরে আমার। ধু।
অন্তিম কালে তরাইবে
ভবনদী পার।
দুর্গা নামটি মকরন্দ,
শ্রবণে বহে আনন্দ,
নিরানন্দ, নিতান্ত
কপাল মন্দ যার॥
দুর্গা নামটি মহৌষধি,
পান কর নিরবধি,
কালো ভয় কালো চিন্ত
নাইক তোমার।
তারিণী ব্রাহ্মণী বোলে,
দুর্গা নামটি না লইলে,
শমন ভুবনে গেলে
দোহাই দিবে কার।

এই গীতের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে চাহি না। রসগ্রাহী, ভক্ত পাঠক নিজেই ইহার সৌন্দর্য্য সুধা পান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। আশা করা যায় যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ এই সুন্দর গীতটির রসাস্বাদন করিয়া এই স্ত্রী কবিকে বঙ্গীয় কবি শ্রেণীভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রী আবদুল করিম।

* এই গানটীও প্রবন্ধের অংশ বিশেষ, সম্প্রতি সুচক্রদণ্ডীর বান্ধব সম্মিলনীতে লেখক কর্তৃক পঠিত হইয়াছে। ১৯/৩/০৯ "জ্যোতিঃ" পত্রিকায় তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

আঃ সঃ।

ঢাকা দক্ষিণ

বঙ্গের পূর্ব্ব প্রান্তে আসামে শ্রীহট্ট বা প্রাচীন শ্রীক্ষেত্র। এ জেলার "ঢাকা দক্ষিণ" গ্রাম ইতিহাসে পরিচিত। এই গ্রামটী শ্রীহট্ট সহরের কিঞ্চিদধিক ষড় ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে অবস্থিত। গণ্ড শৈলমালা-সমাকীর্ণ বলিয়া, এই স্থানের নৈসর্গিক শোভা অতীব মনোরম ; স্থানে স্থানে বিশৃঙ্খল বনস্পতি সমূহ বিরাজিত থাকিয়া প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য বিকাশের সহায় হইতেছে। বনভাগের কোথায়ও বা বিহঙ্গ নিচয়ের কাকলী, ভ্রমণশীল মানব নিকরের কর্ণ কুহরে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। কোথায়ও বা সুশ্যামল শষ্প-পরিবেষ্টিত গুল্‌মাদি প্রকৃতির সুষমার বিচিত্রতা উৎপাদন করিতেছে। মৃদুকলনাদিনী কল্লোলিনী বনভাগের সৌষ্ঠব বিকাশ কল্পে প্রবাহিতা। ভীষণ হিংস্র শ্বাপদ-কুল অরণ্য প্রদেশে নির্ব্বঘ্নে অধিকার বিস্তাব করতঃ বিক্রমের পরিচয় প্রদানে অপর জীবকুলের ভীতি উৎপাদন করিতেছে। এই "ঢাকা দক্ষিণ" শাখা-মৃগগণের বিহার ভূমি। দলবদ্ধ চপল কপিকুলের শাখা হইতে শাখান্তরে ঝম্প প্রদান ও বিবিধ অঙ্গ ভঙ্গি দশনের কৌতুহল, প্রবাসীর পর্যটন ক্লেশ নিবারক মহৌষধ। প্রসন্নসলিলা কুসিয়ারা (মেঘনার উপনদী) দুই কুলে গ্রামের পাদ বিধৌত কবিয়া পশ্চিম বাহিনী লইয়া প্রাণের টানে প্রিয়-সঙ্গমোদ্দেশে ছুটিয়াছে। তীরে তীরে বল্লী-ভুজ-বেষ্টিত মহীরুহ দূরে দূরে দণ্ডায়মান হইয়া নীববে মিলন-সুখানুভবে বিভোর ! বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজ গ্রামের পূর্ণতা বিধান করিতেছে। শৈলে শৈলে বিরাজিত লোকালয় সমূহের দূর দৃশ্য আগন্তুকের নয়ন-মনোমুগ্ধকর। প্রকৃতির বিচিত্রতার এইরূপ লীলাক্ষেত্রে মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্র জন্মপরিগ্রহণ করিয়া কিশোর ও বাল্য লীলা সমাপ্ত করতঃ স্ফুটনোন্মুখ যৌবন সীমায় পদার্পণ করেন। অবশেযে নবদ্বীপ গমন পূববক শ্বশুরালয়বাসী হন। চৈতন্য দেবের পিত্রাবাস বলিয়া এই স্থানটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়, পবিত্র বলিয়া মান্য করেন ; স্থানের নামকরণ সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায় নাই। এই স্থানে চৈতন্য দেবের প্রভাব সম্বন্ধীয় একটি কিম্বদন্তি আছে ; নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল। জগন্নাথ মিশ্র শ্বশুরালয়বাসী হইলে, মাতা স্বীয় আবাসেই রহিলেন। তাহাব পর লোক.গমনের পর, শোকাতুরা জননী পৌত্রমুখ সন্দর্শনের বাসনা প্রকাশ করিয়া তাঁহাব নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। চৈতন্যদেব সন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণান্তর পিতামহীব বাসনা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে সশিষ্য "ঢাকাদক্ষিণ" গ্রামে আগমন করেন। পুত্র শোকাতুরা জননী গৌরের সন্যাস-বেশ অবলোকনে অধিকতর শোকাতুরা হন ও পৌত্রের এ বেশ পরিত্যাগের জন্য আগ্রহাতিশয় ও নানা প্রকার আবদার আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুতেই চৈতন্য দেবের অভিপ্রেত মনোভাবের পরিবর্ত্তন সাধিত হইল না। জগৎ মহাপুরুষের ভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার প্রয়াস বৃথাই পাইয়া থাকে। অতঃপর অলৌকিক ক্ষমতা সন্দর্শনে রোরুদ্যমানা পিতামহী তাঁকে নিজ ও নিজ কুলবধুগণের জীবনোপায় বিধানার্থ অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হয়। চৈতন্যদেব তত্রত্য কোন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করত: সপ্ত দিবস উক্ত দ্বারোন্মোচনের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। কিন্তু

উপস্থিত জনগণের বিলম্ব অসহ্য হওয়ায় অকালে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে, গৃহে একটি অপূর্ণ দারু–মূর্ত্তির আবির্ভাব দৃষ্ট হইল।[১] প্রভু, জনগণের প্রতি ঈষৎ বিরক্তির ভাব প্রদর্শন করিয়া বৃদ্ধাকে "যাবৎ এ দারু মূর্ত্তি এ স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে তাবৎ এ বংশের কাহারও অন্নাভাব হইবে না।" এই বলিয়া আশ্বস্ত করেন। সংখ্যার আধিক্য স্বত্ত্বেও অদ্যাপি সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে। যে বাড়ীতে ঐ মূর্ত্তিটি বিরাজিত তাহা "মহাপ্রভুর বাড়ী" বলিয়া অভিহিত হয়।

রথযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে এই স্থানে বহু নর–নারীর সমাগম হয়। চৈত্র মাসের প্রতি রবিবারে বহু লোক পূণ্য ব্যাপদেশে এই স্থানে সমবেত হইয়া থাকে। স্থান–মাহাত্মে আকৃষ্ট হইয়া আমি চৈত্র মাসের রবিবাসরীয় কোন মেলা উপলক্ষে তথায় গমন করি। আমার শ্রীহট্টীয় আবাস হইতে পদব্রজে গমনান্তর সায়ংকালে তথায় উপনীত হই। ভ্রমণ ক্লেশ দূরীকরণ মানসে মহাপ্রভুর বাড়ীর অদূরে কোন বৃক্ষ মূলে উপবেশন করি। সমীরণ মৃদু সঞ্চারে আমার পথশ্রান্তি দূরের ব্যবস্থা করিল। এদিকে আরতির খোল--করতালের তানলয় মিশ্রিত ঝঙ্কারে গগন মেদিনী প্রকম্পিত করিতেছিল। এই ত্রৈর্য্যত্রিকী নিনাদের সমতানে সুধামাখা হরিনাম–সঙ্গীত কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইলে আমি অভূতপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ–রসে আপ্লুত হইয়া মায়াময় মানব জন্ম সকল বোধ করিলাম ! দূর হইতে সে মধুর ঝঙ্কার অনুভব করিয়া আশা তৃষ্ণা মিটিল না ; অনতিবিলম্বে মহাপ্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় মহাপ্রভু সন্দর্শন কায্য শেষ হইলে, পরিচিত কোন মিশ্র মহাশয়ের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। মিশ্র ভবনটি মহাপ্রভুর বাড়ীর সংলগ্ন। শত শত ভক্ত–কণ্ঠধ্বনি, খোল করতালের প্রাণস্পর্শী নিনাদ–তরঙ্গ নৈশ আকাশ ও বাতাস-বিকম্পিত করিয়া দিক্‌বধূগণকে জাগাইতেছিল। নিদ্রা দেবী অপ্রসন্নমনে আমার নিকট হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইল। পার্শ্বে সঙ্গীতের উন্মাদকর ধ্বনি ; আমার কঠিন হৃদয়েও একটু আবেশ জন্মিল। একবার শয়নে শয়নে থাকি আবার আবেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া গৌরাঙ্গ–ভক্ত গায়ক গায়িকাগণের সহিত মিলিত হইয়া মহানন্দ উপভোগ করি।

যাত্রীগণের মধ্যে নীচ কুলোদ্ভবা রমণীর সংখ্যাই অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। রমীগণও হরি–প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য–গীত করিতে লাগিল। এই ভাবের উচ্ছ্বাসের সময়, (লিখিতে যুগপৎ লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হইতেছে) কোন কোন দুবৃত্ত নরপিশাচ নবীনা যুবতীগণের সহিত নর্ত্তনছলে বীভৎস কার্য্যাদির সূচনা করিয়া পবিত্র ক্ষেত্রে অপবিত্রতার সমাবেশ করিতে কুণ্ঠিত হইতছে না। বড় মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রাপ্ত হইলাম। লোক পরম্পরা জ্ঞাত হইলাম, মহা প্রভু সন্দর্শন সময়েও এতাদৃশ কাণ্ড ও সময় সময় ততোধিক লোম হর্ষণ ঘটনানিচয় সংঘটিত হইয়া, ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক দিগকে "নেড়ানেড়ীর কাণ্ড" উল্লেখে, ঘৃণার কঠাক্ষপাত ও মর্ম্মন্তুদ সমালোচনার অবসব দেওয়া হইয়া থাকে। এতাদৃশ অজ ও যণ্ড

[১] . ইনি বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক শ্রী ক্ষেত্রে ইন্দ্রদ্যুম রাজার জগন্নাথ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ গল্পের ছায়া। ভক্তগণ কর্তৃক বিবৃত বলিয়া অনুভূত হয। আ: স:

কুলতিলকেরা কিরূপে হিন্দু ধর্ম্মের সুকোমল ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইতেছে ! তাহা ভাবিতেও শরীর সিহরিয়া উঠে। পবিত্র ধর্ম্ম মন্দিরে, জননী শ্রেণী অবলা কুলের প্রতি পশুগণের এরূপ অত্যাচারের কি কোন প্রতিবিধান নাই? বৈষ্ণব সম্প্রদায় কি মুক্ত-কচ্ছ হইয়াই চিরকাল থাকিবেন? হিন্দুর দেশ বুঝি এরূপেই রসাতলে গেল।

এই বর্ব্বরোচিত কাণ্ডের প্রতিবিধানে ক্ষীণ শক্তি নিয়োজিত করিয়া বিশেষ কোন ফল পাইলাম না, কামিনী কুলের কেহবা ইচ্ছায় কেহবা ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া অলক্ষ্যে, এ সব অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকেন। আমার পথাবলম্বী হইয়া পাষণ্ডদিগকে সমুচিত শিক্ষা ও শাস্তি বিধান করিবার লোক তাই দুর্ঘট হইল। আমি প্রভাতে কার্য্যক্ষেত্রে প্রস্থান করিলাম; প্রসঙ্গত: হিন্দু সমাজের বিশেষতঃ বৈষ্ণব সমাজের অগ্রণীদিগকে এবম্বিধ অত্যাচার প্রতিবিধানে প্রয়াসী হইতে, প্রাণপাত করিয়াও হিন্দু ধর্ম্মের মহিমা বদ্ধন জন্য সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করি। অন্যথা কিয়ৎ কাল পরে সেই পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্র "পঞ্চমকারর' বিকারে কলঙ্কিত হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত।

দুঃখ [প্রবন্ধ], মাসিক-সমালোচনা।

১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩০৯

কুমুদবন্ধু রায় : সকাম ও নিস্কাম কর্ম্ম, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী : খট্‌খটা বাবা [ভ্রমণ], করুণাকিশোর গুহ : মনে এক, মুখে আর [প্রবন্ধ], রসিকচন্দ্র রায় মহাশয় : এবার আশা [ঐ], দ্বিজদাস দত্ত : শাস্ত্রের বিরোধ, শান্তিপ্রিয় শর্ম্মণ : সহানুভূতি ও সংমিশ্রণ, সুবাসিনী কর : কল্পনা [কবিতা], যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় : শকুন্তলা [ঐ], রেবতীচরণ খাস্তগীর : সাধ [ঐ], অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী বিদ্যাভূষণ : তিনটি ছবি [ঐ], মঙ্গলগীতি [ঐ], জাতীয় সাহিত্যের মহাসমিতি [প্রবন্ধ], ত্রৈলোক্যনারায়ণ বিশ্বাস : মনের কথা [ঐ]।

১ম ভাগ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩০৯

শশধর সেন : অদ্বৈতবাদ, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী : খট খটা বাবা [ভ্রমণ], আনন্দ রায় : আকারেজা ও রাজন্যায় : কুমুদবন্ধু রায় : জাতি বা বর্ণভেদের প্রতিবাদ,

ভাষানুসন্ধান

বাঙ্গালার গ্রাম্য-গীতি

"ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎপরা"—এই ক্ষুদ্র বাক্যটি কেমন অন্বর্থ! বস্তুত: সঙ্গীতের মত এমন মনোমুগ্ধকর, চিত্তহারী ও হৃদয়ের অন্তস্থলস্পর্শী জিনিষ এ ধরাধামে আর দ্বিতীয়টি নাই! দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে পলিতকেশ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই ইহার মোহিনী শক্তিতে বিমুগ্ধ। ইহার আশ্চর্য্য প্রভাবে কথা ভাবিতে গেলে মন বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়। প্রাণান্তক আশীবিষ বংশীনাদে উন্মত্ত হইয়া অহিতুণ্ডিকের হস্তে নৃত্য করে; পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী 'ডালা'-শিকারীর বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অবোধ কুরঙ্গ প্রাণ হারায়, ইহা ত কাহারো অবিদিত নাই।

বলিহারি ঈশ্বরের করুণা, বলিহারি মানবের উদ্ভাবনী শক্তি! নন্দ–নন্দনের বংশী–গানে এক দিন যমুনা উজান ছুটিত; মায়ামুগ্ধ তাপিতপ্রাণ মানব সঙ্গীত–মোহে মুগ্ধ হইবে, বিচিত্র কি?

অনেকেই পূর্ব্ব বঙ্গের 'বাঙ্গাল মাঝিদিগের' সংস্রবে আসিয়াছেন। বিশাল বারিধি–বক্ষে, নক্ষত্র খচিত গগনতলে, মৃদুমন্দপবনহিল্লোলে তাহারা দাঁড় টানিতে টানিতে কি যে মধুর সঙ্গীত–তান ধরে, নৈশানিল–সঞ্চালিত সেই সঙ্গীত–লহরী কর্ণে প্রবেশ করিয়া শ্রোতার মনে কি অপূর্ব্ব ভাবের ও সুখের সঞ্চার করিয়া দেয়, এক দিনও যাঁহাদের এ সুখ–লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে, তাহা কেবল তাঁহারই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন।* এই সকল গান 'সারিগান', 'হকিয়ত' ও 'প্রভাত' গান নামে পরিচিত। 'সারি গান' গুলি কৃষকগীতি মাত্র। 'হকিয়ত' ও 'প্রভাত' গুলি সকল শ্রেণীর লোকেরই গেয়। 'সারিগানে' সকল ভাবের গীত আছে। এই গানের ভাব ও ভাষা যেমনই হউক, কেবল সুরের জন্যও এই গান শুনিতে ইচ্ছা যায়। তাহা নিতান্তই চিত্তহারী।

'হকিয়ত' ও 'প্রভাত' গানে ধর্ম্মভাব প্রধান। 'প্রভাত' গানে প্রণয়াদিরও সংস্রব আছে, 'হকিয়তে" আদৌ তাহা নাই। 'হকিয়ত' একবারে ধর্ম্মভাবমূলক। এই গুলি মুসলমানদের নিজস্ব বলিয়া বোধ হয়। মুসলমানী কথায় বলিতে গেলে ইহাদিগকে 'ফকিরী গীত' বলা যায়। হকিয়তের গানে মুসলমান ধার্ম্মিকগণের অপূর্ব্ব ভাবাবেশ হয়। 'প্রভাত' গুলি 'হকিয়তেরই অনুরূপ; তবে প্রভেদ এই যে, 'প্রভাত' গুলি রাত্রের শেষ ভাগেই 'প্রভাত' রাগে গাহিতে হয়। সূর্য্যোদয়ের পর আর 'প্রভাত' গাওয়া যায় না। তজ্জন্যই বোধহয় ইহাদের নাম 'প্রভাত'। 'হকিয়ত' ও 'প্রভাতে নিকৃষ্ট ভাবসমাবেশ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। 'সারি গানের' সুরটা খুব মিষ্ট হইলেও তাহাতে অনেক নিকৃষ্টভাব ও অশ্লীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকটাই ভদ্রলোকের শুনিবার অযোগ্য। তাই মনে হয়, 'হকিয়ত' ও 'প্রভাত' গুলির রচয়িতা কিছু শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক লোকগণ আর 'সারি গান' গুলি ইতর শ্রেণীর লোকের রচনা। তবে 'সারি গানে' অশ্লীলতা বিবর্জ্জিত গান এক বারে নাই, এমন কথা দূরে থাকুক, তাহাদের মধ্যেও অনেক সুন্দর গান পাওয়া যাইতে পারে।

'সারি গান' গাহিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। কৃষকগণ স্বকর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া মনের আনন্দে এই গান গায়,—মাঝিগণ দাঁড় টানিতে টানিতে 'হকিয়ত' ও 'প্রভাত' গায়। অপর লোকেরাও যে গায় না, তাহা নহে। এই অঞ্চলে পূর্ব্বে এই সকল গানের খুবই প্রচলন ছিল। অধুনা, জীবন সঙ্কটের তীব্র তাড়নে প্রাচীন কালের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ গুলিই একে একে লোপ পাইতে বসিয়াছে। এই সকল গীতের অবস্থাও তথৈবচ। কোন আমোদ প্রমোদের প্রতি এখন লোকের আর তাদৃশ আন্তরিকতা নাই। না থাকিবারই কথা; কারণ পেটে থাকিলেই পিঠে সয়! ইংরেজের সুখের রাজত্বে আমাদের ত আর পেটে অন্ন পড়ে না! নাম মাত্রাবশেষ আমোদোৎসব এখনও যাহা আছে. তাহাদের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হওয়ার বড় বাকী আছে বলা যায় না। সুতরাং এই দুর্দ্দিনে আমাদের প্রাচীন জিনিষাদি ধ্বংশমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্র সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

---

* শুনিয়াছি C.B Clarke সাহেব মাঝিদিগের এরূপ গানে মুগ্ধ হইযাছিলেন। আ: স:

দেশে এখন 'সারি গান' প্রভৃতি গাহিবার লোক একরূপ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে যেই প্রাচীন বয়সের লোকগণের অন্তর্দ্ধান হইতেছে, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই গান গুলির ও বিলোপ ঘটিতেছে। প্রাচীন লোক ভিন্ন অপরে এই সকল গান জানে না। স্বজাতি প্রেমিক সত্বর হউন ; নতুবা কিছু কাল পরে অন্ধ অনুমান সাহায্যে মাত্র আমাদিগকে এই সকল গীতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে হইতে দেওয়া আমাদের কলঙ্কের কথা, কেন না, এই গুলিই আমাদের নিজস্ব ও খাঁটি সম্পত্তি। ইহাদের অভাবে জাতীয় ইতিহাসের একাংশের অভাব ঘটিবে, বুঝিতে পারিতেছেন কি? যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে গীত গুলির প্রাচীনত্ব এবং মৌলিকত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বস্তুত: এই সকল গান আধুনিক রচনা নহে। অধুনা আর তাহা রচিত হয় না। বলিয়া রাখা উচিত, অনেক গীত পাঠ করিলে তাহাতে কিছু মাত্র সৌন্দয্য উপলব্ধ হইবে না। এই গুলি পাঠ করিবার জিনিস নহে,— গান গুলি শুনিবার জিনিস। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহাদের সুরই চিত্তবিমোহন। পাঠে সে সুরের স্বাদ কোথা হইতে আসিবে? সুন্দর নাই বা হউক, জাতীয় প্রাচীন সম্পত্তির নিদর্শন স্বরূপ এই সকল রক্ষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। নিম্নে কয়েকটি 'হকিয়ত ও 'প্রভাত' তুলিয়া দিতেছি। পাঠকগণ দেখিবেন, তন্মধ্যে কয়েকটা কবিত্ব হিসাবে ও রক্ষণোপযোগী।

১। হকিয়ত।

(১)
নিশ্চিন্তে রাহছ কার বলে রে,
মনুরা ভাইরে?
নিশ্চিন্তে রহিছ কার বলে। ধু।
সজাগে থাকিও মন,
খাক-কারা অচেতন,
ডাকাইতে ঘিরিয়া লৈল বাড়ী।
কি লাগি বণিজে (১) আইলুম,
ধন ডিঙ্গা ডুবাইলুম,
কি লৈয়া যাইব সাউদের (২) আগে।
সোণার মন্দির শূন্য করি,
হীরামণ তোতারে ধরি,
লই গেল বিষম বহরী।
কৃপাতরী দান দিয়া,
দুঃখ সিন্ধু তরাইয়া,
অধীনেরে কর গো নিস্তার।
সৈয়দ আবদুল্লা ভণে,

১. বণিজে–বাণিজ্যে।
২. সাউদ–সাধু, সদাগর।

লক্ষ্য নাহি প্রভুবিনে,
এই সঙ্কট হনে (৩) তরাইবার॥

(২)
ধড়ের মাঝে রে, আলো
কানুর (৭) মন মজিল রে,
এবে কানু চল দেশে যাই। ধু।
ও মন মন রে,
কোথাতে আছিলা মন,
কোথা তোমার সিংহাসন,
কোথা থাকি দিলা দরশন।
দরশন দিয়া রে,
কোথা ছাপাই রৈলারে,
এ অকুল দরিযার মাঝে ভাসাইলা রে॥
হিঙ্গুল মন্দিরের ঘরে,
ঘুণে খাইল জর জর,
বত্রিশ বান্ধে এড়ি দিল জোড়া।
উপরে লেপনী দিয়া,
মালুম ঘুমাইল গিয়া,
বাজার লুটিয়া বাইল চোরা রে॥
ঐ কূলে ডালিম্ব গাছ,
ডাল মেলে চারি পাশ,
মধ্যম ডালে বকুলার বাসা।
আধারের লোভে রে,
ভূমিতে পড়িল রে,
গলেতে বাজিল প্রেম লাসা রে॥
(অসম্পূর্ণ)

(৩)
কেনে বুঝাইলে না বুঝ তুমি
পাগলা ময়না।
বুঝিয়া কুল ধর তুমি। ধু।
সকল পরের মেলা,
তাহাতে ময়নার খেলা,

---

৩ হনে-হন্তে-হইতে।
৪ এহ 'কানু'—আমাদের পূর্ব্ব প্রচারিত কবি 'আলী রাজার' নামান্তর। তিনি সাধারণতঃ 'কানু ফকির' নামে প্রসিদ্ধ।

ময়না ভাইএ জানে নানা সন্ধি।
শিকারা উড়িয়া গেলে,
লাগত্ নাহি পাইলে,
অহ তামা দেখাইলে নহে বন্দী॥ (?)
হালিয়া [৫] ভাই চতুর থাকে,
গরু দুটি তাজা রাখে,
সময় বুঝি হাল খানি ছাড়ে।
কাল বুঝি কৃষি করে,
এক শত দুনা [৬] ধরে,
অহ। না বুঝিলে রাজদণ্ডে মরে॥
সাধু ভাই চতুর হৈলে,
ধাব বুঝি নৌকা বাইলে,
কি করিব তরঙ্গ তুফানে।
ঘাটে ছাপাই নৌকা খানি,
বুঝি করে বেচাকিনি,
অহ। রাঙ্গ বেচিয়া সোণা কিনে॥
কহেবে আবঝল হীনে,
ঘর খানি দিনে দিনে,
বন্ধন খসিয়া যায় নিত।
ময়নারে অনাথ করি,
কোন ঘড়ি ঝাঁপ মারে,
অহ! তনের যে দেখি বিপরীত॥

২। প্রভাত।

(১) জগতের লোক রে,
প্রভুর নাম মনে কর ধ্যান। ধু।
নিশি অর্দ্ধ শেষ ভাগে,
ভানু প্রকাশিবার আগে,
সেই সনে নুরে [৭] করে খেলা।
শয্যাতে উঠিয়া জাগি,
যেই লইবা লও মাগি,
প্রভুর করমের [৮] দ্বার মেলা॥

৫ হালিয়া--কৃষক।
৬ দুনা —দুইগুণ (এস্থলে গুণ। আঃ সঃ)
৭ নূর আলো; heavenly light
৮ করম—বকশিস; (এখানে) অনুগ্রহ।

হায় বন্দা উঠ উঠ,
ফজরের নিদ্রা টুট,
ছাড় নিজ রমণীর পাশ।
দেখ যত পক্ষী কুল,
গাহে সবে পুনঃ পুনঃ,
পরম সুস্বরে করে রব ॥
সেই সমে ইব্লিছ [৯] পাপী,
নিদ্রায়ে ধবযে চাপি,
নিদ্রার মোহনী দিয়া যায়।
সেই পাপিষ্ঠের চিত্তে,
এবাদত [১০] ভঙ্গ কৈত্তে,
অবিরত কুপন্থ দশায় ॥
শ্রী আমিরালী কহে,
এ তন [১১] আপনা নহে,
হইবেক মাটীর ভোজন।

. .. ...

(২)
দুঃখিনীব দুঃখ বে,
কৈওরে শ্যাম বন্ধেব [১২] লাগ
পাইলে। ধু।
কৈওরে শ্যাম বন্ধের ঠাই,
এ দেশে মনুয্য নাই,
আর নাইরে কোকিলাব বা।
আর নাইরে ববিশশী,
কিরূপে পোহাইব নিশি,
বন্ধেব লাগি জ্বলে সব্বগা ॥
এ দেশের পাড়া পড়শী,
সকল পরাণের বৈরী,
আর বৈরী ঘরের গুরু জন।
শাশুড়ী ননদী বৈরী,
তাহাদের গঞ্জনায মরি,

---

৯ ইব্লিছ- সযতান (satan)।
১০ এবাদত- আবাধনা।
১১ তন—তনু।
১২ বন্দেব—বন্ধুব।

নানান ছলে খাবাইল মারণ॥
শাশুড়ী মরি যাইত,
ননদীরে বাঘে খাইত,
তবে হৈত মুই নারীর বসতি॥

... .

(৩)
মালিনীরে লই যারে তোর ফুল।
আমার ফুলেব সাধু ঘরে নাইরে,
চিত্ত বেআকুল। ধু।
আল্লায় দিছে ধন জন,
সোয়ামীর দিছে সুখ,
কোন্ বিধি হরি নিলরে মোর এই রঙ্গ
কৌতুক॥

(৪)
রাগ—কুহু।
ওরে অবোধ মনুরারে [১৩],
জাগরে প্রভাতে।
ইব্লিছ পাতকী সবে ফিরে সাথে সাথে।
জাগিয়া প্রভুরসেব এক মনে কর।
মরিবার কালে তুমি সব আগে মন॥
জীবন থাকিতে যদি পার মরিবার।
তবে কাল যম হস্তে ভয় নাহি আব॥
নুরেব ফিরিস্তা আসি নুর বাটি যায়।
শয্যা সুখে নিদ্রা যাও একি ব্যবহার॥
বনবাসী পাখী সবে বিপিনে থাকিয়া।
জপয়ে প্রভুর নাম প্রভাতে জাগিয়া॥
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে আমি ভোর মতি

অনেক গুলি গীত অসম্পূর্ণ রহিল। ষড় ঋতুর লীলা ক্ষেত্র বাঙ্গালার প্রতি পল্লীই এই সকল গীতের ঝঙ্কারে মৃখরিত। চেষ্টা করিলে এরূপ সহস্র সহস্রগীত সংগৃহীত হইতে পারে। পাঠকগণের নিকট সানুনয় অনুরোধ, তাঁহারা যথা সাধ্য আমাদের এই সংগ্রহ কার্য্যে সহায়তা করিবেন। আশা আছে, মাতৃ ভাষার খাতিরে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রী আবদুল করিম।

১৩ মনুবা—মন।

চিহ্ন-বিভ্রাট

কথাটা শুনিয়া কেহ চমকিত হইবেন না। সাহিত্য সেবকগণের মধ্যে, আমি যতটুকু জানি, আমার ধারণা, প্রায় কেহই, কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার ফেরার আসামী নহেন, যদি কেহ থাকেন, তবে আছেন কোন বিলোল কটাক্ষের ফেরার—একটু সোহাগের গ্রেপ্তারী পরওয়ানার প্রতীক্ষায়ই আছেন, ধরা দিবার শুভ মুহূর্ত্ত গণনায় ব্যস্ত আছেন। কথাটা আবার আমার উদ্দেশ্যের পথে টানিয়া আনিতে হইল। আমি এক্ষণ সাহিত্যের আসরে নামিযাছি, নব বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে নব নব কথা, সাহিত্যের অঙ্গের নব নব পুষ্টি-চিন্তা-বিষয়ই আমার ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা ও ব্যবসায়। তাই চিং বিভ্রাটও সাহিত্য-বিষয়ক, গোল মাল কতকটা মিটিল ত?

চিহ্ন গুলি কি? মনের ভাব সাধারণত: ভাষায় সাহায্যেই প্রকাশিত হয় কিন্তু একা ভাষা বোধ শক্তির সম্পূণ সাহায্য করিতে অক্ষম। তাই মনের ভাব বুঝিবার নিমিত্ত ভাষায় অঙ্গ ভঙ্গি বা বিরামই চিহ্ন। যখন শ্রুতি ও স্মৃতির যুগ ছিল,লেখা পডার নাম গন্ধও ছিল না নয়নের কায শ্রবণে হইত, হস্ত ও মুদ্রা যন্ত্রের কায মনেব ভিতব ছিল ; তখন, চোখ, মুখ, অঙ্গের ভঙ্গি স্বরেব ও নিশ্বসের বিরাম দ্বারাই ভাষাব ভাব পরিস্ফুট হইত। ক্রমে শ্রুতি ও স্মৃতির যুগ অতীত হইল (বোধ হয় সাধে অতীত হয় নাই, শক্তিবও অবনতি হইতে ছিল, বত্তমান অবস্থান প্রতি লক্ষ্য করিলেই অবনতি হইতে ছিল, বত্তমান অবস্থান প্রতি লক্ষ্য কবিলেই উদ্ধতন স্থলের অবস্থান সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাব) ধাতু-পত্র প্রস্তর ও বৃক্ষ পত্রে লেখনের যুগ আরম্ভ হইলে। নানা প্রকার জীব ও উদ্ভিদেব অবয়ব দৃষ্টে অক্ষবের ধাবণার সৃষ্টি আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিরাম চিহ্নেব অবতাবণা হইল। অক্ষরও চিহ্ন বিশেষ অন্দেহ নাই। অক্ষব আবিস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বিরাম চিহ্ন আরম্ভ হয় এমন নহে, আবশ্যক বোধে তৎপব, কোন সময় অক্ষরকাবগণ অপেক্ষা একটু বেশী চিন্তাশীল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বাবা চিহ্নেব সূত্রপাত হয বলিয়া অনুমিত হয। লোক যতই সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠিতে আবম্ভ করে ততই তাহাব তাহার অভাব বৰ্দ্ধিত হয। লেখার চিহ্ন সংযোগ ও সেইরূপ বৰ্দ্ধিত সভ্যতার ফল। সভ্যতাও প্রথমত: এক দিনে বা একশত বৎসরেও লাভ হয় না। তাহ বলিতে হইতেছে চিহ্ন গ্রহণ করিতে মধ্য যুগের মানুষের কয়েক শত বৎসর লাগিয়াছিল। প্রথমে চিহ্ন একটি মাত্র ছিল, বত্তমান আকাবে পয্যবসিত দাড়ির (।) আদি পুরুষই সেই চিহ্নটি। পরে স্থান বিশেষে দ্বিগুণ করিয়া ব্যবহৃত হইত (॥)

তৎপর বত্তমানের তারা চিহ্ন (*) তাহাদের দলে স্থান পাইল। দাঁড়ি বা পূণচ্ছেদ সংস্কৃত হইতে বঙ্গ ভাষায় গৃহীত, তারা চিহ্ন মুসলমান রাজত্বের ভগ্নাবশেষ চিহ্নের অন্যতম। ইংরেজ রাজত্বেব পূর্ব্বেই আমরা এসব আপন রক্ত মাংসের সহিত মিশাইতে পারিয়াছি। তৎকালে এইসব চিহ্নও সৰ্ব্বত্র অর্থসঙ্গতি ক্রমে ব্যবহৃত হইত না। ভারতের বা জগতের আদি যুগেব মানব মাত্রই কাব্য-রস-পূণ। যাহা দেখিতে, ভাবিত, তাহাতেই কবিত্ব পাইত। তাই যত কিছু গ্রন্থ সবই কবিতার অনুকরণে শ্লোকরূপে গ্রথিত। আবশ্যক বোধে গীত হইত। কবিরা কিন্তু পরের আবশ্যক অনাবশ্যক বোধের ধার ধারেন না। আপন মনে তাহারা চির কালই গাহিয়া থাকেন। পরে তাহা লোকের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায় ; স্বভাবই

কবির গানকে তত্তৎ যুগের উপযুক্ত করিয়া কবিকণ্ঠ হইতে নি:সৃত করায়।

বলিতে ছিলাম চিহ্নাদি সর্ব্বত্র অর্থ সঙ্গতি ক্রমে ব্যবহৃত হইত না। কবিতার বা শ্লোকের প্রথম চরণের অন্তে একটি দাঁড়ির ন্যায় রেখা ও দ্বিতীয় চরণের অন্তে দুইটি দাঁড়ির ন্যায় রেখা ব্যবহৃত হইত। কখনো বা তারা চিহ্ন ঐ প্রথানুযায়ী ব্যবহৃত হইত। কখনো বা তারা চিহ্ন ঐ প্রথানুযায়ী ব্যবহৃত হইত।

মনের ভাব সরল ভাবে প্রকাশ করিতে যাইয়া মানুষ স্বকীয় ভাষার সৃষ্টি করিল। অবশ্য সকল প্রকার প্রাণীর এমন কি গাছেরও ভাষা আছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, ভয়, লজ্জা প্রভৃতির আবেশে ভাষায় অনেক অব্যয়ের ও কোন শব্দের অনুকরণে মনের ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া অনেকে অনুকার অব্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। পরিবর্ত্তন ও নূতন কিছু করার ঔৎসুক্য মানুষেব স্বভাব। কাযেই ব্যবহারের ২/৪টি নিয়মের একতা দৃষ্টে ব্যাকরণে ভায়া সাজ গোজ করিয়া মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথম কিন্তু কিছুতেই পাত পাতিতে পারেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ভাষার সংস্কার বিধান, বোধ হয় তাঁহার কৃপায়ই চিহ্নের সূচনা। বৈয়াকরণিক চিন্তাশীল হইতে পারেন, কবির ন্যায় উন্নতমনা ও সুখী নহেন। পরের দুঃখে যাহার চোখে জল আসে সে সুখী নয়ত কে সুখী? ক্রমে এদিকে বৈয়াকরণিকের ভাষার উপর আধিপত্য অসামান্য হইতে লাগিল। ব্যাকরণ নিজে ভাষার সংস্কারক ও শিক্ষক সাজিলেন। তিনি নিজে গুরু হইয়া অপর গুরুর মানের লাঘব করিবার সূচনা করিলেন বটে কিন্তু সে যুগে সবটা আঁটিয়া উঠিলেন না। কখন পারিলেন? পরে বলিব। তিনি যেমন বলিলেন "আমি" উত্তম পুরুষ, "তুমি" মধ্যম পুরুষ, আর সব "নাম" পুরুষ, তেমন কাযও করিলেন। তাঁহার তীব্র বাক্য-বাণ বা সমালোচনাবান লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, কেহ তাহার কথা গ্রাহ্য করিল কেহবা করিল না, আপন মনে গাইয়া গেল। ব্যাকরণ তাহাকে প্রণাম করিয়া "আর্ষ্য" প্রয়োগ আখ্যা দিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। অতি প্রাচীন কালে গুরুভিন্ন শিক্ষা হইত না। (সর্ব কালেই পূর্ণ শিক্ষা গুরু সাপেক্ষ) প্রতিভা। একান্ত বেশী হইলে নিজেই এক প্রকার নিজের গুরু হওয়া সম্ভব ; তবু প্রাকৃতিক উদাহরণ পাঠ করিতে হয়। লেখায় চিহ্নাদির অভাব থাকায় উপযুক্ত শিক্ষক ভিন্ন ভাবের সমাবেশ নগ্ন ভাষার প্রকটিত হইত না, তাই শিক্ষকের বা গুরুর আবশ্যকতা। ব্যাকরণের বিশ্লেষণে ও শ্রেণী বিভাগে ভাষার আংশিক ভাব প্রকটিত হইল এবং গুরুর মানের লাঘব ঘটিল বটে। কিন্তু ভারতীয় ব্যাকরণ, পাঠকের বোধ শক্তির স্বাধীনতা দিতে আর অগ্রসর হইতে পাবিলেন না। মানসিক ভাবের বিকাশকল্পে লেখার সহিত ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন থাকার আবশ্যক, তখন তত বোধও হয় নাই। কারণ অভাব বোধ হইলে অবশ্যই উপায় নিদ্ধারিত হইত। অভাব প্রকার ভেদে—স্বাভাবিক ও অপরের সম্পদ তুলনায় নিজ হীনতার বা অপূর্ণতার অভাব এই দুই শ্রেণীর বিভক্ত হইতে পারে। সুশিক্ষাবিষয়ে উভয়ই উপকারী। স্বভাবই পাশ্চাত্য জগৎকে সাজ সজ্জাদি বিষয় বড় করিয়াছে। লেখায়ও চিহ্নাদির প্রচলন গ্রীক্, লাটিন তৎপর ইউরোপীয় অন্যান্য উপভাষায় গৃহিত হইয়াছে। ভারত, গ্রীক্ প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রণে সেখালে তাহার কিছু লাভ করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের রাজশক্তির

অন্তর্ধানের পর ভারতে তাহার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট রহে নাই। আরব্য ও পারস্য ভাষায়ও চিহ্নাদির প্রচলন সম্বন্ধে ভারতের কিছু প্রযোজ্য নহে।

(ক্রমশঃ)

কলা-নিকেতন

আশা।

আশা-আশা-আশা ও মধুর নাম
জপিয়াছি বহু দিন।
নিরাশা আসিয়া গ্রাসিয়াছে হিয়া
করিয়াছে উদাসীন।
প্রকৃতি আজিযে নিদয় নিঠুর
নীরস সমাজ-লীলা—
আবাহন করি লইয়াছে বুকে,
খেলিতেছে সেই খেলা।
হায়রে বসন্ত ধরণীর বুকে—
খেলেনা তেমন আর,
ছিঁড়িয়া গিয়াছে কাব্য-রসময়—
মধুর বীণার তার।
পিকের সুস্বর বসন্ত আগমে—
উদ্ভাসিত করি প্রাণ, —
আর যে গাহেনা, দূরে-দূবে কভূ
ছাড়ে সে উদাস তান।
আজ কোথা হতে বহু দিন পবে
মৃত সঞ্জীবন নাম
সুদূর আগত বংশীরব সম
শুনে শ্রুতি অভিরাম !
ডাকিছে মধুরে স্বরগের গীতি
জীর্ণ ভারতের বিশীর্ণ অন্তরে
জাগা'তে জগত-প্রীতি।
অধম আমি যে-অসাধ্য সাধনা,
কি আছে শকতি মম !
গাহিব সে গান পুরা'য়ে মানস
সিদ্ধ সাধকের সম।
ভারত কুমার ! গাও প্রাণ মনে
আশা সঞ্জীবন গান।
পর প্রতাপের ব্রত গরীয়ান,

জাগাও সুষুপ্ত প্রাণ।
যেই মন্ত্রে আজি সুজন সাধক,
লক্ষ্য করিয়াছ মতি,
সুপ্ত ভারতের উত্থানের পথে
উহাই অনন্য গতি।
পার যদি আর্য্য, বীণায় পুরিতে
আশার ললিত গাথা,
অমৃত ঝঙ্কারে মৃত আর্য্যাবর্ত্ত—
আবার তুলিবে মাথা।
আশা পতিতের উত্থান সোপান
জীবন যন্ত্রের তার,
বহিবে কেমনে আশা হীন জনে
জীবন দুর্ব্বহ ভার,
তিমিরান্ধ জনে পথ প্রদর্শনে
আশা করে আলোদান,
ক্ষণেকেরো তরে মুমূর্ষু বদনে
ফুটায় জীবন গান।
রোগ-শোক-তাপে-সন্তাপিত বুকে
নির্ম্মল শান্তির সেক,
বিপদ সাগরে ধ্রুবালোক সম
দি'ক লক্ষ্য চিহ্ন এক।
আশা ফুরাইলে বসুন্ধরা রহে -
মহা অচেতন পড়ি,
নির্জীব—নীরব—স্পন্দন-বিহীন,
বিরাট শ্মশান পুরী।
আশার সাধনে কপর্দ্দন হীন
পঞ্চ পাঞ্চালীর পতি,
জগতের বুকে দেখায়ে গিয়াছে—
মহান ধৈর্যের নীতি।
আশার প্রভাবে ভিকারী রাঘব
সিন্ধু-বুকে বাঁধি সেতু,
দুঃসাধ্য সাধনা কেমনে সাধিলা—
উড়া'য়ে বিজয় কেতু!
বাণী-প্রিয়-পুত্র কবি কালিদাস,
কবি-গুরু রত্নাকর,.
আশা-মহামন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত

সুধন্য সংসার'পর।
ভারত অবলা দেখাইলা ভবে
সতীত্ব-শকতি-বল,
বিচিত্র উজ্জ্বল রাজপুত-লীলা
স্তব্ধ যাহে ভূমণ্ডল।
অস্তমিত এবে ভারত-মিহিব,
কীৰ্ত্তি চিত্র চমৎকার—
ইতিবৃত্ত গায়, এখনও উজ্জ্বল
অঙ্কিত রয়েছে তার।
সুপ্ত ভারতের বিলুপ্ত জীবন
এখনও হয়নি ভবে,
আশার উজ্জ্বল আলোকের রেখা
দূরে সরে কেন তবে।
আলোকের অই উজ্জ্বল কিবণ
লক্ষ্যি' আর্য্য-বংশধর,
হও অগ্রসর, জাগিবে ভারত
মাতাইবে চরাচর।
আবার উদিবে মগ্ন দিবাকর,
আঁধার ঘুচিবে পুনঃ
বিজ্ঞান- জ্যোতিষ-জাগিবে আবার
সাধ আপনার পণ।

শ্রীমতী .... দেবী।

এখনও।

এখনও বাজে বাঁশী যমুনা-কুলে,
এখনও বহে রাধা আপনা ভুলে।
এখনও শুনে সেই মোহন বেণু,
কুলে কুলে যমুনার বিচরে ধেনু।
এখনও খেলে শ্যাম রাখাল-সনে,
এখনও কংশ-দূত বিচরে বনে।
এখনও সহে রাধা বিরহ-ক্লেশ,
এখনও যায় শ্যাম চন্দ্রোর দেশ।
রাধা-শ্যাম খেলে দোল, ঝুলন, রাস,
লীলাময়, পূরাবে কি ভকত-আশ?

কোথা?

"কোথা কৃষ্ণ লীলা?" এই যে দেখনা;
কামনা—যমুনা, রাধা—আরাধনা।
প্রবৃত্তি—ধেনু, হৃদি—বৃন্দাবন,
বাঁশরী ঝঙ্কার—মহা-আবাহন।
ভক্তি—চন্দ্রাবলী, বৈরাগ্য—রাখাল,
আবিশ্বাস—কংশ দূতেরা—ভয়াল।
মহাযাগে রিপু—জটিলা, কুটিলা,
দোল, রাস,—আত্মা-পরমাত্মা-লীলা,
বিদ্যা—মা যশোদা আনন্দ—গোনেশ,
এযে কৃষ্ণ—পরামাত্মা—পরমেশ।

প্রার্থনা

তোমাব চবণে আমার হৃদয়
সদা যেন ডুবে থাকে.
নাহি টলে যেন চঞ্চল হৃদয়
কিবা সুখে কিবা দুঃখে।
সংসাব-বিভব, পুত্র পরিজন
পাইয়া বিষম সম্পদে
স্নেহ দয়া মায়া পে'যে ভাল বাসা
ভুলি না হে যেন শ্রীপদে।
নীচে-কত নীচে-ঘোব অন্ধকাবে
রয়েছি হে আমি পড়িয়া,
কেমন পাইব ও চরণ আমি
তোল নাথ, মোরে ধরিয়া।
আর কাঁদাওনা দয়া করে নাথ,
নিয়ে এস মোরে আলোকে,
তোমারে হৃদয়ে রাখিব যতনে
নাচিবে হৃদয় পুলকে!
কভু যদি পুনঃ পঙ্কে ডুবে যাই
কভু যদি ভুলি তোমারে—
হাত বাড়াইয়া তোমার কোলেতে
তুলিয়া লইও আমারে।

শ্রীমতী মৃণালিনী বসু।
মালখাঁনগর, ঢাকা।

আবেদন

একটী হাসির রেখা
কি জানি গোপনে
আঁধারে লুকা'য়ে যদি
থাকে কোন খানে ;
একটু সুখের আশা
যদি মায়াবলে
থাকে গো বিষাদ সাজি'
হৃদয়ের তলে,
কল্পনাতে দুঃখ ছাড়া
অন্য উপাদান
থাকে যদি সূক্ষ্মরূপে
অজ্ঞাতে মাখান,—
তোমরা তো চাহ সবে
হাসি আর সুখ—
নিয়ে যাও মোর প্রাণে—
আছে যতটুক
.. ..
যার প্রাণে যতটুক
স্তব্ধ দীর্ঘ শ্বাস,
যার প্রাণে যতটুক
লুকা'ন নিরাশ,
এ জগতে যেথা যেথা
যার যার প্রাণে—
আকুল নয়ন-বারি
আছে সঙ্গোপনে,—
সবটুকু দাও মোরে—
দিব প্রতি দান
একটী প্রাণের ভাষা—
সুদুর্লভ গান।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গুহ বি.এ।

সিন্ধু-সৈকতে।

(গল্প)

(১)

"লীলা ! লীলা ! !"—

সমুদ্র-সৈকতের নির্জ্জন বালুকা-স্তূপের উপব দিয়া প্রদোষপবনে এ উদ্ভ্রান্ত ধ্বনি সাগর বক্ষে শূন্যে শূন্যে ছুটিয়া গেল ! মর্ম্মের তিক্ত রক্তমধ্য হইতে নিদারুণ উচ্ছ্বাসে যে ধ্বনি বাহ্য জগতে শান্তির আশায় ছুটিয়াছিল, দেখিল, সর্ব্বত্র অনন্ত, অপার কটু লাবণাম্বুধি ! মর্ত্ত্যে সকলই কি তিক্ত ?

"লীলা ! লীলা ! !"—

মহেন্দ্র আবার ছুটিল। যেখানে উত্তুঙ্গ ভীম অম্বুধিতরঙ্গ দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া ভৈরব গর্জ্জনে সৈকত ভূমি প্রাহত করিয়া অতি শুভ্র বিপুল ফেনপুঞ্জ উদ্গীরণ করিতেছিল, মহেন্দ্র মন্ত্র চালিতের ন্যায় স্তব্ধ ভাবে তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তাঁহার পদমূল প্রক্ষালিত করিয়া শতজস্ত দূরে পিছাইয়া গল। মহেন্দ্র আরও অগ্রসব হইল। সাগরের মধ্যস্থল হইতে এক ভীম তরঙ্গ গর্জ্জিয়া আসিতেছিল, ভীম বলে মহেন্দ্রকে দ্বিশত হস্ত দূরে সৈকতে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তরঙ্গ আবাব ফিরিযা গেল। বদশাঙ্গ মহেন্দ্র ভাবিল, জগৎ এমনি করিয়া তাঁমাকে উপেক্ষা করিয়াছে , হায় ! সে কি তাঁহার লীলারও উপেক্ষিত ?—

আবার তবঙ্গ গর্জ্জিয়া আসিতে ছিল ; সমুদ্রতীবমবাসী অসভ্য ধীববগণ নৎস্য সংগ্রহ করিয়া সেই পথে ফিরিতছিল. একজন 'যাত্রী'কে তাহারা তদবস্থায় দেখিয়া সযত্নে তুলিয়া লইল। তরঙ্গ আবার আসিয়া আবার ফিরিয়া গেল, ধীবরগণ অবসতদেহ নির্ব্বাক মহেন্দ্রকে ক্রোরে লইয়া স্বগৃহে গেল।

(২)

লোকে লোকারণ্য। রথোৎসবের রাত্রিতে পুরীমধ্যে হুল স্থূল ব্যাপার। সিন্ধুর ভৈরব কল্লোল অতিক্রম করিয়া জন কোলাহল উর্দ্ধে উঠিয়াছে। রমাকান্তের দিদীমা, মা, পিতা সকলেই পাণ্ডার সঙ্গে শ্রীজন্নাথের রথারোহণ দেখিতে গিয়াছেন. অধিক বাত্রি বলিয়া রমা ও তাহার ভগ্নী. মার্কণ্ডসরসাহীর দ্বিতল প্রকোষ্ঠে নিদ্রিত। বড় গরম গৃহের দরজা জানালা উম্মুক্ত, প্রকোষ্ঠ মধ্যে সুন্দর বায়ু খেলিতেছে। ভাই বোন অচিন্তাক্লিষ্টভাবে বিঘোরে ঘুমাইতেছে।

সহসা দ্বারের পথে একটা ছায়া পড়িল। জীবচক্ষুর অগোচরে টিপিটিপি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল গৃহ কর্ত্রীর যণ্ডপুত্র গঙ্গারাম ! রমাকন্তের ভাই বোন বিঘোরে ঘুমাইতেছিল,গঙ্গারাম তাহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ধীরে, একটি শীস্, আর একটি। দ্বিতলের সিঁড়ী বাহিয়া দুইটা উড়ে আসিল—আর একটি,— তাহার পর গৃহের মধ্যে সড়্ সড়্ খটখট, গোঁগ গোঁ নানা প্রকার শব্দ শুনা গেল।কিয়ৎকাল পর বস্ত্রসমাচ্ছোদিত একটা ভারী পদার্থ লইয়া চারিজন লোক দ্বিতলের ছাদের উপরে বহু

দূর পার্শ্ব সংলগ্ন অপর বাড়ী ছাদ অতিক্রম করিয়া ক্রমে অদৃশ্য হইল। এই বস্ত্রাচ্ছাদিত পদার্থ রমাকান্তের ভগ্নী লীলা।

প্রত্যুষে বৃদ্ধ নবকান্ত পরিবার সহ রথ-প্রাঙ্গণ হইতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে, "জগবন্ধু!" বলিয়া বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ প্রকোষ্ঠতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পাণ্ডা ঠাকুর ত্রস্ত হস্তে রমাকান্তের বন্ধন মোচন করিযা দিলেন। বাসায় সর্ব্বত্র 'চুপ চুপ!' নীরব বৃশ্চিক যন্ত্রনাময় হইয়া উঠিল।

সেই বিপুল জন সঙ্ঘের মধ্যে কে কি করিল তাহার খোঁজ হওয়া একান্ত অসম্ভব। কর্ত্তা একটু সুস্থ হইলে সেই দিনেই সকলে দেশে ফিরিলেন। দেশে রাষ্ট্র হইল, নবকান্তের কন্যার, পুরীতে কলোরায় মৃত্যু হইয়াছে।

মহেন্দ্র এ কথা শুনিলেন। মহেন্দ্র তরুণ যুবক, বয়স উনিশ কুড়ির উর্দ্ধ নহে। এ কথা শুনিয়া তিনি মাতাকে বলিলেন, বড় প্রয়োজন, শিঘ্রই কলিকাতা না গেলে নয়। মাতার সম্মতি লইযা মহেন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন। তাহার তিন দিবস পরে পাঠক তাঁহাকে সমুদ্রোপকূলে দেখিয়াছেন।

ইহার দশ বৎসর পূর্ব্বের একটা চিত্র না দিলে পাঠক সকল কথা বুঝিবেন না।

ছোট বালিকা ডাকিল, "মহীন্! এ কুলগুলি ভাল নয়; ঐ আগডালে কেমন টুক্‌টুকে থোবাটি ঝুলিতেছে, ঐ থোবাটি পাড়!" সবল বালক মহীন্ বিপুল স্ফূর্ত্তির সাহিত তর্ তর্ করিয়া আগডালে উঠিয়া গেল। থোবাটি পাড়িয়া কোচড়ে পূরিল, গাছের নীচে বালিকা করতালি দিয়া নাচিয়া উঠিল।

তাহার পর মহীন্ সর্‌সর্ করিয়া নামিয়া আসিল, কোচড় খুলিয়া দুজনে কুল ভাগ করিতে বসিল; বালিকা বলিল,– "কেন মহীন্? ভাগ করিব না, কোঁচড়ে থাক, দুজনে খাই।" তখন দুজনে কুল খাইতে খাইতে গলাগলি ধরিয়া ননীদের পাড়ায় গেল।

এ মহীন্—মহেন্দ্র, বালিকা-লীলা। বালক বলিল, "আমি সূর্য্যমুখী নেব।" "নাও!" বালক আবার বলিল,—"না, যুঁই গুলি আমার।"—"নাও" বালক,—এই বড় বড় টগর গুলিও,—"এই নাও, তোমার কানে দুটো গুঁজে দি কেমন?—" এই বলিয়া বালিকা বালকের কানে দুইটি টগর গুঁজিয়া দিয়া হাসিয়া উঠিল। বালক সবগুলি ফুল ছিটাইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—"হাসিলে কেন? আমাকে সংএর মত লাগে? ফুল পরিব না!—"

বালিকা উত্তর করিল না, চুপ করিয়া সব ফুলগুলি কুড়াইল, মুখ ভার করিয়া বাধান বকুলের তলে পা মেলিয়া বসিয়া একটি মালা গাঁথিল। তাহার পর ছুটিয়া গিয়া পিছন হইতে প্রজাপতি ধরণে রত বালকের গলায় টুক করিয়া মালাটি পরগইয়া দিয়া, হাততালিসহকারে হাসিয়া উঠিল! বালক চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "বাঃ!"

এই বালক মহেন্দ্র, বালিকা লীলা। ইহার বেশী বোধ হয় আর কিছু বলিতে হইবে না।

৪

রাত্রি প্রহরৈক সময়ে মুকুন্দসিংহারীর অন্দরে পুলিশ ঢুকিয়াছে বলিয়া শুনা গেল। দুইটা উড়ে ধৃত হইয়াছে, কি অপরাধে, কেহ জানে না। ইহারই পূব্ব বজনীতে নবকান্তের প্রকোষ্ঠে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অভিনয় হইয়াছিল।

বিস্তৃতকায় মার্কণ্ডসরেব পূব্বতীরে ক্ষুদ্র বন। বন পার হইলে খালের ধারে ধারে অতি নির্জ্জন উচ্চ গ্রাম্য পথ, পথের নিম্নে ভাগাড়। ভাগাড়ের মধ্য দিয়া জনৈক বলবান লোক একটা বস্ত্রাবৃত ভারী পদার্থ স্কন্ধে লইযা অতিকষ্টে চলিতেছিল। লোকটা গঙ্গারাম ; গঙ্গারাম খানিক দূর আসিয়া পদার্থটা ভাগাড়ে নিক্ষেপ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ইতস্তত দেখিতে লাগিল,— হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে বজ্রমুষ্টিতে কে তাহার হস্ত ধারণ করিল ; গঙ্গারাম সভয়ে দেখিল তাহারই নিক্ষিপ্ত বস্ত্রজড়িত অজ্ঞান লীলাকে স্কন্ধে লইয়া জটাজুটধারী বিরাট জ্যোতির্মূর্ত্তি--সন্ন্যাসী।—গঙ্গাবাম শিহরিল!

৫

পুবীব এক পার্শ্বে সমুদ্রতীবে শ্মশান। মহেন্দ্র মনে কবিল, এই খানে তাঁহার লীলার সুধাকমনীয় শরীর ভস্মে পরিণত হইয়াছে—হায়! সে পুত ভস্ম কি সমুদ্র জলে প্রক্ষালিত?--মহেন্দ্র সেই খানে বালুকা উপরি বসিল। মুদ্রিতনেত্র মহেন্দ্রের উদভ্রান্ত মনে উদাস ভাবে জাগিয়া উঠিতেছিল,—

ভেঙ্গেছে আমার সাধেব ঘর!
আপন আপনা নাই,
ধরা হয়েছে পর।।
সঁপেছিলে যা'বে প্রাণ
ঢেলে যত স্নেহ প্রীতি,
আজি তার নামে
জেগে উঠে শত ভীতি?
ভেঙ্গেছে কপাল,
ঘিরিছে জঞ্জাল,
অকালে শুকাল' হায় অমিয়া'-নির্ঝর!
প্রেম মমতা ঢালি
দিয়েছিলে যা'রে হৃদি;
সেতগো অনল সনে
ফিরায়ে দিয়েছে স্মৃতি,—
অবসাদ,—অবসাদ, ভবসাধ আজি
সমূলে উষর!
আর কেন সে স্মৃতি গো
আন হৃদে টানি টানি?
এখনো সে ব্যথা নিয়ে
কেন আর কাণা কাণি?

হৃদে দিছ বজ্রহানি,
সহস্র বৃশ্চিক জ্বালা,
ভীম জ্বালা অনল সোসর ! !

দূরে ঝাউ কুঞ্জ হইতে মনুষ্য-মূর্ত্তি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। নিকটে আসিয়া ডাকিল,—

"মহীন্ !"

মহেন্দ্র চমকিয়া চাহিল—মহীন্ ! রুদ্র কণ্ঠে মহীন বলিয়া কে ডাকিবে? মহেন্দ্র বিদ্যুৎ বেগে উঠিয়া দেখিল, বিরাট মূর্ত্তি সাধু।

হরি হরি ! মহেন্দ্র সেই খানে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। এত লীলা নয় !—

৬

নিবিড় বনে সাধু, পাষণ্ড গঙ্গাবামের হাত ধরিয়াছিলেন,—গঙ্গারাম বলিল—

"প্রায়শ্চিত্ত করিব !"
"অতি"—কঠোর !"
"ক্ষমা করুণ"

"অনুতপ্ত মুক্তি পাইবে !" বলিয়া সাধু পাপীর হাত ছাড়িলেন, গঙ্গারাম রুদ্ধশ্বাসে সিন্ধুতীরে ছুটিয়া পলাইল। সাধু প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৭

অরণ্যের ভিতর পর্ণ কুটিরে মহেন্দ্র শায়িত ছিল। শরীর অবসন্ন, শুইয়া শুইয়া শুনিতে ছিল, অদূরে সমুদ্র অনবরত গর্জ্জিয়া গজ্জিয়া ডাকিতেছে। ভাবিল, আবার সেখানে ছুটিয়া যাইবে। মন ছুটিল, শরীর উঠিল না।

কিয়ৎকাল পবে, কুন্তল রাজি পরিবৃত মুখ মণ্ডল, ভস্মাচ্ছাদিত দেহকান্তি এক সুকুমার বালক মহেন্দ্রের শিয়রে আসিয়া বসিল। মহেন্দ্র ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিল "তুমি কে?"

"আনন্দ।"

মহেন্দ্র বলিল—আনন্দ, এ কোন স্থান?
আনন্দ—সিন্ধু কৈলাস।
আনন্দ আবার বলিল, "মহীন, এখানে তোমার ভাল লাগে? আমার বেশ। তুমি এখানে অনেক দিন থাক্‌বে, কেমন?"
মহেন্দ্র বলিল, "আনন্দ, আমাকে মহীন জানিলে কিরূপে?"
আনন্দ,—কেন ! বাবা বলিয়াছেন. আর লালী বলে।
মহেন্দ্র—লালী কে?
আনন্দ—আমার বোন,—

বাহিরে একটা পাখী ছুটিয়া চেঁচাইতেছিল. "আমার ময়না!" বলিয়া আনন্দ ছুটিয়া বাহিরে গেল।

মহেন্দ্র ভাব সমুদ্রে ডুবিল।

৮

লালী কুটিরের অলিন্দে বসিয়াছিল। পার্শ্বে আনন্দ বড় দৌরাত্ম্য করিতেছিল, এমন সময়

সাধু আসিয়া ডাকিলেন,—লালী, ভাল আছিস্ মা?"
লীলা বলিল, "হ্যাঁ বাবা।"
সাধু "আমি আসি" বলিয়া আবার চলিলেন।
আনন্দ বলিল, "লালী, মহীন আছে।"
লীলা, "মহীন্! কোথারে?"
আনন্দ, "কৈলাসে।"—

এটি সিন্ধু স্বর্গ।

লীলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

৯

এখনও আনন্দ আসে নাই। "লীলা কে?" মহেন্দ্র ভাবিল, "লীলা কি?" তড়িৎ প্রবাহে হৃদয় ধমনিতে শেনিত চমকিল।

ন্!"

একি বীণার ধ্বনি? মহেন্দ্র উঠিয়া বসিল, বনের আড়ালে বিদ্যুৎ গতিতে ..: ছুটিয়া গেল কে?—

"মহীন্!"

মহেন্দ্র থরহরি চমকিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল,—সম্মুখে সেই মূর্ত্তি সেই বিরাট সাধুর তেজোময় জ্বলন্ত মূর্ত্তি।

মহেন্দ্র শয্যা আশ্রয় করিল। লীলা সিন্দু কৈলাসে মহেন্দ্রের দর্শনে আসিয়াছিল, সাধুকে দেখিয়া পলাইয়া গেল।"মহীন্' মহী

১০

বিধির লীলা। তিনটি সংসারের অদৃষ্ট পুড়িয়াছে পূরীতে। নবকান্তের মহেন্দ্রের আর কাত্যায়নী ঠাকুরাণীর। কাত্যায়নী ঠাকুরাণী মহেন্দ্রের প্রতিবাসিনী।

কাত্যায়নী বলিলেন, "মা, ভাবিয়া ফল কৈ? দুজনার অদৃষ্টই কি এক হবে!" ঠাকুরাণী আর ভাবিতে পারিলেন না, বস্ত্রাঞ্চলে, ত্রস্ত চক্ষু চাপিলেন।

গত বৎসর মকর সংক্রান্তিতে কাত্যায়নী পুরীতে বালক পুত্র হারাইয়াছেন। বালক রোগাক্রান্ত হইয়াছিল, হাঁসপাতালের দূত আসিয়া বাছাকে ছিনাইয়া লইল;

নিল, সেই নিল,—শূন্য পাষাণ হৃদয়ে বজ্রমুষ্টি আঘাত করিতে করিতে ঠাকুরাণী দেশে ফিরিলেন। কিন্তু ইহার তিন বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহার কপাল পুড়িয়ছিল। কটকে তাঁহার স্বামী কার্য্য করিতেন কাত্যায়নীর অন্যতরা সপত্নী ছিল, সপত্নী সহ কলহ প্রসঙ্গে কাত্যায়িনী স্বামীকে গর্হিত কটু বলিয়াছিলেন, স্বামী হৃদয় দারুণ ব্যথা বহন করিতে ছিলেন। একদা মহানদীর ভীম বন্যায় স্বামী নিত্যপ্রসাদ রায় জগত হইতে অপসৃত হইলেন। সেই হইতে ঠাকুরাণী মরমর হইয়া আছেন, তাহার উপর আবার শেল।

আজ কয়েক দিবস হইল মহেন্দ্র কলিকাতা গিয়াছে, তাহার কোন খবর নাই, তাই ঠাকুরাণী মহেন্দ্রের মাতার কাছে আসিয়াছেন।

দুই হৃদয়ের উদ্বেল সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। কে জানে, লীলার খোঁজে মহেন্দ্র যদি পুরী গিয়া

থাকে, সেখানে যদি—কেহ আর ভাবিতে পারিলেন না। মূর্ত্তিমান লোক আসিয়া মহেন্দ্রের গৃহ অধিকার করিল।

১১

"সে কে?"

"জানি না" বলিয়া আনন্দ আরও খানিক দূরে গেল। এবার বড় ঢেউটা তাহার লম্বা চুল গুলি ভিজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মহেন্দ্র তাহাকে টানিয়া আনিল,—"আর যাইওনা,—সে কখন?"—"ফিরে রথের সময়। একেবারে মাথার খুলি চূর্ণ হইয়া গেছে, রথের যে চাকা!—বাবা কহিলেন, সে লোকটা বড় পাপী ছিল।"

এ পাপীটা পাঠকের গঙ্গারাম। মহেন্দ্র বলিল, "হইতে পারে, কিন্তু মুক্তি পাইল।—আনন্দ, বলিলে না লালী কোথা?" আনন্দ, "বাবা বলিলেন, এখন বলনা, কাল।"

মহেন্দ্রের হৃদয় একবার নিবিয়া আবার জ্বলিল। মহেন্দ্র ভাবিল, এ বিষম ইন্দ্রজাল, এ কুহক কবে ভাঙ্গিবে? আনন্দ ঝিনুক খুঁজিতে খুঁজিতে অন্যমনে বলিল,—"আজ!"

মহেন্দ্র আনন্দের হাত ধরিয়া 'কৈলাসে' ফিরিল।

১২

বনের বাহিরে একখানা প্রস্তর ছিল। রাত্রি থাকিতে থাকিতে স্নান করিয়া আসিয়া মহেন্দ্র তাহার উপর বসিল। আনন্দ গৃহের ভিতরে গিয়াছিল। তখন অতি অল্প রাত্রি ছিল। মহেন্দ্র ভাবিল, হায় লীলা! আর কত দিন?—হৃদয় ভাঙ্গিয়া মর্ম্ম বিদারিয়া অস্ফুট ধ্বনি উঠিতেছিল, "লীলা, লীলা!" পশ্চাৎ হইতে কে সাড়া দিল—

"মহীন্!"–

মহেন্দ্র শিহরিল। সেই বিরাট সাধুর মূর্ত্তি মানস পটে জাগিয়া উঠিল সভয়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া— লীলা! তুমি লীলা!!— মহেন্দ্র ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছিল সহসা লীলার মৃণাল বাহু তাহাকে ত্রস্ত ধরিয়া ফেলিল। আনন্দ দৌড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মহাপুরুষ সাধু সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—

"লীলা মা!"—

মহেন্দ্র চকিতে জাগিয়া চাহিল, দেখিল, সমুদ্র-মধ্য হইতে সদ্যস্নাত তরুণ সূর্য্য হুস্ করিয়া জল রাশির উপর মস্তক জাগাইয়া হাসিতেছেন!

... ...

মহেশপুরে হুলস্থূল পড়িল। মহেন্দ্রের সহিত লীলার বিবাহ হইল, কাত্যায়িনী আনন্দকে ফিরিয়া পাইলেন।

পুরীর সমুদ্র সৈকতে, শ্মশানে এখনও মধ্যে মধ্যে সেই মহাপুরুষকে একক চলিতে দেখা যায়।

এ মহাপুরুষ—নিত্যপ্রসাদ রায়।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

সরোজ গুহ : অসভ্য জাপান [প্রবন্ধ], কৃষ্ণকুমার মজুমদার : মহাকবি কালিদাস, প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

১ম ভাগ, ৭ম-৮ম সংখ্যা, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৯

কুলদাকুমার সেন : মেঘদূত সমালোচনা, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী : বঙ্গের বৈষ্ণব গ্রন্থ

কর্ত্তব্য ও শ্রীবৃদ্ধি
বাঙ্গলা সাময়িক পত্রাদির বর্ত্তমান দুর্গতির মূল।

বঙ্গভাষা যে অধুনা ঘোর হীনাবস্থাপন্ন হইয়াছে, এ কথা আর বোধ হয় নূতন করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। চক্ষুবিশিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহা দেখিতে পাইবেন ; সামান্য জ্ঞানযুক্ত যে কোনও ব্যক্তিই ইহা বুঝিতে পারিবেন। এই বঙ্গভাষার দুর্গতির নিদর্শন সংবাদপত্র ও পত্রিকা বিভাগেই অতি জ্বলন্তভাবে পরিস্ফুট। দেশে যে অতি খ্যাতনামা লেখক পরিচালিত সংবাদ পত্র ও পত্রিকাও সমীচীন সমাদর প্রাপ্ত হইতেছে না, অনেক উপযুক্ত পত্রাদিও অধিককাল জীবন ধারণ করিতে পারিতেছে না, বঙ্গদেশে যে ক্রমশঃই পত্রিকাদি প্রচারের আগ্রহ শিথিলীভূত হইতেছে, ইহা আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষের বিষয়, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাময়িক পত্রাদিই যে আমাদের জাতীয় ভাষার ও সাহিত্যের প্রধান ও প্রয়োজনীয় মুখপাত্র, জাতীয় সাহিত্য যে আমাদের জাতীয় জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ, এবং সাহিত্যের দুর্গতি যে সমগ্র জাতীয় জীবনের সহিত বিশেষভাবে সংসৃষ্ট, ইহা অবধারণা করিয়া প্রসঙ্গটী একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। সহৃদয় পাঠক বর্গের আলোচনেচ্ছা উদ্দীপনার্থে নিম্নে কতকগুলি সম্ভবপর কারণের অবতারণা করা গেল। নিম্নে কেবল কয়েকটি প্রধান ও মূল কারণের কথাই বলা গেল ; ইহা ব্যতীত সামান্য দুই একটি ক্ষুদ্র ও অবান্তর কারণও থাকিতে পারে তাহা বাহুল্যভয়ে উল্লিখিত হইল না।

বঙ্গভাষার প্রতি সাধারণের ঔদাসীন্য।—বাঙ্গলা সংবাদপত্র ও পত্রিকার দুর্গতির সর্ব্বপ্রধান কারণ অতি গুরুতর। এই একটী কারণের কথা উল্লেখ করিলেই আমাদের নৈতিক অবনতির বিষয় ও বিশেষভাবে প্রতীয়মান হইবে। বলিতে লজ্জা হয়, প্রকাশ করিতে দুঃখ হয় যে জগৎ সমক্ষে আমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিবার যে সকল দ্বার আছে, আমরা ক্রমে২ তাহা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিয়া দিতেছি। আমাদের উচ্চ বংশমর্যাদা সংরক্ষণ করিবার যে সকল উপায় আছে, আমাদের গৌরবসূচক জন্মসৌষ্ঠব প্রতিপন্ন করিবার যে সকল অনায়াসলব্ধ দলিল আছে, তাহা আমরা অবলীলা ক্রমে বিনষ্ট করিয়া, ক্ষুণ্ন করিয়া উল্লাস ও উল্লম্ফন করিতেছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের উচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ আমরা অনেকদিন বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইযাছি, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষাভ্যস্ত সামাজিক রীতিনীতি অনেক কাল আমরা বিদেশীয় ও বিজাতীয় সৈনিকবৃন্দ কর্ত্তৃক চ্যুতপ্রতিষ্ঠ করিয়াছি ; আমাদের পূর্ব্বপুরুষৰ্জ্জিত দৈহিক ও ভৌতিক উৎকর্ষ, যাহার জন্য তাঁহারা জগতে অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা বহুকাল বিসর্জ্জন দিয়াছি। এইরূপে আমাদের গোষ্ঠীপ্রতিপাদক যে সকল অভিজ্ঞান, আমাদের জাতীয়তা প্রতিপন্ন করিবার যে সকল উপকরণ আমরা প্রাকৃতিক নিয়মসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা প্রায় সকলই আমরা হারাইয়াছি। আমাদের জাতিগত যাহা কিছু বিশেষত্ব, আমাদের জাতীয়তার যাহা কিছু স্মারক ও পরিচায়ক, আমরা তাহা প্রায় সকলই যত্নের সহিত, গৌরবের সহিত হারাইয়াছি বা হারাইতে বসিয়াছি। আমরা কি, আমরা কে, আমরা কোন জাতির সন্তান, ইহা

প্রতিপন্ন করিবার উপাদান আমাদের কাছে এইক্ষণ খুব কমই আছে। হায়, কি লজ্জার কথা, দুঃখের কথা, নীচতার কথা! আমাদের বর্ত্তমান অনুষ্ঠিত বিকৃতদশাপন্ন ধর্ম্ম-নীতির দ্বারা বুঝিবার উপায় নাই যে আমরা আদ্যসন্তান, আমাদের আধুনিক প্রচলিত কদর্য্য ও অতি বিজাতীয় সামাজিক অনুষ্ঠান আচরণের দ্বারা জানিবার যো নাই যে আমরা অমর-প্রতিষ্ঠ ঔপনিষদিক ঋষিকুলের বংশধর, আমাদের বর্ত্তমান অবলম্বিত ভিত্তিশূন্য যুক্তি বিচারের প্রথা দেখিয়া কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই যে আমরা তীক্ষ্ণবুদ্ধি গভীর-জ্ঞান দার্শনিক জাতির সন্তানবৃন্দ, আমাদের বর্ত্তমান দৈহিক হীনাবস্থা দেখিয়া কাহারও অনুমান করিবার হেতু নাই যে আমরা সেই খ্যাতবীর্য্য বিশালদেহ জাতির বংশে জন্মলাভ করিয়াছি। তবে আর আছে কি? রহিল কি? ছিল একটী জিনিষ—যাহা আমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিবার পক্ষে; আমাদের জাতীয় মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে অনেক পরিমাণে সহায়তা করিতেছিল;—সেটী আমাদের ভাষা—বঙ্গভাষা। দুঃখের বিষয় তাহাও আমরা হারাইতে বসিয়াছি।

অনেকে হয়ত আমাদের জাতীয় ভাষা বললে সংস্কৃত ভাষাই বুঝিবেন, এইরূপ বুঝাটা নিতান্ত অসঙ্গত বা অন্যায় বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু বঙ্গদেশে সংস্কৃতটাকে আমাদের সাধারণ ভাষারূপে প্রচলন বা প্রবর্ত্তন করা যে একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িবে ইহা বোধ হয় অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। এ বিষয়টী এস্থলে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে যাওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িবে বলিয়া ইহা হইতে বিরত হওয়া গেল। তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সংস্কৃতের পরে যদি বঙ্গদেশে কোনও ভাষাকে দেশীয় ভাষারূপে প্রচলন করা যাইতে পারে, তাহা হইলে উহা বঙ্গভাষা। বলা বাহুল্য যে বঙ্গভাষার গঠন-তত্ত্ব একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে সংস্কৃত ভাষাকে অনায়াসে উহার আদিম উৎপত্তি স্থান বলা যাইতে পারে। স্বীকার করি যে আরবী, পারস্য ও পালী প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার প্রভাব ও উহার সহিত বিজড়িত, তত্রাপি ঐ সকল ভাষার সাহায্য ও সংশ্রব অপেক্ষাকৃত স্বল্প বলিয়া সংস্কৃত ভাষাকেই প্রাধান্য দেওয়া কোনও ক্রমেই অবিহিত নহে। অপিচ সংস্কৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাষার যে সৌসাদৃশ্য ও নিকট সম্বন্ধ তাহা দেখিলেও ইহাকে সংস্কৃতের একটী উপভাষা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সুতরাং বঙ্গভাষা শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিলে, বঙ্গভাষা বলীয়ান হইলে, আদিম ভাষা ও সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হইবে ইহা বলা অসঙ্গত হয় না, এবং এই ভাষার সেবা করিলে আমাদের জাতীয় ভাষাকেই সেবা করা হইবে, আমাদের জাতীয় জীবনের একটী অঙ্গ পুষ্টি ও পূর্ণতালাভ করিবে, আমাদের জাতীয়তায় ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বঙ্গভাষার প্রতি সাধারণের বিরাগ ও ঔদাসীন্যের বিষয় বোধ হয় সকলেই বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন; ইহা আমাদের আধুনিক জাতীয় জীবনের একটী জাজ্বল্যমান বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গভাষাকে নিজভাষা—মাতৃভাষা বলিয়া জ্ঞান ও সমাদর করেন এরূপ লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে নিতান্ত বিরল বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমানকালীন ইতিহাস হইতে ইহার ভুরি২ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। মহানুভব পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে আমাদের দেশে এরূপ বাঙ্গালী অনেক আছেন যাঁহারা অনেক ভাল২ বাঙ্গালা পুস্তক কখনও দর্শন পর্য্যন্ত করেন

নাই, এবং অনেকে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। একখানি নূতন সাময়িকপত্র বা পত্রিকা হস্তগত হইলে, বিনা পাঠে ও বিনা পরীক্ষায়ই অধিকাংশ বঙ্গসবিতা নাসিকাগ্র কুঞ্চিত করিয়া 'অপদার্থ' বলিতে কুণ্ঠিত হন না। আবার অনেক সময় যদিও বা কোনও রূপে উহা তাঁহাদের টেবিলের উপর স্থানলাভ করিল, তত্রাপি তাঁহাদের অনুরাগাধিক্য বশতঃ তাঁহারা একবার মনে করিতে ও সুযোগ পান না যে তাহার আবার মূল্য দিতে হইবে। বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষার প্রতি এমনি কৃপাদৃষ্টি যে, লজ্জার সহিত লিখিতে হয়, অনেক ভাল বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। হতভাগ্য বঙ্গদেশে উপযুক্ত সংখ্যক গুণগ্রাহী ব্যক্তির অভাবে অনেকানেক অমূল্য গ্রন্থ অর্দ্ধ বা সিকি মূল্যেও বিক্রয় হওয়া কঠিন হইয়া দাড়ইয়াছে। হায় কি নিদারুণ দৃশ্য, কি নীচতার অভিনয়ই বঙ্গভূমিকে দেখিতে হইল ! হায়, অশুভক্ষণেই সকল ক্ষণজন্মা ধীমান মহাপুরুষদিগের এই হতভাগ্য হৃদয়হীন বঙ্গদেশে জন্ম হইয়াছিল ! ঐ সকল মূর্ত্তিমান প্রতিভাবতারের অদৃষ্ট নিতান্তই অশুভ, তাই তাঁহাদের নাম তাঁহাদের বংশধর কর্ত্তৃক কলঙ্কিত হইল তাই তাঁহাদের গৌরব এই জাতি কর্ত্তৃক কলঙ্কিত হইল তাই তাঁহাদের গৌরব এই জাতি কর্ত্তৃক অতি নৃশংসরূপে নিন্দিত ও উপেক্ষিত হইল, তাই তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি পদদলিত হইল, তাঁহাদের ভাষ্যমতী কীর্ত্তি লুপ্তপ্রায় হইল। জানিনা কেন বিধাতা একজন রামমোহনকে আমেরিকায় সৃষ্টি না করিয়া বঙ্গদেশে সৃষ্টি করিলেন, একজন অক্ষয়কুমারকে জর্ম্মানিতে সৃষ্টি না করিয়া বঙ্গদেশে তাঁহার জন্মভূমি নির্দিষ্ট করিলেন, একজন মাইকেল্‌কে ইংলন্ডে না পাঠাইয়া মৃত বঙ্গদেশে পাঠাইলেন, একজন দীনবন্ধুকে স্কট্‌লণ্ডে স্থান না দিয়া বঙ্গদেশে জন্ম পরিগ্রহ করিবার জন্য পাঠাইলেন? তাহা হইলে তাঁহাদের এদশা ঘটিত না, এ পরিণতি হইত না।

বাঙ্গলা ভাষা যে জাতির, সেই জাতিই যদি ইহার প্রতি বিরূপ ও বীতরাগ হয়, তাহা হইলে আর বাঙ্গলা গ্রন্থ পড়িবে কে, বাঙ্গলা পত্রাদি পড়িবে কে, বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিই বা করিবে কে?

সম্পাদকীয় বিশৃঙ্খলা—পত্রিকাদির দুরবস্থার আর একটী প্রধান কারণ সম্পাদকীয় দুর্ব্বলতা। সম্পাদকই পত্রিকার জীবন স্বরূপ ! নায়কের সহিত অর্ণবপোতের যে সম্পর্ক, সম্পাদকের সাহিত পত্রিকারও সেই সম্পর্ক·উপযুক্ত নায়ক না হইলে যেমন জলযানের গতিবিধি অসম্ভব হইয়া পড়ে, তেমনি যোগ্য সম্পাদকের অভাবেও পত্রিকার জীবন অসম্ভব হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ একটী পত্র পরিচালনায় যাহা কিছু প্রয়োজন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সম্পাদকের সহায়তাই সর্ব্বপ্রধান ; সুতরাং অযোগ্য সম্পাদকের হস্তে পত্রিকাভার ন্যস্ত হইলে, উহার পতন ও মরণ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশে অনেক পত্রাদিই এই এক কারণে দুরবস্থাপন্ন হইয়া থাকে বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের বাঙ্গলা পত্রাদির অনেকানেক সম্পাদকদিগের প্রায়ই এমন কোনও গুণ বা দক্ষতা দেখা যায় না যাহাতে তাঁহাদিগকে সম্পাদকের ন্যায় একটা উচ্চ পদে ন্যায়তঃ বরণ করা যাইতে পারে। আমাদের অনেকের মধ্যে সম্পাদক সম্বন্ধে একটা সাধারণ অপবাদ প্রচলিত আছে ; তাহা এই যে, যাহাদের কোনও গুণ নাই, ক্ষমতা নাই, বিদ্যা বুদ্ধি নাই ; যাহাদের দ্বারা জগতে কোনও কাজ হইবে না, তাহারই প্রায় সম্পাদক সাজিয়া বসে। একথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা বলা যাইতে পারে না। বরঞ্চ, অনেক সম্পাদকের অবস্থা দেখিয়া এ অপবাদটা দৃঢ়ীকৃত হয়। বর্ত্তমান প্রস্তাব লেখক অনেকানেক বাঙ্গলা সাময়িক পত্রাদির সহিত স্বল্পাধিক পরিমাণে পরিচিত,

অনেক সম্পাদকের গুণাগুণ বিষয়ে স্বল্প বিস্তর পরিজ্ঞাত। দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, অনেক মহাত্মা সম্পাদকের আসন পরিগ্রহ করিতে সাহসী হইয়া থাকেন বটে, পত্রিকা বক্ষে তাঁহাদের নামটী উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত দেখিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, অথচ তাঁহাদের ভাষার উপব এমনই অধিকার যে তাঁহাদের লেখা পাঠ করিলে অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠা কঠিন যে তাঁহারা কি ব্যক্ত করিতেছেন।

অধুনা সম্পাদক হওয়াটা যেন একটা দেখাইবার জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনও কথা নাই, বার্ত্তা নাই, হঠাৎ এক একজন সম্পাদকের মুখস পরিয়া প্রকাশ্যে বাহির হইতেছেন। ইহাতে ফল দাঁড়াইতেছে এই যে লোকের ক্রমশঃই বাঙ্গলা পত্রাদির প্রতি অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সম্পাদক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অপবাদ বদ্ধমুল হইতেছে।

কালব্যাপী শিক্ষা ও সাধনা জগতের নীতি ; এই নীতির প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ সকল কার্য্যে, সকল বিভাগেই, সমভাবে খাটিয়া থাকে। বিশেষ কোনও বিদ্যা বল বা ব্যবসায় বল কোনও একটা কার্য্য বল বা উৎকর্ষ বল, প্রকৃষ্ট সাধনা ব্যতিরেকে উপযুক্ত অনুশীলন ব্যতিরেকে, কিছুই সম্যকরূপে সংসিদ্ধ হয় না, কিছুই ফলোপধায়ক হয় না। জগতের সকল বিষয়ে, সকল বিভাগে, সকল কার্য্যেই যদি এই নিয়মের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সম্পাদকীয়তা কার্য্যে এই সাধারণ নিয়মের কেন ব্যাতিক্রম বা বৈলক্ষণ্য ঘটিবে ? ধীমান পাঠক ! সম্পাদকীয়তাও কি একটা গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য নয় ? সমস্যা বিজড়িত দায়ীত্বসংযুক্ত ও জটিলতাপূর্ণ কার্য্য নয় ? একজন রাজনৈতিক অধিনেতার কার্য্যে যতটা গুরুত্ব বা দায়ীত্ব জড়িত আছে, একজন ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কারকের কার্য্যে যে সকল নিগূঢ় সমস্যা নিহিত আছে, একজন সম্পাদকের কার্য্যেও দায়িত্বও গুরুত্বের পরিমাণ কোন অংশে কম নাই। যেহেতু সকলটীরই মূখ্য উদ্দেশ্য এক ; জাতীয় উন্নতিসাধন বা স্বদেশ সেবা। রাজনৈতিক অধিনেতার উদ্দেশ্য যেমন দেশীয় অপকৃষ্ট শাসনবিধির অপসারণার্থে সংগ্রাম করিয়া জাতীয় উন্নতি সংসাধন করা, ধর্ম্মযাজকের উদ্দেশ্য যেমন বিকৃত ধর্ম্মনীতি সংশোধন করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করা সমাজ সংস্কারকের উদ্দেশ্য যেমন সামাজিক কুরীতি সকল উৎসারিত করতঃ তৎস্থানে উচ্চসমাজনীতি প্রবর্ত্তন করিয়া জাতীয় জীবনকে সুসংস্কৃত করা, তেমনি সম্পাদকেরও চরম উদ্দেশ্য জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করতঃ শুধু সাহিত্য বা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি কেন, লেখনীর সাহায্যে পত্রিকা সাহায্যে জাতীয় দুর্গতির প্রাতকারোপায় প্রদর্শন করতঃ জাতীয় জীবনের সকল (দিক্‌সংক্রান্ত সমস্যা) উপস্থিত করতঃ, জাতীয় উন্নতি কল্পে বিবিধ আলোচনা ও আন্দোলন উদ্দীপিত করিয়া স্বদেশের পরিচর্য্যা করা বরঞ্চ, একটু সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান ও অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে প্রকৃত সম্পাদকের কার্য্য ও কর্ত্তব্য রাজনৈতিক অধিনেতার, ধর্ম্ম বা সমাজসংস্কারকের কার্য্যাপেক্ষা ও উচ্চতর ও পবিত্রতর।

সাধারণতঃ একজন সমাজসংস্কারকের দ্বারা বাজনৈতিকের কার্য্য সম্যকরূপে সংশিদ্ধ হইতে দেখা যায় না, একজন ধর্ম্মপ্রচারকেব দ্বারা সাহিত্য সংস্কাবকেব কার্য্য বিশদরূপে সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। কিন্তু, বিচক্ষণ ও বহুদর্শী সম্পাদকের হস্তে পত্রিকা ন্যস্ত হইলে, ঐ সকলের কার্য্যই তাঁহাদ্বাবা যুগপৎ সুসম্পন্ন হইতে পারে। বিচক্ষণ সম্পাদক ইচ্ছা করিলে, এবং তৎকল্পে একটু আগ্রহ ও উদ্যম প্রয়োগ করিলেই, তাঁহার পত্র বা পত্রিকার সাহায্যে সাহিত্যের অঙ্গরাগ সাধন করিতে পারেন, দেশে সুসংস্কৃত সামাজিক নীতির বীজ

বিকীর্ণ করিতে পারেন, জ্ঞানানুমোদিত সভ্যতা-সংস্কৃত ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতে পারেন, এবং বিকৃত ও অপকৃষ্ট রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থাদির বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন ও সংগ্রামের সূচনা করিয়া দিতে পারেন। যাহার শক্তি সামর্থ্য দ্বারা এতগুলি মহৎ কার্য্য পরিসম্পন্ন হইতে পারে, জাতীয় জীবনের এতগুলি প্রয়োজনীয় অঙ্গের পরিপুষ্টি পক্ষে যাঁহার হস্তে এরূপ মূল্যবান সুযোগ ও উপায় ন্যস্ত আছে, এরূপ ব্যক্তির মূল্য ও মর্য্যাদা প্রকৃত পক্ষে কখনই সামান্য নহে। এই জন্যই ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় কোনও পত্রিকাসম্পাদক সুধী সমাজে এত সম্মাননার ও শ্রদ্ধার পাত্র।

যাহা হউক, উপরোক্ত মন্তব্যগুলি একটু ধীরভাবে অনুধাবন করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে একজন সম্পাদকের প্রকৃত দায়ীত্ব অনেক ; সুতরাং তাঁহার কর্ত্তব্য ও অতি গুরুতর। তাঁহার দায়ীত্ব অনেক এবং কর্ত্তব্য অতি গুরুতর বলিয়াই, তাহার কঠোর সাধনা আবশ্যক, কালব্যাপী অনুশীলন আবশ্যক ; এবং উপযুক্ত প্রক্রম (Preparation) আবশ্যক। তাঁহার কর্ত্তব্য যেরূপ গুরুতর, তাঁহার দায়ীত্ব যেরূপ মহান্ ; তাঁহার মর্য্যাদা যেরূপ উচ্চ, তাহাতে অপরিপক্কবৃত্তি অবিকশিতজ্ঞান ও অনভ্যস্ত শক্তি কখনই সুফল প্রসব করিতে পারে না। এক ব্যক্তি যেমন অস্ত্র চালনায় সম্যক পারদর্শীতা লাভ না করিয়া যুদ্ধ বিদ্যা সংক্রান্ত সমস্ত কৌশল আয়ত্ব না করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, তাহার নিকট হইতে যেমন পৃষ্ঠ প্রদর্শন ও পরাজয় ভিন্ন অধিক কিছু আশা করা যায় না, তেমনি যে সম্পাদক মানবীয় জীবনের বিবিধ সমস্যাবলীর স্বল্পাংশেও পরিচিত নহেন, এবং জগতের নিগূঢ় তত্ত্বে কিছু মাত্রও প্রবেশ করেন নাই, তাঁহার নিকট হইতে জাতীয় কোনও রূপ ইষ্টই আশা করা যায় না।

কিন্তু আর সমস্ত সাধন ও শিক্ষা অপেক্ষা সম্পাদকের পক্ষে একটি সাধনাই সর্ব্বোচ্চ; তাহা ছাড়া অন্যবিধ বিশেষত্ব সম্পাদকের থাকা প্রয়োজন, তবে ঐ একটির তুলনায় আর সকল গুলি ক্ষুদ্র ও সামান্য। সম্পাদকের একটিই মূল্য ও মূখ্য আদর্শ বা উদ্দেশ্য ; অন্যান্য গুলি কেবল গৌণ উপলক্ষণ বা উপাদান মাত্র। যেটার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে সেটা স্বদেশ প্রাণতা। যে পর্য্যন্ত প্রকৃত স্বদেশানুরাগ না জাগিবে, যে পর্য্যন্ত জাতীয় অভাব দূরীকরণার্থে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া না উঠিবে, সে পর্য্যন্ত সম্পাদক প্রকৃত সম্পাদকীয়তা পদের উপযুক্ত নহেন। হৃদয়ে প্রকৃত স্বদেশবাৎসল্য না থাকিলে রচনাচাতুর্য্য শূন্য আড়ম্বর মাত্র, কৃতীত্ব পূর্ণ বর্ণবিন্যাস অন্তঃসার শূন্য এবং সর্ব্ববিধ কৌবিদ্যাভিনয়ই, নিষ্ফল অনুষ্ঠান মাত্র। সম্পাদককে সর্ব্বপ্রথমে স্বদেশ প্রাণতার পাঠশালায় উপযুক্ত সাধনা দ্বারা উপযুক্ত শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিতে হইবে এবং এই বিদ্যার সম্যক পারদর্শীতা অর্জ্জন করিয়া অন্যান্য অবাস্তব অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষার্থী হইতে হইবে। কিন্তু স্বদেশ প্রাণতাই মুখ্যভাবে সম্পাদকের নায়ক ও নোদক হইবে, এবং আর২ শিক্ষা ও সাধনা এই ভাবকে জাগ্রত রাখিবার জন্য, পরিপুষ্ট করিবার জন্য সহায়ভূত হইবে। এবং ঐ লক্ষ্যের দিকে সম্পাদকের দৃষ্টি ও আগ্রহ একান্তভাবে প্রভাবিত না হইলে, তাঁহার অপ্রধান ও ঔপলক্ষণিক উদ্যম, আদর্শ ও অনুশীলনগুলি অবিকৃত ও অবিধ্বস্ত থাকিতে পারেনা। যেহেতু ঐ একটি উচ্চ লক্ষ্যই লিপিনৈপুন্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও অপ্রধান সম্পাদকীয় আদর্শ ও কর্ত্তব্যাবলীকে সঞ্জীবিত করিতে ও পবিত্র রাখিতে সমর্থ। শুধু রচনাচাতুর্য্য অভিনয় করিতে হইবে বা কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতে হইবে, এইরূপ ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য নিচয়, ঐরূপ একটী উচ্চ ও পবিত্র আদর্শ কর্ত্তৃক বিধৃত না

হইলে কখনই স্থিরপ্রতিষ্ঠ থাকিতে পারেনা। দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে দেশীয় পত্রিকা বিভাগে এই মন্তব্যের সার্থকতার উদাহরণ ও প্রমাণ অনেকেরই জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

কিন্তু রচনা পরিপাট্য প্রভৃতি দক্ষতা সকলকে এত নিম্নস্থান দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কেহ যেন উহা একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয় বা নিরবলম্ব্য প্রতিপন্ন করাই প্রস্তাব লেখকের মনোগত ভাব। তাঁহার পূর্ব্ব মন্তব্যেরই পুনরুল্লেখ করতঃ বলা যাইতে পারে যে উহা কেবল গৌণভাবে প্রয়োজনীয় [সুতরাং অপ্রয়োজনীয় নহে,] এবং সম্পাদকের , শুধু ঐ উদ্দেশ্য বা আদর্শ লইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিলে মহান্ বিপত্তির সম্ভাবনা। লিপিদক্ষতা সম্পাদকের প্রয়োজনীয়,—অতি প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, তবে পূর্ব্বোক্ত আদর্শ সম্পাদনের একটী প্রয়োজনীয় উপায় ও সহায় মাত্র। সম্পাদকের নিকট ইহার কেবল এইটুকুই প্রয়োজনীয়তা এই উপায়কে সম্পাদকীয় আদর্শে বা উদেশ্যে পরিণত করা ভ্রম। সম্পাদকের রচনাগুণে পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিবার ও তাঁহাদের স্তুতি আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও সম্পাদকীয় ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা হইবে না, যদি তাঁহার ঐ উচ্চলক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ না থাকে। শুধু আদর্শান্তর রহিত প্রশংসার্হ রচনাদির ত অতি ক্ষুদ্র ও হীন ব্যবহার ও হীন প্রয়োগও দেখা গিয়াছে। বিচক্ষণ পাঠক শ্রেণীর মধ্যে বোধহয় অনেকেই সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, আমাদের দেশের অনেক কৃতি লেখক পর্য্যন্ত পরগ্লানি চর্চ্চায় নীচ অসূয়া চরিতার্থতায় এবং উপক্রোশ কার্য্যে লেখনীচালনা করিযা তাঁহাদের মহতী ও পরীয়সী লিখনশক্তি কলঙ্কিত করিয়াছেন। বলিতে কি এই নীচতাজনক দৃশ্য অনেক সম্পাদক কর্ত্তৃকও অভিনীত হইয়াছে। এইরূপ উচ্চ শক্তির অপব্যবহার ও কমনীয় নৈপুন্যের বৈগুণ্য শুধু লক্ষ্যভ্রষ্টতা ও হীনাদর্শেরই অবশ্যম্ভাবীফল ; এবং এই কারণেই উহা পবিত্র সম্পাদকীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ; উচ্চ সম্পাদকীয় আদর্শের বিরুদ্ধ। সেইজন্যই বলিতেছিলাম লক্ষ্যান্তর রহিত উচ্চোদ্দেশ্যনিরপেক্ষ রচনাচাতুর্য্যের মান, মর্য্যাদা বা মূল্য সম্পাদকীয় বিভাগে বড় অধিক নহে। ঐ উচ্চ উদ্দেশ্যসাধনোপায় রূপেই সম্পাদকের লিখনবৃত্তির একমাত্র আবশ্যকতা ও উপযোগীতা।

পাঠকবর্গের পর্য্যালোচনার্থ নিম্নে আরও কতকগুলি সম্পাদকীয় ক্রটীর বিষয় পৃথক ভাবে প্রকটিত হইল।

বিষয় নির্ব্বাচন ক্রটী।—ইহাও একটী গুরুতর সম্পাদকীয় ক্রটী। সাধারণতঃ সম্পাদকের অনভিজ্ঞতা ও স্বল্পজ্ঞানই এই ক্রটীর সর্ব্বপ্রধান মূল। সম্পাদক বিশেষভাবে সাহিত্য বিজ্ঞানে পরিচিত না হইলে, প্রবন্ধাদির যোগ্যতো রচনার দোষগুণ কিছুই বিচার না করিয়া পত্রিকার কলেবর পরিপূরণার্থ প্রচুরও উপযুক্ত উপকরণ অভাবে সকল প্রকার প্রবন্ধই পত্রিকাস্তে স্থান দিয়া থাকেন। অনেক সময় প্রবন্ধ লেখকদের প্রতি অবাঞ্চনীয় সমদৃষ্টি ও অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শনেচ্ছা হইতেও এই ক্রটী প্রসূত হয়। রচনা যেরূপই হউক, প্রবন্ধের মধ্যে প্রকৃত সার থাক আর নাই থাক, সকল প্রকার লেখাই অভ্যর্থনীয়, সকল প্রকার প্রবন্ধই প্রকাশযোগ্য। প্রবন্ধটি লিখিতে যে কিছু মসি ও কাগজ ব্যয়িত হইয়াছে, প্রবন্ধটি রচনা করিতে কিছু সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হইযাছে, ইহাই যেন লেখকের পক্ষে যথেষ্ট। ইহা হৃদয় রঞ্জক গল্প নহে ; দুঃখের সহিত বলিতে হয়, সত্য সত্যই এই ছাঁচের সম্পাদক আমাদের দেশে খুঁজিলে দুই চারিজন মিলে। ঐরূপ সম্পাদকের কাছে যে কাচ কাঞ্চনের মূল্য এক হইবে, নবীন প্রবীণের সমাদর একই হইবে, এবং এই কারণে বঙ্গ ভাষার মর্য্যাদা বিনষ্ট হইবে,

সাহিত্যের মাহাত্ম্য কলঙ্কিত হইবে ; তাঁহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এমনও কীৰ্ত্তিমান সম্পাদক দেখা গিয়াছে, যিনি একজনের রচনা ও ভাব সমালোচনা করিতে গিয়া যেরূপ সানুক্রোশ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন কিয়ৎকাল পরে ঠিক সেই লেখকের বিপরীত ভাবাপন্ন আর একজন লেখকের প্রসঙ্গকেও তদনুরূপ অভিনন্দন প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যে সম্পাদকের একটা স্বাধীন বিচার শক্তি নাই, যাঁহারা সাহিত্যসংক্রান্ত বৈষম্যাদি গ্রহণ করিবার, রচনাকৌশল তুলনা করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহার দ্বারা যে এরূপ একটা ক্ষোভব্যঞ্জক প্রহসন। অভিনীত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি! এইসব কারণেই বলা হইতেছি৽। যে সম্পাদকের একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন।

একদিকে যেমন যোগ্যতানিরপেক্ষ প্রবন্ধ সন্নিবেশ দোষের হইয়া পড়ে, তেমনি আবার নানা রকমের নানা শ্রেণীর, নানা ভাবের প্রবন্ধাদি পত্রিকাতে প্রবিষ্ট না হইলে, পত্রিকার সৌন্দর্য ও মর্য্যাদা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। কোনও বিশেষ বিদ্যা শিক্ষা বা ব্যবসার সংক্রান্ত কাজে এই সাধারণ নিয়মের সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা বিশেষ কিছু নাই। তাহাতে অন্যবিধভাব, অন্যবিভাগীয় চিন্তা অন্যশিক্ষাসংপৃক্ত নীতি সমাবেশের প্রয়োজনীয়তা বড় একটা নাই। যেমন "ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিষয়ক পত্রে বর্ত্তমান শিক্ষা বৈকল্যের আন্দোলন সূচনা করা কতকটা অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গত হইয়া পড়ে, এবং "আলাপিনী" নাম্নী সঙ্গীতা বিষয়িনী পাত্রিকার স্বায়ত্ত্বশাসনেব উপযোগীতা প্রতিপাদক প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হাস্যোদ্দীপক হয়। কিন্তু উপরোক্ত মন্তব্য সাধারণ পত্রিকাদি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

অর্থাৎ যে সকল পত্রিকায় নানাবিধ ভাবপূর্ণ, নানাবিধ শিক্ষাসংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যাপরিতোষক প্রবন্ধাদির জন্য দ্বার অবরুদ্ধ নহে, সেই সকল পত্রিকায় নানা শ্রেণীর প্রবন্ধাদি সন্নিবিষ্ট করিলেই পত্রিকার মর্য্যাদা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। জগতে একভাবের, একছাঁচের, একরূপের, একসুরের, এক প্রকৃতির উপাসক কেহই নাই। মানব মাত্রই বৈচিত্রের অনন্তত্বের ও নূতনত্বের উপাসক ও অনুসারক। এখানে একাকীত্বের আদর বা প্রতিষ্ঠা নাই। এই সত্যের সমর্থন করিয়াই দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন বৈচিত্রই সৌন্দর্য্যের উপকরণ ও উপলক্ষণ। তাই মার্কিন পণ্ডিত ইমার্শন্ বলিয়াছেন "Nature hates monopolies and exceptions." অর্থাৎ প্রকৃতি একভাবীত্বের ও এক রূপত্বের বিরোধী। এইজন্যই সম্পাদকের অভিরুচি ও অনুরাগ নানামুখী হওয়া প্রয়োজন। এই জন্যই তাঁহার জ্ঞানের, তাঁহার শিক্ষার পরিধি ও প্রসার বিস্তৃত ও সর্ব্বতোমুখী হওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য লেখক দিগের অপেক্ষা তাঁহার শিক্ষার পরিধি তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, বিদ্যার প্রসার, ও শক্তির পরিমাণ অধিক হওয়া স্বভাবতঃ সম্ভব নহে।* অথবা সকল শাস্ত্রে, সকল প্রকার শিক্ষা বা জ্ঞানে সমবুৎপত্তি লাভ করা ও সকল সম্পাদকের ভাগ্যে ঘটা সকলসময় সম্ভব বা স্বাভাবিক নয়।+ তবে,

* ইংলণ্ড ও আমেবিকার অনেক সম্পাদকের শক্তি ও যোগ্যতা পত্রিকার অন্যান্য লেখক দিগের অপেক্ষা উচ্চতর। তবে সকল সম্পাদকই যে এইরূপ উচ্চাধিকার প্রাপ্ত, বা ঐরূপ সম্পাদকের সংখ্যাই অধিক তাহা বলিতেছিনা।

+ ইহা নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে যে ইংলণ্ডের ও আমেরিকার অধিকাংশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদকেরাই এইরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাপন্ন এবং প্রশস্তশিক্ষা প্রাপ্ত।

সম্পাদকের সর্ব্ববিধ শিক্ষা সর্ব্ববিধ বিদ্যা, সর্ব্ববিধ সমস্যার প্রতি বিশিষ্ট অনুরাগ, লীপ্সা ও সহানুভূতি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। হয়ত, সম্পাদকের শুষ্ক সাহিত্য ভিন্ন তাঁহার, দক্ষতা, তাঁহার শক্তি আর অন্যদিকে বিস্তৃত নয়। জাতীয় জীবনের অন্যান্য দিক্ অন্যান্য বিভাগ, অন্যান্য সমস্যা আর কিছুতেই তাঁহার অধিকার নাই, কিন্তু তাহা হইলেও সাহিত্য ব্যতিরেকে বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতি অন্যান্য বিভাগেও তাঁহার অনুরাগ ও আকাক্খা সমভাবে আকৃষ্ট হওয়া প্রযোজন। এবং ঐসকল শিক্ষা ও চিন্তাবিষয়ক প্রবন্ধাদি, জাতীয় জীবনসংক্রান্ত আবশ্যকীয় সমস্যাসংপৃক্ত আলোচনাদি সম্পাদকের আগ্রহ সহকারে গ্রহণ ও অভিনন্দন করা বিধেয়।

এবং এইরূপে নানা ভাবাপন্ন নানা চিন্তাপূর্ণ ও নানা আকারের প্রবন্ধাদি পত্রিকাতে যতই আলোচিত হইবে, ততই জাতীয় জীবনের বিবিধ বিভাগীয় সমস্যাবলী লোকের জ্ঞান গোচর হইবে ; জাতীয় জীবনে নিগূঢ় তত্ত্বাদি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে জাতীয় জীবনের নানাদিক্‌সংক্রান্ত অসম্পূর্ণাদি দূর করিবার কৌশল ও উপায় উদ্ভাবিত হইবে এবং ইহা দ্বারাই সম্পাদকের প্রকৃত আদর্শ সাধিত হইবে, প্রকৃত দায়িত্ব সংরক্ষিত হইবে, প্রকৃত সম্পাদকীয়ত্ব সার্থকতা লাভ করিবে।

অনুদারতা—ইহাও একটী গুরুতর সম্পাদকীয় দোষ। পত্রিকায় নানাবিধ প্রসঙ্গাদি সন্নিবিষ্ট না হওয়ার আর একটী প্রধান কারণ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও অনুদারতা। এই অনুদারতা দোষে সম্পাদকীয় মহদাদর্শ ক্ষুণ্ন হয় এবং প্রকৃত সম্পাদকীয় উদ্দেশ্য ও দায়ীত্ব হীনতা প্রাপ্ত হয়। আমি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ও একমাত্র উচ্চধর্ম্মের অধিকারী, শুদ্ধ হিন্দু আচরানুমোদিত ভাব যাহা বিশুদ্ধ আর্য্যমন প্রসূত চিন্তা ও সংস্কার যাহা, তাহাই আমার পত্রিকায় স্থান পাইবে, অন্য ধর্ম্মসম্পৃক্তভাব বা 'নীতি' আমার পত্রিকায় আস্পদলাভ করিতে পারিবে না যেহেতু উহাতে পত্রিকা অপবিত্রও অবিশুদ্ধ হইবে। অথবা আমি সুসংস্কৃত সভ্যতানুমোদিত ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগামী, সুতরাং অন্যধর্ম্মগ্রাহীদিগের ভাব ও মন্তব্য, অন্য সম্প্রদায় ভুক্তের বিশ্বাস, অন্য পদ্ধতি অনুসারক দিগের সিদ্ধান্ত ও মিমাংসা কোন ক্রমেই আমাকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইবে না, যেহেতু ঐসকল বিমার্গপ্রস্থিতের চিন্তা, কুসংস্কারাপন্নের সমালোচনা ও কুরীতিকপরিগ্রাহকের মত। অথবা আমি পবিত্র খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অনুসারক্য সুতরাং বাইবেল বিবর্জ্জিত বাক্য আমার সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। এইরূপ নীচ ও অসংকীর্ণভাব দ্বারা সে সম্পাদক পরিচালিত হইয়া থাকেন, তাঁহার পত্র বা পত্রিকার চতুরঙ্গ উন্নতি সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য কখনই সম্ভব নহে অনুদারতা যে কেবল ধর্ম্মার্থীর পক্ষেই অনিষ্টকর, শুধু ধর্ম্ম পথেরই কণ্টক* তাহা নহে, ইহার অকারীতা সকল বিষয়ে, সকল বিভাগেই সমান। ইহা সত্য গ্রহণের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দেন, মানবহৃদয়ের কোমল ও কমনীয় ভাব সকল শুষ্ক করিয়া দেয়, মানবের অন্তঃকরণ ক্ষুদ্র ও সঙ্কুচিত করিয়া দেয়, এবং বিবিধ উন্নতির

* মহামতি ইমার্শন বলিয়াছেন—"The exclusionist in religion does not see that he shuts the door of heaven on himself, in striving to shut out others," অর্থাৎ ধর্ম্মসমাজে পরপ্রতি রোধক ব্যক্তি দেখিতে পাননা যে অন্যকে রোধ করিতে গিয়া তিনি নিজেই স্বর্গের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিতেছেন।

উপায় বন্ধ করিয়া দেয়। সত্য আহরণ করা কেবল যে ধর্ম্মপ্রয়াসীরই বিশেষভাবে কর্ত্তব্য এমন নয়, ইহা সাধারণ ভাবে সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য, সকল বিভাগেই প্রয়োজনীয়। সত্যের ভিত্তির উপর সকল প্রকার কার্য্য, সকল প্রকার উদ্দেশ্য, সকল প্রকার আকাঙ্খা প্রতিষ্ঠিত না হইলে, কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না, যেহেতু সত্যই সকল বস্তুর ভিত্তি, সত্যই জীবনের মূলমন্ত্র। মহাত্ম ইমার্শন্ তাই বলিয়াছেন, "Truth is our element of life," অর্থাৎ সত্যই আমাদের জীবনের উপাদান। এই সত্য আসিবার পথ যদি সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, সত্য গ্রহণ করিবার অনুরাগ ও আকাঙ্খা যদি শুষ্কীভূত হয়, সত্য গ্রহণ করিবার শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে একবার অনুধাবন করিয়া দেখ এই অনুদারতার কিরূপ শোচনীয় ফল। যে কোনও প্রকার সংস্কার বল, যে কোনও প্রকার উন্নতি বল, যে কোনও প্রকার সদুদাম বা সদনুষ্ঠান বল, সকলটিরই চরম উদ্দেশ্য কোনও না কোনও রূপে সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও সংবর্দ্ধন করা এবং অসত্যের বিনাশ সাধন করা। এই সত্যের দ্বার একটা দুইটা নহে ইহার দ্বার অনন্ত। অনন্ত অনন্তভাবে, অনন্ত উপায়ে সত্যলাভ করাই মানবের ধার্য্য। সেই জন্য তুমি কিছুই ঘৃণা বা বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে পারনা, কাহাকে উপেক্ষা বা পরিহার করিবার তোমার অধিকার নাই, ক্ষমতা নাই। যে উপায় বা পথ তোমার নিকট নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাই অনেক সময় অতি আশ্চর্য্য ভাবে অতর্কিত ভাবে সত্যের খনি প্রকাশিত করিয়া থাকে।

ভিন্নমতাবলম্বী বা ভিন্নভাবাপন্ন হওয়ায় যে ব্যক্তিকে তুমি মনে করিতেছ সে তোমার কোনই উপকার সাধন করিতে পারিবে না, তোমাকে কোনও রূপে শিক্ষাই প্রদান করিতে পারিবেনা, তোমার কোনও প্রকার উন্নতির পক্ষেই সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেনা, সেই ব্যক্তির সহিত একটু সখ্যভাবে মিশ, সে ব্যক্তির ভাব ও কার্য্যসমষ্টির সহিত একটু সানুরাগ অন্তঃকরণে পরিচিত হও, সে ব্যক্তির প্রভাব তোমার জীবনের উপরে একটু নিরবরোধভাবে বিস্তৃত হইতে ও কার্য্য করিতে দেও, সেরূপ ব্যক্তির মধ্যেও অনেক সত্য অনেক সার অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে।* এই বৈচিত্রপূর্ণ জগতে মানব এমনই উপাদানে গঠিত এমনই বৈচিত্রে সৃষ্ট যে একজন সামান্য লোককেও একটু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে, তাহার মধ্যে কিছু না কিছু বিশেষত্ব, কিছু না কিছু নূতন জিনিস, কিছুনা কিছু শিক্ষণীয় বিষয় দেখা যাইবে। জগতের বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন প্রভাব, বিভিন্ন শক্তির দিকে অনেক সময় আমাদের সল্পানুরাগ ও অবহেলা প্রযুক্ত আমাদের জ্ঞানগোচর হয়না বা আমাদের শিক্ষার রাজ্য ও জ্ঞানের পরিধি আশানুরূপ বিস্তৃত করেনা। সেই জন্যই মার্কিন ঋষি ইমার্শন্ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন :—"There are as good earth and water in a thousand places, yet how unaffecting"—ইহার ভাবার্থ এই জগতের কতকদিকে, কতস্থান কত ভাল জিনিস, আমাদের কত শিক্ষার ও উন্নতির উপযোগী বস্তু রহিয়াছে, অথচ সে সকল আমাদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছেনা।

* প্রত্যেক মনুষ্যই জগতের সকল দিক হইতে, সকল বস্তু হইতে শিক্ষা ও উপকার লাভ করিতে পারে। এই সত্যের সমথন করিয়া জ্ঞান-প্রবীণ ইমার্শন বলিয়াছেন :—"The world exists for the education of each man,"—অর্থাৎ, এই জগৎ প্রত্যেক মনুষ্যেরই পক্ষে শিক্ষার উপযোগী।

এই পরিবর্ত্তনশীল, উন্নতিশীল, বর্দ্ধনশীল জগতে মানুষের জীবনকেও পরিবর্ত্তনের পথ দিয়া বর্দ্ধনের পথ দিয়া যাইতে হইবে, মানবের মৌলিক শক্তি সামর্থ্যের, বিদ্যা বুদ্ধির পরিধি বাড়াইতে হইবে মানবের মানবত্বের সীমা উত্তরোত্তর বাড়াইতে হইবে। চিন্তাশীল ইমার্শন্ যথার্থই বলিয়াছেন "The life of a man is a selfevolving circle, which from a ring imperceptibly small, rushed on all outwards to new and larger circles, and that without end," অর্থাৎ মানুষেব জীবন একটি স্ববর্দ্ধমান বৃত্ত, ইহা প্রথমতঃ একটি ক্ষুদ্রতম গোলক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ নূতন এবং বৃহত্তর গোলকে বর্দ্ধিত হয়, এবং এইভাবে উত্তরোত্তর অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বাস্তবিক সীমাশীলতা বা স্থিতিশীলতা জগতের নিয়ম নয় প্রকৃতি নয়। এবং যে মানুষের আকাঙ্খা ও আদর্শ সীমাগত, যে মানুষের উৎসাহ, উদ্যম, অনুশীলনতা সীমাপরিবেষ্টিত, সে মানুষ প্রকৃত মানবাদর্শ হইতে চ্যুত। তাই ইমার্শন্ বলিয়াছেন—Men cease to interest us when we find their limitations. The only sin is limitation, অর্থাৎ আমরা যখন মানুষের ক্রিয়া কলাপে একটা সীমা, একটা গণ্ডি দেখি, তখন আর উহা আমাদের মনঃপুত হয়না। সীমাবদ্ধতাই এক মাত্র পাপ। কি ধর্ম্মরাজ্যে কি সংস্কার বিভাগে, সকল স্থলেই মানবের বিচরণ ভূমি যতই বিস্তৃত হয়, মানবের বিশ্বজনীন সহানুভূতি ও প্রেম ততই বাড়িতে থাকে, সার্ব্বভৌমিক সংমিশ্রণ যতই বাড়িতে থাকে, ততই মানুষের চিন্তারাজ্য বর্দ্ধিত হয়, জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত হয় এবং নিজ২ অভাব অসম্পূর্ণতা দূর করিবার নানা রূপ উপায় উদ্ভাবিত হয় ও সমীচীন শক্তি লাভ করা যায়। সকল প্রকার লোকের নিকট হইতে কোনও না কোন উপকার লাভ করা যাইতে পারে, বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, বিপরীত বিশ্বাসীর নিকট হইতেও অনেক শিক্ষা ও সাহায্য লাভ করা যাইতে পারে, এই অকাট্য সত্যের খাতিরেই সম্পাদককে ব্যক্তি গত মত, বিশ্বাস ও ভাব নিরপেক্ষ হইয়া উদারতার সহিত, সহানুভূতির সহিত নানা শ্রেণীর লেখকের নানা প্রকৃতির সাহিত্যিকের রচনা ও প্রসঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা পরমেশ্বরের সৃষ্ট একজন মানবের মধ্যে যে গ্রহণীয় বিষয় আছে ; যে শিক্ষণীয় বস্তু আছে তাহা অনুদারাবর্জ্জিত নয়নে না দেখিলে, প্রগাঢ় সহানুভূতিব চক্ষে না দেখিলে কখনই দৃষ্টিপথবর্ত্তী বা জ্ঞান-বিষয়বর্ত্তী হয়না। হয়ত, তোমার সহিত মতানৈক্য আছে বলিয়া বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভুক্ত বলিয়া তুমি মনে করিতেছ বুঝি ঐ ব্যক্তি তোমার অভ্যর্থনার পাত্র নয়, তোমার সহানুভূতির যোগ্য নয়, কিন্তু জানিও যে উপর হইতে দেখিতে বা বাহির হইতে শুনিতে সামান্য হইলেও মানব সামান্য নয়, তাহার একটা মূল্য আছে, মর্য্যাদা আছে। এই মানুষ সম্বন্ধে মহাজ্ঞানী ইমার্শন্ কি বলিতেছেন শ্রবণ কর :—Every man has his own vocation. His talent is his call. There is one direction in which all space is open to him. He has his faculties silently exerting him to endless exertion,"—অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষেরই নিজের কিছুনা কিছু করণীয় আছে। তাহার বিদ্যা বুদ্ধিই এই কার্য্যের আমন্ত্রণ স্বরূপ। অন্ততঃ এমন একটী বিভাগ আছে যাহাতে সমস্ত জগতই তাহার আয়ত্বাধীন তাহার শক্তি সামর্থ নীরবে সেই দিকে অবিশ্রান্তভাবে কার্য্য করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। আর একস্থলেও এসম্বন্ধে তিনি একটী সুন্দর কথা বলিয়াছেন :—"Every man has this call of the power to do something unique. and no man has any other call,"—অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষেরই বিশেষ কিছু করিবার ক্ষমতা আছে—

এইভাবের আহ্বান প্রত্যেক মানুষেরই নিকট আসে ; এছাড়া আর কোন ও আহ্বান তাহার নিকট আসেনা। শুধু যে ধর্ম্মসাধনার্থির পক্ষেই "prove all this things hold fast that which is good" (অর্থাৎ সকল বিষয় প্রমাণ ও পরীক্ষা কর, এবং যাহা সার তাহাই গ্রহণ কর) মূলমন্ত্র তাহা নহে ; এই মহৎ অনুশাসন কি সমাজ সংস্কারকের পক্ষে, কি রাজনৈতিক প্রচারকের পক্ষে কি শিক্ষাসংস্কারকের পক্ষে, কি স্বদেশ হিতৈষির পক্ষে, সকল প্রকার উন্নতিসাধকের পক্ষেই সমভাবে অনুসরণীয়, সমভাবে প্রয়োজনীয়। পুরাকালোচিত নীচ বৈষম্যনীতি বর্জ্জন করিয়া সাম্যনীতি অনুসরণই সর্ব্বধা প্রয়োজনীয়।* ইহাতেই আমাদের সকল প্রকার জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে, ইহাতেই আমাদের জাতীয় সংস্কারের আশা সংবদ্ধ রহিয়াছে। যেহেতু জগতের ইতিহাস হইতে, জ্ঞানী মহাত্মাদিগের অভিজ্ঞতা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, "Wisdom will never let us stand with any man or men on an unfriendly footing'[Emerson] (অর্থাৎ প্রজ্ঞা আমাদিগকে কখনই এক বা বহু ব্যক্তির সহিত বিরোধ ভূমিতে দাঁড়াইতে দিবে না)*

(ক্রমশঃ)

শ্রীশান্তিপ্রিয় শর্ম্মা।

অক্ষয়কুমার মজুমদার : দীক্ষা [প্রবন্ধ] উমানাথ চট্টোপাধ্যায় ; বিবাহ করিয়া মরিও না [ঐ] নলিনীকান্ত সেন ; দেশের কাজ [ঐ], দ্বিসদাস দত্ত : জাতি বা বর্ণভেদ, অক্ষয়কুমার মজুমদার : জাপানের সংবাদ। শ্রীমতি ... দেবী : বউ কথা কও [কবিতা]

১ম ভাগ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩০৯

কুমুদবন্ধু রায় : সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম, তরণীকান্ত দাস : বুদ্ধ গয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, শশধর সেন : দেবসুরের যুদ্ধ, সরোজন্দ্র গুণ : অসভ্য জাপান,

ঋষি ইমার্শন্ এই সম্বন্ধে অতি সুন্দর অনুশাসন ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন : "If you meet a sectary, or a hostile partisan, never recognise the dividing lines ; but meet on what common ground remains—if only that the sun shines, and the rain rains for both ; the area will widen very fast, and ere you know it the boundary mountains, on which the eye had fastened, have melted into air,"— অর্থাৎ যদি কোনও সামাজিক বা অপ্রেমিক সাম্প্রাদায়িকের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে তোমাদেব মধ্যে প্রভেদরেখা গণনা না করিয়া, তোমাদের মধ্যে যতটুকু ভাবের বা মতের সাম্য আছে, তাহা দেখিয়াই উভয়ে মিলিত হও–এমনকি তোমাদের উভয়ের জন্যই সূর্য্য কিরণ দেয় এবং বৃষ্টি বর্ষিত হয়–ইহাছাড়া যদি মিলের আর কোনই প্রশস্ততর ভূমি না থাকে। এবং তোমাদের মধ্যে যে পর্ব্বত–তুল্য প্রভেদ সীমার দিকে চক্ষু প্রথমতঃ আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা ক্রমে২ শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

এস্থলে সদাকাঙ্খী "আশা"–সম্পাদকের বিষয় উল্লেখ করিলে বোধহয় ন্যায়–বিরুদ্ধ হইবে না পত্রিকায় তাঁহার স্বরচিত মন্তব্যাদিই তাঁহার উচ্চ উদারতার বিশিষ্ট পরিচায়ক।

প্র: লে:।

কুমারী-বারব্রত

(১)
যম পুকুর

এই ব্রত আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে শেষ হয়। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিবস প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্নানান্তে বাটীর উঠানে একটী পুষ্করিণী কাটিয়া হেলেঞ্চা, কলমী, কলাগাছ, তুলসী, মানকচু কালকচু, হরিদ্রার চারা রোপণ করিতে হয়। এবং প্রত্যহ শয্যা ত্যাগ করিয়া কিছু আহার না করিয়া, শূচী হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূজা করিতে হয়। পুষ্করিণীর মন্ত্র—

* হেলেঞ্চা, কলমী, লক্ লক্ করে।
রাজার বেটা পক্ষী মারে॥
মারণ পক্ষী শুকোর বিষ।
সোণ্যর কৌটা রূপার খিল॥
খিল খসা'তে লা'গল চড়।
আমার ভাই, বাপ লক্ষ্মীশ্বর॥

কলাগাছের মন্ত্র—

কলাগাছ কলাগাছ পোজন।
সোণার থালে ভোজন॥
সোণার থালে ক্ষীরের নাড়ু।
শাঁখার আগে সুবর্ণের খাড়ু॥

তুলসির মন্ত্র—

তুলসি তুলসি নারায়ণ।
তুমি তুলসি ব্রহ্মণ॥
তোমার তলায় ঢালি জল।
অন্তকালে দিও স্থল॥

কালকচু, মানকচু, হীরদ্রাচার মন্ত্র—কালকচু, মানকচু, হলুদেরচারা দেবিভ্যঃ নমঃ।

এই মন্ত্র কয়টির প্রত্যেকটি তিনবার করিয়া পড়িতে হয়। পনরই কার্ত্তিক ঐ পুষ্কণীর নিকট কএক হাত জমি লইয়া পাঁচ প্রকার শস্য বুনিতে এবং যমগোদার মা, মাছবেচুনি, কুম্ভীর, কচ্ছপ, শশক, এবং হাতে পো ফাঁকে পো, নামক পুতুল কয়টী ঐ শস্য ক্ষেত্রের নিকট রাখিতে হয়।*

* হেলেঞ্চা, কলমী, লতাশাক বিশেষ—পুষ্করিণীর ভিতর থাকে।

* এই পুতুল ছয়টি উহাদের আকৃতি অনুযায়ী করিতে হইবে।

(২)
সাজতি

এই ব্রত, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত মাসের সংক্রান্তিতে শেষ করিতে হয়। আহারের পর বেলা তিনটার মধ্যে এই ব্রত নিত্য শেষ করিতে হয় ; শৃগাল ডাকিলে সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যায়।

আতপ তণ্ডুল বাটিয়া, জলে গুলিয়া চন্দ্র, সূর্য্য গঙ্গা, অরুন্ধতি, যমুনা, ইন্দ্র, শঙ্ক, শাখা, সাটী, নথ, নোয়া, সিন্দুরের কৌটা, পানেরবাটা, শয্যা, কদমগাছ, অশ্বত্থগাছ, ফুলগাছ, রান্নাঘর, ঢেঁকিঘর, গোয়ালঘর, ধর্ম্মের ষাঁড়, কুরা, হাট, ঘাট, সমস্ত অলঙ্কার ইত্যাদি, কুঁচুইবন, এইছবি গুলি ঘরের মেজেতে আঁকিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দুর্ব্বা দ্বারা পূজা করিতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত ছবিগুলিও, পূজার পর সমস্ত দুর্ব্বাগুলি কুঁচুই বনে লইয়া যাইবার সময় এই মন্ত্রটি পাঠ করিতে হয়। যথা :—

অরণ বরণ চরণে।
ফুল ফুটেছে বরণে॥
যখন ঠাকুর পাটে উঠোন।
সকল ফুল কুড়াইয়া নেন॥

কুঁচুই বনে লইয়া গেলে দুর্ব্বাগুলি নাড়িতে এবং (অমুক) আসছে ছালা ছালা। তাই তুলতে এত বেলা॥ এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।*

(৩)
তুঁষুলী

এই ব্রত পৌষ মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ মাসে সংক্রান্তিতে শেষ হয়। কাল গরুর গোবর এবং তুঁষে একত্র মিশাইয়া গোল করিয়া ; নিত্য চারিটি করিয়া পূজা করিতে হয়। সূর্য্য উঠিবাব পূর্ব্বে শূচি হইয়া দুর্ব্বা, চন্দন, সিন্দুর লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া পূজা করিতে হয়।

মন্ত্র—তুঁষ তুঁষুলি কাঁধে ছাতি।
কেন তুঁষুলি এত রাতি॥
তুঁষুলিরে রাই।
তোমারে পূজা করে পাঁচ বুড়ি—
পাঁচটা গড় গড়ে খাই॥

সংক্রান্তির দিবস যথারীতি পূজা পূর্ব্বক প্রাতঃকালে একখানি সরায় করিয়া পাঁচবুড়ি,— পাঁচটা, গড়গড়ে খাইতে হয়, এবং ৩০ দিনের পূজা করা তুঁষুলি, দুর্ব্বা এবং সাত ফুলের কাঠ একত্র করিয়া একটি মালসায় রাখিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিতে হয়। ঐ আগুন

* এই ব্রতেব মন্ত্র অধিক এবং অতিশয় বড় তজ্জন্য দেওয়া হইল না। আ, স।

ভোজনের সময় সম্মুখে থাকিবে, আহারান্তে ভূক্তাবিশিষ্ট আগুনের মালসার ভিতর দিয়া জলাশয়ে ভাসাইয়া দিতে হয়। ঐ দিবস ব্রত কারিণীর পাঁচ বুড়ি পাঁচটা গড় গড় ব্যতীত আর কিছুই খাইতে নাই।

শ্রীমতী শৈলজা কুমারী দাসী।

কলানিকেতন
আশার কাহিনী

আজন্ম জাগ্রত মানস অন্তরে
প্রদীপ্ত প্রদীপ সম
তারি সুধা হাসি দেয় নিতি নাশি,
নিরাশ বেদন–তম।
জীবন প্রভাতে থাকি সাথে সাথে
বাঁধি, বুকে চির–বাসা
সে যে আশা, সে যে আশা !
সৃজনের স্রোতে ভাসিয়া এসেছে
একি ব্যাকুলতা !
সুপ্তহৃদি–যন্ত্রে কিমোহন মন্ত্রে
আনে নিভরতা !
প্রেমের শৃঙ্খলে মমতার ফুলে
গাঁথা অনন্ত পিপাসা
সে যে আশা, সে যে আশা।
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বীণাটির তরে
বাজিছ বিমুগ্ধ সুর
বিহগের গানে নদী-কলতানে
মিশি, উন্মদ মধুর !
পল্লব মুকুলে ফুল্ল ফুলে ফুলে
অঙ্কিত একটি ভাষা
বিশ্ব বিমোহিনী আশা।
তোল প্রাণে প্রাণে সুখের কল্লোল
ওগো আশা–রাণী,
জীবনে মরণে দীন দুঃখী জনে
শুনাও আশ্বাস বাণী,
ভব জ্বালা জ্বাল ঢাল সুধা ঢাল
নাশ ক্ষুধা নাশ তৃষ্ণা
ওগো আশা, ওগো আশা !

শ্রীমতী 'সঙ্গিনী' রচয়িত্রী।

মঙ্গল গীতি।*

ধীরে ধীরে, সান্ধ্য সমীরে,
ছুটিছে ফুল-বায়,
ফুলে বাগানের ফুলের হাসি
ঢা'লতে আজি কাহার পায় !
আজ কেনরে নদীর ঢেউ
খেলছে উজান বাহিয়ে !
আজ কেনরে চাঁদের হাসি
পড়ছে বিমান-ছাপিয়ে,
ফুটছে কোথা জ্যোছনা টুকু
কার পরাণে মিলতে চায় !
এক তানেতে প্রমোদ গীতি
উঠছে কাহার উদ্দেশে,
গাইছে বিহগ ধীরি ধীরি ধীরি
কার মহিমা হরষে,
আশীষ ভরে যুক্ত করে
কার যশঃ ভারত গায় ?
আজ নাকিরে মাতৃহারা ভারত
পাবে জনক এক,
আজ নাকিরে মাতৃহারা ভারত
পিতার অভিষেক ;
গাওরে স'ব, গাওরে তবে
গাওরে—ভারত পিতার জয় ! ! !

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস গুপ্ত।

বালিকার প্রতি

বালা, তুমি আস যাও,
খেলিয়া বেড়াও,
থাক সদা মনোসুখে,
আমি নত মুখে
থাকি মনোদুঃখে
শত শেল বেঁধে বুকে ;
তুমি ভাব সুখে
খেলার ভাবনা

* দিল্লী-দরবার উপলক্ষে লিখিত।

সদাই আনন্দ ময়,
আমি ভাবি হায়,
'পেটের ভাবনা'
—শুষ্ক কাতর হৃদয়।
(তুমি), জান নাক কভু
দুঃখের বারতা
প্রফুল্ল কুসুম সম,
সাহারা সংসারে
নীরস পাদপ
বিষন্ন মূরতি মম।
তুমি আনন্দ উৎস—
স্বরগের সুধা
আমি বিভীষিকা ময়,
তোমাকে আমাতে
আকাশ পাতাল
মিল কেমনে হয়?

শ্রীতারাপদ গুপ্ত।

ডেক না।

সখা গো! ডেকনা মোরে তব শুভ কাজে,
এদীর্ণ হৃদয়ে শুধু ব্যথা দেওয়া সাজে!
তোমাদের সুখ-সভা, কুশল বাসরে,
এ বেদনা-ডালি বল আনিব কি করে?
কি হ'বে করিয়া ম্লান দীপ্ত-দীপালোক
নীরস নিশ্বাসে! কি জানি অলক্ষ্যে শোক
পশে যদি ছিদ্র লভি, দংশে যদি হায়
তোমাদের মণি-ময় সুন্দর কায়ায়!
তব প্রেম, তব ক্ষেম, তব হেম-মাঝে,
চিরোজ্জ্বল বিধু-কলা নিয়ত বিরাজে;
রাহুকে এনো না সেথা ডাকিয়া স্বেচ্ছায়,
কুল্যাঘাতে খেদাইয়া করগো বিদায়।
শুধু তব ব্যথা-দুঃখে মোর অধিকার,
হে সখা, তখন মোরে ডাকিও আবার!

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল ভক্তিবিনোদ!

ছেলে-খেলা।

এতটুকু বালিকারে লয়ে করি খেলা,
অবসর করে নিয়ে ভোরে সন্ধ্যা বেলা।
সেও আপনার মনে ঘনাইয়া আসে,
কত ভঙ্গী করি, যায়, গায় খেলে হাসে !
কেশ বেশ বিন্যাসের শিখিয়াছে ভাব,
সেজে গুজে চলা তার এখন স্বভাব।
হয়েছে প্রখর দিঠি একান্ত নূতন,
লজ্জা শিখায়েছে তারে রীতি-পলায়ন।
আরনাহি ভাল লাগে খেলা তার সনে,
যদি সে না হ'ল মোর সমাজ-বন্ধনে !
তবে কেন সুখ শান্তি আমি অবলায় ;
নিয়তির বজ্র হস্তে করিব সংহার !
হে কিশোবি, ছেলে খেলা বুঝি হ' শেষ
মনে বেখো তব জন্মভূমি বঙ্গদেশ।

১২।৮।০৭। খুলনা।

ভুলভাঙ্গা

আমি পিতা মাতার অতি আদরের সন্তান ছিলাম। আমরা ভাই ভগ্নীতে পাঁচটি। কিন্তু সর্ব্ব কনিষ্ঠ বলিয়া পিতা মাতা এবং অন্যান্য সকলেই আমাকে সমধিক স্নেহ করিতেন। পিতা পার্ব্বত্য প্রদেশে বড় চাকুরী করিতেন ; আমরা পিতার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতাম। আমাদের পড়াইবাব নিমিত্ত যদিও শিক্ষক নিযুক্ত ছিল, তথাপি আমি পিতার কাছেই পড়িতাম, ও মায়ের কাছেই সূচী-কার্য্য শিক্ষা করিতাম—আর বেশীর ভাগ সেই পরম রমণীয় প্রকৃতির লীলা ভুমিতে বন্য কুরঙ্গীর মত বেডাইয়া বেড়াইতাম এবং সেই নির্ঝরিণীর মৃদুল জল-কল্লোল শব্দে, বন্য বিহঙ্গের মধুর কলকলধ্বনিতে, হরিদ্বর্ণ তৃণ পল্লব, নয়ন-রঞ্জন পার্ব্বত্য প্রসূন এবং শ্যামল লতা কুঞ্জের মধ্যে আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলিতাম। কোথা দিয়া দিন চলিয়া যাইত, জ্ঞান থাকিত না। মাতা ব্যস্ত হইতেন, আমাকে খুঁজিবার জন্য লোকের পর লোক পাঠাইতেন এজন্য মায়ের কাছে মাঝে মাঝে মৃদু ভর্ৎসনাও শুনিতাম কিন্তু এ লোভ সম্বরণ করিতে পারিতাম না। এ জানি কি এক মোহময় আকর্ষণে আবার ছুটিয়া বাহির হইতাম। প্রকৃতি দেবী যেন তাঁহার অতুল রূপ সাগরে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য আমাকে জোর করিয়া টানিয়া লইত। আমি কখন বিচিত্র বর্ণের পাখীর পালক কুড়াইতাম, কুড়াইয়া খোপায় পরিতাম। কখনও বা বন সঙ্গিনীদের সঙ্গে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিতে রাজহংসীর মত সাঁতার কাটিতাম।

কখন হরিণ শিশুর সঙ্গে ছুটাছুটি করিতাম। আবার কখনও নানাবর্ণের বন ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া গলায় পরিতাম। চঞ্চল কুরঙ্গ ধরা দিত না, ছুটিয়া পলাইয়া যাইত, আমার সাধের মালা গাছি ছিঁড়িয়া যাইত, ভারি রাগ হইত। হায় ! তখন জানিতাম না পৃথিবীতে যে যাকে ভালবাসে, আদর করিতে চায়, সে তাকে ধরা দেয় না। এমনি করিয়া গান গাহিয়া মালা

গাঁথিয়া হরিণ-শাবকের সঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া শ্যামল লতাপল্লবের মধ্যে আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলিয়া আমার জীবনের চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিলাম। তারপর একদিন স্নিগ্ধ কৌমুদী শোভিত বাসন্তী নিশীথে যখন কোকিল জগৎ মাতাইতে ছিল, সমীরণ আনন্দে অস্থির হইয়া লুটিয়া লুটিয়া ফুলের গন্ধ অঙ্গে মাখিতে ছিল, শ্যামা কি এক মধুময় প্রানস্পর্শী সঙ্গীতে প্রাণে আনন্দ ধারা ঢালিয়া দিতেছিল, সানাইয়ের প্রত্যেক রাগিণীতে যেন থাকিয়া থাকিয়া বলিতেছিল—

'স্থান দিও দাসীরে চরণে'—

এমন সময়ে আমাদের চারি চক্ষের সম্মিলন হইল। আমি আগ্রহে আগ্রহে চাহিয়া দেখিতাম। কি দেখিতাম, দেখিতাম, দেব সদৃশ একখানি সুঠাম সুন্দর সমুন্নত দেহ কান্তি, তদুপরি একখানি সুন্দর সহাস্য মুখ—সরলতা ও পবিত্রতার একত্র সমাবেশ। উজ্জ্বল নয়ন যুগলে স্নেহরাশি উছলিয়া পড়িতেছে—দেখিয়া প্রাণ আশ্বস্ত হইল। তারপর, পিতা, মাতা, ভাই বোন্‌দের কাঁদাইয়া, সমবয়সীদের আশ্বাস ও উৎসাহ লইয়া সানাইয়ের বিদায় রাগিণীর সঙ্গে২ বিদায় লইলাম। শ্বশুর বাড়ী গিয়া আবার সকলই পাইলাম। সেই পিতা মাতার স্নেহ, ভাইবোন্‌দের আদর, সোহাগ, দাসীর যত্ন সেই সকলই পাইলাম,—আর পাইলাম আর একটী হৃদয়ের প্রাণভরা ভালবাসা !

আমার শ্বশুব বাড়ী পল্লীগ্রামে। গ্রামের প্রান্তভাগে একখানা নানা জাতীয় ফলের বাগান ; তাহারই মাঝে একখানি সুন্দর দোতালা বাড়ী—গাছে গাছে ঢাকা। বাড়ীর পশ্চাতে শৈবাল শোভিত একটি ছোট পুকুর, পুকুরের চারি পারে দেশী বিলাতী নানা জাতীয় ফুলের বাগান। বাগানের স্থানে২ লতার বেড়া, তাহাতে লাল নীল প্রভৃতি নানা রঙ্গের ফুল ফুটিয়া সর্ব্বদা চিত্তাকর্ষণ করিত। বাগানের মধ্যস্থ ঘাসগুলি যত্ন পূর্ব্বক ছাটিয়া দেওয়াতে বোধ হইত যেন কেহ একখানি সবুজ গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছে। তাহারই মাঝে আমরা দু'জনে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতাম। প্রিয়তম আদর করিয়া আমার অবেণী সংবদ্ধ চূর্ণ কুন্তল রাজিতে সুগন্ধী মাখাইয়া, ধূলাবলুণ্ঠিত ক্ষুদ্র অঞ্চল বাসিত করিয়া দিতেন। বাসে প্রাণ মাতোয়ারা হইত। দু'জনে দু'জনের দিকে চাহিয়া২ আপনা বিস্মৃত হইতাম ! আকাশে চাঁদ হাসিয়া উঠিত, মাথার উপর দিয়া পাপিয়া ডাকিয়া যাইত, গ্রাম্যপথে ক্বচিৎ দু'একটী শ্রান্ত পথিক পথশ্রান্তি দূর করিবার আশে রজনীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আপন মনে গান গাহিয়া যাইত। পাগল বাতাস ফুলের গন্ধ চুরি করিয়া নিজ অঙ্গে মাখিত। এবং সকলকেই কিছু কিছু উপহার দিত, বুঝি ফুলের গন্ধের চেয়ে প্রাণে-সিঞ্চিত সুগন্ধি তাহার কাছে বেশী মিষ্ট লাগিত,—তাই আমার সেই সিক্ত আচলখানি লইয়া লুটোপুটি যাইত ! যাক্ ইহার কিছুতেই প্রাণ আকৃষ্ট হইত না, আমার মন তখন সেই প্রাণস্পর্শী স্নেহময় কোমল চাহনির সঙ্গে২ কোন্ এক অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া যাইত,—আমি আত্মহারা হইতাম ! ভাবিতাম এই বুঝি স্বর্গ ! আমার জীবনের দিনগুলি এমনই বুঝি কাটিয়া যাইবে। কিন্তু তখন জানিতাম না ভাগ্যদেবী আমার অলক্ষ্যে পা বাড়াইতেছেন, নিষ্ঠুর নিয়তি মুখ ব্যাদান করিয়া হাসিতেছে। হায় ! সুখের দিনে বুঝি লোকে এমনি ভুল করে।

আমার সুখের দিন ফুরাইয়া আসিল। প্রিয়তম আমাকে রাখিয়া চাকুরীর উদ্দেশে সুদূর বিদেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সেই দেবমূর্ত্তী হৃদয়ে আঁকিয়া সমস্ত সুখ দুঃখের স্মৃতি ও বুকভরা আশা লইয়া আমি শূন্য প্রাণে পড়িয়া রহিলাম। আবার মধুমাস দেখা দিল। গাছে গাছে

কোকিল ডাকিল, বাগানে ফল-ফুল সাজিল, গগনে চাঁদ হাসিল। পৃথিবীর আঁধার দূর হইয়া গেল কিন্তু আমার হৃদয়ের আঁধার দূর হইল না। শুধু আমি একটি ক্ষীণ দীপালোক আলোকিত। নির্জ্জন কক্ষে চক্ষের জলে বালিশ ভিজাইতাম, আর ভাবিতাম,—

'কোথা এবে হৃদয়ের ধন-
হৃদয়ের দেবতা আমাব,
অভাগীরে হের একবার।"

ভাবিতাম সেও বুঝি আমার মত এই শুভ্র স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে বাসন্তী নিশীথে হৃদয়ের দারুণ ব্যাথায় অবসন্ন হইয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া তপ্ত অশ্রুজলে অন্তরের জ্বালা নিবারণ করিতে প্রয়াস করিতেছে। কিন্তু হায়, এমন দিন আসিল ; যে দিন আমার সেই চিরপোষিত, আকাঙ্খিত বড় সাধের ভুলটি ভাঙ্গিয়া গেল। তারপর সহসা চাহিয়া দেখিলাম, সংসার মরুভূমে আমি একা পড়িয়া রহিয়াছি। একটুকু জল নাই, একটুকু বাতাস নাই চতুর্দ্দিকে কেবল ধূধূ করিয়া আগুণ জ্বলিতেছে। সে আগুণ নিভাইতে পারে এমন কোন শীতল জল নাই, সে যন্ত্রণা দূর করিতে পারে এমত কোন স্নিগ্ধ সমীরণ নাই। কেহ নাই, কিছু নাই—আছে কেবল সেই দগ্ধ স্মৃতি, আর প্রাণেশের বহু আদরের সেই সুগন্ধিগুলির শূন্য বোতল।

শ্রীমতী মৃণালিনী বসু।

আবদুল করিম : বাঙ্গালার গ্রাম্যগীতি।

এই পত্রিকা নোয়াখালী—রামেন্দ্র-যন্ত্র হইতে শ্রীতারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আশার নিয়মাবলী।

১। "আশা"র প্রত্যেক সংখ্যা অন্যুন ৩২ পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে।
২। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ভারতে ১৷৷০ ও অন্যত্র ২ টাকা নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যার পৃষ্ঠে লিখিত থাকিবে।
৩। উত্তর প্রার্থিগণকে রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট পাঠাইতে অনুরোধ করি। প্রবন্ধাদি এক পৃষ্ঠায় ভাল কাগজে লিখিতে হইবে ; প্রবন্ধাদি ফেরৎ দেওয়ার নিয়ম নাই।
৪। ঠিকানা স্পষ্ট লেখা আবশ্যক।
৫। পত্র, প্রবন্ধ ও টাকা নিম্নের ঠিকানায় আমার নামে প্রেরিতব্য।
৬। বিজ্ঞাপনদাতাগণ টিকিট পাঠাইয়া নিয়মাবলী জানিতে পারেন।

শ্রীমহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী।
আশা নিকেতন, নোয়াখালী।

প্রাপ্তি স্বীকার।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমরা "আশা"র বিনিময়ে এবার "আরতি" "ভারতী" 'বান্ধব' ও শিবপুর কলেজ পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। 'শিবপুর কলেজ পত্রিকা" সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

'আশা'য় সমালোচনার্থ "নির্ম্মলা" "কমলা", "আরম্ভ" ও "বর্ণজ্ঞান" নামক পুস্তক চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইয়াছি।

অবসর মতে ভবিষ্যতে গ্রন্থ নিচয় "আশা"য় আলোচিত হইবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে স্বদেশ হিতৈষী উদারহৃদয়, রসজ্ঞ, হাতিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মৌলবী মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী সাহেব "আশা"র আর্থিক অবস্থায় উন্নাতিকল্পে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, ভবিষ্যতে যথেষ্ট সাহায্য করিবেন বলিয়া আশাও দিয়াছেন। আমরা ধন্যবাদান্তে তাঁহার দয়ার উপর বিশ্বস্ত রহিলাম। দুঃখের বিষয় বিভাগীয় একমাত্র মাসিক পত্রিকা "আশা"র উন্নতিকল্পে কোন মাতৃভক্ত সন্তানই বিশেষ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। ইহা জাতীয় কলঙ্ক সন্দেহ নাই।

ঘরের কথা

"আশা"র অনিয়মিত প্রচারের জন্য পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থী। বাসনানুরূপ কার্য্য সম্পন্ন না হওয়ায় আমি লজ্জায় ম্রিয়মান। মফস্বল হইতে বিশেষতঃ নোয়াখালীর ন্যায় স্থান হইতে পত্রিকা প্রচার করা বড় কঠিন কায, কঠিন জানিয়াও, সৎকার্য্যের সহায় ধর্ম্ম এই বিশ্বাসে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। অর্থাভাব, মুদ্রাযন্ত্রের কর্ম্মচারীগণের অভাব ও রোগাদি আকস্মিক ঘটনানিচয় আমাকে এরূপ লজ্জিত করিতেছে। নিজের মুদ্রাযন্ত্র না করা পর্য্যন্ত আমার এসব দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। মাতৃভক্ত সন্তানগণ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেই আমার উদ্দেশ্য সাধন সহজ হয়।

১ম ভাগ, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ

আশা-বিজ্ঞাপনী।
নোয়াখালী হালদার এণ্ড কোম্পানীর সুবিখ্যাত
চৈতন্য-বটিকা।
জ্বরের মহৌষধ।

মহামান্য বড় লাট্ লর্ড কুর্জ্জন্ বাহাদুরের পার্শনেল্ ষ্টাফের অনারেরি এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, নোয়াখালীর বর্ত্তমান বড় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রায় উপেন্দ্রনাথ বাহাদুরের প্রদত্ত, চৈতন্য বটিকা সম্বন্ধে ইংরেজী প্রশংসা পত্রের বঙ্গানুবাদ—

... হালদার এণ্ড্ কোম্পানীর আবিষ্কৃত চৈতন্য বটিকা, প্রসিদ্ধ সঙ্গত [অস্পষ্ট] দ্রব্য সমূহের দ্বারা প্রস্তুত। ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরের উপরে [অস্পষ্ট] শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, গর্ভবতী সকলেই নিরাপদে ব্যবহার স্বীকৃত পারে।

নোয়াখালীর ভূতপূর্ব্ব সিভিল ম্যাডিকেল্ অফিসার (বড় ডাক্তার) শ্রীযুক্ত জি, জি, সরকার মহাশয়ের ইংরেজী প্রশংসা পত্রের বঙ্গানুবাদ—

নোয়াখালীর ঔষধ বিক্রেতা হালদার এণ্ড্ কোম্পানী, তাহাদের আবিষ্কৃত চৈতন্য বটিকা কতকটি আমাকে দিয়াছিলেন।

১ম ভাগ কার্ত্তিক–অগ্রহায়ণ

সংকলন

ভারত-সুহৃদ

১ম ভাগ ১ম সংখ্যা. আষাঢ় ১৩০৯

সূচনা, হিন্দু ও মুসলমান, নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত : ইচ্ছা ও শক্তি, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী : মরক্কোর মুসলমান, সুরমা [উপন্যাস], দেবকুমার রায় চৌধুরী :

মানসী।*

মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে, মানব-চরিত্রে প্রেমকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে হয়। প্রেমেই জগতের সৃষ্টি, প্রেমেই জগতের স্থিতি এবং পূর্ণতাই প্রেমের চরমলক্ষ্য। এই পূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, প্রেমের স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ায় বসিয়াই বিশ্বসংসারের আদর্শ মহাত্মাগণ মানব জীবনের সাফল্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। প্রেমকে ছাড়িয়া দিলে এ নিখিল সংসারের এত অভিনবত্ব, এত অক্ষুণ্নশান্তি এক নিমিষেই বিলুপ্ত হইয়া যায় ; এ সৃষ্টি তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে এবং এ ব্রহ্মাণ্ড তাহা হইলে অবিলম্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। ভগবান প্রেমময়, সুতরাং প্রেমই জগতের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধসূত্র।

আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের পরিচালক, কবিবর রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমের কবি। তিনি প্রেমকে নির্ম্মল করিয়া এ সংসারের সর্ব্বভূতে ব্যপ্ত করিয়া দিবার জন্য মধুর বীণাঝঙ্কারে যে রাগিণী তুলিয়াছেন তাহা আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে পশিয়াছে। কিন্তু এখনও আমরা কবির অসাধারণ কবিত্ব সব সময়ে, একান্তচিত্তে অনুভব করিতে পারি না। কারণ আমরা বড়ই চঞ্চল প্রকৃতি; গভীর ভাবগুলির সহিত সমানভাবে পরিচিত হইতে হইলে আপনার প্রকৃতিকে সংযত করিয়া আনা দরকার, ... চাঞ্চল্য যেখানে গভীরতা সেখানে আসিতে পারে না। গভীর বিষয়গুলি বুঝিতে হইলে চিন্তা করিবার শক্তি থাকা চাই। কিন্তু হায় ! সে সাধনা আমাদের কোথায় ! আমরা নিতান্তই বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের অগাধ কাব্যসমুদ্রের অসংখ্য রত্নগুলির মধ্যে আমরা "মানসী"কে কিছুক্ষণের জন্য ডুব দিয়া ঘনিষ্টভাবে দেখিবার চেষ্টা করিব। দীর্ঘভাবে ইহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার ক্ষমতা বা সাহস আমাদের নাই। সংক্ষেপতঃ ইহার সম্বন্ধে দুই চারিটি বক্তব্য আমরা এই প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াই নিরস্ত হইব।

'মানসী" অনন্তবাহিনী প্রেমনির্ঝরিণীর এক খানি সুন্দর চিত্র। ইহার অঙ্কন-চাতুর্য্য যেমন স্বাভাবিক তেমনি অপূর্ব্ব। সকল স্থান সমান সুন্দর করিয়া, এত নৈপুণ্যের সহিত কবি এই প্রেমচিত্র খানি আঁকিয়াছেন যে, ইহার কোন স্থানে অকারণ তুলিকার অসদ্ব্যবহার করা হয় নাই। সংযতভাবে, অন্তরের নিভৃততম কন্দরে প্রবেশ করিয়া কবি ইহার উপর রং ফলাইয়া দিয়াছেন ; কাজেই ইহার সহিত কোন স্থানেই আমাদের সম্পূর্ণ অন্তঃকরণ অকপটে সায় দিতে অরাজী হইবে না। কবি পুস্তকের প্রারম্ভেই "উপহার" নামক কবিতায় আভাসে, এ পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রেমনির্ঝরিণীর চরম লক্ষ্য সেই মানসী-প্রতিমাখানি যে কত উচ্চ, তাহা আমরা এই দুইটী লাইন হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিব :---

* কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ১ টাকা মাত্র। কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

"এ চিরজীবনে তাই আর কিছু কাজ নাই
বচি' শুধু অসীমের সীমা
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।"

প্রথমতঃ এই মহান আদর্শকে আমাদের মলিনতাপূর্ণ, জীর্ণ প্রাণ সর্বতোভাবে অনুভব না করিতেও পারে কিন্তু একটু বিজনে বসিয়া, বিভ্রান্ত চিত্তকে ক্ষণেকের জন্যও পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমরা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব, এ কলুষিত অন্তরেও হীনপ্রভ হইয়া আমাদের মানসী-প্রতিমা—এই "আমিত্ব"-বিরাজ করিতেছেন, তাহারি চরণপ্রান্তে আসিয়া এই প্রেমতটিনী শীর্ণ দেহে, অতি নিঃশব্দে লুকাইয়া যাইতেছে।

আলোচনার পূর্বে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার মনে হইতেছে। রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে একটু "তলাইবার" অভ্যাস থাকা আবশ্যক। তাহার বাহির কুয়াসাচ্ছন্ন হইলেও ভিতরে তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল স্বর্ণ-কিরণে দশদিক উদ্ভাসিত হইয়া আছে। যিনি এই কুয়াসাখানি ভেদ করিয়া সেই পুণ্যকিরণ একবারও দেখিয়াছেন তিনি জানেন, কাররবে কত জিনিষ। কিন্তু যিনি এই আচ্ছাদন খানি দেখিয়াই বিরক্ত হইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছেন, তিনি কোন মতেই ইহাকে বুঝিতে পারিবেন না; তাহার একান্তই দূরদৃষ্ট বলিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব কবিগণ তাহাদের কাব্যে আচ্ছাদনের কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন না— রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই "আব্রু" ভাবটুকুর সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাণের গোপনতম কথাগুলি নগ্নভাবে, সর্বজন সমক্ষে না আনিয়া কবি সেগুলিকে কিঞ্চিৎ ঢাকিয়া আনিয়াছেন। ইহাতে যেন কাব্যসৌন্দর্য্য আরও অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

কবিবর "মানসী"তে প্রেমের অতি নিখুঁৎ চিত্র আঁকিয়াছেন। সাধারণতঃ "মানসী"কে প্রেমকাব্য বলিলে কোনই দোষ হইবে না—কারণ প্রেম কি, তাহাই বুঝাইবার জন্য কবির এ কাব্য প্রণয়ন। কবি বলিয়াছেন প্রকৃত প্রেম অতি গোপনে, প্রিয়জনের শুভকামনা করিয়া বাঁচিয়া থাকে। তাহাতে আকাঙ্ক্ষা নাই, বেদনা নাই, ব্যাকুলতা নাই। যে প্রেম প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করে, তাহাই যথার্থ প্রেম। দূরে দূরে থাকিয়া ভালবাসা, প্রেমের ইহাই প্রথমাবস্থা প্রাণের বিজনতম প্রদেশে যে প্রেমকে লুকাইয়া রাখিলে প্রাণ ক্রমে আরো প্রেমপূর্ণ হইয়া উঠে তাহাই প্রকৃত প্রেম।

কবি বলিয়াছেন,—

"যত গোপনে ভালবাসি পরাণ ভরি'
পরাণ ভরে ওঠে শোভাতে
যেমন কালমেঘে অরুণ আলো লেগে
মাধুরী ওঠে জেগে প্রভাতে।"

কি মধুর বর্ণনা! দুর্লোকার এতখানি ভাব ঢাকিয়া রাখিবার ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বঙ্গ সাহিত্যে অতি অল্প কবিরই দেখিয়াছি। কবি এই ভাবটি আর একটি কবিতায় পুনশ্চ ব্যক্ত করিতেছেন

"লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত
আঁধার হৃদয় তলে মাণিকের মত জ্বলে

আলোকে দেখায় কালো কলঙ্কের মত।"

বাস্তবিকই গুপ্তপ্রেমে যে আনন্দ, যে তৃপ্তি, ব্যক্তপ্রেমে তাহা নাই। আমি আমার সুখ দুঃখে সম্পদে বিপদে, লাভক্ষতিতে আমার যেমন বন্ধু অপরে ঠিক তেমনটি হইতে পারিবে না। অন্যে যতই কেননা আমাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসুক, আমার যতখানি আবশ্যক, ওজন করিয়া ঠিক ততখানি সহানুভূতি যে আমাকে দিতে পারেনা। এবং সহানুভূতিব আশায় সব প্রকাশ করিয়া ফেলিযা শেষে নিরাশ হইলে প্রাণ নিশ্চয়ই দমিযা যায়। প্রকৃত প্রেম এইসকল কারণেই আত্মপরিচয় দিতে চায়না, সে ভালোবাসে গোপনে থাকিয়া। সে আপন মনে, থাকিয়া থাকিয়া, দীঘশ্বাসে গগণ আন্দোলিত করিতে করিতে বলেনা :-

"আপন প্রাণের গোপন বাসনা
টুটিয়া দেখাতে চাহি রে-
হৃদয়-বেদনা হৃদয়েই থাকে
ভাষা থেকে যায় বাহিরে !

যাহার বাসনা থাকে সে-ই প্রকাশ করিতে চায় আর যাহার প্রাণ বাসনাহীন বেদনাবিরহিত সে অযথা আত্মসম্মান নষ্ট করিয়া প্রিয়জনকে আত্মপরিচয় দিতে উৎকণ্ঠিত হয় না। আপনাতে আপনি তৃপ্ত থাকাই প্রকৃত প্রেমের স্বাভাবিক রীতি। যে প্রেমে বাসনা নাই তাহাই প্রেম। তাহাতে শুদ্ধতাব আনন্দ, দানেব নেশা, ঐকান্তিকতার তৃপ্তি মানবহৃদয়কে মাতাইয়া তুলে। তাহাতে যাতনা নাই, ভাবনা নাই,—পূবেবই বলিয়াছি তাহা আপনাতে আপনি তৃপ্ত থাকে। রূপ দেখিয়া যে প্রেম আত্মবিস্মৃত হয় তাহা ক্ষণবিধ্বংশী ; কিন্তু প্রকৃত বিশুদ্ধ প্রেম শরীর ছাড়াইয়া একেবারে আত্মার সহিতই সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লয়। সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়, বাসনাগত জীব যাতনার হাত হইতে কোনরূপেই নিষ্কৃতি পায়না। কিন্তু এ প্রেমে বাসনা নাই -ইহা নিঃস্বার্থ। 'মানসী'তে কবি বারবার করিয়া ভোগাভিলাষী. সভ্যতাভিমানী স্বার্থান্ধ আধুনিক নব্য সংপ্রদায়কে এই কথাটিই বুঝাইতে প্রয়াস পাইযাছেন। "বিচ্ছেদের শান্তি" নামক কবিতার একস্থলে তিনি বলিয়াছেন :—

*　　*　　*　　*

"সেই ভাল তবে তুমি যাও
যে প্রেমেতে এতভয়　　এত দুঃখ লেগে রয়
সে বন্ধন তুমি ছিঁড়ে দাও।
আমি রহি একধারে　　তুমি যাও পরপারে
মাঝখানে বহুক বিস্মৃতি
একেবারে ভুলে যেয়ো,　　শতগুণে ভাল সেও
ভাল নয় প্রেমের বিকৃতি।"

প্রিয়জনের মঙ্গলের জন্য কবির কি চমৎকার আত্মবলিদান ! পাছে প্রেমের বিকৃতি ঘটে, পাছে প্রেমের সহিত কামনাকে জড়িত করিয়া ফেলা হয়, সেই ভয়ে প্রেমাস্পদকে কবি 'বিস্মৃতি' নদীর পরপারে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন। কেননা—

"এত কি বুঝাতে হয়　　প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়া সোহাগ করা শুধু অপমান?

কবি ক্ষণিক আত্মসুখের জন্য প্রেমকে খাট করিয়া দেখিতে পারিতেছেন না। প্রেম তাঁহারই প্রাণনাথ দেবাদিদেবের শ্রীচরণচ্যুত, অম্লানসুন্দর, পবিত্রবাসপূর্ণ, নির্ম্মাল্য ফুল,—

তিনি সব সহিতে পারেন কিন্তু এমন প্রেমের অনাদর কি তাঁহার প্রাণে সহ্য হয়? তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—হে প্রিয়বন্ধু,

"আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না ত' অপমান
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে
তোমারো চেয়ে সে যে মহীয়ান।

কবিবর এই প্রেম লাভ করিয়াছেন ; তাই কাব্যের এক স্থলে কবি আনন্দ বিগলিত অন্তরে নিজেই বলিতেছেন—

"শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি তাই নিয়ে থাকি নিতি
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুঃখের।"

কবি বুঝিয়াছেন—এই স্বর্গীয়, নিষ্কাম প্রেম লাভ হইলে প্রাণ সুখদুঃখকে অতি সহজে তুচ্ছজ্ঞান করে ; সুখদুঃখ তখন ছায়ালোকের মত আত্মার উপর দিয়া ভাসিয়া যায়। সত্যই প্রাণ সে প্রেমে একবার অভিসিক্ত হইলে আর সংসারের কোন বাধা, কোন নৈরাশ্য, কোন দুর্ব্বিপাকেই সে ক্লিষ্ট হয় না ; সে তখন অজর অমর হইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে, অতি সহজে জীবনের সকল কর্ত্তব্যগুলি সুসম্পন্ন করিয়া লয়। প্রকৃত প্রেম বড় মধুর অথচ তাহা বড় গভীর। তাহাতে আবেগ থাকিলেও উদ্বেলতা নাই ; তাহাতে আত্মবিসর্জ্জন আছে কিন্তু তাহাতে প্রতিদানাকাঙ্ক্ষা আদৌ নাই। মনুষ্য জীবনে যত দুঃখ সবই অভাবের দরুণ ;—কিন্তু বাসনা বিহীন প্রেমে কোন অভাবই নাই, সে প্রেম কোন শৃঙ্খলেই আবদ্ধ নহে, সংসারে তাহার অব্যাহতগতি রহিয়াছে, সে কাহাকেও ডরাইয়া চলে না।

"মানসী"তেও কবি এই কথা বলিয়াছেন। তিনি প্রেমকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই—বিস্তারই প্রেমের প্রকৃতিগত স্বভাব বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। "সংশয়ের আবেগ" নামক কবিতায় কবি প্রিয়জনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

"তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।
দূরে যাবে ভয় লাজ, সাধিব আপন কাজ
শতগুণ বলে,
বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম
দিব তা' সকলে।"

যে প্রেম ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাব ধারণ করে তাহা প্রেম নহে,—তাহা প্রেমের একটা বিকৃত অবস্থা মাত্র। কবি সে প্রেমকে, সে বন্ধনরজ্জুকে সুকঠিন আঘাতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন ; তিনি প্রেমকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ জ্ঞান করিয়াছেন এবং প্রেমময়ে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া, এই প্রেমকে রক্ষাকবচের ন্যায় বক্ষে ধারণ করিয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে বলিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া একান্তই আবশ্যই হইয়া পড়িয়াছে : সাধারণতঃ আমরা প্রেমকে এতই মোহের ভিতরে মিশাইয়া ফেলি যে, আমাদের প্রেম কুসুমমালিকা হইয়াও পরিশেষে আমাদের দুচ্ছেদ্য

বন্ধননিগড় হইয়া দাঁড়ায়। প্রেমে যে হৃদয়ের বল দ্বিগুণিত হইয়া উঠে, আমরা হতভাগা, তাহা বুঝিতে পারি না—বুঝিতে তেমন চেষ্টাও করি না! অশেষ ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রপীড়নে বিধ্বস্ত আমরা, প্রেমে আর মোহে কত ব্যবধান, তাহা দেখিয়াও অন্যমনা হইয়া থাকি। প্রেমে যে কর্ম্মের শক্তি, দানের শক্তি, চিন্তার কতদূর বাড়ায় তাহা আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষগণের চরিত্রালোচনা দ্বারা আমার উপলব্ধিগম্য করিতে পারিব ; কিন্তু পাশ্চাত্য অঞ্জনচক্ষু হইতে সম্পূর্ণ বিধৌত না করিলে আমাদের এ উন্নতির পন্থা নাই,—আমি ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করি।

কবি তাঁহার কাব্যে এই প্রেম আর মোহের ব্যবধানটাকে অতি সুস্পষ্টরূপেই দেখাইয়াছেন। যে প্রেম সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে শরীরজ মোহে পরিণত হয়, কবি তাহার প্রতি অতি তীব্র কটাক্ষ ক্ষেপন করিয়াছেন। তিনি দেখাইতেছেন—প্রেম বাহিরের জিনিষ নহে, তাহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মজগতের জিনিষ। প্রেম বলিবার নহে, তাহা একান্তরূপে অনুভবনীয়। তাহা বিশ্বসংসারের জড়চৈতন্য একাকার করিয়া দিতে নিয়তই ব্যাকুল, তথাপি তাহা জড় ও চৈতন্যের কোনই সংশ্রব রাখে না। যাহাকে ভালবাসা যায় (প্রকৃতপক্ষে যাহাকে "হৃদয়ের ধন" বলিয়া মানি) তাহাকে বুকে টানিয়া লইলে দেখিতে পাই, যেন শরীরটা একটা মস্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। যেন তখন দেহের অন্তরাল ভেদ করিয়া অপ্রতিহত ভাবে আত্মায় আত্মায় অবাধে গতায়াত করিবার জন্য প্রাণটা "হুহু" করিতে থাকে, যেন তখন ইচ্ছা করে মরিয়া যাই—মরিয়া গেলে বোধ হয় এক সঙ্গে সম্মিলিত হইতে পাবিব।

শরীরজ মোহে তৃপ্ত হইতে গিয়া কবি কি সুন্দর এই ব্যাকুলতাটি ব্যক্ত করিয়াছেন দেখুন—

"নাই, নাই! কিছু নাই! শুধু অন্বেষণ!
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছানিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে!
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?"

—না সত্যসত্যই হৃদয়ের ধনকে আমরা দেহে ধরিতে পারি না। তাহাব জন্য আরও অধিকতর ঘনিষ্ঠতার আবশ্যক করে। প্রেমের সহিত শরীরের কোন সম্পর্কই থাকে না ; কাজেই প্রেমের মধ্যে রূপলালসা, ভোগলিপ্সা প্রভৃতি মিশিলে সে প্রেমে আমরা আর তৃপ্তি পাই না—তাহাতে অতৃপ্তি, অশান্তি, স্থৈর্য্য ক্রমেই বাড়ে মাত্র ; এবং সে প্রেম অতি সত্বরই মিলাইয়া যায়। এই স্থানে বৈদেশিক কবি Wordsworth রচিত "Laodamia" নামক কবিতাটি মনে পড়িল ;— সেই চারি ছত্র।

Forth sprang the impassioned queen her lord to clasp!
Again that consummation she essayed ;
But unsubstantial form eludes her grasp
As often as that eager grasp was made."

কবি তাঁহার অন্যান্য পুস্তকে বাঁশীর ডাকেই উতলা হইয়াছিলেন "মানসী"তে তিনি "কুহুধ্বনি" শুনিয়া

"অতীতের দুঃখ সুখ   দূরবাসী প্রিয়-মুখ
শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান
ওই কুহুমন্ত্র বলে   জাগিতেছে দলে দলে
লভিতেছে নূতন পরাণ"—

বলিয়া উঠিয়াছেন। এই "কুহু" ডাক কবি যেন অবিরাম শুনিতেছেন। কবিতার এক স্থলে আছে—

"এই কাণ্ড এত গোল   বিচিত্র এ কলরোল
সংসারের আবর্ত্ত বিভ্রমে
তবু সেই চিরকাল   অরণ্যের অন্তরাল
কুহুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে।"

বাহিরে উদ্দাম কলকোলাহল কিন্তু ভিতরে আর কিছুই নাই—সেখানে স্থিরস্নিগ্ধ প্রেম তরুচ্ছায়াতলে কবি বসিয়া আছেন আর বৃক্ষশাখে, পত্রান্তরাল হইতে, অতি মধুর স্বরে, তাঁহারি মানসী-প্রতিমা তাঁহাকে ধ্যাননিমগ্ন করিয়া দিতেছেন। মরি কি শোভন অঙ্কন মাধুরী ! এই কুহুরব শুনিয়াই কবি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, প্রেম স্বর্গীয়—ইহা নিষ্কলঙ্ক।

*   *   *

কবি পরোপকারার্থে, নিষ্কামভাবে সকলকে ভালবাসিতে বলিয়াছেন কিন্তু মানুষের চরণে প্রেমাঞ্জলি দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি মানুষকে ভালবাসিয়াছেন পরোক্ষভাবে, কর্ত্তব্যের হিসাবে মাত্র। পরিপূর্ণ প্রাণ নিয়া যাঁহাকে কবি ভালবাসিয়াছেন তিনি কে, শুনুন,—

"আমি মনে করি যাই দূরে
তুমি বিশ্ব রয়েছ জুড়ে
যতদূর যাই ততই তোমার
কাছাকাছি ফিরি ঘুরে।

চোখে চোখে থেকে নহ কাছে তবু
দূরেতে থেকেও দূর নহ কভু,
সৃষ্টি ব্যাপিয়া, রয়েছ তবুও
আপন অন্তঃপুরে।"

এ সংসারের সর্ব্বভূতে আপনার প্রেমকে বিস্তৃত কবিয়া দিয়া কবিবর এ সংসার ছানিয়া একটি পরশ মাণিক বাহির করিয়াছেন। সেই পরশ মাণিকের নিমিত্তই তাঁহার সমুদায় প্রেমার্ঘ্য অতি নিভৃতে, গোপনে সজ্জিত রহিয়াছে। সবাইকে ভালবাসিয়াও তাঁহার প্রেম হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই বরং পরিমিত শারীরিক পরিশ্রম করিয়া স্বচ্ছন্দ পরিমাণে আহার করিলে যেমন শরীর সুস্থসবল থাকে তাঁহার প্রেমও তদ্রূপ আরও সুন্দরতর, মধুরতর, গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সর্ব্বসাধারণকে ভালবাসিয়াও বলিতেছেন—

"দেবতার তরে থাক পুষ্প অর্ঘ্য ভার।"

কি মহান্ আদর্শ ! যিনি এই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া আপন চরিত্র গঠন করিবেন, তিনি যে এ পাপদুষ্ট সংসারে থাকিয়াও দেবত্ব লাভ করিবেন, একথা বলাই বাহুল্য।

কবির কর্ত্তব্য সমাজ গঠন করা। যাহাতে জাতীয় উন্নতি হয়, যাহাতে সাধারণে জীবনের গুরু কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজীবতা লাভ করিতে পারে, যাহাতে লোকে আত্মচিন্তা করিয়া আত্মোন্নতি করিতে অভিলাষী হয়,—কবির কর্ত্তব্য, সেই আদর্শই সমাজের সম্মুখে প্রকাশিত করা।

"মানসী"র কবি এই কাব্য প্রণয়ন করিয়া যে মহদুপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য চিরকাল, কেবল বঙ্গসাহিত্য নহে, সমগ্র বঙ্গদেশে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। কবির অসাধারণ রচনা-কৌশলে, "মানসী" কাব্যের প্রেম-কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে কোহিনুর দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

আর কত দেখাইব? সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় যাহা আলোচনা হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক কিছু বলা যায় না।—সূক্ষ্মদর্শী পাঠক "মানসী" পড়িয়া দেখুন—বুঝিবেন, কি অমৃতরাশি "মানসী" কাব্যে নিহিত রহিয়াছে।

কবি প্রেম সম্বন্ধে এই পুস্তকাখানিতে যেখানেই হাত দিয়াছেন সেই স্থানটীই সোণা হইয়া গিয়াছে কিন্তু এ কাব্যখানিতে আপত্তিজনক অনেক ত্রুটি আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে। আলোচনা শেষে, কর্ত্তব্যের হিসাবে, সেগুলিও একটু না দেখাইলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আমরা তাই অপ্রীতিকর দুয়েকটি কথাও বলিতে বাধ্য হইতেছি। ভরসা করি, কবিবর নিজগুণে এজন্য আমাদিগেকে মার্জ্জনা করিবেন। "মানসী"তে প্রেমের একখানি অতি অপূর্ব্বআদর্শ আমাদের সম্মুখে খাড়া করান হইয়াছে। প্রধানতঃ এ কাব্য খানিতে প্রেম যে কি পদার্থ, তাহাই বুঝান কবিব উদ্দেশ্য; সুতরাং কবির আলোচ্য বিষয় অতি গুরুতর সন্দেহ নাই। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, এমন গভীর বিষয় আলোচনা করিতে করিতে কবি কাব্যখানির স্থানে স্থানে হাস্য রসের অবতারণা করিতে গিয়াছেন। এই চেষ্টা নিতান্তই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে এবং "মানসী" খানা স্থানে স্থানে এই জন্য বড়ই বেসুরা, বেতালা হইয়া পড়িয়াছে। কবি তাঁহার এমন দুধের বাটিতে এমন অম্লরস ঢালিয়া কেন সর্ব্বনাশ কবিতে বসিয়াছেন, ভগবান জানেন। ইহাতে কাব্যগত সৌন্দর্য্যের হানি ত হয়ই, তা'ছাড়া ইহাতে অনেক লোকে মনে করে,—কাব্যটা বুঝি এই ধরণেরই!—উপরি উপরি দুই চারি লাইন পড়িয়াই তাহারা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করিতে বসিয়া যায়।

কবির লেখা পড়িতে পড়িতে, অনেক সময়ে আমাদের মনে হইয়াছে, কবি যেন দায়ে পড়িয়া কবিতা লিখিতেছেন; তাহাতে ভাব নাই, সৌন্দর্য্য নাই, কেবল বাক্য সমষ্টি মাত্র! স্বীকার করি, সাহিত্যক্ষেত্র সজীব রাখিবার জন্য কবিবরকে একেলা খাটিতে হইতেছে কিন্তু গা' বলিয়া তিনি যাহা লিখিবেন, সকলগুলিই তাঁহার কাব্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে-এ অতি ভয়ানক কথা!

'মানসী"তে প্রেমের বিশুদ্ধ আদর্শখানি যদি খাঁটি রাখিয়া দিতেন তবে বাহিরের লোকে তাঁহার "মানসী" রচনার উদ্দেশ্য বেশ বুঝিতে পারিত এবং তদ্দারা কবির শ্রমও সার্থকতা লাভ করিতে পারিত; তা' না করিয়া কবি ইহাতে এই রকম ভেজাল মিশাইয়া এ কাব্য খানিকে বড়ই উপেক্ষিত করিয়াছেন।

"দেশের উন্নতি" "বঙ্গবীর" "নবদম্পতির প্রেমালাপ" "ধর্ম্ম প্রচার" প্রভৃতি কবিতা, ও কবি লিখিত পত্রাবলী, এ পুস্তকে স্থান পাইবার উপযুক্ত নয়। হাস্যরসাত্মক কবিতাগুলি ও

অন্যান্য দুয়েকটি কবিতা বেশ সুলিখিত হইলেও তাহা এ কাব্যখানির যোগ্য নহে। আমাদের সানুনয় নিবেদন, কবি যেন এ সকল কবিতা এ কাব্য হইতে সরাইয়া অন্ততঃ তাঁহার "সোণার তরীতে" সন্নিবিষ্ট করিয়া দেন। এমন সুললিত, সুমধুর রচনাপ্রবাহের গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট হইলে আমরা বড়ই ক্ষুব্ধ হইব।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার ন্যায় সংস্কৃত, প্রাঞ্জল বাঙ্গলা, অন্য কোন কবির দেখি নাই। রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়িবার পূর্ব্বে ভাবিতাম, ভাষায় বুঝি ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ হইয়া কোন কবিই দাঁড়াইতে পারেন নাই ; কিন্তু আমাদের সে ধারণা এখন আর নাই।

এখন আমরা রবীন্দ্রনাথের ত্রিতন্ত্রী-ঝঙ্কারে একান্তই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। চন্দ্রেও কলঙ্ক থাকে, রবির কিরণও সময় বিশেষে, স্থানবিশেষে অসহনীয় বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষার ত এত প্রশংসাবাদ করিলাম তথাপি সত্যের অনুরোধে বলি, বাঙ্গলা-ভাষায় যথেচ্ছাচারের প্রবর্ত্তন কবিবরই করিয়াছেন। যে সকল ব্যাকরণ-দুষ্ট, গ্রাম্য কথা বাঙ্গলা-ভাষায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, কিম্বা যে সকল কথা ভাবপ্রকাশের জন্য একান্তই ব্যবহার করিতে হইবে, সে সকল কথা ভাষায় ব্যবহৃত হোক তাহাতে দোষ নাই কিন্তু তদ্ব্যতীত "বাংলা" (!) ভাষায় অপ্রচলিত কথিত ভাষার প্রচলন করিতে যাওয়া প্রাজ্ঞজনোচিত মনে করিনা।

এ সম্বন্ধে সোজাসুজি বাঙ্‌লায় আমরা একটা দৃষ্টান্ত দেখিলে বুঝিতে পারিব।

যথা—নির্ম্মলাকাশে প্যাঁজা তুলার মত মেঘ গুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

এ স্থলে "প্যাঁজা" কথাটি দিয়া যে ভাব প্রকাশ করা গেল, অন্য কোন বিশুদ্ধ কথার ব্যবহারে ঠিক্ সে ভাব প্রকাশিত হইবে না।

কিন্তু

"বালকটি ড্যাবা ড্যাবা চোখে চাহিতেছিল" এস্থলে 'ড্যাবা ড্যাবা" কথার ব্যবহার সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। "বিস্ফারিত নেত্রে" কথাটি "ড্যাবা ড্যাবা চোখের" স্পষ্ট একভাবব্যঞ্জক। কবির লেখায় আগাগোড়া এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাকরণ দ্রোহিতার একটা দৃষ্টান্তও আমরা এ স্থলে দেখাইতেছি।

যথা—"মানসী"তে "বিচ্ছেদ" নামক কবিতার প্রথম লাইনে আছে—

"ব্যাকুল নয়ন মোর অস্তমান রবি।"

জিজ্ঞাসা করি, এখানে "অস্তমান" কথাটা কি হেতু ব্যবহৃত হইয়াছে? "অস্ত যাইতেছে এমন রবি" যদি কবির বক্তব্য হয় তবে "অস্তগামী" না লিখিয়া তিনি "অস্তমান" কেন লিখিলেন? এরূপ স্বেচ্ছাকৃত জবরদস্তি কবির আরো অনেক আছে—আমরা নানা কারণে সে সকলের উল্লেখ করিলাম না।

ত্রুটি এক আধটা থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে অবতাররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহার অনন্য সাধারণ প্রতিভা প্রভাবে, বঙ্গদেশে এক অভিনব অভূতপূর্ব্ব, অচিন্ত্যপূর্ব্ব নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে তিনি ইচ্ছা করিয়াও যদি দুয়েকটা ভ্রমাত্মক কথা লেখেন ত' তাহা সর্ব্বথা অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের রচনা-প্রবাহে যে যে তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে রবির প্রকৃত রশ্মি প্রতিফলিত হইয়াছে, আমাদের কর্ত্তব্য, সেগুলির প্রতি অতি সতর্কদৃষ্টি রাখা। কবির কাব্যগুলির "সিলেক্সান"

ব্যতীত তাঁহার রচনার মর্য্যাদা রক্ষা করা, ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। এই সিলেক্সান করা যে সে লোকের কার্য্য নহে, কারণ, এ ব্যাপার অতি গুরুতর। এ কার্য্যের জন্য কোন একজন শিক্ষিত, সমাহিত, সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের প্রয়োজন। আমরা ভরসা করি, কলিকাতার "সাহিত্য পরিষৎ" প্রভৃতি সাহিত্যানুরাগী, বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী এ বিষয়ে মনোযোগ করিবেন। অনাবশ্যক আবর্জ্জনারাশির মধ্যে কবি বরের রত্নরাজি বিলুপ্ত হইয়া গেলে আমাদের নবযৌবনা বঙ্গভাষার নিতান্তই দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে।[১০২]

১ম ভাগ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩০৯

মহানদীর প্রতি।*

আবার তোমারি কূলে এসেছি ফিরিয়া ;
দু'দিন ছিলাম শুধু তোমারে ছাড়িয়া,
প্রসন্নসলিলা ! সেই ক্ষণিক বিরহে
আজি মোর প্রেমস্রোত অন্য খাতে বহে ;
—গিয়াছিনু সিন্ধু দরশনে সেই হ'তে
হিয়া ধায় ভীষণের অভিসার পথে !
ভীমকান্ত রূপ যাহা দেখিনু নয়নে,
হুহুঙ্কার-বাণী যাহা শুনিনু শ্রবণে,
জেগে আছে প্রাণে, আজো লেগে আছে কোণে !
তবু যেন মনে হয়, তোমারি ওখানে
হিয়া মোর বাঁধা আছে দুর্ভেদ্য কুহকে ;
এ বিপ্লবে তাই মোর নিদ্রা নাই চোকে।
প্রথম তোমারে হেরি যে শান্তি সুধায়
ভেসেছিনু,—সে আনন্দে মজা।ও আমায় !

শ্রী প্রমথনাথ রায় চৌধুরী[১০২ক]

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী : নবাব সার সর্দ্দার হেয়াৎ খাঁ বাহাদুর, কে. সি এস আই, অপত্যস্নেহ, দেবকুমার রায় চৌধুরী : সহজ মিমাংসা, সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র : ধর্ম্মের পটভূমিতে হিন্দু ও মুসলমানের একত্ব, রসরঞ্জন সেন : জাতীয় জীবনে বীর্য্যের প্রতীক, সুরমা, খোন্দকার মইনউদ্দীন আহমদ : প্রকৃতি-চর্চ্চা ও সৌন্দর্য্যচর্চ্চা।

ধর্ম্মের উচ্চভূমিতে হিন্দু ও মুসলমানের একত্ব

দর্শনশাস্ত্র বলিতেছেন যে এক ধর্ম্মাবলম্বী পদার্থগুলি এক। দুইটীপদার্থের মৌলিক প্রকৃতি এক হইলে তাঁহারা একই পদার্থ এবং তাহাদের ভিতর যে ভেদ দৃষ্টহয় তাহা কেবল অবস্থাগত। একই আকার প্রকারের দুই খানি কাষ্ঠাসন যদি একই ঘরের দুই স্থানে রাখা যায়

---

* কটকের মহানদী দেখিয়া লিখিত।
"ভারত-সুহৃদ" সম্পাদক

অথবা এক স্থানেই একের পার্শ্বে অপরকে সন্নিবেশিত করা যায় তাহা হইলে দর্শন বলিবে যে উহার একই বস্তু অথবা একই ভাবের (idea) প্রকাশ, তবে যে উহাদিগকে দুইটী পদার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে তাহা কেবল অবস্থাগত পার্থক্যজনিত। উহার একখানা যে স্থানে সেই ভাবে আছে, অপর খানাকেও যদি ঠিক সেই স্থানে সেই ভাবে রাখা যাইত তবে উহারা একই জিনিস হইয়া যাইত। বাহ্য জগতে প্রকাশিত পদার্থ মাত্রই মননোৎপল ও মনোগত ভাবের প্রকাশ এবং যে সকল পদার্থের মূলে এক ভাব তাহারা বিভিন্ন অবস্থাপন্ন হইলেও একই পদার্থ। দার্শনিক পদ্ধতি অবলম্বনে এবং উপরোক্ত রূপ দৃষ্টান্ত আদির দ্বারা এই মৌলিক মতটী সপ্রমাণ করা দুর্ঘট নহে।**

জাগতিক পদার্থনিচয় যদি মননোৎপন্ন ও মনোগত ভাবের প্রকাশ হয় তবে ইহাদিগের নির্ম্মাতাকে জানিবার পক্ষে ইহাদিগের তত্ত্বালোচনা যে বিশেষ উপযোগী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; কারণ কৃত কার্য্যের উপরে কর্ত্তার প্রকৃতির যে ছাপ পড়ে তাহা ঐ প্রকৃতি বোধের এক বিশেষ সহায়। সুকৌশল সম্পন্ন কারুকার্য্য দেখিয়া শিল্পির নিপুণতা, কৌশল, উপযোগিতা বোধ প্রভৃতি গুণের পরিমাপ বিশেষ দুঃসাধ্য নহে। কিন্তু এখানে দেখিলাম যে কর্ত্তা (শিল্পী) নির্ম্মিত পদার্থের (কারুকার্য্যের) যে সকল অঙ্গ নিজের জ্ঞান হইতে দিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার শক্তি ও কৌশল প্রকাশ করিতেছে। ব্যবহৃত অস্ত্র গুলি অথবা যে সকল পদার্থের দ্বারা ঐ সকল অস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে ঐ সকল পদার্থ, বা যে কাষ্ঠের দ্বারা তিনি তাঁহার অভিলষিত পদার্থ নির্ম্মাণ করিতেছেন ঐ কাষ্ঠ তাঁহাব শক্তি বা নিপুণতাকে প্রকাশ করেনা। কাষ্ঠকে যে আকারে পরিণত করিবেন ঐ আকারই তাঁহার মননোৎপন্ন ও মনোগত ভাবেব প্রকাশ সুতরাং উহাতেই তাঁহার শক্তি ও কৌশল প্রকাশ পাইতেছে এখন যদি এমন একজন সৃষ্টিকর্ত্তা পাওয়া যায় যাঁহার মনন ও মনোগত ভাব হইতে সৃষ্ট পদার্থের অবস্থাগত আকৃতি প্রকৃতি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যদি স্রষ্টা হইতে সৃষ্ট মৌলক বস্তুত্ব এবং আকার প্রকার উভয়ই প্রাপ্তহয় তাঁহা হইলে সেই সৃষ্ট পদার্থ অবলম্বনে স্রষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় : কারণ ঐ সৃষ্ট বস্তুতে এমন কিছুই থাকেনা যাহা স্রষ্টার প্রকাশক নহে।

এই পর্য্যন্ত আমরা দুইটী দার্শনিক মূলসূত্র পাঠক বর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম-(১) সৃষ্টবস্তু মাত্রেই মননোৎপন্ন ও মনোগত ভাবের প্রকাশ এবং যে সকল বস্তু এক মনোগত ভাবের প্রকাশক তাহারা বিভিন্ন অবস্থাগত হইলেও এক, কারণ অবস্থাগত ভেদ মৌলিক পার্থক্য নহে (২) যে সৃষ্ট বস্তু সর্ব্বতো ভাবে স্রষ্টার প্রকৃতি সম্ভূত সে প্রকৃত অর্থে স্রষ্টা আত্মজ এবং স্রষ্টার প্রকৃতি বোধক। এই দুইটী অদ্বৈতবাদ বলিতেছেন মানব জাতি এক— মানবাত্মা এক। মানবে মানবে ভেদ সম্পূণ অবস্থাগত এবং এই এক মানবাত্মা সেই 'এক মেবা দ্বিতীয় ব্রহ্মের আত্মজ—সুতরাং তাঁহার মৌলিক প্রকৃতির যথার্থ প্রকাশক।

আজ আমরা পাঠক বর্গকে উপরোক্ত দার্শনিক তত্ত্বরূপ মূল ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মের উচ্চভূমিতে হিন্দু মুসলমানের একত্ব উপলব্ধি করিতে আহ্বান করিতেছি।

দর্শন বলিলেন মানবাত্মা এক এবং ইহা একমেবা দ্বিতীয়মের আত্মজ। এখন আমাদের প্রশ্ন হইতেছে ধর্ম্মের স্বরূপ কি এবং মানবাত্মার ধর্ম্মের মূল কোথায়? মানবাত্মার

ঈশ্বরাভিমুখী অবস্থার নাম ধর্ম্ম। মানুষ চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে ইহাতে অনন্ত ও সান্ত, পূর্ণ ও অপূর্ণ, ক্ষুদ্র ও মহানের অপূর্ব্ব সমাবেশ। আত্মশক্তি মানবজন্মে এক মহাসমস্যায় পড়িয়াছেন। মানবজন্ম পাইয়া ইনি দেখিলেন যে স্বরূপে অনন্ত হইয়া ও অবস্থায় ান্ত হইতে হইয়াছে—স্বরূপে পূণ হইয়াও অবস্থায় অপূর্ণ হইতে হইয়াছে—স্বরূপে অখণ্ড মহান হইয়াও অবস্থায় ক্ষুদ্র হইতে হইয়াছে: যাই এই বোধ তাই ভিতরে জ্বালা উপস্থিত! প্রশ্ন উঠিল—অনন্ত মহান পূর্ণ পুরুষের আত্মজ হইয়া কেন আমি ক্ষুদ্র থাকিব? অবস্থায় আমাকে খর্ব্ব করিতেছে, অবস্থাকে জয় করিতে হইবে—অবস্থাকে আয়ত্ত করিতে হইবে এবং অবস্থা পশ্চাতে ফেলিয়া অথচ অবস্থার ভিতর দিয়াই অনন্ত পূর্ণত্বেব দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইল এবং কার্য্যানুরূপ ফল হইতে লাগিল। কিন্তু অবস্থা যদিও জয় করিবার এবং উল্লঙ্ঘন কবিবার জিনিস তবুও তাহার প্রতি বিরাগ নাই; কারণ তাহার জন্যই পিতা পুত্র সম্বন্ধ এবং তজ্জনিত সখ ভোগাদি সম্ভব হইয়াছে। তাই মানবাত্মা অবস্থাকে বলিতেছেন তুমি অনাদিকাল আমার সঙ্গে থাক, আমি তোমাকে উল্লঙ্ঘন করি আর পিতার সহিত মিলন সুখ সম্ভোগ করি। তাঁহার সহিত মিলনই আমার জীবনের পরিণতি। বিচ্ছেদ না হইলে মিলন নিরর্থক। তোমা হইতেই বিচ্ছেদ সুতরাং মিলনের সম্ভাবনা হইয়াছে; অতএব ভূমি উল্লঙ্ঘনীয় হইলেও প্রিয়। এইরূপে অবস্থাগত পার্থক্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অনন্ত পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য মানবাত্মার যে স্বাভাবিক আকাঙ্খা তাহারই নাম ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এবং ইহাতেই ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। ইহা নিঃসন্দেহরূপে সত্য যে জাতি বণ নির্ব্বিশেষে এই প্রবৃত্তি মানবাত্মায বিরাজ করিতেছে এবং ভিন্ন২ অবস্থার ভিতর দিয়া মানবকে একই গন্তব্য পথে লইয়া যাইতেছে।

আমরা দেখিয়াছি যে মানবাত্মা যত বিভিন্ন অবস্থাতেই থাকুক না কেন ইহা এক এবং এক মেবাদ্বিতীয়মের আত্মজ। যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ইহাকে অবস্থাবলির ভিতর দিয়া ক্ষুদ্রত্ব হইতে অনন্ত পূর্ণত্বেব দিকে লইয়া যায় তাহার নাম ধার্ম্মিক প্রবৃত্তি। তাহা মানবাত্মার এক অপূর্ব্ব স্বাভাবিক অধিকার এবং মানবের মানবাত্মার মূলে প্রতিষ্ঠিত। এখন দেখিতে হইবে যে এই সকল তত্ত্ব হইতে হিন্দু ও মুসলমানের আধ্যাত্মিক একত্ব সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এবং এই উভয় জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রইবা ঐ সিদ্ধান্তের কতদূর সমর্থন করে। আত্মবস্তু একত্ব হইতে হিন্দু মুসলমানের মৌলিক একত্ব অখণ্ডনীয় রূপে প্রমাণিত হইতেছে; তাহাদের মৌলিক প্রকৃতি স্পষ্টরূপে সাক্ষ্য দিতেছে যে, তাহারা উভয়েই একমেবাদ্বিতীয়নের আত্মজ সুতরাং এক। এই মৌলিক একত্ব হইতে অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম প্রবৃত্তির একত্ব অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে। আদর্শদেব যে ভাবে ও যে উদ্দেশ্যে হিন্দুর সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন ঠিক সেই ভাবেও সেই উদ্দেশ্যেই মুসলমানের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। হিন্দু সাধক যে আশা, উদ্যম ও উৎসাহের সহিত তাঁহার দিকে ছুটিতেছেন মুসলমান সাধক ও ঠিক সেই আশা উদ্যম ও উৎসাহের সহিত তাহাকে লাভ করিবার জন্য ক্রিয়াশীল।

তাঁহারা উভয়ই সাধারণ ভাবে একই সাধন রহস্য ও তৎসম্পর্কীয় অবস্থানিচয়ের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছেন—উভয়ের ইউদ্দেশ্য ও লভনীয় এক, আশা ভরসা ও সফলতার সম্ভাবনা এক, এবং সাধারণ ভাবে অবলম্বিত উপায় ও নিয়মাদিও যে এক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য বাহ্যিক আকার প্রকার, পার্থক্য ব্যবহারিক

জীবনের বহিরাবরণ, পার্থক্য অকিঞ্চিৎকর ও অবান্তর। একত্ব মৌলিক। এখণ এই উভয়ের কাহার মূল্য অধিক তাহা অতি সহজ বোধ্য।

শাস্ত্র মনোগত ভাবের এবং মনোগত ভাব আত্মার প্রকৃতির প্রকাশক। হিন্দু এবং মুসলমানের শাস্ত্র একই আত্মবস্তুকে প্রকাশ করিতেছে বলিয়া তাহাদের এত একত্ব। তাই বেদ ও কোরাণ এক বাক্যে বলিতেছেন "সেই পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই—তিনি জীবন্ত, অটল"। উভয় শাস্ত্রই তাঁহাকে স্রষ্টা, পাতা, পরিত্রাতা, সখা ও সুহৃৎ বলিতেছেন। উভয় শাস্ত্রই বলিতেছেন তিনি সিদ্ধিদাতা ও দয়ালু, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম। "একমেবাদ্বিতীয়ম" মত্ত্ব কোরাণের প্রতি পৃষ্ঠায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে? "ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী" এই বেদবাক্য কোরাণের প্রতি পত্রে নিহিত। বেদ বলিতেছেন "ত্বমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।" কোরাণ বলিলেন "জানিও ঈশ্বর একমাত্র প্রভু, অন্য পথে যাইওনা"। ধন্য লীলাময় ভগবান্, ধন্য তাঁহার বিধান! তিনি আমাদিগের সহায় হউন, আমরা এক দেশ বাসী উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের সাধন সম্পদ ও সাধন বলের সাহায্যে বলীয়ান হইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হই, তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হউক।

শ্রী সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র।

১ম ভাগ তৃতীয় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩০৯

দেবকুমার রায় চৌধুরী : আবাহন, অম্বুজা সুন্দরী দাসগুপ্তা : মঙ্গলগীতি, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী : দেওজী শর্ম্মা,

আলিবর্দ্দীর দৈনিক জীবন

স্বনামপ্রসিদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী মহব্বত জঙ্গের নাম বঙ্গদেশে অপরিচিত নহে। ইতিহাস পাঠক তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। মুর্শিদাবাদের রাজসিংহাসনে যে সকল ভাগ্যবান পুরুষ উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নবাব আলিবর্দ্দীর ন্যায় গভীর রাজনীতিবিশারদ, সূক্ষ্মদর্শী সুচতুর ভূপতি কেহই ছিলেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক তাঁহার সমরনীতি, তাঁহার প্রজা-হিতৈষণা, তাঁহার সর্ব্বভূতে সমভাব, তাঁহার গুরুভক্তি সন্দর্শন করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে পূজনীয় দেবতা না বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন? তাঁহার মোহন চরিত্র ন্যায়পরতা, শুদ্ধাচার, ধর্ম্মানুরাগ, দয়াদাক্ষিণ্যাদি স্বর্গীয় সুকোমল সদগুণ রাশিতে বিভূষিত ছিল। এই কোমলতার মধ্যে যে কঠোরতা ছিল না, এমত নহে। মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয় যখন কোমলতা ও কঠোরতার বিমিশ্রণে সংগঠিত, তখন সেই প্রাতঃস্মরণীয় নবাব আলিবর্দ্দীর হৃদয়ে যে কোমলতার পার্শ্বে কঠোরতা বিরাজ করিত না, কে বলিতে পারে? কিন্তু তাঁহার সেই কঠোরতার বিশেষত্ব ছিল। তাহা ন্যায় ও বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া ধীরতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে প্রধাবিত হইত। তিনি সমর প্রাঙ্গনে কালান্তক যমদতের ন্যায় ভীম-বিক্রমে অরাতিদলনে স্বীয় কঠোরতা প্রদর্শন করিতেন বটে, কিন্তু তাহা ন্যায়-ব্যবহার করেন নাই। ঈদৃশ সদ্গুণরাশি, ঈদৃশ উন্নত জীবন থাকতে নবাব আলিবর্দ্দী হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রীতি, ভক্তি ও সম্মান আকর্ষণ করিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের আবাল, বৃদ্ধ, বনিতার অন্তরে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন বটে, ফলে যদি দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধি অকালে তাঁহার জীবলীলা সাঙ্গ না করিত, যদি আরও কি- দিন তিনি সুস্থ শরীরে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার অবসর পাইতেন, তাহা হইলে ভার.েব বর্ত্তমান রাজনৈতিক সুচারু–দৃশ্য আমাদের নয়ন পথে পতিত হইত কিনা, সন্দেহ।

হিজরী ১১৬৯ শালের রজব মাসের ৯ই তারিখে, বেলা অপরাহ্ন সময়ে বঙ্গের সেই দূরদর্শী পূণ্যশীল নরপতি নবাব আলিবর্দ্দী মহব্বত জঙ্গ অশীতি বৎসর অনিত্য সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অনন্ত সুখময় স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করেন। তিনি মৃত্যুকালে স্বীয় শব তাঁহার লোকান্তরিতা কবরশায়িতা পূণ্যবতী জননীর পদপ্রান্তে সমাহিত করিবার জন্য অনুমতি করিয়া যান। তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য সম্পাদিত হয়। তিনি ভাগিরথীর পশ্চিম তটে, রাজকীয় সমাধিক্ষেত্র 'খোশবাগ' নামক মনোরম উদ্যানে, জননীর পদমূলে, পার্শ্বে প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে* লইয়া পার্থিব ধন–জন–সুখ সমৃদ্ধির নশ্বরত্ব জ্ঞাপন করত: অনন্ত শয়নে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। এই আদর্শ নরপতির উন্নত জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ অবগত হইবার জন্য অনেকেরই কৌতুহল জন্মিতে পারে ; তজ্জন্য আমরা এস্থলে তাহা বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

নবাব আলিবর্দ্দী মহব্বত জঙ্গ আজন্ম বিশুদ্ধ চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি জীবনে কখন মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেন নাই। তিনি এমনি শান্তচিত্ত, সংযমী পুরুষ ছিলেন যে, যৌবন–স্বভাব–সুলভ বিলাস–ব্যসনের ভীষণ প্রলোভন তাঁহার অন্ত:করণ অধিকার করিতে কখন সমর্থ হয় নাই। তাহার অমূল্য সময় বৃথা অতিবাহিত হইত না। যখনই অবসর পাইতেন, তখনই অনন্যমনে পবিত্র "কোরাণশরিফ" পাঠে মনোনিবেশ করিতেন। প্রতিদিন নিশাবসানের দুই ঘন্টা পূর্ব্বে তাঁহার শয্যাত্যাগের অভ্যাস ছিল। সেই সময়ে তিনি স্নান করিতেন, পরে অঙ্গশুদ্ধি (অজু অর্থাৎ নামাজ করণার্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রক্ষালন) করত ধর্ম্মপ্রাণ মহর্ষীর ন্যায় নির্জ্জনে, একাগ্র চিত্তে সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের ধ্যানে নিমজ্জিত হইতেন। ক্রমে উষার উজ্জ্বল আলোকে জগতের তিমির তিরোহিত হইলে, প্রত্যুষের সুরভিত স্নিগ্ধ সমীরণ মৃদুমন্দ হিল্লোলে জীবের সজীবতা সম্পাদন করিতে বহির্গত হইলে, নবাব যথারীতি প্রাভাতিক উপাসনা সাঙ্গ করিয়া দরবারস্থ কতিপয় গণ্যমান্য লোকের সহিত আমোদ প্রমোদে "কাফি" পান করিতেন। অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দার, সভাসদমণ্ডলী, এবং অপরাপর সম্ভ্রান্তবর্গ যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। তখন অভিবাদন–প্রত্যভিবাদন প্রসঙ্গে তথায় এক অপূর্ব্ব মধুর রসের অবতারণা হইত। নবাব সকলেরই সহিত প্রসন্ন বদনে আলাপ করিতেন। পরে প্রত্যেকের অভাব অভিযোগ শ্রবণান্তর সকলকেই আপ্যায়িত করিয়া সন্তোষের সহিত বিদায় প্রদান করিতেন। এইরূপে দুই ঘন্টা কাল বহির্বাটীর কার্য্য সমাপন করিয়া কর্ম্মবীর আলিবর্দ্দী অন্দর মহলের এক নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিতেন। তথায় তাঁহার কতিপয় প্রিয়

নবাব আলিবর্দ্দীর কবরের পার্শ্বে সেরাজউদ্দৌলার সমাধি প্রদান করা হয়। আমরা "পল্লী চিত্র" নামক পৃথক প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ বিবৃত করিব, বাসনা রহিল। লেখক।

সহচর, ও আত্মীয় উপস্থিত হইতেন। তাঁহারা "গজল", কবিতা, আবৃত্তি করিতেন ; কেহবা রহস্যজনক উপন্যাসের অবতারণা করিয়া দিতেন। নবাব স্মিতবদনে তৎ সমুদয় শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতেন। এবং পুলকিত ও মুগ্ধ হইতেন।

ক্রমশ :।

শ্রীমোজাম্মেল হক্।[১০৩]

জাতীয় আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ কোন কথা বলিলেই, নব্যবঙ্গ তাহা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করে। বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগকে রবীন্দ্রনাথের যুগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেবল তাঁহার বীণার ঝঙ্কারেই যে বঙ্গ-দেশ ঝঙ্কৃত—তাহা নয়, সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সময়ে সময়ে যাহা বলিয়া থাকেন নব্যবঙ্গ তাহা উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করে। ইহার দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কতদূর প্রভাব তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। গত আষাঢ় মাসের "বঙ্গদর্শনে" রবীন্দ্রনাথের লিখিত দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধদ্বয় আলোচনা-সমিতির অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। 'ব্রাহ্মণ' ও 'চীনেম্যানের চিঠী' উভয় প্রবন্ধেরই প্রতিপাদ্য বিষয় এক। "পাশ্চাত্য সভ্যতা বস্তু প্রধান ও শক্তি প্রধান এবং প্রাচ্য সভ্যতা ধর্ম্ম-প্রধান ও মঙ্গল-প্রধান।" আর য়ুরোপীয় আদর্শ অবলম্বন অসম্ভব ও অন্যায় ; আমাদের "অতীতকেই নূতন বল দিতে হইবে, নূতন প্রাণ দিতে হইবে।" নব্যবঙ্গের শীর্ষস্থানীয়, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দীক্ষায় সমালঙ্কৃত রবীন্দ্রনাথের এবম্বিধ উক্তি, সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। বস্তুত এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন আদর্শ ও তাহার উপযোগিতা সকলেরই ভাবিবার বিষয় বটে। আমরা বর্ত্তমান সময়ে এরূপ একস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, যেস্থান হইতে পাদবিক্ষেপের পূর্ব্বে, গন্তব্য স্থানের বিষয় একটু চিন্তা করা আবশ্যক। পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া আমরা উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছি ; কখন কোন্ ড্রেণে কি খানায় পড়ি তাহার স্থিরতা নাই। যখনই সেই নেশার ঝোঁক একটু কমিতেছে, তখনই আমরা পূর্ব্বের অস্থৈর্য্য, চঞ্চলতা ও উন্মত্ততার বিষয় স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইতেছি। আমাদের দেড় শত বৎসরের ইংরেজী শিক্ষার ফল আলোচনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালেই প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব দেখা যাইতেছে। ইহা যে কেবল ভারতবর্ষে বা বঙ্গদেশেই বিশেষ ভাবে ঘটিতেছে, তাহা নয়। সমাজচক্র চিরকালই অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী শক্তির তাড়নায়, স্বীয় গন্তব্য পথে চলিতেছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় সে প্রাচীন ও নবীনের বিরোধ নয়। সে বিরোধ ত চিরন্তন। এক শ্রেণীর লোক তাঁহাদের আদর্শ অতীতে স্থাপন করিয়া, বর্ত্তমানের সেই আদর্শচ্যুতির জন্য বিলাপ করিয়া থাকেন, আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা ভবিষ্যতেই সমস্ত সুখ-শান্তির চরম নির্দ্দেশ করিয়া, বর্ত্তমানকে তদনুযায়ী করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা অতীতে ভক্তিমান্ নহেন। কিন্তু প্রাচীতে প্রতীচির উদয় একটি অভিনব ব্যাপার। বিদেশীর সংশ্রব ব্যতীত ভারতবর্ষীয় সভ্যতা কি আকার ধারণ করিত, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। সুতরাং আমাদের সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা কি, তাহা স্থির করিতে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি। সমাজের পক্ষে কোন তাপমান যন্ত্র থাকিলে, আমরা সমাজ-শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক তাহা পরিমাণ করিতে পারিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে রূপ কোন তাপমাণ যন্ত্র নাই। কেহ বর্ত্তমান অবস্থাকে অতি

অস্বাভাবিক উত্তেজনার অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, আবার কেহ ইহাকে ঘোর অবসাদের অবস্থা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, জাপান প্রবাসী জাপানী সভ্যতায় মুগ্ধ, কোন বঙ্গীয় যুবকের কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

"Our society opposes the forces of Progress. The orthodox guardians of our society, posing as saviours and preservers of India, are nothing but her destroyers. These headmen have grown Imperious in their ambition and prestige, and none dare attack them. Again, in India, a halting Reform will not do, only appeals will not suffice— a peace-disturbing revolution, a hair pulling rebellion is needed".

অর্থাৎ "আমাদের সমাজ উন্নতির বিরোধী সমাজের প্রাচীন তন্ত্রের অভিভাবকেরা ভারতের রক্ষাকর্ত্তা ও ত্রাণকর্ত্তা হইতে যাইয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার বিনাশ সাধন করিতেছেন। এই সময় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ আত্মগৌরবে ও আত্মসম্মানে বড়ই স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন ; তাঁহাদিগকে কেহই কিছু বলিতে সাহস করে না। ভারতবর্ষে ধীর ও সঙ্কুচিত ভাবে সংস্কার কার্য্যে অগ্রসর হইতে চলিবে না, কেবল বাক্য দ্বারা উদ্বোধিত করিলে চলিবে না। ভারতে এক ঘোরতর বিপ্লবের .. শ্যক, এমন বিপ্লব চাই যাহাতে লোক উন্মত্ত হইয়া আপন কেশরাশি আপনি ছিন্ন করিবে এবং শান্তি সুখ বিপর্য্যস্ত হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় সভ্যতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

"যেখানে প্রতিযোগিতার তাড়নায়, পাশের লোককে ছাড়াইয়া উঠিবার অত্যাকাঙ্ক্ষায় প্রত্যেককে প্রতিমুহূর্ত্তে লড়াই করিতে হইতেছে, সেখানে কর্ত্তব্যের আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখা কঠিন।"

অন্যত্র :—"কিন্তু যে চলা পদে পদে থামাদ্বারা নিয়মিত নহে, তাহাকে উন্নতি বলা যায় না। যে ছন্দে যতি নাই, তাহা ছন্দই নহে। সমাজের পদমূলে সমুদ্র অহোরাত্র তরঙ্গিত ফেনায়িত হইতে পারে, কিন্তু সমাজের উচ্চতম শিখরে শান্তি ও স্থিতির চিরন্তন আদর্শ নিত্যকাল বিরাজমান থাকা চাই।" প্রাচীন কাব্য দর্শন, সমাজ-নীতি ও রাষ্ট্রনীতি-সম্বলিত পুরাণ, ইতিহাসাদিতে-প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার যে আদর্শ আমরা দেখিতে পাই, তাহা শান্তি ও স্থিতির আদর্শ বটে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা কি সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া তৎপ্রতিলক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইব—না, আমাদের অচিন্তিতপূর্ব্ব, আকস্মিক অবস্থার সংঘাতে আদর্শকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিব? গন্তব্য স্থান নির্ণীত হইলে, সরল কি বক্র পন্থা অবলম্বন করিয়া,—তথায় উপস্থিত হইব, তাহা আলোচনার বিষয় হইতে পারে। কিন্তু আদর্শ যত দিনে স্থির না হইবে, তত দিন আমরা "চোখ বাঁধা বলদের মত" ঘুরিয়া বেড়াইব। আমরা সকলেই উন্নতিকামী, আমরা সকলেই সৌভাগ্যকামী। কিন্তু কি উপায়ে সেই উন্নতি লাভ করিব, কি প্রণালীতে সেই সৌভাগ্য অর্জ্জন করিব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এসিয়াকে য়ুরোপ করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা হইতে পারে, কিন্তু দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের এসিয়াকে ফিরাইয়া আনা ব্যাপারটাও কি অসম্ভব নয়?—মৃতের পুনরুত্থানের কাহিনী কেবল বাইবেলেই পড়িয়াছি। অতীতের সমস্তই কি মৃত? বর্ত্তমান কি অতীতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? অতীত অদৃশ্য হইতে পারে, অই বলিয়াই কি 'অতীত' মৃত? গৃহের ভিত্তি, বৃক্ষের মূল চিরকালই অদৃশ্য, অথচ ভিত্তিহীন বাসগৃহে কেহ বাস করিতে চান না, মূলহীন বৃক্ষের

দাঁড়াইবার শক্তিতেও সকলে সন্দিহান। অতীতের সকল মৃত নহে,—যাহা আবরণ, যাহা অস্থায়ী, যাহা অপ্রয়োজনীয়, যাহা স্থূল, তাহাই মরে। আর যাহা আবৃত, যাহা স্থায়ী, যাহা আবশ্যক, যাহা সূক্ষ্ম, তাহাই জীবিত থাকে। সূর্য্যালোকে ও উত্তাপে দুর্ব্বাদল কি প্রকার শ্যামবর্ণ ধারণ করে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আবার সেই দুর্ব্বাদল সূর্য্যালোক ও উত্তাপ-বিরহিত হইলে কি বর্ণ ধারণ করে, তাহাও দেখিয়াছেন। সুতরাং বিদেশীয় সংশ্রবে ও বিদেশীয় সভ্যতার সংঘর্ষে প্রাচ্য সভ্যতার রং বদ্‌লাইয়া যাওয়া কিছুই বিচিত্র নহে, কিন্তু দুর্ব্বাদল জীবিত কি মৃত তাহা দেখিতে হইলে যেমন দুর্ব্বা-মূলের পৃথিবী হইতে রসাকর্ষণীশক্তি আছে কিনা তাহা দেখা আবশ্যক, তেমনি আধুনিক ভারতবর্ষীয় সভ্যতার সঞ্জীবনীশক্তি অনুভব করিতে হইলে, প্রাচীন সভ্যতার ভূমি হইতে ইহার রসাকর্ষণীশক্তি আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিতেছেন—

"বিদেশীর সহিত আমাদের সংঘাত যতই কঠিন হইয়া উঠিতেছে, স্বদেশকে ততই বিশেষভাবে জানিবার ও পাইবার জন্য আমাদের একটা ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিতেছে।"

এ ব্যাকুলতা সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলপ্রদ। আমরা যতই নবীনের পক্ষপাতী হই না কেন, যতই নূতন পড়িবার সাধ থাকুক না কেন, আমরা পুরাতনকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারি না। যাহা কিছু নূতন করি, যাহা কিছু নূতন গড়ি, সমস্তই প্রাচীন ভিত্তির উপরে সংস্থাপন করিতে হইবে। আবার অপর দিক দিয়া দেখিতে গেলে, আমরা কি দেখিতে পাই?— -কেবল কঙ্কাল খুঁজিলে চলিবে না। মৃত্তিকা ও ভস্মস্তূপ হইতে কঙ্কাল উদ্ধৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে মাংসপেশী সংযোগ না করিতে পারিলে, কঙ্কালের প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় লাভ কি? যেমনটি ছিল, তেমনটি আর হইবে না। কার্য্যানুরোধে, হেট্-কোট্ পরিধান করা আবশ্যক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু হেট কোট্ সমাচ্ছন্ন সেইখানি 'দ্বিজ- দেহ' হওয়া চাই। সংস্কারই বলুন আর উন্নতিই বলুন, পুনরুত্থানই বলুন আর পুনর্জ্জীবনই বলুন, সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষীয় সভ্যতার প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। প্রাচ্য সভ্যতা বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ধর্ম্ম-প্রবীণ তাহাতে আর কাহারও সংশয় নাই। যাহাদের অশনে, বসনে, শয়নে, স্বপনে ধর্ম্ম, তাহাদিগের সভ্যতাকে ধর্ম্ম প্রধান বলিতে আর কুণ্ঠিত হইব কেন? ধর্ম্ম আমাদের অস্থি-মজ্জাগত। নির্জ্জীব ভারত- সমাজে যদি কখনও জীবনের সঞ্চার দেখিতে পাই, তাহা ধর্ম্মান্দোলনে। এক ধর্ম্মই জড়-প্রকৃতি-সম্পন্ন ভারতসমাজকে আন্দোলিত করিতে পারে, আর প্রাচীন সমস্ত প্রধান প্রধান ধর্ম্মগুলির উৎপত্তি স্থান,—খৃষ্ট, বৌদ্ধ, ইসলাম, হিন্দু, জৈন প্রভৃতি জগতের সমস্ত ধর্ম্মের বাল্য-লীলা এসিয়া খণ্ডে। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষে যে কোন আন্দোলন, যে কোন ক্রিয়া, যে কোন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাই ক্ষণস্থায়ী অন্তঃসারশূন্য বন্দুক ক্রীড়ায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-শূন্য-রাজনীতি-চর্চ্চা, য়ুরোপে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে নয়। এই সত্য, আমাদের গবর্ণমেণ্টও বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন। নতুবা সামান্য গোরক্ষিণী-সভার কার্য্যকলাপের প্রতি বা এত প্রখর দৃষ্টি কেন,—আর পাশ্চাত্য আন্দোলনের ছায়া অবলম্বন করিয়া যে কংগ্রেস কার্য্য করিতেছে, তৎপ্রতিবা এ উদাসীনতা কেন? তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, গোরক্ষিণী-সভা ভারতের আর কংগ্রেস ইংলণ্ডের। গোরক্ষিণী সভা ধর্ম্মমূলা, আর কংগ্রেস ধর্ম্মহীন। সাহিত্য-রথী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পরিণত বয়সের গ্রন্থাদিতে এই ভাবটি বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তারপরে শান্তির কথা। শান্তির অর্থ যদি নির্জ্জীবতা, জড়ত্ব, কর্ম্মহীনতা হয়, তবে সে শান্তির আদর্শ অবলম্বন করিয়া, জীবন-সংগ্রামে ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে,. আমরা কদাচ তিষ্ঠিতে পারিব না। য়ূরোপীয় সভ্যতার সংশ্রবে ও সংঘাতে যদি আমাদের আদর্শকে কোন প্রকারে নূতন করিয়া তুলিতে হয়, তবে সে নূতনত্ব, জড়ত্ব-দ্যোতক শান্তির আদর্শ পরিত্যাগ ভিন্ন আর কিছুই নয়। জাপান-প্রবাসী ভারত-যুবকদের হৃদয়েও শান্তির এই নির্জ্জীব আদর্শ পরিহারের ভাব সদীপ্ত হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই প্রাণের আবেগে বিপ্লবের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অতি সন্তর্পণে সমাজের উচ্চতম শিখরে শান্তির আদর্শ সংস্থাপনের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"অতএব যে সমাজে কর্ম্ম আছে, সেই সমাজেই কর্ম্মকে সংযত রাখিবার বিধান থাকা চাই—অন্ধ কর্ম্মই যাহাতে মনুষ্যত্বের উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ না করে, এমন সতর্ক পাহারা থাকা চাই, কর্ম্মিদলকে বরাবর ঠিক পথটী দেখাইবার জন্য, কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে বিশুদ্ধ সুরটী—বরাবর অবিচলিত ভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য এমন এক দলের আবশ্যক, যাহারা যথাসম্ভব কর্ম্ম ও স্বার্থ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবেন।"

শান্তির সেই সুর। অর্থাৎ উর্দ্ধে যেমন প্রশান্ত, স্থির ও গম্ভীর নীলাকাশ—অধোদেশে কতই ঝঞ্ঝাবাত. অশনি নির্ঘোষ ও বিপ্লব ঘটিতেছে, তাহাতে আকাশের সেই শান্তি, স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইতেছে না। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, সমাজের উর্দ্ধতম স্তরে সেই প্রকার শান্তি চাই। ধর্ম্ম ও দর্শনালোচনায় যে গভীর শান্তির উদয় হয়। (Philosophic calm) এ সেই শান্তি। সেই শান্তি ও ধর্ম্মের আদর্শ অবলম্বন না করিয়া, আমরা য়ূরোপীয় কর্ম্মে আদর্শ অবলম্বন করিলে, নিশ্চয়ই জীবন সংগ্রামে পরাভূত হইব। কিন্তু তাই বলিয়া যদি আমরা কর্ম্মকে উপেক্ষা করি, ধন অর্জ্জন করিবার চেষ্টা পরিহার করি, আধুনিক বিজ্ঞান-সৃষ্টির প্রতি উদাসীন হই, তবে নিশ্চয়ই আমরা অচিরে এই ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইব। জাপান প্রবাসী যুবক বলিতেছেন :—

"The Japanese society presages death to societies will perversely continue in the wrong course in this age and oppose the spirit of Reform and Progress Reform is nothing if not cleanliness, and Progress is nothing if not incessant activity. Reform is purging and Progress is assimilation. So, in one word Japanese society is a crystal of cleanliness and a powerful engine of assimilation. This explains its superiority."

অর্থাৎ "যে সমাজ, সংস্কার ও উন্নতির বিরোধী হইয়া বর্ত্তমান কালে, বিপথগামী হইবে, তাহার বিনাশ সম্বন্ধে জাপান-সমাজ ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছে, পবিত্রতাই সংস্কার আর নিয়ত-কর্ম্মই উন্নতি। সংস্কার পরিবর্জ্জন, আর উন্নতি পরিগ্রহণ। এক কথায় বলিতে গেলে, জাপান সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব এই পরিবর্জ্জন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা-মূলক।" তিনি শান্তি ও ধর্ম্মের কথা কিছুই বলেন নাই। জাপানী সভ্যতা খুব আকস্মিক ও বিস্ময়কর বটে, কিন্তু যতদিনে এ নবোদিত সভ্যতার শিরোভাগে ধর্ম্ম, কিরীটের ন্যায় শোভা না পাইবে, যতদিনে জাপানের কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে শান্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন এই সভ্যতার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে সন্দিহান থাকিতে হইবে। জাপানী-সভ্যতাকে কেহ কেহ ধর্ম্ম-শূন্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্ম্ম-শূন্য সমাজ ও সভ্যতা য়ুরোপে সম্ভব হইলেও হইতে পারে,—এসিয়াখণ্ডে সে প্রকার সমাজের ও সভ্যতার কল্পনা করিতে পারি না। অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন, সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী জাপানবাসীরা কিছু একটা নূতন করিলেও করিতে পারে,

এসিয়ার বিশেষত্ব পরিহার করিলেও করিতে পারে, কিন্তু এসিয়ার অন্যান্য দেশের পক্ষে তাহা অসম্ভব। দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যপ্রপীড়িত, বিদেশীয় বাণিজ্যে হৃত-সর্ব্বস্ব, যুগব্যাপী দাসত্ব ও পরাধীনতায় অপগতবল-ভারতবাসী যদি ধর্ম্ম, শান্তি ও স্থিতির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মহীন হইয়া উঠে, তবে কি আর রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত সেই অবস্থায় উপনীত হইবে, 'যখন ভারতবাসী বৃহৎ হইবে, মুক্ত হইবে, অমর হইবে,—জগতের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে, প্রাচীন ভারতের তপোবনে ঋষিরা যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইবে এবং পিতামহগণ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন?"

স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন ও জগতের অন্যান্য দুদ্ধর্ষ ও প্রবল জাতি সমূহের সংশ্রবশূন্য যতদিন ছিলাম, ততদিন আমরা শান্তি, স্থিতি ও ধর্ম্মের আদর্শ অনুসরণ করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠাবান্ ছিলাম। তখন ব্রাহ্মণগণ সমাজের উচ্চতম শিখরে শান্তি ও স্থিতির আদর্শ ধরিয়া জনগণকে শিক্ষা দিতেন, 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি, যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।' তাহাতে সমাজের নিম্নস্তরেও আত্মাই চরমগতি ও পরম সম্পৎ বলিয়া বিবেচিত হইত। আমাদের পিতামহগণ—উত্তরে অভ্রভেদী হিমাচলের স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও প্রশান্তভাব বিলোকন করিতেন, দক্ষিণে অপার নীলাম্বুর বিশালতা উপলব্ধি করিতেন, পশ্চিমে সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর তরঙ্গ-ভঙ্গী ও পূর্ব্বে বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশের শস্য-শ্যামল ভূখণ্ডের শোভা নিরীক্ষণ করিতেন। সন্তোষ ও শান্তির সমস্ত উপকরণই ইহার মধ্যে লাভ করিতেন। তখন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য, বৈশ্যের বণিক্‌বৃত্তি ও শূদ্রের শ্রমশীলতা, অক্ষয় কবচের ন্যায় তাহাদিগকে রক্ষা করিত। যেন প্রতিযোগিতার তাড়নাই বা কোথায়, অন্ন চিন্তাই বা কোথায় আর পৃষ্ঠে পাদুকাঘাতই বা কোথায়! সে ভারত আর নাই, সে শান্তি ও সন্তোষ আর নাই। সুতরাং এই বিপর্য্যস্ত, পরিবর্ত্তিত ও অভিনব অবস্থায় সেই প্রাচীন শান্তি ও স্থিতির আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিব কি প্রকারে?—রবীন্দ্রনাথ সে উপায় প্রদর্শন করেন নাই। আমরা যে পথে চলিতেছি, সে পথ অবলম্বনীয় নয় ইহাই বলিতেছেন, কিন্তু ঠিক্ কোন্ পথটা অবলম্বন করিলে, আমরা নিরাপদে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিব তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। আমরা সেই আদর্শকে নূতন করিয়া নূতন অবস্থার মধ্যে কি করিয়া স্থাপন করিব, তাহা বলেন নাই। আমরা অবাধ-বাণিজ্য (free trade) বিদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন (colonisation), মার্টিনী হেন্‌রি লি মিট্‌ফোর্ড, লিডাইট প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া যে জগতে যশস্বী হইতে পারিব না, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত তাই বলিয়া কি আমরা ঐ সমস্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া চলিতে পারিব?

আমাদের মহত্ব ও বিশেষত্ব যাহাতে তাহা অবলম্বন করিয়াই আমরা প্রতিষ্ঠা লাভ করিব। কিন্তু নবাবিষ্কৃত রণ্টেন আলোর সাহায্যে আমাদের সমাজদেহে যে সমস্ত ক্ষত স্থান দেখিতেছি তাহাতে প্রলেপ না দিলে, সে শান্তি, সে শৃঙ্খলা, সে স্থিরতা ও সে ধর্ম্মের আদর্শ ঠিক বজায় রাখিতে পারিব না। আমরা চাই শান্তি, কিন্তু সমাজের মধ্যে যে সমস্ত অশান্তির বীজ প্রোথিত রহিয়াছে, তাহা তুলিয়া না ফেলিলে শান্তির আশা কোথায়? আমরা চাই মঙ্গল, কিন্তু যে সমস্ত অমঙ্গল-সূচক ধ্বনি প্রতিনিয়ত শুনিতেছি তাহা নিবারিত না হইলে, স্বর্গীয় মাঙ্গলিক বাদ্য আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে কেন? আমরা চাই—স্থিরতা কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে যে বন্যার স্রোত আমাদের উপর আসিয়া পড়িতেছে, তাহা প্রতিহত বা সুসংযত না করিতে পারিলে, এ অস্থিরতা দূর হইবে কি উপায়ে? আমরা চাই ধর্ম্ম, কিন্তু

ধর্ম্ম, চিন্তার প্রতিরোধক অন্ন-বস্ত্র-চিন্তা যে আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিতেছে, তাহা দূর না হইলে ধর্ম্ম চিন্তার অবসর কোথায়? রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন : "খাইব কি? যদি কালিয়া পোলায়ো না খাইলেও চলে, তবে নিশ্চয়ই সমাজ আপনি আসিয়া যাচিয়া খাওয়াইয়া যাইবে।" কালিয়া পোলায়োর জন্য যে আধুনিক ব্রাহ্মনগণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন এরূপ বোধ হয় না ; এক মুঠো আতপান্নের জন্য ও অনেক সময়ে কেরাণিগিরি করিতে হয় এবং তন্নিবন্ধন য়ুরোপীয় পাদুকা-স্পর্শরূপ অপার সুখ অনুভব করিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমাজের অশান্তি অমঙ্গল ধ্বনি ও অন্নচিন্তা প্রভৃতি দূর করিতে কিছুদিন "নকল নবিশি" করার বড়ই দরকার হইয়াছে। আর "নকল নবিশি" কি এতই নিন্দনীয়? নকলনবিশী করিয়াইত জাপান একটি গণ্য মান্য দেশ হইয়াছে নকলনবিশি করিলেই কি মৌলিকতা (Originality) হারাইতে হয়? নকল নবিশি করিতে করিতেও অনেক মৌলিক তত্ত্বের উদ্ঘাটন হয়। ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইংরেজের বিজ্ঞানাগারে 'নকল নবিশি' করিয়াইত মৌলিক তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া জগতে যশস্বী হইয়াছেন। "নকল নবিশি" ব্যতীত অনেকেই নূতন কিছু করিতে পারেন না।

আমাদের মৌলিকতার বাসনাটাকে একটু খর্ব্ব না করিলে, আবার কল্পনা ও জল্পনার রাজ্যে কিছু কাল বাস করিতে হইবে। সুধু "নকল নবিশি" করিয়া আপনার শক্তি ও সামর্থ্যেব প্রতি দৃষ্টি না কবিয়া আমাদের 'নকল নবিশি'র প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণার উদয় হইয়াছে এবং তজ্জন্য আমাদের কি আছে, তাহা একটু তলাইয়া দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে, এবং হওয়াটা স্বাভাবিক বটে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে, যে সমস্ত ব্যাপারে "নকল নবিশি" ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই, সে সমস্ত বিষয়ে যেন মৌলিকতার আশা করিয়া আমরা অকর্ম্মণ্য হইয়া না পড়ি। কোন্ দিক দিয়া আমরা আমাদের প্রকৃতিগত মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিব, কোন্ দিক্ দিয়া আমাদের ইপ্সিত মৌলিকতা লাভ করিতে পারিব, কোন্ বিষয়ে আমাদের "নকল নবিশি" অনাবশ্যক তাহাই রবীন্দ্রনাথ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধদ্বয়ে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ বিষয়ে "নকল নবিশির" প্রয়োজন এবং কোন্‌দিক্ দিযা আমরা আমাদের সেই শান্তি, স্থিতি ও মঙ্গলের আদর্শের প্রতিরোধক অশান্তি, অস্থৈর্য্য ও অমঙ্গলের হেতুগুলি দূর করিয়া দিব, তাহা দেখান্ নাই। মনে মনে আশঙ্কা হয় যে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তালব্ধ রত্নগুলির পাছে অপব্যবহার হয়, কেহবা ইহা দ্বারা "পুনরুত্থানের"-পুনরুত্থানই অনুমান করেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পরিষ্কাররূপে বলিতেছেন :—আমাদেব ভারতবর্ষের অতীত যদি বা যত্নের অভাবে আমাদিগকে ফল দেওয়া বন্ধ করিয়াছে তবু সেই বৃহৎ অতীত ভিতরে থাকিয়া আমাদের পরের নকলকে বারংবার অসঙ্গত ও অকৃতকার্য্য করিয়া তুলিতেছে। সেই অতীতকে অবহেলা করিয়া যখন আমরা নূতনকে আনি, তখন অতীত নিঃশব্দে তাহার প্রতিশোধ লয়, নূতনকে বিনাশ করিয়া পচাইয়া বায়ূ দূষিত করিয়া দেয়। আমরা মনে করিতে পারি, এইটে আমাদের নূতন দরকার, কিন্তু অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ আপোষে যদি রফা-নিষ্পত্তি না করিয়া লইতে পারি, তবে আবশ্যকের দোহাই পাড়িয়াই যে দেঁউড়ি খোলা পাইব, তাহা কিছুতেই নহে, নূতনটাকে সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করাইলেও নূতনে-পুরাতনে মিশ না খাইলে সমস্তই পণ্ড হয়।

সেই জন্য আমাদের অতীতকেই নূতন বল দিতে হইবে, নূতন প্রাণ দিতে হইবে। মোট কথা এই যে, নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রন ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। পুরাতন আদর্শ

সাম্‌নে রাখিব, কিন্তু নব পন্থা অবলম্বন করিয়া আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইব। অনেক বিষয়ে আমাদের 'নকল–নবিশি' করিতে হইবে, কিন্তু সেই পুরাতন আদর্শ ধরিয়াই আমরা যা কিছু অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার করিব। সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষা ভ্রান্ত নয়, মনের খেদে জাপান প্রবাসী–যুবক যাহাই বলুন বিপ্লবে সমাজের কোন মঙ্গল সংসাধিত হয় না ; বিশেষত : ভারতবর্ষ বিপ্লব–বিরোধী। আমরা বিপ্লব (Revolution) চাইনা, চাই বিবর্ত্তন (Evolution)।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত।

হরেন্দ্রকৃষ্ণ সেন : অদৃশ্য বাধন,নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত : জাতীয় আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর সেন : কাঞ্চা কল্পতরু, বৃজসুন্দর স্যান্যাল : ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ, খোন্দকার মইনউদ্দীন আহমদ : বিধবাবালা [কবিতা]

১ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যা আশ্বিন ১৩০৯

মনোরঞ্জন গুপ্ত : পূর্ব্বরাগে বাঙালী কবি, ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : যুগলচিত্র, ব্রজদুর্ল্লভ হাজরা : দক্ষিণ–কাহিনী,

আলিবর্দ্দীর দৈনিক জীবন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নবাব আলীবর্দ্দী মহব্বত জঙ্গের আহার্য্য সামগ্রী অতি সাবধানতার সহিত উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইত। তিনি স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন ; কখন কখন নিজে বাবুর্চ্চীদিগের সম্মুখে রন্ধনক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেন। ফলতঃ তাঁহার সেই রন্ধনের উদ্দেশ্য, উহাদিগকে শিক্ষা প্রদান এবং আত্মপ্রসাদ লাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি নিজে যেমন উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি আহার করিতেন, তাহাদের পাক প্রণালীও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহার আর এক অসাধারণ গুণ ছিল, সে গুণ জগতের অপর কোন ভূপতিতে কখন লক্ষিত হইয়াছে কি না, সন্দেহ। তিনি স্বহস্ত–পক্ক অন্নাদি খাওয়াইতে বিশেষতঃ পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন। তজ্জন্য প্রায়ই "মজলিস" হইত। এই মজলিসে সভাসদ্‌বর্গ এবং নিমন্ত্রিত আত্মীয় বন্ধুগণ উপবিষ্ট হইলে তিনি পরিবেশন করিতেন এবং পরিশেষে আপনিও আহারে বসিতেন। তখন খাদ্যের ভালমন্দ বিচার চলিত। কোন্‌ খাদ্যের কিরূপ আস্বাদন, কোন্‌টীর পাককার্য্যে ত্রুটি ঘটিয়েছে, ইত্যাকার স্বাধীন মত সকলেই ব্যক্ত করিতেন। নবাব তৎশ্রবণে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেন। কেবল পুরুষদিগকে খাওয়াইয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না; কখন কখন তাঁহার কুটুম্ব ও আত্মীয় গণের মহিলারাও নিমন্ত্রিত হইয়া তদীয় ভবনে আগমন করিতেন। যাহা হউক আহারান্তে সকলে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলে মহামতী মহব্বত জঙ্গ সুকোমল শুভ্র শয্যায় শয়ন করিতেন। তখন রহস্যবিৎ লোকেরা উপস্থিত হইল, তাহারা মনোরঞ্জন উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলে তিনি শুনিতে শুনিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু তাঁহার সেই নিদ্রা আলস্য–পরায়ণব্যক্তিদের ন্যায় দীর্ঘ কালস্থায়িনী ছিল না; ঠিক দুই প্রহরের সময় জাগরিত হইয়া "অজু" করণান্তর তৎকালের নির্দ্দিষ্ট "নামাজ" নির্ব্বাহ করিতেন ; পরে আট পাত "কোরাণ শরিফ" পাঠ করিতেন। এই

পবিত্র কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নবাব রসনার তৃপ্তিকর সুবাসিত "শুরুয়া" পান করিতেন। পিপাসায় মাংসের "শুরুয়া" ব্যতীত তিনি জল কখন ব্যবহার করিতেন না। বোধ হয়, পীড়ানিবন্ধন চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থানুযায়ী তাঁহাকে এই অনিবার্য্য নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইয়াছিল।

আলিবৰ্দ্দী স্বয়ং বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্যারও যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তাঁহার সভা বহুল উচ্চজ্ঞান গরীয়ান পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক লোকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুবিখ্যাত "ফাজেল" মীর মহাম্মদ আলি, নকী কুলী খা, হাকিম হাদী খাঁ, মির্জ্জামহাম্মদ হোসেন সুফী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত অগাধ ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিত লইয়া তিনি শাস্ত্রালাপনে মনোনিবেশ করিতেন। তাঁহার আসনের সম্মুখ ভাগে পণ্ডিতগণের উপবেশন-স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। যখন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ মীর মহাম্মদ আলি ধীর পদবিক্ষেপে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বিতলোপবি সভাস্থলের সমীপবর্ত্তী হইতেন, তখন নবাব তাঁহার সম্মানার্থ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কিছু দূর অগ্রসব হইয়া তাঁহাকে "আদবের" সহিত "সালাম" প্রদান করিতেন। মীর সাহেবও যথারীতি প্রত্যাভিবাদন করতঃ আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে যাইয়া উপবেশন করিতেন। অনন্তর নবাব আসন গ্রহণ করিলে পর আবার জলযোগের বন্দবস্ত হইত। তখন কাফি এবং রসনার তৃপ্তিকর বিবিধ উপাদেয় রাজভোগে সকলেরই হৃদয় হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিত এবং সুরুচিসঙ্গত হাস্য পরিহাস ও কথোপকথনের উচ্চ তরঙ্গে গৃহ উদ্বেলিত হইত। নবাব কেবল কাফির অংশী হইতেন, মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ করিতেন না।

এইরূপে জলযোগ ক্রিয়া সাঙ্গ হইলে পর মুলতান নগরবাসী জনৈক বিচক্ষণ পণ্ডিত "কাফী" নামক শিয়ামতানুমোদিত এক খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন।(১) এবং মীর সাহেব উহার কঠিন স্থলের ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। কোন বিষয় সন্দেহ জন্মিলে আলিবৰ্দ্দী প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন; প্রতিভাশালী মীর সাহেব অতি সুন্দররূপে তন্ন তন্ন করিয়া তাহার উত্তর প্রদানে নবাবের চিত্ত বিনোদন করিতেন। এবং প্রকারে দুই ঘন্টা কাল শাস্ত্রালাপনে অতিবাহিত হইলে পর সভাভঙ্গ হইত, সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থানোদ্যোগ করিতেন। মীর সাহেব আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলে আলিবৰ্দ্দীও অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিতেন এবং তাঁহার সম্মানার্থ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া "সালাম" প্রদান করতঃ দণ্ডায়মান থাকিতেন, তিনি যতক্ষণ না পাদুকা পরিধান পূর্ব্বক চলিতে আরম্ভ করিতেন, নবাব ততক্ষণ আর স্বস্থানে আসিয়া উপবেশন করিতেন না।

সহচরবর্গ ও পণ্ডিতমণ্ডলী একে একে বিদায় হইয়া যাওয়ার অনতিপরেই দেওয়ানী আমলাগণ এবং জগৎশেঠ সমুপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকের সংবাদ জ্ঞাপন করিতেন। উহাতে নবাবের দুই ঘন্টা কাল ক্ষেপণ হইত। রাজ্যের শুভাশুভ সংবাদ শ্রবণ ও তাহার শৃঙ্খলা সাধনরূপ কঠিন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তিনি সেই স্বল্প সময় মধ্যে কখন সেরাজউদ্দৌলা, কখন শাহামৎ জঙ্গ, কখন বা সওলাত জঙ্গ, ইহাদের যে কেহ উপস্থিত হইতেন, তাঁহারই

(১) কথিত আছে, "কাফী" গ্রন্থ প্রণেতা দৈবানুগ্রহে উহা রচনা করিয়াছিলেন। লেখক।

সহিত বাক্যালাপ করিতেন, তাহাতে অণুমাত্রও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। ইহাঁদের গমনের পর হাস্যপরিহাসপটু মির্জ্জা সমস্ উদ্দীন, জয়নাল আবেদীন বকাওল, মির জওয়াদ কোশবেণী, মহাম্মদ জানান প্রভৃতি উপনীত হইয়া কিছুক্ষণ আমোদ আহ্লাদ করিতেন। অতঃপর সন্ধ্যা সমাগত হইলে নবাব যথারীতি "নামাজ" নির্ব্বাহ পূর্ব্বক কক্ষান্তরে যাইয়া গার্হস্থ কার্য্যের শৃঙ্খলা সাধনে মনোনিবেশ করিতেন। এই স্থলে তাঁহার বিবিধ সদগুণশালিনী প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনী, প্রাণাধিক দৌহিত্র সেরাজউদ্দৌলা এবং অপরাপর আত্মীয়া অঙ্গনারা উপস্থিত থাকিতেন। নানা বিষয়ের আলোচনা চলিত। কামিনী-কুল বরেন্যা বুদ্ধিমতী নবাব-বেগম সচিবের ন্যায় স্বামীকে সদুপদেশে আপ্যায়িত করিতেন, নবাবও তৎসমুদয় অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ ও পালন করিতে ত্রুটি করিতেন না। প্রসিদ্ধি আছে, সূক্ষ্মদর্শী আলিবর্দ্দী তাঁহার এই প্রিয়তমা জীবন-সঙ্গিনীর সৎপরামর্শ প্রভাবেই অনেক সময় অনেক সঙ্কট-সঙ্কুল কার্য্যে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ! আহা ঈদৃশী পুণ্যশীলা মহীয়সী মহিলা পত্নীরূপে পাইলে এই সংসার সমুদ্র বহু বিঘ্নময় ও বিপদপূর্ণ জানিয়াও কোন্ ব্যক্তি না তাহাতে স্বীয় জীবন-তরণী ভাসাইতে বাসনা করে ?

নবাব আলিবর্দ্দী মহব্বত জঙ্গ রাত্রিকালে উপাদেয় ফলমূল ও অন্নাহার করিতেন। যখন ত্রিযামার যাম মাত্র অতীত হইত, তৎকালে তাঁহার নিকট হইতে কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই বিদায় লইয়া স্ব স্ব শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেন। এই অবসরে কতিপয় রহস্যবিৎ লোক আসিয়া "খোশগল্প" আরম্ভ করিত। তিনি পর্য্যাঙ্কোপরি সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া তাহা শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু সে নিদ্রা কতক্ষণ। শস্ত্রবিভূষিত বিশ্বস্ত প্রহরীগণের পর্য্যায়ক্রমে শয়ন কক্ষের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিয়া দেখিবার ব্যবস্থা ছিল। নবাব নিদ্রার ২।৩ ঘণ্টা পরেই জাগরিত হইয়া কে প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত আছে? রাত্রি কত হইয়াছে? ইত্যাকার প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করিয়া আবার নিদ্রা যাইতেন। ফলে রাত্রিকালে তিন চারিবার তাঁহার জাগরিত হইবার অভ্যাস ছিল। দুই ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে তিনি একেবারে নিদ্রোত্থিত হইতেন এবং স্নানান্তে পার লৌকিক শ্রেয়ঃ লাভজন্য পরম কারুণিক পরমেশ্বরের উপাসনায় মগ্ন হইতেন। এইরূপ প্রণালীক্রমে মহাত্মা আলিবর্দ্দী মহব্বত জঙ্গ বাহাদুরের জীবনাতিবাহিত হইত।

সময়ের সদ্ব্যবহার কিরূপে যে করিতে হয়, তাহা তিনিই অবগত ছিলেন। এই কৌশলী কর্ম্মবীর স্বীয় কার্য্যরাশি সময়ের বিভাগানুসারে যাদৃশ্য আনন্দের সহিত অক্লেশে সম্পন্ন করিতেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতায় কে না বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া থাকিতে পারে? কে না তাঁহাকে আদর্শ নরপতি, অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ভক্তি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া থাকে? তাঁহার দৈনন্দিন জীবনকাহিনী পাঠে যে জ্ঞানলাভ হয়, যে সৎশিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা শত শত কোহিনুর হইতেও মূল্যবান, রাজপদ হইতেও মহত্তর, তাহার আর সন্দেহ নাই !

শ্রীমোজাম্মেল হক, শান্তিপুর।

আলাওলের পদাবলী

পূর্ব্বে আমরা স্থানান্তরে* দেখাইয়াছি, মহামতি সৈয়দ আলাওল সাহেব বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ ব্যতিরেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষ্ণব-কবিতা-রচনায়ও তাঁহার অমৃত নিষ্যন্দিনী লেখনী পরিচালিত করিয়াছিলেন। এতদুক্তির প্রমাণ-স্বরূপ আমরা যে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, সেই সুন্দর পদটি মাননীয় দীনেশ বাবু অনুগ্রহ-পূর্ব্বক তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রহণ করিয়া পদটিকে চিরস্থায়ী করিয়া দিয়াছেন* । মুসলমান কবিকুলের কীর্ত্তি-রাশি-সমুদ্ধার জন্য আজও রীতিমত কোন চেষ্টাই হয় নাই ; কে বলিবে, আলাওলের মত কত কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তিই কালের করাল কবলে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে? যে সকল ধ্বংশোন্মুখিনী কীর্ত্তি আজও বর্ত্তমানা, তৎপ্রতি নিজে মুসলমান সমাজ সম্পূর্ণ উদাসীন ; সুতরাং আলাওলাদির আশা আর কাহার কাছে? মহাজনেরা বলেন, জাতীয় গৌরব-হৃদয়ঙ্গমে অক্ষম হইলেই কোন জাতির প্রকৃত অধঃপতন হয়। আমাদের ও সেই চরম অবনতির আরো বাকী আছে নাকি? ফলতঃ, যে জাতিতে আলাওল ও দৌলত কাজির মত ক্ষমতাশালী কবির আবির্ভাব, আজ সেই জাতি মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি কেন এরূপ বিরূপ হইল,—কে আমাদিগকে বলিয়া দিবে?

পূর্ব্বোক্ত একটি মাত্র পদের দ্বারাই আলাওল বৈষ্ণব-কবি-সমাজে সাদরে পরিগৃহীত হইবেন, সন্দেহ কি? সম্প্রতি তাঁহার রচিত আরো তিনটি পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ণবিন্যাসে ভিন্ন অন্য কোথাও কিছুমাত্র রূপান্তর না করিয়া পদগুলি এখানে প্রকাশিত করিলাম। দুঃখের বিষয়, তৃতীয় পদটির বিশুদ্ধ পাঠ পাওয়া যায় নাই। কমধিকমিতি।

(১)

গুজ্জরী ভাটিয়াল

কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে লো নাগর কানাই রে !
শ্যাম কি দেখিলাম যমুনার ঘাটে।। ধু।
দক্ষিণে নাচএ ভূরু, সঘনে কম্পএ উরু,
পাপিনী সাপিনী হৈল বাম।
আভাবে পড়িল বাধা, মুই কলঙ্কিনী রাধা,
না জানি কি হয় পরিণাম।।
মুই যদি জানিতুম্ বাটে কানাইয়া যমুনার ঘাঠে,
ত' কেনে ভরিতে আইলুম্ জল
কৈয়াছিল গুরু জনে, সে কথা না ছিল মনে,
পাইলাম তার প্রতিফল।।
জঙ্গম মেঘের আড়ে, যুগল খঞ্জন নাচে,

---

* 'আলো—২য় বর্ষের ২য়—৩য় সংখ্যায় 'আলাওল গ্রন্থাবলীর সময়-বিচার' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' ৫৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তা দেখিয়া পড়ি গেলুম্ ভোলে।
হেন কভু না দেখিছি, লোকমুখে না শুনিছি,
হেন পক্ষ আছএ গোকুলে॥
বংশী বটের তলে, ছায়া নাহি সুশোভিত,(?)
তাতে বসিতে না লয় মন।
অরুণ কিরণ তাপে, মু'খানি শুকাই যাবে,
ক্ষুধাএ আঁখি অরুণ বরণ॥
কহে হীন আলাওলে, কেনে আইলুম্ তরুতলে,
নয়ানে নয়ানে হৈল দেখা।
এক ধারা পত্থখানি, দুই ধারা হইতে নারি,
শ্যাম গায়ে লাগিয়াছে ঢেকা॥[১]

(২)

পঞ্চম

আলি কহ (কিহে?) মুঝে মিলায়ব কাম,[২]
ঘঠে (তে) না বহে প্রাণ॥ ধু।
না জানি কি হৈল, কি দিআ কি কৈল,
না জানি ললাটে[৩] আছে কি।
বিনি দোষে কালা, দিলা এথ জ্বালা
এনা দুঃখে প্রাণ যায় তেজি॥[৪]
অনিবত পোড়ে মন, কালা মোরে নিদারুণ
ভুলিয়া রহিলা ভিন্ন দেশ॥[৫]
বিরহের বন. মদন দাহন,
তনু ক্ষীণ প্রাণি (মোর) শেষ॥
চন্দন আগর, শীতল মন্দির,
কিছু না লাগএ মন রঙ্গে।[৬]
হীন আলাওলে ভণে. ঐ দুঃখ রহিল মনে,[৭]
কানাইয়া দেখ তোর সঙ্গে॥[৮]

(১) ঢেকা ধাক্কা।
(২) "আগুনিতে দহে মোর মন, ঘঠেতে" ইত্যাদি পাঠান্তর।
(৩) "লিখিবে" পাঠান্তর।
(৪) "ঐ দুঃখে প্রাণ না যায় তেজি" পাঠান্তর।
(৫) "ভুলি রৈলা ভিন্ন দেশ" ঐ।
(৬) "কিছু না লাগ এ অঙ্গে" ঐ।
(৭) "ঐসে দুঃখ রৈল মনে" ঐ।
(৮) "কালা দেখ তোমার সঙ্গে" ঐ। দেখ=দেখম=দেখোঁ বা দেখো।

(৩)

কল্যাণ

সইগণ, বড়ি অপরূপ সাজে।
একি অপছরী,(৯) তেজি সুরপরী,
আয়ল ভুবন মাঝে।। ধু।
শিরেত (১০) সিন্দুর, নয়ানে কাজল,
বড়ি অপরূপ রঙ্গ।
রাহু দিবাকর, কুহু সুন্দর, (১১)
তিন ভেল একহি সঙ্গ।।
অরুণ বরণ, যুগল নয়ান,
কাজল লজ্জিত ভেলা।
কনক কমল, উপরে ভ্রমর,
খঞ্জনে কর এ খেলা।।
সর্ব্বক্ষণ হেন, জিতেন্দ্রিয় (?) গমন,
করি–অরি জিনি মাঝ।
কেয়ূর কঙ্কণ, কিঙ্কিণী নূপুর,
সঘন কর এ গাজ (?)।। (১২)
গুরুর কিঙ্কর
শুন সব মতিমান।
নূতন যৌবন, কামিনী–মোহন
শ্রীআলাওলে ভাণ।। (১৩)

শ্রীআবদুল করিম।

বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত : সীতা [কবিতা], স্বপ্নরাজ্য [প্রবন্ধ], অশ্বিনীকুমার দত্ত : কদ্রানু কীর্ত্তন [ঐ], শশিমুখী গুপ্তা : শোকোচ্ছ্বাস [কবিতা]।

১ম ভাগ, ৫ম–৬ষ্ঠ সংখ্যা, কার্ত্তিক–অগ্রহায়ণ ১৩০৯

নলিনাল বন্দ্যোপাধ্যায় : যুগল চিত্র

সৈয়দ মর্ত্তুজার পদাবলী।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন মল্লিক মহোদয়ই সর্ব্বপ্রথম মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। চট্টগ্রাম হইতে উক্ত প্রকারের পদাবলী সংগ্রহ করিবার জন্য আমরাও বহুদিন অবধি নিযুক্ত আছি। আমাদের অনুসন্ধানের ফলে অনেকগুলি নূতন বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব জানা গিয়াছে।* তন্মধ্যে প্রবন্ধের শীর্ষোক্ত

(৯) "একি অপরূপ হরি" পাঠান্তর।

* ইহাদিগকে লইয়াই ৩য় বর্ষের 'বীরভূমিতে' আমরা "নূতন মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছি।

সৈয়দ মর্ত্তুজা একতম। তাঁহার কোনরূপ পরিচয় আমরা পাইতে পারি নাই ; রমণী বাবুও পারেন নাই। গত বৎসরের মাঘ মাসের 'সুধা' পত্রিকায় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায় মহাশয় মুর্সিদাবাদবাসী এক সৈয়দ মর্ত্তুজার পরিচয় প্রকাশিত করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ দেখিবার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই। রমণী বাবু, নিখিল বাবু এবং আমাদের প্রকাশিত পদাবলীর মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ বা অভিন্নতা আছে কিনা, দেখা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে আমাদের এই সৈয়দ মর্ত্তুজা 'একে তিন', 'তিনে এক' কিনা, বলিতে কঠিন হইবে না।

সৈয়দ মর্ত্তুজার অনেক পদ আমরা পাইয়াছি। তাহার কতকগুলি পূর্ব্বে 'পূর্ণিমা' ও 'সাহিত্য সংহিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি পদ পাঠাশুদ্ধি বা অপূর্ণতা হেতু এখন প্রকাশিত করা যাইতে পারে না। অদ্য 'ভারত সুহৃদের' পাঠকবর্গের তাঁহার তিনটি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব পদ উপহার দিলাম।

মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে সৈয়দ মর্ত্তুজা একজন শ্রেষ্ঠ কবি। রসগ্রাহী জনের কর্ণে তাঁহার কবিতা, অমিয়া সিঞ্চন করিবে, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব কবিতার সৌন্দর্য, মাধুর্য্য লেখনী মুখে ব্যক্ত করা চলে না, তাহা আস্বাদন করিয়া বুঝিতে হয়। পাঠক কবিতাগুলি পাঠ করিয়া প্রথমেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, মুসলমানের লেখনী এতটা হিন্দুভাবাপন্ন কিরূপে হইল? তাঁহার পদের লালিত্য, ছন্দের মাধুর্য্য ও ভাবের গাম্ভীর্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

(১)

ধানশী

সৈ রে আমার কি করে পরাণে !
প্রাণি মোর হরি নিল কালার বাঁশী টানে।।
যে যে চাহসি দিমু বাঁশী তোর যেই শ্রদ্ধা।
রাঙ্গা পায় মিনতি করি বাঁশি না ডাকিয় রাধা।।
ছৈয়দ মর্ত্তুজা কহে শুন মোর কথা।
মন মোর মজি রৈল বাঁশী পূরে যথা।।

(২)

ধানশী

রাধার আকুল রে (?) বাঁশী না বাজাইয়। ধু।
তরল বাঁশের বাঁশী তাতে পঞ্চ বেধা।
বাঁশিয়া কেমনে জানে কলঙ্কিনী রাধা।।
যে জড়ে আছিলি বাঁশী জড়ের লাগ পাম্।
জড়ে মূলে কাটি বাঁশী সাগরে ভাসাম্।।
ছৈয়দ মর্ত্তুজা কহে শুন রে কালিয়া।
নিবিছিল মনের দিলি জ্বালাইয়া।।

(৩)
ধানশী

তোর নি বাঁশীর রব শুনি গো রাই।
তোর নি বাঁশীর রব শুনি॥ ধু।
উজানে বাজাও বাঁশী মথুরা রইয়া শুনি।
কামিনী হেরল কামবাঁশী তপসী ছোড়ে মুনি॥ ধু?
কোন দেশে তরল বাঁশী বাজাইল বন্ধুয়া।
রাধের প্রাণ হরিতে বাঁশী আনিল কানাইয়া॥ ধু।
যেইখানে বাজাও বাঁশী সাগরে ভাসাম্॥ ধু।
ছৈয়দ মর্ত্তুজা কহে যৌবন দিমু ডালি।
তন* ছাড়ি প্রাণি টান তন হৈল খালি॥

ইঁহারা মুসলমান হইয়া হিন্দুর দেবতা কৃষ্ণবিষয়ক পদ কেন লিখিলেন, সে প্রশ্ন এখন তুলিয়া ফল নাই। বস্তুতঃ এমন একদিন গিয়াছে, য্খন মুসলমানেরা বঙ্গ-ভাষার খাতিরে ধর্ম্মের অনুশাসনেরও ভয় করেন নাই। আর আজ কিনা সেই মুসলমানগণই মাতৃভাষা বাঙ্গালাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য সভাসমিতি করিতেছেন! হায়! আমাদের মধ্যে এরূপ দুর্বুদ্ধির সঞ্চার করিল কে?

শ্রীআবদুল করিম

গোপালচন্দ্র সেন : আমিষ নিরামিষ, সতীশচন্দ্র গুহ : প্রেম [প্রবন্ধ], অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত—

বাঙ্গালী ও বাঙ্গলা ভাষা

বাঙ্গালী বলিলে আজকাল আমরা কি বুঝিয়া থাকি? বাঙ্গালী বলিলে সাধারণতঃ বঙ্গদেশের অধিবাসী বুঝায়। এই বঙ্গাধিবাসী বাঙ্গালী জাতির অবয়ব-গঠন চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাই, দুইটী স্বতন্ত্র উপাদানের একত্র সহস্থানে এই বিশাল সমাজ-শরীর উৎপাদিত হইয়াছে। হিন্দু এবং মুসলমান এই জাতিদ্বয়ের সংযুক্ত অবস্থানে বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজের উৎপত্তি ও গঠন। বঙ্গ-সমাজের অন্তর্দ্দশার ও বহির্দ্দশার পর্য্যালোচনে যাহার চিন্তাস্রোত প্রবহমান তিনিই এই মীমাংসায় উপনীত হইবেন, সন্দেহ নাই। পাঠক জানেন, প্রাচীন বঙ্গের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ত্তমান সময়ে দুর্লভ। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশ সাঁওতাল, পাহাড়ীয়া প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। পরে যখন সমুন্নত আর্য্যগণ তাঁহাদের কাস্পীয়ান তীরবর্ত্তী আদিনিবাস পরিহার পূর্ব্বক ভারতের সীমাতে পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহারা ভারতের অন্যান্য স্থল অধিকার করিয়া পরিশেষে বঙ্গভূমিতে উপস্থিত হয়েন। আর্য্য হিন্দুগণ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া অনার্য্য অধিবাসীদিগকে

* তন = তনু—দেহ।

পরাজয় করিলেন এবং তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বঙ্গের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। এই আর্য্য হিন্দুগণ পুরুষ-পরম্পরা বঙ্গদেশে অবস্থান হেতু ভারতের অন্যান্য স্থলের আর্য্যগণ অপেক্ষা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলেন, এবং যতদিন বিদেশীয় কোন প্রবল শক্তির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত না হইয়াছিল, ততদিন তাঁহারা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি ভোগাধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে ইসলামধর্ম্মী পাঠানগণ যেই বঙ্গাকাশে উদিত হইলেন, অমনি বঙ্গের রাজদণ্ড হস্তান্তরে স্থান লাভ করিল। হিন্দু রাজত্বের অবসান হইল, বঙ্গে মুসলমানের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। এই পরাক্রমশীল মুসলমানও যখন স্থায়ীরূপে বঙ্গদেশে নিবাস স্থাপন করিলেন তখন তাঁহার জাতীয় বীর্য্যে অবনতি ঘটিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে বঙ্গবাসী হিন্দু-মুসলমান প্রায় তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উভয়েই বিদেশীয় নবশক্তির প্রভাব হইতে আত্মরক্ষণে সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িল। তাই প্রবল পরাক্রম ব্রিটীশ শক্তির ভারত অধিকারে বঙ্গবিজয় সর্ব্বাপেক্ষা সহজ সাধন হইয়াছিল। আজ সময়ের স্রোতে, অবস্থার বিবর্ত্তনে বঙ্গদেশবাসী হিন্দু-মুসলমান উভয়েই অবস্থা-সাম্যে সম্মিলিত—উভয়েই বিদেশীয় শক্তিবিজিত, উভয়েই সমসৌভাগ্যে ভুবনবিজয়ী ইংরাজের রাজভক্ত প্রজা, উভয়েই বীর্য্যহীন কৃপাপাত্র, উভয়েই আদিনিবাসবর্জ্জিত বঙ্গভূমির স্থায়ী অধিবাসী। বর্ত্তমান অবস্থায় সাম্যপ্রাপ্তিহেতু এবং দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সাত শত বৎসর ব্যাপী সুদীর্ঘ সহাবস্থান নিবন্ধন, আজ হিন্দু মুসলমান এক পরিবারভুক্ত সন্তানমণ্ডলীর ন্যায় পরস্পর সহানুভূতি পরবশ ; উভয়েই বঙ্গভূমিকে জন্মভূমি বলিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী- জ্ঞানে তাহার যথাসম্ভব উন্নতি সাধনে একান্ত সমুৎসুক। উভয় জাতির মধ্যে বাহ্যিক আবরণাদিতে স্বতন্ত্রতা বর্ত্তমান থাকিলেও, এইক্ষণ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বঙ্গভূমির শ্রীবৃদ্ধিসাধন নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন, কারণ উভয়েই স্থির বুঝিয়াছেন বঙ্গভূমি উভয়েরই নিজের। বাঙ্গালাদেশ যেরূপ হিন্দুর পুরুষানুক্রমিক অধিকার, তদ্রূপ উহা মুসলমানেরও বংশগত পৈতৃক ধন। বঙ্গদেশের উন্নতি অবনতির সহিত উভয়েরই সুখ-দুঃখের মূল অভেদ্যরূপে সংস্থিত ; এই মূল এত গভীর বিস্তৃত যে উহার উচ্ছেদ মানবশক্তির বহির্ভূত। যাঁহারা সমাজ চিন্তনে প্রীতি লাভ করেন, তাহারা দেখিবেন এক স্থানে বহুকাল একত্র বসবাসহেতু বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমানে পরস্পরের আচার ব্যবহার পরস্পরের জীবনে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মুসলমানের অনেক আচার পদ্ধতি হিন্দুর সামাজিক জীবনে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং হিন্দুর অনেক আচারে মুসলমানগণ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা জানি অনেক হিন্দু পীরের সিন্নি দিয়া থাকেন, আবার অনেক মুসলমান হিন্দুর দেবমন্দিরে ভোগ প্রদান করেন। বঙ্গের অনেক পল্লীতে পরিদৃষ্ট হয় যে, হিন্দুর ন্যায় মুসলমানগণও সন্তানের কল্যাণ কামনায় কালী, শীতলা প্রভৃতি হিন্দু-দেবীগণের আরাধনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের যথারীতি পূজা দিয়া থাকেন। অনেক হিন্দু বেদকে যেরূপ শ্রদ্ধা করেন, মুসলমানের কোরাণকেও সেইরূপই মহাপুরুষ বাক্য বলিয়া সম্মান করেন। নাম গ্রহণ সম্বন্ধে দেখা যায়, অনেক মুসলমান 'চাঁদ' প্রভৃতি হিন্দুর নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ স্থিরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, হিন্দু-মুসলমানে পূর্ব্বতন 'যবন-কাফের' ভাব বিদূরিত হইয়াছে এবং উভয়ে সম্প্রতি পরস্পরকে পার্শ্ববর্ত্তী মিত্রবোধে আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। উভয়েতে

যাহাই জাতিগত স্বতন্ত্র সঙ্কীর্ণ বৈলক্ষণ্য থাকুক, আজকাল হিন্দু-মুসলমান উভয়েই উদারতার উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, পরস্পরের সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া, উভয়ের সংযোগ-গঠিত বাঙ্গালী জাতির গৌরব-বর্দ্ধনে একান্ত অভিলাষী। এইক্ষণ বাঙ্গালীর গৌরব-বর্দ্ধনে একান্ত অভিলাষী। এইক্ষণ বাঙ্গালীর গোরব, বাঙ্গালীর উৎকর্ষ, বাঙ্গালীর জয় বলিলে, বঙ্গদেশবাসী হিন্দু-মুসলমান উভয়ের গৌরব, উৎকর্ষ ও জয় সূচিত হয় এবং বাঙ্গালী বলিলে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের একত্র সমাবেশ নির্দ্দেশিত হয়। আজকাল বাঙ্গালী বলিলে কেবল মাত্র হিন্দু বা মুসলমানের নির্দ্দেশ হয় না, পরন্তু উভয়ের মনোহর সংযোগ জ্ঞাপিত হয়। বাঙ্গালী জাতি দুইটী জাতির একত্র, হিন্দু ও মুসলমান। বাঙ্গালী সমাজ, দুই সমাজের সমষ্টি, হিন্দু ও মুসলমান।

বাঙ্গালী কি তাহার একরূপ সমাধান হইল। এইক্ষণ প্রশ্ন বাঙ্গালীর ভাষা কি? বাঙ্গালী (জাতি বা সমাজ) যেরূপ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সংযোগে গঠিত, বাঙ্গালীর ভাষাও তদ্রূপ উভয়ের সহায়তায় পরিপুষ্ট। আমরা সম্প্রতি দেখাতে চেষ্টা করিব যে, বঙ্গভাষার মাতৃভাষা সংস্কৃত হইলেও পার্শিভাষার আশ্রয়াবলম্বনে উহার অঙ্গ বিকশিত এবং দেহকান্তি সংবর্দ্ধিত। পাঠক দেখিবেন, বঙ্গসাহিত্যের কোন কোন যুগে তদুপরি মুসলমান সাহিত্যের প্রভাব পরিস্ফুট লক্ষিত হয় এবং বঙ্গসাহিত্যের বিস্তৃতি সম্পাদনে উৎকৃষ্ট গ্রন্থরচনা দ্বারা অনেক মুসলমান কবির সহায়তা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে প্রমাণিত হইবে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে কেবলমাত্র হিন্দুর একনিষ্ঠ স্বতন্ত্র অধিকার নহে। পরন্তু উহা হিন্দু মুসলমান উভয়ের অধিকার চিহ্নিত সাধারণ সামগ্রী। অতএব বাঙ্গালীর ন্যায় বাঙ্গালী ভাষাও হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সমাধিকারত্ব সূচক এবং উহার পুষ্টি ও বিবর্দ্ধন কেবলমাত্র উভয়ের ঐকান্তিক মিলিত সাধনাধীন।

ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে হিন্দি, উড়িষা তেলুগু, গুজরাটী মারহাট্টী, কাশ্মিরী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষাও প্রসূতা দেবদুহিতা। কিন্তু বঙ্গভাষা আজ যে মূর্ত্তিতে বঙ্গের ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে, দেবমাতা ঐ মূর্ত্তিতে উহাকে প্রসব করেন নাই। কিন্তু যে আকৃতিতে মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, বহু শতাব্দীর অবস্থা বিপর্য্যয়ের তরঙ্গাঘাতে তাহাতে প্রচুর বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। দীন শিশু জন্মের কিছুকাল পরে মাতৃ আশ্রয়ে বঞ্চিত হইয়া নবশক্তির অধীনতায় পরিপুষ্টি হেতু বর্ত্তমান আকার ধারণ করিতেছে। অতএব বঙ্গভাষা ভাষা-জগতের শ্রেষ্ঠ গুরু সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠা কন্যা হইলেও, অন্য ভাষার আশ্রয় এবং গূঢ় সংস্পর্শ উহার জন্মশুদ্ধি নষ্ট করিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা যেরূপ বঙ্গভাষার জন্মদায়িনী। এই উভয় ভাষার পৃষ্ঠপোষণে বঙ্গভাষার অঙ্গ বর্দ্ধিত, সুতরাং উহা উভয়ের শক্তিমিশ্রিত নূতন ভাষা।

আজকাল অনেকে অনুমান করেন, সংস্কৃতের অপভ্রংশ প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে মুসলমানের প্রভাব বিস্তৃত না হইয়াছিল এবং হিন্দুর জীবন মুসলমানের প্রতাপাধীন না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত এই ভাষা সম্পূর্ণ হিন্দুভাবে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু বাঙ্গালায় মুসলমান আধিপত্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন বঙ্গভাষার উপর মুসলমান ভাষা পার্শির প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল। হিন্দু মুসলমান দুই জাতি বহুকাল একত্র অবস্থান হেতু উভয়ে উভয়ের ভাব গ্রহণ করিতে লাগিল এবং অনেক মুসলমানী ভাব হিন্দুর

জীবনে প্রবিষ্ট হইল! এই নবগৃহীত বহিঃ প্রকটনের প্রয়োজনীয়তা হিন্দুকে মুসলমান ভাষার অনুকরণে বাধ্য করিল এবং অজস্র পার্শিশব্দ বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়া উহার পরিধি প্রসারিত করিল। এইক্ষণকার বঙ্গভাষায় প্রচলিত এত অধিক সংখ্যক শব্দ পার্শি হইতে অনুকৃত যে উহা বাদ দিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে একমাত্র সংস্কৃতশব্দাত্মিক করিতে চাহিলে উহা বিকলাঙ্গ হইয়া অতি বিকৃত দর্শন হইয়া দাঁড়াইবে।

আমরা প্রথমতঃ দেখিতে পাই, বিচার শাসন সম্বন্ধীয় অসংখ্য পার্শি শব্দ বঙ্গভাষায় স্থান লাভ করিয়া উহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছি এবং ঐ সকল শব্দসূচিত ভাব প্রকাশে বঙ্গভাষার অসমর্থতা দূরীভূত করিয়াছি। আদল, আদালত, রায়, হাকিম, হুকুম, হাজির, হুজুর, জারি, দাখিল, দখল, বহাল, ববখাস্ত, দরখাস্ত, দস্তখত, সামিল, নালিশ, রোয়েদাদ, সওয়াল, জবাব, জামিন, কবালা ফর্শা কোর্ফা মোৎফর্কা, আসল, কিস্তি, পেয়াদা, বরকন্দাজ, কাজি, মেয়াদ, তালুক, মুলুক, মুনাফা বাদসাহ, ওমরাহ, কসুর, জাহের, সদর, কায়েম, আমল, ওয়াধা, মেহানৎ, হাজত প্রভৃতি অগণিত পার্শিশব্দ প্রতিদিন বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত ও প্রচলিত হইতেছে। কতকগুলি বাঙ্গালায় প্রচলিত পার্শিশব্দ ইংরাজিতেও অপরিবর্ত্তিতভাবে ব্যবহৃত হইতেছে যথা,—নাজির, পেস্কার প্রভৃতি।

বাস্তবিক বিচারবিভাগের সাধারণ ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা শব্দই পার্শি হইতে গৃহীত। এই ক্ষেত্রে প্রচলিত পার্শি শব্দের সহায়তায় আমাদের কার্য্য সঞ্চালন সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একটা, অতি প্রয়োজনীয় এবং বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রে বঙ্গভাষার প্রধান অবলম্বন পার্শি ভাষা, যত দিন বঙ্গভাষা কার্য্যক্ষম থাকিয়া লোক সমাজে আপন অস্তিত্বের পরিচয় দিবে, ততদিন উহা বহু মূল্য শব্দাভরণ বক্ষে ধারণ করিয়া পার্শি ভাষার মহাদান কৃতজ্ঞ অন্তরে বিঘোষিত করিবে। মুসলমানের রাজকীয় প্রভাবে বঙ্গভাষার পদবৃদ্ধির আরও নিদর্শন আছে। রুপিয়া, সুকি, পয়সা প্রভৃতি মুদ্রাবাচক শব্দগুলি মুসলমানের। মুসলমান রাজত্বে হিন্দুগণ মর্য্যাদাসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইতেন; এইগুলি এই ক্ষণ অনেক স্থলে কৌলিক উপাধিস্বরূপ হইয়াছে এবং উহার ব্যবহার খাটি বাঙ্গালা শব্দের ন্যায়। আমরা কয়েকটি মাত্র নির্দ্দেশ করিতেছি, যথা— তহবিলদার, হাবিলদার, সরকার, মজুমদার, রায়, তরফদার প্রভৃতি।

অতঃপর আমরা আর এক দিক দিয়া দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অনেক শব্দ পার্সি হইতে আসিয়াছি। হিন্দু স্বভাবতঃ সাত্বিকভাবাপন্ন; রাজসিকতাপূর্ণ বিলাসামোদী মুসলমানের প্রভাব যখন বঙ্গের ভাগ্যাকাশে নক্ষত্ররূপে উদিত হইল, তখন নবরশ্মির কিরণপাতে বঙ্গের প্রকৃতি এবং ভাষাও কিঞ্চিৎ রূপান্তর গ্রহণ করিল। বাদসাহ মুসলমানের সঙ্গে সঙ্গে বাদসাহী ভাব বঙ্গে প্রবেশ করিল এবং প্রকৃতির নগ্ন–সৌন্দর্য্য-প্রিয় হিন্দুর অন্তরে বিলাসাকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইল। তাই এইক্ষণ সরলতাপ্রিয় পল্লীবাসী হিন্দুর "সহরের" "দালান" "এমারাত" "ঝাড়" "ফানুসের" "বাহারে" "আজগবি" "মজাদার" "খেয়ালে" "সখ" জন্মিল। বস্তুতঃ মুসলমান প্রভাবে বিলাসিতাজ্ঞাপক বহুশব্দ পার্সি হইতে বঙ্গ ভাষায় স্থান অধিকার করিয়াছে; কিন্তু আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালার কথিত ভাষায় (colloquial language) পার্সি ভাষার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, রাজা–প্রজা হিসাবে সহাবস্থানহেতু মুসলমানের ভাষা হিন্দুর ভাষা কিরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। এইক্ষণ পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন, মুসলমান ও হিন্দু সমসত্ত্ববিশিষ্ট প্রতিবেশীরূপে বসবাসহেতু, হিন্দুর ভাষার কিরূপ

পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই হিসাবে দেখিতে পাই, অনেক পারিবারিক এবং সাধারণ ব্যবহারগত শব্দ পার্সি হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। এই অলক্ষিতভাবে অনুকরণলব্ধ শব্দরাশিই আমাদের বর্ত্তমান কথিত ভাষার প্রধান উপকরণ। ইহার বিশেষত্ব এই, ইহা বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যেই প্রচলিত। এই হেতু বলা যাইতে পারে, কথিত ভাষার উপর পার্সি ভাষার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেক শব্দ কথিত ভাষাতে ব্যবহৃত হয় এবং সাধাবণ সাহিত্যেও উহাদের যথেষ্ট প্রচলন। গরম, খালি, পরদা, তাজা, জামা, বাজার, বন্দুক, দৌলত, ইজ্জৎ, লাগাম, সাদা, রওনা, কলম, দাগ, চাকর প্রভৃতি অনেক পার্সি শব্দ আমরা কথিত ভাষায় ব্যবহার করি এবং লঘু সাহিত্যেও উহাদের প্রচুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

মোটামুটি একরূপ দেখা গেল যে, কত অসংখ্য শব্দরাশি পার্সি ভাষার অনুকরণে গঠিত হইয়া শীর্ণ বঙ্গভাষার কলেবর পরিপুষ্ট এবং সবল করিযাছে। পার্সি হইতে বঙ্গভাষা যে অতুলশব্দসম্পদ লাভ করিয়াছে, তাহা মুসলমানের সহিত বঙ্গভাষার সম্বন্ধ বিচারে চিরদিন অখণ্ডনীয় প্রমাণ থাকিবে। পার্সি ভাষার সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ মজ্জাগত সম্বন্ধ তাহা বুঝিবার আরও উপায় বিদ্যমান আছে। বাঙ্গালাতে আমরা অনেক মিশ্রশব্দের (hybrid) ব্যবহার দেখিতে পাই, যথা—চাকরাণী। "চাকর" পার্সি শব্দ, উহাতে সংস্কৃত "আণী" প্রত্যয় সংযোগ করিয়া, উভয় ভাষার অংশমিশ্রিত অভিনব "চাকরাণী" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মিশ্র শব্দগুলি হিন্দু মুসলমান উভয়ের ভাষাগত সম্মিলনের চমৎকার দৃষ্টান্ত। আমরা জানি প্রতিশব্দের (synonym) ব্যবহারে অনেক সময় বাক্যের জোর (Emphasis) বর্দ্ধিত হয়। একার্থবোধক দুইটি শব্দ একযোগে ব্যবহার করিলে, ভাব প্রকাশে ভাষার শক্তি বৃদ্ধি পায়। আমরা কোন একটি ভাবের বিশেষ ধারণা জন্মাইতে হইলে, সময় সময় একটি সংস্কৃত একটি পার্সি, এই সমার্থবাচক দুইটি শব্দ একত্র ব্যবহার করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়া লই। ইহার দৃষ্টান্ত যথা—ধন দৌলৎ, মান ইজ্জৎ প্রভৃতি। সংস্কৃত শব্দের সহিত সমার্থবোধক পার্সি শব্দের ব্যবহার বঙ্গভাষায় ক্ষীণ অঙ্গে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, পার্সি ভাষা যেরূপ একদিকে অসংখ্য শব্দরূপ মাংসপেশী যোজনা করিয়া বঙ্গভাষার শীর্ণ অঙ্গ সুদৃঢ় ও সুশোভন করিয়াছে, উহা আবার অপর দিকে তদ্রূপ বঙ্গভাষার ক্ষীণ শরীরে নূতন শক্তির সঞ্চার করিয়া উহাকে অধিকতর কার্য্যক্ষম করিয়াছে। আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সুধী সমাজ পরিতুষ্ট না হইতে পারেন, কিন্তু বোধহয় ইহা স্বীকার করিতে কাহারও অসম্মতি হইবে না যে, পার্সি ভাষার প্রভাব বর্ত্তমান বঙ্গভাষার অস্থি মজ্জাতে এতদূর অনুপ্রবিষ্ট যে, বঙ্গভাষাকে এইক্ষণ উহার সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইংরেজী ভাষার পাঠক জানেন, বর্ত্তমান ইংরেজী ভাষার অঙ্গ বিকাশেও এইরূপ একটি অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরেজী ভাষা মূল য়্যাঙ্‌লো-সেক্‌সন্ (Anglo-saxon) ভাষা হইতে উৎপন্ন হইলেও, উহা এইক্ষণ বহুভাষামিশ্রিত এক নূতন ভাষা হইয়াছে। নর্ম্ম্যান্‌বংশীয় রাজগণ যখন পুরুষানুক্রমে ইংলণ্ডে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, তখন নর্ম্ম্যান্ ভাষার সহিত পুরাতন ইংলণ্ডের ভাষা মিশ্রিত হইতে লাগিল এবং পরিশেষে নর্ম্ম্যান্‌দিগের ভাষার আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হইয়া, য়্যাঙ্‌লো-সেক্‌সন্‌দিগের ভাষা পরিবর্ত্তিত ইংরেজী ভাষার আকৃতি ধারণ করিল। বর্ত্তমান ইংরেজী ভাষার অবয়ব গঠনে যেরূপ

রাজপ্রভাবশীল নর্ম্ম্যান্‌দিগের ভাষা বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, তদ্রূপ বর্ত্তমান বঙ্গ ভাষার শরীর-নির্ম্মাণে বাদসাহ্ মুসলমানের পার্সিভাষা প্রচুর সাহায্য করিয়াছে। বর্ত্তমান ইংরেজী ভাষার উপর নর্ম্ম্যান্ ভাষার প্রভাব যেরূপ অবিচ্ছিন্ন, বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার উপর মুসলমান ভাষার প্রভাবও অবিকল তদ্রূপ।

আমরা এই পর্য্যন্ত ভাষার অন্তর্নিহিত উপাদান এবং শক্তির আলোচনা করিয়া বঙ্গভাষার সহিত মুসলমানের সম্বন্ধ বিচার করিয়াছি। আমরা সম্প্রতি দেখিব, মুসলমানগণ কিরূপ গ্রন্থরচনাদিদ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি বিধান করিয়া বঙ্গভাষার উপর মুসলমানের চিরস্থায়ী অধিকার সংস্থাপন করিয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় সুহৃদ, বাঙ্গালা ভাষার গৌরব-বর্দ্ধক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের রচিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক শিক্ষিত বাঙ্গালীর অবশ্য পাঠ্য অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা এই ক্ষেত্রে অনেক অজানিত তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি।

বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তা জানেন, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বঙ্গদেশে এক সাহিত্য-যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই বৈষ্ণবযুগে অগণিত পদকর্ত্তাগণ পদরচনাদ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গ বিস্তার করিয়াছেন। এই কবিবৃন্দের মধ্যে আমাদের সৌভাগ্যে একাদশটি উৎকৃষ্ট মুসলমান কবি আসন লাভ করিয়াছেন। এই কবিগণের নাম—আকবর আলী, কবির, কমরালী, নসিরমামুদ, ফকিরহবিব, ফতন, সালবেগ, সেখ জালাল, সেখ ভিক, সেখ লাল, সৈয়দ মর্ত্তুজা। এই একাদশ মুসলমান বৈষ্ণব কবি ললিতপদ রচনাদ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য-রমণীর প্রতি সন্তানোচিত মাতৃভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এইক্ষণ দেখা যাক, মুসলমানের উৎসাহে কিরূপ বঙ্গ-সাহিত্যের একজন অতি প্রসিদ্ধ উৎসাহবর্দ্ধক ; তাঁহার উৎসাহ-আনুকূল্যে বহু বঙ্গ-সন্তান মনোরম গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সমতাযোগ্য না হইলেও, সম্রাট হুসেনসাহও বঙ্গ-সাহিত্যের উৎসাহদাতা বলিয়া অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সম্রাট হোসেনসাহ ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌবদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যে হুসেনসাহের উৎসাহ কিরূপ ফলোৎপাদক হইয়াছে এবং তাঁহার নিকট বঙ্গ-সাহিত্য কিরূপ ঋণী, তৎসম্বন্ধে আমরা দীনেশ বাবুর কয়েকটি কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। "কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীধর নন্দীর মহাভারত পরোক্ষভাবে সম্রাট হুসেনসাহেরই উৎসাহের ফল, বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ ও বহু সংখ্যক বৈষ্ণব গ্রন্থে হুসেন সাহের যশ ও কীর্ত্তি বর্ণিত আছে। তিনি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও হিন্দুদিগের প্রতি উদার ও বঙ্গভাষার উৎসাহবর্দ্ধক বলিয়া গণ্য ছিলেন। এই সম্রাটের নামানুসারে গৌড়ীর যুগের মধ্যে এক খণ্ডযুগ চিহ্নিত করিয়া তাহাকে হুসেনী সাহিত্যের কাল আখ্যা দান করা অনুচিত হইবে না।"* পাঠক দেখিবেন, মুসলমানগণ কেবল লিখিয়া সাহিত্যের উন্নতি করিয়াছেন এমত নহে, পরন্তু রাজকীয় আশ্রয় প্রদানে বঙ্গবাসীকে সাহিত্য-প্রয়াসে উৎসাহিত্য করিয়াছেন এবং বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২১৮ পৃষ্ঠা।

এইক্ষণ আমরা আর এক ভাবে মুসলমানের সহিত বঙ্গ-সাহিত্যের অভেদ-সম্পর্ক নির্দ্দেশ করিব। কৃষ্ণচন্দ্র যুগের সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যের ছায়া পরিস্ফুট লক্ষিত হয়। উদ্দাম প্রেম-কল্পনা, নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ, বনিতা-বিলাস-বর্ণনা প্রভৃতি মুসলমান সাহিত্যের বিশেষ পরিচায়ক চিহ্ন ; এই সকল ভাব ভারতচন্দ্রাদির গ্রন্থে প্রবেশ করিয়া উহার রুচিতে এক প্রকার বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে। এই বিশেষত্ব বঙ্গ-সাহিত্যের উপর মুসলমান সাহিত্যের প্রভাবের সুস্পষ্ট পরিচয়। এই সময়ে বঙ্গদেশে পার্সি শিক্ষার বহুল প্রচার ছিল এবং বঙ্গ-লেখকগণ সংস্কৃত পার্সি উভয় ভাষাতে পাণ্ডিত্য লাভ করিতেন। বঙ্গ-সাহিত্যকে মুসলমানের স্পর্শহীন করিতে হইলে, তৎপূর্ব্বে আমাদের ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতিকে বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিতে হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্রাদিকে বাদ দিলে বঙ্গ-সাহিত্যের রহিল কি? সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের মূলে মুসলমানের সম্বন্ধ চিরকালের তরে অচ্ছেদ্য অভেদ্যরূপে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, উহার উচ্ছেদ অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে আমরা এই যুগের একটী অতি প্রসিদ্ধ মুসলমান কবির উল্লেখ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কবি আলোয়াল অনুমান ১৬১৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; ইনি কয়েকখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মহদুপকার করিয়াছেন। আলোয়াল "ছয়ফুলমুল্লুক," "বদিউজ্জমাল," "লোরচন্দ্রানী," "সতী ময়না" ও নেজামি গজনবীর "হস্তপয়করের" বঙ্গানুবাদ রচনা করিয়াছে ; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বোত্তম কীর্ত্তি "পদ্মাবতী কাব্য"। এই কাব্যে কবি আলোয়াল পার্সি এবং সংস্কৃত উভয় ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়াছেন। পদ্মাবতী পাঠ করিলে মনে হয়, উহা সাহিত্য, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার বিবিধ অধিকারে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এক অসামান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের বিরচিত গ্রন্থ। পদ্মাবতী যেরূপ এক দিকে সংস্কৃত জ্ঞানের অমোঘ নিদর্শন, তদ্রূপ অপর পক্ষে উহাতে আবার পার্সি সাহিত্যের রমণীয় ছটা স্পষ্ট প্রতিভাত। কৃষ্ণচন্দ্রযুগের সাহিত্যে পার্সি সাহিত্যের যে প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় আলোয়ালের পদ্মাবতীতে উহার প্রবর্ত্তনা সূচিত। দীনেশ বাবু বলেন "এইকাব্য কৃষ্ণচন্দ্র রাজার বহু পূর্ব্বে রচিত হইলেও ইহাতে এই যুগের মুখ্য চিহ্নগুলি বিদ্যমান ; সুতরাং কবিকে কৃষ্ণচন্দ্র যুগের পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে, আমরা এজন্য পদ্মাবতী প্রসঙ্গ দ্বারা কাব্যশাখার মুখবন্ধ করিতেছি।"* মুসলমান কবির পন্থানুবর্ত্তনে বঙ্গসাহিত্যে এক যুগ সৃষ্টি হইয়াছে৺ কবি আলোয়ালের পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে এবং এই একমাত্র ঘটনায় বঙ্গসাহিত্যের উপর মুসলমান অধিকারের সামান্য সাক্ষ্য প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য রচনায় মুসলমানের ইহাই শেষ চেষ্টা নহে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কমলাকান্ত, রাম বসু প্রভৃতি গীত রচকগণ গীতি রচনা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। এই গীতিকবি শ্রেণীর মধ্যে আমরা দুইটী প্রসিদ্ধ মুসলমান গীত রচক দেখিতে পাই। মৃজা হুসেন আলি ও সৈয়দ জাফর খাঁ, এই দুই মুসলমান কবি উৎকৃষ্ট গীতি রচনা দ্বারা তাঁহাদের সমকালবর্ত্তী হিন্দু ভ্রাতাদিগের ন্যায় বঙ্গ সাহিত্যদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছেন।*

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৫৪১ পৃ.।
* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৫৯৭ পৃ.।

আমরা সংক্ষেপে দেখিতে পাইলাম, বঙ্গ সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে বিভিন্নক্ষেত্রে হিন্দুর ন্যায় মুসলমানগণও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, মাতৃকল্পা বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় সম্রাট হুসেন সাহও বঙ্গের তদানিন্তন লেখকবৃন্দকে উৎসাহ ও আশ্রয় প্রদান করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের চমৎকার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। আরও দেখিতেছি, পার্সি সাহিত্য ভারতচন্দ্রীয় সাহিত্যে চিরস্থিতিশীল প্রভাব বিস্তার করিয়া, বঙ্গ সাহিত্যের সহিত মুসলমানের সম্পর্ক চিরকালের নিমিত্ত বদ্ধমূল করিয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচনা করিলে নিঃসংশয়িতরূপে স্থিরীকৃত হয় যে, বঙ্গ সাহিত্য ও মুসলমান উভয়েতে অভেদাত্মক সম্বন্ধ। আমরা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষার অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, বঙ্গ ভাষার বিকাশ অনেক পরিমাণে পার্সি ভাষার সহায়তার উপর নির্ভর করিয়াছে। অতএব বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হিন্দুমাতার গর্ভে উৎপন্ন হইলেও বহুকাল মুসলমানের আশ্রয়ে অবস্থান ও পরিপুষ্ট হেতু, বর্ত্তমান সময়ে উহা উভয়ের অধিকার চিহ্নিত এক নূতন বস্তু। আজকাল বঙ্গভাষা বা বঙ্গ সাহিত্য বলিলে উহা একমাত্র হিন্দু বাঙ্গালীর অধিকৃত বস্তু বুঝায় না, বাস্তবিক হিন্দু মুসলমান সমগ্র বাঙ্গালীর সাধারণ সম্পত্তি বুঝায়। বাঙ্গালী যেরূপ সাধারণ সংজ্ঞা, এই সাধারণ সংজ্ঞা দুইটী শাখার মনোহর মিলন নির্দ্দেশ করে, তাহা হিন্দু ও মুসলমান। বাঙ্গালী যেরূপ বঙ্গদেশবাসী হিন্দু মুসলমান উভয়ের বংশপদ্ধতিসূচক সাধারণ নাম, বাঙ্গালা ভাষা তদ্রূপ বঙ্গদেশবাসী হিন্দু মুসলমান উভয়ের মাতৃভাষাজ্ঞাপক সাধারণ নাম। বাঙ্গালী বলিলে যেরূপ হিন্দু মুসলমানের পৃথকত্ব নির্দ্দেশ হয় না, উভয়ের সংহতি সূচিত হয় ; বাঙ্গালা ভাষা বলিলে তদ্রূপ হিন্দু মুসলমানের স্বতন্ত্রাধিকারের জ্ঞাপন হয় না, উভয়ের ভাষাগত সমমাতৃকত্ব অনুমিত হয়। তাই বলা যায়, এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা ভাষা—উভয়ই—হিন্দু মুসলমান উভয়ের একত্ব জ্ঞাপক এবং উভয়েরই উৎকর্ষ ও সমুন্নতি উভয়ের মিলিত সাধনায়ত্ত।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুপ্ত

সুরমা, ঔদ্বাহিক অর্ব্বাচীনতা

আকবর ও আওরঙ্গজেব[১]
(ঐতিহাসিক আলোচনা)

আকবর ও আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে অনেকের অনেক ধারণা আছে। কেহ বলেন আকবর বড়, কেহ বলেন আওরঙ্গজেব বড। আমরা প্রথম আকবরের কথাই বলিব।

ধূমকেতুধর্ম্মী কোহিনুর পত্রিকায় একবার 'অতীত ইতিহাসে মুসলমান বিচারক' নামধেয় আমার একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে আওরঙ্গজেবের সম্বন্ধে কয়েকটী অপ্রিয় কিন্তু সত্য কথা লিখিয়াছিলাম। মিহির ও সুধাকরের সম্পাদক সাহেব তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন 'এমন লেখক মুসলমান সমাজ হইতে যত শীঘ্র তিরোহিত হয় ততই মঙ্গল।' যে পত্রিকায় ইহা লিখা হইয়াছিল, সে পত্রিকা আমি দেখিনাই কিন্তু বহুদিন পরে জনৈক পূজনীয় সাহিত্য সেবকের নিকট তাহা শুনিয়াছি। স্বাধীন চিন্তা ও আলোচনা যদি দোষাবহ বিবেচিত হয়, তবে আমার কোন উত্তর নাই। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদঘাটন না করিয়া কেবল অন্ধবিশ্বাসের বলে যাঁহারা গোড়ামির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা কস্মিনকালেও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন। আকবরেরও দোষ ছিল, আওরঙ্গজেবের ও দোষ ছিল। কেবল আকবরও ভাল ছিলেন না, কেবল আওরঙ্গজেবও ভালছিলেন না। ইতিহাস পাঠ করিয়া তাহার সারাংশ উদ্ধার করিতে পারিলে ইহাই প্রমাণিত হয়। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। লেখক।

আকবর মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃ স্থাপয়িতা ও সুদৃঢ়কর্ত্তা। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে পাঠানপক্ষীয় হিন্দু সেনাপতি হিমু বক্কালকে পরাভূত করিয়া আকবর স্বীয় পৈত্রিকরাজ্য কণ্টকশূন্য করেন। তিনি রাজপুত রাজন্যবর্গের সহিত কোথাও সখ্যসূত্রে কোথাও কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং উত্তর ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র মুসলমান রীতিনীতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুবহুল হিন্দুস্থানে মোস্লেম শক্তি চির-প্রবল করিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রকৃত রাজধর্ম্ম পালনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামতি আকবর। জগতের ইতিহাসে অনেক বিজিত ও বিজেতৃ জাতির সম্বন্ধ পরিচয় বিদ্যমান আছে, কিন্তু কোথাও আকবরের 'সমদর্শী' নীতির তুলনা নাই। সকল জাতীয় প্রজাকে তিনি সমানভাবে দেখিতে, তাঁহার নিকটে হিন্দু মোস্লেমে ভেদ ছিল না। তাইত আজ বহু যুগান্তরের পরও আকবরের কথা উঠিলে সকলের হৃদয় ভক্তিপ্লুত হইয়া যায়। আকবর আদর্শ সম্রাট, অ্যালফ্রেড বলুন, অশোক বলুন, ফ্রেডরিক বলুন, যত The great আছেন, তিনি সকলের উপরে। কারণ তাঁহাদিগকে আকবরের ন্যায় বহু বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মাবলম্বির উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে হয় নাই, আকববের মত সমস্যায় পড়িতে হয় নাই।

আকবরের রাজ্যশাসন শ্রেষ্ঠকল্পের হইলেও তাঁহার ধর্ম্মমত এস্লাম ধর্ম্ম সম্মত ছিল না। ফায়েজী ও আবুল ফজল, প্রতিভাশালী ভ্রাতৃযুগল, তাঁহাকে তাঁহার পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম হইতে দূরে টানিয়া নিয়াছিলেন। বাবর একদিন আসন্ন বিপদের সময়ে কোরাণ স্পর্শ করিযা আব মদ্য পান কবিবেন না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা কখনও ভঙ্গ করেন নাই। হুমায়ুন প্রতিদিন নিযমিতরূপে উপাসনা করিতেন। ইঁহারা উভয়েই হিন্দুস্থানের শাহান্শাহ্ ছিলেন। কিন্তু আকবরের জীবনের এই অংশ তাঁহার কোনও নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমত ছিল না। মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি এস্লামের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই। সত্য বটে তিনি একটী ধম্ম সভা স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বধর্ম্মানুরক্তির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরং তাঁহাব রাজত্ব সময়ে এস্লাম ধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়াছিল।

আকবরের হৃদয়ে নানকশাহের ন্যায় কোনও প্রবল মত স্থান পাইয়াছিল। হয়ত তিনি গুরু নানকেরই মত সমগ্র ভারতবর্ষকে এক ধর্ম্মাক্রান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারই সংসাধন মানসে প্রলুব্ধ হইয়া তিনি ফায়েজী ও আবুল ফজলের সহায়ে 'দীন এলাহী' অথবা 'তৌহিদে এলাহী' মত প্রচার করেন। হিন্দু ও মুসলমানকে সম্মিলিত করিবার আশাতেই তাঁহার এই চেষ্টা। তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। ফায়েজী, আবুল ফজল ও বীরবল ব্যতীত আর কেহ সে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। একবার রাজা ভগবান দাসের পুত্র জয়সিংহকে এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনার সহিত সম্মিলিত হওয়া যদি জীবন উৎসর্গ করা বুঝায়, তাহা হইলে পূর্ব্বেই আমি তাহার নিদর্শন প্রদান করিয়াছি, বলিতে পারি। কিন্তু আমি হিন্দুরূপে জন্মিয়াছি, আপনার রাজশ্রী হয়ত আমাকে মুসলমান করিতে ইচ্ছা করেন না। এই দুই ধর্ম্ম ছাড়া আমি অন্য কোনও তৃতীয় ধর্ম্মের খবর রাখি না !"

আকবরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই 'দীন এলাহী' ও মৃত্যুকবলিত হয়। কথিত আছে, মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে নাস্তিকতা পরিহার পূর্ব্বক, আকবর পুনঃ এস্লাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি এস্লামে খুব আস্থাবান্ ছিলেন। তাঁহার মধ্য জীবনেই সমস্ত গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয় ! জীবন-সন্ধ্যায় তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই

বোধহয়, কিন্তু তখন আর নূতন কার্য্য আরম্ভ করিয়া নূতন পথে চলিবার সময় ও অবসর ছিল না!

আওরঙ্গজেব আকবরের তুল্য প্রতিভাশালী নৃপতি ছিলেন। বীরত্বে, বুদ্ধি ও বিবেচনায় তিনি। তাঁহার প্রপিতামহ হইতে কোনও অংশে হীন ছিলেন না। বিলাসিতায় আলমগিরের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটত্রয় বিখ্যাত ; কিন্তু বসন-ভূষণে, কি আহার বিহারে আওরঙ্গজেবের ন্যায় পরিমিতাচারী সম্রাট জগতে বিরল। তিনি স্বকীয় উপার্জ্জন দ্বারা নিজের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন, সাম্রাজ্যের আয়লব্ধ এক কপর্দ্দকও তজ্জন্য গ্রহণ করিতেন না! তিনি বিচারে বিচক্ষণ, রণক্ষেত্রে দুদ্ধর্ষ সেনাপতি, রাজনীতির চর্চ্চায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এস্লাম ধর্ম্ম তাঁহার সহায়ে নববলে বলীয়ান হইয়াছিল। সহস্রাধিক মৌলবী ও মাওলানার সাহায্যে তিনি "ফতওয়ায়ে আলমগিরি" নামক সুপ্রসিদ্ধ ধমর্ম্মগ্রন্থের প্রণয়ন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তিনি এস্লামের উন্নতি সম্পাদনকেই স্বীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য মনে করিতেন। প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমানের সম্রাট হইয়াও ঠিক সেই ভাবেই চলিতেন। এই সমুদয় বিষয়ে তিনি আকবর হইতেও শ্রেষ্ঠ। আকবরের মধ্যে চবিত্রগত দু একটু দোষ ছিল, কিন্তু আওরঙ্গজেব এই বিষয়ে তিনি আকবর হইতেও শ্রেষ্ঠ। আকববের মধ্যে চরিত্রগত দু একটু দোষ ছিল, কিন্তু আওরঙ্গজেব এই বিষয়ে নিষ্কলঙ্ক। তাঁহাব চরিত্র মেঘলেশহীন মধ্যগগনস্থিত সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর। তাহা হইলেও আকবরে যাহা ছিল আওরঙ্গজেবে তাহা ছিল না। আকবব পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া, স্বীয় ভ্রাতাকে কাবুলের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করিয়াছিলেন। সহোদর একবার বিদ্রোহী হইলে, তিনি তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন না ; কিন্তু ক্ষমা·করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব রাজ্যলাভাকাঙ্ক্ষায় তদ্বিপরীত কার্য্যই কবিয়াছিলেন, হইতে পারে দারা খৃষ্টান, শুজা বীর হইয়াও অপরিণামদর্শী এবং মোরাদ সুরাসক্ত ছিলেন, তথাপিও তাঁহাদিগকে নৃশংসের ন্যায় বধ করা স্নেহ-ধর্ম্মের অনুশাসন নহে ; তিনি ইচ্ছা কবিল অন্য শাস্তি ব্যবস্থা করিতে পারিতেন।

প্রিয়দর্শী অশোক তাঁহার সপ্তদশ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াও শেষোক্ত জীবনের কার্য্যদ্বাবা যশস্বী হইয়াছিলেন। যেই নীতির বলে আমরা অশোকেব দোষ বিস্মৃত হই, সেই নীতির বলে আওরঙ্গজেবকে ক্ষমা করিলেও তাঁহার আর একটি কলঙ্কের কথা ভুলিতে পারি না! আওরঙ্গজেব তাঁহার পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া তিল তিল করিয়া তাঁহার জীবন হরণ করিয়াছিলেন। পুত্রের নিকটে পিতা সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছিলেন। ভ্রাতৃত্রয়কে বিনাশের পর সিংহাসনাধিকারের পথে তাঁহার আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, তথাপিও তিনি রাজ্য কাড়িয়া লইয়া পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কাবাগাব কারাগারই বটে, তাহাতে নানাবিধ সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত থাকিলেও তাহা স্বাধীন জীবনের সুখের তুলনায় কিছুই নহে। বিশেষতঃ সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যের যিনি অতুল প্রতাপান্বিত সম্রাট ছিলেন, তাঁহার পক্ষে কারাগার যম-যন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণাদায়ক ছিল।

আওরঙ্গজেব তাঁহার সুবিশাল সাম্রাজ্যের সমুদয় প্রজাকে একভাবে দেখিতেন না। তাহাতে এক কুফল ফলিয়াছিল। সংখ্যায় বহুল হিন্দুগণ মুসলমানদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। জিজিয়ার পুনঃপ্রচলন আওরঙ্গজেব জীবনের আর একটী কলঙ্ক। যে রাজপুত রাজন্যবর্গ যুদ্ধক্ষেত্রে মোগল সম্রাটদের প্রধান সহায় ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করিয়া সাম্রাজ্যের শক্তি দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি নিজ পুত্রকেও বিশ্বাস করিতেন

না। এই অবিশ্বাসই মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংশের প্রধান কারণ। পুত্রগণ পিতার নিকট হইতে দৃষ্টান্তর্গত কোনও শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না। যদি রাজপুত রাজগণ তাঁহার প্রতি ভক্তিমান থাকিতেন, পুত্রগণ তাঁহারই স্নেহে সিঞ্চিত হইয়া সর্ব্বস্থানে তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যের পঞ্চবিংশবর্ষব্যাপী সমর অল্পকাল মধ্যেই শেষ হইত এবং 'পার্ব্বত্য মুষিকের' উদীয়মানদল বলদর্পিত হইয়া, মোগল সাম্রাজ্যের আমূল আলোড়ন করিতে পারিত না। দাক্ষিণাত্যের সমর তিনি আহাম্মদনগর, বিজাপুর এবং গোলকণ্ডার শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিয়াছিলেন। শিয়াদিগকে তিনি কাফের (অবিশ্বাসী) বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ইহা তাঁহার জীবনের আর একটী ভুল!

এই সমুদয় সুদীর্ঘকালস্থায়ী সমরে রাজ্যের কত অর্থ অপব্যয়িত হইয়াছে, কত উন্নতির সুযোগ তিরোহিত হইয়াছে। আওরঙ্গজেব শেষ জীবনে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট পত্রাবলি। এই সকল পত্র মূল বা ভাষান্তরিত অবস্থায় যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই আমাদের মতের সমর্থন করিবেন।

একবার রাজকুমার মহম্মদ আজম দ্রুতবেগে শকট চালনা করাতে তাঁহার ছত্রধারীর অকস্মাৎ পতন হয় এবং তাহাতেই মৃত্যু ঘটে। এই দুর্ঘটনার কথা শ্রবণ কবিয়া আওবঙ্গজেব পুত্রকে লিখিয়াছিলেন,—

'আহেস্তা খেরাম্ বল্‌কে মখেরাম্,
রেক্বদমাত্ হাজার জ্বানাস্ত।'

ধীরে চল, নতুবা একেবারেই চলিও না, কাবণ তোমার পায়ের নীচে সহস্র জীবন রহিয়াছে।

অন্যত্র—
'ক্বদিমানে খোদ্‌রা বে আফ্‌জায়ে ক্বদর
কে হরগেজ নিয়াযেদ জে পব ওয়ারদাহ্ গদব।'

তোমার প্রাচীন ভৃত্যদিগেব সম্মান বৃদ্ধি কর, কারণ প্রতিপালিতজন কখনও বিশ্বাস হন্তারক হয় না।

পুনঃ—'আজাব ও গোনাহ্ হরচে করদম্,
হুম্‌রায়ে আঁ বখোদ মিবোরাম।'

আমি যে সব অত্যাচার এবং পাপ করিয়াছি, তাহাদের ফল নিজ সঙ্গে বহন করয়িা নিতেছি।

জীবনের শেষমুহূর্ত্তে অনুতপ্ত হৃদয়ের এই সব দীর্ঘনিঃশ্বাস কখনই কৃত্রিম হইতে পারেনা। অশীতিবর্ষব্যাপী সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধজ্ঞানে আওরঙ্গজেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা করিতে পারেন নাই, তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে! তাই তাঁহার হৃদয় হইতে গৈরিকনিঃস্রাবের ন্যায় এই সব বাক্যাবলী নির্গত হইয়াছিল!

আকবর এস্লাম ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে জাতিরূপে (as a nation) বড় করিতে চাহিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব চাহিয়াছিলেন এস্লাম ধর্ম্মকে বড় করিতে। কেহই জাতি এবং ধর্ম্ম উভয়কে বড় করিতে চাহেন নাই। কিন্তু দেখিতে হইবে ধর্ম্ম আগে, না জাতি আগে। আগে জাতির প্রতিষ্ঠা

তৎপরে ধর্ম্মের স্থাপনা। জাতি বড় হইলে ধর্ম্ম আপনিই বড় হইবে। যেমন আগে ভাষার উৎপত্তি তৎপরে তাহাকে সংযত এবং বলশালিনী করিবার জন্য ব্যাকরণের জন্ম, সেইরূপ মানবসমাজেও প্রথম জাতির উৎপত্তি তৎপরে ধর্ম্মের জন্ম। ধর্ম্ম জাতীয় শক্তিকে বৃদ্ধির পথে টানিয়া নেয়। তখন ভারতবর্ষে যদি মুসলমান জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্মের বিস্তারের দিকে মন দেওয়া যাইত। তাহা হইলে মুসলমানদের এত শীঘ্র পতন হইত না।

আকবরের ধর্ম্মমত শূন্যবাদ কি অন্য কিছুর উপর স্থাপিত হইলেও তিনি ভারতবর্ষীয় মুসলমান জাতিকে সংখ্যায় ও শক্তিতে বড় করিতে চাহিয়াছিলেন। এতদুদ্দেশে তিনি কেবল কার্য্য আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা জাহাঙ্গির বা শাহ্‌জাহাঁর ছিল না। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্রাট আকবরের প্রতিভা ও শক্তি লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবই আকবরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তিনি সেই উত্তরাধিকারিত্বের অবমাননা করিযাছিলেন। তিনি যদি আকবরের ত্রুটি সংশোধন করিয়া ধর্ম্ম ও জাতি উভয়কে বড় করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে ভারতবষের শাসনদণ্ড এত শীঘ্র মোগল সম্রাটদের হস্তচ্যুত হইত না!

মুসলমান জাতি এবং ধর্ম্ম একত্রে উভয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইলেই আওরঙ্গজেবকে সমদর্শী নীতির অনুসরণ করিতে হইত। যে নীতি অবলম্বন করাতে আকবর জগতের শ্রেষ্ঠ সম্রাটপদাভিষিক্ত, তিনি সেই শুভনীতির অনুগামী হইয়া কার্য্য করিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যরূপ হইয়া যাইত! সমদর্শী নীতি এস্লামের অননুমোদিত নহে। যাঁহারা মহাপুরুষ মহম্মদের পবিত্রজীবনী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই এ বিষয়ের সমর্থন করিবেন।

আকবরের ধর্ম্ম জীবনে এস্লামের প্রভাব পরিলক্ষিত না হইলেও তিনি সাম্রাজ্যের পরিচালনে পরোক্ষভাবে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন, তাই তিনি ভারতবর্ষীয় সম্রাটদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে আমরা আর একজন পাঠান সম্রাটের নামোল্লেখ করিতে পারি। শেরশাহ্ কেবলমাত্র পঞ্চমবর্ষব্যাপী রাজত্বে যে সমুদয় মহৎ কার্য্যের সূচনা এবং সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান রাজত্বের গৌরব। কালঞ্জরের অবরোধ সময়ে তাঁহার মৃত্যু না ঘটিলে হয়ত তিনি ভারতবর্ষের আরও বহু উন্নতি বিধান করিতে পারিতেন।

আকবর কি আওরঙ্গজেব উভয়েই নিজ সাম্রাজ্যের শক্তি ও সীমা বৃদ্ধি করিতে অধিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহই প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য শেরশাহের ন্যায় যত্ন করেন নাই। তবে কথা এই, আকবর জিজিয়া প্রভৃতি কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করিয়া রাজ্যের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাই হিন্দুগণ এখনও তাঁহার নাম ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন। আওরঙ্গজেব কেবল মুসলমানেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্বজাতির প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসায় আওরঙ্গজেব বরেণ্য। তাঁহার মত স্বজাতি প্রেমিক এবং স্বধর্ম্মে আস্থাবান সম্রাট ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকালস্থায়ী মুসলমান রাজত্বে আর কেহ ছিলেন না। এই হিসাবে মুসলমানের নিকট আওরঙ্গজেব বড়। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিবাসী কেবল মুসলমান নহে, হিন্দুও বটে। এই দুই জাতির প্রতি যে সম্রাট সমানভাবে দেখিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাকেই বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে হিন্দু, মুসলমানের যে অবস্থা এই অবস্থার সঙ্গে তদানিন্তন অবস্থার কোনও সামঞ্জস্য ছিল না। মুসলমান তখন বিজেতা, হিন্দু তখন বিজিত। বিজিতের প্রতি বিজেতার সদয় ব্যবহারই আকবরের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভের প্রধান কারণ। বিশেষতঃ অধীনস্থ প্রজার প্রতি উদার ব্যবহার না করিলে রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্পাদিত হয় না।

আমরা আকবর ও আওরঙ্গজেবের জীবনী আলোচনা করিয়া এই বুঝিতে পারিয়াছি, আকবর বড়, সম্রাটরূপে। আওরঙ্গজেব বড়, ব্যক্তিগতভাবে। আমাদের স্বজাতীয় ভ্রাতাদের মধ্যে অনেকেই আকবরকে আওরঙ্গজেব হইতে সর্ব্ব বিষয়ে হীন মনে করেন, ইহা সমীচীন নহে। একজনের প্রাপ্য সম্মান আর একজনের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া গোঁড়ামিরই নামান্তর মাত্র। আকবরও আমাদের, আওরঙ্গজেবও আমাদের, কেহই আমাদের পর নন। আকবর ও আওরঙ্গজেব উভয়েই ভক্তির পাত্র। আকবরের ভুল সংশোধন করিবার শক্তি কেবলমাত্র আওরঙ্গজেবের ছিল এবং তিনি তাহা করেন নাই বলিয়াই তাঁহার বিরুদ্ধে এত কথা উত্থাপিত হয়।

ভরসা করি, আমরা আকবর ও আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, পাঠকবর্গ তাহা একটু মনোযোগের সহিত আলোচনা করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রী সৈয়দ এমদাদ আলী।[১০৪]

উৎসব ও ভারতবাসী, দেবকুমার রায় : সিদ্ধি [কবিতা], রমণী মোহন ঘোষ : হেমন্তগীতি [কবিতা], বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত : মদিরের পথে [ঐ]

১ম ভাগ, ৭ম সংখ্যা, পৌষ ১৩০৯

মানসকুমার রায় চৌধুরী : প্রার্থনা [কবিতা], দেবকুমার রায় চৌধুরী : প্রতিহিংসা [ঐ], হৃদয় ও বুদ্ধি, হরানন্দ সেন : নেপোলিয়ন কি দুইজন ছিলেন, অনুকূলচল চন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থ : একটি প্রশ্ন, ধম্মানন্দ মহাভারতী—

মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ

প্রথম প্রস্তাব

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় অধিকার ও ইউরোপীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, রাজনৈতিক আলোচনা একেবারেই ছিলনা, একথা বলা যায় না, কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক আলোচনার প্রকৃতি অন্য প্রকার ছিল ; এখন যাহা কণ্ঠের বক্তৃতায় কিম্বা হংসপুচ্ছের পরিচালনায় সহজে সম্পাদিত হয়না, তখন তাহা তীর, ধণু লাঠি ও তরবারীর ব্যবহারে সম্পাদিত হইত। তখনকার আন্দোলন "কার্য্যের" এবং এখনকার আন্দোলন "মুখের" বলিয়া পরিগণিত। বর্ত্তমানকালের পাশ্চাত্য প্রথার রাজনৈতিক আন্দোলন, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বোধহয়, সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—তিনিই এই আন্দোলনের জন্মদাতা। ইনি সর্ব্ব প্রথমে ইংলণ্ডে গমন করিয়া একজন মুসলমান নরপতির পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক ইউরোপীয় সমাজে এবং বৃটীশ পালামেণ্টে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তাহার পরে বাবু রামগোপাল সূত্রপাত করেন। তাহার পরে বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মহানুভবেরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে কর্ষণ করিয়া উন্নতির বীজ রোপণ করিয়াছিলেন ; ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ইহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃষক। কলিকাতা বোম্বাই ও অযোধ্যার রাজনৈতিক সভার সুযোগ্য সভ্য মহাশয়গণ এই ক্ষেত্রে জলসিঞ্চন করিয়া ইহার প্রভূত উপকার সাধন করেন ; কিন্তু তখনও পুষ্পোদ্যান বা কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় নাই। প্রস্তাব শীর্ষোক্ত মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বত্তমান ভাবতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষক এবং সর্ব্ব প্রধান সহায়ক, এই অভিনব ক্ষেত্র হইতে যে সকল অতিসুন্দর এবং অতি সুখকর ফল, মূল, শস্য, শাক, সব্জি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, বাবু সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহ, উদ্যম, কার্য্যকারিণী শক্তি এবং অনবরত পরিশ্রম ও যত্নের তাহা গৌরবাত্মক নিদশন। ভারতীয় রাজনীতির অনুব্বর ক্ষেত্রে এমন অপূব্ব কৃষক এবং অসাধারণ সামর্থ্যসম্পন্ন মালীকে আবিভূত হইতে ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখা যায় নাই। এই মহানুভব পুরুষের জীবনী নানা অপূর্ব্ব বিবরণ মালায় পরিপূর্ণ। এ সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত ভারত-সুহৃদের পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, সৎশিক্ষা, পরিশ্রমপরায়ণতা, দেশ হিতৈষিতা শারীরিক সামর্থ্য, মানসিক শক্তি, উৎসাহ, উদ্দীপনা প্রভৃতি যে কোনও গুণ লইয়াই আলোচনা করি, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যাই এবং নানা কারণে ইহার অমূল্য জীবনের শত সহস্র দৃষ্টান্তকে অনুকরণ করিতে ইচ্ছা হয়। ইনি আমাদের দুঃখিনী ভারত মাতার অন্যতম সুসন্তান ; ইনি আমাদের দেশের গৌরব এবং ভারতে বৃটীশ শিক্ষা, বৃটীশ সভ্যতাও বৃটীশ শাসনের ইনি অত্যাশ্চর্য্য সুফল স্বরূপ। স্পষ্ট কথায় বলিতে হইলে, বর্ত্তমান ভারতে ইঁহার সমকক্ষ পুরুষের সংখ্যা অতি অল্প ; প্রখ্যাতিতে ইঁনি বোধহয় সর্ব্বপ্রধান ; এতদ্দেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে ইঁনি অদ্বিতীয় ; সমস্ত সুসভ্য জগতে ইঁনি এক্ষণে সুপরিচিত এবং ভারতের প্রত্যেক স্থানেই সুরেন্দ্রনাথের নাম আজিকালি গার্হস্থ্য শব্দ বলিয়া গণ্য। বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই মহাপুরুষের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

কলিকাতা নগরীর তালতলার পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ, ডাক্তার বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাননীয় সুরেন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন। দুর্গাচরণ ঐ বাবুর জীবিতাবস্থায়

দুর্গাচরণের মত ডাক্তার, কিম্বা হাকিম্ এদেশে ছিলনা বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। তিনি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহার এতাদৃশ পারদর্শিতা ছিল যে লোকে তাঁহাকে ধন্বন্তরি অথবা দেবানুগৃহীত পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিত। যে সকল দুশ্চিকিৎস্য এবং মারাত্মক ব্যাধিকে বড় বড় দিগ্বিজয়ী ডাক্তার, কবিরাজ ও হাকিমেরা আশাশূন্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়[১০৫] তাহা অতি সহজে এবং অতি স্বল্প সময়ে আরোগ্য করিয়া দিতেন। কালিকাতার ডভটন কলেজে সুরেন্দ্রনাথ লেখাপড়া শিখিয়া বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৮ অব্দে সিবিল সার্ব্বিশ পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ড গমন করেন। লাটিন ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করায় ইংরাজি ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল। তাঁহার সহপাঠী সুবিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত[১০৬], বিহারীলাল গুপ্ত[১০৭] এবং আনন্দরাম বড়ুয়ার সহিত ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সিবিল সার্ব্বিশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকতায় আসিবার পথে আলাহাবাদ নগরীতে বাবু নীলকমল মিত্র মহাশয়ের বাটীতে ইহাঁদের অভ্যর্থনা–সভায় সুরেন্দ্র বাবু সর্ব্ব প্রথম ইংরাজি ভাষায় সাধারণ সমীপে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই প্রাথমিক বক্তৃতা তাঁহার ভবিষ্যতের অতুলনীয় বাগ্মিতার সুস্পষ্ট নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ভারতে পুনরাগমন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়েন কিন্তু অল্পকাল মধ্যে কোনও মোকর্দ্দমাবশতঃ তাঁহার পদচ্যুতি হয় এবং ঐ মোকর্দ্দমার আপীল করিবার জন্য তিনি পুনরায় বিলাতে গমন করেন। আপীল না মঞ্জুর হওয়ায়, হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার করিবার জন্য তিনি আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু পেনেলে সাহেবের আবেদনের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথেরও আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাঁহাকে যাবজ্জীবনের জন্য মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছিলেন, কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা করিতে অসম্মত হয়েন, এই টাকা তিনি অদ্যাপি গ্রহণ করেন নাই। মাজিষ্ট্রেটী পদে বাহাল থাকিলে সুরেন্দ্রনাথ বোধহয় এতদিনে হাইকোর্টের জজ হইতে পারিতেন অথবা কমিশনারের কার্য্য করিতেন, কিন্তু তাঁহার পদচ্যুতি আমাদের দরিদ্র–ভারতের কল্যাণকর বলিয়াই বিবেচেনা করি। যে সকল ভারতবাসীকে আমরা "সিবিলিয়ান" হইতে দেখিয়াছি, ইহাঁদের মধ্যে রমেশ বাবু ভিন্ন, প্রায় আর সকলকে কেবল সুন্দরী সহধর্ম্মিণীর মূল্যবান্ অলঙ্কার নির্ম্মাণ, উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ, সম্পত্তি খরিদ, সুভোজ্য আহার এবং অর্থসঞ্চয় প্রভৃতি ভিন্ন অন্যকর্ম্ম করিতে দেখি নাই ; দেশের বা সমাজের উন্নতির সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক অতীব দূরবর্ত্তী এবং স্বজাতীয় প্রেমও তাঁহাদের হৃদয়ে অতি অল্প, সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতিকে আমাদের মঙ্গলের কারণ বলিয়াই আমরা বিবেচনা করি। এক সময়ে মিষ্টার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বাঙ্গলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি বিহীন ছিলেন, কিন্তু পদচ্যুতির জন্যই এখন সেই "বিদেশীয় ও বিজাতীয় সুরেন্দ্র" প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক এবং প্রকৃত ভারতসুহৃদ্। কর্ম্মচ্যুত হইয়া সুরেন্দ্র বাবু, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, এই স্থানেই তাঁহার প্রখ্যাতি গৌরব, মহিমা এবং ভুবন বিখ্যাত যশের সূত্রপাত হয়! পাইয়নিয়র পত্রের লেখক লিখিয়াছেন—

"It was at this juncture that Mr. Banerjee turned his attention to that sphere (of politics) in which he was destined to attain the proudest position ever attained by any of his countrymen, and the highest laurels that it is possible for one who serves his country unselfishly and devotedly to aspire to."

অর্থাভাব বশতঃ সুরেন্দ্রনাথ বাবু এই সময়ে অল্পদিনের জন্য ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনের ইংরেজী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েন ; তদন্তর অনরেবল কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদিত হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিতে থাকেন ; কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত ফ্রিচর্চ্চ কলেজের অধ্যাপকতা করেন, এবং তদন্তর অন্যান্য দুই একটি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি প্রকৃষ্টরূপে রাজনৈতিক আন্দোলন জন্য সুপ্রসিদ্ধ "ভারত সভা"র[০৮] প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে দিনে সভার প্রতিষ্ঠা হয় সেই দিনে তাহার শিশুপুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথ তাহাতে অণুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া সভার কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। এই সময়ে এবং ইহার পূর্ব্বে বহুসংখ্যক বিরাট সভায় তাঁহার অপূর্ব্ব বক্তৃতা শ্রবণ এবং বহুসংখ্যক সমাচার পত্রে তাঁহার লেখনী প্রসূত রচনাবলী পাঠ করিয়া ভারতবাসী জনগণ বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ; সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছিলেন "সুরেন্দ্রনাথ পরিণামে একজন অসাধারণ দিগ্বিজয়ী পুরুষ বলিয়া সফল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় ; সুরেন্দ্রনাথেরও ভাগ্যলক্ষ্মী খুব প্রসন্না হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। একজন সুলেখক লিখিয়াছেন—

"Amongst those who may fitly be called the leaders of the India today, there is no one who is held in higher respect for his ability and eloquence and who is regarded more rightly as an interpreter of the feelings and sentiments of the educated portion of his country men than Mr. S. N. Banerjee. For more than a quarter of a century he has been one of the trusted political leaders of his countrymen and has voiced forth their grievances their aspirations and their gratitude for what England has already done for their country, with a happiness and felicity of language that has commanded the respect and the admiration of friends and foes alike. He is now the chiefest exponent of our school of political thought ; he now occupies, in fulness of time, the most commanding position. His life has been a life of high aims and of incessant hard work, he now lives to reap a rich harvest due to the results of his early labours. He now sees a generation of his countrymen growing around him in every part of India who respect and revere his name and are filled with high aspirations for their own advancement as a nation that he had been the first to implant into the young Indian Mind."

যাহাতে প্রকৃষ্টরূপে রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত হয়—যাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ দেশে রাজনৈতিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়—যাহাতে মুখে ও লেখনীতে শিক্ষার সূত্রপাত হয়—যাহাতে মুখে ও লেখনীতে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘোরঘটা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য বাবু সুরেন্দ্রনাথ "ভারত সভা" স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে, বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "বেঙ্গলি" নামক সমাচার পত্র ও মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া লইয়া তাহাই নিজে সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই "বেঙ্গলি" প্রথমে সাপ্তাহিক এবং এক্ষণে প্রাত্যহিকপত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। নানা কারণে ইউরোপ, আসিয়া ও আমেরিকায় "বেঙ্গলি" সুপরিচিত, ইহা ভারতবর্ষীয় ইংরাজ রাজপুরুষদিগের নিত্যপাঠ্য সম্বাদপত্র এবং এ দেশের সর্ব্বত্র ইহা সাগ্রহে পঠিত হয়। ভারতবর্ষে, দেশীয় সমাচার পত্রাবলীর মধ্যে বেঙ্গলি প্রথম শ্রেণীভুক্ত।

ইংরেজী ১৮৮৩ অব্দে সুরেন্দ্রনাথের জীবনে এক বিষম দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। এই দুর্ঘটনায় ভারতবর্ষবাসীদিগের প্রতি ইউরোপীয় রাজপুরুষদিগের আচরণ এবং স্বদেশ হিতৈষী মহানুভবদিগের প্রতি দেশীয়দিগের কর্ত্তব্য ও মনের প্রকৃতি আমরা কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। "ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন" নামে একখানি সাপ্তাহিক ইংরেজী সমাচার পত্র ঐ সময়ে একজন এতদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্রাহ্মের দ্বারা সম্পাদিত হইত, ইহাতে কলিকাতার বড় বাজারের এক হিন্দুবিগ্রহ ও তাহার মন্দির সম্পর্কীয় একটি সম্বাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথ তাহাই স্ব-সম্পাদিত "বেঙ্গলি" পত্রে উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ পূর্ব্বক দেখাইয়াছিলেন যে, ইউরোপীয় রাজপুরুষেরা এই ঘটনায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অযথা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ এবং অন্যান্য জজেরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক সুরেন্দ্রনাথের নামে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন, হাইকোর্টে ঐ মোকর্দ্দমার বিচার হয় এবং বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র ভিন্ন সকলেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অপরাধী ও দণ্ডযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করতঃ মিষ্টর জষ্টিশ নরিশ সাহেবের এজলাষে মোকদ্দমার বিচার হইবার জন্য হুকুম দেন। নরিশ সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে দুই মাসের জন্য দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ রাখিবার আদেশ প্রদান করেন। এই মোকদ্দমার বিচারের সময় হাইকোর্টে যেরূপ জনতা হইয়াছিল, ভারতবর্ষে বৃটীশ আদালতে ইতিপূর্ব্বে আর কোনও মোকদ্দমায় এরূপ জনতা হয় নাই। বলা বাহুল্য, কলিকাতার যুবকেরা এবং বিশেষতঃ স্কুল ও কলেজের বিদ্যার্থীবৃন্দ এই সময়ে রাজপুরুষদিগকে এবং হাইকোর্টের বিচারপতিদিগকে নানা কারণে অত্যন্ত বিরক্ত, ভীত ও অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, কেহ কেহ লাঠি, ইষ্টক, প্রস্তর প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া হাইকোর্টের জানালাদি ভগ্ন করিবার উপক্রম করিয়াছিল। জষ্টিশ নরিশের চৌরঙ্গীর বাসাবাটীতে ডাকে দুইটা পার্শেল পৌঁছিয়াছিল ; বিচারপতি নরিশ তাহা খুলিয়া দেখেন, ইহাদের একটার মধ্যে প্রায় দ্বাদশটা জীবিত বৃশ্চিক এবং আর একটাতে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সর্প অর্দ্ধমৃতাবস্থায় অবস্থিত ! ! যাহা হউক, সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসে সমস্ত ভারতবর্ষে যেরূপ মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, সর্ব্বত্র যে প্রকার অসংখ্যাসংখ্য বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায় নাই। তিনি জেলে গিয়া কষ্ট ভোগ করেন নাই, তাঁহার সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতার জন্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। আত্মীয় ও বান্ধবেরা জেলে গিয়া সতত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং অতি সম্মানের সহিত রাজপুরুষেরা সুরেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি দুই মাস পরে জেল হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলে, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য নানা স্থানে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল ; পাছে অসংখ্য লোকের সমাবেশে মহা ধুমধাম উপস্থিত হয়, এজন্য রাজকর্ম্মচারিগণ রাত্রি প্রভাত না হইতে সুরেন্দ্রনাথকে জেল হইতে অতি গোপনে অশ্বযানে বসাইয়া দিয়া বাহির করিয়া দেন। ঐ বৎসর গবর্ণমেণ্টের শাসন বিভাগের রিপোর্ট পাঠ করিয়া দেখিয়াছিলাম প্রত্যেক বিভাগের কমিশনর এবং প্রত্যেক জেলার কালেক্টর সাহেবেরা সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস এবং কারামুক্তি লইয়া যে সকল মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, কেবল তাহারই বর্ণনায় আড্‌মিনিষ্ট্রেশন রিপোর্ট পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। আলিগড়ের নবাব

সার সৈয়দ আমেদ সাহেব বাহাদুরও নীরবে থাকিতে সমর্থ হয়েন নাই, তিনিও সুরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক বিরাট সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

কারাগার হইতে মুক্ত হইবার কিয়ৎকাল পরে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, সুদূর পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে গমন করেন। আলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ পাইয়নিয়র নামক ভুবন বিখ্যাত ইংরেজিপত্র সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—

"When Surendra Nath came out of prison, his personal popularity stood at its highest and he became the idol of his educated countrymen. His personal troubles served furthei to cement and deepen the ties of Indian unity and fostered those feelings of brotherhood and comradeship between the Multitudinous classes and races of the Indian population that it had been his great aim to engender. He continued his work assiduously on the same lines and his lecturing tour in upper India excited so much interest and enthusiasm amongst all classes that his progress from city to city assumed the character of a triumphal procession." স্বদেশ প্রেমে, স্বজাতি বাৎসল্যে এবং সত্যের জয় ঘোষণায় যাঁহারা উদ্দীপ্ত হন, তাঁহাদের সম্মান সর্ব্বত্র, ইহা ধ্রুব সত্য।

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ স্কুল এক্ষণে কলেজে পরিণত হইয়া "রিপণ কলেজ" নামে প্রখ্যাত ; ইহার অনেকগুলি শাখা আছে। এই কলেজ তাঁহার অমরকীর্ত্তি। ১৮৯০ অব্দে সুরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, তাহার ন্যায় সুস্থকায় ও বলবান ব্যক্তিদিগের মধ্যে পীড়া প্রায়ই দেখা যায় না, কিন্তু তিনি পীড়িত হইয়াও ঐ বৎসর রুগ্ন শরীরে কলিকাতার কংগ্রেশে উপস্থিত ছিলেন। পীড়া আরোগ্য হইলে, নিজের অর্থ ব্যয়ে, ইংলণ্ড গমন করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যে মহা মহা শিক্ষিত পুরুষপুঙ্গবপুঞ্জ বিশিষ্টরূপে মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। বড় বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এবং রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ অবাক্ হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। ফিন্‌স্‌বরীর (Finsbury) নগরেব এক বক্তৃতা উপলক্ষ করিয়া বিলাতের এক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র লিখিয়াছিলেন—

"Surendra Nath's speech was most magnificent, He electrified his le[a]rned hearers by close reasoning. by the appropi iate language in which he clothed his ideas, and by the spirit which breathed in his utterances, Experienced speakers in and out of Pai liament find in Mr. Banerjee a good deal which recalled the sonorous thunders of a William Pitt, the dialectical skill of a Fox, the rich freshness of illustiation of a Burke, and the keen wit of a Sheridan." টন্‌টন্ নগরেব বক্তৃতা উপলক্ষে সমরসেট এক্সপ্রেস্ লিখিয়াছিলেন—

"When we heard Mr. Banerjee, we were surprised, startled and electrified. The English was pure, the pronunication perfect, the rhetoric a pattern of style and ability and the address as a whole one that well deserved the applause with which it was greeted,"

সাহস করিয়া বলা যায়, ইউরোপে কোনও বাঙ্গালীর এ পর্য্যন্ত এরূপ প্রশংসা হয় নাই। বাবু লালমোহন ঘোষ অথবা বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়দিগের বাগ্মিতা সম্বন্ধেও এতাদৃশ প্রশংসা আমরা শ্রবণ করি নাই।

ইং ১৮৯৩ অব্দে সুরেন্দ্র বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন। ইহাঁর বহুদর্শন এবং কার্য্যকারিতাগুণে গবর্ণমেণ্ট এবম্প্রকার সন্তোষ লাভ করেন যে, একবার লেপ্‌টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুর নিজের চেষ্টায় ইহাঁকে মেম্বরী পদে নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত করিয়া দেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করিয়া "য়োয়েল্‌বি কমিশনে" ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে সাক্ষ্য দান কবেন।

বর্ত্তমান বৎসরে সুরেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম প্রায় ৫৬ বৎসর, কিন্তু উৎসাহ, উদ্দীপনা, পরিশ্রমপরায়ণতা, শারীরিক সামর্থ্য, মানসিক তেজ, কার্য্যকারিণী শক্তি প্রভৃতিগুণে তিনি এখনও নবীন যুবার ন্যায় পরিগণিত। একটি কলেজ এবং তিনটি স্কুলের তিনি স্বত্বাধিকারী ও অধ্যাপক ; একখানি প্রথম শ্রেণীর প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের তিনি সম্পাদক ও প্রধান লেখক ; একটি রাজনৈতিক সভার তিনি পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক ; বত্রিশটি সমিতির তিনি সভ্য ; নর্থ বারাকপুর প্রথম শ্রেণীর অনারেরী মাজিষ্ট্রেট ; কলিকাতার অনারেরী প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ; দুইটি মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ; কংগ্রেশের প্রাণের প্রাণ—তদ্ভিন্ন এত অসংখ্য প্রয়োজনীয় কার্য্য তাঁহার হস্তে সতত ন্যস্ত থাকে যে, নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশও তাঁহার থাকে না ; তিনি চব্বিশ ঘণ্টাই ঘোরতর পরিশ্রমী এবং ঘোরতর ব্যস্ত। তাঁহার শরীরে যেমন প্রভূত সামর্থ্য, মনেও তেমনি অসাধারণ তেজ। সুরেন্দ্রনাথের যত অধিক বয়স হইতেছে, ততই তিনি ঈশ্বর পরায়ণ হইতেছেন ; হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস আছে ; শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভগবদগীতার নীতিতে তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থা দেখা যায়। গত ডিসেম্বর মাসের আমেদাবাদ কংগ্রেশে তিনি বলিয়াছেন "কর্ম্মই ধর্ম্ম" ; বাস্তবিক সাধুজনোচিত কর্ম্ম অর্থাৎ দেশের, সমাজের, স্বজাতির, স্বধর্ম্মের এবং সমগ্র জীবের প্রতি আমাদের যে গুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাই সম্পাদন করা পরম ধর্ম্ম এবং তাহা হইলেই ঈশ্বরের অনুজ্ঞা পালন করা হয়। সুরেন্দ্র বাবু উপরোক্ত বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

"We draw our strength and inspiration from those ever-living fountains which flow from the footsteps of the throne of the Supreme. The divinely inspired Srikrishna, in his memorable admonition to Arjuna on the battle-field of Koorokshetra, said Karma is Dharma, which means, good deeds constitute religion. Is there a holier dharma, a nobler religion, a diviner mandate than that which enjoins that our most sacred duty which has a pramouncy over all others, is the duty which we owe to the land of our birth." স্বদেশ প্রেমী সুরেন্দ্রনাথের শ্রীমুখ এই ভগবদুক্তি আরও সুন্দর, আরও মনোহর।

সুরেন্দ্রনাথের পিতা যেমন বড় লোক ছিলেন, তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ও একজন ধনবান্, ধার্ম্মিক ও দেশমান্য লোক ছিলেন। ইহাঁর শ্বশুরের নাম বাবু ভবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। ইনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সস্ত্রীক "তুলা" ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক প্রচুর মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন, ইহাঁরই একমাত্র কন্যা শ্রমতী চণ্ডীকুমারী দেবী সুরেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী। সুরেন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রমতী সুশীলার সহিত (ময়মনসিংহের বর্ত্তমান সিবিল সার্জ্জন) ডাক্তার সার্জ্জন মেজর উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হয়। প্রায় ২৫ বৎসর হইতে সুরেন্দ্র বাবু বারাকপুরের নিকট মণিরামপুরে গঙ্গাতটে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তথা হইতে প্রতিদিন কলিকাতায় আগমন করিয়া থাকেন। তাঁহাব পিতা দুর্গাচরণ বাবুর শারীরিক সামর্থ্য যথেষ্ট ছিল, সুরেন্দ্রনাথের সহোদর (ব্যারিষ্টার) জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শারীরিক শক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। দুর্গাচরণ ঘোরতর পরিশ্রম করিতে পারিতেন, সুরেন্দ্রনাথে সেই অসাধারণগুণ প্রবেশ করিয়াছে। সমস্ত দিবস তিনি অসংখ্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, রাত্রি তিনটার সময় কার্য্য আরম্ভ করেন এবং তৎপর দিবস সায়াহ্নের পর পর্য্যন্ত কর্ম্মের শেষ হইয়া উঠে না।

এ দেশে প্রজা সাধারণকে লইয়া সভা করিবার (Mass Meetings) প্রথা সুরেন্দ্রনাথই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তারকেশ্বর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থলের বিরাট মাশ্‌মিটিং তাঁহার উৎসাহ ও ক্ষমতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের সম্পাদকবর্গের একত্র সমাবেশ এবং সংবাদপত্র সমিতির তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। লর্ড লিটনের দেশীয় সমাচারপত্র বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা টাউনহলে যে আশ্চর্য্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বাগ্মিতার অসাধারণ দৃষ্টান্ত। এ দেশে কন্‌ফারেন্সের বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা। সুরেন্দ্রনাথের অনেক অমরকীর্ত্তি আছে, কিন্তু আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল কংগ্রেশ সম্বন্ধে দুই চারি কথা কহিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি না করিয়া অথবা অকারণে কূট তর্ক উত্থাপন না করিয়া সংক্ষেপে বলিয়া রাখি, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেশ নামক জাতীয় মহাসমিতির সুরেন্দ্রনাথ কেবল প্রাণের প্রাণ স্বরূপ নহেন, ইনিই ইহাঁর প্রকৃত জন্মদাতা। এই কংগ্রেশ এক অপূর্ব্ব সম্মিলন। কলিতে ইহা রাজসূয় অথবা অশ্বমেধ তুল্য অদ্ভুত রাজনৈতিক যজ্ঞ, ইহা সমগ্র ভারতবাসীর অত্যাশ্চর্য্য বিরাট সমিতি। কংগ্রেশ হইতে ভারতবাসী মহা উপকার সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সম্প্রতি আমেদাবাদে ইহার অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ এবারে ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, পুণানগরীর সমিতিতেও তিনি আর একবার সভাপতির সম্মানিত পদে অভিষিক্ত হয়েন। আমেদাবাদে প্রায় এক লক্ষ লোক সম্মিলিত হইয়া মহাসম্মান সহকারে ইহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, কলেজের গ্রাডুয়েটগণ ইহার অশ্বশকট বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ভারতবাসী এতদিনে স্বদেশ প্রেমীর সম্মান করিতে শিখিয়াছে দেখিয়া মনে মনে আশা হয়,—হতভাগ্য ভারতবর্ষে জাতীয় ভাবের বুঝি পুনরুদ্দীপন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ এখন সর্ব্বত্র সম্মানিত ; কেশবচন্দ্র সেন অপেক্ষাও তাঁহার নাম এক্ষণে অধিকতর পরিচিত এবং তিনি সকল স্থানেই অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এদেশে শিক্ষিত লোকেরা শিক্ষিত লোকেরই সম্মান করিত, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী ও প্রজা সাধারণ সকলের নিকটই সম্মানিত। প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষী ও স্বজাতি প্রেমীর সম্মান কোথায় নাই?

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বহুবর্ষের চেষ্টায় আমরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, সংক্ষেপে নিম্নে কতকগুলি অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। ১। ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণের নববিধি অনুসারে নির্ব্বাচন, ২। মিউনিসিপালিটির উন্নতি, ৩। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নূতন আইন, ৪। সম্বাদপত্রের নিষ্ঠুর আইনের লোপ, ৫। সমাচারপত্র সমিতির সৃষ্টি, ৬। ভারত সভার প্রতিষ্ঠা, ৭। প্রজা সাধারণ মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞানের উদ্দীপনা, ৮। মাশ্‌মিটিং, ৯। প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স, ১০। কংগ্রেস. ১১। "বেঙ্গলি" সম্বাদপত্র, ১২। সায়ত্বশাসন, ১৩। রিপন কলেজ, ১৪। সিবিল সার্ব্বিশের বয়স হ্রাস, ১৫। শিক্ষার উন্নতি, ১৬। একতা, ১৭। জাতীয় ভাব ও স্বদেশ প্রেম, ১৮। পুলিশ কমিশন, ১৯। পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রভৃতি।

বাবু সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলনে এ দেশে এক নবজীবন সঞ্চার হইয়াছে, এ দেশে এক নবসম্প্রদায়ের মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক গুণের মধ্যে তাঁহার স্বদেশ প্রেম এবং স্বজাতি বাৎসল্য গুণের আমরা সমধিক প্রশংসা করি এবং সেই মহাগুণের জন্যই আমরা তাঁহার শত দোষকে ভুলিয়া যাই। এই দেবোপম মহাপবিত্র গুণ অনুকরণের যোগ্য। স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্য যাঁহারা দেহ, মন ও প্রাণ সমর্পণ করেন, তাঁহারা চিরকালই আমাদের পূজার যোগ্য। স্বদেশীয় বা স্বজাতীয় উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। আমেদাবাদ কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁহার মহা-তেজোময়ী বক্তৃতায় "The mission of the Congress" এবং "A desponding view of the situation" সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। স্থানাভাব বশতঃ আমি তাঁহার অমৃতময়ী কথাগুলি এস্থলে উদ্ধৃত করিতে অসমর্থ হইলাম। একটী মাত্র কথা উদ্ধৃত না করিয়া স্থির থাকিতে পারি না, এই মহাপুরুষ বলিয়াছেন—

"In seasons of doubt and despair when darkness thickens upon us, when the journey before us seems to be long and weary and the soul sinks under the accumulating pressure of adverse circumstances, may we not then turn for inspiration and guidance to those great teachers of our race—those masterspirits—who, with their hearts aglow with the divine enthusiasm, triumphed over the failing spirit, faced disappointment and persecution with the serenity of a higher faith and lived to witness the complete realization of their ideals? The responsibilities of the present, the hopes of the future, the glories of the past ought all to inspire us with the noblest enthusiasm to serve our country. Is there a land more worthy of service and sacrifice? Where is a land more interesting, more venerated in antiquity, more rich in historic traditions, in the wealth of religions, ethical and spiritual conceptions which have left an enduring impress on the civilization of mankind? ইত্যাদি।

বস্তুতঃ, যে সকল মহানুভব সাধু পুরুষ যে সকল দেবানুগৃহীত মহাপুরুষপুঙ্গবপুঞ্জ ইহজীবনে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিতে করিতে, পবিত্রভাবে

জীবন যাপন করিয়া ভগবানের মধুর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক, এই নশ্বর ধরাধাম পরিত্যাগ করতঃ পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিলাইয়া দেন, তাঁহারা মৃন্ময় মর্ত্তধামের সামান্য জীব নহেন—তাঁহারা সুবর্ণময় সুখকর স্বর্গের অমর দেবতা।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

ভারতী—শ্রমতী সরলা দেবী সম্পাদিত[১০৯]
(পৌষ—২৬ ভাগ, ৯ম সংখ্যা !)

যথাসময়ে প্রচার 'ভারতীর' বিশেষত্ব। বাঙ্গলা 'মাসিকে'র অনিয়মিত প্রচাররূপ কলঙ্কক্ষালন করিয়া, বিদুষী সম্পাদিকা যশস্বিনী হইযাছেন। সাহিত্য জগতে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিভিন্ন ভাষা হইতে 'নাটক' 'নভেলঃ 'কবিতা' 'প্রবন্ধ' ইত্যাদি ভাষান্তরিত করিয়া, বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিতেছেন। অসার 'মৌলিকতার' প্রতি অস্বাভাবিক আসক্তিনিবন্ধনই বঙ্গভাষা এত দীনা। জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর অনুবাদগুলি বেশ স্বাভাবিক ; 'কর্ত্তব্য সাধনকর' নাটিকা ফরাসী ভাযা হইতে ভাষান্তরিত ও রূপান্তবিত।

"সাহেব জাতির কুটুম্ব বাৎসল্য" প্রবন্ধটি প্রচলিত-রাজনীতির কচ্‌কচি। সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায়ই এপ্রকার প্রবন্ধ শোভা পায়। 'মাসিকে' রাজনীতির আলোচনা করিলে একটু সাধারণভাবে তাহার মূল তত্ত্বগুলির পর্য্যালোচনা করাই সঙ্গত। 'সুন্দরীর' সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমত৷ আমাদিগের নাই। সম্পাদিকার শোভানুভাবকতা অবশ্য এক্ষেত্রে আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী। 'হিন্দুধর্ম্মের স্বাবলম্বননীতি' এবাবের বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার ভূযসী প্রশংসা শুনিতে পাই। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সে গৌরব অব্যাহত রহিয়াছে। দেশীয় শিল্পচর্চ্চা সম্বন্ধে ভাউনগবীয় অভিমত" ও 'জাপানে ভারতীয় ছাত্র' সময়োপযোগী প্রবন্ধ। 'ঢাকা ও ঢাকেশ্বরী' গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ, এপ্রকার প্রবন্ধে মাসিকের গৌরব বর্দ্ধিত হয়।

বঙ্গদর্শন--(অগ্রহায়ণ, ১৩০৯)

এই সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন', সম্পাদকের শোকোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। কবিবরের জীবনী লিখিবার সময় উপস্থিত হইলে, জীবনী লেখককে এই সংখ্যার বঙ্গদর্শনের অনুসন্ধান করিতে হইবে। চির-বিচ্ছেদে মিলনের কথা তত্ত্বজ্ঞানী গভীর প্রেমিক কবিবরের মুখেই শোভা পায়।

মিলন সম্পূর্ণ—আজি হল তোমাসনে
এ বিচ্ছেদ-বেদনার নিবিড় বন্ধনে !
এসেছ একান্ত কাছে, ছাড়ি' দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙি' অন্তরাল।
তোমারি নয়নে আজ হেরিতেছি সব
তোমারি বেদনা বিশ্বে করি অনুভব।

*　　*　　*　　*

আবার　আজ তুমি বিশ্বমাজে চলে গেলে যবে
বিশ্বমাঝে ডাক মোরে সে করুণ রবে !

*　　*　　*　　*

নিখিল নক্ষত্র হতে কিরণের রেখা
সীমন্তে আঁকিয়া দিক সিন্দুরের লেখা।

হীরেন্দ্র বাবুর 'অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত' কোটেসন্-বহুল, শাস্ত্র-বহুল, পাণ্ডিত্য-পরিপূর্ণ। কিন্তু কোন্ গভীরতত্ত্বের মীমাংসার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। হিন্দুধর্ম্ম মূর্ত্তামূর্ত্ত উভয়বিধ পূজারই ব্যবস্থা করিযাছে, সুতরাং এবম্বিধ আলোচনার আবশ্যকতা বুঝিতে পাবিলাম না। 'সার সত্যের আলোচনা', দ্বিজেন্দ্র বাবুরই শোভা পায়। শফরী-প্রকৃতি-সম্পন্ন, বাক্-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী, 'দর্শনের' দর্শনে ভীত হয়, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? এই আলোচনা দ্বারা দ্বিজেন্দ্র বাবু বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিতেছেন। 'পরনিন্দা'র নিন্দাবাদ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি, সমালোচনা অনেক স্থলেই 'পবনিন্দার' রূপান্তর। সমালোচনা সাহিত্যকে ও পরনিন্দা সংসারকে "বিকার হইতে রক্ষা করিতেছে।" 'পর-নিন্দা'র এই শুভ ফলোৎপাদনী শক্তি আছে বলিয়া ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্তি জন্মে। ইংরেজীতে যাহাকে private life বলে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা পরনিন্দার একটি বিশেষ কাজ, কিন্তু তাহা সমাজের পক্ষে কত হিতকর, তাহা সন্দেহের বিষয়। লোকের private life কে টানিয়া বাহির করা, ও তাহাকে অপবিত্র করা, অনেকের নিটক দূষনীয বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু লেখক তাহা মনে করেন না, সম্ভবতঃ Libel এর আইনটাকে তিনি পশন্দ করেন না। নিন্দুকের ততটা প্রশ্রয় হলে সমাজের বড়ই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে, বিদ্বেষমূলক 'নিন্দা ছাড়িয়া দিলে,' নিন্দুকের আর কিছুই কর্ত্তব্য থাকে না His occupation is gone. "স্বদেশভক্তি" পণ্ডিত চূড়ামণি স্পেন্সারের patriotism শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ মতিমান্ স্পেন্সারের শেষ গ্রন্থ "তথ্য ও ভাষ্য" নামধেয় সমগ্র পুস্তকখানি অনুবাদ করিয়া জ্যোতি বাবু বাঙ্গলার মহদুপকার সাধন করেন, এই আমাদের কামনা।[১১৩]

প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩০৯

চিত্র বাহুল্য ও কমনীয়তায়, "প্রবাসী" বাঙ্গলা মাসিকের শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছে। রামানন্দ বাবুর সৌন্দর্য্যানুরাগ প্রশংসনীয়। বহিঃ সম্পদে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রবাসী যে অন্তঃসার শূন্য তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। 'কুকী পুঞ্জী' কুকী জাতি সম্বন্ধীয় তথ্যে পূর্ণ। প্রকৃতি শিশু অসভ্য কুকী গাড়ো সাঁওতাল ভীল প্রভৃতি জাতি ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইলে, কৃত্রিমতাপূর্ণ সভ্যতা জগৎকে নিতান্তই কদাকার করিয়া তুলিবে। 'এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় সন্দেশ' মিঃ মহলানবিশের সুখ-স্মৃতি। ছাত্র জীবনে অধ্যাপক ব্লাকি, টেইট্ প্রভৃতির নিকটস্থ হওয়ার ন্যায় সুখের কথা কি হইতে পারে? 'প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চা' পাঠ করিতে করিতে প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। 'ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদে' 'পদ্মার' কবি প্রমথনাথ হৃদয়ের কি গভীর বেদনাই ব্যক্ত করিয়াছেন! হায়রে উপাধি! কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় :—

হা, মানি, সোহাগ মাখা পেয়েছ বাহাবা ফাঁকা;
ও যে নিদারুণ ব্যঙ্গ ওযে শুধু ভাণ।

হে কবিবর আমরা আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া ভারতীর ও ভারতেরই পূজা কর; শিরোপা পরিধান তোমার শোভা পায় না। 'আহেরিয়া' ও 'দাসনন্দিনী' ঐতিহাসিকতত্ত্বপূর্ণ। ডাক্তার বসুর 'বাবু ইংলিস' সম্বন্ধীয় জবাব না দিলেও চলিত, পরছিদ্রান্বেষণকারী এংলো ইণ্ডিয়ান লেখকদিগকে বেশ চিনি।

বান্ধব--(অগ্রহায়ণ, ১৩০৯)।

'কিশোর-গৌরাঙ্গ' ও বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিবে না, 'ছায়া-দর্শন' ও আমাদিগকে দর্শন দিতে বিরত হইবে না! গ্রন্থাকারে যাহা নিশ্চয়ই প্রকাশ হইবে, 'মাসিকে' তাহার প্রচার একটা সম্পাদকীয় চতুরতা। 'ছায়া-দর্শন' ইংরেজী থিওছপিকেল্ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত ও অনূদিত, ইহাতে না আছে গবেষণা না আছে চিন্তা। যাঁহারা 'ছায়া-দর্শনের' দর্শন জন্য উৎকণ্ঠিত, তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন। 'ব্রহ্মদেশের কাহিনী' ও 'গারো জাতির বিবরণ' জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। সুসঙ্গের মহারাজা, নাটোরের মহারাজা, ত্রিপুরার মহারাজা প্রভৃতি কমলার বর-পুত্রগণ যে রীতিমত বঙ্গ সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। 'প্রদাহি সুখ আর প্রশান্ত সুখে' সম্পাদকের সেই পূর্ব্ব রচনার কৌশল ও ভাষার ছটা পরিলক্ষিত হইল না। বক্তব্য বিষয়টি সামান্য হইলেও তাহাকে ফেনাইয়া শ্রুতিসুখকর ভাষায় ব্যক্ত করিতে খুব বাহাদুরী আছে; কিন্তু এবারে আমরা নিরাশ হইয়াছি।

১ম ভাগ, ৮ম-৯ম সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৯
চন্দ্রশেখর সেন : দান [প্রবন্ধ],

জ্ঞান-বারমাস

-----*-----

ষড় ঋতুর লীলাক্ষেত্র বাঙ্গালায় এক সময়, 'বারমাস্যা' নামধেয় সন্দর্ভগুলি বড়ই মুখরোচকছিল; তাহাতে আর সংশয় নাই। নচেৎ, বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যের পথে ঘাটে,—সর্ব্বত্রই এত 'বারমাস্যার' সাক্ষাৎকার লাভ হইবে কেন? কাল প্রভাবে শিক্ষিত সমাজের রুচি-পরিবর্ত্তনে এখন 'বারমাস্যা'গুলি পুরাতন পঞ্জিকার সামিল হইলেও, সাধারণ লোকে আজো উহাদের প্রতি প্রবল আসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলতঃ বঙ্গ সাহিত্যের প্রসারবর্দ্ধনে এককালে এই সকল বারমাস্যাও কম আনুকুল্য করে নাই।

প্রণয়ী হইতে প্রণয়িণীর একটু বিপ্রয়োগ বা তদাশঙ্কা ঘটিলেই অমনি 'বারমাস্যা'র অবতারণা, ইহা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিদ্যা, খুল্লনা ও বিষ্ণুপ্রিয়া 'বারমাস্যা'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর প্রায় সপ্তত্যধিক সন্দর্ভ আমাদের হস্তগত আছে। বিষয়ান্তরাবলম্বনেও যে বারমাস্যার প্রণয়ন ঘটিত না, তাহা নহে; তবে কিনা, তাহার সংখ্যা নিতান্ত সামান্য। অদ্য আমরা 'ভারত-সুহৃদে'র পাঠকবৃন্দকে আমাদের শেষোক্ত উক্তির প্রমাণ স্বরূপ শীর্ষোক্ত জ্ঞানগর্ভ সুন্দর প্রাচীন নিবন্ধটি উপহার দিতেছি।

ইহার প্রণেতা যদুনাথ সম্বন্ধে কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আমাদের প্রাপ্ত হস্তলিপিখানির লেখকের নিবাস চট্টগ্রাম—কধুরখীল গ্রামে। তদ্বারা কবিকে চট্টগ্রামবাসী অনুমান করিলে, বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না।

প্রাচীনকালে বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী বড়ই অদ্ভুত ছিল, একথা সকলেই জানেন। প্রাচীন সাহিত্যের এই ত্রুটী ধর্ত্তব্য নহে জানিয়াও, টীকাটিপ্পনীতে প্রবন্ধ কলেবর কণ্টকিত করিতে হয় বলিয়া, আমরা অনেক স্থানে বর্ণাশুদ্ধি-শোধন করিয়া দিলাম।

গত ১৩০৭ সালের 'পরিষৎ-পত্রিকা'র ৪র্থ সংখ্যায় মল্লিখিত 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' প্রবন্ধে ইহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। (২২শ সংখ্যক পুঁথির বিবরণ দ্রষ্টব্য)। এতাবৎকাল অপেক্ষা করিয়াও আমরা ইহার দ্বিতীয় প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তজ্জন্য ইহার স্থানে স্থানে কিছু কিছু ত্রুটী পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা।

সন্দর্ভটি গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথা লইয়া বিরচিত,—গুরুপদেশ ব্যতিরেকে সকলের বোধগম্য হওয়ার নহে। তাহা হইলেও, ইহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করা যায়। বিষয়টি এই :-

বৈশাখে বসন্তের বাও তরু মেলে পাত।
দুই ডালে ভর করে ত্রিজগতের নাথ॥
নানা পুষ্প ফল ধরে বায়ু করে গতি।
মহা সুখে কেলি করে ত্রিজগতের পতি॥ (১)
জ্যৈষ্ট মাসেত তিমির মন বাতি। (?)
তাহার উপরে আছে রাজ গজপতি॥
ত্রিপিণীর[১] ঘাট বৈসে দেখিতে সুন্দর।
কনক কমল মধ্যে গুঞ্জরে ভ্রম.....
আষাঢ়েতে আম ঢালে (ডালে?) আছেমনুরাএ[২]
অন্ত (?) কমলে থাকি নানা ভোগ খাএ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ তান সঙ্গে ধাএ।
নিদ্র কালে মনু (মনুরা?) গোপ্ত (গুপ্ত) ঘরে যাএ॥ ৩
শ্রাবণেতে শুনি অতি শ্রী কবিলাস।
নিত্য (নৃত্য?) শব্দ বাদ্য গীত নিত্য অবিলাস (অভিলাষ?)
আর কথ দূরে আছে শ্যাম বৃন্দাবন।
তাহাতে রহিছেন হরি পরম কারণ॥ ৪
ভাদ্রে ভরণ অতি শোভে পারিজাত।
প্রকাশিত রবি শশী দেখএ সাক্ষ্যাৎ॥
আর কথ দূরে আছে মহা বেদ বাণী।
এমন অমূল্য নিধি না শুনিলে শুনি (না দেখি না শুনি?) ৫
আশ্বিনেত আদ্যাশক্তি ভজ রূপে থাকি।

---

(১) ত্রিপিনী—ত্রিবেণী।
(২) মনুরা—আত্মা।

শরতের মধ্যে যেন ঘন ঘন ডাকি॥
হেমন্ত বসন্ত দুই তাহান সমুখে।(৩)
ফুলেস (?) কুসুম্ভ দিআ নিত্য নিত্য ডাকে॥ ৬
কার্ত্তিকে কালিন্দীর জল উথলিআ উঠে।
কৈলাশ পর্ব্বত আছে তাহান নিকটে॥
শিব শক্তি দুইজন তাহান সম্বিধান (?)।
গঙ্গা যমুনার জলে নিত্য করে স্নান॥ ৭
আগ্রাণেতে আজি মধ্যে আছে নিরঞ্জন।
কোটী কোটী চন্দ্র তথি(৪) করিছে শোভন॥
যুথি জাতি মালতী যে কস্তুরী ভূষণ।
অখিলের ব্রহ্মাণ্ড অতি সেই নিরঞ্জন(৫) ॥ ৮
পৌষে পরম বিষ্ণু সমাইর(৬) পালক।
পদ্মের তিলক যেন শতদল কমলেক (?)॥
সপ্ত সাগর যেন সপ্ত রঙ্গধারী।
জলমধ্যে শোভে যেন কুমুদের কলি॥ ৯
মাঘ মদত (মরুত?) বায়ু আইসে আর যাএ।
রাখি রাখি প্রাণনাথে মুরারি(৭) বাজাএ॥
আকইর সন (আকর্ষণ?) করি যদি রাখিবারে পারে।
মুক্তিপদ হএ তার অভিলাষ পূরে॥ ১০
ফাল্গুনে ফুটিল পুষ্প হৈল বিকশিত।
সত(৮) রজ তম তিন হৈল উপস্থিত॥
অষ্ট বর্ণ নবরঙ্গ হইল সঞএ (?)।
প্রকাশিত হৈআ উঠে চন্দ্র ওদএ (উদএ)॥ ১১
চৈত্রে চঞ্চল হর ব্রহ্মা নারায়ণ।
মন্দাকিনী জলে স্নান করে দেবগণ॥
যমুনা ঝগরা জলে (?) স্থাবর জঙ্গম।
প্রকাশিথ হৈআ আইসে নিদারুণ যম॥ ১২
যম না বোলিঅ তারে দেবের দেবরাজ।
যদুনাথে গাএ গীত গুরুর সমাজ॥
যেই গাএ যেই শুনে জ্ঞান বারমাস।

(৩) সমুখে—সম্মুখে।
(৪) তথি—তথায়।
(৫) এই চরণটি বোধ হয় এইরূপ ছিল :—'অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি সেই নিরঞ্জন।'
(৬) সমাইর—সকলের। 'সমাই' কি 'সমূহ' শব্দ জাত?
(৭) মুরারি—মুরলি।
(৮) সত—সত্ব (গুণ)।

পাপ ছাড়ে পুণ্য বাড়ে অন্তে স্বর্গ বাস॥ ২৬
"ইতি ঙ্গ্যান বারমাস সমাপ্তঃ। শ্রীরামচন্দ্র স্বকিঅ বহিঃ॥ ইতি সন ১১৭৯ মাঘ।"

শ্রী আবদুল করিম।

রজদুর্ল্লভ হাজরা : দক্ষিণ বাহিনী [প্রবন্ধ], পরেশনাথ সেন : বৈদিক সাহিত্য, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী : ইস্রাইলের ঈশ্বর,

সোণার তরী*

(সমালোচনা)।

রবীন্দ্রনাথের মানসীর সমালোচনায় বঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়াছিলেন, তিনি ইংরেজ কি ফরাসী কোন কবির একখানি গ্রন্থে এতগুলি সুন্দর কবিতার একত্র সমাবেশ, কখনও দেখেন নাই। রবীন্দ্রনাথের সহিত পাশ্চাত্য কবিদের তুলনায় সমালোচনার শক্তি বা অবসর প্রবন্ধ লেখকের নাই। তাঁহার কাব্য পাঠ করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, পাঠকগণের হৃদয়ে যদি তাহার ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিও জাগাইয়া তুলিতে পারি, তবে ধন্য হইব।

সোণার তরী আজ প্রায় দশ বৎসর প্রচারিত হইয়াছে। ইহার পব রবীন্দ্রনাথের কাব্য স্রোত, কত শতরূপ লীলা ভঙ্গে, কত মরুদ্দেশ সবস করিয়া, কত চন্দ্রমা বক্ষে আঁকিয়া, কত আলোকস্তম্ভ রচনা করিয়া এবং কত মায়াদ্বীপ সৃজন করিয়া সাগর সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যের এই ভবিষ্যদ্বিকাশের প্রথম আভাষ 'সোণার তরী'তে পাওয়া যায়। এই জন্যই আমি 'সোণার তরী'র এই ক্ষুদ্র সমালোচনা লইযা পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছি।

'কৈশোরক' হইতে 'মানসী' পর্য্যন্ত কবির কাব্য সাহিত্যে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছায়া সম্পাত আছে। এক হিসাবে ব্যক্তিত্বই কাব্য সাহিত্যের উপাদান। কারণ হৃদয় ছাড়া সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না! কিন্তু কবি যদি তাহার সৃজনশক্তি দ্বারা শুধু স্বীয় সুখ দুঃখই ফুটাইয়া তুলেন, তবে তাহা আমাদের হৃদয়ের কূলে আঘাত করিতে পারে এবং সহানুভূতি ও সমবেদনা দ্বারা তাহার প্রতিধ্বনিও আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হইতে পারে, কিন্তু জীবনের চরম আদর্শ তাহাব মধ্যে খুঁজিয়া পাই না।

কবি 'সোণার তরী'তে সেই ব্যক্তিত্বের সীমা রেখা অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত।

আবার বলিতেছেন :—

হৃদয় আমাব ক্রন্দন করে
মানব হৃদয়ে মিশিতে
নিখিলের সাথে মহারাজ পথে
চলিতে দিবস নিশীথে।

* ববিশালেব "সাহিত্য সমিতি"র এক বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

মানুষ যখন ক্ষুদ্র স্বার্থের কারা ভঙ্গ করিয়া স্বাধীন আলোক ও বাতাসের স্পর্শ অনুভব করে, তখন তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা স্বীয় ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ অতিক্রম করিয়া মহত্তর সিদ্ধির অনুসরণ করিতে অগ্রসর হয়। আমাদের কবি যখন মায়ামন্দির রচনা করিয়া আপন আত্মাকেই তথায় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারই মুখে চাহিয়াছিলেন :—

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।

তখন দেউলের দুয়ার খুলিয়া গেল এবং দেবতার করস্পর্শে হৃদয় অপরের জন্য জাগ্রত হইয়া উঠিল।

কবি এইরূপে উদ্বুদ্ধ হইযা আশাহত স্বদেশের জন্য আশার সংবাদ খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। এই আদর্শের অনুসরণই সমালোচ্য কাব্যখানির বিশেষত্ব। কবি আদর্শ খুঁজিতে যে তরীতে যাত্রা করিয়াছেন, তাহারই নামে কাব্যের নামকরণ হইয়াছে এবং এই আদর্শের অনুসরণকে "নিরুদ্দেশ যাত্রা" আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

সোণার তরী বিবিধ বিষয়ক কতগুলি কবিতার সমষ্টি। কিন্তু এই নিরুদ্দেশ যাত্রার বিশেষ ভাবটি কাব্যখানির মেরুদণ্ড। এইজন্য সর্ব্বাগ্রে আমি এই ভাবটি পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিব।

কাব্যখানির প্রথম কবিতাটির নাম 'সোনার তরী'। এক বর্ষাঘন প্রাতঃকালে কবিকে আমরা এক বিজন নদীকূলে শস্যক্ষেত্রে, শস্য সংগ্রহে রত দেখিতে পাই। তখন—

"গগনে গবজে মেঘ ঘন বরষা।"

এই একটী ছত্রে নব বর্ষার জীবন্ত চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়। আমরা যেন মেঘের গর্জ্জন, আষাঢ়ের দিগন্ত প্রসারী মেঘমালা এবং অবিরাম বৃষ্টিধারার চিত্র হৃদয়ে অনুভব করি।

মেঘলা দিনের একটা বিশেষত্ব আছে, বিশেষতঃ নব বর্ষার দিনগুলির।* বর্ষার নিবিড়তা মনের মধ্যে স্বতঃই একটা উদাস ভাব আনিয়া দেয়। আমাদের আত্মনিষ্ঠ কবি আজ বিকল হইয়াছেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যেন

"গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।"

তিনি অপরিচিতা তরণীবাহিকার হস্তে, এতকাল নদীকূলে যাহা লইয়া ভুলিয়াছিলেন, সকলই "থরে বিথরে" তুলিয়া দিলেন এবং নিজেকে তুলিয়া লওয়ার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু তাঁহার জন্য তখনও তরণীতে ঠাঁই হইল না।

এই যে সর্ব্বস্বদান, এইখানে কবির ব্যক্তিত্বের অবসান। তরণীবাহিকা আজিও কবিকে বিশ্বাস করেন নাই, তাই তরণীতে তাঁহার স্থান হইল না। ইহার পর কোন্ শুভদিনে তাঁহার

* মেঘদূত ব্যাখ্যা। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত।

তরী আরোহণ ঘটিল, তাহা আমরা জানি না। নিরুদ্দেশ যাত্রায় কবির তরণী পশ্চিম সাগরের দিকে ছুটিয়াছে দেখিতে পাই।

"দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিম পানে অসীম সাগর ;
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।"

তরণীর কর্ণধার রমণী। তাহারই ইঙ্গিতে কবি কখন তরণীতে উঠিয়াছেন এবং তাহারই ইঙ্গিতে মন্ত্র চালিত মত নিরুদ্দেশের উদ্দেশে ছুটিয়াছেন !

এই রমণীকে 'সোণার তরী'তে 'সুন্দরী' এবং 'অপরিচিতা'রূপে দেখিতে পাই, 'চিত্রা'য় তিনি 'চিত্রা' এবং 'চৈতালী'তে শুধু "তুমি"। ইনি আর কেহ নহেন, কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইঁহাকে কবির অদৃষ্ট আখ্যা দিতে পার।

তরীতে উঠিয়া কবি অপরিচিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোণার ফলে?"

রমণী হাসিলেন এবং নীরব রহিলেন।

ইহার পর সাগরে কতবাব সুবাতাস বহিয়াছে, আবার কতবার তুমুল ঝড় উঠিয়াছে। কবি কখন অশান্ত হইয়া সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন :—

"এখন বারেক সুধাই তোমায়,
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়?"

কিন্তু রমণী শুধু হাসিয়াছেন এবং তরণী চালনা করিয়াছেন। যে তরল সৌন্দর্য্য দেখিয়া কবি পশ্চিম পানে ছুটিয়াছিলেন, তাহা মরীচিকায় পরিণত হইয়াছে। নিরাশা তাঁহাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে। তাই সোণার তরীতে কোন আশার সংবাদ পাই না। কিন্তু আজ রমণী তাঁহাকে আশা নিরাশার মধ্য দিয়া সমস্ত জগৎ ঘুরাইয়া আনিয়াছে। তাহার তরণী পুনর্ব্বার পূর্ব্ব সিন্ধুকূলে আসিয়া লাগিয়াছে !

পাঠকগণ মনে রাখিবেন, কবি আদর্শ খুঁজিতে পশ্চিম সাগরের দিকে ছুটিয়াছিলেন। আমরা ছোট বড়তে মিলিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকে জীবনের মহা আদর্শ মনে করিয়া, উন্মত্তের ন্যায় তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের সে নেশা এখনও একেবারে ছোটে নাই। কিন্তু দিন দিনই সে আদর্শ ছোট হইয়া আসিতেছে এবং অনেকে ইতি মধ্যেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই প্রত্যাবর্ত্তন মৃত্যু আনয়ন করিবে যদি অন্য মহত্ত্বের আদর্শ ধরিতে না পারি।

যে চঞ্চল আলোক আশার মত জলে কাঁপিতে দেখিয়া, কবি তরী আরোহণ করিয়াছিলেন, আজ তাহা তাঁহার চক্ষে :—

"ঐ পশ্চিমের কোণে রক্তরাগ রেখা
নহে কভু সৌম্য রশ্মি অরুণের লেখা

তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যায় প্রলয় দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিম সমুদ্র-তটে করিছে উদগার
বিস্ফূলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয় শেষ অগ্নিকণা।"

এই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে লক্ষ্য করিয়া, কবি আবার বলিতেছেন :—

"—দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি' তীব্র বিষে
* * * *
জাতি প্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবির তরী পৃথিবী ঘুরিয়া পুনর্ব্বার সিন্ধুকূলে আসিয়া পৌছিয়াছে। যে নবীন জীবন খুঁজিতে কবি বাহির হইয়াছিলেন জগৎ ঘুরিয়া তাহা পাইলেন না, কিন্তু পূর্ব্ব সিন্ধুতীরে এত দিনে তাহা মিলিয়া গেল। তাঁহার ভ্রমণবেগ ক্ষান্ত হইল। কবি পশ্চিমের আদর্শে নিরাশ হইয়া বলিতেছেন—

"তোমার নিখিল প্লাবী আনন্দ আলোক
হয়তো, লুকায়ে আছে পূর্ব্ব সিন্ধুতীরে
বহু ধৈর্য্য নম্র, স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে
সর্ব্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়
দীর্ঘকাল ব্রহ্ম মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায়।"

অন্যত্র আছে :—

"দেখিনু তোমারে পূর্ব্ব গগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে !"

এই মহা আদশ কবি তাঁহার অমর তুলিকায় আমাদের চোখের সম্মুখে চিত্রিত করিয়াছেন। যে আদর্শ বেদগান মুখরিত প্রাচীন ভারতের তপোবনে ঋষিদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, এ সেই আদর্শ। যে আদর্শ হইতে আমরা চ্যুত হইয়া, এই অবমান ও লাঞ্ছনার ডালি মস্তকে বহন করিতেছি, এ সেই আদর্শ। কবি প্রাচীন ভারতের সেই আদর্শ নিজের ভাষায় ঘোষণা করিতেছেন :—

"————————শোন বিশ্বজন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময় ; তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।"

কবি এই মহা আদর্শ খুঁজিতে সোণার তরীতে বাহির হইয়াছিলেন। এই জন্য সোণার তরীকে আমরা কবির ভবিষ্যদ্বিকাশের সূচনা বলিয়াছি।

এইরূপ অবিনাশী মঙ্গল আদর্শ খুঁজিতে বহুযুগে বহু মহাপুরুষ বাহির হইয়াছেন। Plato তাঁহার Ideal Republic এ এবং More তাঁহার Utopiaএ এইরূপ একটা আদর্শ সৃজনের চেষ্টা করিয়াছেন।

Tennysonও এইরূপ নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে আদর্শ কখন পুণ্যরূপে, কখন জ্ঞানরূপে, কখন স্বর্গীয় আশারূপে, কখন বা স্বাধীনতার রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

"Like virtue firm, like knowledge fair

* * * *

Like Heavenly Hopes. She crowned the sea

And now the bloodless point reversed,

She bore the blade of liberty."

পাঠকগণ দেখিয়াছেন, আমাদের কবির আদর্শ তাহাই, যাহা সকল আদর্শের শেষ, যাহা হইতে জ্ঞান ও পুণ্য নিঃসৃত, আশা যাহাকে অবলম্বন করিয়া আছে এবং স্বাধীনতা যাহার পাদপীঠতলে স্থান পাইলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে।

Tennysonএর যাত্রায় তাঁহার ইচ্ছাশক্তির প্রভাব দেখিতে পাই, কিন্তু আমাদের কবি বলিতেছেন :—

"আর কতদূরে, নিয়ে যাবে মোরে"

হে সুন্দরী।

ইহাতে অদৃষ্টবাদী হিন্দু ও পুরুষকারবাদী পাশ্চাত্য জাতির পার্থক্য ফুটিয়া উঠে।

'সোণার তরীর' বিশেষ ভাবটি যথাসম্ভব পাঠকগণ সম্মুখে বিবৃত করিলাম। এখন কাব্যখানির অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোচনা করিব।

কবির কার্য্য কি, ইহার এক কথায় উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়—সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করা। কোন তত্ত্ব প্রচার কবির কাজ নহে। পাঠকগণ কাব্য হইতে তত্ত্ব বাহির করিতে পারেন, দার্শনিক তাহা হইতে দর্শনের সূত্র আবিষ্কার করিতে পারেন, কিন্তু কবির কাজ শুধু সৃজন। এই সৃজন-নীতি ভিন্ন কবিতে ভিন্নরূপে বিকশিত হয়। রবীন্দ্রনাথকে বর্ত্তমান যুগের মনুষ্যত্বের আদর্শের কবি বলা যাইতে পারে। আমাদের মানসিক ও শারীরিক বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশেই মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আমাদের কবিও এই বৃত্তি নিচয়ের শোভা ও মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিতেছেন।

কবির যে এই সৃজন, তাহার উৎস কোথায়? কবি তাহার উত্তর 'পুরস্কার' শীর্ষক কবিতায় দিয়াছেন।

"অতি দুর্গম সৃষ্টি শিখরে
অসীম কালের মহা কন্দরে

সতত বিশ্ব নির্ঝর ঝড়ে
ঝর্ঝর সঙ্গীতে,
স্বর তরঙ্গ যত গ্রহ তারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশ্য হারা
সেথা হতে টানি লব গীতধারা
ছোট এই বাঁশরীতে।"

যে শিখর হইতে বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, কাব্যের উৎপত্তিও তথায়। গ্রহ নক্ষত্র সমূহ যে সঙ্গীতসমুদ্রের তরঙ্গ, আমাদের কবিও তাঁহার কাব্যের উপাদান তথা হইতে সংগ্রহ করিতেছেন। তিনি ধরণীর শ্যাম করপুটখানিকে সেই গীত আনিয়া ভরিয়া দিতে চাহেন।

কবি তাঁহার কর্ত্তব্য উক্ত কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বাতাসে এক মধুর অর্থ ভরা বাণী মিশাইয়া দিতে চাহেন, নববর্ষার নিবিড়তা ঘনতর করিতে চাহেন, বসন্তকে বাসন্তী-বাঁস পরাইয়া দিতে চাহেন এবং সংসারের 'দুয়ে একটি কাঁটা' দূর করিতে চাহেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"সুখে হাসি আরও হবে উজ্জ্বল
সুন্দর হবে নয়নের জল
স্নেহ সুধামাখা বাস গৃহতল
আরও আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর বচনে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে
আরেকটু স্নেহ-শিশু মুখপরে
শিশিরের মত রবে।"

আরও কাজ আছে। তিনি অন্তর হইতে বচন আহরণ করিয়া আনন্দ লোক সৃজন করিতে চাহেন এবং ভাষার দৈন্য দূর করিতে চাহেন।

মানুষ হইতে যাহা আবশ্যক, খেলা, ধুলা, শিক্ষা, ভালবাসা ও ধর্ম্ম, স্বদেশ ও সমাজ, কবি এই সকলই পবিত্র চোখে দেখেন। এই এই সকলের মধ্যেই সৌন্দর্য্যের নব নব বিকাশ দেখাইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে চাহেন। আমাদের চিরবৃদ্ধদেশে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রণয়গুলিকে একটু হেলার চক্ষে দেখেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যে কবি এই প্রণয় কবিতাগুলির রচয়িতা, বাঙ্গালা ভাষার অমর-ধর্ম্ম-সঙ্গীতগুলির শ্রেষ্ঠ অংশ তাঁহারই রচিত। যে দেশের মহর্ষিরা উপনিষদের রচয়িতা, সে দেশের মহাকবি নায়িকার বস্ত্রাঞ্চল কাঁটা গাছে বাঁধাইয়া দিয়া প্রেমের ছলনা লীলা দেখাইয়াছেন। রমণী পুরুষের প্রণয় লীলা বিধাতারই বিধান। এ বিধান ভঙ্গ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। তুমি যদি জগতের সমস্ত কাব্যগ্রন্থ ভস্মশেষ করিয়া ফেল, মানুষ তবুও কালচোখ দেখিয়া ভুলিবে। কারণ ইহা বিধাতার অভিপ্রেত। কবি যদি সেই কালচোখে একটু আলো ফুটাইয়া তোলেন, সে তো বিধাতার কার্য্যের সহায়তা করা হইল!

প্রণয় কবিতার উৎস—নারী। এই নারীর বর্ণনা জগতের কাব্যসাহিত্যের আদ্যন্ত জুড়িয়া আছে। নারীকে লক্ষ্য করিয়া যত শ্লোক রচিত হইয়াছে, দেবোদ্দেশে তদপেক্ষা বেশী বন্দনা গান উঠিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। কবি বলিতেছেন, প্রণয় ও ভগবৎ প্রেম একই জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ।

"আমাদেরি কুটীর কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে,—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ ! এই প্রেম-গীতিহার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি সেই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
দেই তাই দেবতারে।—আর পা'ব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা !"

প্রকৃতপক্ষে ইহা অপেক্ষা প্রেমের উজ্জ্বলতর আদর্শ এ জগতে হইতে পারে না।

নারীর শারীরিক বিকাশের অজস্র বর্ণনা সকল দেশের কাব্যেই পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবিগণ যে বয়ঃসন্ধির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহাদের এই সকল বর্ণনা নারীর দেহের বিকাশ লইয়া। বালিকার খেলাধূলা ও যুবতীর লীলাচাঞ্চল্য কিরূপভাবে মিলিয়া যায় এবং কিরূপভাবে যৌবন বাল্যের উপর জয়যুক্ত হয়, বিদ্যাপতি প্রমুখ কবিগণের অমর লেখনী তাহা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তরের নারীপ্রকৃতির বিকাশ বয়সের হিসাবে চলে না।

এই অন্তরবাসিনী নারীর জাগরণ, কবি তাঁহার "রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে" "নিদ্রিতা" ও "সু..." এই কবিতাত্রয়ে প্রদর্শন করিয়াছেন প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি কবিতা একটি কবিতারই তিনটি ভাগ মাত্র। রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে পাঠশালায় যাইতেন, পড়াশুনা করিতেন, খেলার ছলে কখনও হয়তো মালা বদল হইয়া যাইত।

এখন. খেলাধূলা পাঠ সমাপ্ত হইয়া গেছে। রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে কোথায় যে যার দেশে চলিয়া গিয়াছেন। রাজার ছেলে জীবনের সঙ্গিনী খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। পথে তাঁহাকে

"কেহবা ডেকে কয়েছে দুটো কথা,
কেহবা চেয়ে করে'ছে আঁখি নত।
কাহারো হাসি ছুরির মত কাটে
কাহারো হাসি আঁখি জলেরি মত।"

আবার কেহবা গর্ব্বভরে চলিয়া গিয়াছে, কেহবা ধীরে গান গাহিয়াছে। এই অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে রমণী জাতির বিভিন্ন লীলাভঙ্গী ফুটিয়া বাহির হইতেছে। রাজার ছেলে যখন এইরূপে বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি করিতেছিলেন, রাজার মেয়ে তখন "শিথানে মাথা রাখি' বিথান বেশে" নিরালায় ঘুমাইতেছিলেন। রাজপুত্র দেশ বিদেশ ঘুরিয়া শেষে এই নিদ্রিতা রাজকন্যার কাছে আসিলেন।

"কমল ফুল-বিমল সেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনু লতা ;
মুখের পানে চাহিনু অনিমিষে
বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা।"

এই যে "সুখের মত ব্যথা," ইহা একান্তই অনুভবের বিষয়। ইহাকে স্ফুটতর করিবার ভাষা মানুষের নাই।

"একটি বহু বক্ষ'পরে পড়ি'
একটি বাহু লুটায় এক ধারে।"

* * *

"আঁচলখানি পড়েছে খসি' পাশে
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দু'টি।"

পাঠকগণ দেখিবেন—রাজকন্যা এখনো বালিকা নহেন। তাহার অঙ্গে যৌবনের বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু অন্তরবাসিনী নারীধর্ম্ম এখনো জাগিয়া উঠে নাই। রাজপুত্রের ভ্রমণবেগ ক্ষান্ত হইল। তিনি ভূতলে বসিয়া, মাথা আনত করিয়া মুদ্রিত আঁখি চুম্বন করিলেন এবং নিদ্রিতার কণ্ঠে রত্নহার পরাইয়া দিয়া, তাঁহার নিকট স্বীয় পরিচয় লিখিয়া রাখিয়া গেলেন। রাজকন্যা যখন জাগিয়া উঠিলেন, তখন—

"খসিয়া পড়া আঁচলখানি বক্ষে তুলি দিল,
আপন পানে নেহারি' চেয়ে সরমে শিহরিল।"

ইনি এখন সুপ্তোত্থিতা। এটি কবির রূপক মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা কুমারী-হৃদয়ে নারীধর্ম্মের একটি জাগরণ-বার্ত্তা। আজন্ম বীরব্রতচারিণী চিত্রাঙ্গদাব নারী-হৃদয়ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া এইরূপে এক মুহূর্ত্তেই জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। চিত্রাঙ্গদা বলিতেছেন—

* * * "সেই
আপনাতে-আপনি-অটল মূর্ত্তি হেরি'
সেই মুহূর্ত্তেই জানিলাম মনে,—নারী
আমি। সেই মুহূর্ত্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।"

কবি অন্যত্র উক্ত "চিত্রাঙ্গদা"-কাব্যে প্রণয়ের দেবতার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—

"* আমিই চেতন করে' দেই
একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী,—পুরুষে পুরুষ।

অতঃপর, যুবতী রমণীর বিবিধ লীলাভঙ্গীর বিশদ বর্ণনা আমরা "তোমরা ও আমরা" শীর্ষক কবিতায় পাই। শব্দের ঝঙ্কারে, অনুপ্রাসের ব্যবহার-কৌশলে, কবিতাটির মধ্যে

সুন্দরীদের ভূষণশিঞ্জন এবং সুমধুর অঙ্গগন্ধ অনুভব করা যায়। কবিতাটি হইতে নিম্নে আমি কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।—

অঙ্গে অঙ্গে বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।
ইঙ্গিত-রসে ধ্বনিয়া উঠেছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।
আঁখি নত করি, একলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,—
কি কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা !"
"চকিত পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও !
যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে !"

এ যেন আতটপ্লাবী ভাদ্রের নদীস্রোতের মত। মনে হয় যেন নারীর যৌবন ভাষায় ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অন্যত্র আছে—

"পূর্ণচন্দ্রকররাশি মূর্চ্ছাতুর পড়ে আসি'
এই নব যৌবন-মুকুল !"

বাস্তবিক, চাঁদের আলো এমন স্থান ছাড়া আর কোথায় পড়িবে ?

ইহার পরে, কবি বিবাহিত নারীর চিত্র দিয়াছেন। কবি এই অল্প কয়েক ছত্রের মধ্যে বিবাহিতা জীবনের যে সুস্পষ্ট চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা পাঠকগণকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।—

"বন্দী হ'য়ে আছ তুমি সুমধুর স্নেহে
অয়ি গৃহলক্ষ্মি, এই করুণ ক্রন্দন
এই দুঃখ-দৈন্য ভরা মানবের গেহে।
* * *
পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ক কঠিন
সংসার-সংগ্রামে, সদা বন্ধনবিহীন ;
যুদ্ধ দ্বন্দ্ব যত কিছু নিদারুণ কাজে
বহ্নিবাণ বজ্রসম সর্ব্বত্র স্বাধীন !
তুমি বদ্ধ স্নেহ, প্রেম, করুণার মাঝে,—
শুধু শুভ কর্ম্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।"

"ব্যর্থ যৌবন" নামক কবিতায় কবি বিরহবিধুরা রমণীর ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার "লজ্জা" একটি অতি মধুর কবিতা। শাস্ত্রে বলে, লজ্জাই স্ত্রীজাতির ভূষণ। কবিও তাহাই বলিতেছেন।—

"আমার হৃদয় প্রাণ সকলি ক'রেছি দান
কেবল সরমখানি রেখেছি।"

রবীন্দ্রনাথের প্রণয় কবিতাগুলির মধ্যে একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি ধর্ম্ম ও নীতিকে সর্ব্বদা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন বাস্তবিক—প্রণয় যখন ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধন ত্যাগ করে, তখন সে সৌন্দর্য্যের স্বর্গ হইতেও চ্যুত হয় এবং সেই সঙ্গে কবিও তাঁহার মহিমোজ্জ্বল সিংহাসন হইতে ধূলিতলে নামিয়া আসেন।

কবির স্বদেশ-ভক্তি সর্ব্বজন বিদিত। নব্য বঙ্গ এখন তাঁহারই মন্ত্রে স্বদেশ-প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। স্বদেশ-ভক্ত আমাদের দেশে অনেক আছেন,—রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের পথে যান নাই। আবেদন ও নিবেদনের থালা লইয়া রাজনৈতিক অধিকার ভিক্ষা করিয়া আনা,—এ তাঁহার স্বদেশপ্রীতির অঙ্গ নহে। তিনি আমাদের সর্ব্ববিধ লাঞ্ছনা দূরীভূত করিয়া, আমাদের জাতীয় আদর্শানুসারে আমাদিগকে প্রকৃত কর্ম্মী করিয়া তুলিতে চাহেন। ভিক্ষায় হীনতার গ্লানি শতগুণ বর্দ্ধিত হয় মাত্র—কবি এ কথা বার বার আমাদিগকে শুনাইছেন। তিনি মনের খেদে গাহিয়াছেন :—

"শুধু হেথা কেন আনন্দ নাই
কেন রহে সবে নীরবে?
তারকা না হেরি পশ্চিমাকাশে,
প্রভাতে না হেরি পূরবে!"

* * *

"শুধু চারিদিকে প্রাচীণ পাষাণ—
জগৎ-ব্যাপ্ত সমাধি সমান;
গ্রাসিয়া রেখেছে অযুত পরাণ,—
রয়েছে অটল গরবে!"

অন্যত্র-

হৃদয় আমার ক্রন্দন কবে
মানব-হৃদয়ে মিশিতে
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে' আছি মৃত,
জড়তার মাঝে হ'য়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন অমৃত
কে দিবে গো এই তৃষিতে?"

কোথায় সে বজ্র যাহার আঘাতে এই প্রাচীন পাষাণস্তূপ চূর্ণ হইয়া যাইবে এবং আমরা বিশ্বের আনন্দ গানে যোগ দিতে পারিব! কবি 'সোণার তরী'তে প্রাচীন পাষাণ দীর্ণ করিয়া

কোন আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে সে আনন্দবার্ত্তা তিনি ঘোষণা করিয়াছেন ;—রবীন্দ্রনাথের পাঠকগণের সে সংবাদ অবিদিত নাই।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম-সঙ্গীতগুলি বঙ্গ-সাহিত্যের অলঙ্কার। ভগবান্‌কে তিনি মহতোমহীয়ান বলেন ; কিন্তু নিজেকে তিনি ছোট মনে করেন না। আমরা মহতের সন্তান, ছোট হইব কেন? আমাদিগকে ছোট মনে করিলে, দেবতাকেই ছোট করিতে হয়। কবি তাঁহার ৲হু বাল্যকালের রচিত সন্ধ্যা-সঙ্গীতে বলিয়াছেন :—

"আমারে যে করেছ সৃজন
একি শুধু অনুগ্রহ করে'
ঋণপাশে বাঁধিবারে মোরেএ
হেসে ক্ষমতার হাসি, অসীম্ ক্ষমতা হ'তে
ব্যয় করিয়াছ এক রতি
অনুগ্রহ করে' মোর প্রতি?"

প্রকৃতপক্ষে কবি কোথাও দেবতার নিকট অনুগ্রহ করেন নাই। 'সোণার তরী'তে ভগবদ্বিষয়ক কবিতা বেশী নাই। "আবেদন" একটি ক্ষুদ্র কবিতা। কিন্তু ইহার অল্প কয়েকটি ছত্রের মধ্যে কবির বিশেষত্ব বেশ বুঝা যায়। কবি যেন অভিমান করিয়া বলিতেছেন :—

"আমার পরাণ লযে কিখেলা খেলাবে ওগো
পরাণ প্রিয়।
কোথা হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণ মূলে
তুলে দেখিও।
এ নহে গো তৃণদল, ভেসে-আসা ফুল ফল,
এযে ব্যথাভরামন মনে রাখিও।"

এ কথাগুলি আমাদের জাতীয় হৃদয় তন্ত্রীকে আঘাত করে। যখন আমরা প্রত্যহ পথতৃণের মত পরপদ দলিত হইয়া আসিতেছি, তখন দেবোদ্দেশে প্রত্যেক হৃদয় হইতে এরূপ প্রার্থনা উঠা স্বাভাবিক।

জীবনের যত রহস্য আছে মৃত্যু সকলের চেয়ে গুরুতর। মরণের পরপারের সংবাদ কেহই বলিতে পারেনা। তাই মৃত্যুকে কেহ আকাঙ্ক্ষা করেনা। কবি তাঁহার তরুণ বয়সের লিখিত "কড়ি ও কোমল" কাব্যে বলিয়াছেন :—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।"

মৃত্যুও তো বিধাতারই বিধান। "কবি সোণার তরীতে" এ বিধান উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু এখনও তিনি মঙ্গলময়ের রাজ্যে মৃত্যুর সার্থকতা বুঝিতে পারেন নাই। অনিবার্য্য বলিয়াই তিনি তাহার কাছে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। আত্মাকে তিনি মৃত্যুর প্রিয়পাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবি বলিতেছেন :—

"তুই কি বাসিস ভাল আমার এ বক্ষবাসী
পরাণ পক্ষীরে?"

কিন্তু আত্মা তো তাহার নিকট ধরা দিতে চাহে না,
"চপল চঞ্চল প্রিয়া ধরা নাহি দিতে চায়—
স্থির নাহি থাকে
মেলি নানা বর্ণ পাখা, উড়ে উড়ে চলে যায়
নব নব শাখে

কিন্তু একদিন তাহাকে ধরা দিতে হইবে। সেই দিন মৃত্যু তাহার প্রেয়সী "পরাণ পক্ষী"কে কোথায় লইয়া যাইবে?

যেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চির কুমারী,
আলোক পরশ
একটি রোমাঞ্চ রেখা আঁকেনি তাহার গাত্রে
অসংখ্য বরষ;
সৃজনের পরপারে যে অনন্ত অন্তঃপুরে
কভু দৈব বশে
দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি
তিল নাহি পশে;
সেথায় বিরাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তারিয়া
বন্ধন বিহীন,
কাঁপিবে বক্ষের কাছে নব পরিণীতা বধু
নূতন স্বাধীন!

কল্পনার গতি ইহা অপেক্ষা উচ্চ গ্রামে পঁহুছিতে পারে না। কবি বলিতেছেন সৃষ্টির পরপারে যে আদিম অন্ধকারে কখনও আলোকের রেখাপাত হয় নাই আত্মার বাসরগৃহ বুঝি সেই জায়গায়। তিনি "এখন মরিতে চাহি না" এ কথা বলেন না। কিন্তু করুণ চক্ষে অবশ্যম্ভাবী মরণকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলেন।

কবি পরে মৃত্যুতেও ভগবানের মঙ্গল ভাব অনুভব করিতে পারিয়াছেন। "চৈতালী"তে মরণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন,

"মনে হয় যেন তব মিলন বিহনে
অতিশয় ক্ষুদ্র আমি এ বিশ্বভুবনে।
* * * *
প্রথম মিলন ভীতি ভেঙ্গেছে বধুর
তোমায় বিরাট মূর্ত্তি নিরখি মধুর।
সর্ব্বত্র বিবাহ বাঁশি উঠিয়াছে বাজি
সর্ব্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি।

"প্রতিক্ষার" সহিত আর একটি করুণ কবিতার কথা স্মরণ হয়; তাহা "যেতে নাহি দিব"। পিতা বিদেশে যাইবেন; চারি বৎসরের মেয়েটিকে "মাগো আসি" বলিতে, বালিকা বলিয়া উঠিল "যেতে আমি দিব না তোমায়"। এই কথা কয়েকটির উপরেই এই করুণ কবিতাটি রচিত। বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন :—

"——————————চরাচরে,
কাহারে রাখিবি ধরে, দুটি ছোট হাতে
গরবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বার প্রান্তে শ্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ
শুধু লয়ে ওই টুকু বুক ভরা স্নেহ!"

জগতের "সব চেয়ে পুরাতন কথা", "সব চেয়ে গভীর ক্রন্দন" এই "যেতে নাহি দিব"। হায়, "তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়"। এই চলে যাওয়া জগতের চিরন্তন রীতি। মাতা বসুন্ধরা চিরদিন যাহা পায় সকলই হারায়। তবু চিরদিন এই চারি বৎসরের কন্যাটির মত, প্রেমের গর্ব্বে প্রচার করে "যেতে দিব না", বলে "মৃত্যু তুমি নাই।" Tennyson ও মৃত্যুর উপরে প্রেমের এইরূপ গর্ব্ববাণী প্রচার করিয়াছেন। প্রেম মৃত্যুকে বলিতেছে :—

... This hour is thine ;
Thou art the shaow of life, * * *

* * * *

The shadow passeth when the tree shall fall
But I shall reign for ever over all!

মৃত্যুর অখণ্ড রাজত্বের উপর প্রেমের এই বিজয় ঘোষণা, এই মরণাহত জগতে চরম শান্ত্বনা।

রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ কাব্য শিল্পী। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক। তাঁহার কাব্যের সমগ্রভাবে সমালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক হইবে না। "সোণাব তরীতে"ই তাঁহার শিল্পনৈপুণ্য প্রথম বিশেষভাবে বিকশিত দেখিতে পাই। তাঁহার উপমা সহকৃত প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা, শব্দ যোজনায় ও মধুর পদবিন্যাসে অসাধারণ নৈপুণ্য এবং শব্দের ঝঙ্কার বঙ্গভাষায় অতুলনীয়। বৈঞ্চব কবিগণের পর হইতে প্রায় সকল কবিই যুক্তাক্ষরগুলিকে একমাত্রারূপে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, এইরূপে বাঙ্গালা ভাষায় এক একটি যুক্তাক্ষর এক একটি অক্ষরের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাই সংস্কৃত কাব্যে যুক্তাক্ষর দ্বারা ও ইংরেজী কাব্যে বহু ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গতি দ্বারা শব্দের যে ঝঙ্কার উঠে বাঙ্গালা কাব্যে তাহা ছিল না। স্বরবর্ণে ও অযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে ভাষার গতি শক্তি দিতে পারে, কিন্তু ঝঙ্কার তুলিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশ যেমন সমভূম, কাব্য সাহিত্যও তেমনি একঘেয়ে, সমভূম হইয়া উঠিয়াছিল। নব্য বঙ্গের কবিদের মধ্যে হেমচন্দ্র ভাষার এই দৈন্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার "দশ-মহাবিদ্যা" কাব্যে যুক্তাক্ষর দুইমাত্রারূপে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তিনি পরের লিখিত কবিতায় আর সেইরূপ ব্যবহার করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "মানসী" কাব্যে প্রথম এই প্রথা অবলম্বন করেন। তিনি উক্ত কাব্যের ভূমিকায় যুক্তাক্ষর-যুক্ত পদগুলিতে কিরূপভাবে পড়িতে হইবে, তাহার উপদেশ করিয়াছিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ উপদেশের আবশ্যকতা ছিল। এখনও যে সেই আবশ্যকতা একেবারে চলিয়া গেছে একথা বলা যায় না।

"কালি যে ভারত সারাদিন ধরি'

অট্টগরজে অম্বর ভরি
রাজার রক্তে খেলে ছিল হোরি,
ছাড়ি কূল ভয় লাজে।"

এ যায়গায় যুক্তাক্ষরকে একমাত্রারূপে ধরিলে, প্রথম ছত্রে বারো, দ্বিতীয় ছত্রে দশ এবং তৃতীয় ছত্রে একাদশ মাত্রা হইবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সহিত অপরিচিত লোকেরা এখানে ছন্দ পতন দোষ ধরিবেন। কিন্তু যাঁহারা রসজ্ঞ তাঁহারা স্বীকার করিবেন, "কালি যে ভারত সারাদিন ধরি" এই ছত্রে আমাদের কর্ণে কোন কলধ্বনি আনিয়া দেয় না; কিন্তু "অট্ট গরজে অম্বর ভরি" পদ মধ্যে দুইটি যুক্তাক্ষর থাকায় আমাদের কানের মধ্যে একটা মধুর ঝঙ্কার আনিয়া দেয়। এই যুক্তাক্ষর যোজনায় সোণার তরীতেই কবি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এইরূপ শব্দ যোজনার দুই একটি দৃষ্টান্ত বোধ হয় প্রাসঙ্গিক হইবে।

(১) "উড়ে কুন্তল উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ু চঞ্চল,
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী
মত্ত বোল।"

(২) "ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম,
বলি অঙ্কিত শিথিল চর্ম্ম
প্রখর মূর্ত্তি অগ্নি শর্ম্ম
ছাত্র মরে আতঙ্কে।"

(৩) "নির্ঝর ঝরে উচ্ছ্বাস ভরে
বন্ধুর শিলা সবলে।"
ইত্যাদি—

ধ্বনি অনুকারী শব্দ প্রয়োগেও কবি সিদ্ধ হস্ত।
"তল তল ছল ছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।"

মনে হয় যেন জলের ছল ছল শব্দ কানে আসিতেছে। কোমল ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহারে ও অনুপ্রাসের ব্যবহার-নৈপুণ্যে পদটি আরও সুমধুর হইয়াছে।

ওই সে শব্দ চিনি, নূপুর রিণিকি ঝিনি।
রূপসীর পায়ের নূপুর ঝঙ্কার যেন পদটিকে পূর্ণ করিয়া আছে।
সুন্দব উপমা সহযোগে কবির প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা অতি মনোহর।

(১) "-————————-শুভ্র খণ্ড মেঘ
মাতৃ দুগ্ধ পরিতৃপ্ত সুখ নিদ্রা রত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মত
নীলাম্বরে শুয়ে।

(২) বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলো চুলে,
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে

একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া।

(৩) আকাশ সোণার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ
পশ্চিম দিগ্বধু দেখে সোণার স্বপন।"

মধুসূদন নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দে, হেমচন্দ্র স্বদেশানুরাগোদ্দীপক কবিতা সম্পদে ভাষাকে ভূষিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ বৈচিত্র্য ভাষায় অতুলনীয়। তাঁহার স্বদেশানুরাগ অপূর্ব্ব প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। হেমচন্দ্রের স্বদেশ প্রীতির কবিতাগুলি অনেকটা বায়রণের পরপদদলিত গ্রীক জাতির উদ্দেশে লিখিত অমর কবিতাবলীর অনুকৃতি। তাহাতে যে আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশের সময় ও অবস্থার উপযোগী নহে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ আমরা সংক্ষেপে বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকটিত করিয়াছি। আমাদের সেই একমাত্র পথ, একমাত্র গতি।

ববীন্দ্রনাথের কাব্যেও যে ক্রটি না আছে তাহা নহে। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় বলা যায় রবিমণ্ডলেও কলঙ্ক আছে। অসংখ্য গুণরাশির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রটি চক্ষে পড়ে না। তাই আমি যদি কবির কোন ক্রটি প্রদর্শন করিয়া থাকি, পাঠকগণ আমায় ক্ষমা করিবেন।

সমালোচ্য কাব্যখানির "গান ভঙ্গ" নামক কবিতায় কবি বলিতেছেন :—

"একাকী গায়কের নহে তো গান,
মিলিতে হবে দুইজনে।

গাহিবে একজন খুলিয়া গলা,
আর একজন গাবে মনে!"

ভগবানের কৃপায় আমরা যেমন গায়ক পাইয়াছি, সকল জাতির অদৃষ্টে তেমন ঘটে না। কিন্তু শ্রোতা কোথায়?[১১০]

শ্রীবিপিনবিহারী দাস গুপ্ত।

যুগল চিত্র [প্রবন্ধ]

১ম ভাগ ১০ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩০৯

রমনীমোহন ঘোষ : প্রভাতী, স্বদেশ–প্রীতি, রাজর্ষি রামমোহন রায়, সবলের প্রতি দুর্ব্বলের অত্যাচার, পরেশনাথ সেন : বৈদিক সাহিত্য, আনন্দচন্দ্র শীল : কতিপয় এন,

দুর্দ্দিন

একি দুর্দ্দিন আসিল আজিকে
কাঁপায়ে মেদিনী সহসা।
ভীম হুঙ্কারে ত্রাসি' দশদিশি
আইল মত্ত বরষা।

প্রভাত-সূর্য্য আবরি' আঁধারে
কালো মেঘরাশি নাচে চারি ধারে,
ছুটে উন্মাদ বায়ু হাহাকারে,—
নাহি হেরি কোন ভরসা !
একি দুর্দ্দিন আইল ঘনা'য়ে
কাঁপায়ে মোদনী সহসা।
চলেছিনু ধীরে বাহিয়া তরণী
নব বসন্ত-পবনে—
হেরি' নির্ম্মল, স্নিগ্ধ ধরণী
সজ্জিত নব ভূষণে।
অম্বরতল আলোকি' তখন
উঠেছিল নব অরুণ-কিরণ,
পিক "কুহু" রব নবীন জীবন
আনি' দিতেছিল ভুবনে ;—
তা'রি মাঝে আমি বে'য়েছিনু তরী
নব বসন্ত-পবনে।
আশা ছিল,—না'য়ে, প্রিয়ারে লইয়া
গা'ব গান প্রাণ খুলিয়া,
তটিনী-উপরে তরণী চলিবে
ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া।
ভাবি নাই মনে,—এমন সুদিন
মেঘরাশিমাঝে হইবে মলিন।
ভাবি নাই হায়,—হ'ব আশাহীন
তরী'পরে পাল তুলিয়া !
বড় আশা ছিল, প্রেয়সীর সাথে
গা'ব গান প্রাণ খুলিয়া।

এবে ভাবি মনে—মানব জীবনে
কোনই ভরসা নাহি রে !
চিরদিন হাসি অশ্রুর মাঝে
ডুবিছে ভিতরে—বাহিরে !
বড় আনন্দে ভাসাইনু তরী
শান্ত নদীতে আপনা পাসরি'।
এবে, জলরাশি "খলখল" করি'
উঠে ভৈরবী গাহিরে !
তাই ভাবি মনে—মানব-জীবনে
কোনই ভরসা নাহিরে !

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য

ভারত-সুহৃদ্

আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীমৎ স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী, ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন, শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত এম. এ. শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণের মিত্র এম.এ. শ্রীযুক্ত মুন্সী মোজাম্মেল হক্, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল, শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা, শ্রীযুক্ত রসরঞ্জন সেন বি.এ. শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত খোন্দকার মঈনউদ্দীন আহমদ, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ সেন বি.এ. প্রভৃতি কৃতীলেখকগণের লেখা বাহির হইয়াছে।

আশ্বিন ও কার্ত্তিকের যুগ্ম সংখ্যায় আশ্বিনেব ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন এম.এ শ্রীযুক্ত মৌলবী জকিউদ্দীন আহমদ বি.এ. শ্রীযুক্ত ব্রজদুর্ল্লভ হাজরা বি.এ. শ্রীযুক্ত অশ্বনীকুমার দত্ত এম.এ. শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র সেন বি.এ. শ্রীযুক্ত মৌলবী আজগর আলী বি.এ. শ্রীযুক্ত ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গণেশ্চন্দ্র দাস গুপ্ত এম.এ. শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ, শ্রীযুক্ত মৌলবী কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুহ রায় বি. এ. শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ. শ্রীযুক্ত সেখ ফজলল করিম, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস বি.এ. শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দাস শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুহ এম.এ. শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন এম. এ. শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থ প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ লিখিবেন।

যে সকল গ্রাহকগণ পূজার বন্ধোপলক্ষে আশ্বিনের ১৫ই তারিখের পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত হইবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নেই আমাদিগকে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ দিবেন, নচেৎ কাগজ পাইতে বিলম্ব হইতে পারে।

কার্য্যাধ্যক্ষ "ভারত-সুহৃদ্"
বরিশাল।

সম্পাদকীয় কৈফিয়ৎ

বড় আশা ছিল, আশ্বিন ও কার্ত্তিকের যুগ্ম সংখ্যা এ মাসেই বাহির করিতে পারিব ; কিন্তু নানা অনিবার্য্য কারণে, নিয়মিত সময়ের মধ্যে মুদ্রণ কার্য্য শেষ করিতে পারিব না বলিয়া ও শারদীয় পূজার বন্ধোপলক্ষে পাঠক ও গ্রাহকগণের স্থান পরিবর্ত্তন আশঙ্কা করিয়া, আশ্বিন মাসে ৩ ফর্ম্মা মুদ্রিত হইল। বিজ্ঞাপিত সুলেখকগণের প্রবন্ধগুলি প্রায়ই আমাদের হস্তগত হইয়াছে, আগামী সংখ্যায় তৎসমুদয় প্রকাশিত হইবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য লেখক ও পাঠকগণের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। — সম্পাদক

বিশেষ দ্রষ্টব্য

"ভারত-সুহৃদ" বর্ত্তমান বর্ষের আষাঢ় মাসে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, সে হিসাবে আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসে এক বৎসর পূর্ণ হইবে। কিন্তু দেশ প্রচলিত প্রথানুসারে চৈত্র মাসেই দেনা পাওনা প্রভৃতি সমস্ত পরিষ্কার করিতে হয়। ইহাতে হিসাব পত্র রাখাও সুবিধাজনক। এই জন্য আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায়ই "ভারত-সুহৃদের" প্রথম খণ্ড শেষ করিলাম। আমাদের প্রতিশ্রুতি

অনুসারে মাসিক। ২৷৷ ফর্ম্মা হিসাবে বার মাসে মোট ত্রিশ ফর্ম্মার যে কয়েক ফর্ম্মা কম রহিল, আগামী বর্ষে তাহা পূর্ণ করিয়া দিব ; সুতরাং গ্রাহকগণ কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। আগামী বৈশাখ মাস হইতে "ভারত-সুহৃদের" দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ হইবে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া অবিলম্বে দ্বিতীয় বর্ষের অগ্রিম মূল্য ১৷৷ টাকা পাঠাইয়া দিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, — "ভারত-সুহৃদ"
বরিশাল।

ভারত-সুহৃদ পুরস্কার

"ভারত-সুহৃদের" শুভোদ্দেশ্য সংসাধন মানসে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও সাহিত্যামোদী দুইজন বন্ধু, মুসলমান যুবকদিগের মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলন ও সাহিত্য চর্চার জন্য একটি পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

"মুসলমান রাজত্বে, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে সুসম্বদ্ধ হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে বর্ত্তমান কালে সংঘর্ষ ও বিরোধ উপস্থিত হওয়ার কারণ ও তন্নিবারণের উপায়" সম্বন্ধে যে মুসলমান লেখক সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তিনিই আমাদের বন্ধু দত্ত বিংশ মুদ্রা পুরস্কার পাইবেন। প্রবন্ধ লেখকগণ আগামী কার্ত্তিক মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি, উপরে "ভারত-সুহৃদের পুরস্কার রচনা" লিখিয়া সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও অন্যান্য প্রবন্ধ সুলিখিত হইলে "ভারত-সুহৃদে" প্রকাশিত হইবে। লেখকের নাম, ধাম ও বিশেষ পরিচয় লিখিয়া দিবেন।

বরিশাল, নিবেদক
১৫ ই শ্রাবণ ভারত-সুহৃদ সম্পাদক।

পপুলার এজেন্সি কোং

ষ্টেশনারী বিভাগ : ইহাতে সকল রকম লিখিবার ও ছাপাইবার কাগজ, নানাবিধ ডাক কাগজ ও লেপেফা, কালী, নিব প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে রাখা হয়।

পেটেন্ট ঔষধ বিভাগ : সর্ব্ব প্রকার বিলাতী ও দেশী পেটেন্ট ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

পারফিউমারি বিভাগ : বিলাতী ও দেশী সকল রকম এসেন্স, হেয়ার অয়েল, সোপ, পমেটম, আতর, গোলাপ জল প্রভৃতি উচিত মূল্যে বিক্রয় হয়।

অয়েলম্যান ষ্টোর বিভাগ : ইহাতে সকল প্রকারের বিলাতী খাদ্য দ্রব্যাদি সস্তা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

ফ্যান্সী জিনিষ বিভাগ : নানবিধ সুন্দর সুন্দর উপহার দেওয়ার জিনিস ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় হয়।

ওয়াচ ক্লক ও টাইমপিস : সকল নাম করা মেকারের ওয়াচ ক্লক ও টাইমপিস অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীর অভূতপূর্ব অবিস্কার

সুধানিধি — সবর্ব প্রকার জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। স্থানীয় এসিস্ট্যান্ট সার্জ্জন বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় এল. এম. এস্ বলেন, "এই ম্যালেরিয়া প্রধান দেশে জ্বরের যে সমস্ত পেটেন্ট ঔষধ বাহির হইয়াছে, সুধানিধি তাহার অনেকের নিকট উচ্চাসন পাইতে পারে।" মূল্য প্রতি শিশি ৷৷. আনা, বোতল ৸৹আনা।

মেহ-নিসূদন— এই মহৌষধ ব্যবহারে সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন প্রমেহ ও তজ্জনিত উপসর্গাদি ত্বরায় নবারিত হইবে। এক সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ৸৹ আনা।

রিংওয়ার্মস্ অয়েন্টমেন্ট—দা'দ, ছোদ প্রভৃতি চর্ম্মরোগ ২/৩ দিন ব্যবহারে আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা।

লোমনাশক চূর্ণ—ব্যবহারে ৪/৫ মিনিটে লোম সকল উঠিয়া যাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৵০ আনা।

টনিক পিল—ইহাতে দেহের কান্তি, পুষ্টি সাধন, স্বপ্নদোষ ও জ্বরান্ত-দৌর্ব্বল্য নাশ মস্তিস্কের বলোপচয়, মনের প্রফুল্লতা, চক্ষুর জ্যোতিঃ, উৎসাহ ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। অধ্যায়নশীল ছাত্রগণ ইহা দ্বারা মেধা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকেন। এই অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন টনিব পান স্নায়বীয় দুর্ব্বলতাজনিত যাবতীয় জীর্ণ ও জটিল রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি কৌটা ৸০ আনা।

স্থানীয় এসিস্ট্যান্ট সার্জ্জন বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় এল.এম., এস বলেন, "টনিক পিল যে উপাদানসমূহের রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত তাহার সকলই স্নায়ুবীয় দুর্ব্বলতাগ্রস্ত রোগীর, বিশেষতঃ ছাত্রবৃন্দের পক্ষে মহোপকারী।"

কলেরা প্রিভেন্টিভ— কলেরাব সময় ইহার এক একটী প্রত্যেক লোকের সঙ্গে রাখা কত্তব্য। ইহা যেমন কলেবা প্রির্ভেন্টিভ, তেমনি কলেরা ও ডায়রিয়ার প্রথমাবস্থায় অতীব ফলপ্রদ। মূল্য ছোট শিশি ।০ আনা, বড় শিশি ।৵০ আনা।

সেন এণ্ড কোং এজেন্টস্ জগন্নাথ মেডিকেল হল, বরিশাল।

নলহাটী ফার্ম্মেসী

[১৮৯০ সালে স্থাপিত]

সরকারস্ টনিক্

বা

য়্যান্টি-ম্যালেরিয়াল্ স্পেসিফিক।

নূতন, পুরাতন ও প্লীহা যকৃতাদি সংযুক্ত, পীলা এবং সর্ব্বপ্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের বিখ্যাত মহৌষধ। মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, ছোট বোতল ৸০, শিশি । ৵০ আনা।

কে.ডি. সরকারের ডিবিলিটী ফিওরার।

সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ ও ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা।

কামিনীরঞ্জন তৈল

বিলাসীর বড়ই আদরের বস্তু। ইহারা সুগন্ধে মন আমোদিত হয়। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্ক শীতল, হাত পা.জ্বালা, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি আনা। সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। আমাদের অন্যান্য ঔষধের বিবরণ ক্যাটলগে দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলেই ক্যাটলগ পাঠান য'য়।

কে. ডি সরকার।

অযোধ্যার অন্তর্গত মাল্যপুর রাজার ভূতপূর্ব্ব চিকিৎসক। নলহাটী লুপলাইন।
বরিশাল এজেন্ট — বাবু নিশিকান্ত বসু ডাক্তার, জেইল রোড, বরিশাল।

সুলভে সুন্দর পুস্তক বিক্রয় !!!

গ্রাহকগণ সত্বর লউন ! এ সুযোগ হারাইবেন না।

সকল সংবাদপত্রে প্রশংসিত এবং শিক্ষিত সমাজে আদৃত মুন্সী মোজাম্মেল হক প্রণীত মহর্ষি মন্‌সুর ৷৷৹ আনা, ফেরদৌসী চরিত ৷৷৹ আনা, প্রেমহার ৷৷৹ আনা, অপূর্ব্ব-দর্শন ৷৷৹ আনা, তাপসজীবনী ৷৷৹ আনা, জাতীয় ও জুবিলী সঙ্গীত ✓৹ আনা ইত্যাদি প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠার প্রাগুক্ত গ্রন্থ এক সঙ্গে লইলে ২৷৷✓৹ আনা স্থলে ১।৹ আনা এবং কবিতার ভাণ্ডার 'লহরী' ১২খণ্ড প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠা ১৷৷৹ আনা স্থলে ৷৷✓৹ আনায় দিব। ডাক মাশুলাদি লইব না। এ নিয়ম এক মাসের জন্য, পরে পূর্ণ মূল্য লইব। গ্রহণেচ্ছু "শান্তিপুর, জেলা নদীয়া" ঠিকানায় গ্রন্থকারকে সত্বর পত্র লিখুন।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত দাস উকীল বরিশাল	২
" দিগেন্দ্রশঙ্কর দাস গুপ্ত এম.এ.বি.এল. পটুয়াখালী	১৷৷৹
N Gupta Esqr, Bar-at-law বরিশাল	১৷৷৹
শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল লতিফ খোর্দ দুর্গাপুর, নদীয়া	১৷৷৹
" বাবু ললিতমোহন সেন বি.এল. পটুয়াখালী	১৷৷৹
" মৌলবী আবদুল হক্ বরিশাল	১
" বাবু কুমুদকান্ত সেন এম. এ.বি.এল. বরিশাল	২
" বাবু প্যারীমোহন সেন উকীল পটুয়াখালী	২
ডাক্তার ক্ষীরোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বরিশাল	২
শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ মোফাজ্জল আলী সব রেজিষ্ট্রার কচুয়া, খুলনা	২
" বাবু সুরেন্দ্রনাথ দে বরিশাল	১৷৷৹
" বাবু সতীশচন্দ্র দাস মোক্তার পটুয়াখালী	১৷৷৹
" বাবু শ্যামাচরণ সিমলাই উকীল পটুয়াখালী	১৷৷৹
The members of Chowdhury Family Library Panchashar, Dacca.	২
শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত উকীল বরিশাল	২
" বাবু অমৃতলাল গাঙ্গুলী বি.এল. ঐ	১৷৷৹

Lawjee Jeenad Esqr. Rangoon	১॥০
শ্রীযুক্ত মুন্সী রহিমদ্দীন মোল্লা মোক্তার বরিশাল	২
" বাবু নিশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মোক্তার পটুয়াখালী	১॥০
" বাবু অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায় মোক্তার ঐ	১॥০
" মৌলবী চৌধুরী আব্দুল আজাহার, উলানিয়া, বরিশাল	১॥০
" বাবু বিপিচন্দ্র দাস উকীল বরিশাল	২
" বাবু ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় বি.এল. নায়েব সুবিদখালী	২
" বাবু গুরুচরণ সেন উকীল পটুয়াখালী	১॥০
" বাবু ভোলানাথ মজুমদার, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা	১॥০
" মৌলবী রেয়াজুল ইসলাম বরিশাল	২
" বাবু কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী কচুয়া, খুলনা	১॥০
" বাবু তারকচন্দ্র সেন মোক্তার, পটুয়াখালী	১॥০
" বাবু বসন্তকুমার দাস ঐ	১॥০
" বাবু ললিতমোহন সেন উকীল ঐ	১॥০
" মুন্সী আলী হোসেন, কেশবপুর	১॥০
" বাবু শরৎচন্দ্র গহ এম.এ.বি.এল. বরিশাল	২
" বাবু হরনাথ ঘোষ বি.এল. বরিশাল	১॥০
" বাবু নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মোক্তার পটুয়াখালী	১॥০
Munshi A. Z. Rahaman, Rangoon.	১॥০
" বাবু নিশিকান্ত চৌধুরী নাজির, পটুয়াখালী	১॥০
" বাবু বিমলাচরণ গুহ জমিদার, বরিশাল	১॥০
" মুন্সী আরমান আলি খাঁ মোক্তার পটুয়াখালী	১॥০
" মৌলবী আকতার উদ্দীন আহম্মদ ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ঐ	১॥০
" মুন্সী এসলাম আলী, কালমা, পটুয়াখালী	১॥০
" মুন্সী এসলাম আলী, কালমা, পটুয়াখালী	১॥০
" মৌলবী আকতার উদ্দীন আহম্মদ ম্যরেজ রেজিস্ট্রার ঐ	১॥০
" মুন্সী এসলাম আলী, কালমা, পটুয়াখালী	১॥০
" বাবু কালীপ্রসন্নগুহ বি.এল. বরিশাল	১॥০
" কাজী মুহম্মাদ মহিউদ্দীন ঐ	১॥০
" মুন্সী আব্দুল কাসেম মোক্তার, পটুয়াখালী	১॥০
" মৌলবী জকিউদ্দীন আহম্মদ বি.এ. ভোলা	১॥০
" মৌলবী আব্দুল বারি R. C. College Barisal	১॥০
" বাবু আনন্দচরণ সেন বিজনী, আসাম	১॥০

১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

সাহিত্য কংগ্রেস।

মুর্শীদাবাদ, ১লা শ্রাবণ ১৩০৯।

আগামী ১৩১০ সালের বৈশাখ মাসে মুর্শীদাবাদ নগরে "সুধা" পত্রিকার কার্য্যালয়ের অন্তর্গত সাহিত্য বিভাগের যত্নে বঙ্গদেশীয় বিদ্বজ্জন বর্গের সমাগম ও সম্মিলন হইবে। এই বিরাট সাহিত্য দরবারে বঙ্গদেশের সমদয় সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রের সম্পাদক, সত্বাধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষ এবং প্রধান প্রধান লেখক, সুবক্তা ও সুপণ্ডিতদিগকে সসম্ভ্রম নিমন্ত্রণ করা হইবে। সম্ভবতঃ দশ দিবস পর্য্যন্ত মেলা ও উৎসব চলিতে থাকিবে। সুনীতি বিষয়ক নাটকের অভিনয়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি কল্পে বক্তৃতা, প্রধান প্রধান (মৃত) লেখকদিগের ফটো প্রদর্শন, প্রধান প্রধান (জীবিত) লেখকদিগের ফটো গ্রহণ, বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা, "সুধা" লেখকদিগের মৃণ্ময় মূর্ত্তি গঠন ও প্রদর্শন, বঙ্গদেশের কতিপয় প্রধান প্রধান ভোলা ময়রা, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি সেকেলে 'কবির' অনুকরণ, প্রাচীন কবিদিগের পদাবলী আবৃত্তি, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির বাটীতে ফলাদি ভক্ষণ, হস্ত লিখিত প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথি প্রদর্শন, মাইকেল, বঙ্কিম, অক্ষয় দত্ত প্রভৃতির হস্তলিপি প্রদর্শন, বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা অক্ষরের লিথো প্রদর্শন, বাঙ্গালী মুসলমানদিগের এবং খ্রীস্টানদিগের মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চা ও উন্নতি সম্বন্ধে প্রস্তাব, গৌরাবঙ্গোৎসব ১২৫০ সাল হইতে ১৩০৯ সাল পর্যন্ত সমুদয় বাঙ্গলা সম্বাদপত্র ও মাসিক পত্রের তালিকা পাঠ, বঙ্কিম বাবুর স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব, অন্ধ গায়ক বালকগণ কর্ত্তৃক রামপ্রসাদের গীত, মুসলমান বালকগণ কর্ত্তৃক প্রাচীন মুসলমান কবিদিগের কবিতার আবৃত্তি, মেলা এতদ্দেশীয়দিগের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয় প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাহিত্য দরবার ব্রতী থাকিবে। ইহাকে এক প্রকার সাহিত্য-কংগ্রেস (Literary Congress) বলা যাইতে পারে। দেশের প্রধান প্রধান বিদ্বজ্জনগণের অভিমত (ভোট) লইয়া আগামী ফাল্গুন মাসে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। সুপণ্ডিত শ্রীমৎস্বামী ধর্ম্মনন্দ মহাভারতীর মহাশয় অতীব যত্ন পরিশ্রম ও যোগ্যতার সহিত সমুদয় বিষয়ের সুচারুরূপে বন্দ্যোবস্ত ও বিরাট আয়োজন করিতেছেন। পূজনীয় শ্রীমৎস্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর মহাশয় এই মহা সমাগমের সম্পাদক ও প্রধান তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যে ব্রতী হইলেন। সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিলে জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়।

এই বিরাট ব্যাপারে মহাশয়ের ন্যায় সুবিজ্ঞ ব্যক্তির আন্তরিক উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রার্থনায় কৃপা করিয়া এ বিষয়ে মহাশয়ের অভিমত জানাইবেন। এবং আপনার সুবিখ্যাত মাসিক পত্রে এ বিষয়ের উল্লেখ ও আন্দোলন করিলে নিতান্ত বাধিত হইব। আপনি সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিবেন, তিনি আপনার অনুগ্রহাত্মিকা লিপি প্রাপ্ত হইলে পরিতুষ্ট হইবেন। আমার এই 'নিবেদন' পত্রখানি আপনার 'ভারত-সুহৃদ' পত্রে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

নিবেদক—

শ্রীরমদারঞ্জন মিত্র

'সুধা' পত্রিকার সত্বাধিকারী।

সংকলন

ধূমকেতু

ভূমিকা

"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোধখিতঃ।"

জগৎপূজ্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে ধূমকেতুর উদয়ে অমঙ্গল সূচিত হয়। পৃথিবী যখন পাপাচারে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, —পৃথিবীর জীবগুলি যখন নিজেদের অসার সুখে উন্মত্ত হয় এবং জীবনেব উচ্চ ব্রত হইতে স্খলিত হইয়া, ক্রমশঃ অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়ে, তখন ধূমকেতু মঙ্গলময় বিশ্ব-নিয়ন্তার রোষারুণ কটাক্ষরূপে আকাশ প্রতিভাত হয় এবং মানবের মনে ভীতির উদ্রেক করিয়া প্রলয় কি বিপ্লব যে পাপের অবশ্যম্ভাবি ফল, তাহা জানাইয়া দেয়। কিন্তু, ধূমকেতুর মহিমা এই যে, ইহা আশু অশুভ সূচনা করিলেও, ইহার উদ্দেশ্য. ইহার পরিণাম, বড়ই মঙ্গলপ্রদ। যাঁহারা প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘনীয় মঙ্গলময় বিচিত্র নিয়ম মনোযোগপূববক নিরীক্ষণ করিয়াছেন, কিম্বা মানবজাতির ইতিহাসের সহিত একটু পরিচিত আছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, বহু দিনের দূরিত দুর্গন্ধময় পঙ্কিলস্রোত ফিরাইতে হইলে ও সেই স্থানে স্বর্গের মন্দাকিনী প্রবাহিত কারিতে হইলে, প্রলয়-সহচরী প্রচণ্ড-শক্তির আবশ্যক। যদিও তাহা ক্ষণকালের জন্য, সাধারণ শ্রেণীর লোকের নিকট একটা ভয়ঙ্কর অসম্বদ্ধ অমঙ্গল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তথাপি তাহার পরিণাম অসংখ্য জীবেব সুখও শান্তির কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা এই কথার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারিব। যাঁহারা দার্শনিক-ঐতিহাসিক কি বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিক তাঁহারা নিম্নোক্ত এই দুইটি সত্যই এই লোকভয়ঙ্কর বিপ্লবে দেখিতে পাইবেন। প্রথমতঃ পাপ কিছুতেই অনেক দিন দন্তবিকাশ করিযা হাস্য করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বহু দিনের সঞ্চিত পাপের স্তর উড়াইয়া সেখানে দেবসুলভ সুখশান্তি কি স্বর্গের সম্পদ ছড়াইতে হইলে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন। আগ্নেয়গিরি যেমন তাহার ভয়ঙ্কব পূর্ণ বিকাশের বহু পূর্ব্বে ঈষৎ ধূম ও ক্বচিৎ লেলিহান অগ্নিশিখা দেখাইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করে, তেমন ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের বহুপূর্ব্বে, চতুর্দ্দশ লুইর মৃত্যুর পরেই, ফরাশি জাতীয়-হৃদয়ে অসন্তোষ ও প্রতিহিংসার জ্বালা দৃষ্ট হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, কালে যে অশ্রুতপূর্ব্ব লোক-ভয়ঙ্কর ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবে পরিণত হইবে ও সমগ্র পৃথিবীতে প্রত্যেক লোকের প্রাত্যহিক জীবনের একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটাইবে, তাহারই পরিচয় দিতেছিল। পাপ অবশেষে তাহার ধ্বংস আনয়ন করিল। নির্দ্দোষ, অমায়িক ষোড়শ লুই, নিজ শোণিতে, ফ্রান্সের রাজ-সিংহাসন কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। ফ্রান্সের বোর্‌বোন্ বংশের সম্রাটদিগের অত্যাচার ও ক্ষমতার অপব্যবহারের নিদর্শন বা সাক্ষ্য স্বরূপ ভীষণ কারাগার বাষ্টিল রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া গেল! ফ্রান্স তখন তাহার এই উন্মত্ত, অপ্রতিহত শক্তি কোথায় পাইয়াছিল? সমগ্র ইউরোপ তখন ভীত-ভীত নেত্রে কেনইবা এই

মুষ্টিমেয় উন্মত্ত লোক-সংখ্যার দিকে তাকাইতে বাধ্য হইয়াছিল। ইউরোপ তখন বুঝিয়াছিল যে, সুপ্তসিংহ জাগ্রত হইয়াছে। কাজেই ইউরোপের বড় বড় রাজ্যের বাহুবল ও মস্তিস্ক-বল সমবেত চেষ্টা দ্বারা ফরাশি জাতিকে দমন করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছিল।

আমাদের এই ধূমকেতু হঠাৎ কেন এই বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সমুদিত হইল, তাহার কারণ কয়েকটি সরল কথায় নিম্নে লিখিতেছি। মানুষ মাত্রেরই সুখের স্পৃহা আছে। মানুষ অনেক সময় বোঝে না, তাই সুখের প্রকার-ভেদ কবিতে চায় কিন্তু অবসাদ শূন্য অনাবিল সুখই প্রকৃত সুখ এবং জ্ঞান সুখের অক্ষয় প্রস্রবণ। জ্ঞান লাভের দেশকালানুযায়ি পদ্ধতি আছে। আজকাল পুস্তক পাঠ করিয়াই আমাদের অধিকাংশ জ্ঞান লাভ করিতে হয়। সুতরাং দেশ কি ব্যক্তিগত উন্নতি বা অবনতি যে জাতীয় সাহিত্য এবং পত্রিকার উপর নির্ভর করে, একথা বলাই বাহুল্য। বঙ্গসাহিত্যে কর গণিযা কতকখানি পুস্তক পৃথক করিয়া বাখিলে, বাকী পুস্তকগুলি "চাঁড়ালের হাত দিয়া — কর্ম্মনাশা জলে" ইত্যাদি করিলে পুস্তক সম্বন্ধে পাঠকেব কিঞ্চিৎ সুখ-সমাপ্তি হয়। বৎসর বৎসর অসংখ্য অপকৃষ্ট শ্রেণীর গদ্য লেখা বাহির হইতেছে এবং অনেক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকই (যাহারা পেটের দায়ে কাগজ চালান) বদ্ধ পাগলের ন্যায় তাহার সমালোচনা করেন। বিবেকের কুলটাবৃত্তি বড়ই দূষ্য। উচ্চ শিক্ষা লাভ কবিতে হইলে নীচ শিক্ষা ত্যাগ ও তাহার মূল পর্যন্ত নষ্ট করা সমভাবে কর্ত্তব্য। যে সকল অর্থগৃধ্নু সম্পাদক কি লেখক তৈলাক্ত মস্তকে ঘি ঢালিতে অভ্যস্ত, খোসামোদ প্রিয়, কি ব্যক্তি বিশেষের প্রীতিলাভের কাঁচকে কাঞ্চনের মূল দিতে একটুকও দ্বিধা বোধ কবেন না, এবং এইরূপে দেশের উন্নতির, জাতির উন্নতির, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির বিঘ্ন জন্মান, তাহাদিগকে স্বজাতি-দ্রোহী, দেশ-দ্রোহী, কিম্বা বিশ্ব-দ্রোহী, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তীব্র কশাঘাত ব্যতীত তাঁহাদের কিছুতেই চৈতন্য সঞ্চারের সম্ভাবনা দেখা যায় না। সমালোচকের পদে বসিলে বিদ্বেষবুদ্ধি মনে পোষণ করা নিতান্তই অন্যায় ; আবার প্রকৃত সত্য গোপন করাও অন্যায়। সত্য বটে, সমালোচকেব অন্যায় রূপ সম্মার্জ্জনীব আঘাতে অনেক উন্মেষোন্মুখী প্রতিভা, (যাহাতে কালে দেশেব মুখোজ্জ্বল করিবার কথা) অঙ্কুরেই চিরকালের জন্য লয় পায়। মধুর কবি কিট্‌সেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাহার কোমল স্বভাব, জীফ্রের কঠিন সমালোচনা সহ্য করিতে পারিয়াছিল না। সমভাবে দোষ-গুণ আলোচনা করতঃ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিহীন পাঠককে অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক দোষ-গুণ দেখাইয়া অনুভূত সুখের অধিকারী করিয়া দেওযা সমালোচকের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভাল মন্দের আদর্শ কি? কবিতার প্রকৃত সংজ্ঞা কেহ দিতে পারেন নাই। তবে যে গদ্য কিম্বা পদ্য প্রকৃত অবসাদ শূন্য চির-সৌন্দর্য প্রকাশ করে ও আত্মা এবং মনকে সমভাবে উন্নত করে, তাহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। নিত্য নূতন পদ্য গদ্যের আবর্জ্জনার পূতিগন্ধে অস্থির হওয়া ও দীনাহীনা বঙ্গভাষার প্রতি এত জুলুম দেখিয়া, বিশেষ "বঙ্গের উজ্জ্বল আশা" দের ও এই জোর জুলুমে যোগদান করিতে দেখিয়া, হঠাৎ বঙ্গসাহিত্যাকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাব হইল। আশা করি, সাহিত্য-সেবিগণ ইহাকে বিদ্বেষের চক্ষে না দেখিয়া—বঙ্গভাষার ক্ষত স্থানে প্রলেপদানে উদ্যত বলিয়াই, সমহৃদয়তার স্বাভাবিক আকর্ষণে হাস্যমুখে সংবর্দ্ধনা করিবেন।

উদ্ধার।

"The fools are my theme,
Let satire be my song."–
বঙ্গ দেশের অঙ্গ ভর্‌ল
কত কবি গ্রন্থকার,
তবু দেখ্‌ছি্ বঙ্গ ভাষার
উঠ্‌ছে নিত্য হাহাকার।
অমর কবি মধুসূদন
বঙ্গদেশের কপালে,
না হইতে সাঙ্গ ব্রত,
প্রাণ ত্যজেছে অকালে।
বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার,
নাম নিতেই মনে হয়,—
মাতৃভাষায় তরে এরা
কর্‌লেন কত রক্তক্ষয়।
ক্ষণ- জন্মা বঙ্কিমচন্দ্র,
এ দেশে কি হবে আর?
শিয়াল শকুন চাবায় এখন
বঙ্গ ভাষার ভগ্নহাড়!
দীপ্ত সূর্য্য হেমচন্দ্র
অস্তিমিত হয়ে এল,
দেশটা দেখি ক্রমশ:ই
অন্ধকারে ছেয়ে গেল।
কবিশ্রেষ্ঠ নবীনচন্দ্র
হয়েছেন দেশের আশাস্থল,
পত্নীহারা রবীন্দ্রনাথের
বীণায় ঝরে অশ্রুজল!
কবিতা কুঞ্জে ফুটায়েছেন
কত সেফালী, যুঁই, বেলী,
স্তাবকের মতে মোদের
এই বঙ্গ ভাষায় ইনি শেলী।
আলুণি খিচুড়ী পাক করেছেন,
বহু কষ্টে গোসাইজী,
কবির কাব্য বিষয়ে দুচার কথা
এখানে আর বল্‌ব কি।
সবায় দিলেন অর্দ্ধ চন্দ্র,
পাত পেয়েছে প্রমথনাথ,

প্রণামী কিছু মিলেছে বুঝি
নৈলে কেন পক্ষপাত ?
বড়াল কবি স্বভাব কবি,
কবিতায় তার সিদ্ধ হাত,
দোষের মধ্যে একটি দোষ—
বুঝতে পাছে ভাঙ্গে দাঁত।
বঙ্গ দেশের সার ওয়ালটার
হরিসাধন মুখার্জ্জি,
মূল পার্সি হতে গল্প লিখেন
ক'রে বহু কারসাজি।
বঙ্কিমচন্দ্রের আসন লোভী
হারাণচন্দ্র রক্ষিত,
তৈল মাখান ব্রতে ইনি—
হয়েছেন এখন দীক্ষিত।
"হৃদয় লওহে" বলি দেখ
কে অই গড়াগড়ি যায়,
উনি বুঝি প্রেমিক পরাণ
জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।
বর্দ্ধমানের উকীল শ্রেষ্ঠ
তীব্র ব্যঙ্গের সিদ্ধ কবি,
বহুকাল হতে নীরব আছেন
আঁকেন না কোন নূতন ছবি।
তারি পার্শ্বে বসিক প্রবর
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,
অনেক সময়ই রসটা তাহার
পান্‌সে হয়ে যায়।
প্রমথ বাবু করেছেন নাকি
"বঙ্গ ভাষায় যুগান্তর,"
সত্যই এ দেশে এল বুঝি
বুদ্ধিনাশের মন্বন্তর।
আর্ট পেপারে কুন্তলীনের
ছাপায় শুধু চলবে না,
মখমলের বাঁধানে কিন্তু
রাবিশ ঢাকা পড়বে না।
সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক
অক্ষয়কুমার মৈত্র,
ভিন্ন রঙ্গের একেছেন ইনি

সিরাজদ্দৌলা চিত্র,
গোঁসাই প্রভুর মতে ইনি
নূতন কলম্বাস,
তারি বলে লেখা হল
সিরাজ ইতিহাস।
নব্যভারত সম্পাদকটি
অহেতুকী প্রেমেই মত্ত,
বৎসরান্তে লিখে থাকেন
ভারি জটিল তত্ত্ব ;
বই লিখেছেন খান সতর
গ্রন্থকর্ত্তা হওয়াই চাই,
ছাপাখানার লাভ ব্যতীত
বিন্দু মাত্রও কারো নাই।
"প্রমথ বাবুর আবিভাবে
ধন্য হল বঙ্গ দেশ"।
খোসামুদীর কায়দা কানুন
সম্পাদকটি জানেন বেশ।
বঙ্গ দেশের গ্যারী বল্ডি
বলতে কোন দোষ যে নাই,
আত্মা তোমার নহে উচ্চ
যেমন তুমি দেখাও ভাই।
"সাজির" লেখক সুরেশ বাবু
সাহিত্য করেন সম্পাদন,
উদ্দেশে তোমার এ দীন কবি
বরষিছে কুসুম চন্দন।
তীব্র বিশোধকে যদি
শোধিত না কর বঙ্গ ভাষা,
যুগী জোলা গ্রন্থকার হবে
দেশের তবে কোথায় আশা?
বেচারাম কেনারাম এখন
সবাই করে যুগান্তর,
দেশে শুনে কার না ভাই
ফেটে যেতে চায় অন্তর।
দামোদরে চর পরেঁছে
লেখার নাইকো বাঁধুনী
কপালকুণ্ডলা বাঁচাইতে
বিফল তাহার কর্দ্দানী।
যোগেন চট্ট বেতাল ভট্ট

বের করেছেন "ক'নে বউ,"--
বঙ্কিমচন্দ্রের পরে
আহা এমন লেখা পড়েছ কেউ?
বিরহ বিধুর মধুর কবি
এনেছেন "চন্দন" "কস্তুরী' "—
কাঙ্গাল কবি, তাতেই বুঝি
নাম পান নাই "যুগান্তরী"।
অশোক গুচ্ছের প্রিয় কবি,
কি দিয়ে করব সম্ভাষণ,
মাতৃকল্পা ভঙ্গ ভাষা
করুক আশীর্ব্বাদ বরিষণ।
পূর্ব্ব বঙ্গের কীর্ত্তিস্তম্ভ
বান্ধবখানার প্রকাশ দেখি,
অতীত যুগের কথাগুলি
মনের মাঝেতে দিচ্ছে উকি।
সহযোগী "বঙ্গদশন"
"নবজীবন" ত্যজেছে প্রাণ,
একা যদি এ আঁধারে
করতে পারে আলো দান।
নব পয্যায় বঙ্গ দশন
(তোমার) এ নিয়তি কেন ছিল?
এমন করে বাচার চেয়ে
মরে থাকাইত ছিল ভাল।
প্রয়াগবাসী "প্রবাসী" খানার,
ছবিগুলি বেশ মনোরম,
যোগ্যতর প্রবন্ধ হ'লে
কাগজ হত শ্রেষ্ঠতম।
"প্রদীপ" খানার তৈল কমেছে
দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়,
দম্‌কা বাতাসে প'ড়ে আহা
কখন জানি প্রাণটা হারায়।

সমালোচনার সমালোচন।

এই সংখ্যার 'ধূমকেতু'তে আমরা প্রচলিত কয়েকখানি মাসিক সাহিত্য-পত্রের সমালোচনার সমলোচন ও প্রসঙ্গচ্ছলে উহাদের উদ্ধৃত দুই একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। মাসিক পত্রিকার নাম উল্লেখ করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম বঙ্গের গৌরব বান্ধবের নাম উল্লেখ করিতে হয়। যে বান্ধব বাঙ্গলাভাষারূপ তরুর মূলে বহুদিন হইতে জল-সিঞ্চনে নিযুক্ত থাকিয়া, বাঙ্গালা ভাষায়

অতি সুন্দর ও শুদ্ধরূপে গভীর দার্শনিকতত্ত্ব যে একেবারেই লিখা যায় না, এই ভ্রম সংস্কার সকলের মন হইতে দূর করিয়া ছিল, এবং বিষয়ের তৃপ্তিহীন পিপাসায় আত্মবিস্মৃত এবং চঞ্চলা লক্ষ্মীর ঈষৎ হাস্যে নিজকে কৃতার্থ করিতে যাইয়া দিন কয়েক সারস্বত শক্তির উপাসনা ভুলিয়া ছিল, এবং এখন আবার অনুতপ্তচিত্তে নূতন তত্ত্ব লইয়া দীনা বঙ্গভাষার আশাস্থলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—তাহার কথা প্রথমে না বলিলে বঙ্গসাহিত্যসেবীকে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়। এখন বান্ধব সম্বন্ধে কয়েকটি অপ্রিয় সত্য বলিতে চাই। এই বান্ধবকে যখন সুযোগ্য সম্পাদক জ্ঞানবৃদ্ধ চিন্তাশীল পণ্ডিত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর দ্বারা প্রচলিত হইয়াও পুস্তক সমালোচনা কালে ব্যক্তি বিশেষের প্রীতিলাভে কি পর-দু:খ কাতরতায় কি তোষামুদী কি ভ্রূকুটী স্মরণে কাঁচকে কাঞ্চনের মূল্য দিতে দেখি, তখন বাস্তবিকই বড় ক্ষুণ্ন হইতে হয়। ১৩০৯ সনের আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায় শ্রীবিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'বুদ্বুদ' সমালোচনা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে। বুদ্বুদকে বান্ধব সম্পাদক 'সাধুশব্দ গ্রথিত খণ্ডকাব্য' "ইহাতে চিন্তশীল লোক অনেক লোক ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ পাইবেন." ইহার কোন কবিতা আবেগময়" ইত্যাদি লিখিয়া অসমালোচনা শব্দের অন্বর্থতা জন্মাইয়াছেন। ভক্তি বিষয়ে গৌরাঙ্গের নাম লইয়া যাহা খুসী একটা লিখিলেই হবিসংকীর্ত্তনের দলে তিলককাটা বৈরাগী মহালে ভক্ত বলিয়া আদৃত হইলেও কাব্যাংশে সম্মানের আসন পাইবেন, এমন কোন নিয়ম বা চিরন্তন প্রথা নাই। এই প্রকার অসার কতকগুলি পদ্য গদ্যকে বান্ধবের ন্যায় পত্রিকায়— অন্যায়রূপে প্রশংসা করিয়া আর অন্যায়রূপে বান্ধবে ঐরূপ কদর্য প্রবন্ধের স্থান দিয়া সাধারণের হৃদয় ভ্রান্ত করা নিতান্তই অন্যায। আশা করি, বান্ধব ভবিষ্যতে ব্যক্তিবিশেষের প্রীতি কি প্রস্তুতি কি ভ্রূকুটী ইত্যাদি ভাব বৈচিত্র্যে সাধারণের পক্ষে অবান্ধবের কাজ কবিবেন না।

বান্ধবের পরে সাহিত্যের কথা উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত সমাজপতি মহাশয় সুখ-পাঠ্য ও সার-সম্পন্ন প্রবন্ধ ও কবিতা দ্বাবা যথাসম্ভবরূপে ইহার শ্রীসাধন করিতে ছিলেন। তাঁহারই তীব্র, নিরপেক্ষ ও সরল সমালোচনায় রাশি রাশি বাঙ্গালা পদ্য ও গদ্যের আবর্জ্জনার পূতিগন্ধ, কথঞ্চিৎরূপে দূর এবং তাঁহাদ্বারা কিঞ্চিৎমাত্রায় বিশোধকের কাজ হইতেছিল। সাহিত্যের সমালোচনা দেখিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া থাকিতাম। যাঁহারা জিহ্বার কণ্ডূয়ন নিবৃত্তির জন্য কিম্বা মুখরোচক পরনিন্দার জন্য সমালোচকের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমালোচক পদের অবমাননা করেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই আমরা সাধুজন-বিগর্হিত বিশেষণে বিশেষিত করিব। কিন্তু সমাজপতি মহাশয়ের সমালোচনা তেমন ছিল না। যে দিন তাহার সাহিত্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ সেন মহাশয়ের শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ প্রণীত সঙ্গিনীর সমালোচনা দেখিলাম, সেই দিনই বুঝিলাম পক্ষপাতিতা সুরেশ বাবুকে পক্ষাঘাত রোগের ন্যায় ক্রমশ: আক্রমণ করিতেছে। সুরেশ বাবুর কি একটু ভব্যতার খাতিরটা ছাড়ান দিয়া বেওয়ারিশী বাঙ্গলা ভাষায় উপর একটু কৃপা কটাক্ষ করিলে ভাল হয় না? আশা করি, সমাজপতি মহাশয় এইরূপ অসামাজিক কাজ আর না করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

আজ কাল অর্থ-গৃধ্নু ধ্বামাধরা কতকগুলি সম্পাদকের নিকট ধনী লোকদের খুব সুবিধা। লেখক কি কবি বলিয়া যশের আকাঙ্ক্ষী হইয়া, যাহা কিছু একটা প্রলাপ লিখিয়া, পৃষ্ঠায় নিজের বার্ষিক আয়ের একটা তালিকা দিয়া দিলে, কি সম্পাদককে আসমানের চাঁদ একটু হাতে দিবার আশা দিলেই, তিনি তাহার পত্রিকার আগে পিছে কয়েকটা ঢাক ঢোল পিটাইয়া,

তাহার ছবিখানি মুদ্রিত করেন এবং পাত্রিকায় বাহির করেন ও তাহাকে যত প্রকার অসম্ভব প্রশংসায় প্রশংসিত করিতে থাকেন।

আমাদের নব্যভারত সম্পাদক দেবী প্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। তিনি, এই বৈশাখ মাসের নব্যভারতে প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায়, শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের "আরতি" সম্বন্ধে বলিয়াছেন,– "এহেন দেশে প্রথমনাথের জন্ম। এহেন দেশে অকাতরে প্রথমনাথ মুক্তা ছড়াইতেছেন। আমরা কি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করার যোগ্য? তবুও আমাদের প্রতি তাঁহার অতুল দয়া। এই জন্যই ধন্যবাদ দিতেছি।" কিন্তু যে বঙ্গদেশে ক্ষণজন্মা অমর কবি মাইকেলও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পণ্ডিতপ্রবর প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাগ্মিপ্রবর কেশবচন্দ্র সেন ও বিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপক বসু ইত্যাদি এবং আরও অনেক অসাধারণ পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও স্বকীয় জীবনের কার্য্যাবলীতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন এবং ভুলেও নিজ জন্মস্থানকে কি নিজ জন্মভূমিকে, তাঁহাদের অযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই, সেই বঙ্গদেশকে দেবী বাবুর যে কেন প্রমথনাথের জন্মভূমি বলিয়া উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন, তাহার কারণ আমরা বুঝি না। নিতান্ত গাঁজায় দম দিয়া না লইলে অথবা সম্পূর্ণরূপে বিবেককে বলিয়া দিয়া না ফেলিলে এসব লিখা সম্ভব নয়। আর তিনি প্রমথনাথের যে মুক্তা ছড়ানোর কথা লিখিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত সাধারণে কিছুই পায় নাই। তবে দেবী বাবু কিছু পাইতে পারেন কিম্বা পাইবার আশা রাখেন। দেবী বাবু আরও লিখিয়াছেন যে, তাহার আবির্ভাবে দেশ ধন্য হইয়াছে। প্রমথ বাবুর যশ অক্ষুন্ন থাকুক, ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব হইবে না। এ দেশের ধনী লোকেরা সাধারণতঃ যে সকল কর্দয্য আমোদে জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন, প্রমথ বাবু যে তাহা হইতে দূরে থাকিয়া বাণীব চরণতলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হইতেছেন এবং সাহিত্যিক সুলভ যশের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তজ্জন্য আমরা তাহাকে ধন্যবাদ দেই।·

ক্ষণজন্মা বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের সহিত বর্ত্তমান বঙ্গদর্শনে তারতম্য কি--ভাল কি মন্দ, তাহা বিদ্বৎ সমাজের বিচার সাপেক্ষ। আমাদের বক্তব্য এই যে, ভাগ্যবান্ সুকবি বাঙ্গালায় অশ্রুতপূর্ব্ব গীতি কবিতার প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রবাবুর বঙ্গদর্শনে অর্থশূন্য কোন কবি তার সমাবেশ দেখিলে দুঃখিত হইতে হয়। কেবল ছন্দের মিল থাকিলে কবিতা হয় না। কোন শব্দকে উল্টা করিয়া লিখিলে যথা — "বঙ্গদর্শনে"[৯৯] "নের্শদঙ্গব" যেমন শব্দ হয়, অর্থ হয় না, তেমন বঙ্গদর্শনেও মাঝে মাঝে এরূপ অর্থশূন্য কবিতা বাহির হয়। আর এ কথাও মনে রাখা কর্ত্তব্য, যে সকল গল্প কি উপন্যাস মনকে উন্নত করিয়া, হৃদয়কে এক বিমল অবসাদশূন্য আনন্দ-হিল্লোল্লনা দোলাইতে সমর্থ হয় এবং যাহার অভীষ্টচিত্রে উজ্জ্বলতার অভাব অথবা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হেতু আনুষঙ্গিক কালচিত্রগুলি, পাঠককে আকৃষ্ট করে ও চরমের প্রতি উপেক্ষা জন্মায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।

ধূমকেতুর পুনরুদয়ে অন্যান্য পত্রিকা ও পুস্তকের সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আত্মপ্রবঞ্চনা [প্রবন্ধ; প্রথম সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮ পৃষ্ঠার]

১ম ভাগ ২ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩১০

অর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ : বর্ষা [কবিতা] অভাব [কবিতা]

বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্গ-মহিলা

মঙ্গলময় বিশ্ব-নিয়ন্তা, তাঁহার সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ মনুষ্যে নানাবিধ ভাব-বৈচিত্র্যের সমাবেশ করিয়াছেন। কি করিয়া জীবধাত্রী ধরিত্রী, শূন্যপথে পিণ্ডীভূত দ্রব্য-বহ্নির ন্যায় ভ্রাম্যমাণা রহিয়া অনন্তযৌবনা প্রকৃতি- রাণীর শোভা-সম্পদে পরিশোভিতা ও জীব--জন্তুর আবাসভূমি হইল, এবং যাহারা এক দিন বৃক্ষকোটরে বাস, নগ্নদেহে অবস্থান ও অর্দ্ধ-দগ্ধ-মাংসে ক্ষুন্নি বৃত্তি করিত, সেই আদিম মানবজাতি হইতে কিরূপে, স্বভাবে মঙ্গলময় মধুর অনুশাসনে এবং ক্রমবিকাশে, লোকাতিবিক্ত পদার্থপূর্ণ, মানবজাতির দুর্ন্নিরীক্ষ্য রাম-চরিত্র, খ্রীষ্ট, চৈতন্য কি বুদ্ধেব অলোকসামান্য আত্মত্যাগ ও অতলস্পর্শি-বিশ্ব-প্রেম, অলৌকিক প্রতিভার জ্বলন্ত প্রতিকৃতি,— সেক্সপিয়ার, কালিদাস, নিউটন, মিহির,কপিল, কি কণাদের দেব-দুলভ মনঃসম্পদ এবং বোনাপার্টি কি সিজারের আলোক সাধারণ বীরত্ব ফুটিয়াছিল, তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। তবে যে একটি বিশেষ স্বভাব মানবজাতির অতি প্রাথমিক অবস্থা হইতে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, এখানে তাহারই কথা আমি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিব।

সহানুভূতি ও সঙ্গপ্রিয়তার স্বাভাবিক আকর্ষণে মানুষ কখনও একাকী থাকিতে পারে না। একত্র দলবদ্ধ হইয়া থাকাই মানুষের স্বভাব,—মানুষ সামাজিক জীব। ইউরোপের জ্ঞানগুরু এরিষ্টটল্ বলিয়া গিয়াছেন যে, মানুষ কখনও একাকী থাকিতে পারে না। যে পারে, সে হয় দেবতা, না হয় পশু। তাঁহার এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে কাহারও অধিক সময়-ক্ষেপ করিতে হয় না। বর্দ্ধিতায়তন সমাজের নামই জাতি। দেশ-ধর্ম্ম-বিশেষে মানব-জাতি বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সমাজের দুইটি অঙ্গ—স্ত্রী ও পুরুষ। এই সসাগরা পৃথিবীর বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে রীতিনীতি সম্বন্ধে, পরস্পর পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও, এই একটি বিষয় সকল জাতির মধ্যেই সাধারণ। সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে, কোন দেশের কোন সমাজেও, স্ত্রীলোকেরা জড়পিণ্ডের ন্যায় সমাজের একটা দুর্ব্বহনীয়, অনাবশ্যকভার বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তথাপি আমরা যখন কোন জাতির উত্থান, পতন, উন্নতি, অবনতি,—জাতীয় চরিত্র, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করি, তখন প্রায়ই সেই জাতির অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, সংসাব-রঙ্গভূমিব কর্ম্মক্ষেত্রে ক্কচিৎ দৃষ্ট অর্দ্ধ অঙ্গকে— যে অর্দ্ধাঙ্গ যবনিকার অন্তরাল হইতে আপনার অদৃশ্য প্রভাব বিকীর্ণ করে এবং সমগ্র জাতিটাকে মাতৃস্নেহের পীযুষধারায় ফুটাইয়া তুলে, অনাবশ্যক বোধে ভুলিয়া যাই। কিন্তু এখন সমাজবিজ্ঞানের কাঠোর পরীক্ষায়, এই চিরসত্য, বুদ্ধিমান মাত্রেই অতি সহজে বুঝিতেছেন যে, সমাজের এই দুইটি অঙ্গ সমভাবে উন্নত হইলে, জগতের কল্যাণ হয় ও সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট লাভের পথ উন্মুক্ত হইবার সুযোগ ঘটে; অন্যথা, সমাজ অর্দ্ধ-বিকশিত ও রুগ্ন হয়, এবং পৃথিবীতে অধিক দিন তাহার অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকে না। সে যাহা হউক এই প্রবন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্গ মহিলাগণ কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং কিরূপে তাঁহাদের অগ্রসর হওয়া উচিত, তাহাই আমাদের সংক্ষেপে আলোচ্য।

সাহিত্য সমাজের প্রতিকৃতি। যে কোন জাতির সাহিত্য পাঠ করিলে, আমরা তাহাদের আচার বিচার ও রীতি নীতি সম্বন্ধে অনেক কথা ন্যুনাধিকরূপে জানিতে পারি। সুতরাং যে স্থলে সমাজের সহিত সাহিত্যের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এবং স্ত্রী লোকেরা যখন সেই সমাজের

একটি অঙ্গ এবং পুরুষ অপেক্ষা প্রয়োজনীয়তায় কোন অংশেও ন্যূন নহে, তখন সাহিত্যের উন্নতি বা অবনতি যে, সমাজের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের উপর সমভাবে নির্ভর করে, এ কথা বলাই বাহুল্য। সৌভাগ্যক্রমে এখন বঙ্গমহিলাগণ, তাঁহাদের অন্তঃ পুরের সার্ব্বভৌম আসনে থাকিয়াও সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেছেন, এবং মাতৃভাষাকে নানারূপ মনোহর পুষ্পালঙ্কারে সাজাইতে অগ্রসর হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের উপর তাঁহাদের এই গভীর আন্তরিক অনুরক্তি আমাদের সৌভাগ্যই সূচনা করিতেছে। তাঁহাদের স্নেহকোমল কর-স্পর্শে ইহার লাবণ্য বৃদ্ধি পাইবে, ইহা আশা করাও অন্যায় নহে। বঙ্গমহিলারা পৃথিবীর কোন সুশিক্ষিত জাতির ললনা অপেক্ষা স্বাভাবিক বুদ্ধি কিম্বা প্রতিভায় হীনপ্রভ নহেন— তবে একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার অভাবই তাঁহাদিগকে অনেক নিম্নে রাখিয়াছে। স্বাভাবিক বুদ্ধি কিংবা প্রতিভা, খনি হইতে সদ্যঃ উত্তোলিত স্বর্ণ কি হীরক ; শিক্ষাদ্বারা তাহার বিকাশ অথবা শ্রীসাধন না হইলে, তদ্দ্বারা জগতের কোন বিশেষ কাজ সাধিত হয় না। প্রায় সকল বঙ্গ লেখিকাই, বাঙ্গালা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা জানেন না, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ দখল নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের এখনও এত সম্পদ হয় নাই যে, আমরা শুধু বাঙ্গালা পড়িয়া উপযুক্তরূপে শিক্ষিত ইহতে পারি। দরিদ্রের ভাল ছেলে যেমন সৌভাগ্যসূচনায় অতিরিক্ত আদরে নষ্ট হয়, আমাদের বাঙ্গালা ভাষারও সেইরূপ অবস্থা হইতে চালিয়াছে। একেত বাঙ্গালা সাহিত্যে মৌলিকতার নিতান্ত অভাব — যাহা আমরা সারসম্পন্ন প্রবন্ধ বলিয়া চীৎকার করি, তাহা প্রায় স্থলেই ইংরেজির অনুবাদ, তাহাতে আবার ব্যক্তিমাত্রেই গ্রন্থকার ;—যাঁহারা অর্থে স্বচ্ছল কিম্বা বেশীর মাত্রায় গলাবাজি করিতে পারেন, তিনি তাহার পতাকার তলে, স্তাবকের দল একত্র করেন এবং যুগান্তরী (?) নাম ধারণ করিয়া আনন্দে গদগদ হন। কেবল তরজমা পড়িয়া পণ্ডিত হইবার আশা করা কাহারও পক্ষে উচিত নয়। এখন দেখিতে হইবে যে, বাঙ্গালা ব্যতীত আর কোন ভাষা, (যাহাতে অসংখ্য অমূল্য রত্ন সংগৃহীত আছে) আমাদের সহজে ও সুবিধার সহিত আয়ত্ত হইতে পারে। এই স্থানে সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্য সর্ব্বাগ্রে আমাদের চক্ষে পড়ে। প্রথমটি আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষদের সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদের শিক্ষা করা কর্তব্য। দ্বিতীয়টি সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তার জন্য শিক্ষা করা উচিত। বঙ্গমহিলাদের কোন কিছু লিখিবার পূর্ব্বে, ইংরেজী ও সংস্কৃতে পারদর্শিনী হওয়া একান্ত উচিত, এবং এই দুই ভাষায় অমর কবিদের অমূল্য চিত্রগুলি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা সঙ্গত। কিছুই পড়িব না, কিছুই শুনিব না, কেবল আসমানের চাঁদ দেখিব, কোকিলের ডাক শুনিব, আর অমনি তরতর বেগে যাহা খুশী একটা কবিতা লিখিব, এ কল্পনা বড়ই অন্যায়। শুধু কবিতা লিখা কি সাহিত্য চর্চ্চার জন্য যে স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন, তাহা নহে— সমগ্র মানবজাতির উন্নতিকল্পে তাঁহাদের শিক্ষা আবশ্যক। মাতা শিক্ষিতা থাকিলে, স্তনন্ধয় শিশু, স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে নানা কথা শিখিতে পারে ও তাহা যেমন তাহার অস্থিমজ্জাগত হয়, তেমন আর কিছুই হয় না। মাতৃভাষায় কেন আমাদের এত দখল এবং অন্য ভাষাই বা কেন প্রাণপণ করিলেও এরূপ আয়ত্ত হয় না?—না, ইহা মায়ের ভাষা, ইহা স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিক্ষা করি। সংস্কৃত ইংরেজী শিক্ষা করিতে হইলে, যে পরিমাণ যত্ন, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাঁহাদের ভিতরে অনেকেরই উহার অভাব, এবং সেই জন্য তাঁহাদের

জ্ঞানও অতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে সময়ের বা অবকাশের আপত্তি প্রায় কেহই উত্থাপন করিতে পারেন না, ধন, মান, যশঃ সকলই যে বহুপরিমাণে পূর্ব্বোক্ত গুণগুলির উপর নির্ভর করে, তাঁহারা তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না। সর্ব্বপেক্ষা দোষ আমাদের। আমরা গর্ব্বের সহিত লোক-সমাজে বাহির করি যে, এই কবিতা বোধোদয় পাঠিকার লেখা, ইহা কথামালা-পাঠিকার লেখা ইত্যাদি। বোধোদয়-পাঠিকার কবিতা, তাহার ক্ষুদ্র পরিবারের সঙ্কীর্ণ সীমায় আনন্দ বিকীণ করুক, তাহাতে ক্ষুদ্র পরিবারে সঙ্কীর্ণ সীমায় আনন্দ বিকীর্ণ করুক, তাহাতে কাহাবও সুখ বই কোন আপত্তি নাই। কিন্তু জনসাধারণের নিকট তাহার মূল্য কি? আমরা বোধেদয়-পাঠিকাকে এইজন্য দীর্ঘজীবিনী হইয়া জ্ঞানানুশীলনে রত থাকিতে আশীর্ব্বাদ করিতে পারি মাত্র, কিন্তু তাহার কবিতার তত উচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি না। যথাসাধ্য স্ত্রীলোকদের উচ্চ শিক্ষাব পথ পরিস্কার করিয়া দেওয়া, তাঁহাদের গুণের যথেষ্ট প্রশংসা করা এবং অতিরিক্ত মিষ্ট খাওয়াইয়া অঙ্কুরে নষ্ট না করা, সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য। অপিচ এই বিশ্বসংসার যেমন একটা পাগলফাটক নয়, ইহার যেমন একটা উদ্দেশ্য ও সার্থকতা আছে, ইহার প্রত্যেক পরমানু যেমন বিশেষ মঙ্গলোদ্দেশ্যে সৃষ্ট, এমন কি, একটি শিশির বিন্দুও অকারণে ভূমিতে পতিত হয় না, তেমন মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি ভাষায় গ্রথিত হইয়া, কবিতাকাবে প্রস্ফুটিত হইবারও একটা উদ্দেশ্য আছে। শব্দে শব্দে মিল থাকিলে যে কবিতা হয় না, ইহা অনেকেই জানেন। কবিতা কাহাকে কহে এবং তাহাব উদ্দেশ্য কি, তাহার বন্ধু চেষ্টা করিয়া সম্যকরূপে না বুঝাইতে পারিলেও, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর সকলেই জীবনের কোন না কোন সময়ে কবি হন এবং ন্যূনাধিকরূপে কবিতা বোঝেন। উহার বিশ্বব্যাপিনী জগন্ময়ী শক্তি চিরকাল কাহারও নিকট একেবারে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে না। ইহাব কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে ইহা জীবনের আংশিক জীবন-শক্তি ও সর্ব্বব্যাগিনী সঞ্জীবশক্তির ক্রমবিকাশ নীতির সহায়তাকারী। সুতরাং আত্মাকে উন্নত করা কবিতার যে একটি মূখ্য উদ্দেশ্য এবং তদুপলক্ষে ইহাব বিষয়গুলি যে উচ্চ অঙ্গে হওয়া আবশ্যক, তাহাতে বোধহয় অনেকে দ্বিধাশূন্য। আজ কাল বঙ্গ-মহিলারা যে সমস্ত বিষয় ধরিয়া কবিতা লিখেন, তাহা নিতান্তই সামান্য। সেও ফুলের হাসি ও ফুলের বিয়া ও পূর্ব্বাপর সেই মামুলী উচ্ছ্বাস। কাব্যে সুন্দর ও দেবোপম চরিত অঙ্কিত করে কেন?— না, তাহা দেখিয়া মানুষ সুন্দর হইবে। এবং কুৎসিত চিত্র আঁকিয়াই বা কেন মানুষের মনে বীভৎস রসের সঞ্চার করে?- না, তাহা দেখিয়া মন্দের উপর ঘৃণা জন্মিবে। যে কবিতা মানুষকে দুই হাত উর্দ্ধে উঠাইতে না পারিল, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ ও প্রলাপমাত্র। বাঙ্গালাভাষায় বঙ্গমহিলাদের প্রণীত পুস্তকগুলির প্রত্যেক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া, দোষগুণ বিচার করিতে বিস্তর সময় ও পাঠশালার গুরুমহাশয় সুলভ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। মোটামোটি বলিতে গেলে, শ্রীমতী কামিনী রায়, শ্রীমতী মানকুমারী এবং শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী বাঙ্গালা সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবার যোগ্যা। প্রায় বার আনা বাঙ্গালা লেখকদের বহু উপরে তাঁহাদের আসন। আরও কয়েকটি মহিলা কবি আছেন, যাঁহাদের মাঝে মাঝে অতি সুন্দর জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের পরিমাণ অতি অল্প। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গীয় ললনাদিগের মধ্যে, কবিতা লিখন, কি কাব্য চর্চ্চা প্রায় ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,

তাঁহাদের ভিতর এত শীঘ্র এত উন্নতির প্রসার দেখিয়া, সকলেরই মনে আনন্দের উদ্রেক হয়। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রীলোকের পক্ষে এই যথেষ্ট ; কিন্তু যথেষ্টবাদ উন্মেষোন্মুখী প্রতিভার আবাহনস্বরূপ হইলেও ক্রমে ক্রমে ইহাকে আপাত তিক্ত সমালোচনায়, পরিণামে যাহাতে মধুর হইতে মধুরতর ফলে পরিণত করা যাইতে পারে, তৎসম্পর্কে সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আশা করি, বঙ্গমহিলাগণ আমার এই প্রবন্ধে সমালোচনার আনুষঙ্গিক ও মধ্যে মধ্যে অপরিহার্য্য অপ্রীতিকর কথার দোষ গ্রহণ করিবেন না এবং ইহাও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি তাঁহারা দয়া করিয়া, তাঁহাদের অবকাশ সময়ে, ধূমকেতুকে কিয়ৎক্ষণের জন্যও সঙ্গী করেন, তাহা হইলে জ্ঞানবিশ্বাস মতে আমাকে দেশে ও সাহিত্যের মঙ্গলেচ্ছু জানিয়া অন্তরের সহিত ক্ষমা করিবেন।

শ্রীন--

সমালোচক।

"Seek roses in December,– ice in june ;
Hope constancy in wind, or corn in chaff,
Believe an woman, or an epitaph,
or any other that's false, before
You trust in critics."

(১)

চিন কি ইঁহারে? — ইনি সম-আলোচক,
মসী-যুদ্ধে মহাবীর,
প্রিয় পুত্র ভারতীর,
সাহিত্য কানন-মাঝে জ্বলন্ত পাবক,
যত কিছু—ধূলি, মাটি,
যা' কিছু ইহার—খাঁটি,
আবিলতা মাঝে ইনি পূত গঙ্গোদক,
চিন কি ইঁহারে?—ইনি সম-আলোচক।

(২)

চিন কি ইঁহারে? ইনি সম-আলোচক,
সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প,
কিছুতেই নন অল্প,
বিশ্বগ্রাসী জ্ঞান-গর্ব্ব জ্বলে ধক্ ধক্,

অপূর্ব্ব শকতি দিয়া,
দিচ্ছে বিধি পাঠাইয়া,
নেতৃ-হীন বাঙ্গালার সাহিত্য-রক্ষক,
চিন কি ইঁহারে?— ইনি সম-আলোক।

(৩)

চিন কি ইঁহারে?— ইনি সম-আলোচক,
করিত্বে—বায়রণ, শেলী,
উপন্যাসে—স্কট, ডলি,
ব্যারিস্টারে "বেলান্টাইন," বিচারে "পিকক,"
লেখনী বরিষে বিষ,
রোষ-দীপ্ত অহর্নিশি,
ফণা আস্ফালিয়া, যথা ভীষণ তক্ষক,
চিন কি ইঁহারে?—ইনি সমআলোচক।

(৪)

চিন কি ইঁহারে?— ইনি সম-আলোচক,
ধর্ম্মের বিমল তত্ত্ব,
এঁর কাছে পাবে সত্য,
বৈরাগ্যে চৈতন্য, ইনি জ্ঞানে বিনায়ক,
ন ভূত ন ভবিষ্যতি,
সর্ব্বদর্শী মহামতি,
বিনা এ বাঙ্গালা রাজ্য, বাঙ্গালী পাঠক
চিন কি ইঁ হারে?— ইনি সম-আলোচক।

(৫)

চিন কি ইঁহারে?—ইনি সম-আলোচক,
ইঁহার প্রতপ্ত শ্বাসে,
অনল বহিয়া আসে,
মুহূর্ত্তে মলিন করে কবিতা-কোরক,
ক্রোধান্ধ রক্তাভ আঁখি,
দেখিলে কাতরে ডাকি
বলে মা ভারতি, রক্ষ সাহিত্য-সেবক,
চিন কি ইঁহারে?— ইনি সম-অলোচক।

(৬)

চিন কি ই হারে?—ইনি সম-আলোচক,
"সুবুদ্ধি"—লেবেল মাথে,
জ্ঞানের দাঁড়ায়ে যেন ত্রিকাল-দর্শক,
রসনা সেলাইর কল,
চলিতেছে অবিরল,
চিন কি ই হারে?—ইনি সম-আলোচক।

(৭)

চিন কি ইহারে?—ইনি সম-আলোচক,
এমন অদ্ভুত কর্ম্মা,
এমন পরের ছিদ্রে জিহ্বালক্ লক্!
খোঁজ যদি অনিবার,
পাইবে না কোথা আর,
সাহিত্যের অনারেরী এমন শাসক,
চিন কি ইঁ হারে?— ইনি সম-আলোচক।

শ্রী অর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

আমাদিগের মাতৃভাষা।--
বাঙ্গালা।

আমরা যেমন বহুরূপী, আমাদিগের ভাষাও তেমনই বহুরূপিণী। আমাদিগের এক মূর্ত্তিতে শ্রুতি, স্মৃতি, সংহিতা ও পুরাণ, আর এক মূর্ত্তিতে কায়দা, কানুন, বয়েত ও কোরাণ। এক মূর্ত্তিতে হিষ্টরি, মিষ্টরি, সাইএন্স ও বাইবেল, আর এক মূর্ত্তিতে, অনুকরণ, অনুসরণ ও পরস্বসম্বল অদ্ভুত উদ্ভাবন। আমাদিগের ভাষাও, এই হেতু, ভিন্ন ভিন্ন অনন্ত মূর্ত্তির হাতে পড়িয়া, ভিন্ন ভিন্ন অনন্ত মূর্ত্তিতে গঠিত। এই ভাষাগত অনন্ত রূপের বিশদ প্রকাশ-প্রদর্শন, ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কর্ম্ম নহে। অতএব, দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রধান প্রধান কএকটির মাত্র আংশিক নমুনা এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।—

মস্তকে জটাজূট, বদনে নিবিড় শ্মশ্রু, ললাটে রক্ত চন্দনের উজ্জ্বল ফোঁটা, কণ্ঠ, কফোণি ও কব্জায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরিধানের রক্তাম্বর, ঐ যে বপুষ্মান ভৈরবমূর্ত্তি দণ্ডায়মান, উনি বাঙ্গালার তান্ত্রিক হিন্দু, — শক্তিভক্ত শাক্ত। এই শ্মশান-চারী, শবাসন, শব-সাধকের রসনাস্পর্শে ক্ষীণা বঙ্গভাষাও, ভৈরবীর ভীমকণ্ঠ, শব্দ-তরঙ্গে, কেমন গর্জ্জিতে শিখিয়াছে, — পাঠক সর্ব্বাগ্রে গর্জ্জনের অভাস একটু দেখিয়া রাখুন।—

"দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা জিহ্বাললনভীষণা।
ব্যাদিত-বদনা ঘোরা নিমগ্ন-রক্তনয়না।"
"বিগলিত কেশে, অবনী পরশে, প্রকাশে জিহ্বা লোলনী।
আলম্বিত গলে, মুণ্ডমালা দোলে, দুর্দ্দর্শনা স্মেরাননী।"

"মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভমম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজূট সংঘট্টগঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥"
"দক্ষে মহাকাল, গলে মুণ্ডমাল, কপাল খট্টাঙ্গ করে।
রতন-রচিত, মুকুট সহিত, কটা জটা ভার শিরে॥
ধূম্রবর্ণ কায়, অতি শোভা পায়, চিতাধূলি আলেপন।
ভূষণ নাগেন্দ্র, শিরে অর্দ্ধচন্দ্র, মুদ্রিত ঘূর্ণ লোচন॥'

এই শাক্তধর্ম্মাবলম্বিনী হিন্দু বাঙ্গালাকে, বোধ হয়, ভৈরবী বাঙ্গালা নামে নির্দ্দেশ করা অন্যায় নহে।

আবার উহারই পার্শ্ব দেশে, এই যে মুণ্ডিতমস্তক, শ্মশ্রু-গোঁফবিহীন, নারীভাবাপন্নবদন, তিলকাঙ্কিত, ভিক্ষান্নজীবী, ক্ষীণদেহ কৌপীনধারী নতমস্তকে ও কাতর-প্রাণে, যাহাকে

পাইতেছে, বাহু মেলিয়া কোল দিতেছে ; অথবা যাহাকে দেখিতেছে, তাহারই পায়ে গড়াইয়া পড়িতেছে ; আর দীন-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া, কাহার ভাবে গলিয়া, কি যেন দুঃখে আত্মহারা হইয়া, কেবলই গদ্‌গদ কণ্ঠে কাঁদিতেছে ; পাঠক, ইহার করুণ-বিলাপেও একবার কর্ণপাত করুন।—

"ধরণী ধরিয়া ধনি, কত বেরি বৈঠই
পুন তহি উঠাই না পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি,
নয়নে গলয়ে জলধারা।।"
"আরে মোর গৌর কিশোর।
রজনি বিলাস রস-ভাবে বিভোর।।
কহইতে গদ গদ কহই না পার।
নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার।।
প্রেম-রসে ঢুলু ঢুলু অরুণ নয়ান।
কহই সরস বিরস বয়ান।।"
"শ্যামল সুন্দর নব-ঘন-রূপ,
চাচর চিকুর রাশি।
অঙ্গ হেলায়িত চূড়া দোলায়িত,
নীল পদ্ম যেন, যুগল নয়ন,
কি বাঁকা চাহনি ছাঁদ।
ব্রজ-গোপ-বালা মানস-মোহন
অই সে গোকুল চাঁদ।।
শোভে বামে যেন বিজলীর ছটা,
শ্রীরাধা রমণী-মণি।
শত চাঁদ গলি এক ঠাঁই মিলি
অমিয় মূরতি খানি।।
দাঁড়াল আসিয়া মধুর হাসিয়া
মধু এ মাধুরী সনে,
মধুর রূপের যুগল মিলনে,
মধুর বাঁশীর গানে,
উথলিল হিয়া যমুনা আমার,
উছলি উজান ধায়।
স্বর্ণ-কমলিনী শ্যাম সরোবরে
থে'কে থে'কে ডুবে যায়।।"

ইহাই আমাদিগের ব্রজবুলি-বিলাসিনী বৈষ্ণবী বাঙ্গালা।

ঐ গুরুগর্জ্জন ভৈরব, আর এই বিলপমান দীন বৈষ্ণব, উভয়েই বাঙ্গালী ; এবং ভৈরবের ঐ তাণ্ডবসঙ্গীত আর বৈষ্ণবের এই করুণ মূর্চ্ছনা, এ উভয়ই বাঙ্গালা। তথাপি, একদেশীয় বা একজাতীয় বস্তু বলিয়া সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। শাক্ত বাঙ্গালা "তেজস্বিনী, প্রগলভা ও প্রখরা" বৈষ্ণবী বাঙ্গলা মৃদুকলনাদিনী মৃদুবিলাসিনী ও মধুরা।

হিন্দু বাঙ্গালার আরও বহুরূপ আছে। সুদীর্ঘ কেশ, করবী আকারে, উর্ধ্বেমুখে নিবদ্ধ, বদনে শ্মশ্রুলম্বিত, গলায় তুলসীর মালা তৈলসিক্ত আলখেল্লা গায়, ঐ যে স্থূলকায় লোকটি খঞ্জনীর তালে তালে মাথা ঢুলাইয়া ঢুলাইয়া গাইতেছে, —

"সাঁই কর , ঠাওর নৈলে কপনী কাঁথা।

*　　　　*　　　　*

মাঝ গাঙ্গে বকা চরে শুকিয়ে উঠল ফলের মাথা।"

ইহাও একপ্রকারের বাঙ্গালা। এই শ্রেণীর আউলী বাঙ্গালা আউল বা বাউলদিগের সাধনার ভাষা।

ত্রিপুণ্ড্র–লাঞ্ছিত–ললাট, স্কন্ধলম্বিত–নামাবলী, পুষ্পমাল্যশোভিত কণ্ঠ, মার্জ্জিতযজ্ঞসূত্র ব্রাহ্মণ সুসজ্জিত ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া, চিত্তপুত্তলিকার ন্যায় নীরবনিষ্পন্দ শতাধিক শ্রোতাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিতেছেন, —"নৈমিষারণ্য ক্ষেত্র মধ্যে সূত বক্তা, সৌনকাদি মুনি সকল শ্রোতা। কতি কতি ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন পরিভাগেতে, কতি কতি মৃগচর্ম্মাসন পরিভাগেতে, কতি কতি কুশাসনপরিভাগেতে মুনিসকল উপবেশনপূর্ব্বক, মধ্যস্থলে সূতকে উচ্চাসন প্রদান করিতেছেন। আর সূত নিকটে ভুয়োভূয়ঃ পৃচ্ছা করিতেছেন, —বাপরে সূত, সেই যে পুরাণীয়া অপূর্ব্বা কথা, তাই শ্রবণে ঐকান্তিকী বাসনা, অদ্য পুনঃ তাহা কীর্ত্তন ক'রে, অস্মদীয়া শ্রুতির তৃপ্তি সাধন কর বাপ্।"

বলা বাহুল্য, ইহাই আমাদিগের পাঠকী বাঙ্গালা।

ইজার পরা, চাপকান গায়, তাজ বা টুপি মাথায় ঐ যে মিঞা বা মৌলবী সাহেব দণ্ডায়মান, উনিই বহুরূপী বাঙ্গালীরই এক অতি প্রসিদ্ধ রূপ। উহার লেখনী নিগলিত বা মুখবিনিঃসৃত "পলাণ্ডু সুবাসিত" ভাষাও একপ্রকারের বাঙ্গালা বটে। এই বাঙ্গালাকে মুসলমানী বাঙ্গালা বলা যাইতে পারে। মুসলমানীর গীত ও কবিতা এইরূপ :

"মোরে মিলাইল এলাহি রব্বণা।
আমার দূরে গেল দেলের ভাবনা॥
যার জন্য পেরেসান, আছিল আমার প্রাণ,
তারে পেয়ে ঘুচিল যন্ত্রনা।
কাণা পায় চক্ষু দান, মড়া যেন পায় প্রাণ,
যেমত কাঙ্গালে পায় গাইবি খাজানা।"

"যে জন রসিক হবে এই পুস্তকের।
পড়িয়া পাইবে মজা আওয়াল আখের।
"আশমানেতে মারে তুরি জমিনের উড়ে ধূল,
জমিনেতে মারে তুরি পরবতের ভাঙ্গে চূড়া
দালান কোঠা বালাখানা ভাইঙ্গা করল গুড়া।" ইত্যাদি।

অধুনা বাঙ্গালার আরও কএকটি অভিনব মূর্ত্তি বিকশিত হওয়াছে। সে কএকটিরও কিছু কিছু নমুনা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। — "শ্রীমতী মানময়ী চক্রবর্ত্তী অনুতাপের ভিতর দিয়া কিরূপে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সুন্দর ভাষায় বক্তৃতা করিয়া, অজস্র করতালির মধ্যে আসন পরিগ্রহ করিলেন। তৎপর শ্রীমতী দ্রবময়ী চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, — 'সন্তানের প্রতি মাতার প্রেম যেরূপ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়, এরূপ আর কাহারও প্রতি হয় না। এই মাতৃপ্রেম প্রত্যেক সন্তানে উপভোগ করে" সর্ব্ব শেষে শ্রীমতী বিলাসিনী ঠাকুর উপাসনা বিষয়ে কিছু বলিলে, সভা ভঙ্গ হয়।"

বডি ও সেমিজে ঢাকা, গাউনের গুমরে গৌরবিনী নূতন ঢংএর শাড়ী পড়া, মুদ্রিতনয়না এই বহুভাষিণী বাঙ্গালার নাম কি, না বলিযা দিলেও, বোধ হয়, পাঠক তাহা বুঝিতেছেন,— এই বাঙ্গালাই বঙ্গীয় ব্রাহ্মিকা। ব্রাহ্মিকার বিশেষত্ব এই যে, তিনি স্ত্রীলোকের নামে পুং উপাধি যুড়িয়া দিয়া ভাষায় এক নূতন রং ফলাইয়া লইয়াছেন। ব্রাহ্মিকা মাতৃ স্নেহকে 'মাতৃপ্রেম' বলিতেই বেসী ভাল বাসেন। এবং 'মাতৃপ্রেম' প্রত্যেক সন্তানকে উপভোগ করাইয়া সুখী হন।

ঐ যে বাঙ্গালীর ঘরের নবীনা নীরদবরণী, পালকে পাউডারে ও পমেটামে বিলাতী বিবি সাজিয়া গাউন ঢুলাইয়া এক হাতে উঠানে ঝাড়ু দিতেছেন, এবং আর এক হাতে 'গঙ্গাপানি' ফেলাইয়া দিয়া জর্ডানের জলে পাপ ধুইতেছেন। উনিই খৃষ্টানী বাঙ্গালা।—

খৃষ্টানী বাঙ্গালা আব এক শ্রেণীর পদার্থ। —

"সঙ্কটেব সময়, তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ক্রন্দন করে।"

জীবং ঈশ্বরের চলৎমণ্ডলী, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরমধন্য স্বর্গীয় পুরুষ প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সতী, সাধ্বী ভার্য্যারূপে পরিগণ্যা হইয়া স্বীয় সৌভাগ্য ও গরিমাব পরিচয় দান করিতেছে।"

"শাস্ত্রে আরও বলে যে, প্রাচীনেরা উত্তমরূপে পালকের কর্ম্ম করে, বিশেষতঃ যাহারা প্রভুর বাক্যে ও শিক্ষাদানে পরিশ্রম করে, তাহারা দ্বিগুণ সমাদরের যোগ্য গণিত হউক।"

"গীতে বলিও না। পাছে পালষ্টিনের দুহিতারা আনন্দ করে। পাছে অচ্ছিন্ন ত্বকদের দুহিতারা আহ্লাদে নৃত্য করে।"

"ঈশ্বরদত্ত বাইবেল শাস্ত্র আমাদের পথেব প্রদীপ ও আমাদের চরণের আলোক।"

ব্রাহ্মিকা ও খৃষ্টানী বাঙ্গালা স্থূল দৃষ্টিতে বিভিন্ন হইলেও, মূলে প্রায় একই শ্রেণীর জিনিষ। যেন একই মায়ের পেটের দুটি বোন। অথবা একই শিক্ষয়িত্রীর দুটি ছাত্রী। ব্রাহ্মিকা বলিবে 'স্বর্গীয়া জ্যোতি', খৃষ্টানী বলিবে 'স্বর্গীয় সমাচার'। ব্রাহ্মিকা বলিবে 'জীবন্ত ঈশ্বরের জ্বলন্ত

প্রমাণ,' খৃষ্টানী বলিবে, 'জীবৎ ঈশ্বরের চলৎমগুলী'। ব্রাহ্মিকা চাহিবে 'অন্ধকার হইতে আলোকে' যাইতে আর খৃষ্টানী চাহিবে, 'বাইবেল শাস্ত্রকে, আপনাদিগের 'চরণের আলোক', বানাইতে। এই প্রভেদ।

ঐ চশমাধারী, আলবার্ট তোলা বাবুটি সিগারেট টানিতে টানিতে যে এক অদ্ভূত বাঙ্গালার অবতারণা করিতেছেন এবং যে বাঙ্গালা, সময়ে সময়ে, স্বরূপ বর্ণনার অছিলায় কালী কাগজে মুদ্রিত হইয়া রসিক পাঠকের হাতে নূতন রসের নূতন এক ফোঁয়ারা খুলিয়া দিতেছে, তাহারও বহুরুপিণী বাঙ্গালারই এক রূপ বটে।

"ক্যালিবান উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ইংরেজীধরণে, মৃদু মধুর হাস্য করিয়া ঘটকের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল,— "হাল্লো গুড্‌মনিং মেষ্টার মহিম চাণ্ডার।"

"রিসিভ্ করার ভার আমিই এক্‌সেপট করেছি।"

প্রফেসার রো সাহেবের নির্দ্ধারিত "বাবু ইংলিশের' মত, ইহাকেও বাবু বাঙ্গালা বলা যাইতে পারে। অথবা ইহাকে ইঙ্গবঙ্গভাষা বা জঙ্গলা বুলী বলিলেও মন্দ হয় না।

আর এক শ্রেণীর ইঙ্গবঙ্গভাষা এক্ষণ কখন স্থায়ী সাহিত্যিক গ্রন্থাদিতেও মুদ্রিত হইতেছে। ইংরেজীর নিকৃষ্ট বাঙ্গালা অনুবাদে এই ভাষার সৃষ্টি। "এখান হইতে লাগে কত দিন, যাইতে চাটগা এবং খুস্কিতে,"— ঐ বাঙ্গালা কতেকটা এই শ্রেণীর বস্তু ! সুখের বিষয় এই যে, এইরূপ বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা ইংরেজী, কুত্রাপি বাঙ্গালারূপে পরিগৃহীত হয় নাই।

যাহা হউক, আমবা বহুরূপিণীর এই ধাঁধাঁখানায় পা বাড়াইয়া প্রথমেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। মাতৃভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ করি, ইহাই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু আমাদিগের মাতৃভাষা কি, মাতৃভাষা কোন্‌টি, তাহা ত কিছুতেই বুদ্ধি হইতেছে না। এইক্ষণ সুবিজ্ঞ সাহিত্যিকদিগের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে,—আমরা কি শাক্তের রণরঙ্গিণী ভৈরবী বাঙ্গালাকে মা বলিয়া নমস্কার করিয়া, অমানিশির ঘোর অন্ধকারে, শ্মশানে মশানে, নিববচ্ছিন্ন শবসাধনায়ই ব্যাপৃত রহিব না, মৃদুবিলাপিনী বৈষ্ণবীকে মা বলিয়া, করঙ্গ করে লইয়া কেবলই নয়ন জলে ভাসিয়া ফিরিব ? মুসলমানীর মেন্দিমাখান পায়ে সেলাম বাজাইয়া আসনাই রোসনাই, কার্দ্দানি ও মর্দ্দানি লইয়া জোর জবরে কারবার করিব—না ব্রাহ্মিকাকে মা বলিয়া, মনের পাপ মুখে টানিয়া আনিয়া মুখের অনুতাপে পুড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিব ? — খৃষ্টানী আমাদিগের অবলম্ব হইবে ; — না বাবুর জঙ্গলা বাঙ্গালাই আমাদিগের জননী সাজিয়া বসিবে ? এই বহুরূপিনীর হাটে, বাঙ্গালী মা, বাঙ্গালী জাতির খাটি মাতৃভাষা কোন্‌টি, কে আমাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দিবে ?

বাঙ্গালা-সাহিত্যক্ষেত্র, আজি, কুরুপাণ্ডবীয় কুরুক্ষেত্রের ন্যায়, একসঙ্গে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী গ্রন্থকারের সমাবেশে টলটলায়মান। মহারথী, রথী, অর্দ্ধরথী, সাদি, নিষাদি ও পদাতি প্রভৃতি, সর্ব্বশ্রেণীস্থ সাহিত্য-বীরই, আপন আপন ধনুতে টঙ্কার দিয়া অগ্রসর।

সকলেরই বহির্দৃশ্যমান লক্ষ্য মাতৃভাষার কল্যাণ সাধন, মাতৃভাষার শোভা, সম্পদ, অধিকার ও গৌরব বৃদ্ধি। কিন্তু সেই মাতৃভাষা কি? বহুরূপিনীর সর্ব্ববিধ রূপের বাছা বাছা শোভাসম্পদ ও শক্তি সামর্থ্যের সমীকরণে, একটা আদর্শস্থানীয়া, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মাতৃভাষারূপিণী বাঙ্গালা গড়াইয়া দিবে কে? আঠার অক্ষৌহিণী বাঙ্গালা গ্রন্থকারের মধ্যে কয় জন সে জন্য প্রকৃত মনে প্রাণে যত্নবান্? তদনুরূপ শক্তি সামর্থ্যই বা আছে কয় জনের? ইহা রথী, অর্দ্ধরথী, সাদি, নিষাদি বা পদাতির কর্ম্ম নহে— ইহা সর্ব্বতোভাবেই ধুরন্ধর মহারথীদিগের যুগযগান্তব্যাপি কঠোর সাধনা সাপেক্ষ। এ মহাসাধনায় কেহ জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন কি?

কিন্তু হায়! আজি কালিকার এই গড্ডলিকা প্রবাহে সে সাধনার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। আজি এ ক্ষেত্রে, পদাতিক হইতে আরম্ভ করিয়া, রথী পর্য্যন্ত সকলেই যেন গায়ের জোরে মহারথীর পদ ও গৌরব কাড়িয়া লইতে ব্যস্ত। কেহই রাজীরগবতে ও বহাল তবিয়তে ছোট হইয়া বড়ব প্রাধান্য স্বীকার বা তাহার পন্থানুসরণে প্রস্তুত নহে। বড় হওয়ার স্বভাবসিদ্ধ প্রসর পথে চলিয়া কেহই বড় হইতে চাহে না। সকলেই যেন বড়কে ছোট বানাইয়া আপনি বড় সাজিতে চেষ্টা করে। এ অবস্থায় আর আশা কোথায়?

সাহিত্যক্ষেত্রে আপনি ভীষ্ম,—মহারথী। আপনি সম্মুখে নগণ্যশিখণ্ডীর অযথা আস্ফালন দেখিয়া, ঘৃণায় ও বিরক্তিতে ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া দিয়া বিমুখ হইয়া বসিতেছেন কেন? —আপনার এই অবসন্নতা ও বিমুখতায় মাতৃভাষার কোনই কল্যাণ সাধিত হইবে কি? — পরিনামে আপনিই কেবল শোচনীয় শর-শয্যার আশ্রয় লইবেন, এই ঘোর অনিষ্ট ভিন্ন ইহাতে কোনই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। তাই করযোড়ে অনুরোধ করি, আপনি, ঔদাস্য ত্যাগ করিয়া ঐ শিখণ্ডিকে পথে আনিতে যত্ন করুন, অথবা উহাকে উপেক্ষা করিয়া, নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থভাবে, মাতৃসেবারূপ মহাযজ্ঞে আপনার হবীয আহুতি আপনি প্রদান করিতে থাকুন। আর তুমি সাহিত্যক্ষেত্রে উত্তর-গো-গৃহের উত্তর। তোমারও যদি মাতৃভাষার কল্যাণ সাধনে আন্তরিক কামনা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে, আছ আছ তুমি রাজপুত্র; — রাজপাটের ভাবী উত্তরাধিকারী. আর আছে আছে ঐ নৃত্যশালার বৃহন্নলা তোমার আজ্ঞাধীন নীচ কর্ম্মকারী নগণ্য ভৃত্য; তুমিও, তাহা হইলে, তোমার ঐ অযোগ্য পদ-গৌরব ও হাতগড়া কৃত্রিম মর্য্যাদা ভূলিয়া গিয়া, অবনতমস্তকে প্রকৃত গুণের সম্মান কর। যদি সাহিত্য-সংগ্রামের প্রকৃতই জয়ী হইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ঐ হীনবেশে প্রচ্ছন্ন বহ্নি, —বৃহন্নলার যোগ্যতার হস্তেই রথিত্ব সঁপিয়া দিয়া আপনি কড়িয়ালি করে সারথির আসনে বসিয়া যাও, অথবা অক্ষুন্ন মনের এ ক্ষেত্র হইতে চিরতর অপসৃত হও। এতটা ত্যাগ স্বীকারে সমর্থ এমন উত্তর কেহ এখন বাঙ্গালার এই কীচকসঙ্কুল বিরাট-রাজ্যে আছে কি?

পৃথিবীর যে কোন সভ্যজাতির সুগঠিত ভাষা লইযাই বিচার করা যাউক না কেন। তাহাতেই দৃষ্ট হইবে যে, লিখিত ভাষার একটা দৃঢ় নির্দ্দিষ্ট ছাঁচ বা কাটাম আছে। নূতন আমদানীর কোন প্রয়োজনীয় মাল আসিয়া যুটিলে, ভাষার কারিকরেরা, তাহা কাটিয়া ছাটিয়া.

ঘষিয়া মাজিয়া এবং আবশ্যক হইলে, গলাইয়া ও গড়াইয়া পিটিয়া আপনাদিগের ছাঁচ বা কাঠামোর উপযোগি করিয়া লন। যাহা ঐ ছাঁচ ছিকাইয়া ছুটে অথবা কাঠাম ডিঙ্গাইয়া চলিতে চাহে, ভাষার অঙ্গে তাহা কখনও স্থানপ্রাপ্ত হয় না। পৃথিবীর সকল ভাষাতেই ভাষাগত শাসন ও বিধিব্যবস্থার এইরূপ গৌরব আছে, নাই কেবল বাঙ্গালীর বাঙ্গালায়! আমাদিগের ভাষাই উন্নতি কল্পে ইহা কি নিতান্তই একটা মারাত্মক পরিপন্থী বা ভয়াবহ অন্তরায় নহে?

শ্রী--

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

মাসিক সাহিত্য।

বান্ধব।— "অগ্নি ও অঙ্গার" উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের বান্ধবে প্রকটিত হইয়াছে। পুনঃপ্রচারিত বান্ধবে, প্রথম সংখ্যাব একমাত্র অবতরণিকা ব্যতীত, অন্য কোন প্রবন্ধ, "অগ্নি ও অঙ্গার" উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের বোধ হয় না। ইহাতে ভাব, ভাষা ও শব্দ-সঙ্গীতের একত্র সমাবেশ এবং সর্ব্বোপরি প্রাণহারি লালিত্যের এক মোহন আবরণ আছে। পাঠমাত্র মানুষের হৃদয় মন-আপনি আকৃষ্ট হয়। এই শ্রেণীর প্রবন্ধকেই পদ্যময় গদ্য বা গদ্যকাব্য বলা যাইতে পারে। আজি কালি এরূপ প্রবন্ধের বিশেষ অভাব ; প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

মহাকবি মাঘকৃত শিশু পাল বধেব অনুবাদ।— সুন্দর হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ সমস্যা।"—যতীন্দ্র বাবুর যুক্তিযুক্ত এবং শুভেচ্ছাপূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। তিনি বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের দুরবস্থার কারণ যথাযথরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদেরও তাঁহাদিগের দুরবস্থার কারণ যথাযথরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ঐ রূপ মতই পোষণ করি। তিনি যে কএকটি অবশ্য প্রতিপাল্য প্রতিজ্ঞায় ব্রাহ্মণদিগকে আবদ্ধ হইতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই সঙ্গত। ইহা করিলে, যে তাঁহাদের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার-পথ অনেকটা উন্মুক্ত হইয়া আসিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"ভারতে কিসের অভাব"?—ইহা একটি মামুলী প্রবন্ধ। তবে লেখক কি অভাব প্রদর্শন করেন, এবং তাহাতে কোন নুতন তত্ত্ব থাকে কি না, তাহাই আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। "ফলেন পরিচীয়তে।"

"বাসুদেব দত্ত।"—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, আত্মত্যাগ বিষয়ে, বাসুদেব দত্তকে খ্রীষ্টের উপরে স্থান দিতে চাহিয়াছেন। এবং কোন যুগে, কোন কালে, কোন দেশেও, বাসুদেব দত্তের ন্যায়, আত্ম-বিসর্জ্জনের তুলনা পাওয়া যায় না বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে ঠাকুরতা মহাশয়ের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ও বিচার-শক্তি খুব প্রখর নহে, এরূপ মনে করা, বোধ হয়, তত দোষের কথা নহে।

"আমার স্বপ্ন।"—জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় শেষ হওয়াতে অনেকেরই ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি তাঁহার এই "জাল্‌নাডার পাশে চুপ ক'রে দেঁড়ুয়ে, "না দিদি, মাইরি বল্‌ছি" ইত্যাদি হাল আমলের বাছাই মাল রাখিবার জন্য অন্য কোন গুদাম খুঁজিয়া পান নাই? এই সাহিত্যিক উন্নতির যুগে, "খাচ্ছি দিচ্ছি" যাহার উপাস্য, অসার গল্প যাহার অঙ্গাবরণ, বঙ্গে, তাদৃশ মাসিক পত্রিকার অভাব কি?— বান্ধব কি তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি সম্পদ ভুলিতে ভালবাসেন?

বঙ্গদর্শন।—"নৌকাডুবি" (উপন্যাস)। একটি উপমা বড় বিসদৃশ ঠেকিল!!!—"বধুটি যেন একখানি নূতন তৈরি ছোট নৌকার মত!" ইত্যাদি। এরূপ উপমা সাহিত্যভাণ্ডারে দুর্লভ উপন্যাসটি শেষ না হইলে ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করা যায় না।

"সন্ধ্যা" — কবিতাটিতে অকারণ বেসী মাত্রায় শেলিত্ব প্রকাশ করাতে ইহা সাধারণের দুরধিগম্য হইয়াছে। ইহার অর্থ বুঝিতে হইলে, স্বয়ং কবির কাছে যাইতে হয়। "দুয়োরানী"— অতি সুন্দর হইয়াছে। নির্ঝরিণীর মৃদু মধুর কুলু কুলু শব্দের ন্যায় সুন্দর, সরল ও অনাবিল সঙ্গীতে ইহা পাঠকের প্রাণ জুড়ায়। 'দুয়োরাণীর' নামে আমাদিগের শৈশবের যে সমস্ত কল্পনা উজ্জীবিত হইয়া উঠে, ইহাতে তৎসমস্তের পূর্ণস্ফূর্ত্তি ও সমাপ্তি আছে।

"বাজে খরচ।" — বিশেষ কোন নূতন কথা নাই। তবে মাঝে মাঝে এ প্রসঙ্গে উত্থাপন করা ভালই। এ বিষয়ে আমাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়া একান্ত উচিত।

"যাত্রিণী"।—প্রথমকার ছয় সাতটি পংক্তি, কতকটা কবি-ওয়ালদের ছড়া পাচালীর মত। শেষভাগে প্রাণের অব্যক্ত ক্রন্দন আছে।

"প্রাচীন গ্রীস্, প্রাচীন রোম ও প্রাচীন ভারতে সৌন্দর্য্য কল্পনা"। — মৌলিকতা না থাকিলেও প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে। মাঝে মাঝে ইংরেজী বাঙ্গালার একটু খিচড়ী দৃষ্ট হইল। (যথা তাহা Missionary slanders কেও পরাভূত করিয়াছে)।

প্রবাসী।— ধুরন্ধর কর্ত্তৃক অঙ্কিত শকুন্তলা চিত্রে, কালিদাসের মালিনী-নদী-তীরে সহকার সনাথ বনজ্যোৎস্নাকুঞ্জে কটিপিনদ্ধের সুখদ ক্লেশে ক্লিষ্ট উদ্ভিন্নযৌবনা, কবি তুলিকার সেই অতুল রত্ন শকুন্তলার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। "আমাদের জাতীয় সাহিত্যে আলোচনার আবশ্যকতা"—যুক্তিযুক্ত ও পাঠযোগ্য। "রামের প্রতিসীতা"—ত্রেতাযুগের রাম সীতা বলিয়া বোধ হইল না। "বিজাপুর"— ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি মন্দ হয় নাই। ভারতী।—"রাম অনুগ্রহ নারায়ণের বিদ্যারম্ভ"।— বেহারী ছাত্র জীবনের একটি চিত্র। ভালই হইয়াছে। কিন্তু ভাষায় মধ্যে মধ্যে বড় উৎকট রকমের সাহেবিয়ানা। এক স্থানে আছে, — 'বহু বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিয়া, আজীর্ণ, চক্ষুপীড়া (Chest Dissease) প্রভৃতির 'বলি' হওয়া অপেক্ষা" ইত্যাদি। লেখকের নাম দেখিয়া সাহেব বলিয়া বোধ হইল না। তবে তাঁহার কলমে এই বিলাতী বাঙ্গালা কিরূপে নিঃসরিত হইল, বুঝিতে পারিলাম না।

"দেশীয় শিল্প"।— সুন্দর প্রবন্ধ। সকলের পাঠযোগ্য। 'নিঃস্বের বিত্ত"।—কাগজে স্থান পাইবার যোগ্য, ইহাতে বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। "প্রেমপরীক্ষা"।—দেখিলে মনে

নয়, কোন বিদেশী ভাষা হইতে অনুবাদিত। ভাল মন্দ বলা শক্ত। "কবিদণ্ডী"-নজির অজ্ঞ ব্যক্তির সমালোচ্য। "বীর বালক"—স্কুলের বালকাদিগের পাঠোপযোগী। "বাঙ্গালীর পিতৃধন"।—প্রবন্ধটি মন্দ নয় ; কিন্তু অকস্মাৎ ব্রজ্রাঘাত হইয়াছে। "শেষশেষি" শব্দটা ভাল নয় ; কিন্তু অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইয়াছে। "শেষাশেষি" শব্দটা ভাল লাগিল না।

১ম ভাগ ৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩১০

অর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ : উপেক্ষিতা [কবিতা], নরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ : মন্ত্রজাগরণ [প্রবন্ধ], অর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ : সে [কবিতা], উমেশচন্দ্র বসু : ইন্দ্র [প্রবন্ধ],

ধূমকেতুর আত্মকথা।

"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।"

খৃষ্টীয় বিংশ ও বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী, সময়-গণনায়, একই কথা।—কালের অঙ্গে, বিংশ যেস্থানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, চতুর্দ্দশও হইয়া সেই খানেই ঠেকিয়াছে। কিন্তু বিলাতের বিংশ, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, সমৃদ্ধি ও সমুন্নতির অব্যবহিত উত্তরাধিকারী। এ বৈজ্ঞানিক মহাযুগের ডাক ডঙ্কায় পৃথিবীর চক্ষে তাক লাগিয়াছে। কাঙ্গাল বাঙ্গালার তুচ্ছ চতুর্দ্দশ ইহার ধারে কাছেও দাঁড়াইবার যোগ্য নহে। কিন্তু, তথাপি, আমরা, পৃথীপ্রখ্যাত ঐ খৃষ্টীয় বিংশতির দোহাই দিয়া, পরেব গৌরবে গুমর করিতে ইচ্ছা করি না। যখন প্রয়োজন ঘটিবে, ধূমকেতুতে আমরা অপ্রসিদ্ধ ও অপরিচিত বঙ্গাব্দ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর হিসাবেই, সময় নির্দ্দেশ করিব।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, অর্থাৎ বর্ত্তমান ১৩১০ সনের বর্ষারম্ভে, বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনে, অকস্মাৎ ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে।—ভূমিকাতেই একবার সে কৈফিয়ত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিগত দুই মাসে ধূমকেতুর গ্রাহক-সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণবৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন গ্রাহকদিগের অনেককেই, আমরা ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যা না দিতে পারিয়া লজ্জিত আছি। ধূমকেতুর উদয়ের কারণ সম্বন্ধে, কাজে কাজেই, অনেক গ্রাহক ও পাঠক অহংকারে রহিয়াছেন। ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। অতএব, পুনরপি তৎসম্পর্কে দুই চারটি কথা বলিয়া লওয়া আবশ্যক মনে করি।

প্রথম কথা,—ধূমকেতু হইলেও, ইহা কোন অংশেই অমঙ্গলের প্রদান নহে ;—ভাবী মঙ্গলেরই অগ্রদূত। এ কথা আমরা ভূমিকাতে সুস্পষ্ট অক্ষরে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া। কিন্তু চিরন্তন সংস্কার বশতঃ ধূমকেতু নামে অনেকেরই ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া আইসে। ধূমকেতুর ঘোরদর্শন, আলোকিত ধূমল পুচ্ছ অনেকের চক্ষেই আতঙ্কজনক ও অসহ্য হয়। এ ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নাই। এ প্রাবৃদ্ধিক ধূমকেতু নীরদ-আবরণে আবৃত। অনল-কেতু থাকিয়া থাকিলেও প্রচ্ছন্ন। উহা কাহারও নয়ন ঝলসাইতে অথবা কাহারও প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিতে কখনও অবসর প্রাপ্র্য হইবে না। অতএব আমরা আবারও 'মাভৈ' রবে আশ্বাস দিয়া

বলিতেছি,—আপনারা ধূমকেতু নাম শুনিয়াই, ভয়ের কুহেলিকায়, হরিৎ পতাকাতে রক্তিমা দেখিয়া চমকিয়া উঠিবেন না ; এবং অকারণ আতঙ্কের ঘণ্টা বাজাইয়া সাহিত্যিক জগতের শান্তি ভঙ্গ করিবেন না।

দ্বিতীয় কথা,—ইহা যদি প্রকৃতই মঙ্গলজন্য, তাহা হইলে, শিবভাব-ব্যঞ্জক শত শত সুন্দর সংজ্ঞাসত্বে, এমন রোমহর্ষণ বিকটনামে ইহার নামকরণ হইকে কেন? আমরা নিম্নে যাহা নিবেদন করিতেছি, তাহা হইতেই পাঠক এই প্রশ্নের বিশদ উত্তর পাইবেন।

কতিপয় উৎসাহশীল তরুণ যুবক কর্ত্তৃক ধূমকেতু পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু ধূমকেতুর পরিচালকগণ যুবক হইলেও, উদ্ধত বা অর্ব্বাচীনের ন্যায়, আত্মশক্তি সম্পর্কে অন্ধ নহে। তাহারা জানে যে, তাহারা এ ক্ষেত্রে নব-প্রবিষ্ট, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অকৃতী। তাহারা লেখনী হাতে লইয়াই লেখকের গর্ব্বে গা ফুলাইয়া গৌরবান্বিত গুরুর গা ঘেষিয়া দাঁড়াইতে ভালেবাসে না। এ দৃষ্টতায়, তাহারা প্রকৃতই ক্লিষ্ট। শিক্ষার্থীর বিনীতবর্শে তাহাদিগের প্রাণপ্রিয় পরিচ্ছদ ; ছাত্রোচিত নমনীয়তাই তাহাদিগের আদরের আভরণ।

ধূমকেতুতে সন্দর্ভ আছে ;—চিরদিনই থাকিবে। কিন্তু ধূমকেতু ইহা মুক্তকণ্ঠে মানিয়া লইতে প্রস্তুত যে. এ অংশে তাহার কোনই বিশেষ নাই।—তাহার সন্দর্ভনিচয় শিক্ষাথীর সা-রে-গা-মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেখানে বাঙ্গালা-সাহিত্যে-সম্রাট্ কালীপ্রসন্ন, এখনও মধুরে গম্ভীরে দীপক ও মেঘমল্লারে অজস্র তান ধরিতেছেন ; অক্ষয়কীর্ত্তিমান্ অক্ষয়চন্দ্র মাঝে মাঝে, তরল-স্বর-তরঙ্গে সারগর্ভ সন্দর্ভের মোহন মূর্চ্ছনা ফলাইয়া, যেখানে প্রীত পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন এবং শক্তিসম্পন্ন চন্দ্রনাথ, শিশুশিক্ষার 'করিকোমল' হইতে "হিন্দুত্বের" উচ্চগ্রামে আরোহণ করিয়া, লেখনীর অভিনব ঝঙ্কার শুনাইতে প্রয়াস পাইতেছেন, সেখানে নূতন-ব্রতী ধূমকেতুর সন্দর্ভবিলাস বালকের কপচান নয় ত কি?

ধূমকেতুতে কবিতা আছে ;—বোধ হয়, চিরদিনই থাকিবে। কিন্তু যেখানে, এখনও এক দিকে, প্রবীণ নবীন একবার ঘনীভূত অশ্রুতে শান্তির সুস্নিগ্ধ মোহন-মালা গাঁথিযা, শোণিতসিক্ত কুরুক্ষেত্রের জ্বালা জুড়াইতেছেন, আবার অনল-ফুলে তারা হার গড়াইয়া ভাষায় শোভা ও সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছেন ; এবং অন্য এক দিকে, নবীন রবি আধ ফুটন্ত আধ ঘুমন্ত আবেশময় ভাব-কুসুমে নিত্য নুতন ধরনের সরস মালা গাঁথিয়া, ভাষার গলায় দোলাইতেছেন ; সেই খানে ধূমকেতূর পক্ষে শুধুই অর্দ্ধেন্দুর ক্ষীণ জ্যোৎস্না অথবা নীরদ-লাঞ্ছিত চন্দ্রের এক ফোঁটা অস্ফুট আভা-রঞ্জিত কবিতার এলো ফুল লইয়া দণ্ডায়মান হওয়া, অবশ্যই অসম সাহসের কর্ম্ম।

ইতিহাস ও উপন্যাস উপলক্ষে ধূমকেতু এখনও কোনরূপ প্রয়াস প্রকাশ করে নাই। কোন দিন করিবে কি না. সে কথা পশ্চাৎ। কিন্তু যেখানে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায় প্রভৃতির ন্যায় প্রগাঢ়পণ্ডিত ও শিক্ষিত কৃতী পুরুষের অতীতের গভীরতম অন্ধকারে, আলো লইয়া, ঐতিহাসিক সার নিষ্কাশনে সাধকের প্রাণে ব্যাপৃত ; যে খানে পাঠকের প্রাণ অদ্বিতীয় বঙ্কিমের আনন্দমঠ প্রভৃতির আনন্দ-কোলাহলে এখনও

এতদূর ডগমগ ও ঢল ঢল রমেশ দত্তের ন্যায় মহামহোপাধ্যায়ের উপন্যাসনিচয়ও যেন একটু ঠাঁই করিয়া লইতে অসমর্থ, সেখানে ধূমকেতুর ইতিহাস ও উপন্যাস তত্ত্বে নকলনবীশী করিতে যাওয়া সর্ব্বথাই নিরর্থক।

এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, সাহিত্যের একদিক্, ওদিক ও সেদিক, ইহা কোন দিকেই যদি ধূমকেতুর কোনরূপ, আশা, ভরসা বা প্রত্যাশা না থাকে, তাহা হইলে, গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত বঙ্গীয় সাহিত্য গগনে আবার একটা ধূমকেতুর প্রয়োজন কি ?—প্রয়োজন অতি গুরুতর।—ধূমকেতুর প্রয়োজন,—সমালোচনায় সত্য কথা বলা। গ্রন্থাদি সম্বন্ধে, যে কথাটি লোকের মনে জাগে, নানা কারণে ফোটে ফোটে করিয়াও মুখে ফুটিতে সাহস পায় না, ধূমকেতু সমালোচনায় সরল-প্রাণে, তাহাই বলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে। বলা বাহুল্য যে, অধুনা বঙ্গীয় সাহিত্যিক সমালোচনায় শাদা সিধা নিরেট সত্য প্রায়শঃ প্রকটিত হয় না।

মানুষ সামাজিক জীব। যেখানে মানুষ সেইখানেই সামাজিকতা। ডাক্তারে ডাক্তারে, উকীলে উকীলে এবং সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে একদিকে যেমন ঘোরতর প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর একদিকে আবার তেমনই এক বিচিত্র সামাজিকতা। রাম লিখেন, শ্যাম বাহবা দেন। রামও আবার শ্যামের বেলা ঐরূপ বাহবা দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকেন। গ্রন্থকার গ্রন্থলিখিয়া সমালোচনার জন্য সমালোচকের কাছে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু "আমার গ্রন্থের প্রকৃতসমালোচনা করিবেন," প্রায়শঃ কোন গ্রন্থকারই সাহস করিয়া এরূপ কথা লিখেন না। "আমার ক্ষুদ্র পুস্তকখানির যেন অনুকূল সমালোচনা হয়," তিনি বিনয়ের ভাষায় করযোড়ে কাকুতি করিয়া, পারিলে, সঙ্গে কিঞ্চিৎ উপঢৌকন দিয়া, এমনই সরস-মধুর আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন। গ্রন্থকার সাহিত্যিক, সমালোচকও সাহিত্যিক। চক্ষু লজ্জা ও সামাজিকতার হিসাবে, সমালোচক গ্রন্থকারে ঈদৃশ বিনীত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং..., শুধু অসার স্তুতির বাহ্য চমকেই, সোনার সেলামি পাইয়া তরিয়া যায়।

সাহিত্যিকদিগের মধ্যে, যাহারা ধুরন্ধর লেখক, তাঁহারাও, এই সকল কারণে, অনেক সময়ই, সমালোচনায় সত্যনির্দ্দশে অক্ষম হইয়া পড়েন। তাঁহারা, প্রায়শই চক্ষুলজ্জা, শিষ্টাতা ও দয়ার অনুরোধে, পরকীয় লেখার ত্রুটি প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন। সুতরাং দোষের অংশে নীরব থাকিয়া, কখনও স্নেহের ভাবে আশীর্ব্বাদ করিয়া উৎসাহ দেন, কখনও বা আলিঙ্গনে আপ্যায়িত করিয়াই নিরস্ত রহেন। যেখানে প্রতিযোগিতার মারাত্মক আকর্ষণে অথবা কোন গুপ্ত ঈর্ষ্যার তীক্ষ্ণ দংশনে সামাজিক শিষ্টতার এই বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়, সেখানেও প্রকৃত সমালোচনা হয় না। সেখানে বিকার ও বিদ্বেষ গুণের আগুনে ভস্ম ঢালিয়া দিয়া, কেবল দোষের উপরও রোষ করিতে থাকে ; এবং সরল সত্যের পরিবর্ত্তে, হাতগড়া অসত্যের সরল উদ্গিরণ করিয়া জ্বালাতন করিয়া তুলে। সাহিত্যের অধোগতি ও ভাষার অধঃপতন, ঈদৃশ সমালোচনা-বিভ্রাটের অবশ্যম্ভাবি ফল।

সমালোচনায় সত্যনির্দ্দেশ ধূমকেতুর জীবন-ব্রত। ধূমকেতু কখনও কথার ছটায় একের মন ভাঙ্গিয়া অন্যের মন ভুলাইতে চেষ্টা করিবে না ; — পরের গৌরব হানি করিয়া আপনার গৌরব বাড়াইতে যাইবে না ; এবং প্রাণান্তেও বিকারবিদ্বেষের কোন ধার ধারিবে না। বিনয়ে

সর্ব্বদা নত থাকিবে। সম্ভবে মাথা নোয়াইবে। কিন্তু কখনও ভয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট কিংবা চক্ষুলজ্জায় কর্ত্তব্যবিমুখ হইবে না। সমালোচনায়, সরল চিত্তে যথাশক্তি সত্য কথা কহিবে। পুস্তক, পুস্তিকামাসিক সাহিত্য, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্র, এমন কি, বাঙ্গাভাষায় লিখিত বিজ্ঞাপনটি পর্য্যন্তও ধূমকেতুর সমালোচ্য। ধূমকেতু আবশ্যক বোধ করিলে, সমাজ, সম্প্রদায় ও ধর্ম্মসম্বন্ধেও সমালোচনার ভাবে, সময় সময়, দুটিকথা বলিতে সঙ্কুচিত হইবে না।

বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনি কালীপ্রসন্ন। ধূমকেতু, আপনাকে ও আপনার সদৃশ ব্যক্তিদিগকে চিরদিনই গুরুজ্ঞানে পূজা করিবে। কিন্তু আপনাদিগের খেয়াল ধ্রুপদেও যদি কখনও তাল কাটে বা রাগিনী ছুটিয়া যায়, ধূমকেতু তখন বারবার তালি না বাজাইয়া, সসম্ভ্রমে একটু মুখ বাঁকাইবে। আপনারা ধূমকেতুর এই শিষ্টভাবাপন্ন ধৃষ্টতা—শিক্ষার্থীর এই আবদার সহিয়া লইবেন না কি? আপনি কাব্য-কুঞ্জের নবীন কোকিল। কাল-বশে, শীত সঙ্কোচে, আপনার কল-মধুর কুহুধ্বনির কোন তান বেসুরে বাজিয়া উঠিলে, ধূমকেতু যদি সহসা বন্ধ করিয়া কানে হাতে দেয় ; অথবা আপনি বঙ্গীয় কাব্য-সরোবরে তরুণ রবি, আপনার বিমল কিরণ মেঘচ্ছায়ায় কখন বিমলিন হইলে এবং তাহাতে কোন কমল-দল অকালে টলিয়া বা ঢলিয়া পড়িলে, ধূমকেতু যদি সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, বালকের এই অশিষ্টতা আপনাদের নিকট মার্জ্জনীয় হইবে না কি?— আর ভাই তুমি, ধূমকেতুরই মত, সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপরিচিতনামা অকৃতী, ধূমকেতু যদি তোমার পঙ্কিল পুকুরে কাদা ঘাটিতে প্রবৃত্ত হয়, তুমিও রাগ করিও না ; একই অবস্থাপন্ন একক্রিয় মিত্র জ্ঞানে মাপ করিয়া লইও। ধূমকেতু যেমন একদিকে কাদা খুঁচিয়া উঠাইবে, আর এক দিকে আবার তেমনই, তোমার ঐ প্রফুল্লপদ্মটির প্রতিও প্রীতিবিস্ফারিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া তোমার সহিত আনন্দ করিবে।

ধূমকেতু, এই অংশে সর্ব্বতোভাবেই নূতন পথের পথিক। নভশ্চর ধূমকেতুর গতি-পথ ও আবর্ত্তন-প্রণালী যেমন অন্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই সাহিত্যিক ধূমকেতুর গতি-পথ, এ অংশে অন্যান্য সাহিত্যিক জ্যোতিষ্ক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আপনারা যাহাই ভাবুন, আমরা কিন্তু, এই হেতুই, অন্য সমস্ত রুচিবিনোদন, রসিকরঞ্জন, সুললিত সংজ্ঞা অপেক্ষা ইহার এই ভাবশূন্য নীরস ধূমকেতু নামই অধিকতর সঙ্গত ও সমীচীন মনে করি।

উপসংহারে, পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পূজনীয় সাহিত্যিক গুরুদিগের নিকট, ধূমকেতুর বিনীত নিবেদন এই যে, ধূমকেতু ক্ষুদ্র হইলেও, তাহার ব্রত-সঙ্কল্প ক্ষুদ্র নহে। আপনারা সহায় হউন। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন.— ধূমকেতু যেন আপনাদিগের সদয় আনুকুল্যে তাহার এই কঠোর সত্যব্রত পালনে সমর্থ হয়। ধূমকেতু সাহিত্যিককে সর্ব্বতোভাবে ভুলিয়া গিয়া, সাহিত্যের পানে তাকাইয়া সত্য কথা কমিতে যত্ন করিবে। যদি সে কখনও অজ্ঞতা হেতু, সত্য বুঝিয়া অসত্য বলিয়া ফেলে, অথবা কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদে বিড়ম্বিত হয়, আপনারা দয়া করিয়া সে ত্রুটি দেখাইয়া দিবেন। ধূমকেতু মাতৃভাষার সেবাব্রতে শিক্ষানবীশ মাত্র। সে সর্ব্বদাই বিজ্ঞজনের চরণধূলি শিরে ধরিয়া, শিক্ষার্থ প্রস্তুত

থাকিবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যেই সত্য কহিতে চেষ্টা করিয়া, প্রকৃত সত্য চিনিয়া লইতে প্রয়াস পাইবে। আবারও বলি, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, সাহিত্যক্ষেত্রে ধূমকেতু নামক সার্থক হউক।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

মাসিক সাহিত্য।

"আশা"।—নোয়াখালী হইতে প্রকাশিত। পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী, নোয়াখালীর ন্যায় নগরে, সাহিত্যিক "আশার" দর্শন পাইলে, আশান্বিত হওয়া অন্যায় নহে। আমরা বিগত কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, এই তিন মাসের আশা পাঠ করিয়াছি। তিন খানি আশা তন্ন তন্ন করিয়া পড়িলাম ; কিন্তু আশার আশা, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নানা প্রবন্ধের এক অপক্ক খিচড়ী বিশেষ। এরূপ হইলে আর আশার দর্শনে, আশার সাফল্য কোথায়। সকল সাহিত্য পত্রেরই একটা নির্দ্দিষ্ট Mission বা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। হাটের নাগরা, যে আসিল, সেই তালে বেতালে এক গদ বাজাইয়া গেল এরূপ হইলে, আর ভিন্ন ভিন্ন নামের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য-পত্রের সার্থকতা কি?

আশাব কতকগুলি প্রবন্ধ পাদপূরণে চ গোছের। চালাইলে চালান যায়। কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ও অনাবশ্যক। "বঙ্গে বৈষ্ণবগ্রন্থ' ইহা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীয় ন্যায় ব্যাপক লেখকের লেখা হইলেও প্রবন্ধের আসনে ইহাকে বসান ভাল হয় নাই। এ পুঁথির তালিকাটাকে, সম্পাদকের কাছে না পাঠাইয়া লাইব্রেরিয়ানের ক্যাটালগে যুড়িয়া দিলেই বেশ মানাইত। পাঠকের শ্রম বাচিয়া যাইত। "কুমারী বারব্রত" "যমপুকুর," মাঘমণ্ডল ও নাটাইচণ্ডীর ব্রত, এই মেয়েলী পূজা গুলিও যদি মাসিকপত্রিকার বিষয় হয়, কবিত্বও নাই, আছে কেবল "মনোসুখ" ও 'গান গাহা" ইত্যাদি পদরচনায় ভাষার উপর দৌরাত্ম্য। আশা মুদ্রণ ও কাগজ ভাল না হইলেও মলাট খানি সুন্দর। মলাটের উপরবিভাগ, সাবেক কালের ইষ্টাম্পের আদর্শে কাল ও লাল রঙে চিত্র করা।

"নবপ্রতিভা"।—দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। নবপ্রতিভার কাগজ ও ছাপা উভয়ই সুন্দর। দেখিলাম নবপ্রতিভার প্রথমেই "নবের" আমদানী ও আবদারটা বড় বেসী। প্রথম প্রবন্ধ,—"নববর্ষ"। ইহার পরে "কবিতা কুঞ্জ"। কবিতা কুঞ্জে উঁকি দিয়া দেখিলাম, সেখানেও "নববর্ষ"। গদ্যে ও পদ্যে নববর্ষের আরতি। কিন্তু আরতিতে "নূতন আলু, নূতন কপি ; নূতন কড়াইসুটী, ভরা ভাদ্রের নূতন ইলিশ," ইত্যাদি রসনারুচিকর সরস জিনিস আছে, স্পর্শেন্দ্রিয়ের জন্য "মলয় স্পর্শ" আছে, শ্রোত্রের জন্য কোকিল-ঝঙ্কার আছে, নয়ন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের জন্য শ্যাম নব কিশলয়, পুষ্প ও পত্র আছে এবং অবগাহনের জন্য গঙ্গা আছে ; নাই কেবল ধূপধুনার গন্ধ, আর দেবারতির সেই প্রাণজুড়ান ভাবের আবেশ। ইহা আমাদিগের দুর্ভাগ্য। "জাতীয় সাহিত্য" প্রবন্ধের নামটি বড়ই উচ্চ। কিন্তু লেখক, হ, য, ব, র, ল, করিয়া প্রবন্ধের শেষ করিয়াছেন। প্রবন্ধের সার কথা এই যে,

এক শ্রেণীর লোকে, মাতৃভাষার বদলে ইংরেজী চালাইতে চাহেন। যদি ইহাঁদের কথা যুক্তি-সঙ্গত হয়, ইংরেজীই চলুক। আর যদি মাতৃভাষা সজীব রাখা পরামর্শসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই হউক। জিজ্ঞাসা করি, এই 'যদি'র মীমাংসা কোথায়? "জাতীয় সাহিত্যের" লেখাও যদি এ.ও.তা করিয়া তরমিম্ নিষ্পত্তি করিলেন, তাহা হইলে, সাহস করিয়া একথার স্পষ্ট মীমাংসা করিবে কে? "জড় পদার্থের সংবেদন" প্রবন্ধটি মন্দ নহে। "ঋণ পরিশোধে" কাজের কথা আছে। "কাপ্তেন কুক" জীবনবৃত্ত, শিক্ষাপ্রদ ও উপকারজনক। কিন্তু ইহার ভাষায় বাঙ্গালার এক নূতন বাহার দেখিলাম। যথা— "তাঁহার সাহস নম্র এবং সুচিন্তিত ছিল** তাঁহার ব্যবহার অমায়িক এবং প্রীতিপ্রদ ছিল কিন্তু রিপু কর্ত্তৃক উত্যক্ত হইয়া স্বভাবের একটু দোষ হইয়া ছিল, তত্রাচ পরহিতৈষী ও দয়ালু ছিলেন।" "সাহস নম্র ও সুচিন্তিত" ইহা আজগুবি নূতন সৃষ্টি নয় কি? শেষপ্রবন্ধ—"হারানিধি"। বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে এই—"হারানিধির" দল এখন সরিয়া পড়িলেই ভাল হয়।

"**নবনূর**।—নবনূর[১১১] অর্থাৎ নূতন আলো, (New light.)। নব-নূর মুসলমান সম্পাদক কর্ত্তৃক পরিচালিত মুসলমানী সাহিত্য-পত্র। আমরা ইহার প্রথম দুই সংখ্যা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। নবনূরের বাঙ্গালা, গত মাসের ধূমকেতুতে প্রদর্শিত মুসলমানী বাঙ্গালার ছাঁচের ঢাকা নহে। ইহার বাঙ্গলা, সরল ও মধুর। 'মনোকষ্ট'—'মনোসুখ' 'মনাকর্ষন' মুগ্ধকারিনী' 'সাধ্যায়ত্ত' ও 'দর্দ্দশাগ্রস্ত' 'বৃত্তসংহার' ইত্যাদিরূপ প্রয়োগের বাহুল্য না থাকিলে ইহাকে বিশুদ্ধ বলিতেও আমাদিগের আপত্তি ছিল না। দেখিলাম মুসলমান লেখকদিগের লেখাও হিন্দুর লেখা প্রবন্ধের সহিত ভাষা ও ছন্দোবন্ধে অভিন্ন। ইহা খুবই প্রশংসার কথা। মুসলমান মহিলার রচিত বাঙ্গালা কবিতায় গোলাপের বিকাশ দেখিয়া, আমরা অধিকতর সুখী হইয়াছি। কিন্তু নামে 'নূর' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা মুসলমানত্বের পরিচয় না দিলেই ভাল হইত। "নবনূর" নামটি হিন্দুর কানে কেমন একটু বাঁধ ঠেকে। নবনূরের প্রবন্ধগুলি মোটের উপর মন্দ নহে। অবশ্যই তন্তুচ্ছেদ করিয়া দেখিতে গেলে দোষ পাওয়া যাইবে। কিন্তু প্রথম সংখ্যায়ই সে দোষ দেখাইতে যাওয়া অসঙ্গত। নবনূরের নিকট আমরা আর কিছু চাহি না। নবনূর যদি, আবরী, পারসি ও উর্দ্দু হইতে রত্নরাজী আহরণ করিয়া মাতৃভাষারূপিনী বাঙ্গালাকে আরবী পারসির উপাদেয় মোগলাই আভরণে সজ্জিত করিতে পারেন, তাহা হইলেই, তাঁহার জীবন-ব্রত সিদ্ধ হইল, মনে করিয়া, সকলে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিবে। কিন্তু কোন কোন বিকৃত রুচি অদূরদর্শী হিন্দু লেখকের মুসলমান দ্বেষ লক্ষ্য করিয়া, যদি নবনূর ফুর ফুর করিয়া জ্বলিতে না জ্বলিতেই, অর্থাৎ জন্মমাত্রই, অহি-রাবনের ন্যায়, হিন্দু বিদ্বেষে গর্জ্জিয়া উঠেন, তাহা হইলে তাঁহারদ্বারা কোন কর্ম্ম হইবারই প্রত্যাশা নাই। নবনূরের এ অংশে মতি গতি ভাল দেখিলাম না।

"**সুধা**"।— সুধা হইলেও, ইহা অবশ্যই অগ্নি-চক্র-রহিত সে চাঁদের সুধা নহে। এ সুধা আহরণের নিমিত্ত গরুড়ের গতি বা শক্তির প্রয়োজন নাই। মাত্র দুটি ক্ষুদ্র রৌপ্যচক্র মুর্শিদাবাদের দিকে ডাকের মুখে ছুড়িয়া মারিলে, ঘরে বসিয়া হাতে হাতেই সুধা পাওয়া যায়। সুধাতে অনেক মাল মসল্লা থাকে। সুধার মলাটে বাঁকা বাঁকা যুগল নামের বেশ বাহার আছে।

নামে সুধা হইলেও ইহার অনেক স্থলেই কবিরাজি তিক্ত পাচনের আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাতে পাচনের কোনও উপকারিতা নাই। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের সংখ্যায় দেখিলাম, প্রথমই সিন্ধু যাত্রার আড়ম্বর। সিন্ধুযাত্রার এই পদ্য আড়ম্বরে "তীরে তীরে তীরে" ছুটিয়া আসিয়া "যাব কি ফিরে?" এই প্রশ্ন আছে। 'উদল বুক', উদাম আশা' এবং "আশীষ তুলি শিরে" লওয়ার কথা আছে। আর আছে, "সাগর-কূলে তরঙ্গ-ঘায় চুম্বন-কেলি"। ** দক্ষিণা বাবু কবিতাটিকে অতিরিক্ত কোমল ও শ্রুতি-মধুর করিতে এবং সুকবির ন্যায় প্রেম-প্রবণ খোলা প্রাণের পরিচয় দিতে যাইয়াই, "উদল বুক" "উদাম আশা"র অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের, উহার গভীরতা, কোমলতা ও উচ্ছ্বাস বুঝিবার শক্তি কোথায়? আর সাগরকূলে চুম্বন কেলির কথা শুনিয়া কিন্তু আমাদের বড় ভয় হয়। কারণ আমরা জানি যে, একবার একজন, পুরীতে সমুদ্রের ঢেউ লইতে যাইয়া, কাণ পাকাইয়া আসিয়াছিলেন এবং প্রায় একমাস কাল তাঁহাকে কাণে পট্টি বাঁধিয়া থাকিতে হইয়াছিল। ইহার পরে "যুগান্তর"! যুগান্তরে "বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর" প্রেমের কথা আছে। ইহার পরে নীতি বিজ্ঞানের ন্যায়ন্যায় বিচার। ন্যায়ান্যায় বিচারে, "যে প্রণালীতে (Procsess) বুদ্ধি (Intellect) পরিচালনা করিয়া" ইত্যাদি রচনা আছে। কিন্তু এই রচনা আছে। কিন্তু এই রচনা বাঙ্গালানবীশ ইংরেজের জন্য, না ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালীর জন্য, সে কথাটা বলিয়া দেওয়া হয় নাই কেন? কবি হেমচন্দ্রের জন্য পদ্যছন্দে শোক আছে। "বঙ্গগৃহে মর্ম্মে মর্ম্মে ধিক্কারিয়া দারুণ শোক ও তপ্ত অনুতাপের উত্থান আছে। "অধঃপতনের শিরে" কবির নামে দুটি ছত্র আছে। "কবি স্কুলমাস্টার" আছে। আছে অনেকই। নাই কেবল অধিকাংশ লেখারই বিশেষ কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। নীতিবিজ্ঞান প্রবন্ধে দেখিলাম, ন্যায়ন্যায় বিচার প্রণালীর বিশ্লেষণ করিয়া, লেখক "চারিটি উপাদানে" ইহার "মজ্জা" 'বিচারকর্ত্তা,' দ্বিতীয় মজ্জা 'যাহাকে বিচার করা হয়' তৃতীয় মজ্জা "যে বৃত্তিব সাহায্যে আমরা ন্যায়ন্যায়ের ধারণা প্রাপ্ত হই" চতুর্থ মজ্জা "যে পরিমাপকের সাহায্যে আমরা ন্যায়ন্যায় বিচার করি।" এই চারিমজ্জায় ন্যায়ান্যায়ের বিচার প্রণালী, কেমন সুন্দর! সুধায় 'বলবান্ লালসা' আছে। 'চাঁদনি নিশা' 'বিতরাগী' 'সিপাহীদিগের বিদ্রোহী বিবরণ' ইত্যাদি ব্যাকরণ সম্মত শিষ্ট প্রয়োগ আছে। সুধায় "মনুষ্য লেখনী বর্ণনা প্রসব করে" এই কথা আছে। কিন্তু পাঠক পাঠিকারা নাড়ী ছেদ করিয়া উলুধ্বনি দিয়া উহাকে অমনি কোলে তুলিয়া লয় কি না, সে কথাটা নাই। বলিলে বলিবার কথা অনেক আছে। কিন্তু অদ্য স্থানাভাব।

১ম ভাগ, ৪র্থ-৫ম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১০

অর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ : আহ্বান [কবিতা],

বঙ্গের ভূস্বামিগণ।

(প্রথম প্রস্তাব।)

প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকের কঠোর পরীক্ষায় ধ্বংস কিংবা বিনাশ শব্দ এইক্ষণ ভ্রমাত্মক কিংবা অর্থশূন্য বলিয়া প্রমাণিত ও উপেক্ষিত হইয়াছে। কেন না, সকল বস্তুরই রূপান্তর প্রাপ্তি অথবা অন্যরূপ পরিবর্ত্ত আছে,—কাহারও ধ্বংস কিংবা বিনাশ নাই। কিন্তু নিত্যক্রিয়াশীলা

পরিবর্ত্ত-প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্ত্ত নাই কেবল সত্যের। উহাই একমাত্র অবিকৃত বস্তু এবং এই জন্যই জ্ঞান প্রসূতি চিন্তা শুধু সত্যকে নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই সতত ব্যাপৃত রহে। দর্শন-বিজ্ঞান, কাব্য-সাহিত্য, সকলই এই চিরসুন্দর সত্যের উদ্দেশ্য সৃষ্ট এবং এই জন্যই মানবজাতির প্রাণারাধ্য। কিন্তু ইতিহাস বলিলে কি বুঝিব? কার না ইতিহাস আছে। যদিও এই জড়-জগতের যাবতীয় পদার্থেরই উত্থাপন-পতন বিষয়ে জল-বুদবুদের সঙ্গে উপমা হইয়া থাকে, তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে এই মানব জাতি-শাসিত বিস্তীর্ণ ধরায় ঐ উপেক্ষিত জল-বুদবুদ হইতে আরম্ভ করিয়া, কিছুই ইতিহাসশূন্য নহে। চেতন, অচেতন কিংবা উদ্ভিদ, যে কোন পদার্থই হউক না কেন, যাহাই দোষ গুণের আধিক্যে, অবস্থাবিশেষে দুঃখ কিংবা সুখের কারণ হইয়াছে, তাহারই নাম মনুষ্য-জাতির ইতিহাসে, কোথাও বা বিভীষিকার শোণিতাক্ষরে, কোথাও বা স্মৃতির উপাস্যরূপে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। কোন জাতির, কি বিশেষ স্বত্বে স্বত্ববাণ তজ্জাতীয় কোন শ্রেণীর বিষয় একটু গভীরভাবে আলোচনা করিতে হইলেই, উহার উৎপত্তি এবং প্রাথমিক অবস্থা হইতে বত্তমান পরিণতির মূলে, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসগত কোন্ বিশেষ অংশের রহস্য প্রকটিত রহিয়াছে, অতি সংক্ষেপে হইলেও, তাহার উল্লেখ আবশ্যক। সূক্ষ্ম আণবিক পরীক্ষা দ্বারা সাম্যের অখণ্ড প্রভাব প্রমাণিত করিতে পারিলেও, কার্য্যতঃ সাম্যের বৈষম্যই আমাদের স্থল দৃষ্টিতে পতিত হইয়া থাকে। মানবজাতির অতি প্রাথমিক অবস্থা হইতেই, আমরা নিম্নোল্লিখিত দুইটি শ্রেণীর পরিচয় পাইয়া থাকি। একটি প্রভূত্বের আসনে উপবিষ্ট ; অন্যটি প্রভু-শক্তিদ্বারা পরিচালিত। জনসাধারণ হইতে দৈহিক কিংবা তদপেক্ষা বহু গুণে উচ্চতর মানসিক শক্তির স্ফুরণজনিত আকর্ষণ প্রভাবের বিশেষত্বই জাতিবিশেষের করধৃত বজ্র সৃষ্টি হওয়ার কারণ ; এবং সেই বজ্রই কোথাও দ্রষ্টব্যে সিংহাসনারূঢ় সম্রাট, কোথাও বা চন্দ্রাতপের প্রান্তবর্ত্তী সচিব এবং কোথাও বা সৈন্যদল-বেষ্টিত সেনাপতি। যাঁহারা রাজ্যেশ্বর, কিংবা অধিকার এবং প্রভুত্বের বিস্তার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইলেই, রাজ-শীঘ্রই অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ, তাঁহাদের সম্পর্কেও এই একই কথা। এই প্রভূ-পদের মহিমা এতই বেসী যে, প্রথমে ইহা শক্তিদ্বারা অর্জ্জিত হইলেও, উত্তরাধিকারিগণশক্তির অভাবেও পূর্ব্বস্মৃতির গৌরব-সাহায্যে কিছুকাল তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন। এই পদের সৎ কিংবা অসৎ ব্যবহারের সহিত বহুলোকের সুখ দুঃখের অতিঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়াই, ইহা এত দায়িত্ব পূর্ণ, এবং দায়িত্বপূর্ণ বলিয়াই, ইহার এত গৌরব এবং গুরুত্ব। যিনি যে পরিমাণ তৎপরতার সহিত কঠিন কর্ত্তব্যব্রত পালন করিয়া, এই প্রভুশক্তির পরিচালন করেন, তাঁহার নাম সেই পরিমাণে ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত ইতিহাসে সংপৃক্ত থাকে। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ রাজাকে দেবতার অংশ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং বস্তুতঃপক্ষেও যাঁহাতে আত্মসুখ অপেক্ষা আত্মত্যাগের মহিলাই অধিকতররূপে প্রকটিত হয়, তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ স্তুতির ভাষা প্রয়োগ করা অসঙ্গত বলিয়া হয় না। আলোকের প্রকৃতি ও পরিণতির তত্ত্ব বুঝিতে হইতে যেমন পাঠ্য,—সূর্য্যের জগদুজ্জল রশ্মি, তেমনই পরীক্ষার বস্তু সম্মুখ সামান্য

একটি খদ্যোত।—কীট, এ উভয়ই যে প্রকৃতির সর্ব্বব্যাপি সাম্যতত্ত্বে পরস্পর সন্নিহিত, ইহা যে না বুঝিল, তাহাকে বুঝাইবার জন্য বৃথা পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করি না। যাঁহারা বুঝিলেন, তাঁহাদিগকে বলিব আসুন আমরা সামাজিক শক্তির প্রতিনিধি অথবা সূর্য্যস্বরূপ সম্রাট ও মহাসম্রাটদিগের কথা পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের ক্ষুদ্র বঙ্গীয় সমাজরূপ উদ্যানের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র সাংসারিক শক্তির প্রতিনিধি অথবা খদ্যোতস্বরূপ স্বদেশীয় ভূস্বামীদিগের কথা লইয়া একটু আলোচনা করি।

ভারতবর্ষে ভূস্বামী বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে বঙ্গ দেশেই বিদ্যমান। কারণ, ১৭৯৩ সালে, ২২ শে মার্চ্চ, লর্ড কর্ণওয়ালিশ যে চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তনা করেন, তাহা একমাত্র বঙ্গদেশ ব্যতীত, ভারতেব আর কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় না। জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, সংসার অসার কিংবা আত্মপরভেদ-ভ্রমান্ধতার পরিচায়ক বলিয়া জানিলেও, এই মর্ত্ত্যভূমির কর্ম্মক্ষেত্রে বিধাতৃশক্তি দ্বারা নিয়মিত বৃত্তি সমূহের সাধারণ এবং স্বাভাবিক অনুশাসনে চিরস্থায়িরূপে, আপনার কি আপন জনের বলিয়া না জানিলে, কোন পদার্থের প্রতি তত মমতা জন্মে না। সুতরাং, তাহার উৎকর্য বিধানেও কাহার প্রাণ অগ্রসর হয় না। যে আত্ম-ত্যাগের এত মহিমা ও গৌরব, তাহার কল্পনাও, আত্মস্বত্ব নিদ্ধারিত হওয়ার পূর্ব্বে জন্মিতে পারে না। রহস্য এই যে, ইহা, বিস্তার এবং গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আত্ম-পর-ভেদ যতই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম করুক না কেন, প্রায় সকল স্থলেই, আত্মত্যাগের মূলে অহং নামের সার্থকতারূপ অতি সূক্ষ্ম থাকিয়া যায়। এই অপরিহার্য্য স্বার্থ, মানবজাতির গৌরব-হানি-কর নহে। চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের পর হইতে, সাময়িক স্বার্থ-সাধন উদ্দেশ্যে ভয়ঙ্কর পীড়ন-ব্যবসায় অনেকটা দমিত হইয়া আসে, এবং বঙ্গে পুরুষানুক্রমে প্রজা ভূম্যধিকারীর মধ্যে একটি দৃঢ় এবং দুশ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ সিংহেব শাসন-সংরক্ষণে দেবীসিংহের দুর্ব্বিসহ অত্যাচার, ক্ষুদ্র সংস্করণে কোন কোন স্থানে এখন পর্য্যন্ত নানারূপে প্রচ্ছন্নভাবে অভিনীত হইলেও, তাহা প্রমিত করিবার জন্য চেষ্টা যথেষ্ট উপায় রহিয়াছে। বঙ্গদেশে ভূম্যধিকারিগণের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয় নহে। তাঁহারা অসংখ্য প্রজার করগ্রাহী এবং অনেকস্থলে প্রজাদের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, প্রজাদিগকে নানারূপেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুখী কিংবা আপদগ্রস্ত করিতে পারেন। স্থূলদৃষ্টিতে কেবল প্রজাদের সঙ্গেই, ভূম্যধিকারিগণের এইরূপ গুরুতর সম্পর্ক দৃষ্ট হইলেও, বস্তুতঃপক্ষে, তাঁহাদের সঙ্গে দেশের প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই শুভাশুভের অতি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে।

বর্ত্তমান যুগে, সাংসারিক উন্নতি কি মানসিক উন্নতি, যাহাই হউক না কেন, সকলই অর্থসাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশীয় ভূস্বামীদিগের মধ্যে কেহ সাধারণতঃ ধনী, কেহ সমৃদ্ধ, কেহ বা ধনুকুবের এবং ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্তবংশ হইতে উদ্ভূত, তাহাদের প্রায় সকলেই দাতার প্রাণরূপ উচ্চসম্পদে সম্ভ্রান্ত। এমত অবস্থায় যাহাদের অর্থাভাবে উন্নতির পথ অবরুদ্ধ আছে, তাহাদের অনেকেই যে এই ভূস্বামীদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাঁহাদের হস্তে এইরূপে নিঃস্ব প্রজার শুভাশুভ,

দেশের মঙ্গল ইত্যাদি ঘোরতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মের ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের যে নানাপ্রকারে কতদূর যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমেয়। দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভূস্বামিবর্গের মধ্যে অপাত্রে ভার ন্যস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত এখন বিরল নয়। তাঁহাদিগের ভিতরও আবার দুইটি শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। একটি, জড়পিণ্ডবৎ নিশ্চেষ্ট কিংবা হার্বার্ট স্পেনসার[১০৯ক] অচেতন বস্তুর যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, সেই সংজ্ঞাভুক্ত। অন্যটিতে, তৃপ্তি হীন, সীমাহীন প্রভুত্ব ও ভোগ-লালসা-জনিত অন্ধ উন্মত্ততা সর্ব্বদা বিদ্যমান। ইহাঁরা আপনাদের 'প্রদাহি-সুখের' নিমিত্ত জনসাধারণের ন্যায়-সঙ্গত সুখ দুঃখ তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেন। এবং যাঁহারা শক্তিশালী, তাঁহাদিগকে নীচজনোচিত সেবায় তুষ্ট রাখিয়া, গরীব পীড়ন আরম্ভ করিয়া দেন। অবশেষে গরীব প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া, নিজে যশের খেতাবী অর্জ্জন করেন। সভ্যজগতে এইরূপও পীড়নের প্রথা। অন্য দিকে রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির সমুদ্র শোষণ করিলেও তাঁহাদের তৃপ্তি হয় না। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, শুকদেবের নিঃস্বার্থপরতা, দধীচির পরার্থ-প্রীতি, কিংবা দার-ত্যাগী দেব-ব্রতের জিতেন্দ্রিয়তা লইয়া সংসারে অতিঅল্প লোকই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পৃথ্বীচারী সাধারণ কীট, আমাদের অঙ্গে ধূলি, মাটী সর্ব্বদা লাগিয়াই রহিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমাদের কর্ত্তব্য কিংবা এবম্বিধ সুখ এবং সখের মাত্রা নাই? প্রাকৃতিক নিয়ম-পালন, সমাজের মঙ্গলসাধন এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যের মিশ্রণ— আত্মার উন্নতি সাধন রূপ মহাকর্ত্তব্য কি সাধ্যমত আমাদের পালন করিতে চেষ্টা করা উচিত নয়? যে মাদকতা, এই সকল কর্ত্তব্যের প্রতি উপেক্ষা জন্মায়, এবং সর্ব্বজন-নিন্দনীয় অতিগর্হিত কর্ম্মকেও নিজের গৌরব বলিয়া মনে করায়, তাহা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, যাহারা এই সমস্ত কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন, তাহারা প্রকৃতির সর্ব্বমঙ্গল নিয়মে, কিছুতেই পৃথিবীতে বেসী দিন স্থায়ী হইতে পারে না। জগতের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দান করিবে। উপযুক্তরূপ শিক্ষা সম্পদেও, এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভূস্বামিগণ দরিদ্র। শিক্ষার মহাত্ম্য এই যে, ইহা রুচি মার্জ্জিত করে, মন উন্নত করে, এবং প্রকৃতি-গত দোষাসমূহের মূল-শক্তি উৎপাটিত করিতে, অনেক সময় অসমর্থ হইলেও, এমন স্নিগ্ধ-আবরণে উহাদিগকে আবরিয়া রাখে যে, প্রায়শঃ তাহা জনসাধারণের পীড়াদায়ক হয় না। শিক্ষার সাহায্যে যে প্রতিভা কতদূর উর্দ্ধে উঠিতে পারে, তাহা কাঁচ হইলেও কাঞ্চনবৎ শোভা পায়। যে ব্যাপার শ্রবণ করিলে, কর্ণে অঙ্গুলী দেওয়া কিংবা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করার ব্যবস্থা, তাহা শিক্ষাদ্বারা স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত প্রতিভা-সাহায্য অভিজ্ঞান শকুন্তল কিংবা স্থানান্তরে রোমিও ও জুলিয়েট্। উভয়েই কাব্যজগতে প্রেমের অতুল চিত্র এবং এখনও জগতের প্রেমিক প্রেমিকা, তাহাদের নিজ হৃদয়ের অফুরন্ত নীরব ভাষা উহাতে পরিস্ফুট দেখিতে পাইয়া, আত্মায় অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করিতেছে। শেষোক্ত শ্রেণীর ভূস্বামিগণের এক দিকে যেমন শিক্ষা অভাব, অন্য দিকে সৎসঙ্গও তাহাদের পক্ষে দুর্লভ। কতগুলি মাক্ষিকপ্রকৃতি অশিক্ষিত নীচ স্তাবকের দলে তাহার সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকে। আকস্মিক বিশেষ কোন দৈবী কিংবা প্রবলা বাহ্যশক্তির সাহায্য ব্যতীত, ঐ কুশিক্ষা এবং অসৎসংসর্গের বিষময় ফল তাহাদের বংশপরম্পরা চলিতে থাকে।

পাঠক ! এখন একবার এই ভূস্বামী সম্পর্কে সুদূর ইংলণ্ডের সহিত আপনাদের দেশের তুলনা কর। বিলাতে এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রায় সকলেই কি পরিমাণে সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন এবং সংসারক্ষেত্রে কর্ম্মবীর, তাহা আমাদের দেশে সহজে অনুমিত হইবার নহে। জীবনব্যাপি অধ্যয়ন-স্পৃহা, বহুদেশ ভ্রমণ, পাঠ্য বস্থা হইতে রাজনীতির আলোচনা, বাল্যকাল হইতে স্বদেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জনের সংকল্প এবং তাঁহাদের স্বজাতি-সুলভ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণে তাঁহারা দেশের অগ্রগণ্য এবং যে কোন গুরু কর্ম্মের ভার গ্রহণে সমর্থ। এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। ভারতে, ব্রিটিশ-শক্তির অভ্যুদয় কাল হইতে এ পর্য্যায় ইংলণ্ডের কোন সম্রাট্ কি-মহিষী আমাদের দেশ আসন সংরক্ষণ করিতে আসেন নাই। এই বিপুল ভারতসাম্রাজ্যের কোটি কোটি প্রজার সুখ দুঃখের দায়িত্বপূর্ণ বোঝা বহন করিতে, উপযুক্ত ব্যক্তি, বিলাতের ভূস্বামী শ্রেণী হইতেই প্রায় নির্ব্বাচিত হইতেছেন। তাঁহারাই আমাদেব দেশের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতৃরূপে বড় লাটের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহারা যে কি পরিমাণ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ কর্ম্মঠ এবং কি পরিমাণই বা সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহা শিক্ষিত লোকের ভিতর অনেকেই জানেন। বিলাতে পার্লিয়ামেন্টে, হাউস অব্ লর্ড্স্ এ (House of Lords) যত জন লর্ড সভ্য আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি আমাদের দেশ শাসনে সমর্থ। আর আমাদের দেশের ভূস্বামীদের মধ্যে এইরূপ অনেক আছেন, যাঁহারা নিজেদের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির শাসন-সংরক্ষণে কিংবা সুবন্দোবস্তেও অসমর্থ। পক্ষান্তরে, যাহাদের আত্ম সম্মান জ্ঞান আছে, এমন সদাশয় বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ ব্যক্তিরও, ইহাঁদের সঙ্গে মিশিবার পথে অনেক বিঘ্ন আছে। সুতরাং, বহিস্থ ব্যক্তিদের সৎ সঙ্গেও সহজে ইহাঁদিগকে টানিয়া উর্দ্ধে উঠাইতে পারে না। পৃথিবীতে আমরা হৃদযের সকল দিক্ দিয়া সকলে সঙ্গে মিশিতে পারি না। এমন কি, যাঁহাকে জীবন-সঙ্গিনী সহধর্ম্মিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহার সঙ্গেও নয়। মনে কর, তুমি অতবড় পণ্ডিত, কিন্তু পাণ্ডিত্যের দিক দিয়া, তুমি তোমার স্বল্পশিক্ষিতা স্ত্রীর সহিত মিশিতে পার না। কিন্তু চরিত্রের নির্ম্মলতা, গভীর স্নেহ ও ভালবাসা ইত্যাদিতে তোমার ক্ষুদ্রতা অনুভব কর, এবং তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরক্ত হও। তাই বলিতেছি যে, মনুষ্যের ভিতরে এমন কোন বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক, যাহাতে এই বিভিন্ন ধর্ম্মালম্বী মনুষ্য-জগতে কাহারও না কাহারও প্রাণ তাহাব প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায়, যেখানে মূর্খতা এবং মুখোচিত অভিমান ও ক্রোধের মণিকাঞ্চন-সম্মিলন হয়, সেখানে খ্রীষ্টের মহা-প্রাণতাও ব্যর্থ হইয়া থাকে।

এবারের উপসংহারে আমার বক্তব্য এই, যে শক্তি ও সম্পদ, ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায়, যত্ন কিংবা ভাগ্যগুণে, তোমার হস্তে গড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার একমাত্র ও সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব মানুষের সুখশান্তির ভার গ্রহণ। সে দায়িত্ব যদি তুমি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হও, কি তাহাতে অপারগতা দেখাও, এবং পক্ষান্তরে তোমার যতটুকু শক্তি লইয়া যাহাকে স্পর্শ কর, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে চীৎকার করিয়া উঠে, যে পথে দিয়া যাও, সেখানেই যদি হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে, তাহা হইলে, ইউরোপের কমিউনিষ্ট দলের সাম্যবাদে তোমার আপত্তি থাকিবে কেন? প্রভুপদের প্রকৃত মহিমা যে সেবকতায়, তাহা যদি তুমি না বুঝিতে পারিলে, এবং

তোমার ন্যায়সঙ্গত কোন সুখের বিন্দুমাত্র ত্যাগ না করিয়াও, সাধারণের যে সকল সুখশান্তি বিধান করিতে পার, তাহার প্রতি উদাসীন রহিলে, তবে তোমার এই বাহ্যিক নট-লীলার এই বিসদৃশ বিড়ম্বনায় আর প্রয়োজন কি?

সত্যের অনুরোধে ইহা বলা আবশ্যক যে, এ দেশীয় ভূস্বামীদিগের সকলেই এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহেন। তাঁহাদিগের মধ্যে, কেহ কেহ, শুধু সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রাদি কলাবিদ্যায় নিপুণ, মার্জ্জিতরুচি সুরসিক সৌখিন, এমন নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে, সর্ব্ববিষয়ে আদর্শস্থানীয় ভূম্যধিকারী আছেন। তাঁহারা যেমন সুশিক্ষিত তেমনই ধার্ম্মিক, যেমন অমায়িক তেমনই উদার। ভোগ-বিলাসের অতুল সম্পদ চারিদিকে বিকীর্ণ অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে, তাঁহারা, সেই সম্পদরাশির মধ্যে, বিলাস-কুঞ্জের কুসুমাসনে নিত্য সমাসীন রহিয়াছে দয়া, ধর্ম্ম ও অনাসক্তিতে রাজর্ষিকল্প। তাহারা সর্ব্বাংশে কর্ত্তব্যপরায়ণ। —তাঁহারা একহস্তে বজ্রমুষ্টিতে আপনার বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করেন ; আর এক হস্ত, দয়ার অশ্রুতে আর্দ্র করিয়া, উহাদ্বারা দীনদু:খীর নয়নজল পুছাইয়া দেন। তাঁহাদের পরোপকার-ব্রতে শঙ্খ ঘন্টা, ঢাক ঢোল বাজাইবার প্রয়োজন থাকে না। তাঁহাদিগের আশ্রিত-বাৎসল্যে আসাসোটার চমক খেলে না। অথচ, তাঁহারা চরিত্র-গৌরবে চারি দিকের প্রীত-মুগ্ধ আনন্দ দৃষ্টির বিষয়ীভুত হইয়া উঠেন। প্রজাবর্গ তাঁহাদের চিরপদানত ; কিন্তু ভয়ে নহে,—ভক্তিতে। আশ্রিতনিচয় সেবকের ন্যায় সতত অনুগত ; কিন্তু লোভে বা ক্ষোভে নহে— আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধায়। প্রজাবর্গ, তাঁহাকে আপদে বিপদে অভয় ও আশ্রয়দাতা রক্ষক, আমোদ উৎসবে, সুখশান্তিবিধাতা অভিবাবক, এবং সর্ব্বত্রই পিতা মাতায় স্থলবর্ত্তীজ্ঞানে, প্রাণের সহিত ভালবাসে ও ভক্তি করে। কোন কোন স্থানে ঈদৃশ পূণ্যপ্রকৃতি ভাগ্যবান ভূস্বামী সম্পর্কে প্রজার মধ্যে এই বিশ্বাস ও ধারণা বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হইয়া আছে যে, ভুস্বামীর নামে মানস করিলে, অফলন্ত গাছে ফল ধরে, বন্ধ্যা গাভী বৎসবতী হয়। এবারকার এই প্রবন্ধের উপসংহারে, এই শ্রেণীর পার্থিব ভুদেবস্বরূপ এ দেশে যে দুই এক জন ভূম্যধিকারী আছেন, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্যে করপুটে প্রণাম করিতেছি। তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকুন ; এবং একে এক সহস্র হইয়া, এ দেশীয় ভূস্বামী সম্প্রদায়কে কৃতার্থ করুন। তাঁহাদের সংখ্যা যদিও বড় কম, তথাপি তাঁহারা যদি, তাঁহাদের আদর্শ যাহাতে অন্য ভূস্বামীদিগের মনের উপর কার্য্য করিতে পারে, তদর্থ স্বতঃ পরতঃ একটুকু যত্নবান্ থাকেন, আত্মবিষয় সংরক্ষণের ন্যায় ইহাও যদি তাঁহাদিগের অবশ্য করণীয় নিত্যকর্ত্তব্য মধ্যে গণিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অচিরেই আমাদিগের মধ্যে প্রীতিকর পরিবর্ত্তন বা যুগান্তর না ঘটিয়া করিবে না।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ন ঘোষ।

চন্দ্রোদয়ে [কবিতা], গুরুনারায়ণ আইচ চৌধুরী : ইন্দ্রের অপবাদ [পূর্ব্ববর্তী সংখ্যার **'ইন্দ্র' বিষয়ক প্রবন্ধের প্রতিবাদ], নবেন্দ্রনারায়ন ঘোষ : মেঘ [কবিতা], অর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ : পত্র [কবিতা], অভয়কুমার গুহ : সৌন্দর্যতত্ত্ব, [প্রবন্ধ], ভুবন মোহন সেনগুপ্ত : সরলা [কবিতা], তারে [কবিতা], শ্রী: ফটো [ব্যাঙ্গাত্মক রচনা], সংক্ষিপ্ত সমালোচন, জনৈক সাহিত্য-সেবী : সমালোচনার সমালোচন।**

বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইংরেজী-ওয়ালা সমালোচক

অনেকেই জানেন, ইংরেজ সমালোচক, বাঙ্গালী-চরিত্রের সমালোচনায়, অশেষ গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার লেখনী মুখে কখনও কাল-কূট বিষ উদ্গিরিত হইয়াছে ; কখনও, বাঙ্গালীর কল্যাণে, বিদ্রূপাত্মক তীব্র রসিকতার উৎস উছলিয়া পড়িয়াছে। আবার কখন কখন বা, কি যেন একটা ভাবের ক্ষণিক মোহে, সামান্য একটু কৃপাকটাক্ষ লুলিয়া পড়িয়া, নিরীহ বাঙ্গালীকে কৃতার্থ করিয়াছে। ইংরেজকর্ত্তৃক-গ্রথিত বাঙ্গালী জাতির গুণগাথা, এক্ষণি গ্রন্থবদ্ধ অবস্থায়, ইংরেজী সাহিত্যের, একদিককার একটা, নূতন অঙ্গরাগ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজ, বাঙ্গালী চরিত্রের সমালোচনায়, এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, অথচ তাহার ভাষা বা সাহিত্যের কোন সংবাদ লন নাই, ইহা কোন প্রকারেই সম্ভবপব নহে। বস্তুতঃ ইংরেজের হাতে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও যথেষ্ট সমালোচনা হইয়াছে, এখনও হইতেছে। কিন্তু আমরা, আজিকার এই প্রবন্ধে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইংরেজ সমালোচকদিগের প্রসঙ্গে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

ইংরেজ লেখক, বাঙ্গালীর জাতি তত্ত্ব লিখিতে যাইয়া, কলিকাতার কৃষ্ণদাস পালকে, যখন অনায়াসে, ব্রাহ্মণ বলিয়া, নির্দ্দেশ করিতে পারেন ; আবার, বঙ্কিমচন্দ্রের, সম্ভবতঃ, বৃষবৃক্ষের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, 'গোপাল উড়েকে' (Flying Gopal) লিখিতে, যখন একটুকুও ইতস্ততঃ করেন না। হয়ত, গোপালের অনুবাদে (Herd of cows) এবং গোপাল উড়েকে একবারে (Flying Herd of cows) অর্থাৎ উড়ন্ত গরুর পাল লিখিয়া আক্ষরিক অনুবাদে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেই মনে প্রাণে উৎসুক রহেন ; তখন আর ইংরেজ সমালোচক-কৃত বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা সম্বন্ধে অকারণ বাক্যব্যয় করিয়া পুণ্য কি? ফলতঃ তা দৃশ সমালোচনার সহিত বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি বা অবনতির বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না।

কিন্তু, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইংরেজী-ওয়ালা-সমালোচক সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। ইংরেজী ওয়ালার সমালোচনা উপেক্ষার বস্তু নহে। কেন না, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইংরেজী-ওয়ালা-সমালোচকদিগের সকলেই বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালী বলিয়াই, যথার্থ গুণগণনায় অনধিকারী হইলেও, বাঙ্গালা সম্বন্ধে, দুটি কথা বলিতে অন্য প্রকারের নিত্য অধিকারী। বাঙ্গালা সাহিত্যে রীতিমত নামজারি না হইয়া থাকিলেও, জন্মস্বত্বেই, তাঁহারা উহার সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত মালিক দখিলকার বা নির্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান্। তাঁহাদের অনেকে আবার ইংরেজীর প্রসাদে দেশে ও সমাজে উচ্চ পদবীরূঢ় এবং নেতা চালকরূপে সর্ব্বত্র সম্মানার্হ। সে ঋষি নাই, ঋষিবাক্য নাই ঋষির সে দেশও এখন নাই। সুতরাং, স্থান ও অবস্থা বিশেষে, তাঁহারাই সেই মুনি ঋষির স্থলবর্ত্তী এবং কালমাহাত্ম্যে তাঁহাদের ইংরেজী-ভাবাবিষ্ট, ইংরেজী-রীতি-সঙ্গত ইংরেজী উক্তিই ঋষি বাক্যের ন্যায় অতর্কিত রূপে গ্রাহ্য ও আদরণীয়।

কোন ইংরেজকে সংস্কৃত বা আরবি ভাষায় অগাধ পণ্ডিত বলিলে, কেহই এরূপ মনে করিবেন না যে, তিনি তাঁহার মাতৃভাষা ইংরেজীতে নিরেট মূর্খ। পক্ষান্তরে, কোন বাঙ্গালীকে ইংরেজীতে বিশেষ বুৎপন্ন বলিলে, সাধারণতঃ ইহাই বুঝাইবে যে, তিনি তাঁহার মাতৃভাষা বাঙ্গালা জানেন না, অথবা কোন দিন উহার কিছু শিখিয়া থাকিলেও এখন ভুলিয়া গিয়াছেন ; আর একবারে ভুলিতে না পারিয়া থাকিলেও নেটিভী বুলীর সেই ছাই ভস্ম, যাহাতে স্মৃতির পট হইতে একবারে ধুইয়া পুছিয়া অচিহ্ন হইয়া যায়, তদর্থ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন ! তাঁহারা

লিখেন ইংরেজী, বলেন ইংরেজী, চিন্তা করেন ইংরেজী। তাঁহারা হাসেন ইংরেজীতে, কাসেন ইংরেজীতে, ইংরেজীতে ঘুমান এবং ইংরেজীতেই স্বপ্ন দেখিতে যত্ন করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের অভিভাবকতায়, খাটি ইংরেজ অপেক্ষাও, ঈদৃশ ইংরেজী–ওয়ালা অধিককতর মারাত্মক ও ভয়াবহ উপসগ।

ইংরেজী–ওয়ালা বাঙ্গালী দিগের মধ্যে, এখানে সেখানে দুই চারি জন সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় বিশেষ বুৎপন্ন ও অসাধারণ কৃতী পুরুষ না আছেন, এমন নহে। কিন্তু তাঁহারা ইংরেজী–ওয়ালার চিহ্নিত শ্রেণীভুক্ত নহেন। তাঁহাদের ইংরেজী সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও প্রসর হইলেও, পাসের চাপরাশরূপ দলিল না থাকিলে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সংস্পর্শ দোষে, সাধাবণের চক্ষে স্বল্পতোয় তড়াগের মত মীন–প্রবাহ ও নিস্তেজ। এমন কি, তাঁহাদিগকে, সাধারণের নিকট ইংরেজী–ওয়ালারূপে প্রতিপন্ন হইবার নিমিত্তও, অশেষ যোগাড়–যন্ত্র ও বহু সাটিফিকেট সংগ্রহ করিতে হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে, ইংরেজী–ওয়ালা বাঙ্গালীদিগের পক্ষে, বাঙ্গালা ভুলিয়া না যাওয়া, একটা উৎকট কলঙ্ক মধ্যে গণ্য ছিল। এখন অবশ্যই সে ভাব নাই। এক্ষণ, মাতৃভাষার প্রতি, সকল স্থানে আন্তরিক না হইলেও, মৌখিক অনুরাগের ভাব প্রকটিত হইতেছে। সুতরাং, বিরাগেব সেই থার্ম্মোমিটারও কএক ডিগ্রি নীচে নামিয়াছে। কেহ কেহ এখনও, "আমি বাঙ্গালা জানি না," স্পষ্টাক্ষরে ইহা নির্দ্দেশ করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন না বটে, কিন্তু অনেকেই বাঙ্গালা জানাব ভাণ করা আবশ্যক মনে করিতেছেন এবং বাঙ্গালা গ্রন্থেব সমালোচনায়, অবাধে তাঁহাদেব ইংরেজীলেখনী চালনাকবিতে অভ্যস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। এই শ্রেণীর ইংরেজী–ওয়ালা সমালোচকই আমাদিগের লক্ষ্য।

বাঙ্গালা–সাহিত্যের ইংরেজী–ওয়ালা সমালোকগণ, দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী নিম্নস্থানীয় ইংরেজী–ওয়ালা অথবা জঙ্গলা ভাবাপন্ন ইঙ্গবঙ্গ। তাঁহারা ইংরেজী–ওয়ালা হইলেও অপ্রসিদ্ধ, অজ্ঞাতনামা ও অপরিচিত ; সুতরাং নগণ্য। তাঁহাদের সমালোচনা কালীঘাটের চণ্ডীপাঠের মত। যে দেয় পয়সা, তারই শিরে চণ্ডীপাঠ। যে গ্রন্থকার 'তুভ্যং নমঃ' বলিয়া দুটি স্তুতির ফুল দিতে পারিল, তাহারই শিরে প্রশংসাব এক ঝুড়ী আশীর্ব্বাদ ঝরিয়া পড়িল। যাহা হউক, এই শ্রেণীর সমালোচকের ঈদৃশ সমালোচনায়, বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কারণ, তাহাদের উক্তিতে গ্রন্থকারও ইচরে পাকিয়া উঠিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় না ; আর ঐ সকল গ্রন্থকারের লেখা,—সেই শিশুর খেলা বা অসম্বদ্ধ প্রলাপ অথবা অনুপযুক্ত সখের অসার হিল্লোলগুলিও গ্রন্থের সম্মান পাইয়া তরিয়া যাইতে পারে না।

ইংরেজী–ওয়ালাদিগের মধ্যে, যাঁহারা সমাজের নেতৃস্থানীয়, উচ্চপদস্থ বড় লোক, যাঁহাদিগেব কথায় দশের মত পরিচালিত ও দেশের গতি আংশিক পরিবর্ত্তিত হয়, যাঁহাদিগের শঙ্খনাদে গঙ্গার স্রোত উজান চলে,—গবর্ণমেন্টও যাঁহাদিগের কথায় সসম্মান কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করেন ; তাঁহারা যখন বড় বড় ইংরেজী কাগজের পরিচালক বা সম্পাদকরূপে সমালোচকের আসন পরিগ্রহ করেন, তখন সমালোচনার অর্থ বস্তুতঃই অন্যরূপ হইয়া পড়ে।

এই শ্রেণীর সমালোচক, এক সময়ে, ছিলেন, সর্ব্বত্রপরিচিত নীতিকুশল কৃষ্ণদাস পাল ও শম্ভুচন্দ্র মুখার্য্যি। তাঁহারা উভয়েই এক্ষণ স্বর্গগত। অধুনা, জ্ঞান–গম্ভীর, ধীমান, দেবপ্রকৃতি মিরার–সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, বেঙ্গলী–সম্পাদক, বাগ্মিকুল–বরণ্যে, প্রসিদ্ধনামা সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, নানা তত্ত্বে অধীতি, বিশ্বকোষ–সম্পাদক, কৃতবিদ্য নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শম্ভুমুখুর্য্যার স্থলবর্ত্তী, 'রেইজ ও রাইয়ট্‌–সম্পাদক, ইংরেজীতে প্রগাঢ়, সুবিজ্ঞ যোগেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি, ইংরেজী–ওয়ালা সমালোচকদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। কিন্তু ইহাঁরা, অন্য প্রকারে সমাজে ভজনীয় ও একান্ত সম্মানার্হ হইলেও ইহাঁদিগের কেহই বাঙ্গালা ভাষায় তেমন অভিজ্ঞ নহেন। অথচ ইহাঁরা, আপনাদিগের ইংবেজী কাগজে বাঙ্গালা গ্রন্থাদির অজস্র সমালোচনা লিখিয়া আপনাদিগের অভীষ্ট সমালোচন–ব্রত অবাধে উদ্যাপন করিতেছেন !

আমরা শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর, যখন শোকক্লিষ্ট কলিকাতায় বিরাট শোক-সভার অধিবেশন হয়, তখন সেই সভার একটি বিখ্যাত বক্তা, অবশ্যই ইংরেজী–ওয়ালা, বক্তারূপে বরিত হন। তিনি তাঁহার মনোমাদিনী বক্তৃতায়, শোকোচ্ছসিত কণ্ঠে কহিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য উপাদেয় গ্রন্থসমূহের কথা বলিতেছি না। তিনি যদি অন্য কোন গ্রন্থ না লিখিয়া, তাঁহার ঐ 'বন্দেমাতরং' এই গীতটি মাত্র লিখিয়া যাইতেছেন, তাহা হইলেও, তাঁহার নাম বাঙ্গালা–সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত।" তাঁহার সেই আগেবময়ী বক্তৃতার করুণ–বিলম্পতে যদিও সমস্ত সভা মন্ত্রমুগ্ধবৎ আত্মহারা ছিল, তথাপি এই বিসদৃশ 'বন্দে মাতরং' উক্তিটি অলক্ষিত অবস্থায় পার পাইযা যাইতে পারিল না। সভার গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গিয়া গেল ; অনেকে শোকাশ্রু–নয়নে হাসিয়া ফেলিলেন। শুধু 'বন্দেমাতরং' এই একটি কথায়ই বাঙ্গালা–সাহিত্যে বক্তার কিরূপ অভিজ্ঞতা, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। শুনিয়াছি, সে দিনও আবার কলিকাতায় কবি হেমচন্দ্রের শোক–সভায়, অন্য আর একজন কৃতবিদ্য বিজ্ঞ ব্যক্তি, বৃত্রসংহার কাব্যের কথা বলিতে যাইয়া 'বিত্রসিংহ' কহিয়া অমনই হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। কথা ক্ষুদ্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্র কথা হইতেই, বক্তাদ্বয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যে কিরূপ প্রবেশ ও অধিকার আছে, এই বৃহৎ তত্ত্বের একটু আভাস পাওয়া যায় না কি ?

বাঙ্গালা- সাহিত্য, এক্ষণ আব ময়দার পিণ্ডের মত, বেওয়ারিস মাল নহে যে, যাঁহার যেমন সখ, তিনি উহাদ্বারা তেমনই একটা কিছু গড়াইয়া লইবেন। বাঙ্গালা এক্ষণ ভাষা–জগতে একটা বস্তুরূপে সম্মান পাইবার যোগ্য। বিদ্যাসাগব ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, বাঙ্গালার এই ভিক্‌টোরিয়াযুগে, বাঙ্গালা–সাহিত্য রীতি মত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় সংস্কৃতের অধিকার কতদূর খাটি বাঙ্গমালার আধিপত্যই বা কতটুকু, তাহার একটা সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হিন্দী, ব্রজবুলী , উর্দ্দু ও ইংরেজীর কিঞ্চিৎ, আপন আপন শক্তি , সামর্থ্য ও শোভার সম্পদ লইয়া, বাঙ্গালার খাতায় নাম লিখাইয়া, বাঙ্গালা রূপে পরিচিতি হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালাব ব্যাকরণ আছে। উহাতে গঠন–গত নির্দ্দিষ্ট রীতিনীতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালা এখন ভাষা। বাঙ্গালা প্রকৃতই এখন একটা বস্তু। বাঙ্গালায় সহস্র সহস্র গ্রন্থ আছে। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃতিত্ব লাভ করিতে হইলে, এক্ষণ বাছা বাছা অন্ততঃ দুই তিন শত বই ভালরূপে পড়িয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক।

বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য কেহ একবিন্দু পরিশ্রম করিতেছেন না ; অথচ, বিজ্ঞ লোকেরাও আপনাদিগের অসাধারণ প্রতিভা, বিদেশীয় ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য, এবং মাতৃভাষার উপর স্বাভাবিক দাবির বলে, গায়ের জোরে, বাঙ্গালার গ্রন্থকার বা বাঙ্গালা–সাহিত্যের সমালোচক হইয়া বসিতেছেন ! ইহা কি নিতান্তই দুঃখজনক বিড়ম্বনা নহে ?

শুধু বিড়ম্বনা কেন, ইহা একটা মারাত্মক উপসর্গ। বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞতা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যে অপ্রবেশ হেতু, ইংরেজী-ওয়ালা সাহিত্যের বক্ষে শেলাঘাত ও অকৃতী গ্রন্থকারের মুণ্ড পাত করিয়া থাকেন এবং অবশেষে আপনারাও বিজ্ঞ-সমাজে বিড়ম্বিত ও হাস্যস্পদ হইতে বাধ্য হইয়া পড়েন। তাঁহারা বাঙ্গালা জানেন না, বাঙ্গালা গ্রন্থের ভাল মন্দ বিচার কিরূপে করিবেন? তাঁহারা গ্রন্থখানি সেল্‌ফে তুলিয়া রাখিয়া অথবা ওয়েষ্ট পেপার বাসকেটে ফেলিযা দিয়া, গ্রন্থকারের কাতর মুখের পানে তাকাইতে থাকেন। সুতীক্ষ্ম বিচার-ক্ষমতায়, মন্দ বুঝিয়া মন্দ বলিতে, অজ্ঞতা হেতু, তাঁহাদের সাহস না থাকিলেও, স্বাভাবিক, মহত্ত্ব ও দয়ার অনুরোধে, দুটি মিঠা কথা বলিয়া দিতে তাঁহাদের বিবেক বিন্দুমগত্রও ব্যথিত হয় না। সুতরাং তাঁহারা সমালোচনায় গ্রন্থের গুণানুবাদ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহেন।

শাদা সিধা গুণানুবাদে তত অনিষ্ট নাই। তাঁহারা, আবার সময় সময়, এই গুণানুবাদে আপনাদিগের গুণপণার পবিচয় দিতে যাইয়া, অকাণ্ডে প্রলয় বা ক্ষেত্রের পূজায় মহিষ বলির আয়োজন করিয়া বসেন। তাঁহারা রামু শ্যামুর "মনের কথা তাইলো তাই" এই নাটক নামের চটক দেখিয়া, তুলনায় সেক্ষপীরকে স্মরণ করেন। বাসর ঘরের মেয়েলী ছড়ায় কাব্যের মার্কা দেখিয়া, মিল্টন বায়রণ বা সেড়িডেনের নাম করেন। 'ঠাকু' মার ঘুম পাড়ানিয়া গল্পে, স্কট্ বা ডুমার প্রতিভা দেখিতে পাইয়া চমকিয়া উঠেন। কখন বা একটা অসম্বন্ধ অসার প্রবন্ধে ইংরেজী ভাবের অপ্রাসঙ্গিক সামান্য অনুকরণ দেখিয়াই, প্রবন্ধকারকে বাঙ্গালার কার্‌লাইল বলিয়া অভিনন্দন করিতে অগ্রসর হন। এই অবস্থার ফল যার-পর-নাই ভয়াবহ। অত-বড লোকের অমন উচ্চ সার্টিফিকেট পাইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে 'নটে শাকও, মহাদ্রুমের সাহিত আস্পর্দ্ধা করিয়া মাথা নাড়িয়া, দণ্ডায়মান হয়। এবং যে সকল কদর্য্য ও অপাঠ্য গ্রন্থ বঙ্কিম বাবুর অগ্নিপরীক্ষায় ভস্মীভূত হইবার যোগ্য, বঙ্গীয় মুদ্রযন্ত্রের উদিগরিত সেই গলৎগুলিও, জোর করিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের স্বর্ণসেল্‌ফে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন, মধুসূদন, হেম ও নবীন প্রভৃতির গ্রন্থাবলীর সঙ্গে ঠাই পাইতে বিয়াদবের মত অগ্রবর্ত্তী হইতে সাহস পায়! জাতীয় সাহিত্যের এইরূপ বিড়ম্বনা, ভাষার উপর এইরূপ ব্যভিচার ও দৌরাত্ম্য, কি ভাষা, সাহিত্য ও জাতিগত উন্নতি ও বিকাশের পক্ষে যার-পর-নাই ভয়াবহ ও মারাত্মক অন্তরায় নহে? ইংরেজী-লব্ধ, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রতিভা-বলে, বাঙ্গালা-সাহিত্যেব সমালোচনা হউক ; ইহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ইংরেজী-ওয়ালা সমালোচকদিগের নিকট আমরা একান্ত বিনীতভাবে, করযোড়ে এই প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা মাতৃভাষা বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য, অগ্রে একটু শ্রম স্বীকার করিয়া, পশ্চাৎ যেন সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করেন, অন্যথা ঈদৃশ সমালোচনায় শক্তি ক্ষয় করা অপেক্ষা একেবারে নীরব থাকাও শ্রেয়।

১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩১০

"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিত:।"

বঙ্গের ভূস্বামিগণ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

ঐ যে বাসন্ত-প্রভাতের মৃদু মলয়-সমীরণ গাছের কচি পাতাটি কাঁপাইয়া, আধ-নিমীলিত ফুলের কুঁড়িটিকে দোলাইয়া, পুষ্প-গন্ধ-ভার-বহনে ক্ষণে ক্ষণে অসমর্থ হইতেছে ;

উহারে প্রকৃত অধিকারী কে ? কিংবা ঐ যে শরৎকালের মেঘ- নির্ম্মুক্ত চাঁদ, ঝোপে ঝোপে, বীচিমালায় চিক্ দিতেছে, এবং রজনী গভীর হইলে, সুষুপ্ত অর্দ্ধ পৃথিবীকে প্রেম-সেক -স্নিগ্ধ ঘুম-ঘোর -মাখন জ্যোৎস্না-আবরণের আবৃত করিয়া নিজেও তন্দ্রালস-নয়নে চাহিয়া রহিতেছে, উহার কুহক-শক্তি-সম্পন্ন বিমল রজতচ্ছটারই বা প্রকৃত মালিক দখিলকার কে? তরুণ-উষার মুখে ঐ যে প্রাত:সূর্য্য- কিরণ বৃক্ষ লতিকায় হাসি মাখাইয়া দিতেছে, নীহারশ্রুভারে অবনত নলিনীকে আবার প্রফুল্ল করিতেছে উহাই বা কাহার একমাত্র উপভোগ্য? জ্ঞানের অভ্যুদয়ে , মানব-শিশু, যখন প্রশ্ন-আকুল -চিত্তে এই অধিকার-সমস্যা পূরণের নিমিত্ত দেহ-মন-প্রাণ নিয়োজিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহার অনন্ত কাল পূর্ব্বেই, জগদাবরণ-ভূতা জগদ্ধাত্রীরূপিণী সর্ব্ব মঙ্গলা প্রকৃতি, স্বতঃই তাঁহার অনন্তকোটি সন্তানের প্রাকৃতিকসম্পদ অধিকারের নিরপেক্ষ ব্যবস্থা, শত শত অনুশাসন দ্বারা. আমাদের নিকট অপরিহার্য্য, নিত্য ও সত্য দেদীপ্যমান করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদ্বারা তর্কের প্রশ্ন মীমাংসিত না হইয়া থাকিলেও, প্রাণের প্রশ্ন—চিত্তের সমস্যা সহজেই পূরণ হইতে পারে। জল বায়ু, আলো উত্তাপ ইত্যাদি যে কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে, একথা বুদ্ধিস্থ করিতে প্রায় কোন ব্যক্তিরই সময়ক্ষেপ করিতে হয় না। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, অনন্তকোটি জীব জন্তুর আবাস-ভূমি, শস্যশ্যামলা, জীব-ধাত্রী ধরিত্রী মাতৃস্নেহে প্রাণী মাত্রেই ক্ষুৎপিপসা নিবারণ করিতেছে, এই ধারিত্রীর অঙ্গাবরণ,—মৃত্তিকার উপর প্রকৃত অধিকার কার? ধনীর কথায় যেমন ধনের কথা হয়, গুণীর কথায় যেমন গুণের কথা উঠে, সেইরূপ ভূম্যধিকারীর কথায় আপনা হইতেই ভূম্যধিকারের অর্থাৎ ভূমিতে অধিকারের কথা আইসে। ইদানীং Jhon Stuart Mill[১১২] প্রভৃতি মহামনস্বীদিগের যত্নে Political Economy অর্থাৎ আধিরাজিক অর্থ- বিজ্ঞান* নামে যে আশ্চর্য্য দার্শনিক তত্ত্ব প্রায় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছে। তাহার অন্যতম মুখ্য প্রশ্ন এই—ভূমিতে প্রকৃত অধিকার কার? ভূমিতে প্রকৃত অধিকারী কে? লোক-ভয়ঙ্কর ফরাশি রাষ্ট্র-বিপ্লব ও মনুষ্য জাতির নিকট এই প্রশ্ন লইয়াই উপস্থিত হইয়াছিল, এবং এই একই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যই অসংখ্য মনুষ্যের রুধির-ধারায় অবনীর অঙ্গ আর্দ্র করিয়াছিল।

পাঠক, দয়া করিয়া মনে রাখিবেন যে, আমরা বঙ্গীয় ভূম্যধিকারী দিগের ইতিহাস লেখক অথবা তাঁহাদিগের সম্পর্ক ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনা করিতে উপবিষ্ট হই নাই। বঙ্গীয় ভূম্যধিকারী দিগের মঙ্গল হইলে আমাদের দেশের মঙ্গল, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই নানারূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা মনে করিয়াছি যে, ধারাবাহিক শৃঙ্খলা থাকুক আর না থাকুক, বঙ্গের ভূম্যধিকারী সম্বন্ধে যে সকল মঙ্গল্য কথা স্বভাবতঃ পাঁচ জনের মনে উঠে, আমরা সেইগুলি লইয়াই একটু আলোচনা করিব। যাঁহারা (Communism) অর্থাৎ সাধারণ-স্বত্ব-বাদে সবিশেষ প্রবিষ্ট, তাঁহারা জানেন যে, (Communist) অর্থাৎ সাধারণস্বত্ববাদী দিগের মতে আকাশের আলো ও বায়ুতে যেমন পৃথিবাসী সকলেরই সমান অধিকার, পৃথিবীর মৃত্তিকা অথবা ভূমিতেও মনুষ্য মাত্রেরই তেমন সমান অধিকার। বনের শৃগাল ও বন্য-জীবের

ইংরেজী শব্দের বাঙ্গলো অনুবাদে সিদ্ধহস্ত বলিয়া যিনি সর্ব্বত্র সম্মানিত, বর্ত্তমান বঙ্গের সেই অদ্বিতীয় শাব্দিক শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর Political Economy এই ইংরেজী পদের "আধিরাজিক অর্থবিজ্ঞান" এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। লেখক

যে অধিকার আছে, মনুষ্যের তাহা নাই, এ কথা কে বলিবে? আমরা (Communism) অর্থাৎ সাধারণস্বত্ত্ববাদের সকল কথা বুঝিও না, যাহা একটু বুঝি, তাহারও সকল কথায় সায় দিতে পারি না। Mill রীতিমত (Communist) অর্থাৎ সাধারণ-স্বত্ববাদী না হইলেও, তিনি এবং তদনুবর্ত্তী অসংখ্য জ্ঞান-গুরুর মত এই যে, কৃষিজীবী প্রজাই প্রকৃত ভূম্যধিকারী ; কারণ, সে ভূমিকে দোহন করিয়া সাধারণের অন্ন যোগায়। ইহাদ্বারা বুঝা গেল যে, যাহারা নিজে খাটিয়া ও ভূমিকে খাটাইয়া জনসাধারণের গৃহ ধন-ধান্যে পূর্ণ করে, তাহারাই ভূমির প্রকৃত অধিকারী।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের বহু চেষ্টার ফলে যে সকল জটিল প্রশ্ন এখম পর্যন্ত পৃথিবীতে সুমীমাংসিত হয় নাই, তম্মধ্যে ভূম্যধিকার প্রশ্ন একটি। কিন্তু এ কথা ঠিক্ যে, বিবেক যখন বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া, ন্যায্যরূপে ভূম্যধিকার ন্যস্ত করিতে উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিবে, তখন শ্রাবণ-ধারায় আপাদ-মস্তক সিক্ত, চৈত্র-রৌদ্রে দগ্ধ, নিরভিমান পরিশ্রমী কৃষককেই উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে মনোনীত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে জমিদার অথবা ভূম্যধিকারী বলিয়া থাকি, কোন কর্ম্মের নিমিত্ত, ন্যায়-সঙ্গতরূপে, তাঁহারা এই প্রভুত্ব কিংবা ভূম্যধিকার পাইতে অধিকারী? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহার উত্তরস্বরূপে প্রজা-রূপী ভূম্যধিকারীকে রক্ষণাবেক্ষণ ও যাহাতে তাহারা সুখে শান্তিতে বর্দ্ধিত হইয়া আপন কর্ম্মে প্রফুল্ল মনে নিযুক্ত থাকিতে পারে, তজ্জন্য সাধ্যমত চেষ্টা ইত্যাদি সাধুকর্ম্ম ব্যতীত, অন্য কোনই কপোল-কল্পিত, বে-আইনি, ধর্ম্ম-বহির্ভূত অধিকারের কথা, বিবেক কি যুক্তিসঙ্গতরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি না। পাঠক, এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখ, যে কর্ত্তব্যের উপর তাঁহাদের ভূম্যধিকার নির্ভর করে, এবং যে কর্ত্তব্য পালন না করিলে, তাঁহাদের (ভূস্বামীদিগের) অধিকার অনেক পরিমাণে অত্যাচারীর ক্ষমতা কিংবা অধিকারের ন্যায় নিতান্ত অসাধুজনোচিত হইয়া পড়ে, তাহা পালনে কয়জনে মনোযোগী হইতেছেন?

আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, জমিদার তালুকদার ইত্যাদি নামেই বুঝি কিছু মহিমা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জমিদাব, তালুকদাব প্রজা ইত্যাদি শব্দে কোনরূপ মহত্ত্ব মাধুরী কিংবা স্বত্ব বা অধিকার নাই। সুতরাং, যাঁহারা এই সকল শব্দমাত্র অবলম্বন করিযা, সংসূচিত মনঃকল্পিত অধিকারের উপব দণ্ডায়মান হইয়া, একে আর হইতে চাহেন, তাঁহারা মূর্খ। আমাদের দেশে কৃষিজীবীদিগকে প্রজা কিংবা রাইয়ত বলে। পঞ্জাবে কৃষিজীবীর নামই জমিদার। কেননা, জমি তাহার করায়ত্ত। জমির উপর তাহারই ıeal gold অর্থাৎ প্রকৃত অধিকার। তালুকদার বলিলে, আমাদের এ দেশে কৃষিজীবী হইতে উন্নত অথচ জমিদার হইতে অনেক নিম্নস্থিত মধ্যবর্ত্তী একশ্রেণীর লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু যে সকল লোকেরা ধনে মানে, কিংবা ভূম্যধিকারের গৌরব-পরিমাণে; এ দেশের জমিদারদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করেন না, অযোধ্যা-প্রদেশে তাঁহাদের নামই তালুকদার। সুতরাং, এ স্থলে কবিগুরু সেক্ষপীরের সেই চির-প্রসিদ্ধ কথা প্রযুক্ত হইতেছে,—'What is in a name' অর্থাৎ শুধু নামের ভিতর কি মহিমা আছে?

প্রজা শব্দ এখন আর শুধু কৃষিজীবীদের প্রতি ধর্ম্মতঃ ও আইনের বিধানতঃ প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, আমরা তাহাদের রাজা নই। যদিও দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজা বলিলে এইক্ষণ মুদী, পসারি, স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর এবং আদালতের উকিল,

অনেককেই বুঝাইতে পারে, তথাপি সত্যের অনুরোধে ধ্রুব সত্যরূপে বলিতে হইতেছে যে, প্রকৃত রাজা একজন অথবা একটা শক্তি ; এবং সেই রাজার অধিকারে প্রজা ও ভূম্যধিকারী উভয়েই সমান প্রজা। সাধারণতঃ, আমাদের দেশে, অনেক স্থলে ক্ষমতার যেরূপ অপব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের ন্যায় সাধারণের স্বত্বরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর, শাসন-কর্মে উদার এবং রাজ্য-পরিচালন-প্রণালীতে দৃঢ় গবণমেন্ট যদি না থাকিত, তাহা হইলে যে দুর্বল, বহুবিষয়ে পরপ্রত্যাশী বঙ্গদেশের কত অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহিতে হইত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

দেশের লোকে যাঁহাকে নিরন্তর মহারাজা এই চতুরক্ষর মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকে, অথবা মহারাজাধিরাজ বলিয়া স্তুতির পুষ্পচন্দন যোগায়, তিনিও ব্যবস্থা বিজ্ঞানের চক্ষে যেমন প্রজা, রাধু চঙ্গ, কিংবা রামাই পাতরও ঠিক তেমনই প্রজা। সমাজের ও সর্ব্বসাধারণের স্বীকৃত স্বত্বের উপর সামান্য অত্যাচার করিলে, উভয়েরই কণ্ঠনালী কনষ্টবলের চন্দন-লেপ-শূন্য কর্কশ-মুষ্টির চণ্ডশক্তিতে পরিগৃহীত হইতে পারে। এ কথা আমাদের কল্পনার কথা নহে। পুরীর রাজার ইতিহাসই এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পুরীর পুরাতন রাজা প্রতাপ রুদ্র এক সময়ে উড়িষ্যা প্রদেশের প্রকৃত অধীশ্বর অথবা রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশধরদের মধ্যে এক মহাপুরুষ, অল্পদিন হইল, সাধারণ প্রজার উপর অত্যাচারের অপরাধে, প্রথমে কনষ্টবলের দ্বারা নিপীড়িত, তাহার পর বিচারালয়ে নিগৃহীত, পরিশেষে বিচারের ব্যবস্থা-অনুসারে নির্বাসিত হইয়াছেন। এ সকল ঘটনা চক্ষে দেখিয়া এবং ইতিহাসের জ্বলদক্ষর উপদেশ-বাক্য কানে শুনিয়া এবং আধিরাজিক অথ-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের তত্ত্বকথা বিষয়ে সর্বদা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও, যখন আমরা প্রজারূপী প্রকত ভূম্যধিকারীকে ভূম্যধিকারী বলিয়া মনুষ্যোচিত সম্মান দানে অগ্রসর হই না ; এবং যাহাদের অনুগ্রহে অহোরাত্র অন্নবস্ত্রে প্রতিপালিত হইতেছি, তাহাদের আর্তনাদে কর্ণপাত করি না ; পরন্তু, কুটুম্ব, সহচর, অনুচব, বেতনভুগী সামান্য দরোয়ান পর্যন্ত, যাহারই একটু অত্যাচারের স্পৃহা আছে, অথবা নীচজনোচিত স্বার্থসাধনে অত্যাচারে সবিশেষ অনুরাগ আছে, তাহাকেই অক্লেশে এবং সহজচিত্তে প্রকৃতিপালিত মাঠের কৃষকের অঙ্গে তাহার লালাসিক্ত তীব্র দন্ত বসাইতে দেই, তখনই বুঝিয়াছি যে, আমরা শুধুই নামমাত্র ভূম্যধিকারী। ভূমি-সম্ভূত অর্থ এবং অর্থসম্ভূত সুখটুকুর জন্যই আমরা লালায়িত, প্রকৃত ভূম্যধিকারীর সুখ দুঃখের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিরহিত। আমরা, এই নিমিত্ত ভূম্যধিকার-সম্পৃক্ত মহামহিমান্বিত পুরুষদিগকেও, যার-পর-নাই কাতরকণ্ঠে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, এখনও সাবধান হউন, সতর্ক হউন, দেশের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও তাহার ন্যায্য স্বত্ব ও ন্যায়সুলভ সুখ শান্তিতে অক্ষত ও অক্ষুণ্ন রহিতে দিউন।

আপনি মহারাজাধিরাজ, অথবা মাথা হইতেও উন্নত, মহামহিম, মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন মহারাজ, অতএব এ কার্য্যে আপনারই দৃষ্টান্ত দেখান কর্তব্য। আপনারা যদি বড় ছোট সমস্ত ভূম্যধিকারীকে আপনাদের উদার দৃষ্টান্তে আকর্ষণ করিয়া, ভূম্যধিকার-প্রতিষ্ঠিত কৃষিজীবীর স্বত্ব ও সম্মান রক্ষায় এবং মঙ্গলসাধনে না অগ্রসর হন, তাহা হইলে, প্রকৃতি এক সময়ে আপনাদিগের সর্ববিধ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে। প্রকৃতির প্রতিশোধ অপরিহার্য, অপ্রতিহত ও অনুল্লঙ্ঘনীয়। প্রকৃতি যখন পদাহতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় প্রতিশোধ লইবার জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। উহার কঙ্কাল-মুষ্টি তখন

কুপিত শক্তির লৌহ-মুষ্টি হইতেও অধিকতর প্রভাবে অত্যাচারীর কণ্ঠকে করায়ত্ত করিয়া লয় এবং মনুষ্য স্বপ্নেও যে কার্য্যফলের যেরুপ ব্যবস্থা চিন্তা করে নাই, প্রকৃতি তাহা প্রদান করিয়া দেশ ও সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করে। পাঠক, এখন কি তোমার সেই গীতা-উক্ত শ্লোকের কথা মনে জাগরিত হয় না?—"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" তাই আবার বলিতেছি, ধর্ম্মপ্রিয়তার জন্য না হইলেও, অন্ততঃ স্বার্থপরতার জন্যও লোকরঞ্জক হও। তাহা না হইলে, ফ্রান্সের অমিত-ক্ষমতাপন্ন, প্রজা-রক্ত-পুষ্ট, সাধারণের সুখ-দুঃখে উদাসীন, ভোগবিলাসী চতুর্দ্দশ লুই কিংবা সঞ্চিতপাপের প্রায়শ্চিত্ত ঋণী অমায়িক, সাধুপ্রকৃতি ষোড়শ লুইও মুক্তি পায় নাই—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র যে তুমি, তুমিও পাইবে না।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

উমেশচন্দ্র বসু : কুমার সম্ভব [কবিতা ; ৭-৮, ১০, ১২ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত], মনোমোহন ভট্টাচায : ইন্দ্রের অপবাদ অমূলক নহে [প্রবন্ধ], অর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ : তটিনী [কবিতা], অভয়কুমার গুহ : সৌন্দযতত্ত্ব [১০-১২ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত]।

১ম ভাগ, ৭ম-৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০

নব্য-বঙ্গের রঙ্গ-লীলা

প্রথম কথা,—নব্য-বঙ্গ। পুরাতন নামটাই অরুচিকর। যাহা পাকিয়া, গলিয়া, পচিয়া শুকাইয়া গিয়াছে ; যাহার রস নাই, দস নাই, আছে মাত্র আঠি, তাহারই সহিত পুরাতনের সম্পর্ক। যাহা কিছু সভ্য ও ভব্য, যাহা কিছু রম্য ও কাম্য, সে সমস্তই নব্যের সম্পদ। নব্য-বঙ্গ কি?—বঙ্গ-উপসাগর, বেলাভূমির এলাকা বাড়াইয়া দিয়া, পুরাতন বঙ্গের অঙ্গে একটা নূতন বঙ্গ যোজনা করিয়া লইয়াছে কি? অথবা ভূ-কম্পের প্রবল আন্দোলন হেতু, দলিল-বসন-বিশ্লেষে উপকূলসমীপে, প্রসর সাগর-বক্ষের একাংশ নগ্ন হইয়া, নব্য-বঙ্গ নামে পরিচিত হইয়াছে কি?—না, তাহা হইলে, এই মোকদ্দমাবিলসী ভূস্বামীর দেশে, উহার স্বত্বস্বামিত্ব লইয়া, একটা বিষম হুলস্থূল পড়িত, দিয়ারা বিভাগের কাজ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইত, এবং চরম নিষ্পত্তির আশার আপীলের আরজি বিলাতে উপস্থিত হইয়া, প্রিভিকাউন্সিলের টেবিলে সাহেবী ধরণে বসিয়া যাইত। এ সকলের কিছুই হয় নাই। তবে কোন বঙ্গীয় কলম্বাস, রসনা ও লেখনীরূপ এঞ্জিনের জোরে কল্পনার অতলান্ত পার হইয়া, নূতন পৃথিবীর মত, কোন স্থানে একটা নব্য বঙ্গের আবিষ্কার করিয়া ফেলেন নাইত?—না, তাহা হইলেও, ভারতের মান-চিত্রে নূতন রঙ্গের একটা নূতন চিত্র ফুটিয়া উঠিত ; নূতন পাঠ্যের নূতন কুঠিয়াল,—ম্যাক্‌মিলান কোম্পানী, নব্য বঙ্গের নূতন ভূগোল রচনার জন্য, বঙ্গীয় বাল্মীক, ব্যাস ও কালিদাসের দলে বিজ্ঞাপন ঘোষণা বা টেণ্ডার (tender) তলব করিতেন ; এবং বিদ্যা-ভার-নিপীড়িত স্কুলবালকের কোমল স্কন্ধে ভূগোল-বিদ্যা বোঝা আয়তনে এক ঝুরি বাড়িয়া পড়িত। এ সকলের কিছুই হয় নাই। তবে নব্য-বঙ্গ কি?

নব্যবঙ্গ একটা স্বতন্ত্র দেশ বা রাজ্য নহে। পুরাতন ও নূতন পৃথিবী (Old world ও New world) এর মত, পুরাতন-বঙ্গ ও নব্য-বঙ্গ, একই জিনিষের এপিঠ আর ওপিঠও নহে। পুরাতন বঙ্গ ও নব্যবঙ্গ মূলে একই পদার্থ। পুরাতনবঙ্গই, কাল-মাহাত্ম্যের ও অবস্থাবিপাকে, আপনার বেশ ভুষা, চালচলন ও হাবভাব ইত্যাদি সমস্ত বদলাইয়া, নূতন মূর্তিতে নব্যবঙ্গ সাজিয়াছে; এবং নূতন পরিচয়ে স্ফীত হইয়া, কখন কখন পশ্চাতে ফিরিয়া পুরাতন নির্মোকের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া মিটি মিটি হাসিতেছে, আর ভাবিতেছে "এই আমি কি ওই!" কখন কখন বা আবার, দারে ঠেকিয়া, পরিত্যক্ত পুরাতনের দুই এক টুকরা কুড়াইয়া আনিয়া নূতনের সহিত মিশাইয়া রাখিবার নিমিত্তেই যেন, থমকিয়া দাঁড়াইতেছে; আর ভাবিতেছে, "এর চেয়ে ভাল বুঝিয়া ওই।" যাহা হউক, এই নব্য বঙ্গের বয়স বেসী হয় নাই। সম্ভবতঃ, শত বৎসর হইল, এ দেশে, নূতন অবয়বে, ধীরে ধীরে এই নব্য বঙ্গের স্ফুরণ ঘটিয়াছে।

নব্যবঙ্গের এক প্রধান উপকরণ বা পরিচায়কচিহ্ন,—বক্তৃতা। পুরাতন বঙ্গে বক্তৃতাছিল না,—ছিল মুন্সীয়ানা কথা। বক্তৃতায় হস্তপদাদি সঞ্চালন, শিরঃকম্পন, মুখ-ভঙ্গি, ভ্রূকুঞ্চন ও সম্প্রসারণ, বিবিধভাবে নয়নবিক্ষেপণ ইত্যাদি নানারূপ অভিনয় আছে, কণ্ঠস্বরের উত্থান ও পতন,- ধৈবত ও নিখাদের আরোহ ও অবরোহ আছে, আর এই সকলের উপরে আছে,—বৃথা কথার বাগাড়ম্বর। পুরাতন কালের মুন্সীয়ানার এ সকল উপসর্গের উপদ্রব ছিল না।—মুন্সীয়ানা মৃদুবাহিনী, অল্পাক্ষরভাষিণী ও মর্ম্মস্পর্শিনী সার কথা। সে মুন্সীয়ানা এখন দরবারে ঠাঁই না পাইয়া পুরাতন শিশুশিক্ষাব ক্ষীণ পত্রে আশ্রয় লইয়াছে। এ দিকে বক্তৃতা জয়-পতাকা উড়াইয়া, আপন বলে নব্য বঙ্গের সকল অঙ্গ অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

আগে আচায্য অতি নির্জ্জনে বসিয়া, জিজ্ঞাসু শিষ্যকে, অন্যের অশ্রোতব্য ভাষায় চুপে চুপে ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিতেন; এইক্ষণ ধর্ম্মাচার্য্য জনাকীর্ণ সভামণ্ডপে উচ্চমঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া, বক্তৃতার বজ্র-নির্ঘোষে শ্রোতার অনিচ্ছুক কর্ণে, ধর্ম্মোপদেশের প্রবাহ ঢালিয়া দেন। নীতি আগে কথায় ফুটিত না, লজ্জাশীলা কুলকামিনীর মত, কর্ম্মের আবরণে লুকাইয়া থাকিত, এবং সুযোগ পাইলেই অঙ্গুলি সঙ্কেতে কর্ম্মীর আদর্শচরিত্র দেখাইয়া দিয়া, কি এক মনভুলান মধুর অথচ নীরব ভাষায়, ঐ আদর্শের অনুসরণে মনঃপ্রাণ টানিয়া লইত। নব্যবঙ্গে, সেই নীতি, কর্ম্মক্ষেত্রের কৃচ্ছ্রসাধনায়, আংশিক বীতস্পৃহ হইয়া রসনা-রসার্দ্র ভারতীর আশ্রয়ে, বক্তৃতার উচ্ছ্বাসে রণচণ্ডীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে শিখিয়াছে। রাজনীতি এখন যত না মন্ত্রণাগৃহে, তাহার চতুর্গুণ বক্তার জিহ্বায়। কোন পরিচিতনামা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি স্বর্গগত হইলেন। তাঁহার জন্য শোক করিতে হইবে, অমনি বক্তৃতার কণ্ঠে কান্নার করুণ-তান বাজিয়া উঠিল। কাহারও প্রশংসা করিতে হইবে, অমনি বক্তৃতা প্রশংসার গদে সুর বাঁধিয়া লইল। জন্মে বক্তৃতা, কর্ম্মে বক্তৃতা, বিবাহে বক্তৃতা, শ্রাদ্ধেও বক্তৃতা। নব্যবঙ্গে বক্তৃতা না হয় কিসে? এমন কি, একটি সম্ভ্রান্ত আগন্তুক গৃহে আসিলেও বক্তৃতায়ই তাঁহার অভ্যর্থনা হইয়া থাকে।

পুরাতন বঙ্গে, কোন অন্তরঙ্গ প্রিয়জন গৃহে উপস্থিত হইলে, বুকভরা আলিঙ্গন ও অবস্থা বিশেষে, নয়ন-জলে তাহার সংবর্দ্ধনা হইত। এইক্ষণ সেই আলিঙ্গন ও নয়ন-জলের স্থলবর্তী, বাক্-চাতুরী বা বাগ্‌বিন্যাসের মার্জ্জিত কৌশল। পূর্বকালে কোন সম্মানার্হ বহিস্থ অভ্যাগত গৃহে সমাগত হইলে, গৃহ-কর্তা, শাদাসিধা কথায়, হৃদয়ের মধু মাখাইয়া, প্রথমতঃ তাঁহার

সাদর সম্ভাষণ করিতেন। তৎপর "সর্ব্বদেবময়োহ তিথি" এই শাস্ত্র অনুসারে অতিথির সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া, কৃতার্থ হইতেন। নব্য বঙ্গ এই পুরাতন চাল ভুলিয়া গিয়াছে। অধুনা ইদৃশ আগন্তুকের সমাগমে, প্রথমতঃ আতিথেয় ও অতিথি, উভয়পক্ষই কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। ইহার পরে, কার্ডের প্রসাদে অথবা কোন মধ্যবর্ত্তীর অনুকম্পায়, পরিচয়টা হইয়া গেলে, মুখে—"বটে বা হাল্লো" ইত্যাদি দুই একটি কথা ফুটে, অধর-প্রান্তে মৃদু হাসি একটুকু চমক দিয়া চলিয়া যায়, অবশেষে কর-মর্দ্দনে প্রথম সম্ভাষণের পরিসমাপ্তি ঘটে। কর্তা যদি বিশেষভাবে আগন্তুকের সম্মান করিতে ইচ্ছা করেন। তাহা হইলে, ইহার পরে, সুবিধা মত সময়ে, একটা সভা আহ্বান করিয়া, বক্তৃতার হলহলায় আগন্তুকের প্রতি প্রীতির পুষ্পবৃষ্টি হয়। এই হেতুই বলি, বক্তৃতা নব্যবঙ্গের একটা প্রধান উপকরণ।

নব্য বঙ্গের অন্য উপকরণ বা উপসর্গ সংবাদ-পত্র। পুরাতনবঙ্গে খবরের কাগজ ছিল না ; লাইবেল বা মানহানির মোকর্দ্দমায়ও আদালতের ফাইল পরিপুষ্ট রহিত না। তখন খবরেব কাগজের কতেক কর্ম্ম হইত ; সামাজিক শাসনে, কতেক হইত চাটুকারের পুষ্পচন্দনে, কতেক হইত লাঠি বা বেত্র-সঞ্চালনে। ইহার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহা সম্পন্ন হইত, কবির আসরে নবমীর নিশা-অবসানে। নব্য-বঙ্গে, এই সমস্ত প্রয়োজন উদ্ধারেরই সর্ব্ব প্রধান সাধন সংবাদ-পত্র।

নব্যবঙ্গে আরও কত কি ফুটিয়াছে। বেশভূষা, চালচলতি, আহার বিহার, এবং শিক্ষা দীক্ষা, যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই নব্য-বঙ্গের নূতন মার্কা লক্ষিত হইয়া থাকে। বলিতে গেলে বলিবার বিষয় অনন্ত। কিন্তু মূল বিষয় ছাড়িয়া, এখন এ সকল অবান্তর কথা লইয়া সময় কাটান অসঙ্গত।

সকলের উপরে নব্য-বঙ্গের রঙ্গ-লীলা। রঙ্গলীলা ভারতে ছিল ; বঙ্গে ছিল না। অনেকে অনুমান করেন, খৃষ্টের সাত শত বৎসর পরে, রাজা বিক্রমাদিত্য বর্তমান ছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে, সংস্কৃত ভাষায় নাটকের পর নাটক রচিত ও তদীয় বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভায় অভিনীত হইত। বিক্রম অর্ক ইত্যাদি বিক্রম-নাম-ধারী আরও বহু রাজার নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা শ্রীহর্ষ বিক্রম-নাম-ধারী রাজাদিগের পূর্ব্ববর্তী। মহারাজা শ্রীহর্ষ স্বয়ং কবি ছিলেন। কথিত আছে, তিনি রত্নাবলী ও নাগানন্দ প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। এই সকল নাটকের যথারীতি অভিনয় হইয়াছিল। মৃচ্ছকটিক নাটক রত্নাবলীরও পূর্ব্ববর্তী। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতে অতি পুরাতন কালেও নাট্যাভিনয় ও রঙ্গলীলার প্রচুর প্রচলন ছিল। কথিত আছে, ভরদ্বাজ মুনি সর্ব্বপ্রথম ভারতে নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত করেন। ইহা সত্য হইলে, ভারতে নাটক ঋষিযুগের পুরাতন সম্পদ।

রঙ্গ-লীলা পুরাতন কথা হইলেও, পুরাতন-বঙ্গ রঙ্গ-লীলার কোন ধার ধারিত না। এমন কি অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও, বঙ্গের কোনস্থানে, কেহ নাট্যাভিনয় দেখিতে পাইয়াছেন কি না, সন্দেহ। গৌরাঙ্গ দেব, সময় সময়, নাট্যাভিনয়ের ন্যায়ই একটা লীলাভিনয় করিতেন। কিন্তু তাহা কোন অংশেই বর্তমান রঙ্গ-লীলা নহে। উহা তাঁহার সেই উচ্ছ্বসিত আবেগপূর্ণ প্রেম-ভক্তিরই একটা সাধনা বিশেষ বা আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান। গৌরাঙ্গ দেবের কীর্তন বঙ্গে পরিগৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার সে নাট্যাভিনয়ের অনুকরণ হয় নাই। বঙ্গে আমাদের সঙ্গে যাত্রা, কবি, কীর্ত্তন ও ঢপ ইত্যাদিই সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। এখনও এ সকল আছে, কিন্তু রঙ্গ-লীলার নূতন আলোকে অল্পাধিক মাত্রায়, এ সমস্তই তমসাচ্ছন্ন।

কবি ইত্যাদি অপেক্ষা যাত্রার আদর এখনও একটু আছে, কিন্তু এক্ষণকার যাত্রা, আর পুরাতন কালের যাত্রা এক বস্তু নহে। পূর্ব্বে এ দেশে যাত্রায় অভিনয় একপ্রকার ছিল না, বলিলেও চলে। যেটুকু ছিল, তাহা অভিনয় নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য যাত্রার দলপতি কি শ্রোতা কেহই অভিনয়ের কথা ভাবিত না। ছোকরার দল যদি সুব ও লয় ঠিক রাখিয়া ও গীতের পদগুলি সব বুঝাইয়া গাইতে পারিত, তাহা হইলেই ব্যাপার চুকিয়া যাইত। শ্রোতা সন্তুষ্ট হইতেন, যাত্রাওয়ালাও নিশ্চিন্ত থাকিত। করুণ রসের গীত গাইবার সময, ছোকরারা যদি, অধিকারী-প্রদত্ত গুপ্ত চিমটি বা লুকান কান মলার প্রসাদে, একটু কাঁদিয়া ফেলিতে পারিত, তাহা হইলে ত আব কথাই ছিল না, এক গীতেই বাজী মাত হইয়া যাইত।

মান, মাথুর ও প্রভাস প্রভৃতি কৃষ্ণলীলা এবং রামবনবাস ও সীতাবনবাস প্রভৃতি রামলীলার বিবিধ প্রসঙ্গই যাত্রার বিষয় ছিল। প্রায়শই একটা প্লীহারোগা দামোদর বা কোন 'পাথুরে' গোপাল কৃষ্ণ সাজিয়া দাঁড়াইত। ডিম্ব হইতে সদ্য প্রস্ফুট, কুঞ্চিতপক্ষ পতঙ্গের মত, মেটে রঙ্গের একটি শিশু যুথেশ্বরী রাই সাজিয়া, সেই কৃষ্ণের সহিত, প্রেম, বিচ্ছেদ ও মান প্রভৃতি নানা ভাবের নানা-কথা কহিত। বৃন্দাদূতী সাজিত স্বয়ং অধিকারী বা তৎসদৃশ কোন ব্যক্তি। শিশু রাধা বৃন্দার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, আর বৃন্দা যাহা বলাইত, শ্রাদ্ধের মন্ত্রের মত, তাহাই উচ্চারণ করিত। কৃষ্ণ কিছুক্ষণ আসরের এপাশে ওপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃন্দার ঠোকনা খাইত, আর তাহার হাতনাড়া ও মুকনাড়া দেখিয়া অবাক হইয়া রহিত। অবশেষে রাধা কৃষ্ণের মিলন হইয়া গেলেই পালা সাঙ্গ হইয়া যাইত। শ্রোতারা, ঐ দুধের শিশু বাধা আর ঐ কাল পেঁচা কৃষ্ণকেই ব্রজের সেই প্রেমবিনোদিনী, মান-বিলাসিনী, গৌরবিনী রাই ও গোপী-মনোমোহন 'রাধিকারমণ' নটবর শ্যাম মনে করিয়া,কল্পনা বলে, অভিনয়ের ত্রুটি সারিয়া লইতেন ; এবং গীতের পদে কবিত্বে প্রীত হইয়া মনের আগে বাহবা দিতেন।

নব্য-বঙ্গের নাটুকে যাত্রা সর্ব্বতোভাবেই আর এক রকমের জিনিস। উহার আদি, অন্ত ও মধ্য সর্ব্বত্রই রঙ্গ-লীলার রঙ্গাভিনয়। এখনকার যাত্রার পালা শুধু রাম ও কৃষ্ণলীলায় সীমাবদ্ধ নহে। নব্য-বঙ্গের যাত্রা পুরাতন কালের সেই কান্নার পালা ফেলিয়া দিয়া, বীরভাবে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে।রাবণবধ, হিরণ্যকশিপু-বধ, স্তম্ভনিশুম্ভ-বধ ইত্যাদি বধী পালা লইয়া যাত্রার আসরে এক্ষণ একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি কুস্তি হইয়া থাকে। আগে যাত্রার প্রধান রস ছিল,— করুণ ও ভক্তি ; এক্ষণকার যাত্রার প্রধান রস,—বীর ও বীভৎস। যাত্রার দলের বীর সকল অবস্থায়ই বীর। পোষাক পরা অবধি পোষাক খুলিয়া রাখা পর্যন্ত, সমস্ত সময়ই, সে বীর-রসেব উচ্ছ্বাসে একবারে পঞ্চমে চড়িয়া রহে। সে মায়ের কাছে যাইয়াও, বীর-রসের গভীর গর্জ্জনে মাটি কাঁপায়, পত্নীর সহিত প্রেমালাপেও ধনুকে টঙ্কার দিয়া কথা কয়। পুত্রকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতে হইবে, তখনও সে মেঘমল্লারে হুঙ্কার দিয়া উঠে। যাত্রার আসরে নেপথ্য নাই। যাত্রার যুধিষ্ঠির, এই গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া, ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে লম্বা বক্তৃতা করিয়া, শ্রোতৃবর্গের যাত্রা শুনার সাধ মিটাইলেন ; বক্তৃতার পরক্ষণেই আবার, বেহালা লইয়া ছোকরার পিছনে সুর যোগাইবার নিমিত্ত খাড়া হইয়া গেলেন। ভীম, এই গদা আস্ফালন করিয়া, পদাঘাতে মাটি কাঁপাইয়া, মাথামুণ্ড কি কতকগুলি বকিয়া বকিয়া গলা ফাটাইলেন, আবার, অমনি, গলা শাণাইয়া লইবার নিমিত্তই যেন, তবলচির পশ্চাতে মাথা গুজিয়া তামাকে একটা দম দিয়া লইলেন ! আধুনিক নাটুকে যাত্রার এই টুকুই বীভৎস রস।

বঙ্গে রঙ্গ-লীলা ছিল না। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই রঙ্গ-লীলার আদর ছিল ; ভারতেও ছিল। এক্ষণ প্রশ্ন এই, রঙ্গ-লীলার আবশ্যকতা কি?—এই কর্ম্মভূমির রঙ্গমঞ্চে মানবজীবনের অঙ্কের অনুষ্ঠিত নিত্য প্রত্যক্ষ কর্ম্মনিচয়ের অভিনয়দ্বারা আবার এইরূপ অনুকৃতির প্রয়োজন কি?—এ প্রশ্নের মীমাংসায় বাগাড়ম্বর অনাবশ্যক। রঙ্গ-লীলা না থাকিলে, শেক্সপীরের হেমলেট, (Hamlet) লিয়ার (Lear) ওথেলো (Othello), জুলিয়াস সিজার (Julius Caesor) ও রোমিও জুলিয়েট (Romeo Juliet) এবং কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রভৃতির ন্যায় বস্তুর কখনও বিকাশ লাভ ঘটিত না। পারিজাত-পরাগমাখা দিব্য নন্দনকুসুমে মর্ত্যের ধুলিকর্দ্দমও সুবাসিত হইত না। যে রঙ্গ-লীলার প্রাসাদে পৃথিবীর নীরস কঙ্কর রাশিতে এমন দুর্লভ রত্ননিচয়ের স্ফুরণ হইয়াছে, সে রঙ্গ-লীলার কোন প্রয়োজন নাই, এমন কথা সাহস করিয়া কে মুখের বাহির করিবে?

রঙ্গলীলার প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন প্রধানতঃ দুটির।—একটি সাহিত্যের পুষ্টি ও কাব্যের উৎকষ ; অন্যটি লোক-চরিত্র বা সমাজ-শোধন। রঙ্গ-লীলা দ্বারা লোকচরিত্র ও সমাজশোধনের কার্য্য কোথায় কিরূপ হইয়াছে, তাহার ইতিহাস সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহাদ্বারা, সাহিত্যের পুষ্টি ও কাব্যের উৎকর্ষ বিধান, যেমন হইয়াছে ভারতে, তেমন বা ততোধিক হইয়াছে পৃথিবীর অন্য অন্য দেশে। শেক্সপীরের নাট্যাবলী ও কালিদাসের শকুন্তল, শুধু ইংরেজী ও সংস্কৃতের নহে, বিশ্বজনীন সাহিত্যেরই আদরের আভরণ ও গৌরবের সম্পদ। রঙ্গ-লীলা হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমাজশোধন-বিষয়ে কোন ফল ফলিয়া থাকুক আর না থাকুক, পরোক্ষভাবে, নাট্য সাহিত্য হইতে যে, তৎসম্পর্কে সুফল ফলিয়াছে এবং এখনও ফলিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর অন্যত্র যাহাই হইয়া থাকুক, বঙ্গে কি হইয়াছে, ইহাই আমার আলোচ্য। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইয়াছে, বঙ্গে লীলার অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। এই পঞ্চাশ বৎসরে, বঙ্গসাহিত্যের কণ্ঠে বহু নাটকের মোহন-মালা লহরে লহরে দোদুল্যমান হইয়াছে ; এখনও হইতেছে। ভবিষ্যতে আরও হইবে। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, নব্য-বঙ্গে রঙ্গ-লীলা ও রঙ্গসাহিত্যের বহুল প্রচার দৃঢ় বাঙ্গালী জাতি চরিত্রাংশে একটু উপরে উঠিতে পারিয়াছে কি? অথবা বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্ঠব ও সম্পদবৃদ্ধি, কোন দিক দিয়া কিছু ঘটায়াছে কি? আমি অদ্য এই দুটি কথা লইয়াই সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ বাঙ্গালা সাহিত্য। এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসায় 'হাঁ' বা 'না' বলিয়া এক কথায় সরাসরি নিষ্পত্তি করা, সকলের পক্ষে সম্ভবময় ও সুসঙ্গত নহে। স্বর্গগত রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর[১১৩] এবং শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, বাঙ্গালা সাহিত্যের এই দুই মহারথী স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় নাটক হয় নাই। ললাটে নাটকের তিলক কাটিয়া, যে গ্রন্থনিচয়, রঙ্গালয়ে রঙ্গালয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রঙ্গ-লীলার ভোজ্য যোগাইতেছে, সকলের দুই একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যরূপে আদর পাইবার যোগ্য হইলেও, অধিকাংশই কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখিত উপন্যাস মাত্র। একখানিও প্রকৃত নাটক নহে। প্রকৃত নাটক যে কিম্ভূত নামাকার পদার্থ, এখনও বিজ্ঞ লোকেরা তৎসম্পর্কে বাদানুবাদ বিচার শেষ করিয়া ফেলিতে পারেন নাই। যাহা হউক, উল্লিখিত মহামহোপাধ্যায় সাহিত্যিকদ্বয়ের মত উপেক্ষার বস্তু নহে। ইংরেজী ও সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে অধিতী অধিকসংখ্যক বিজ্ঞ লোকেরই এই মত যে,—বাঙ্গালায় নাটক হয় নাই।

মনোমোহনের[১১৪] লেখনী বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অশ্রুর প্রবাহ বহাইয়াছে ; দীনবন্ধু কখনও দর্শকবৃন্দকে হাসাইতে হাসাইতে কাঁদাইয়া ফেলিয়াছেন, কখনও বা কাঁদাইতে হাসাইয়া বিদায় দিয়াছেন, উপেন্দ্রনাথ বঙ্গের অসাড় হৃদয়ে ক্ষণকালের তরে পৈত্র-প্রেমের তরঙ্গ তুলিয়াছেন ; গিরিশচন্দ্র[১১৫] প্রেম-ভক্তির পুরাতন সুরে, সময় সময়, নূতন তান ফলাইয়া, রঙ্গমঞ্চে অভিনব প্রীতির জ্যোৎস্না ঢালিয়াছেন ; এবং অমৃতলাল[১১৬] অমৃতের লহরী তুলিয়া রঙ্গভূমি প্লাবিত করিয়াছেন। এ সকলের অধিকাংশই সরস মধুর কাব্য বা উপন্যাস, কোনটিই প্রকৃত নাটক নহে, ইহাই বিজ্ঞ লোকদিগের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত স্থূল দৃষ্টিতে অনেকের কাছে একটু বিচিত্র ও বিস্ময়কর বোধ হইবে না কি?

যাঁহারা বাঙ্গলায় নাটক নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদিগের চক্ষে নাটকের আদর্শ, বড়ই উচ্চ শ্রেণীর সামগ্রী। তাঁহারা একদিকে সংস্কৃতের ভাণ্ডার খুঁজিয়া দেখিতে পাইতেছেন,—কালিদাসের অভিজ্ঞান ও ভবভূতির উত্তর চরিত প্রভৃতি ; এবং আর একদিকে দেখিতেছেন,—ইংরেজীর গৌরবান্বিত বক্ষে শেক্সপীয়রের গ্রথিত সেই জগদ্দূলভ কৌস্তুভ-হার। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বিচার করিতে হইলে, বাঙ্গালার এই—"মনের কথা তাই লো তাই" গোছের "মেয়েলি" দূরের কথা, পৃথিবীর অধিকাংশ নাটকেরই নাটকত্ব, থাকে না,—নাটকীয় সাহিত্যের দরবারে ঠাঁই পাইবাব অধিকার পঁহুচে না। বাঙ্গালায় দীনবন্ধু[১১৭] উপেন্দ্র নাথ,[১১৮] গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল প্রভৃতির উদয় হইয়াছে সত্য, কিন্তু শেক্সপীরের প্রতিভা ফোটে নাই ; কালিদাসের সেই প্রফুল্ল চন্দ্রালোকেও বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্য আলোকিত হয় নাই। বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে বিচার করিবার পক্ষে ইহা একটা গুরুতর কথা বটে। এ অংশে ইহা শতবার স্বীকার্য্য যে, নব্য বঙ্গের রঙ্গলীলা দ্বারা বিশেষভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের তেমন কোন শোভা, সম্পদ বা সামর্থ্য বৃদ্ধি অথবা উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই।

রঙ্গলীলার দ্বিতীয় প্রয়োজন সমাজ-শোধন। নব্য-বঙ্গের রঙ্গ-লীলা বঙ্গীয় সমাজের উপর কি কার্য্য করিয়াছে, এইক্ষণ তাহাই বিবেচ্য। বস্তুত রঙ্গ-লীলার রঙ্গাভিনয়ে বঙ্গীয় সমাজের কোন কলঙ্ক অপনীত হইয়াছে, কোন্ অংশে ইহার কি উৎকর্ষ ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে চক্ষু স্থির হয় ; দুঃখ ও লজ্জায় আপনি মাথা নষ্ট হইয়া আসে। এ প্রসঙ্গে স্থানান্তরের অপ্রত্যক্ষ, শ্রুত বন্যার উপর নির্ভর করিয়া কোন পুণ্য নাই। শ্রুত কথা প্রায়শই স্মৃতিরঞ্জিত, অথবা ভ্রমসঙ্কুল হইয়া থাকে। বঙ্গে রঙ্গ-লীলা সমাজের উপর কিরূপ কার্য্য করিতেছে, পাঠকদিগকে সংক্ষেপে তাহার একটু আভাস দিবার উদ্দেশ্যে, এ স্থলে, আমাদিগের নিজ চক্ষে দেখা, আপন ঘরের কথা বলিব। এই ঢাকা নগরে সর্ব্বপ্রথম নাট্যাভিনয়ের দ্বারা যে ফল ফলিয়াছিল, তাহা এখনও, বোধ হয়, অনেকের স্মৃতিতেই স্পষ্ট প্রতিভাত রহিয়াছে।

কথাটা আজি কালিকার নহে। রঙ্গলীলা ও নাট্যাভিনয় কি পদার্থ,ঢাকা অঞ্চলের সর্বসাধারণ তাহা ভাল করিয়া জানিত না, ঢাকার নাট্যাভিনয়ের প্রথম সূত্রপাত হইল। ঢাকার তদানীন্তন চালক ও নায়কদিগের উদ্যোগে ও যত্নে ঢাকায় একটি সুগঠিত নাট্যসমিতির অভ্যুদয় ঘটিল। বলা বাহুল্য যে, এই সম্প্রদায়ের সহিত অভিনয় বা নাট্যব্যবসায়ী কোন নটের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। ইহা সর্বতোভাবেই সখের দল বা (Amateur party) স্বর্গগত রায় অভয়চন্দ্র দাস বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষবাহাদুর, প্রভৃতি ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ইহারা স্বয়ং অভিনয় করিতেন না। অর্থ সংগ্রহ, অভিনয়ের বস্ত

নির্বাচন, নির্বাচিত বিষয়টি সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি নাটকীয় অঙ্গের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন এবং অভিনয় শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ইত্যাদি কার্য্য ইঁহাদিগের করণীয় ছিল। অভিনয় কর্ম্মে যাঁহারা লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদিগেরও অধিকাংশ ঢাকার গণ্য, মান্য, সুশিক্ষিত ও সুপরিচিত ভদ্রলোক। ঢাকা বারের উকিল, ঢাকা অঞ্চলের জমিদার, যুবক, কলেজিএট স্কুল ও নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রভৃতির অনেকেই অভিনেতা। বাবু উপেন্দ্রনাথ তখন ঢাকায় গবর্ণমেন্ট প্লিডার বা সরকারী উকিল ছিলেন। তিনি আইনে (Law) তে প্রগাঢ় পণ্ডিত ধীর ও গম্ভীবপ্রকৃতি উচ্চশ্রেণীর উকিল, এবং উকিল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই গুরুস্থানীয়। এহেন উপেন্দ্র বাবুও স্বয়ং সখ করিয়া এই নাট্য সম্প্রদায়ে অভিনয় কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন।

এই নাট্য সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতৃদিগের উদ্দেশ্য সমাজশোধন। উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় দ্বারা আদর্শ-চরিত্রের প্রতি লোকের চিত্ত আকর্ষণ ও সমাজের সুনীতির প্রচার ইত্যাদি উচ্চলক্ষ্যে দৃষ্টি রাখিয়া দেশেব মুখ পাত্র স্বরূপ ব্যক্তিগণ ঢাকায় সর্ব্ব প্রথম রঙ্গ-লীলামোদের সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিলেন। বিশুদ্ধ আমোদের উপলক্ষে দেশে সুনীতির প্রভাব বিস্তৃত হইবে, লোকের এই আকাশকুসুম কল্পনা করিয়া, আনন্দে করতল ধ্বনি করিয়া উঠিল। ধনী জমিদার ও অন্যবিধ অর্থশালিগণ অর্থ লইয়া উপস্থিত হইলেন। শিক্ষিত বুদ্ধিমানেরা এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও বুদ্ধির তহবিল উম্মুক্ত করিলেন। লেখক লেখনী ধরিলেন। শিল্পী চিত্রতুলিকা লইযা অগ্রবর্ত্তী হইলেন। ঢাকায় নুতন তানে, নুতন তানে, নুতন সুরে এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব নুতন ভঙ্গিতে রঙ্গলীলার ঐকতান বাদ্য বাজিয়া উঠিল।

শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর প্রভৃতির পরামর্শে, মনোমোহন বাবুর "রামাভিষেক নাটক" অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত হইল। বহু অর্থ ব্যয়ে "পূর্ব্ববঙ্গ রঙ্গভূমি" নামে একটি মনোরম নাট্যগৃহে নির্ম্মিত এবং উহাতে প্রসর রঙ্গমঞ্চ উচ্ছ্রিত ও সুসজ্জিত হইল। ঢাকার লোকে কএক মাস ব্যাপিয়া নাট্যাভিনয় দশনে রঙ্গলীলার প্রথম স্বাদ গ্রহণ করিল।

ঢাকায়, এই রামাভিষেকের অভিনয়-সময়ে, বহু কৌতুকাবহ ঘটনা দশকদিগের নয়নগোচর হইয়াছিল। নাট্যসম্প্রদায় শিক্ষিত ভদ্রলোকের । অভিনেতা শিক্ষিত লোক। তখন অভিনেত্রীর চল ছিল না। কলিকাতার ব্যবসায়ী নাট্যসম্প্রদায় ও তখন পযন্ত নটীর নয়ন-ভঙ্গিতে ভাববিহ্বল ও রণু ঝুনু কিঙ্কিনী ঝনৎকারে মুখরিত হইয়া উঠে নাই। সুতরাং, তখন ঢাকায় ভদ্রলোকের গঠিত থিয়েটারে নটীর সমাগম অসম্ভব কথা। ঢাকার এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত নাট্যসম্প্রদায়ের পুরুষই দাড়ি গোঁফ কামাইয়া, পরচুলা লাগাইয়া, শাড়ীর অঞ্চলে পুরুষ -প্রকৃতি আবরিয়া লইয়া, নারীর অংশ অভিনয় করিতেন। যে মাষ্টার বা পণ্ডিতের জলদ-গম্ভীর গল-গর্জ্জনে দিবসে স্কুল গৃহ নিনাদিত হইত, যাঁহার আরক্তনয়ন ও বেত্র-সঞ্চালনে ছাত্রদিগের প্রাণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিত. নিশিতে রঙ্গমঞ্চে বালকেরা তাঁহাকেই, হয় কৈকেয়ী সাজিয়া মানের অভি নয় কবিতে, নয় ত মন্থরার বেশে ছড়া কাটিতে দেখিয়া, কেমন এক বিচিত্র আমোদে আমোদিত হতই! দিবসে আদালতে যে উকিলের জেরার কৌশলে ব্যবসায়ী সাক্ষীরও মাথা ঘুরিয়া যাইত, তিনিই হয়ত নিশায় রঙ্গমঞ্চে বিদূষক সাজিয়া, নর্ত্তকীর নৃত্যের তালে তালে মাথা ঝুলাইয়া ঝুলাইয়া লোক হাসাইতেন ও

ঢাকায় এই রঙ্গলীলার প্রথম-উৎসবে শুধু অভিনয়ের কার্য্যই যে ভদ্রলোকের হাতে ছিল, এমন নহে। এক্ষণকার, কংগ্রেস বা কন্‌ফারেন্স মণ্ডপে ছাত্র ভলান্টিয়াবের ন্যায়, অনেক মান্যগণ্য ভদ্রলোক,সখ করিয়া রঙ্গালয়ের দ্বারে বলান্টিয়ার দ্বারবান হইয়া ছিলেন। তখন, এ অঞ্চলের জমিদারগৃহে নব্যযুবা বা শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে ইংরেজিব শিক্ষানবীশি আরম্ভ হইয়া থাকিলেও, যাঁহারা গৃহস্বামী কর্ত্তা ও সংসারী, তাঁহারা বড একটা ধার ধারিতেন না। এই শ্রেণীতে কতিপয় সম্ভ্রান্ত জমিদার নাট্যগৃহের দ্বারে দর্শকদিগের টিকেট সংগ্রহ করা এবং যথাস্থানে তাঁহাদিগের আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, ইত্যাদি কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যদিও ইংরেজী জানিতেন না, তথাপি নাটকের গৌরব রক্ষার্থ, ইংরেজী ধরণে, গতিবিধি সম্বন্ধে একটু যেন রিহাসেল (Rehearsal) দিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা হাল আমলের, হাল ফ্যাশনের পোষাকে সজ্জিত হইয়া, নাটক ঘরের দ্বার চাপিয়া উপবিষ্ট থাকিতেন, আর টিকেট যাচাই করিতেন। এই সময়ে, দুই একটি ইংরেজী বুলিও তাঁহাদের মুখে উচ্চারিত হইত।

একদা কএকটি ভদ্রলোক, টিকেট ক্রয় না করিয়া, নাটক ঘরে প্রবিষ্ট হন এবং ক্ষণকাল পরেই ঈদৃশ বক্ষকের কাছে ধবা পড়িয়া যান। দ্বারদেশে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। রক্ষক বলিলেন,--"হয় টিকেটের মূল্য দিয়া টিকেট ক্রয় করুন, আর নয়ত 'ফিটিশন টিকেট' (Fettision ticket) বাহির করুন। তাহা না হইলে কিছুতেই নাটক ঘরে প্রবেশ কবিতে বা এই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবেন না।"

গোলমাল শুনিয়া বহু লোক সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু ফিটিশন টিকেট কি, কেহই তাহাব মর্ম্ম পরিগ্রহ কবিতে পারিল না। গোলামালে রায় অভয়চন্দ্র দাস বাহাদুরেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি দ্রুতগতি ঐ স্থানে আগমন করিয়া. ফিটিশন টিকেটের কথা শুনিয়া ঈষৎ একটু হাসিলেন , এবং ঐ ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আপনাদিগের সঙ্গে ফ্রি এড্‌মিশন টিকেট (Free admition ticket) আছে কি মহাশয় ?" তাহারা উত্তব করিলেন,—"হাঁ আছে।" অতঃপর তাঁহারা (Free admition ticket) দেখাইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। গোলযোগ মিটিয়া গেল। এই শ্রেণীর কৌতুকাবহ দুই একটি ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটিত।[১১৯]

কিছু দিন পরে, ঢাকায় রঙ্গলীলার প্রাথমিক অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেল। এই অভিনয় দ্বারা সমাজের যে উপকার সাধিত হইল লোকের ধীরে ধীরে তাহা কেহ কেহ বা সেই দীঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া দিলেন। নাটক ঘরে "Smoking strictly prohibited" "ধূমপান নিষিদ্ধ" ছিল। কিন্তু এই ধূম ও অনলের অত্যাচার প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনের বলে নিবারিত রহিলেও, অলক্ষিতে অন্যবিধ তরল অনল যে, রঙ্গালয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত প্লাবিত করিয়া তুলিল, বোধ হয়, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরাও তাহা টের পাইলেন না। পরিণামে, যখন ঐ অনল প্রলয়-মূত্তিতে জ্বলিয়া উঠিয়া উঠিয়া, বহু শান্তি-নিকেতন, ও প্রমোদ উদ্যানকে শ্মশানের ধূমে ছাইয়া ফেলিল,তখন অনেকেই অনুতপ্ত প্রাণে ও ক্ষুণ্নহৃদয়ে রামাভিষেক নাটকের কথা স্মরণ করিলেন। কোন যুবা, হয়ত শরীরে প্রস্ফুট কান্তি. মস্তিষ্কে প্রখর বুদ্ধি. হৃদয়ে আশা ও আনন্দ এবং সম্মুখে বিপুল সম্পত্তির অধিস্বামিত্ব ও অখণ্ড আধিপত্য লইয়া, কি অবস্থা বিপাকে জানি না, ঢাকার রামা ভিষেক নাটকে অভিনয় কার্য্যে যোগাদান করিলেন। নাটকীয় কাণ্ডের শেষ নিষ্পত্তির পবে, তিনি যখন থিয়েটার-সমিতি

হইতে বহির্গত হইলেন, তখন দেখা গেল, তিনি আর সে তিনি নহেন,—সম্পূর্ণরূপে আর এক রকমের জীব। জে রাম নামে "কোটি ব্রাহ্মহত্যার পাপ নাশ" হয়, সে রাম নামে ডুবিয়া থাকিয়াও, অদৃষ্ট দোষে ও রঙ্গ-লীলার কি অননুভূতপূর্ব্ব বিচিত্র প্রভাবে, তিনি মনুষ্যত্বকে সর্ব্বোতভাবে বিলাসিতার পায়ে দান করিয়া, সংহার-মূর্ত্তিতে সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৈত্রিক বিষয় ফুৎকারে উড়িয়া গেল। তাঁহার সেই প্রফুল্ল কান্তিতে অস্বাভাবিক কালিমার রেখা পড়িল। স্বাস্থ্য ভঙ্গ ঘটিল। যুবক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন! হয়ত এই দুর্ঘটনায়, পূর্ব্ববঙ্গের একটি পরিচিত সমৃদ্ধ গৃহ শ্মশানে পরিণত হইয়া রহিল। পুত্রশোকাতুরা দু:খিনী জননী, এবং অপূর্বযৌবনা বিধবা পত্নীর হৃদয়বিদারি আর্ত্তনাদে পাষাণের চক্ষেও অশ্রু ঝরিল। এরূপ ঘটনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে আরও কত হইল, কেহ হইল, কেহ তাহার খবর লইল কি?

ইহার পরে, ঢাকায় ক্রমে আরও দুই চারিটা সখের নাট্যসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ও বিলয় ঘটিল। এক্ষণ এখানে দুইটি ব্যবসায়ী নাট্যসম্প্রদায়, নটী বা অভিনেত্রীর সহযোগে রঙ্গলীলায় নূতনতর উৎকর্ষ ফলাইয়া, পরস্পর প্রতিযোগিতায় জীবিত রহিয়াছে।

চরিত্রবান্ সুশিক্ষিত ও পদস্থ লোকের দ্বারা পরিচালিত "রামাভিষেকের" ন্যায় করুণ -রসাত্মক পবিত্র নাটকের অভিনয়ের যদি নৈতিক ফল এইরূপ বিষময় হয়,—ঈদৃশ বিশুদ্ধ নাট্যামোদের সংশ্রয়ে পড়িয়াও যদি ভদ্রলোকের সন্তান অমন ভাবে অধ:পাতে যাইতে পারে, তাহা হইলে,নটী—বা পণ্যবিলাসিনীর সহযোগে 'লায়লা মজুনের, অভিনয়ে কি হইতে পারে, তাহা মনে ভাবিতেও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে; শরীর বোমাঞ্চিত হয়। বস্তুত: রঙ্গ-লীলার প্রসাদে,বঙ্গে কত গৃহে, কত প্রফুল্ল ফুল অকালে ঝরিতেছে, কত স্নেহের লতা অকাল-বৈধব্যে ঢলিয়া পড়িতেছে, কত পুত্রবৎসলা জননীর স্নেহার্দ্র হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে এবং কত সোনার সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে, তাহা গণনা করিয়া দেখিলে, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই চক্ষু স্থির হইবে, বিস্ময়ে ও দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়িবে।

রঙ্গ-লীলা এক্ষণ, নগরে ও বন্দরে, শুধু রঙ্গমঞ্চেই সীমাবদ্ধ নহে। গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে রঙ্গ লীলাব বঙ্গ'ভিনয় চলিয়াছে। বিদ্যালয়ের বালকেরাও এখন রঙ্গ-লীলার রঙ্গামোদে এতদূর উন্মত্ত যে, সহরে ছাত্রনিবাসে ও বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে রঙ্গ-লীলায় রঙ্গ-লীলায় ছাত্রসমিতির বাৎসবিক উৎসব সম্পন্ন হইতেছে। ছাত্রের "মেসে মেসে" পরীক্ষার পাঠ্যনিচয়, নীরব নিষ্পন্দভাবে সেল্‌ফের উপরে শয়ন করিয়া, কখনও রঙ্গালয়ের গদে বিরাম লাভ কবিতেছে, কখনও করুণরসের সরস-মধুর মৃদু ঝঙ্কারে আর্দ্র হইতেছে; এবং কখন কখন বা বীর-রসের আকস্মিক হুঙ্কাবে চমকিয়া উঠিতেছে' বঙ্গে রঙ্গাভিনয় এখন সব্বব্যাপিনী। বস্তুতঃ, এক্ষণ বঙ্গ-দেশকে, বঙ্গভূমি না বলিয়া, রঙ্গ-ভূমি বলিলেই নামের প্রকৃত সার্থকতা হয়! কিন্তু, এই অবস্থা স্বাভাবিক, স্বাস্থ্যপ্রদ এবং কোন অংশেও শুভসূচক কি? রোগজীর্ণা, অন্নক্লিষ্টা দুঃখিনী যদি সহসা রঙ্গসুখাসক্তা রঙ্গময়ী রঙ্গিণী সাজিয়া তাণ্ডব-নৃত্যে আত্মহাবা হইয়া পড়ে, তাহাহইলে সেই অবস্থাকে স্বাস্থ্যকর উন্নতির পূব্বসূচনা জ্ঞানে, আশায় ও আনন্দে উপসর্গ মনে করিয়া, মনে অবসন্ন বা আত্মায় ম্রিয়মাণ রহিতে হইবে? আপনারা বুদ্ধিমান; আপনারাই ইহার মীমাংসা করুন; এবং পারিলে প্রতিকারের পথ দেখুন।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।

অতএব ভালবাসা।

Power, like a desolating pestilence,
Pollutes whate'er it touches ; and obedience,
Bane of genious, virtue, freedom, truth,
Makes slaves of men, and of the human frame
A mechanized automaton.

P B Shelley.

ভগবানের বিশ্বব্যাপিনী শক্তির অনন্ত মহিমা, যেমন একদিকে অচিন্তনীয় ও অজ্ঞেয় হইয়াও, শক্তিরূপে সজীবতারূপে, চেতনারূপে নবপ্রসূত শিশুতেও সুন্দর ও আশ্চর্য্যরূপে প্রতিফলিত ; এবং কোন কোন অংশে তাহারও অনুভূতি গ্রাহ্য ;--সেইরূপ মানব জাতির নিত্য ভোগ্য নিত্য অনুভূত ও চিরপরিচিত সুখ দুঃখ ভাবে ভাবাবিষ্ট "কায়"টিকে হেলিতে দুলিতে প্রত্যক্ষ করে, কম্পিত কণ্ঠের গদগদ বাক্যে ভালবাসার মধুর মন্ত্র শুনিতে পাইব কৃতার্থ হয়। অধিকাংশ স্থলেই "মন"টিকে কিন্তু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অদেখা "মন" কায় ও বাক্যের মাঝখানে মাথা গুজিয়া অদেখাই রহিয়া যায়। এ ক্ষেত্রে কায়াও বাক্যের আড়ম্বরে, মন অপ্রসিদ্ধ বস্তুরূপে উপেক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানীদিগের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, জগতে মন প্রকৃত পদার্থ, অন্য সমস্তই ছায়াবাজী বা মায়া। ভালবাসার অস্তিত্ব মনের উপরে। সেখানে মনের সম্পর্ক না থাকিলে সমস্তই বৃথা। বঙ্গদেশে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপনে যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহাতে সকলই আছে, নাই কেবল মনের সহিত মনের কোন দিক দিয়া, কোনরূপ আদান প্রদানের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ।

প্রকৃত ভালবাসার সুখ-স্বপ্নে, আত্মহারা হইয়া, আমরা দেশ প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে বলি না। অথবা স্বাধীনতার মোহে ভুলিয়া, ভালবাসার মুখনিবদ্ধ নীতির লাগামটিও ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা করি না। আমরা অমন অসম সাহস বা একগুঁয়েমি বা গোবামির পক্ষপাতী নহি। কিন্তু দেশের অবস্থা দেখিয়া ইহা আশঙ্কা করি যে, বঙ্গীয় দাম্পত্য-জীবনের অধিকাংশ ভালবাসাই অতএব ভালবাসার অন্তর্নিবিষ্ট। একটা স্তম্ভ মাটীতে খাড়া করিয়া যদি সকলেই উহার প্রতি অন্ধকারে ঢিল ছুড়িতে থাক, কোনটিই উহার গায় না লাগিবারই কথা। তবে যদি দুই একটি লাগিয়া যায়,—সে নিতান্তই দৈবানুগ্রহের ফল। বর্ত্তমান সামাজিক নীতিতে আমাদিগের দেশেও, দাম্পত্য-জীবনে প্রকৃত ভালবাসার সঞ্চার ঐ রূপ দৈবানুগ্রহ সাপেক্ষ। ইহা বলাই আমাদিগের অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষ্য। ইহার কোনরূপ প্রতিকার-চেষ্টা কর্ত্তব্য কি না এবং সম্ভব পর কি না, সম্ভবপর হইলে, কি প্রণালীতে তাহার অনুষ্ঠান করা সমীচীন, সামাজিক ধুরন্ধরেরা একবার তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। দাম্পত্য-জীবনে অতএব ভালবাসার বাহুল্যে যে নানা প্রকারেই দেশের অধঃপাত ও সামাজিক অধোগতির কারণ ঘটে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

নৈতিক হিসাবে, সুখ দুঃখের গণনায় এতৎ সম্পর্কে বলিবার বিষয় অনন্ত হইলেও অভ্রান্ত নহে। বিজ্ঞানের প্রামাণিক সিদ্ধান্তও ইহার প্রতিকূল। প্রকৃত ভালবাসার চির অচ্ছেদ্য-অমৃত-বন্ধনীতে যে পিতা মাতার প্রাণ গাথা থাকে, তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি যেরূপ শারীরিক

ও মানসিক দেব-সম্পদের অধিকারী হইয়া জন্মলাভ করিতে পারে, অতএব ভালবাসার দায় ঠেকা বন্ধনে উৎপন্ন শিশুর পক্ষে সে সম্পদলাভ কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। বিজ্ঞান কেন, এ কথা সহজ জ্ঞানেরও অধিগম্য। এ অবস্থার কোনরূপ প্রতিকাব আছে কি? আমরা পুনরপি বিনীতভাবে অনুরোধ করি, আপনারা দেশের ও দশের মুখ-পাত্র ও আদর্শস্থানীয়। আপনারা স্বদেশ ও স্বসমাজের দিকে চাহিয়া, এই গুরুতর বিষয়ে একটু মনোযোগ বিধান করুন।

শ্রীনবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

তুমি কি আমার?

স্বপ্নময়, মোহময় বিভ্রান্ত বিশ্বেব মাঝে,
বল দেখি তুমি কি "আমার"?
এ সংসাব-কর্ম্মক্ষেত্রে, পবিশ্রান্ত এ হৃদয়
তুমি কি গো স্থান জুড়াবাব?
দুঃখেব কঠোরাঘাতে, ঝরে যবে অশ্রুবাবি
ভূমি-তলে কাঁদে সে লুটিয়া,
চরণে যাবে না দলি, এক বিন্দু অশ্রুকণা,
তুমি তাবে লইবে তুলিয়া?

(১)

কক্ষ-ভ্রষ্ট গ্রহসম উদ্ভ্রান্ত উন্মাদ প্রাণ
ভ্রমে যদি হাবায়ে শবণ;
জগৎ ঘৃণার বিষে, দহে যারে নিদারুণ
শত শেলে বিঁধিছে পরাণী;
মরমের শান্ত বাসে, দিবে কি তাহারে স্থান.
জুড়াইবে উত্তপ্ত জীবন
কোমল স্নেহের স্ববে, তারে কি লইবে ডাকি,
"আপনার" বলিয়া তখন?

(২)

বিষাদ মেঘের ছায়া, পড়িলে প্রাণের মাঝে
মুখ দেখি বুঝিবে আপনি?
হৃদয়েব তন্ত্রীগুলি, কোন সুরে বাজে সেথা,
নীরবে লইবে প্রতিধ্বনি?
ভীষণ মরুর মাঝে, ঘুবি যাবে হাহা করি
হবে শুষ্ক তৃষাতুর হিয়া,
প্রেমের নিজর মতে. ল'য়ে সুশীতল বারি
বাঁচাইবে আদরে সিঞ্চিয়া?

(৩)

বিষয়-গহন-বনে, কুশাঙ্কুরে ক্ষতপদ,
যবে মোর অবসন্ন কায়,
না যাবে ফেলিয়া মোরে, ধরি লবে হাতখানি
নিতান্তই যবে নিরুপায়।
শত শত অপরাধ, অবিশ্রান্ত করি আমি
ক্ষমা কি পাইব তব পাশে,
যতনে স্নেহের কোলে, তুমি কি তুলিয়া লবে
আশ্বাসিবে সুমধুর ভাষে?

(৪)

জীবনের গুপ্ত গেহে যত গুলি আছে গাথা,
যত কিছু আকা আছে ছবি,
সংগ্রাম বিরাম যত, উগ্রচণ্ডা প্রকৃতির;
স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়াছে কবি।
সেই মহা কাব্য হ'তে প্রত্যেক অক্ষর ল'য়ে
পারিব কি দে'খাতে তোমায়,
দুঃখময় বাগময়, চিরতাপ-ব্যাকুলিত,
গ্রহণ করিবে তারে হায়?

(৫)

অন্তস্তল ভেদ করি, যে ভাব বাহিরে আসে,
করিবে না খেলার পুতুল,
পাছে তারে অনাদরে তুচ্ছ করি ফে'লে দাও
ভয় প্রাণ বড়ই ব্যাকুল;
যখন যে দিকে চাই, এ জগতে কেহ নাই,
বল দেখি তুমি কি "আমার"?
এস তবে এস এস, আনন্দে মিশিয়া যাই
জীবনে জীবনে একার।

(৬)

সে কণ্ঠে মিশা'য়ে তান, করিব তাঁহার ধ্যান,
জীবন কি ছেলে খেলা তরে?
দুশ্চর তপস্যা সন, মোদের জীবন হো'ক
নিয়ন্ত্রিত সাধনা-নিগড়ে।

সমর্পিয়া প্রাণ- মন, প্রভুর চরণ তলে
প্রেম মুর্ত্তি নিরখিব তাঁর,
এস তবে এক সুরে গাইব অক্ষর গীত,
সত্য-সত্য তুমি কি 'আমার"?

শ্রীমতী কমুদিনী বসু।[১২৩]

মৌনা প্রকৃতি।

তখনো ধরণী, তখনো আকাশ,
ক্ষীণ-তিমির পূর্ণ
গগনের শিরে ক্বচিৎ কোথাও
জ্বলিছে হীরক চূর্ণ।
তখনো জগৎ শান্তি শয়নে।
অলস, অবস, সুপ্ত,
একে একে সব আকাশ-প্রদীপ
ক্রমশ হতেছে লুপ্ত,
প্রভাতি সমীর হয়েছে বাহির
গমন অলস মন্দ,
নিশ্বাসে বহিছে বন কুসুমের
সুমধুর সুধা-গন্ধ.
হে মৌনা প্রকৃতি, দেখেছি তখন
বদনে বিমল শান্ত,
শ্যামল অঞ্চলে শিশির মুকুতা
উজালে অমল কান্তি।
মেঘমুক্ত ধরা মধুর মূর্ত্তি
শোভি তা শারদ-সজ্জা
চপলা বালিকা ফেলিয়াছে যেন
ত্যজিয়া কৃত্রিম লজ্জা,
সুনীল গগনে উজলিয়া দিশি
উঠিলে শরত চন্দ,
দর হ'তে যবে বাস আসে কানে
বাশীর মধুর মন্ত্র,
নদ, নদী-জল বহে কল কল
মধুর চন্দ্রিকা পৃক্ত,
তরু, লতা, পাতা হাসে অবিরল
মধুর মাধুরী সিক্ত,
যেন স্বপ্নময় যেন ভ্রান্তিময়

সুন্দর শারদ দৃশ্য !
শুধু আকুলতা শুধু ব্যাকুলতা
ভরিয়া রয়েছে বিশ্ব !
দেখেছি তখন অয়ি ভাষাহীনা
সাজিয়া কিশোরী কন্যা,
নিথর অধরে কি যেন কহিতে
সর্ব্বাঙ্গে ফুলের বন্যা।
যবে বঙ্গ-বধূ যাপিতে বাসব
সরম শঙ্কায় মগ্ন,
ধীরে ধীরে চলে বাজে তালে তালে
নূপুর চরণ লগ্ন,
সপ্তমীর চাঁদ পশ্চিমে গড়ায়
ক্ষণেক চাহিয়া অমনি পলায়
তারকা কিরণ বিন্দু।
বহে কল কল বাদলের জল
ধরণী মলিনা স্তব্ধ,
দ্যুলোক ভূলোক কাপে থর থরি
ভীত অশনি শব্দ।
মুখশ্রী মলিন দৃষ্টি উদাসীন
লীন আকাশ অঙ্গে,
হে মৌনা প্রকৃতি কোন দূর স্মৃতি
জড়িও বরষা সঙ্গে ?

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

নিশীথে।

বুঝি এমনি মধুর নিশিতে
রূপেতে আলোকি শয্যা বিমল
শুয়ে ছিল 'উষা' সোনার কমল
প্রণয়ী তাহার মুগধ বিহ্বল
গিয়াছিল তারে চুমিতে
বুঝি এমনি মধুর নিশিতে।

(২)

বুঝি এমনি মধুর নিশিতে
ভীষণ তটিনী বন্যার বারি
গভীর নিশীথে একাকী সাঁতারি

প্রেমিক "বিল্ল" 'চিন্তার' বাড়ী
গিয়াছিল তারে দেখিতে।
বুঝি এমনি মধুর নিশিতে।

(৩)

বুঝি এমনি মধুর নিশিতে
যমুনা সলিল বহায়ে উজান
আকুল করিয়া ব্রজবাসী প্রাণ
বেজেছিল হায় রাধা রাধা গান
প্রথম শ্যামের বাঁশিতে
বুঝি এমনি মধুর নিশিতে

(৪)

বুঝি এমনি মধুর নিশিতে
আধ-লাজ-মাখা সবল নয়নে
কনক নিচোল উড়ায়ে পবনে
এসেছিল 'মেনা' শ্যাম তপোবনে
'কৌশিক' দেবে ছলিতে।
বুঝি এমনি মধুব নিশিতে।

(৫)

বুঝি এমনি মধুর নিশিতে
প্রমোদ কাননে পাইয়া 'কুমারে'
বেধেছিল 'ইলা' বনফুল হারে,
ধুয়ে পা দুখানি নয়নের ধারে
দিয়াছিল হৃদি বসিতে।
বুঝি এমনি মধুর নিশিতে।

(৬)

বুঝি এমনি মধুর নিশিতে
'গোবিন্দলাল' বারুণীর তীরে
'রোহিণীর' মুখ দেখেছিল ফিরে,
চরণ যুগল অবশ শিহরে
পারে নাই আর ফিবিতে
বুঝি এমনি মধুর নিশিতে।

(৭)

বুঝি এমনি মধুর নিশিতে
'ফুল জানি' হেরি নাথেরে আবার
লুটিয়া পরিল চরণ মাঝার
প্রিয়তম হায় শেষ উপহার
বিষটুকু দিল করেতে।
বুঝি এমনি মধুর নিশিতে!

(৮)

বুঝি এমনি মধুর নিশিতে
ফুরাবে যখন বিরহ জীবন
আসিয়া বসিবে, হে সখা মরণ
অধরে অধর হইবে মিলন
হবে তোমা আমা মিশিতে।
বুঝি এমনি মধুর নিশিতে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।[১২১]

গ্রন্থ সমালোচনা।

কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক—শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত। মূল্য ১ এক টাকা। গ্রন্থখানি "ভাওয়ালাধিপতি * * * শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর ঠাকুর দাদা মহোদয়কে এই ক্ষুদ্র কাব্যখানা তদীয় চিরস্নেহপ্রতিপালিত এই বালক গ্রন্থকারের অকৃত্রিম ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ উৎসর্গীকৃত" এবং "বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য সূর্য্য, ভাওয়াল রাজমন্ত্রী শ্রী শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহোদয়ের শ্রীকর-কমলে—'মহাত্মন যে যুবক দুই বৎসর পূর্ব্বে সংসার-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিল, আপনার স্নেহতরী আরোহণ করিয়া আজ সেই যুবক' ইত্যাদি ভণিতা সহকারে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন "পলাসীর যুদ্ধ" দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উৎসর্গ করিতে যাইয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রায় 'দিনে ডাকাতির' ন্যায় অনুকরণ সাহায্যে "এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি যুবক" কর্ত্তৃক "তাহার হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ণ স্বরূপ এই ক্ষুদ্র উপহার প্রদত্ত হইয়াছে। এবং তদীয় "একান্ত স্নেহের গ্রন্থকার" আশা করেন তাহার "এই আবদার রক্ষা হইবে"!

লেখক একস্থলে বালক ও অন্যস্থলে যুবক সাজিয়াছেন। কবি-মানুষ সব সাজে! কিন্তু "বয়স" বড় লক্ষ্মীছাড়া জিনিস কল্পনায় তাহা বাড়াইলে কমাইলে মানুষের প্রাণ তাহাতে গলে না। শক্তির অভাবে গ্রন্থকার একগুলিতে দুই বক মারিয়াছেন—'দেবতাও রুষ্ট না হউক মানুষও তুষ্ট থাকুক,' এই নীতি আমাদের কাছে ভাল লাগিল না। পুস্তক খানিব বাঁধানও বেশ সুন্দর; সোনার জলে মলাটের উপরে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম লিখা আছে, কাগজ ও ছাপা মন্দ নয়,—কেবল ভিতরেই যাকিছু গলদ। পুস্তক খানির নাম "কুরুক্ষেত্রকলঙ্ক" না হইয়া "কালীভূষণকলঙ্ক" হইলে উপযুক্ত হইত; এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রাক্ষরে ব্রাকেটের মধ্যে

খোসামুদি প্রিয়তায় ভাল মন্দ বিচার বিষয়ে অন্ধ, আজকালকার ব্যবসায়ী সার্টিফিকেট-দাতা, রামু শ্যামু গ্রন্থকারের প্রশংসা কেতনস্বরূপ এবং এই অপখ্যাত পুস্তকের সার্টিফিকেটদাতা "উড়িষ্যা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক স্বনামধন্য" শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র কলঙ্ক, "কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় ডাক্তার" গুরুদাস কলঙ্ক, এবং "কলিকাতা হাইকোর্টের জজ মাননীয়" চন্দ্রমাধব কলঙ্ক নামে অভিহিত হইল অন্যায় হইত না। এই সকল ব্যক্তিরাও চক্ষুলজ্জার খাতিরে—লেখকের বিনয় কাতরতায় এবং কাঁদ কাঁদ চোখে মুখেব ভাবে পবার্থা প্রীতিতে গলিয়া যদি পুস্তকখানি পড়িয়া বা না পড়িয়া লেখকের পছন্দ মত যাহা খুশী তাহাই লিখিযা দেন, তাহা হইলে একমাত্র ছাপাখানার লাভ ব্যতীত অন্য কোন দিকে ক্ষতি ব্যতীত আর যে কোন স্বার্থ নাই ইহা নিশ্চয়। ঢাকার স্বারস্বত- পত্রও যেন খৃষ্ট কিংবা চৈতন্যের প্রাণ লইয়া বিশ্বপ্রেমে দিশাহারা হইয়া "জগাই মাধাই"কে কোল দিযাছেন এবং মুন্সীয়ানা ভাষার সাহায্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রায় মাইকেলের আসনে উঠাযাছেন। কাব্য খানির প্রথম স্বগে লিখিত আছে—

> "নমি, মাগো তব পদে বীণাপাণি বাণি !
> কব দয়া দয়াময়ি অধম তনয়ে,
> ধুবাশা জলধি-নীরে দিয়াছি মা ঝাপ ;—
> যে ভাবে রক্ষিলে মাগো বরপুত্রে তব
> রক্ষ দাসে সেই ভাবে, এ মিনতি পদে ;
> অন্য কোন আশা মোর নাহিক মানসে।
> চিরদিন গুণহীনে দিয়াছ চরণ,
> এ ভরসা করি মনে হ'নু অগ্রসর,—
> রত্নাকর, কালিদাস ভারত-ভূষণ,—
> গুণাগুণ বির্বজ্জিত ছিলেন যাহারা,
> স্পশমণি স্পর্শে যথা, তথা ও চরণ
> স্পর্শি ভুব-পূজ্য তাঁবা, তোমাব প্রসাদে"।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বোধ হইল যে, "দয়াময়ী বিনাপাণি বাণী এই অধম তনয়ে" অদৌ দযা কবেন নাই, তিনি তাঁহার বরপুত্রকে যে ভাবে বক্ষা কবিয়াছিলেন আমাদের গ্রন্থকার মহাশযও সেই ভাবে রক্ষিত হইবার জন্য বাণীর পদে মিনতি করিয়াছিলেন। আমাদের বিবেচনায় অত হাঙ্গামে না যাইয়া একটা "সরস্বতীকুণ্ডের" প্রার্থনা করিলে তাহারও জনসাধারণের উপকার হইত। কাব্যের বিষয় অভিমন্যু বধ। উদাম প্রশংসনীয়। তিনি সাধনা-বলে কালে সিদ্ধিলাভ করুন ইহাই আমাদেব আন্তবিক ইচ্ছা। প্রথম উদ্যম যে অনেকেরই প্রকাশযোগ্য হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বান্ধব। শ্রাবণ, ভাদ্র—১৩১০। দাতার প্রাণ—নামটি বড়ই সুন্দর। ভাবের দিক দিয়া বিশেষ কিছু নূতন কথা না থাকিলেও, ভাষায় অমল মাধুর্য্যে এবং ব্যক্ত করিবার সুন্দর সরল-মধুর উচ্চ বঙ্গের প্রণালীতে প্রবন্ধটি বিশেষ উপাদেয় হইযাছে। চারিত্রিক ইতিকথা—চণ্ডীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য পত্রিকায় এইরূপ সুন্দর জ্ঞাতব্য চারিত্রিক ইতিকথা সকলেরই পড়িতে আগ্রহ হয়। আমরা ইহার পক্ষাতী। একটি কথা কিন্তু বলিতে হইল ; চারিত্রিক ইতিকথা পড়িতে আরম্ভ করিয়া, একপাতা উল্টাইতেই চণ্ডী বাবুর নামসহ ইতি কথার শেষ দৃষ্ট হইল ! চার্স্নির হিসাবেও ইহার পরিমাণ অতি অল্প।

ভারতে কিসের অভাব?—শ্রীমহেশচন্দ্র সেন। ইহার মধুর গম্ভীর ভাষাটি প্রশংসনীয়। বিষয়টি যে মামুলী হা-হুতাশেপূর্ণ অথচ প্রতিকার বিষয়ে নিব্বক, এবং বহুবার "চর্ব্বিতচর্ব্বণ" তাহা না বলিয়া কিন্তু গুণ নাই তার কপালে আগুন" "আর কোন্ গুণ নাই তার কপালে আগুন।" যে বালক এই হসন্ত সলযুক্ত এবং হসন্ত বিহীন পদদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ বুঝিতে না পারিত, তাহাকে বিচারে পরাজিত বলিয়া ধান দিয়া কপাল চিড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইত। মহেশ বাবুর প্রবন্ধের নাম পড়িয়া এখন বোধ হইতেছে যে আমরা এখনও সে ফাড়া কাটাই নাই। "ভারতে কিসের অভাব?" এই নামে বুঝিতে হইবে যে, ভারতে কিছুই অভাব নাই। যাহারা মহেশ বাবুর প্রদর্শিত এ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত "নূতন অভাব" দেখিতে আশা করিয়া রহিয়াছেন, তাহারা যে হতশ্বাস হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রবন্ধ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা উচিত। লেখক প্রাচ্য সভ্যতার সহিত তুলনায় প্রতীচ্য সভ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটা "কাটাউ" কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সভ্যতা সম্বন্ধে সম্যক্রূপ না জানিয়া তত্তদ্দেশের রীতি নীতি সম্বন্ধে তীব্রভাবে স্পষ্টক্ষরে কোন কথা বলা কি দুঃসাহসিকতার কাজ নয়?

ব্রাহ্মণ সমস্যা—শ্রীঈশানচন্দ্র বসু। আজকাল এরূপ প্রবন্ধ সাহিত্যপত্রেরই ফম্মা পূরণ বিষয়ে সহায়। কারণ এরূপ প্রবন্ধ অনেকেই পড়ে না, কাজেই ইহাকে সাধারণের সমালোচনার বিষয় ভূতও হইতে হয় না ; অথচ ইহা পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি বিষয়ে সাহায্যে করে। বান্ধব এ ক্ষেত্রে কোন রীতিবিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। লেখক এক স্থলে লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মণ সমস্যার মধ্যে এত কথা আছে যে, এ সমস্যা পৃথিবীর সকল সমস্যা অপেক্ষা কঠিনতর ও দুরধিগম্য।" যাহারা মনে একটু আবেগ হইলেই, যে কোন কথা যুক্তি তর্কের সাহায্য ব্যতীত, এক ধাক্কাতেই মাঝ দরিয়ার মাঝে ঠেলিয়া দিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা এ কথায় মস্তকের "আরোহ ও অবরোহ" দ্বারা সায় দিয়া যাইতে পারেন ! আমরা কিন্তু একেবারেই ইহার পক্ষপাতী নই। ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ ব্রাহ্মণ-সমস্যা বিষয়ে বান্ধব পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। আমরাও তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলাম। ঈশান বাবুর পরামর্শ যে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝিলাম না। ঈশান বাবু ভারত উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করিয়া সফলকাম হউন, ইহা অবশ্য আমরা ইচ্ছা করি।

চঞ্চলা প্রকৃতি—শ্রীমতী মরকত দেবী—উত্তরপাড়া— বঙ্গদেশে সাহিত্য সমাজে পরিচিত হইবার যে নীতি বা অনীতি প্রচলিত আছে সেই নীতির বিধান অনুসারে, একমাত্র নাম ও ধাম ব্যতীত কবিতাটীতে অন্য এমন কিছু মহিমা বা মাহাত্ম্য দেখিতে পাইলাম না, যাহাতে ইহা বান্ধবের ন্যায় সাহিত্যপত্রে মুদ্রিত হইতে পারে।

স্বর্গ-প্রয়াণ—সাহিত্য-সমাজে এখনও অপরিচিত জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত। কবিবর হেমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত। হেম বাবুর মৃত্যু উপলক্ষে তাহার নিমিত্ত আন্তরিক শোক-গাথা গাইতে বঙ্গদেশে কয়ে কটি কবিকণ্ঠের সহিত বহু সংখ্যক বায়স-কণ্ঠ

সুর মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, আমরা তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে যতগুলি শোক—গাথা পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে আমাদের সমালোচ্য কবিতাটী প্রথম স্থান অধিকার না করিলেও , ইহা যে স্থানে স্থানে খুব সুন্দর হইয়াছে, তাহা আমরা দ্বিধাশূন্য হইয়া বলিতে পারি। ক্ষণজন্মা অমর কবি মধুসূদনের মৃত্যু উপলক্ষে, এই দারিদ্র্য দু:খ-প্রপীড়িত মৃত্যু কবি এবং কবিবর নবীনচন্দ্র সেন যে দুইটা শোক-গাথা লিখিয়াছিলেন এ কবিতাটীও সেই দুইটী কবিতার ছায়া অবলম্বনে রচিত। এখন একটু দোষের কথা বলি। কবি একস্থলে মেঘমল্লারের সহিত দীপক মিশ্রিত করিয়াছেন। ইহাতে যে নিতান্তই একটা কাটালের আমসত্তা হইয়াছে, তাহাতে আর অন্দেহ কি? পররাষ্ট্রবিভাগের কোন কথা বলিতে হইলে, একটু জানিয়া শুনিয়া বলাই ভাল।

স্বামী না ত কি?—(উপন্যাস)—ইহার বিস্তৃত সমালোচনা আবশ্যক। লেখক পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছেন, সন্দেহ নাই এ পর্য্যন্ত পড়িয়া যতটুকু বুঝিলাম তাহাতে এই ধরণা হইল যে, লেখক প্রাচ্য প্রতীচ্য সভ্যতা সম্বন্ধে দুই সখীর মুখে নিজের প্রাণের কথা কহিয়া, বিচার দ্বারা প্রাচ্য সভ্যতার উৎকষ ও সারবত্তা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। অধ্যবসায়ে পাণ্ডিত্য যেরূপ সুলভ, পাণ্ডিত্য কিংবা অধ্যবসায়ে সারসত্য সেইরূপ সকল সময়ে সুলভ নয়। স্থানাভাবে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা আমরা করিতে পারিলাম না। তবে মোটের উপর ইহা একখানি নূতন জিনিষ হইতে চলিয়াছে এইমাত্র বলিতে পারি। লেখক একদেশদর্শী হইয়া, সংস্কারের নিকট যুক্তি কিংবা স্বাধীন-চিন্তা বিসজ্জন না দেন, এই আমাদের অনুরোধ।

রসিকিনী--শ্রী--গ--চ-- ক:। ইহা একটু মিঠেকড়া রকমের কবিরাজি চাসনী। বঙ্গভাষার নব্য রিফরমারদের বায়ুরোগ ইহাতে কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে পারে। ইহা ঔষধের ন্যায় ক্রিয়াশীল এবং স্বাদে ও অম্ল-মধুর। ইহা ওষধের ব্যবহারে রোগীর বড় কষ্ট হইবে না। ছায়া–দর্শন—পূর্ব্ববৎ।

বান্ধব আশ্বিন কার্ত্তিক, ১৩১০। উড্ডীনপর্ব্বত। প্রবন্ধটীর এই নাম প্রভৃতি পড়িয়াই আমাদের মনে আরব্যোপন্যাস বর্ণিত "কাসকাস" বিকট দৈত্যদের পাহাড় পর্ব্বত কিংবা অট্টালিকাস্থিত সষুপ্তা রাজ কন্যাকে পালঙ্কসহ উড়াইয়া লইয়া যাওয়া ইত্যাদি অদ্ভুত করিয়া মনে পরিয়াছিল। কিন্তু পাঠ কম্মের একটা আবছায়া দেখিলাম যে আমাদের কল্পনা হইতে ইহা সম্পূর্ণরূপে একটী পৃথক বস্তু। ঘোষ বাহাদুরের লেখনী সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বপরই প্রায় একরূপ মত, সুতরাং কোন দিগে কোনরূপ বিশেষত্ব না থাকিলে পুন: পুন: এক কথা বলা অনাবশ্যক। উড্ডীন পর্ব্বত প্রবন্ধটীর ভাব সম্পূর্ণ নূতন—ভাষা সম্বন্ধে বলা নিস্প্রয়োজন। তাঁহার রচনা চিরদিন মাতৃ ভাষায় মুখোজ্জ্বল রাখিবে। বৃদ্ধকালে রোগে ও দু:সহ শোকে অভিভূত থাকিয়াও যে তিনি অক্লান্ত মনে স্বারস্বত–সাধনায় দেহ প্রাণ নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন, এজন্য তাহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দেই। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল করুন।

অধ্যাপক সার উইলিয়ম্ ক্রুক্‌স্-শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষিত সমাজে আজি কালি প্রায় সকলেই ক্রুক্‌সের নাম ও তাহার দুই একটী কৃতকর্ম্মের বিষয় অবগত আছেন। জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর প্রবন্ধটী ভালই হইয়াছে।

বিজয়া—কবিতা, সুন্দর হইয়াছে। একটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম—

আবাহন সনে, একই সুতে গাঁথি,
কে রাখিল বিসর্জ্জন?
উদয়ের ভালে অস্তের লাঞ্ছন
লিখে দিল কোন জন?

অন্যস্থলে গীরিন্দ্র নন্দিনী উমা বিজয়ার দিনে স্বামীসহ পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসবাসিনী হইতে যাইতেছেন ; গিরিরাজ, মেনকা ইত্যাদি সকলের মুখই বিষাদ-ছায়ায় আবৃত, এমন কি চিরমাতৃহীন শঙ্কর ও মেনকার স্নেহ স্মরণ করিয়া বিচ্ছেদ-ক্লেশে ক্লিষ্ট।

অদূরে শঙ্কর,—রজত-ভূধর,
ললাটে শশাঙ্ক দোলে,
জ্যোৎস্নাহীন আজি, আবরিত যেন,
বিষাদ-কুয়াসা জালে!
কাঁদে যথা প্রীতি, বাৎসল্য-ব্যথায়,
আত্মা যথা ম্রিয়মাণ,
ভোলা যার নাম, সেখানে তাহার
প্রফুল্ল কি থাকে প্রাণ?
গলিল অনল,—এক বিন্দু জল,
ললাট-লোচনে ঝরে ;
মেনকার স্নেহ,—চির-মাতৃহীন
থেকে থেকে মনে করে।

বিসজ্জন—(বিজয়ার আশীর্ব্বাদ) উৎকৃষ্ট কবিতা। কয়েকটি স্থান অতি সুন্দর লাগিল। আমরা উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।

আমি ফেলে দেই জলে মাটীর পঞ্জর,
সাধের প্রতিমা ডোবে, ওরা ভাবে মনে ;
হারায় বুকের মণি, মোহান্ধ অন্তর,
দেখে না সে প্রাণ ময়ী চির-গাঁথা প্রাণে।

সোনার প্রতিমা গড় ভকতি ছানিয়া ,
স্নেহের অতময়ে কিবা, ননীর পুতলি,
কিংবা গড় ফুলময়ী প্রীতি-মধু দিয়া,
পরিণাম—বিসর্জ্জন !—মোহে থাক ভুলি।

বিসর্জ্জন কভু জলে, কভু বা অনলে,
চলন্ত তরঙ্গে, কভু জ্বলন্ত চিতায়,
কখনো বিজয়ামোদে,—জয়-কোলাহলে,
অন্তিম সৎকারে কভু নয়ন-ধারায়।

এলে জলে বিসর্জ্জয়া প্রতিমা যাহার,
পোড়ে না অনলে জলে ডোবে না সে ধন,
সে ত এ জগত-যে ড়া প্রাণের আধারম
সলিল অনল তার বিভূতি -ভূষণ।

ভেবে দেখ,—বিসর্জ্জন,—অলীক স্বপন,
অনন্তের অন্ত!—কোথা চেতনার লয়?
অনল তাহার চিত-সিগ্ধ পদ্মাসন!
সলিল,—শয়ন তার চির সুখময়!

ভূলেছ আহুতি-মন্ত্র, বব শুধু চাও,
'দেহি দেহি দেহি' রবে জগত বিকল,
কামনাব ডোবা তাই কাম্যকে হাবাও,
ঘোচে না মনের তৃষা নয়নের জল।

মোগলের অধঃপতন—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত, প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে। গুপ্ত মহাশয়ের ভাষাটিও বেশ প্রাঞ্জল ও মধুর, আমবা আশা করি গুপ্ত মহাশয যে মৰ্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে সাধকের প্রাণে নিযুক্ত থাকিবেন।

প্রাচীন ভারতে পূর্ববঙ্গের অবস্থান—শ্রীকেদাবনাথ মজুমদাব, প্রবন্ধটা ভালই হইযাছে, লেখক একটু সংক্ষেপে সারিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশেব কাহিনী—শ্রীতাবকচন্দ্র দাস গুপ্ত। ব্রহ্মদেশেব কাহিনী ইতিপূর্ব্বে অসংখ্যবার লিখিত, প্রচারিত, পঠিত, মুখস্থ, কণ্ঠস্থ ও উদরস্থ হইয়াছে; আবাব সেই পুরাণ কাহিনী লিখিয়া কলম ভোতা কবিয়া লাভ কি? বান্ধব, প্রবন্ধ বিচাব সম্বন্ধে একটুকু উদাসীন নাকি?

সাহিত্য প্রসঙ্গ—অতি সুন্দর হইয়াছে, ঘোষবাহাদুর পবার্থ প্রীতিতে ডুবিয়াও যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বঙ্গানোদিত সংস্কৃত নাটকাবলীর যথার্থ সমালোচনা করিয়াছেন এবং স্পষ্টাক্ষরে বঙ্গসাহিত্যের মঙ্গলের জন্য মহাজন অনুমোদিত দৃষ্টান্ত কয়েকটী মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বাচালমতি অর্ব্বাচীনের মন:পুত না হইলেও অত্যন্ত মূল্যবান সন্দেহ নাই।

ভারতী—পৌষ ১৩১০। উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক—চলনসই গোছের কবিতা।

"সেনাপতি কালী",—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, লেখকের বিনয়-নম্র এবং সাবধানতার সহিত লিখিত প্রবন্ধটি বাঙ্গালী মাত্রেরই পড়িতে কৌতূহল হইবে। প্রবন্ধটিতে বর্ণিত কথাগুলি সত্যাসত্য বিচারে আমরা প্রকৃত জহুরী নই, কাজেই সেই বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিলাম না। প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে।

কার্ত্তিকের বক্তৃতা—শ্রীরাধাকান্ত বসু, চাসনির হিসাবে মন্দ নয়, একটুকু নূতনত্ব আছে।

পল্লী জননী—শ্রীরমণীমোহন ঘোষ। অতি সুন্দর হইয়াছে। পল্লী জননীর স্নেহ-সুরভি-শীতল-কোলের অমৃতময স্পর্শ সুখ কবির লেখনীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

রোমান ইতিহাসের একপৃষ্ঠা—যা কিছু বাহাদুরী ইংরেজী পুস্তক অনুবাদে। মন্দ নয়—ভালই হইয়াছে। মাঝে মাঝে এইরূপ চাই বই কি।

সংকল্প—শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত, বিশেষত্ব কিছুই বুঝিলাম না।

ডুমনী ও তাহার পতিপুত্র—শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন ; আমাদের কাছে বেশ লাগিল। দীনেশ বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক তাহার কথা অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন।

নারায়ণী—উপন্যাস, এ পর্যন্ত মন্দ লাগিল না ; লেখায় একটু মুন্সীয়ানা আছে।

বিপদের প্রতি—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, কবিতাটির আমরা প্রশংসা করি। দেবেন্দ্র বাবুর কবিতার আমরা চিরকালই পক্ষপাতী তবে মাসিকসচিত্র দুই একটি পত্রিকায় দুই একটি পত্রিকায় দুই একটি সনেট দেখিয়া সময় সময় মনে হয় যেন বয়সের দরুন কবির হাত কাঁপিয়া গিয়াছে।

সাহিত্য—আশ্বিন, ১৩১০। সাহিত্য বৎসরের খাদ্য একদিনে খাওয়াইয়াছেন—কাজেই পরিপাক করিতে একটু সময় সাধ্য হইয়া পরিয়াছে। আমরা এবার এই খণ্ডেরই সমালোচনা কবিব। মাতৃ-স্নেহ—কে লিখিয়াছেন তাহা ঠিক করিয়া বলার যো নেই। কবিতাটি একটু "কটমট" দোযে দুষ্ট হইলেও মোটের উপর মন্দ হয় নাই। পড়িবার সময় রবীন্দ্র বাবুর "রাজর্ষির" কথা একটু মনে পরে।

পূজার মিলন—গল্প। সাহিত্যের কলেবর পূরণ বিষয়ে সাহায্য করিলেও ইহা নিতান্ত অসার—গল্পটি এই ;—ভাইয়ে ভাইয়ে খুব সদ্ভাব ছিল ; কয়েক দিন পরে বড় ভাই মারা পরিল,—ছোট ভাই বড় ভাইয়ের সন্তান গুলিকে খুব ভাল বাসিতেন ও তাহাদের যাহাতে উন্নতি হয় তদ্বিযয়ে যত্ন নিতেন। একবার সেই মৃত বড় ভাইয়ের বড় ছেলে সর্দ্দি কাশির জন্য এবং আইন পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া পূজার সময় কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিতে পারিলেন না, কাকা মহাশয় নিজে যাইয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া আসিলেন। কাঠাম এতটুকু হইলেও রঙ্তার অভাব দৃষ্ট হয় নাই। গল্পটির নামের এবং সম্পর্কের গোলমালে লেখক স্থানে স্থানে এক একটি ক্ষুদ্র "ফোট উইলিয়াম" তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। বক্তব্য বিষয়ে বিশেষ কিছু না থাকিলে, শুধু মুন্সীয়ানা কথায় আর কতদূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে ?

অদৃষ্ট—গল্প। কুলীন ব্রাহ্মণদের বৃদ্ধ বয়সে একাধিক বিবাহের সাধারণত: কিরূপ মন্দ ফল হয়, তাহা অঙ্কিত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। একটু নূতন কায়দা আছে। মন্দ নয়—ভালই। একস্থানে কিন্তু নাটকীয় অভিনয়ের একটু কৃত্রিমতা ঠেকিল ; যথা—"রাম মণি" বলিল, 'নাথ, তোমার সুখে কন্টক দিব কেন।' মধ্যবিত অবস্থার ব্রাহ্মণ পরিবার,—ঘরে সাধারণ ভাবে বাক্যালাপ,তাহার ভিতর 'নাথ' শব্দের ব্যবহারটা জানি কেমন লাগে। চিঠি পত্রেই ত ইহার অধিক ব্যবহার হয় বলিয়া জানি !

দেবী—গল্প। আখ্যানভাগ সামান্য এবং বিশেষ কোন নূতনত্ব বর্জ্জিত হইলেও লিখিবার কৌশলে গল্পটি চিত্ত স্পর্শী হইয়াছে। রাজপূতানী— কবিতা। বেশ লাগিল। শারদীয় দুর্ঘটনা—যাহারা স্বভাবত: একটু রসিক ও প্রকৃত পক্ষে একটু লিখিবার শক্তি রাখেন, অভ্যাস থাকিলে, তাহারা দুই এক পয়সা খরচ করিলে এইরূপ গল্প বোধ হয়, সহজেই লিখিতে পারেন। আমাদের কাছে গল্পটি বেশ লাগিয়াছে। যদিও গাঁজাখুরি হউক তথাপি সেক্ষপীয়রের ভাষায় বলিতে হইবে যে Though this be madness, yet there's isn't ; সাহিত্য সম্বন্ধে আব একটি কথা বলিতেছি। সূচীপত্রে "শারদীয় দুর্ঘটনার" পরে "মাসিক সাহিত্য সমালোচনার" পূর্ব্বে "প্রেমপিপাসা" নামক একটি কবিতার তালিকা আছে। কিন্তু

থাকিলে কি হয়। পুস্তকের মধ্যে সেস্থলে পাওয়া দূর থাক সাহিত্যের আদি অন্ত মধ্য কোথাও উহা দৃষ্ট হইল না। আজ কাল মাসিক সাহিত্য পত্রের দুই একটি সম্পাদক ব্যতীত আর কেহ বড় একটা কালী কলমের সহিত সম্পক রাখেন এমত তাঁহাদের পত্রিকা দেখিয়া বুঝা যায় না। সমাজ পতি মহাশয় এ পথের তাহা আমরা বলিতেছি না ; কিন্তু উল্লিখিত রূপ বিভ্রাট যে ক্রমশ: তাঁহার কৃতিত্বের মূলে কুঠাব হইয়া দাঁড়াইলে তাহাত আর না বলিয়া উপায় নাই। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা—"সাহিত্যের" অনুপযুক্ত হয় নাই।

বঙ্গদর্শন—পৌষ, ১৩১০। নৌকাডুবী বেশ চলিতেছে। কৌতুহল উদ্দীপক বটে। মন্দিরের কথা—নামটা একটু নভেলী গোছেরই বটে, কিন্তু উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মন্দিরের বিষয়ই বলা লেখকের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধটি উপাদেয় হইযাছে। থিয়েটার অতি সুন্দর প্রবন্ধ। লেখকেব মতের সহিত আমাদের সম্পূণ ঐক্য আছে। নগেন্দ্র বাবুর যুক্তিসঙ্গত কথাগুলিও আমাদের নিকট বড়ই ভাল লাগিল। বুলাই--কবিতা— শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। দেবেন্দ্র বাবুব নাম ব্যতীত ইহাতে কোন বিশেষত্ব দেখিলাম না। "সত্য-শিব সুন্দরের শুভ্র শুভহাসী" ইত্যাদি কয়েকটা শব্দ আছে মাত্র। সাবসত্যেব সমালোচনা—দুভেদ্য।

প্রবাসী। অগ্রহায়ণ। ১৩১০। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর "বিভিন্ন সামাজিক আদর্শেব সংঘষ" সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ। আমরা পড়িয়া তৃপ্ত হইলাম। শ্রদ্ধেয় লেখক পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্য মুগ্ধ অস্মৎ সমাজের সম্মুখে যে আমাদের প্রাচীন-শান্তিময় সামাজিক চিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সম্পূণ সময়োপযোগী হইযাছে, সন্দেহ নাই।

বত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অবস্থা পয্যালোচনা--শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি, এস, সি। প্রফুল্ল বাবুর ন্যায় পণ্ডিত বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট , ইহা প্রকৃতই শুভসংবাদ। কিন্তু তাঁহার বত্তমান প্রবন্ধে বত্তমানে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অবস্থা পর্য্যালোচনাতে কোনই বিশেযত্ব লক্ষিত হইল না।

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার ঘোষ "বামলীলা" শীর্ষক প্রবন্ধে যুক্ত প্রদেশেব একটি প্রধান উৎসবের বিবরণ লিপিবদ্ধ কবিযাছেন।

"শাস্ত্রবাদেয় বিকাশ" লিখিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোয সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এখনও শাস্ত্রের জন্ম হয় নাই। বঙ্গ-বেদ ব্যাস মহেশ বাবু জীবিত থাকিতে থাকিতে শাস্ত্রের জন্ম হইবে কি না, জানিতে পারিলে নিশ্চিত হওয়া যাইত।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "রঘু মাঝি" একটি চলনসই গল্প। "মহারাষ্ট্রীয় ভাষা ও সাহিত্যে" মহারাষ্ট্র প্রাচীন কবি মুকুন্দরাজ, জ্ঞানোরা, একনাথ, ভক্ত কবি তুকাবাম প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইযাছে।

"গৌরাঙ্গ"--শ্রীসমালোচকের কৈফিয়ৎ, এ বার সমাজপতি মহাশযের পালা। শ্রীমতী লজ্জাবতী বসুর "অভাবে" সনেটটি বেস হইয়াছে।

"আমাদের আয্যগণের প্রাচীন নিবাস" প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। "সংবাদ ও মন্তব্য" বিবিধ জ্ঞাতব্য কথায় পূণ। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর "বঙ্কিম চন্দ্রের উদ্দেশে" শীর্ষক কবিতাটি উপাস্যের প্রতি উপাসকের কৃতজ্ঞতার উজ্জ্বল নিদর্শন।

এবার প্রবাসীর মহারাষ্ট্র , গুজরাতী, ও হিন্দী সাময়িক সাহিত্যের আলোচনা মন্দ হয় নাই। প্রবাসীর চিত্র গৌরব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ।

নবপ্রভা—কার্ত্তিক। ১৩১০। এ বার কার নবপ্রভা বড়ই মলিন। "ধর্ম্মকথা" লেখকের ব্যগ্রতা যেরূপ উৎকট বলিবার প্রণালী তত মনোরম নহে।

"ভীমরতি" একটি চুটকী প্রবন্ধ মন্দ নয়।

"উইলনামা"—সদ্‌জ্ঞানে ও সুস্থ শরীরে লিখা হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। লেখক যে কোন সময় চারু পাঠের স্বপ্ন দশন ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কবিবর দ্বিজেন্দ্র লাল মেয়ের মাব রূপ দেখিয়াই বোধ হয় আত্মহারা ছিলেন, তাই "ছবি" খানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারেন নাই।

প্রদীপ।[১২২] অগ্রহায়ন। ১৩১০ শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ সেনের "বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যা" সময়োপযোগী সুশিক্ষিত প্রবন্ধ। মেক্সিকোর অসভ্য অধিবাসিগণ স্বজাতীয় উন্নতিকল্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ৬০ বৎসর কাল লবণের ব্যবহার ছাড়িয়াছিল, তাহারা অসভ্য হইলেও আমাদের ন্যায় মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত নহে। যে দেশের নিলর্জ্জ বক্তা আপাদমস্তক বিলাতী পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া বক্তৃতা মঞ্চ হইতে অতি উচ্চ কণ্ঠে স্বদেশীয় দিগকে বিলাতী জিনিষ ব্যবহাব না করিতে বিবিধপদেশ দিতে পারেন, সে দেশের আশা কোথায় জানি না। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর "উক্তি প্রতিমা" নামক কবিতাটি মন্দ লাগিল না।

"কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিনোদলাল ঘোষ কোনও নূতন কথা বলিতে পারেন নাই। "প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধাব" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত আবদুল করিম শনির পাঁচালী প্রকাশ করিয়াছেন, লেখক যেরূপ আয়াস সহকারে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিতেছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

"সপত্নী" শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় রচিত ক্রমশ: প্রকাশ্য উপন্যাস। শেষ না হইলে কোনও কথা বলা যায় না।

"মহাপ্রয়াণ" কবিবর হেমচন্দ্রের মৃত্যুপলক্ষে লিখিত, কবিতাটি শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্রের লেখনী প্রসূত, আমাদের নিকট ভাল লাগিল না।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষের "শোণিতপুর" বিষয় গুণে চিত্তাকর্ষক, কিন্তু লেখক ভাষার প্রতি একবারে উদাসীন।

শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যালের মহারাষ্ট্রীয় "হিন্দুজাতি" মন্দ নহে।

"নবহস্তা"—নাম শুনিয়া ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। ইহা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি সুন্দর গল্প।

নবনূর। পৌষ,—ঈদ সংখ্যা। ১৩১০। সর্ব্ব প্রথমেই ঈদ নামক একটি কবিতা; ধর্ম্মের অঙ্গীয় বলিয়া ইহা ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান সমাজের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু কবিতা হিসাবে সাধারণ পাঠকের উপভোগ করিবার ইহাতে কিছুই নাই।

মিঃ আবদুল্লা আল-মামুন সোহ্‌রাওয়ার্দীর "আরবীয় দর্শনালোচনা" দার্শনিকদিগের আলোচ্য।

শ্রীযুক্ত মৌলভী আবদুল করিম "সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী" নামক প্রাচীন কাব্যও তাহার প্রচ্ছামা কবি দৌলত কাজীও সৈয়দ আলাওলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। লেখকের মতে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে দৌলত কাজী সতীয়ময়না ও লোরচন্দ্রানী কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং তাহার মৃত্যুর পর, ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আলাওল উক্ত কাব্যের শেষ ভাগের পরিসমাপ্তি বিধান করেন। সহৃদয় লেখক মুসলমান কবিদ্বয়ের নাম উল্লেখ করিয়া পরিতাপের সহিত বলিয়াছেন—"তাঁহারা যদি হিন্দুকূলে আবির্ভূত হইতেন, আজ তাঁহাদের জন্ম মৃত্যু স্থান 'পীঠস্থান' বলিয়া পরিচালিত হইত, সন্দেহ কি?"

কিন্তু লেখক বোধ হয় বিস্মৃত হন নাই যে, বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান কবি মধুসূদন দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সে দিনও বঙ্গের অন্যতম প্রতিভাবান কবি হেমচন্দ্র দীনতার আর্ত্তনাদে সবলকে জাগরিত করিতে চেষ্টা করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহন করিয়াছেন। যে দেশে কবির এইরূপ সমাদর, তথায় কবির জন্ম-মৃত্যু- ভূমি পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হইবার দিন এখনও বহুদূরে অবস্থিত।

"বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত মৌলবী আবতাব উদ্দীন আহমদ, ভারতীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত—"বঙ্গে হিন্দু, মুসলমান" প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের সকল মত সমর্থন করিতে পাবি না। আমাদেরও বিশ্বাস উভয় সম্প্রদায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও মাতৃভূমিব মঙ্গলের জন্য প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারেন। এই প্রবন্ধের ফুটনোটে সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"পবেশ বাবুব মন্তব্য পাঠ করিয়া মুসলমান সমাজ হিন্দুর প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিশ্বাসহীন হইবেন, সন্দে নাই"। পরেশ বাবুব মত যে সমগ্র হিন্দু সমাজের মত সম্পাদক কি করিয়া তাহা বুঝিলেন "

শ্রীযুক্ত ইমদাদুল হকের "অহল্যা" ক্ষুদ্র গল্পটি ইংরেজী হইতে সংগৃহীত কিন্তু ভাষা লেখকেব নিজস্ব এবং তাহা প্রশংসাব যোগ্য।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়ের "মিলন" কবিতাটি মন্দ নহে। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দব সান্যালের "খন্দদিগের নববলি নিবারণ," চিত্তাকষক।

"মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান" পূববর্ত্তী প্রবন্ধ বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান প্রবন্ধের প্রতিধ্বনি মাত্র।

"নব্যভারত"।[১২৩] আশ্বিন ও কার্ত্তিক। নব্যভারত প্রাচীন সাহিত্যপত্র। বালক ধূমকেতুর পক্ষে, অমন প্রাচীনের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ অর্ব্বাচীনতা হইলেও, দুই একটি কথা সংক্ষেপে না বলিয়া পারিলাম না। এই প্রাচীন পত্রে, প্রাচীনকালের সেই আসর মাতান "ভারত-উদ্ধার" ভাবের কথা একটু বেশী থাকা অস্বাভাবিক নহে। "রামায়ণের উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত কি না", এই পূর্ব্ব মীমাংসিত পুরাতন প্রশ্ন লইয়া ব্যায়ামও অন্যায় নহে। নব্যভারতের "কপালে আগুন" এবং মহাভারতীয় জুতা ও গুতা" লইয়া যুবজনোচিত উচ্ছ্বাসও আমাদিগের নিকট মন্দ বোধ হইল না। "ত্রিকলিঙ্গ" "শাস্ত্রীয় ও বর্ত্তমান সমাজ" উপাদেয় ও প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ। উপনিষদের উপদেশও নব্যভারতের উপযোগী। ইংলণ্ডকে সম্ভাষণ করিয়া যে কবিতাটি রচিত হইয়াছে, নব্যভারতের মুখে উহাও শুনিতে ভাল লাগিল। "কান্না অভিমান" কবিতাটি নব্যভারতেব উপযুক্ত নহে। নব্যভারতের এই কান্না-অভিমান দেখিয়া মনে হয় নব্যভারত বুঝি এই বুড়া বয়সেও মোছে কলপ দিয়া ফিতে পেড়ে ধুতি পড়িয়া বাসর ঘরে

বসিয়া ছড়া কাটিতে ভালোবাসেন। "দ্বৈত চিন্তা" প্রবন্ধে একটু বিশেষ নূতনত্ব আছে। প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক, এক এজলাস সাজাইয়া এই দুরূহ তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞান বিচারক, আমি ও তুমি বাদী প্রতিবাদী। সাক্ষী নাই, জবানবন্দী, জেরার জোবজবরদস্তিও নাই। নিরাকারবাদী ও সাকারবাদীর বক্তৃতা ও ব্রহ্মজ্ঞান বিচারকের রায় আছে। উকীলের বক্তৃতা ও হাকিমের বায়ে কিন্তু পাঠকেব ধাঁ ধাঁ ঘোচে না। এই রায়ের বিরুদ্ধে 'উচ্চতর আদালতে আপীল কবিবার প্রবৃত্তি হয়।

১ম ভাগ, ৯ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১০

উমেশচন্দ্র বসু : আমি, তুমি ও সে [প্রবন্ধ], শ্রী : সরস্বতী সাধনা [কাবতা], শ্রীচতুর শ্যাম : বোকারাম [প্রবন্ধ], অদ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ : চিরবসন্ত [কবিতা], সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১ম ভাগ, ১০ম-১২শ সংখ্যা, ফাল্গুন-বৈশাখ, ১৩১০

নরেন্দ্রনাবাযণ ঘোষ : স্থান-মাহাত্ম্য ও কাল-মহিমা [প্রবন্ধ], ভুবনমোহন দাসগুপ্ত : অবতাব না উৎপত্তি [কবিতা],

দেবতা

আমি যদি হইতাম পথের বালুকা,
চবণে সে যাইত পরশি,
সে যে গো দেবতা, তার ছুঁইলে চরণ,
পলকে হ'তেম সোণাবাশি।

(১)

যদি গো হ'তেন আমি মৃদুল সমীর,
অনুক্ষণ থাকিতাম পাশে,
ক্ষুদ্র শিশুটার মত করিতাম খেলা,
রহিতাম মিশিয়া নিশ্বাসে।

(২)

যদি গো হ'তেম আমি সুহাসিনী তারা,
নীলতনু নিথর অম্বরে,
মেলিয়া অযুত আখি মিটায়ে তিয়াস,
অনিমেযে দেখিতাম তারে।

(৩)

যদি গো হতেম আমি নীল কাদম্বিনী,
বরষিয়া সলিলের ধারা,
ভকতির অশ্রুজলে পূজিতাম তারে,
হরষ রসেতে মাতোয়াবা।

(৪)

দেবতা সে, দীন হীন অতি তুচ্ছ আমি,
বৃথা এই জীবন অসার,
দিতে পারি প্রাণ–ফুল সে পদে অঞ্জলি,
এই সুখ সৌভাগ্য আমার।

শ্রীমতি কুমুদিনী বসু।

পূজার কুসুম

পূজার কুসুম তোরা বড়ই সাধের,
তোরা কি আনন্দ রূপ সুর নন্দনের?
অমলতা, কোমলতা,
এতকি আছেরে হেথা,
এত পবিত্রতা কোথা সংসার বনের,
পূজার কুসুম তোরা বড়ই সাধের।

(১)

পূজার কুসুম তোরা বড়ই সুন্দর!
ধূলির পরশ নাই ধরার উপর,
কি ছার শারদ–শশী,
বিমল চন্দ্রিকা রাশি,
কোথা প্রসূনের হাসি এত মনোহর?
পূজার কুসুম তোরা বড়ই সুন্দর!

(২)

পূজার কুসুম তোরা, মরিকি মাধুরী!
কোন স্বরগের এই লাবণ্য–লহরী?
মথিয়া সৃষ্টির সিন্ধু,
কে রাখিল সুধাবিন্দু,
বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলার চাতুরি.
পূজার কুসুম তোরা, মরিকি মাধুরী!

(৩)

পূজার কুসুম তোরা জীবন্ত প্রতিমা,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে এই না দেখি উপমা!
পবিত্র মায়ের ক্রোড়ে,
সপ্ত স্বর্গ শোভা করে,
অর্থহীন অৰ্দ্ধবোলে পূর্ণ মধুরিমা,
পূজার কুসুম তোরা জীবন্ত প্রতিমা!

(৪)

পূজার কুসুম তোরা কি উজ্জ্বল মণি,
দেব-অঙ্গ-অলঙ্কার উজলে অবনী,
মাণিক মুকুতা চয়,
এত কি অমূল্য হয়,
কোন্ মহা রত্নাকর এ রত্নের খণি,
পূজার কুসুম তোরা কি উজ্জল মণি !

(৫)

পূজার কুসুম তোরা পরশ রতন,
আয়রে পরশি করি সফল জীবন,
অসার অধম অতি,
এ মোর আয়াস হৃদি,
পরশিয়া হবে নাকি হৈম-নিকেতন,
পূজাব কুসুম তোরা পরশ রতন !

(৬)

দিব আমি এ কুসুম সে পদে অঞ্জলি,
প্রেম-মকরন্দময় আনন্দের ডালি,
সংসার বৃন্তের পরে,
অমরত্ব শোভা করে,
শোক, তাপ, দুঃখ, জ্বালা ক্ষণে যাই ভুলি,
দিব আমি এ কুসুম সে পদে অঞ্জলি।

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু।

অৰ্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ : রমা [গল্প], অর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ : বিদায় [কবিতা নরেন্দ্রনাবায়ণ ঘোষ : স্বপ্ন [কবিতা], সংক্ষিপ্ত সমালোচন, শরচ্চন্দ্র দে—

লর্ড কার্জ্জন

প্রায় দুই মাস অতীত হইল, সম্রাট-প্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন[১২৪] পূর্ব্ববঙ্গে পদার্পণ কবিয়াছিলেন। রাজা অথবা রাজ প্রতিনিধির দর্শন লাভ কবিতে পারিলে, এ দেশের লোক আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং, তাঁহার আগমনে যে রাজভক্ত প্রজার মন আনন্দোৎফুল্ল হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তবে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অনেকেরই হর্ষ, বিষাদে পরিণত হইয়াছে, ও তাহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে চারিদিকে তীব্র আন্দোলন চলিতেছে। সুতরাং, এস্থলে তাঁহাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অনেকটা পুনরুক্তি হইলেও, বোধ হয়, নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরব্যাপী শাসন-কার্য্য সমাধা করিয়া, যখন লর্ড এলগিন[১২৩] রাজপ্রতিনিধির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন এ দেশের অনেক লোকই হাফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। কেবল বংশমর্য্যাদা ভিন্ন তাঁহার এমন কোন গুণ ছিল না, যাহাতে তিনি এরূপ দায়ীত্বপূণ পদের অধিকারী হইতে পারেন। তবে সে সময় উপযুক্ত লোক না পাওয়ায়, মন্ত্রী সমাজ তাঁহাকেই নিযুক্ত করিয়া পাঠান। লর্ড এলগিনের পর যখন লর্ড কার্জ্জন এ দেশের রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হন, তখন এ দেশের ও ইংলণ্ডের অসংখ্য লোকের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার এমন কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল, যাহাতে সহজেই জনসাধারণের মনে নানা প্রকার কৌতূহলের উদ্রেক হয়। তাঁহাকে যখন ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া পাঠান হয়, তখন তাঁহার বয়ক্রম চল্লিশ বৎসরও অতিক্রম করে নাই। এক লড ড্যালহৌসী ভিন্ন কেহই আর এত অল্প বয়সে দেশের গবণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন নাই।

বাল্য হইতেই তিনি সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অতি প্রিয়পাত্র। ইউনিভার্সিটির প্রত্যেক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত উত্তীণ হইয়া, তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর, তিনি মধ্য এসিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ ও তৎসম্বন্ধে গ্রন্থাদি প্রণয়ন দ্বারা বিশেষ যশস্বী হন। ইহার পর তিনি বিবিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করেন। তাঁহার লড উপাধিটি পৈতৃক সম্পত্তি নহে,—স্বীয় ক্ষমতাবলে অজ্জিত। ইহার উপর আবার তিনি ধনবতী পত্নীর স্বামী। আমেরিকার অনেক ক্রোরপতিই কোন বিলাতী লডের কাছে কন্যা দান করিতে পারিলে, আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া থাকেন। লড কাজ্জন এরূপ কোন ধমকুবেরেরই জামাতা। এ সমস্ত ভিন্নও তাঁহার আর একটি বিশেষ আকষণী শক্তি আছে। তিনি বাকপটুতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ, ও মিষ্টকথায় তুষ্টকরিতে তাহার ন্যায় পটু রাজপ্রতিনিধি আর এ দেশে পদার্পণ করেন নাই। এ সমস্ত নানা কারণে এ দেশের সহস্র সহস্র লোক ব্যগ্রতার সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিল। সকলেই মনে করিয়াছিল যে, ভারতের এই বিশাল-যন্ত্রের ইনি একজন দক্ষ পরিচালক হইবেন। তাহার নিকট লোকে বহু আশা করিয়াছিল ও ভাবিয়াছিল যে, তাহার ন্যায় উপযুক্ত লোকের হস্তে শাসন ভার পড়িলে, এই ব্যাধিক্লিষ্ট ও দুঃভিক্ষপীড়িত ভারতবষ কতক পরিমাণে শান্তি লাভ করিবে। কিন্তু, ভারতবাসীর এ সুখ-স্বপ্ন শেষ হইতে বেসী দিনের দরকার হয় নাই। লড বেকন তাঁহার "Youth and Age" নামক একটি প্রবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন "Natures that have much heat and great and violent desires and perturbations are not ripe for action till they have passed the meridian of their years. ... ... Young men are fitter to invent than to judge ; fitter for execution than for counsel and fitter for new projects than for settled business.- ইহার ভাবার্থ এই,—উষ্ণ রক্ত যুবকেরা জীবনের মধ্যাহ্ন সময় অতীত না হইলে, পাকা কাজের লোক হয় না। তাহারা ধীরভাবে কাজ করা অপেক্ষা নূতন নূতন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে ভালবাসে।

লড কার্জ্জন সম্বন্ধে ইহার অনেকগুলি কথাই প্রযুজ্য হইতে পারে। কর্ম্মপ্রিয়তা প্রভৃতি যুবজনোচিত অধিকাংশ গুণই তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করিতে যেরূপ ধীরতা ও সংযতচিত্ততার দরকার, তাহা তাঁহাতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়

না। ইহার উপর তাঁহার একটি প্রধান দোষ এই যে, তিনি "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং" কথাটিকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আত্মশক্তিতে তাঁহার এতটা নির্ভর যে, এ দেশে যাঁহারা অতি দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া কেশ পরিপক্ক করিয়াছেন, এরূপ লোকের নিকটও তিনি কোন প্রকাশ উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

কি কুক্ষণেই লর্ড বিকন্‌স্‌ফিল্ড scientific frontier বা 'বৈজ্ঞানিক সীমান্ত' কথাটির উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন যে তদবিধ 'সীমান্ত' 'সীমান্ত' করিয়া যে একটি চীৎকার উঠিয়াছে তাহার আজ পর্য্যন্তও নিবৃত্তি হইল না। এই পশ্চিমোত্তর সীমান্ত প্রদেশ বিশেষরূপে সংরক্ষণ করিবার জন্য এ দেশের সৈন্য খরচ ক্রমশঃই বৃদ্ধি করা হইতেছে। লর্ড এলগিনের সময় আফ্রিদি প্রভৃতি জাতির সহিত সীমান্তযুক্ত এ দেশের অজস্র অর্থ ব্যয় হইয়াছে, অথচ তাহাতে বিশেষ সুফল কিছু হয় নাই। প্রয়োজনাতিরিক্ত সৈন্য পালন এ দেশের দারিদ্র্যের একটি প্রধান কারণ। এ দেশে এত অধিক সংখ্যক সৈন্য প্রতিপালিত হয় যে, ইংলিশ গবর্ণমেন্ট, অনেক সময় এ দেশের সৈন্য বিদেশে নিয়া আপনাদের কাজ চালাইয়া থাকেন। বিগত বুয়র যুদ্ধ ইহার বিশেষ একটি উদাহরণ স্থল। লর্ড কার্জ্জনের নিকট অনেকেই এ বিষয়ে সুবিচারের আশা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের এ আশা অধিক দিন পোষণ করিতে হয় নাই। বড় লাট বাহাদুরের এ দেশে শুভ পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি আসিয়াই ঘোষণা করিলেন যে, ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত করিতে হইলে, সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করা দূরে থাকুক, বরং বৃদ্ধি কবাই দবকার। অন্ততঃ তিনি যে পর্য্যন্ত এ দেশের কর্ত্তৃত্বপদে অবস্থিত থাকিবেন, ততদিন কিছুতেই তিনি এ দেশের সীমান্ত প্রদেশকে বিপদাপন্ন করিয়া সৈন্য-সংখ্যা কমাইতে মত দিবেন না। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। ১৮৯৯ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত সৈন্যতালিকাটি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, প্রত্যেক বৎসরেই উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি একবার কাউন্সিলে বক্তৃতা'য় স্পষ্টই বলিয়াছিলেন "The geographical position of India will more and more push her into the fore-front of international politics, she will more and more become the strategical frontier of the British empire."

উপরোক্ত কথাগুলি হইতে তাহার ভারতশাসনের মূলনীতি সহজেই অনুমিত হয়। বিলাতে ইম্পিরিয়লিষ্ট (Imperialist)[১২৫] নামক একটি দল আছে। যেন তেন প্রকারেণ সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করাই তাঁহাদিগের মূলমন্ত্র। সুবিখ্যাত কবি Rudyard C[k]ipling ইহার একজন প্রধান পাণ্ডা।

এশিয়ার অসভ্য জাতিবৃন্দ ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সুসভ্য শাসনের অধীন না হইয়া, কখনও তাহারা উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে না, ইহাই তাঁহারা প্রচার করিয়া বেড়ান। লর্ড কার্জ্জনের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যে, তিনি কোন ইম্পিরিয়েলিষ্টেরই মন্ত্রশিষ্য। অনশনক্লিষ্ট দরিদ্র ভারতবাসীর রক্ত শোষণ করিয়া, শুধু আড়ম্বর ও জাক জমকের উদ্দেশ্যে দীল্লির দরবারে অজস্র অর্থ ব্যয়, চন্দ্র সূর্য্য বংশীয় নৃপতি বর্গের কুমারদিগকে আপনার বালক ভৃত্যরূপে খাটান, বিনা প্রয়োজনে সমারোহে পারস্যসাগরে অভিযান, তিববতে সৈন্য প্রেরণ ইত্যাদি সকল কাজই তাঁহার ইম্পিরিয়েলিজমের পরিস্ফুট ফল মাত্র।

লর্ড কার্জ্জনের ন্যায় শিক্ষিত লোক যখন এ দেশের গবর্ণর জেনেরল হইলেন, তখন এ দেশের শিক্ষিত লোকেরা যে অন্ততঃ তাঁহার নিকট আদৃত হইবেন, এ বিশ্বাস অনেকেরই মনেই বদ্ধমূল হইয়াছিল। লর্ড রিপনের সময় তাঁহারা যে টুকু স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পাইয়াছিলেন, তাহার পর তাহার আর কোন প্রসার বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু এইরূপ পরিণামে স্বায়ত্ত শাসনটুকু ক্রমশঃই গবর্ণমেন্টের ও দেশীয় ইংরেজদিগের যেন চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল। শিক্ষাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোথায় স্বায়ত্ত শাসনের প্রসার বৃদ্ধি পাইবে, তা না হইয়া বরং যে টুকু ছিল, তাহাও যেন লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। লর্ড কার্জ্জনের এদেশে আগমনের পর, কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে দেশীয়দিগরে যে ক্ষমতাটুকু ছিল, তাহা প্রায় তিরোহিত হইল, ইউরোপীয় কমিশনারদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইল, ও তাঁহারাই মিউনিসিপালিটির সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইলেন। লজ্জায় ও দুঃখে দেশীয় সুবিখ্যাত আটাইশ জন কমিশনার মিউনিসিপালিটির কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই লর্ড কার্জ্জনের মন টলিল না। মিউনিসিপাল বিল আইনে পরিণত হওয়ার পর, উহার উচ্চ কর্ম্মগুলি ইউরোপিয়ানেরা একচেটিয়া করিয়া লইলেন। এরূপ সংস্কারের কিরূপ বিষময় ফল দাঁড়াইয়াছে, যাঁহারা কলিকাতা মিউনিপালিটির কার্য্যাবলীর খবর রাখেন, তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে জানেন। যে আটাইশ জন লোক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী সরকার অন্যতম। ইঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ও কার্য্যপটু লোক মিউনিসিপালিটিতে আর দ্বিতীয় ছিলেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অল্প কএক দিন হইল তিনি, পুনরায় মিউনিসিপালিটির কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি প্রবেশ লাভ করিয়াই,এই সংস্কারে মিউনিসিপালিটির অকর্ম্মণ্যতা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন, ও ভিতরে ভিতরে যত গলদ ছিল, সব বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। বর্ত্তমান কমিশনারদের অকর্ম্মণ্যতা অথবা স্বার্থপরতার দরুণ করদাতৃগণের বহু লক্ষ টাকা একবারে বৃথা ব্যয়িত হইয়াছে। ইহা সংস্কার না সর্ব্বনাশ?

লর্ড কার্জ্জনের আমলটাকে একটা কমিশনের আমল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুলিশ কমিশন, ইরিগেশন কমিশন, ইউনিভার্সিটি কমিশন প্রভৃতি কমিশনে কমিশনে দেশটা গুলজার হইয়াছিল। দেশের সমস্ত বিষয়ে আমূল সংস্কার করিবার জন্যই যেন লর্ড কার্জ্জন এ দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। একটি গল্প আছে যে. পব্বতের একবার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। পর্ব্বত কি প্রসব করে, তাহা জানিবার জন্য অসংখ্য লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। বহু আশা প্রতীক্ষার পর, একটি ক্ষুদ্র মূষিক পর্ব্বত গহ্বর হইতে লাফ দিয়া বাহির হইল। পর্ব্বতের মূষিক প্রসবেব ন্যায় লর্ড কাজ্জনের কমিশনগুলিও মনে বহু আশা জাগাইয়া, শেষে আমাদিগকে নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবাইয়াছে। পুলিশের অত্যাচারে এ দেশের লোক বিশেষ প্রপীড়িত। উহারাই এক প্রকার দেশের হর্ত্তা-কর্ত্তা ও বিধাতা, সুতরাং কখন পুলিশ কমিশন বসিয়াছিল, তখন সকলেই ভাবিয়াছিল যে, এইবার বোধ হয়, পুলিশ সম্বন্ধে একটা কিছু সংস্কার হইবে ; আর হয়ত পিতৃপিতামহোপার্জ্জিত অর্থ তাহার চরণে অর্পণ করিয়া, তাহার কবল হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে না। পুলিশ কমিশন বহু দেশ ঘুরিল, নানা জেলায় যাইয়া, বহু লোকের সাক্ষী সাবুদ গ্রহণ করিল, কিন্তু আমাদের ভাগ্যফেরে কোন সুফল পাওয়া দূরে থাকুক, এ পর্যন্ত কমিশনের রিপোর্টই আমাদের চর্ম্মচক্ষের গোচর হইল না, আর কোন কাজ হইবে কি না, তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে।

ইউনিভার্সিটি কমিশনের ফল ইহা অপেক্ষাও শোচনীয়। বহু মন্থনের পর, ইহা হইতে অমৃতের পরিবর্তে হলাহল উত্থিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, লর্ড কার্জ্জন অথবা কমিশনের মেম্বারদের ইহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এ বিষ আমাদিগকেই কণ্ঠে ধারণ করিতে হইবে।

সাতজন মেম্বর লইয়া এই কমিশনটি গঠিত হয়। ইহার মধ্যে একজন মুসলমান ও আর একজন হিন্দু ছিলেন। কমিশনের গঠন-প্রণালী দেখিয়াই লোকের মনে নানাপ্রকার সন্দেহ জন্মিয়াছিল। যথাসময়ে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে, গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্যের প্রতি লোকের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। কমিশন যে সমস্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, তাহাতে শিক্ষার সংস্কার না হইয়া, বরং তাহার সংহার হইবে বলিয়াই লোকে আশঙ্কা করিতে লাগিল। কমিশনের একমাত্র হিন্দু মেম্বার, হাইকোর্টের জষ্টিস্ মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[১২৬] মহাশয় অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে একমত না হইতে পারিয়া, একটি note of dissent বা প্রতিবাদ পত্র লিখিলেন। দেশ মধ্যে ঘোর আন্দোলন হইতে লাগিল। এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় একবাক্যে বলিতে লাগিলেন যে, কমিশনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, এ দেশের উচ্চশিক্ষার মূলে সম্পূর্ণ কুঠারাঘাত হইবে। লর্ড কার্জ্জন এ সমস্ত আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই, তাহা নহে। তাঁহার একটি প্রধান গুণ এই যে, তিনি জনসাধারণের মত অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করেন এবং সুবিধা পাইলেই তাহার উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হন। ইউনিভার্সিটি বিল সম্বন্ধে যে সমস্ত আপত্তি উঠিয়াছিল, এবারকার কন্‌ভোকেশনের সময় বড় লাট বাহাদুর তাহার উত্তর দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, উচ্চশিক্ষা সঙ্কুচিত করিবার জন্যই গবর্ণমেন্ট এ বিল করিয়াছেন, ইত্যাদিরূপ কু অভিপ্রায় যাঁহারা গবর্ণমেন্টের উপর আরোপ করেন, তাঁহাদের কথার কোন মূল্যই নাই। কুশিক্ষাকে সুশিক্ষায় পরিণত করা, মৃতপ্রায় শিক্ষাকে সঞ্জীবনী-সুধারসে উজ্জীবিত করাই এ বিলের উদ্দেশ্য।

লর্ড কাজ্জন যাহা বলিয়াছেন, তাহা হয় ত তাঁহার আন্তরিক কথা হইতে পারে, কিন্তু কমিশনের নিম্নোদ্ধৃত প্রস্তাবটি পাঠ করিলেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সন্দেহ যে অমূলক নয়, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে—"Fees must not be fixed so low as to tempt a poor student of but ordinary ability to follow a university course, which it is his real interest to undertake."

লর্ড কাজ্জন আরও একস্থানে বলিয়াছেন যে, এ দেশে এ পর্য্যন্ত উচ্চশিক্ষা জন্মগ্রহণই করে নাই, তবে আর তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিব কি প্রকারে? বড় লাট বাহাদুর হয় ত ইংরেজের আমলেব ইংজেরী শিক্ষার দিকে দৃষ্টি করিয়াই এরূপ কথাবলিয়াছেন। নতুবা সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্তের দেশে, বেদ, স্মৃতি উপনিষদের দেশে এরূপ উক্তিকে অজ্ঞতার প্রলাপ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

এ দেশের ইউনিভার্সিটির শিক্ষা যে বিলাতের ইউনিভার্সিটির শিক্ষার তুলনায় অনেকটা হীন, তাহাতে আর ভুল নাই। তবে, আমাদের দেশ অতি দরিদ্র, বিশেষতঃ এ দেশের মধ্যম শ্রেণী বিলাতের তুলনায় একপ্রকার নিরন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই উদরান্নের সংস্থানের জন্য তাহাদের এত ক্লেশ পাইতে হয় যে, বিদ্যাচর্চ্চার আর সময় থাকে না। এ অবস্থায় যদি শিক্ষার আদর্শ বাড়াইতে যাইয়া, ইহা অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ করা হয়, তাহা হইলে যে শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? বিশেষত এ দেশের উচ্চ শিক্ষিত লোকদিগের কার্য্যক্ষেত্র অতীব সঙ্কীর্ণ। দেশের শাসনকার্য্যে তাঁহাদিগের অধিকার নাই বলিলেই চলে। বড় লাট বাহাদুর একবার কনভোকেশন এর বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, এ দেশের শিক্ষিত লোকদিগকে পিছে ফেলিয়া রাখা কিছুতেই তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কথাটি শ্রুতিসুখকর ; কিন্তু, ইহা যে কথাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে ; কার্য্যক্ষেত্রেও অনেক স্থলে তিনি তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছেন। এ দেশের রাজকার্য্যে ইউরাশিয়ান ও ফিরিঙ্গিদিগকে কিরূপ অন্যায় সুবিধা দিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

লর্ড কার্জ্জন যে সমস্ত কারণে এ দেশের লোকের অপ্রীতি ভাজন হইয়াছেন, দীল্লির দরবার তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। এবার কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ মহাশয় ইহাকে pompous pageant to a' perishing people এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আর ইহার উৎকৃষ্টতর বর্ণনা হইতে পারে না। অনেকে ইহাকে ঠাট্টা করিয়া curzonation এই নামেও অভিহিত করিয়াছেন। দরবারে এ দেশের রাজা মহা-রাজাদিগের প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা লর্ড কাজ্জনের মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে। মিত্র রাজাদিগকে অনেক বিষয়েই অধীন করদ রাজাদিগের ন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ ও প্লেগে এ দেশ একপ্রকার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্মশানক্ষেত্রে দরবারের এই আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব অনেকের চক্ষেই অতি বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইয়াছে।

সাধারণত: বাজপ্রতিনিধিরা পাঁচ বৎসর কাল এ দেশ শাসন করিবার ভার প্রাপ্ত হন। লর্ড কার্জ্জন সৌভাগ্যবান পুরুষ ; মন্ত্রী সমাজ তাঁহার কার্য্যকাল আরও দুই বৎসর বাড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই দুই বৎসরে তিনি পূর্ব্বদোষ সংশোধন করা দূরে থাকুক, বরং ক্রমশ:ই নানা প্রকারে তিনি আরও অপ্রীতিভাজন হইতেছেন। কি দেশীয়, কি এংগ্লোইণ্ডিয়ান সমপ্রদায় সকলেই তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত হইয়াছেন। অল্প কয়েক দিন হইল, ইণ্ডিয়ান ডেইলিনিউস্ পত্রিকা তাঁহাকে autocrat out of temper বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, উক্ত সংবাদ পত্রখানি ইউরোপীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব লড কাজ্জনের আমলের চূড়ান্ত কীর্তি। তাঁহার প্রতি দেশীয়দিগের যে টুকু ভালবাসা, যে টুকু ভক্তি ছিল, এ প্রস্তাবে তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। যে রিজলি সাহেব এই রিজলিউশন লিখিয়াছেন, তিনি আপনাকে এ দেশের আচার ব্যবহার, জাতি প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে একজন অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তিনি সতীদাহ প্রথাটি হিন্দুরা তিব্বতের নিকটবর্ত্তী অসভ্যজাতিদিগের নিকট হইতে অনুকরণ কবিয়াছেন ইত্যাদি কথা বলিয়া, নিজের যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। সেন্সাসের সময় এ দেশের সামাজিক সম্মান অনুসারে এ দেশের জাতিগুলির শ্রেণী বিভাগ করিতে যাইয়া তিনি অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ঢাকা, ময়মনসিং প্রভৃতি জেলা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আসামের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য যে, এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এ দেশে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। বড়লাট বাহাদুর যখন এ সম্বন্ধে এ দেশীয় লোকেব মনের অবস্থা জানিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করেন, তখন সকলেই হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিল। লাট বাহাদুর নিজেও বলিয়া ছিলেন 'I have kept my mind open' কিন্তু ঢাকা ও ময়মনসিং আসিয়া তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে লোকের আশা এক প্রকার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। তিনি বক্তৃতার সময় নিজের পদোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, অনেক স্থলেই বালসুলভ চপলতার পরিচয় দিয়াছেন।[১২৭]

আমরা এরূপ বলিতে চাই না যে, লর্ড কার্জ্জন ভাল লোক নহেন। এ দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার জন্যই তিনি অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইউরোপীয় দিগের হস্ত হইতে এ দেশবাসীদিগকে রক্ষা করা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট স্বাধীন চিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এই অতিরিক্ত স্বাধীন চিত্ততাই তাঁহার একটি দোষ। তিনি শীঘ্রই বিলাতে যাইতেছেন। আশা করি, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইম্পিরিয়েলিজমের ধূয়া ছাড়িয়া দিয়া, তিনি এ দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতিতে অধিকতর মনোনিবেশ করিবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দে বি, এ।

ঔষধ খরিদ করিতে
সাবধান

কি তাজ্জবের কথা।

আমাব সব্বজ্বরগজসিংহ, সব্বদ্রুহুতাশন কণ্ডুদাবানলের অনুরূপ জাল করিয়া আমারই এজেন্ট এবং দোকানদাবদিগকে সিকি মূল্যে দিয়া গোপনে২ বিক্রী কবিতেছিল। কোনও২ গ্রাহক আমার ঔষধ ভ্রমে নকল ঔষধ ক্রয় করিয়া ঠকিয়াছেন। এবং আমাব নিকট পত্র লিখিয়াছেন অতএব সব্বসাধারণকে এই সমস্ত জাল জুয়াচুরির কথা জানাইয়া দিতেছি যে, অনেকের নামে মোকদ্দমা করিয়া প্রতিফলও পাইয়াছি। তাহার পব হইতেই নকল ঔষধ বিক্রয় একেবাবে বন্ধ ছিল।

সম্প্রতি আমাব ঔষধ সকলেব নামের কিছুটা পরিবর্ত্তন কবিয়া ও শঙ্খমাকা বলিয়া যাহাতে লোকেব ভ্রম জন্মিতে পাবে, তদ্রূপ শঙ্খাকৃতি কবিয়া, কেহবা মৎস্য, কেহবা শামুক, কেহবা গরুড, কেহবা নারিকেল, কেহবা কড়িমাকা দিয়া নকল ঔষধ বিক্রী কবিতেছে। এমন কি মোকদ্দমার ভযে আমার নিকটবর্ত্তী কুটুম্ব বিশেষকে শিখণ্ডীবৎ অগ্রে বাখিযা ঔষধ প্রচার কবিতেছে। তাহারাই আমার মত কৌটা, লেবেল ব্যবস্থাপত্র ও বিজ্ঞাপনাদি করিয়া ঔষধ নকল কবিতেছে। তাহাও সব্বসাধারণকে জানাইয়া দেওযাতে হতাশ হইয়া পড়িয়া আবার আমার পঞ্জিকাও নকল করিয়াছে। তাই বলি সাবধান! আমার নাম ও রেজেষ্টরী করা শঙ্খমাকা দেখিয়া লইবেন, নতুবা ধনে প্রাণে মরিবেন, অথচ মূল্যও ফেরত পাইবেন না।

নিং শ্রীলালমোহন সাহা শঙ্খনিধি।
ঢাকা বাবুববাজার ঔষধালয়।

পৃথিবীব যে কোন স্থান হইতে আমার নিকট স্পষ্টাক্ষরে পত্র লিখিলে ভেঃ পেঃ পার্শেলে অগৌণে ঔষধ পাইবেন।

সংকলন

নববিকাশ

১ম ভাগ : ১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩১১

অবতারণিকা, চিন্তা-সরিৎ, প্রাচীণ হিন্দু বাণিজ্য এবং প্রভাব, আগের প্রয়োজন এবং ব্যবহার, "জয়কালে ক্ষয় নাই, মরণ কালে ঔষধ নাই" [প্রবন্ধ] মুর্শিবাদবাদে আতাহোসেন।

১ম ভাগ, ২য়-৩য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ়, ১৩১১

মুর্শিদাবাদে আতাহোসেন, চিন্তা-সরিৎ, শব-সৎকার, অদ্বৈতবাদ ও স্পিনোজা, বর্দ্ধমান ও বৈষ্ণবধর্ম, কামাখ্যা প্রসাদ বসু : এটা ভারতের উপনিবেশ, আমোদিনী ঘোষ : অক্ষমের আয়োজন।

১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা, আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩১১

এস মা [কবিতা], জানকীনাথ পাল : সাব্বভৌমের উদ্ধার, চন্দ্রকিশোর : লক্ষী ও সরস্বতী [নাটক], মিনতি [কবিতা], বাণি [ঐ], নিশিকান্ত চক্রবর্তী : প্রতাবণা [ঐ], রজনীকান্ত মজুমদার : স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শ্রীমতি সুন্দরী দেবী : আর্য্য মহিলা ও বন্ধন, জানকীনাথ পাল : আমাদের অভাব, তন্মোচন উপায়, জানকীনাথ পাল : একখানি পত্র, একটু হাসি [কবিতা], একটু কাঁদি [ঐ], মায়া [গল্প]।

১ম ভাগ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১১

ব্রজসুন্দর সান্যাল : উত্থান, জানকী নাথ পাল : গোপী ভাব, জানকীনাথ পাল : বুদ্ধ ও বাইবেল, যতীন্দ্রমোহন সাহা : সন্তোষ ও বিশ্বাস [কবিতা], আমাদের অভাব ও তন্মোচনের উপায়, শশিমোহন বসাক : অজ্জুনের শোক শান্তি [কবিতা], কামিনীকুমার দেব রায় একেলা [কবিতা]।

১ম ভাগ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩১১

ভিক্ষু গীতা, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত : অভিশাপ [পর্বত], বুদ্ধ ও বাইবেল, বিধুভূষণ শাস্ত্রী সংগৃহীত : অপ্রকাশিত পদাবলী, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় : ক্ষুদ্র কিছু নয়? [কবিতা], শরচ্চন্দ্র সাহা : মিলনে [ঐ], শশিমোহন বসাক : আদর্শ ও উদ্বোধন [প্রবন্ধ]

সমালোচনা

বাল্মবে জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা

স্বনাম-ধন্য শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহোদয় লিখিত। প্রখ্যাতনামা রায় বাহাদুর মহাশয়ের ওজস্বিনী ও তেজীয়সী লেখনী বঙ্গ সাহিত্য-সাগর মন্থন করিয়া অপূর্ব্ব অমৃত্যের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ভাষার অতুল বৈচিত্র্যে, ভাবের অনন্য সাধারণ গাম্ভীর্য্যে, রচনার সুদুর্লভ বৈভবে এবং ঔদার্য্যের প্রোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যে প্রবন্ধদ্বয় আদ্যোপান্ত সুবিন্যস্ত ও সঙ্কৃত। প্রবন্ধদ্বয়ের সমগ্র ও নির্ব্বিশেষ পরিচয় প্রদান সুদূর পরিহত। সীতা—চরিত্র পার্থিব জগতের

সম্মোহন অমৃত, জগত পাবনী ভাগীরথীর সুপ্রসন্ন সলিল। শুভক্ষণে লেখক-কেশরী তদীয় বৈচিত্রময়ী লেখনী ধারণ করিয়াছেন। যেমন দেব-দুর্লভ চরিত্র গৌরব, তেমনই চিত্তহারিণী বর্ণনা ভাব ও ভাষার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে প্রবন্ধের চবমোৎকর্ষ হইয়াছে। তিনি তাঁহার সাধনাসিদ্ধ দৃষ্টি লইয়া ভাবের অতল গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া, তাদৃশ্য ভুবন-দুর্লভ বিশ্বারাধ্য মহিমময় চরিত্রের সুসূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ করিয়া সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের গভীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। যিনি সর্ব্বাতিশায়িনী চরিত্র-প্রভায় জগতের রমনীবৃন্দের মুকুট প্রদেশে বিরাজিতা, যাঁহার অপার্থিব চরিত্র সম্পৎ জগনান্যা রামায়ণী কথার নৈসর্গিক মাধুরী অনন্ত গুণে পারবর্দ্ধিত করিয়াছে, যে চরিত্র গৌবব আদি কবি ভগবান বাল্মীকির নিসগ-সিদ্ধ অপ্রতি [অস্পষ্ট] হৃদয়-মহত্ত্বের সুস্পষ্ট সাক্ষ্যদান করিতেছে, এবং আজ সহস্র যুগান্তেও যে স্বদেশ চরিত্র মহিমা কবি ও দার্শনিকের প্রাণারাধ্য দেববিগ্রহ, লেখক সিংহ সেই অপ্রাকৃত চরিত্রের অনন্ত ভাবময়ী অভিব্যক্তি করিয়াছেন। তাঁহার জানকীর "অগ্নিপরীক্ষা" প্রবন্ধ কাব্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান এই তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। কাব্যাংশে সিদ্ধ-হস্ত লেখক কবির জনপ্রাণ বিমোহিনী সৌন্দর্য্য সুষমা ঢালিয়া দিয়াছেন। কবির সদর্শিনী প্রতিভার তন্ন২ 'ব্যবচ্ছেদপূর্ব্বক তাদৃক্অগাধ সৌন্দয্য-সম্ভার নখ দর্পণে প্রকটিত করিয়াছেন। যে দুরবগাহ ভাব মাহাত্ম্য এবং যে অগাধ হৃদয়-গৌরব সীতা-চরিত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া হৃদয়ের পরিতপণ করিয়াছে, প্রবন্ধকার সেই কবিকুলবরেণ্য বাল্মীকিব চরিত্র সৃষ্টির আলেখ্য প্রদান করিয়াছেন। আদশাঙ্কনে কবি প্রতিভার পবোৎকষ। বাল্মীকি কিরূপে সেই ভুবন-জন-সেবনীয় সংসার প্রাণ-প্রস্রবণস্বরূপ সব্বাভিভাবী আদশের মনোমোহন চিত্র প্রদান করিয়াছেন, ভাবের গম্ভীর উচ্ছ্বাসে যেন পরিপ্লুত হইয়া লেখক প্রবর স্তরে স্তরে সেই দুনিবীক্ষ্য আদশের উদ্ধতম প্রদেশ আমাদের অতীব সাবধানে নেত্রস্থ করিয়াছেন। তাহার পর ঐতিহাসিক অধ্যায়। এই অংশে লেখক-কুলচূড়ামণি ইতিহাসের সুসূক্ষ্ম সমালোচনার সৌন্দয্যের স্রোতস্বিনী স্বরূপা বৈদেহী-চরিত্রের যথার্থ সুবণাক্ষবে আলিখিত করিয়াছেন। কাব্য ও ইতিহাসের মধুর মিলন প্রবন্ধকার সময়ে চিত্রিত করিযাছেন। কল্পনাব স্বেচ্ছাচারিণী গতিই যে কাব্যের অলঙ্কার এবং কবির উদ্দেশ্য নয়, সৌন্দয্য ও সত্য যে একত্র সুসমঞ্জস ও অনুবান্ধরূপে অবস্থিতি করিতে পারে, এবং ইতিহাসেব সুদৃঢ় সনাতন ভিত্তির উপব যে কবি আপনার প্রাণ সুষমা লইয়া চরিত্রের মধুরাঙ্কণ করিয়া থাকেন, প্রবন্ধের এই অংশে তাহা সম্যক্ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁদের শেষাংশে অগ্নিপরীক্ষার বৈজ্ঞানিক ভাব। স্থূল ও জড়জগতের বহির্ভূত অতীন্দ্রিয় স্থূল ঘটনার সম্ভবপবতা এই অংশে অতি গভীর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

অপ্রাকৃতজগতের ঘটনা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষীভূত হয় না ; অতীন্দ্রিয়—জ্ঞান সঞ্চার ভিন্ন সেই সকল দুজ্ঞেয় সত্য উপলব্ধ হয়না। অনলে প্রবেশ কবিয়াও সীতা অদগ্ধা, অস্পৃষ্টা ও অক্ষতা। লৌকিক জ্ঞানে ইহা অবাস্তব বলিয়া পবিগৃহীত হইলেও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে তাহার যথাথ্য কদাপি অগ্রাহ্য হইতে পারেনা। যাঁহারা সৌভাগ্য বলে সাদৃশ্য জ্ঞান-লাভে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যাহিক জীবনে এরূপ বহু ঘটনা অভ্রান্ত ধ্রুব সত্যের ন্যায় নিয়ত অনুভূত হয়। সুতরাং স্থূলনেত্রে স্থূলজ্ঞানে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সমীম ও দুর্ব্বল ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, তাদৃশ্য অলৌকিক অধ্যায় জ্ঞানের মীমাংসা করা সত্য সত্যই অসম্ভব এবং অযৌক্তিক। সীতার সেই অপাথিব অনল পরীক্ষা ঘটনা অধ্যাত্ম জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন কোনক্রমেই অন্যের পরিগ্রাহ্য হইতে পারেনা। লেখক এই অংশেও অতি বিচিত্র ভাবে প্রদর্শন

করিয়াছেন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্তরে প্রবন্ধ জানকীর অগ্নি পরীক্ষার সমালোচনা করিয়াছেন বঙ্গীয় সাহিত্যিক গণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা সহৃদয়তার সহিত আমাদের সাহিত্য কাননের এমন শোভন পুষ্প নিরীক্ষা করেন। বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে এবম্বিধ প্রবন্ধরত্নের যতই উপচয় এবং আহরণ হইবে ততই ভাষা নিঃসংশয় পরিপুষ্টা, সমৃদ্ধিশক্তি অর্থভূয়িষ্ঠা হইয়া সাহিত্য সেবিগণের আনন্দ আশার পরিবর্দ্ধন করিবে। সর্ব্বমঙ্গলালয় নিধান জগদীশ্বরের সমীপে আমাদের আকুল প্রার্থনা, পূজনীয় রায় বাহাদুর মহাশয় সঞ্জীবন লাভ করিয়া সাহিত্য সিংহাসনে থাকুন।[১২৮]

১ম ভাগ ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩১১

বিধুভূষণ শাস্ত্রী : প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত [প্রবন্ধ], ধর্ম্মানন্দ ভারতী

আমেরিকায় প্রথম বাঙ্গালী

(১ম প্রস্তাব)

যে সকল সুশিক্ষিত, সুসভ্য, সুযোগ্য, সদাচারী ও সৎসাহসী বঙ্গবাসীর অমিত অধ্যবসায়, অপ্রতিহত যত্ন, দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্য সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, দেবোপম চরিত্র এবং স্বদেশহিতৈষিতা গুণে সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকায় আমাদের মাতৃভূমির যশোরাশি দিগ্‌দিগন্ত প্রকীর্ণ হইয়াছে,—যাঁহাদের বিদেশ বিচরণের সুফলে বাঙ্গালীজাতি সম্বন্ধে [...অস্পষ্ট...] হইতে বহুবিধ কুসংস্কার তিরোহিত হইয়াছে, যাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রভাবে বিদেশে ভারতবর্ষের নাম এখনও সম্মানের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে,—সংক্ষেপতঃ, যাঁহাদের বাক্যে ও কাযে মহাসাগর পরবর্ত্তী বিদেশীয় জনসমাজে বাঙ্গালার গৌরব ও সৌরভ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আমাদের জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছে, বর্ত্তমান প্রস্তাবের বাবু জগৎচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (মিষ্টার জে, সি, গাঙ্গুলী) তাঁহাদের অন্যতম। বাঙ্গালীর মধ্যে,—বাঙ্গালী মধ্যে কেন, ভারতবাসীর মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ আমেরিকা গমন করেন নাই ; ভারতবাসীদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম মার্কিন মুলুকে যাত্রী। ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আমেরিকা দেশে গমন করার গৌরব. শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে বাঙ্গালীজাতিই তাহার অধিকারী হইয়াছেন! দুঃখের বিষয় এই যে, জগৎচন্দ্রের জীবনী ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই ক্ষণজন্মা ও স্বনামধন্য বাসীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করিতে আরম্ভ করি।

ভুবনবিখ্যাত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জগৎ বাবুর পূর্ব্বে ইংলন্ড গমন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি আমেরিকা দেশ দর্শন করেন নাই। গাঙ্গুলী মহাশয়ই আমেরিকার সর্ব্বপ্রথম ভারত যাত্রী। নিরপেক্ষভাবে এবং সূক্ষ্মানুসক্ষ্মরূপে মহানুভব রামমোহনের সহিত জগচ্চন্দের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দুই একটা বিষয়ের মধ্যে রাজা রামোহন রায় অপেক্ষা, দরিদ্র সন্তান গাঙ্গুলী শ্রেষ্ঠতর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন রাজা রামমোহন নিজে অতুল সম্পত্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন ; দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ধনবানের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ; দেশের প্রধান প্রধান লোক তাঁহার পক্ষানুবর্ত্তী বা [অস্পষ্ট] তদ্ব্যতীত তিনি নানা বিদ্যা ও নানা ভাষা এবং বিবিধ শাস্ত্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া

সাগর পারে ইংলন্ডে গিয়াছিলেন ; তাঁহার যাতায়াতের এবং বিদেশে অবস্থানের ব্যয় নবাবের রাজকোষ হইতে তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছিল ; বিলাতের সর্ব্বত্র তাঁহার মিত্র ও পোষাক ছিল এবং তিনি বহুপ্রকার সুখ, সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে করিতে বিদেশে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু জগৎচন্দ্র গাঙ্গুলী ক্রমাগতঃ দরিদ্রতা–দস্যুর সহিত প্রবল সংগ্রাম করিতে করিতে এবং অসংখ্য প্রকার অসুখ, অসুবিধা ও অস্বচ্ছন্দতায় অবস্থিত থাকিয়া "সাত সমুদ্র তের নদী" অতিক্রম করতঃ বিলাতে অতি দরিদ্রভাবে উপনীত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহনের ন্যায় তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি প্রতিভা বা প্রভাব ছিলনা, কিন্তু স্পষ্ট কথায় কহিতে হইলে রামমোহনাপেক্ষা তিনি অধিকতর অধ্যাবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা, ত্যাগ স্বীকার এবং স্বয়ম্ভূসমুত্থান শক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, অথচ রাজা রামমোহনের ন্যায় তিনি প্রখ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, এইজন্য জগচ্চন্দ্র গাঙ্গুলীর নাম প্রায় অনেকের নিকট অপরিচিত। রাজা রামমোহনের জ্ঞান ও ভ্রমণ কেবল ইংলন্ডের সীমায় আবদ্ধ ছিল, গাঙ্গুলীর জ্ঞান ও ভ্রমণ সমগ্র ইংলন্ড, স্কটলন্ড, ফ্রান্স, স্পেন, অষ্ট্রীযা, জর্ম্মানী, ইটালী ও আমেরিকায় প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নত হইয়া পরিণামে এক পরম প্রধান পুরুষ মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমেরিকার লোকেরা "বাঙ্গালী" কে "মানুষ" বলিয়া জানিতে পারিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে মার্কিন মুলকের লোকেরা ভাবিত,—"বাঙ্গালা দেশের লোকেরা বুঝি অসভ্য বন্য জাতি" ! ! অনেকে বঙ্গদেশের নামও ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ বা পাঠ করে নাই। গাঙ্গুলীর জীবনচরিত আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, বাঙ্গালীজাতির মধ্যে মহত্ত্বের বীজ আছে, কিন্তু ক্ষেত্র নাই। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে বুদ্ধিমান বাঙ্গালী পুরুষ না করিতে পারে, এমনই কর্ম্মই নাই।

জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় হুগলী জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া পল্লীর সন্নিহত বালীগ্রামে খ্রীষ্টীয় ১৮৩৫ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। চতুর্দ্দশবর্ষ বযক্রমকালে তাঁহার জনকের মৃত্যু হয়। দরিদ্র পিতা অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া সমস্ত জীবন পুরোহিত ও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবাপত্নী অথবা সন্তানের জন্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। গাঙ্গুলীর জনকের কনিষ্ঠ সহোদর পৃথকান্ন হইয়া স্বতন্ত্র বাটীতে থাকিতেন, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাঁহার স্নেহের পরিমাণ কখনই হ্রাস হয় নাই ; বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ সহোদরের মৃত্যুতে অনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি অধিকতর স্নেহ ও যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বড় ভাই অপেক্ষা তাঁহার আর্থিক অবস্থা কথঞ্চিত উন্নত ছিল ; স্বল্পকাল মধ্যে গাঙ্গুলীর শিক্ষা ও প্রতিপালনের ভার তিনিই গ্রহণ করিলেন। ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত হইলে অর্থাগমনের পথ সত্বরে প্রশস্ত হইবে ভাবিয়া গাঙ্গুলীব খুল্লতাত মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতায় ইংরাজি পড়িবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে কলিকাতার ব্যয় ভার বহন করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য দেখিয়া তিনি জগচ্চন্দ্রকে পুনরায় বালীগ্রামে আনয়ন পূর্ব্বক সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। জগচ্চন্দ্র এই সময়ে তাঁহার পিতার শিষ্য ও যজমান প্রভৃতির পৌরোহিত্য ও গুরুগিরি করিতে লাগিলেন। সংস্কৃত ভাষা এবং হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহাদের অধিকার জন্মিয়া এই সময়ে কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করিবার জন্য উত্তরপাড়া, বালী ও শ্রীরামপুরের কয়েকখানি লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণাধ্যাপক ও পন্ডিত পুরুষ বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার জগচ্চন্দ্রের স্বল্পবয়সে সংস্কৃত ভাষার উপরে বিশিষ্ট অধিকার লাভের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার মাতার ও তাহার নিজের ভরণপোষণের

বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক এই কঠিন কার্য্যে জগচ্চন্দ্রকে যোগদান করিতে পরামর্শ দিলেন। জগৎ তাহাতে সম্মত হইয়া অনুবাদকের কার্য্য করিতে লাগিলে।

সুপ্রসিদ্ধ সিপাহীবিদ্রোহের প্রায় একবৎসর পুর্ব্বে জগদ্বিখ্যাত পাদ্রী সি, এচ, এ, ডল্ সাহেবের সহিত জগৎ গাঙ্গুলীর আলাপ পরিচয় হয় এবং ডল সাহেবের পরামর্শ ও উপদেশানুসারে ইংরাজি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। যুবক জগচ্চন্দ্রকে ডল্ সাহেব খৃষ্টান ধর্ম্মের শিক্ষা দিতেন এবং আমেরিকার ইতিহাস পড়াইতেন। এই সময়ে কয়েক মাসের জন্য স্থানান্তরে ডল সাহেবের অবস্থান করার আবশ্যকতা হওয়ায়, ডল্ সাহেব মার্টিন্ডেল নামক এক পাদ্রী সাহেবের বাড়ীতে জগৎকে রাখিয়া গেলেন। জগৎচন্দ্র সাহেবেব কুঠীতে থাকিতেন, তথায় শিক্ষা লাভ করিতেন, নানা পুস্তক অধ্যায়ন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইতেন এবং নিকটবর্ত্তী এক হিন্দুর হোটেলে মধ্যহ্ন আহার সমাপন করিতেন। মার্টিন্ডেল সাহেব ভাবতে অবস্থান করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করতঃ দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন ; কিন্তু অনেক চিন্তা ও পরিশ্রমেও তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তিনি ভারতবষের অন্যান্য প্রদেশে এতদুদ্দেশে অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল স্থানে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে বঙ্গদেশে আগমন করেন। ঘটনা ক্রমে কলিকাতা নগরীতে এক অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুককে তিনি হস্তগত করিয়া খৃষ্টের নামে দীক্ষা দান করতঃ খৃষ্টান করেন। এই দরিদ্র অন্ধ সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল পথের ধারে বসিয়া চীৎকার করিয়া ভিক্ষা করিত। ইহার খৃষ্টানী দীক্ষা ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পব পাদ্রীবব মার্টিণ্ডেল সাহেব আমেরিকা দেশে তাহার মিশনের কর্ত্তাদিগকে যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া ছিলেন, তাহা কেবল অতিরঞ্জিত নহে, পবন্তু ঘোরতর অসত্য কথা ও বৃথা আত্মমযাদা ও আত্মাহঙ্কারে পরিপূণ ছিল। বলা বাহুল্য, মার্টিন্ডেল সাহেব আমেরিকা হইতে মাসে মাসে প্রচুর অর্থ সাহায্যস্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু অধিকাংশ টাকা তাঁহার নিজের সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও বিলাসেব জন্য ব্যযিত হইত। যাহা হউক, আমেবিকা দেশে প্রেবিত তাঁহার অদ্ভুত পত্রখানির কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করিয়া দিলাম ;—

"দয়াময় ও প্রেমময় পরমেশ্বরের কৃপায় গত সপ্তাহে এক সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত ভারতবাসী, পতিতাপাবন প্রভু যিশুখ্রীষ্টের পবিত্র নামে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া প্রভুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিল ; মুসলমানদিগের কোরানশাস্ত্রে ও ধর্ম্মতত্ত্বে এই সুযোগ্য পুরুষ বিশিষ্টরূপে অভিজ্ঞ। ইহার নাম মৌলবী রফিক আলী সাহেব। ইশলামীয়দিগের মধ্যে যাহারা প্রধান বিদ্বান্ বলিয়া গণ্য হয়, তাহারা মৌলবী উপাধিতে পরিচিত ; ইনি তাহাদিগের অন্যতম। আমরা পবিত্র বাইবেল পাঠ করিয়া খৃষ্টের জীবনচরিত ও তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচার কবিতেছিলাম,—খৃষ্টীয় সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিতেছিলাম, তাহাই শ্রবণ করিয়া এই মৌলবী বিগলিত হৃদয় হইয়া উঠিয়াছিলেন ; অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্ক দ্বারা ইহার সংশয়চ্ছেদন করিয়া আমি ইহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছি। ভরসা করি যিশুর করুণাবলে, সত্বরেই প্রভুর রাজ্য বিশেষরূপে বিস্তৃত হইবে।"—ইত্যাদি। এই রিপোর্ট লিখিয়া সাহেব বাহাদুর যখন আমেরিকায় ইহা প্রেরণ উদ্যোগ করিতে ছিলেন, তখন জগচ্চন্দ্র গাঙ্গুলী ইহা দেখিয়া ছিলেন এবং পাঠ করিয়া ইহার [...অস্পষ্ট...] অবগত হইয়া ছিলেন। জগচ্চন্দ্র এই মিথ্যা রিপোর্টের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন ; অতীব সাহস সহকারে ইহাকে "অসত্য ও কৃত্রিম" বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে লাগিলেন ; সাহেব বাহাদুর একথা শুনিয়া ক্রোধে

আপাদমস্তক অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। পাদ্রী প্রভুর এই ভাব দেখিয়া যুবক গাঙ্গুলী কুঠীর সম্মুখস্থিত নবশস্পান্নচ্ছ ভূমিখণ্ডে আসিয়া পদাচারণা করিতে লাগিল। সাহেব লিখিয়া পাঠাইলেন,— "You better clear out of my bungalow" অর্থাৎ "আমার কুঠী পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তোমার পক্ষে ভাল।" জগৎ জিজ্ঞসা করিয়া পাঠাইল,—"কখন আমাকে যাইতে হইবে?" সাহেব তাঁহাকে চাকরের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন,—"অদ্যই যাইতে হইবে।"

নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় জগচ্চন্দ্র তাহার সামান্য দ্রব্যাদি ও পুস্তকসমূহ পথের পার্শ্বে আনিয়া দণ্ডায়মান আছে ; কোথায় যাইবে তাহার স্থিরতা নাই ; এমন সময়ে তাহার এক বন্ধু অকস্মাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"আমি তোমারই নিকটে আসিতেছিলাম। শিবনারায়ণ বাবু নামে এক ধনাঢ্য সওদাগর ও আড়তদার তাঁহার পুত্রদিগের শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষকের অনুসন্ধান করিতেছেন। আমি তোমার নামোল্লেখ করিয়া তোমার পরিচয় দিয়াছিলাম, তিনি তোমাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং তোমাকে সঙ্গে করিয়া তথায় যাইতে কহিয়াছেন। আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি। তিনি জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু তাহার ব্রাহ্মণ পাঁচক আছেন, তোমার আহারাদির কষ্ট হইবেনা ; তাঁহার গৃহে তুমি থাকিতে পাইবে।" বন্ধুর এই কথা শ্রবণ করিয়া জগচ্চন্দ্র বিশেষ প্রীতমনে তাহার সঙ্গে শিবনারায়ণ ঘোষের আড়তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক, এই বদান্য শিবনারায়ণ বাবুর উৎসাহ, যত্ন ও অর্থ সাহায্যে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় খৃষ্টীয় ১৮৫৮ অব্দের ২৭ এ জানুয়ারী দিবসে কলিকাতা হইতে বাষ্পীয় তরণীযোগে আমেরিকার বোষ্টন নগরাভিমুখে যাত্রা করেন।

(ক্রমশ :)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শিশুপাঠ্য ইতিহাস

কাল-স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক জাতিরই রাজনীতি, ধর্ম্ম, সমাজ-প্রভৃতি সমুদয় বিষয়েই পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। কোনও নির্দ্ধারিত কাল ব্যাপিয়া জাতিবিশেষ বা দেশবিশেষের যে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহার যথাযথ বর্ণনাই সেই জাতি বা দেশের তাৎকালিক ইতিহাস। সুতরাং ইতিহাস পাঠের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রয়োজন—দেশ বা জাতিবিশেষের একটি চিত্র মনোমধ্যে স্থাপন। যে ইতিহাস-লেখক পাঠকগণের অন্তঃকরণে তাহার বর্ণনীয় বিষয়েব সত্যমূলক ও জীবন্ত দৃঢ় সন্নিবিষ্ট করিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে 'ইতিহাস লেখক' আখ্যা পাইবার যোগ্য পাত্র। আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের পরিসরে এতদূর বিস্তৃত নয়। শিশুগণেব পাঠোপযোগী ইতিহাস প্রণয়নে যে যে বিষয়ে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য, নিম্নে তৎসম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করার প্রয়াস পাওয়া যাইবে।

প্রথমতঃ—শিশুপাঠ্য ইতিহাসে বহুবিষয়ের সমাবেশ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। বয়স একটু বেশী হইলে বহুবিষয় ধারণা করিবার উপযোগী ক্ষমতা জন্মে বটে, কিন্তু বাল্যকালে সেই ক্ষমতা থাকে না। এইরূপ অবস্থায় বালকের স্বভাবতঃ দুর্ব্বল মানসিক ক্ষমতার উপর বহুবিষয় ধারণার ভার প্রদর্শন করিলে সেই বিষয় সমূহের সম্যগ্‌ধারণা হওয়া দূরে থাকুক,

বরং তাহাদিগের স্বভাব দুর্ব্বল ও ক্রমবিকাশ মানসিক ক্ষমতার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। স্বল্পভোজী ব্যক্তিবিশেষকে ভূরি ভোজন করান, অথবা স্বল্পভার বহনক্ষম ব্যক্তির স্কন্ধে অধিক-ভার স্থাপন,-আর কোমলমতি বালকের উপর বহুবিষয় আয়ত্ব করিবার ভার প্রদান,-এই দুইই এক কথা। উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষার পাঠ্য একখানা ইতিহাসে দেখিতে পাইয়াছি, ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বকাল—এই তিনটি বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ওয়ারেণ হেষ্টিংস হইতে লর্ড কার্জ্জন পর্য্যন্ত : সমুদয় গবণর জেনারেলের এবং স্যার জন উড্‌বার্ণ পর্যন্ত বাঙ্গালার সমুদয় লেপ্টেনান্ট গবণরের সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ আছে ; মোগল ও বিভিন্ন বংশীয় পাঠান রাজগণের সকলেরই উল্লেখ আছে এবং সাধারণ ইতিহাসে হিন্দু-রাজত্বকাল সম্বন্ধে যাহা যাহা পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ও আছে। অপিচ-এই ইতিহাস অনধিক একাদশ বর্ষ বয়স্ক বালকের পাঠ্য। এত অধিক বিষয় আয়ত্ব করিতে বাধ্য করান বালকের স্ফুরণশীল মানসিক ক্ষমতার পরিপুষ্টি সম্বন্ধে বড়ই অপরিণামদর্শিতা ও নিষ্ঠুরতার কার্য্য। একদিকে যেমন বহুবিষয়ের সমাবেশ পরিত্যাজ্য, আবার দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের যোজনাও তেমনই পরিহার করা কর্ত্তব্য। বালকপাঠ্য ইতিহাসে জেলা বোর্ড গঠন-প্রণালী, স্বায়ত্তশাসন আইন প্রণয়ন, কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন প্রচলন, ব্যবস্থাপক সভা গঠন প্রভৃতি বিষয়ে সমাবেশ শেষোক্ত শ্রেণীর দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অল্পবয়সে যে সমুদয় বিষয়ের উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে সেই বিষয়গুলি একেবারে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। স্তন্যপায়ী শিশুকে মাংস ও পলান্ন আদৌ প্রদান না করাই বোধ হয় সঙ্গত। লঘুপথ্য-সেবী শিশুর পাকস্থলী ধীরেধীরে সবল হইতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। সবল হইয়া উঠিলে পরম গুরুপাক খাদ্য ভোজন করিতে দিতে আর কোনও বাধা থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ—বর্ণনীয় বিষয়ের অতি সংক্ষিপ্তভাবে সমাবেশ বালকপাঠ্য ইতিহাসের আর একটি প্রধান দোষ। আমরা দেখিতে পাইয়াছি, অনধিক ৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ক্ষুদ্রাকার পুস্তিকায় ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে ; এবং সাধারণতঃ ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য প্রায় কোনও ঘটনাই পরিত্যক্ত হয় নাই। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে, ঘটনাসমূহের বিবরণ নামোল্লেখ মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। এইরূপ পুস্তকের ইতিহাস সংজ্ঞার খ্যাতি না হইয়া ইতিহাসের নির্ঘণ্টপত্র বলিয়া পরিগণিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লিখিত ঘটনা পাঠ করিয়া যে ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য মোটেই সিদ্ধ হয় না, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইতিহাস পাঠের সাক্ষাৎসম্বন্ধে উদ্দেশ্য দেশ বা জাতিবিশেষের একটি পরিস্ফুট চিত্র হৃদয়ঙ্গম করা। যদি গ্রন্থাকার ঘটনাবিশেষের বিশদ ও জীবন্ত বিবরণ প্রদান করিতে প্রয়াস না পান, এবং ঘটনাটি নামমাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন, তাহা হইলে কি পাঠকের মনে ঘটনাটি আদৌ অঙ্কিত হইতে পারে? যদি সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ না হইল, তাহা হইলে লেখকের ভাব-প্রকাশাক্ষম ভাষা আর বন্যপশুর অবোধ্য রব--এতদুভয়ে প্রভেদ কি? কেবল ইতিহাস বলিয়া কেন, যেখানেই ভাষা পাঠকের ভাবোদ্দীপনা করিতে পারেনা, সেইখানেই ভাষা 'ভাষা' সংজ্ঞার অনুপযুক্ত। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে, ঘটনার উল্লেখ যদি অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে করা হয়, তাহা হইলে পাঠক ঘটনাটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না এবং তবেই ইতিহাস প্রণয়ন ও পাঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। প্রাপ্তবয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পাঠোপযোগী পুস্তকে এই সংক্ষেপ প্রক্রিয়া তত দোষাবহ ও ক্ষতিকর না হইলেও শিশুপাঠ্য

ইতিহাসে ইহার ফল বড়ই অনিষ্টকর। অতি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখের একমাত্র উপযোগিতার স্থল—জ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয়ের পুনর্জ্ঞানের উদ্বোধন। যদি কেহ একবার কোনও দৃশ্য দর্শন করিয়া থাকেন—একবার কোনও স্বর শ্রবণ করিয়া থাকেন, অথচ বিস্মৃতিবশে তাহা ভুলিয়া যাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত করিবার নিমিত্ত দর্শন বা শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়টির পূর্ণমাত্রার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই ; সংক্ষেপতঃ বিষয়টির একটুকু আভাস প্রদান করিলেই বিষয়টি পূর্ণাবয়বে তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইবে। সেইরূপ একবার যিনি মানসেন্দ্রিয় দ্বারা একটি বিষয় সম্যগুপলব্ধি করিয়াছেন, কারণবিশেষে তিনি তাহা বিস্মৃত হইয়া থাকিলে, অতি অল্প মাত্রায় বিষয়টির পুনরুল্লেখ করিলেই সম্পূর্ণ বিষয়টি আবার তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিবে বটে। অথবা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত বিষয়ের অনুরূপ বিষযান্তবে সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে সংক্ষেপতঃ উল্লেখ সত্ত্বেও বিষয়টি সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হইতে পারে বটে। যদি কেহ মধুর আস্বাদ পাইয়া থাকেন, অথচ চিনির আস্বাদ না পাইয়া থাকেন, তাহাহইলে চিনির আস্বাদ লইতে না না দিয়া 'মধুর আস্বাদের মত'—এ কথা বলিয়া দিলেও সম্পূর্ণ না হউক—কতক পরিমাণে চিনির আস্বাদ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান জন্মিবে। প্রাপ্ত বয়স্ক ও কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির পাঠোপযোগী ইতিহাসে অতি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখের ফল তত অনিষ্টকর নাও হইতে পারে ; অনেক উল্লিখিত বিষয়ে পূর্ব্বেই তাহার পরিস্ফুট জ্ঞান থাকিতে পারে, সংক্ষেপতঃ উল্লেখ তাঁহাব পূর্ব্ব স্মৃতি জাগ্রত করিবার কার্য্য করিতে পাবে। উল্লিখিত বহু বিষয়ের অনুরূপ বিষয়ে তাহার সম্যক জ্ঞান থাকিতে পারে এবং সেই পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান ও গবেষণা-বলে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও অনেক বিষয়ে তাহার কতকটা পরিস্ফুট জ্ঞান লাভ হইতে পারে। কিন্তু শিশুর বেলা ইহার কিছুই খাটে না। আজকাল আমাদের দেশে যাহারা প্রাথমিক ইতিহাস পাঠের সূচনা করে, তাহারা নবম বা দশমবর্ষীয় বালক। সংসারক্ষেত্রে তাহারা নবাগত পথিক বই আর কিছু নয়। তাহাদের পূববলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিসর অতিক্ষুদ্র। তাহাদের মানসফলকে পূববাঙ্কিত জ্ঞানরেখার সংখ্যা ও গভীবতা অতি সামান্য। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার জ্ঞান প্রদান করিতে হইলে ঘটনাটির পূর্ণাবয়ব ও জীবন্ত চিত্র প্রদান করিতে না পারিলে কি প্রকারে তাহারা তদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে? তাহার পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান ও গভীরতা অতি সামান্য। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার জ্ঞান প্রদান করিতে হইলে ঘটনাটির পূর্ণাবয়ব ও জীবন্ত চিত্র প্রদান করিতে না পারিলে কি প্রকারে তাহারা তদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে? তাহারা পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানের আশ্রয় লইতে পারিবে না, কারণ তাহা তাহাদের নাই। তাহাদিগকে কোনও ঘটনার বিবরণ প্রদান করিবার পূর্ব্বেই দেখিতে হইবে,— ঘটনাটি ক্ষমতার বলে ধারণ করিতে সক্ষম হইবে। তারপর যেটুকুই তাহারা ধারণা করিতে পারগ হইবে বলিয়া মনে হউক না কেন, সেইটুকুই যথাসম্ভব পূণভাবে বর্ণনা করিতে হইবে, যেন সেই বণনার পূর্ণতার বলে বালক পাঠকের মনে বর্ণিত বিষয়ের এক পরিস্ফুট ও জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে। বিষয়টির কঙ্কালমাত্র উল্লেখ না করিয়া চর্ম্ম-মাংস-রুধিরাস্থি-সম্পন্ন পূর্ণবযব বিষযটিরই উল্লেখ করা সঙ্গত। যাহারা জীবিতাবস্থায় কোনও জন্তু বা তদনুরূপ কোনও জন্তু সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহারাই পরে অস্থিপঞ্জর মাত্র দেখিয়া জন্তুটির একটি চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারেন। আর যাহারা আদৌ তেমন কোনও জন্তু জীবিতবস্থায় অবলোকন করেন নাই, কঙ্কালমাত্র দর্শনে সেই

জন্তুর সম্বন্ধে তাহাদের কি জ্ঞান হইতে পারে? বস্তুতঃ অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত ঘটনা পাঠে বালকদিগের তৎসম্বন্ধে কোনও জ্ঞানোদয় হয় না ; কেবল তাহাই নহে, তাহাদিগের মানসিক শক্তি বিকাশের পক্ষে উহা এক গুরুতর অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহাদিগের প্রাথমিকপাঠ্য ইতিহাস পুস্তক অতি নীরস ও দুর্ব্বোধ্য হওয়াতে 'ইতিহাস'—এই বিষয়টির উপবই স্বাভাবিক বীতস্পৃহা জন্মে এবং তাহার ফলে অনেকের প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়ও ইতিহাস পাঠে প্রবৃত্তি হয় না। অপর, এইরূপ পুস্তকপাঠই অর্থ-বোধ ব্যতিরেকে কেবল কণ্ঠস্থ করণরূপ বদভ্যাসের সোপান। বিদ্যালয়ে অদূরদর্শী শিক্ষকের তাড়নার ভয়ে অনুপলব্ধ ঘটনাবলীর বিবরণ কোনপ্রকারের গলাধঃকরণ যথাসময়ে বমন করিতে সক্ষম হওয়াকেই প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া মনে করিতে শিখে এবং তজ্জন্য তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া এবং বহু-বিষয় অধ্যয়ন করিয়াও স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালন ও সম্বর্দ্ধন করিতে সক্ষম হয় না। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম, অতিসংক্ষিপ্তভাবে প্রণীত ইতিহাস পাঠ পাঠকমাত্রেরই—বিশেষতঃ বালক মাত্রেরই প্রভূত অনিষ্টজনক।

অতঃপর শিশুপাঠ্য ইতিহাস প্রণয়নে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বর্ণনীয় বিষয় এমত আকারে বালকের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইবে, যেন উহা সহজেই তাহাদের হৃদয়গ্রাহী হয়। কেবল ইতিহাস বলিয়া কেন বালকপাঠ্য সমুদয় বিষয়েই এই রীতির অনুসরণ করা সঙ্গত। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের প্রথম স্তরে দেখা কর্ত্তব্য,—সাধারণতঃ তাহাদিগের স্বাভাবিক মানসিক রুচি কিরূপ? প্রথমতঃ সেই স্বাভাবিক রুচির কতক পরিমাণে অনুবর্ত্তন করিয়া ধীরে ধীরে অলক্ষ্যভাবে তাহাদিগের অনভ্যস্ত মনকে শিক্ষণীয় বিষয়ে আকৃষ্ট করিতে হইবে। ইতিহাস শিক্ষাদান সম্বন্ধে আমরা এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে দেখিতে পাই যে, বালকগণ ব্যক্তিসমষ্টির বিবরণ অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষের বিবরণ ধারণ করিতে অধিকতর ইচ্ছুক ও সক্ষম। আবার ব্যক্তিবিশেষর জীবনের সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণিত ধারাবাহিক ঘটনাবলী অপেক্ষা বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত ঘটনাবিশেষের পূর্ণ বিবরণ শুনিতেই তাহারা অধিক প্রয়াসী। উপকথা বা প্রস্তাব শুনিতে যে বালকগণের স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তাহা সকলেই জানেন। পরিবারস্থিত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণের কথিত কৌতুকাবহ প্রস্তাব যে বালকগণের কিরূপ চিত্তাকষক, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। একটুকু চিন্তা করিলেই প্রতীয়মান হয়, কি কি গুণবলে সেই প্রস্তাবগুলি বালকের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে? এক গুণ,—বালকগণ সাধারণতঃ যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, তদ্ব্যতিরেকে কিছু নূতনত্ব ; আর এক গুণ,— বহু ঘটনার সমকালীন সমাবেশ না হইয়া ঘটনাবিশেষের পূর্ণচিত্র প্রদান। আমাদিগের মতে শিশুর পাঠোপযোগী ইতিহাস লেখক বালকগণের পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক প্রস্তাবপ্রিয়তার অন্তস্তলে দৃষ্টি সন্নিবেশ করিয়া তাঁহার কার্য্যে ব্রতী হইবেন। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, তিনি যেন তাঁহার বর্ণনীয় জাতিটির একটা সম্পূর্ণ চিত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বালকের চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে আশা না করেন। এই উদ্দেশ্য তাঁহার পরোক্ষভাবে সাধন করিতে হইবে। তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লক্ষ্য হইবে—ব্যক্তিবিশেষের অপেক্ষাকৃত জীবন্ত চিত্র প্রদান। তাঁহার বর্ণনীয় জাতি যদিও বহুব্যক্তির সমষ্টি, তাহা হইলেও কেবল কয়েকটি বড় বড় লোকের জীবন ও কার্য্যই জাতিটির মূল উপাদান। সেই বড় বড় লোকদের মধ্য হইতে দুই চারটি লোকের সম্বন্ধে একটুকু সত্যমূলক জ্ঞান প্রদান করিতে পারিলেই তাঁহার শ্রম সার্থক হইল বিবেচনা করা এবং তৎসাধনেই তাঁহার সম্পূর্ণ চেষ্টা নিযুক্ত হওয়া বিধেয়। আবার সেই ব্যক্তিগণের

জীবনের পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিবেন, তাঁহার লক্ষ্য এতদূর বিস্তৃত হওয়ারও আবশ্যকতা নাই। ব্যক্তিবিশেষের জীবনের কেবল এমন দুই চারটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবেন, যাহা জানিলে সেই ব্যক্তির চরিত্র ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে একটা মোটামোটি প্রকৃত ধারণা হইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে,—বালক পাঠোপযোগী ইতিহাস ইতিহাস লিখিতে যাইয়া ভারতবর্ষে মোগলরাজত্বের ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ না করিয়া, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বাবর ও আকবর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিলেই হইল। বুদ্ধদেবের জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাবলীর উল্লেখ না করিয়া তাঁহার সংসার ত্যাগের বিবরণটি লিখিলেই হইল। অশোকের রাজত্বের আমূল বৃত্তান্তের উল্লেখ না করিয়া, তিনি যে পাঁচ পাঁচ বৎসর পর একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার একটুকু বিবরণ প্রদান করিতে পারিলেই আশোক সম্বন্ধে বালকোপযোগী অবশ্যজ্ঞেয় বিষয় সম্যগ্‌বর্ণিত হইল। কোনও মহৎ লোকের চরিত্র বর্ণন করিতে যাইয়া তিনি অতি ন্যায়পরায়ণ, দয়াশীল বা ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, ইহা বলার পরিবর্ত্তে তাঁহার ন্যায়পরতা, দয়াশীলতা বা ক্ষমতার একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিলেই বালক পাঠকের পক্ষে তাহা অধিক রুচিকর ও জ্ঞানপ্রদায়ক হইবে। বস্তুতঃ প্রস্তাবচ্ছলে লিখিত হইলে বালকগণ আগ্রহ সহকারে যাহা পাঠ করিবে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে গম্ভীরভাবে বর্ণনা করিয়া গেলে বালকগণ তাহা আদৌ পড়িতেই চাহিবে না ও বুঝিবেনা। পটোল পাতাব বড়া ভাজিযা দিলে রোগীর খাইতে আপত্তি হয় না, অথচব্যামোও আরোগ্য হয়। আবার সেই পটোল পাতার রস শিশিতে পূরিয়া ঔষধ রূপে উপস্থিত করিলে অনেক রোগীই ঢালিয়া ফেলিয়া দিতে পারিলে রক্ষা পান।

[ক্রমশ]

শ্রীকুঞ্জবিহারী হার এম, এ।

রমনী মোহন সেন : প্রেমতত্ত্ব [প্রবন্ধ], ক্যামাখ্যা প্রসাদ বসু : প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ বাণিজ্য এবং প্রভাব [ঐ], চারুশীলা দাসী : যুগল রূপ [কবিতা]।

১ম ভাগ, ১১ সংখ্যা, ফাল্গুণ ১৩১১

জানকিনাথ শাস্ত্রী : শ্রী গৌরঙ্গের সংগ্রাম,

(২) শিশুপাঠ্য ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিশু পাঠোপযোগী ইতিহাসলেখকের আর একটা প্রধান লক্ষণীয় বিষয়—তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ের সত্যমূলকতা। যে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে যার সন্দেহ আছে, তাঁহার পুস্তকে যেই ঘটনার স্থান না দেওয়াই সঙ্গত যে, ঘটনার সত্যমূলকতা স্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত মতদ্বৈধ আছে এবং যাহার সম্বন্ধে তিনি নিজে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই—অথবা যে বিষয়ের অনুসন্ধান বিষয়ে তাঁহার নিজের যথেষ্ট ক্রটী রহিয়াছে, সেই সমুদয় লিপিবদ্ধ করিতে তাঁহার যথেষ্ট সাবধানতা লওয়া কর্ত্তব্য। সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক, আর পরোক্ষ ভাবেই হউক, তাহার লিপি-কৌশলে পাঠকগণের হৃদবোধ না হইতে পারে যে, ঘটনাগুলি সত্য। এইরূপ

ঘটনার পরিহারই সঙ্গত। আর একেবারে ছড়িয়া দেওয়া সঙ্গত বোধ না হইলেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, উহাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে। আপাততঃ মনে হইতে পারে, এরূপ সত্যতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা তো কেবল শিশুপাঠ্য ইতিহাস লেখক কেন, সর্ব্বপ্রকার লেখকেরই কর্ত্তব্য সত্য বটে, অনুরাগ সর্ব্বশ্রেণীর লেখকের পক্ষেই প্রয়োজনীয় ; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লেখকগণের মধ্যে ইহার অভাব হইলে যতদূর অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা, আর কোথাও তেমন নয়। সন্দেহ জ্ঞানলাভের এক প্রধান সাধন, আর অন্ধ-বিশ্বাস জ্ঞান বিকাশের অন্তরায় ; এই দুইটি কথাই সত্য। কিন্তু ইহা সকলপাত্রে প্রযোজ্য নয় ; যদি জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে উহা জ্ঞানলাভের সাধন না হইয়া শত্রু জ্ঞানের অঙ্কুরোদগম হইতেছে, তখন সন্দেহের পরিবর্ত্তে বিশ্বাসই অধিকতর উপকারজনক। আর কতকটা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তখন আর অন্ধ-বিশ্বাসের প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত নয়। সন্দেহের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য এবং পূববলব্ধ জ্ঞান, পয্যবেক্ষণ ও গবেষণা প্রভৃতিব সাহায্যে ধীরে ধীরে জ্ঞানরাজ্যে অগ্রসর হওয়াই কত্তব্য। আর নৈসর্গিক নিয়মও তাই। শিশুরা যাহা দেখে তাহাকে সহজেই বিশ্বাস করে, আর বয়োবৃদ্ধগণ বিশ্বাস করিতে তেমন অগ্রসর নন্। অতএব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের উপযোগী ইতিহাস- লেখক যাহাই লিখুন না কেন, তাঁহার সুযোগ্য পাঠকগণ তাহার বর্ণিত বিষয়গুলি একেবারে ধ্রুব সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া লন না। তাঁহারা জানেন, লেখকের ভ্রম প্রমাদ থাকিতে পারে, তাহার সত্যানুসন্ধানের যত্নের ক্রটি থাকিতে পাবে, তিনি যাহা লিখিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার ভাষায় তাহা পূণভাবে প্রকাশিত নাও হইয়া থাকিতে পারে, লেখকের অবৈধ স্বজাতি প্রিয়তা বা স্বার্থপরতা দোযেও তাঁহার বর্ণনার বিষয় দুষ্ট হইতে পারে ; এমন কি, বণনীয বিষয়-বিশেষ লেখকের বুদ্ধির দুরধিগম্যও হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু বালকের পক্ষে ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থা। বালক তাহার পাঠ্যপুস্তকে যাহা লিখিত দেখিতে পায়, তাহা তাহার নিকট ধ্রুবসত্য, তাহা বেদবাণী। পাঠ্যপুস্তকে মুদ্রিত অক্ষরে যাহা লেখা রহিয়াছে তাহা ভুল হইতে পারে—ইহা তাহাব ধারণার অতীত। এইরূপ অবস্থায় ইতিহাস লেখকের অনবধানতা বা অপটুতাবশতঃ যদি একটি অপ্রকৃত ঘটনাকে বালক একবার প্রকৃত ঘটনা বলিয়া অনুমান করিয়া লইল, সে ধারণা তাহার বদ্ধমূল হইয়া যায়। চারাগাছে একটা কর্ত্তনের চিহ্নের মত, তাহার মনে সে একটি মিথ্যা ধারণা দূর প্রসারী হইতেও পারে এবং প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় যথেষ্ট আয়াস গ্রহণ ব্যাতিরেকে সেই মিথ্যা ধারনার অপনোদনও সম্ভবপর নয়। অতএব বর্ণনীয় বিষয়ের সত্যমূলকতার দিকে লক্ষ্য রাখা সম্বন্ধে শিশুপাঠ্য-ইতিহাস লেখকের দায়িত্ব অন্যান্য শ্রেণীর লেখকগণ অপেক্ষা সমধিক গুরুতর। দৃষ্টান্তচ্ছলে এই, যে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার চরিত্র বর্ণনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাধারণ ইতিহাস লেখকগণ উক্ত নবাবের চরিত্রের যতদূর ঘোর কালিমাময় চিত্র প্রদান করেন, আজ কয়েক বৎসর হইল, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাহার অনেক স্খলন করিয়াছেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতে উক্ত চরিত্র সম্বন্ধে যে ধারণা স্থান দিয়া আসিয়াছি, তাহা বিদূরিত করা সহজ-সাধ্য নয়! যে "অন্ধকূপ-হত্যা" সমুদয় পাঠকই অবিকল সত্য বলিয়া পড়িয়াছেন, অনেক প্রবীণ ও অনুসন্ধান-শীল ব্যক্তিগণ আজ কাল তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই ঘোর সন্দেহ করেন!

প্রাথমিক ইতিহাস সম্বন্ধে আর একটি বক্তব্য এই যে, সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন যেন এইরূপ ঐতিহাসিকের একটি বিশেষ লক্ষ্য হয়। শৌর্য্য, বীর্য্য, সৎসাহস, অধ্যবসায়, ন্যায়পরতা,

নিঃস্বার্থপরতার ফল অতিমনোরম, ইহা ইতিহাস হইতে সত্যমূলক দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান করা তাঁহার যেরূপ লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য, পরোক্ষভাবে আবার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা পাপের বিষময় ফল প্রদর্শন তেমন লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য নয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের অবগতির নির্মিত সত্যের প্রতি স্থিরলক্ষ্য রাখিয়া ভাল ও মন্দ উভয়ই জাজ্জল্যমান ভাবে বর্ণনা করা সঙ্গত বটে। কিন্তু শিশুদিগের বেলা ইহার একটু অন্যথা আচরণ করাই বোধ হয় সঙ্গত। অসৎকার্য্যের কুফল দেখাইয়া সৎকার্য্য প্রণোদিত দোষে তাহার ফল সম্যক্ না ফলিতেও পারে, অথবা অনেক সময় বিপরীতও হইতে পারে শিশুর শিক্ষার পক্ষে সত্যমূলক সদ্দৃষ্টান্ত দেখার সৎপথে আকষণ করা, এই সবল-নীতির অনুসরণ কর্ত্তব্য। বয়োবৃদ্ধি হইলে জ্ঞানের পূর্ণতা বিধানেব নিমিত্তে চিত্রের সম্মুখভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ উভয় প্রদর্শন করা সঙ্গত। শৈশবাবস্থায় কেবল সম্মুখভাগ দেখানই ভাল।

অতঃপর বালকপাঠ্য ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তব্য যে, প্রথমপাঠ্য ইতিহাস তাহাব স্বদেশের উপবৃত্ত-সম্বলিত হওয়াই বিধেয়। এতৎসম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজনীয়। কারণ ইহার যৌক্তিকতা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন এবং কার্য্যতঃ সেই প্রণালীই প্রচলিত আছে। আমাদিগের দেশের বালকদিগেব প্রথমপাঠ্য ইতিহাস তাহাদিগের দেশের ও প্রদেশেরই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে বটে ; তবে কথা এই, যাহাতে শৈশব হইতেই স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশপ্রীতির উদ্রেক হয়, স্বদেশের অভাব দূরীকবণ ও উন্নতি বিধানের একটি প্রচলিত আকাঙ্ক্ষা জন্মে, শিশুর হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা কত্তব্য। তাহাদের পঠনীয় ইতিহাস লেখকের হস্তে এই কর্ত্তব্য সাধনের ক্ষমতা যথেষ্ট রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহাব কত্তর্ব্য-স্থাপনেব সঙ্গে সঙ্গে বালকের মনে অনায়াসে স্বদেশানুরাগের বীজ রোপণ করিতে পারেন। তিনি সচেষ্ট হইলে এরূপ হৃদয়গ্রাহি ভাবে বালকের স্বদেশীয় কর্ম্মবীর জ্ঞানবীর ও ধর্ম্মবীরগণের চরিত্রের অবতারনা করিতে পারেন যে, তাঁহারা স্বভাবতই উহাদেব প্রতি অনুরক্ত এবং উঁহাদের পদাঙ্ক অনুসবণ করতে ইচ্ছুক হইতে পারে। সকলেই জানেন বাল্যকালে যাহারা পবস্পর একত্র ভোজনাবস্থান কালের অলক্ষ্যে যে এক প্রীতির বন্ধন সংগঠিত হয়, তাহা অন্যত্র বিরল। সেইরূপ বাল্যকালাবধি স্বদেশীয় বীর ও মনীষিগণেব সহিত মানস-জগতে একত্রাবস্থান ঘটিলে উক্ত মহাজনগণের প্রতি যে এক নৈসর্গিক অনুবাগ ও ভক্তি জম্মিলে, তাহাও অতি দুর্লভ। স্বদেশীয় মহাজনের প্রতি অনুরাগ স্বদেশবৎসলতার এক সোপান। যে কোনও মহাজনের প্রতিই দৃষ্টিপাত করা যাউক না কেন, স্বদেশের হিতসাধন চেষ্টা তাহার চরিত্রের একটি প্রধান উপাদান বলিয়া নিশ্চয়ই লক্ষিত হইবে। আমাদিগের দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ইতিহাসের আলোচনার অবিষয়ীভুত অতীতকালের মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত যত মহাজন জন্মগহণ করিয়াছেন, স্বদেশ বা স্বীয় সমাজেব হিত সাধন কাহার না লক্ষ্য ছিল? অবশ্য ইহাদের অনেকে কেবল স্বদেশ বা স্বকীয় সমাজের গণ্ডীর ভিতব বদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ সাধনেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব বালকগনেব স্বদেশীয় মহাজনগণের প্রতি অনুরাগ জম্মান ও তাঁহাদিগের ছন্দানুবর্ত্তনে ইচ্ছার উদ্রেক, আর স্বদেশানুরাগ বা স্বদেশহিত সাধন বাসনা উৎপাদন—এই দুই-ই এক কথা। সুতরাং বালক পাঠোপযোগী ইতিহাস লেখক মাত্রেরই একটি অতি প্রয়োজনীয় ও স্পৃহনীয় কর্ত্তব্য। কিন্তু ইতিহাসলেখক যদি বিদেশী হন, তাঁহা হইলে। কি আর এই কর্ত্তব্য পালনের আশা করিতে পারি? আজ

কা'ল আমাদিগের এরূপ দুরদৃষ্ট উপস্থিত হইয়াছে যে, আমাদিগের নিজ দেশের ইতিহাস নিজের মাতৃভাষায় লিখিত হইলেও তাহা পাঠোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইবে না। বিদেশী পুস্তক-ব্যবসায়ীগণের তত্ত্বাবধানে ইতিহাস সম্বন্ধে যদৃচ্ছাক্রমে যাহা লিখিত হইবে, তাহাই আমাদিগের দেশীয় শিশুগণের ধ্রুব-সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কে জানে শিক্ষার অঙ্কুরোদগম কালে এইরূপ অনৈসর্গিক ও অযৌক্তিক প্রণালী অবলম্বনের ফল ভবিষ্যতে কতদূর ভয়াবহ হইবে।

উপসংহারে বলা কর্ত্তব্য যে, ইতিহাস লেখকের যে যে বিষয় লক্ষ্য করা বিধেয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তৎসময় বিষয় গুলির প্রতি বালকের শিক্ষকেরও স্থির লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। শিশুর শিক্ষাদান ব্যাপারে লেখক ও শিক্ষক পরস্পর সাহায্যকারী। অপর, পরীক্ষাগ্রহণ-প্রণালীও পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যের অনুগামী হওয়া কর্ত্তব্য। অধীত বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ হইল কিনা, পরীক্ষা গ্রহণের ইহাই উদ্দেশ্য। সুতরাং পুস্তক-প্রণেতা ও শিক্ষক যে প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা প্রদান করেন, পরীক্ষকের তদনুবর্ত্তী হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এই নিয়মের বিপরীত ক্রিয়াও অনেক সময় দৃষ্ট হয়। পুস্তকরচয়িতা ও শিক্ষককেও অনেক সময় পরীক্ষকের মতানুসরণ করিতে হয়! সুতরাং পরীক্ষকগণের পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। মোটের উপর বালকের প্রকৃত শিক্ষার জন্য তাহার অধ্যানীয় পুস্তকরচয়িতা, শিক্ষক ও পরীক্ষক—ইহারা সকলেই দায়ী।

শ্রীকুঞ্জবিহারী হার এম, এ।

আমেরিকায় প্রথম বাঙ্গালী

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

সিপাহী বিদ্রোহের সময় কলিকাতায় যে সকল প্রধান সওদাগর ছিলেন, শিবনারায়ণ ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। ইনি জাতিতে কায়স্থ এবং বিশেষ আগমন করিয়া বাণিজ্য ব্যবসা মহাজনী, তেজারতী ও দালালী করিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জগচ্চন্দ্র গাঙ্গুলী শিবনারায়ণের বাসাবাটিতে অবস্থান করিয়া তাঁহার শিশুসন্তানদিগকে পড়াইতেন এবং আড়তের হিসাবাদি লিখিয়া দিতেন। বদান্য শিবনারায়ণ ঘোষ কয়েক সহস্র টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বোষ্টন নগরাভিমুখে প্রয়াণ করিতে সমর্থন হইয়াছিলেন। এই সময়ে আমেরিকায় দাস বক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং ভারতবর্ষে তখনও সিপাহী-উপদ্রব সম্পূর্ণ ভাবে শান্ত হয় নাই। ইংরাজ ও বাঙ্গালীরা ভয় দেখাইয়া জগতকে বলিতে লাগিল "জাহাজের সাহেবেরা তোমাকে পথিমধ্যস্থিত বন্দরে লইয়া গিয়া দাস (slave) রূপে বিক্রয় করিবে অথবা তোমার খৃষ্টান দেশে যাইবার কথা শুনিয়া খৃষ্টবিদ্বেষী ও বিদ্রোহী সিপাহীরা তোমাকে খিদিরপুরে তরবারী দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে।" কিন্তু জগচ্চন্দ্র কিছুতেই ভীত হইলেন না ; চারিমাসের সমুদ্রযাত্রায় অকুতোসাহসে আত্মসমর্পণ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ২১ বৎসর কয়েক মাস মাত্র ! ! বলা বাহুল্য তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালী আমেরিকা গমন করেন নাই। তখন সুদীর্ঘ চারি মাসকালে ভারত হইতে আমেরিকায় জাহাজ যাইত, সুতরাং নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিয়া তরুণ বয়স্ক গাঙ্গুলী সমুদ্রাতিক্রম

করিয়াছিলেন। ২৪ এ মে তারিখ অপরাহ্নে বোষ্টন নগরে জাহাজ উপস্থিত হইলে, জগচ্চন্দ্র বাষ্পীয় তরণী হইতে অবতরণ করিলেন। ঐ দিবস আমেরিকায় সর্ব্বত্র এক মহা উৎসবের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, কারণ ঐ দিন কলম্বশ কর্ত্তৃক আমেরিকার আবিষ্কারের দিন তিনশত ছয়যষ্ঠি বার্ষিক উৎসবের দিনে গাঙ্গুলি মহাশয় বোষ্টন উপস্থিত হয়েন! পাদ্রী ডল্ সাহেব মহাশয় লিখিয়াছেন "On Red letter day, the soil of America was for the first time trodden by the .. a Brahtimin. It was a memorable day for missionary annals of America" (Revd.) H. A. Dall's Memoirs. Page 284. আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া তৎসাময়িক (Boston Courier) প্রসিদ্ধ সমাচারপত্রে জগচ্চন্দ্র যে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে লেখাছিল—"ইউরোপীয় পুরুষদিগের নিকটে কলম্বশ ও অস্মিনামধেয় নাবিকেরা সর্ব্বপ্রথম আমেরিকায় আবিষ্কার করেন ইহা সত্য, কিন্তু এই আবিষ্কার বহুসহস্র সহস্র পূর্ব্বে ভারতবাসীদিগের নিকট আমেরিকা অপরিজ্ঞাত ছিল না। ভারতে লোকেরা আমেরিকাতে আগমন করিতেন এবং তাঁহাদের প্রাচীন শাস্ত্রে এই দেশের উল্লেখ আছে। হিন্দুদের মেরু পর্ব্বত আমেরিকায় অবস্থিত। কয়েক মাস কাল পরে উক্ত সম্বাদপত্রে জগচ্চন্দ্র আর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ছিল—"আমেরিকা হইতে ভারত অথবা ভারত হইতে আমেরিকা শ্রেষ্ঠতর কিনা, তাহা তুলনা করিয়া দেখিবার আমি সময় পাইয়াছি। দেখিলাম, তুলনায় কতকগুলি বিষয় আমেরিকা ভাল এবং কতকগুলি বিষয় ভারতে ভাল। আমেরিকার বিদ্যাস্পৃহা, কার্য্যকরী শক্তি উন্নয়ন লালসা, দেশহিতৈষিতা, স্বাধীনতা প্রিয়তা স্ত্রীশিক্ষা প্রথা ভারতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে জাতি প্রাধান্য ; এখানে বিদ্যা বিভব ও চরিত্র প্রধানত। আমেরিকার রমনীতে ও বাঙ্গালা রমণীতে স্বগমত্তের প্রভেদ। আমেরিকার সকলেই স্বাধীন ও সকলেই প্রধান সকলেই পরপদানত এবং সকলেই অলস ও নিজ [...অস্পষ্ট...] পরিবাব সুখের ও শান্তির পরিবার ; আমার হিন্দুভ্রাতা তাঁহার নিজের গৃহেও অত্যন্ত অসুখী, এমন কি ক্রীত দাসের সমতুল্য"। ("A Hindu is a slave even in his own house hold") ফিলোডেল্ ফীয়ার্ এক সম্বাদ পত্রে গাঙ্গুলী মহাশয় একবার লিখিয়া ছিলেন" একথা সত্য যে, ভারতবাসীর আথিয়েতা পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। অতিথির যত্ন, সেবা ও মর্য্যাদা ভারতের লোক যেমন জানে বা করে, পৃথিবীর আর কোনও সভ্য বা অসভ্য জাতি তাহা জানেনা ও করে না।" আমিও গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত একমত হইয়া সাহস সহকারে বলিতে পারি, জগচ্চন্দ্রের এই উক্তি সম্পূণ সত্য এবং সম্পূর্ণভাবে স্মরণীয়।

কিছুকাল পরে বোষ্টন নগরে হইতে মেড্ কল্ড্ নামক এক গ্রামে গিয়া বুশ্ (Bush) সাহেবের বাটীতে অবস্থান পূর্ব্বক তিনি খুব মনোযোগ সহকারে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই শিক্ষা ও আলোচনার সুফলে তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক, হিব্রু, লাটীন এবং ধর্ম্মতত্ত্ব (Theology) বিষয়েও কয়েক ঘণ্টা যাপন করিতেন। মধ্যে মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলিত প্রধান প্রধান কলেজে (বিদ্যামন্দিরে) গিয়া বিদ্যার্থীদিগের অধ্যায়ন প্রথা এবং অধ্যাপকদিগের অধ্যাপনাপ্রথা দেখিয়া আসিতেন। কিছু কাল পরে জগচ্চন্দ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া আমেরিকার সাহিত্যসভা হইতে কিছু অর্থ সাহায্যে উত্তর আমেরিকা, ক্যানেডা, মোশাচুশেট প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৬০ অব্দে বোষ্টন নগরে পুর্নগমন করেন এবং ঐ বৎসর

ইউনিটেরিয়ান গির্জ্জার খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। কয়েক মাস পরে তিনি রেভরেণ্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পাদ্রী মধ্যে পরিগণ্য হইয়া উঠেন। এই সময়ে একটি গির্জ্জার ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হয়। ইতিপূর্ব্বে আর কোনও বঙ্গবাসী আমেরিকা দর্শন, আমেরিকা ভ্রমণ, আমেরিকায় খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ অথবা তথাকার গির্জ্জার ভার প্রাপ্ত হইয়া পাদ্রীর কার্য্য করেন নাই। বৎসরের শেষে ক্যানেডা নগরীতে "ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞান" বিষয়ে জগচ্চন্দ্র যে মনোমোহনী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া ক্যানেডার বিশপ বলিয়াছিলেন, "জগচ্চন্দ্র গাঙ্গুলী এক জন অসাধারণ পুরুষ। কোনও বিদেশীয় ব্যক্তি এপর্য্যন্ত আমেবিকায় এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বক্তৃতা করিতে পারে নাই।" বিলাতের "টাইম্‌শ্‌" নামক জগদ্বিখ্যাত সম্বাদপত্রে জগচ্চন্দ্রের উপরিউক্ত বক্তৃতার সারাংশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল ; টাইম্‌স্‌ সম্পাদক মন্তব্য স্বরূপে লিখিয়াছিলেন—"মিষ্টর গাঙ্গুলীর ক্ষমতা অপূর্ব্ব। বলিবার শক্তি, চিন্তা করিবার সামর্থ্য এবং কার্য্যকরিবার প্রবৃত্তি, এই আশ্চয প্রকৃতির বাঙ্গালীতে সমভাবে বর্ত্তমান আছে। ইহার বগ্মিতা ও পাণ্ডিত্য বিশেষ প্রশংসনীয়"। নিউইয়র্কের আর এক বিরাট সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য জগচ্চন্দ্র যখন বন্ধুদিগের সহিত গমন করিতেছিলেন, তখন দেখিলেন, পথের দুই ধারে আমেরিকার লোকেরা বড় বড় ধ্বজা ও পতাকা লইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া রহিযাছে। প্রথম ধ্বজায় লেখা ছিল, "Behold a Bengali", দ্বিতীয় ধ্বজায় লেখা ছিল "A marvellous man from the other side of the sea", আর এক ধ্বজায় লেখা ছিল "A striking convert and a pious christian"

আমেরিকা পরিত্যাগ করিয়া জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিবরপুল বেলফাস্‌ট, ডব্‌লিন, মানচেষ্টার, বৃষ্টল, লিডশ, লিশেষ্টর এবং লণ্ডন ভ্রমণ করতঃ বহুল স্থানে অতীব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুমধুর কবিতা দ্বারা সহস্র সহস্র লোককে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। ইংলন্ডের লোকেরা তাঁহাকে Pundit Padre (পণ্ডিত পাদ্রী) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইংলন্ড হইতে জর্ম্মণী, সুইজরলন্ড, ফ্রান্স এবং স্পেন পরিব্রজন করিয়া জগচ্চন্দ্র গাঙ্গুলী ইটালিতে উপস্থিত হয়েন, তথায় রোমনগর দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চয্য অনুভব করেন। রোমে মহামান্য পোপের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। শীত ঋতুর মধ্যসময়ে তিনি ইটালী হইতে পুনরায় ইংলন্ড গমন করেন এবং ১৮৬১ অব্দের শেষে কলিকাতা নগরীতে উপস্থিত হয়েন।

পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, জগচ্চন্দ্র গাঙ্গুলী ইউরোপ বা আমেরিকায় মদ্যপান, তমাকু সেবন, চা বা কাফি পান অথবা মৎস্য কিম্বা মাংস আহার করেন নাই। জন্মভূমিতে আসিয়া তিনি বাঙ্গালীর বেশভূষা এবং বাঙ্গালীর ভোজন বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার গর্ভধারিণী জননীর এক পত্রের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন "আমি খৃষ্টান হইয়াছি বটে, কিন্তু অ-বাঙ্গালী হই নাই। আমি খৃষ্টান হইয়াছি বটে, কিন্তু কোনও খৃষ্টানী রমণীকে মা বলি নাই। আমার তুমিই মা। কিন্তু মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে আমি তোমারই মত ভালবাসি, তাঁরাও আমার মা।" বিলাত প্রত্যাগত বাবুগণের পক্ষে—"সাহেব সাজা মিষ্টর-বাবু"দিগের পক্ষে, জগচ্চন্দ্রের এই উক্তি মহামন্ত্র স্বরূপ হওয়া উচিত।

রেভরেন্ড জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সতীদাহ, বহুবিবাহ, চড়কে পৃষ্ঠচ্ছেদন, আসামে দাসবিক্রম, জগন্নাৎক্ষেত্রের রথে মনুষ্যহত্যা, সাঁওতালদিগের কালীমন্দিরে নরবলি, গঙ্গায় কন্যানিক্ষেপ প্রভৃতি কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম নেতা ছিলেন। নিজের চেষ্টায় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া

দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় এখনও বিদ্যমান আছে। পান নিবারণী সভা ও স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ব্যাপারে তিনি ঘোরতর পরিশ্রম করিতেন। সাহিত্যের চর্চ্চায় তিনি কখনও অমনোযোগী ছিলেন না। ইংরেজী বাইবেল খানা তাঁহার মুখস্থ ছিল, তিনি ইহার বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবকাশভাবে কার্য্য পরিত্যাগ করিতে তিনি বাধ্য হয়েন। ধর্ম্মপ্রচারে তিনি যেমন পরিশ্রম করিয়াছেন কোনও বাঙ্গালী খৃষ্টান প্রায় সেইরূপ পারে না তাঁহার পরমবন্ধু ও সহযোগী রেভেরেন্ড রুদ কহিতেন "জগচ্চন্দ্র গাঙ্গুলী, গ্রীকদেশের উলিশ দেবতার ন্যায় অধ্যাবসায়ী ও ঘোরতর শ্রমী।" প্রসিদ্ধ বাবু প্যারিচরণ সরকার বলিতেন "পাদ্রী গাঙ্গুলী একজন আদর্শ বাঙ্গালী পুরুষ, ইহাতে অসংখ্য গুণ ও শক্তি বর্ত্তমান এদেশের প্রায় সমুদয় হিতকর কার্য্য জগচ্চন্দ্র সহানুভূতি ও সম্পর্ক দেখা যায়।"

সুপ্রসিদ্ধ লেখক হুইট্‌ফিলড্ সাহেব ১৮৬১ অব্দে বিলাতের এক সমাচার পত্রে ("Hide Park Journal") লিখিয়াছিলেন* বঙ্গদেশ.হইল আগত জগচ্চন্দ্র গাঙ্গুলী (জে. সি. গাঙ্গুলী) এক অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণকে দেখে আশ্চর্য্য হইলাম। যদি ভারতবর্ষের সকল ব্রাহ্মণ এইরূপ ক্ষমতাশালী হয়, তাহা হইলে যে দেশ এক সময়ে ইংলন্ডের সমতুল্য হইতে পারিব ইহা নিশ্চয়।" এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় হুইট্‌ফিল্ড সাহেবকে লিখিয়া ছিলেন "If Aryans are now durwans in India" ; ভারতীয় আর্য্যসন্তানেরা এক্ষণে বিদেশীয়ের সামান্য বেতন দ্বারবানের কার্য্যে নিযুক্ত ! আমেরিকায় খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সময়, প্রভুগণ জগচ্চন্দ্রকে ফিলিপ (Philip) উপাধি দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে অনেকে গাঙ্গুলী মহাশয় "ফিলিপসাহেব" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। জগচ্চন্দ্র কিছুকাল কলিকাতায় ছিলেন, তদনন্তর সময় কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, হুগলী প্রভৃতি অতিবাহন করিয়া বর্দ্ধমান মিশনের ভারপ্রাপ্ত হয়েন। তিনি বর্দ্ধমান নগরে অনেককাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

আমেরিকায় অবস্থানকালে যখন তাঁহার গুণাবলী দিগদিগন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট (রাজা) বাহাদুর তাঁহাকে পাইয়া অতীব সম্ভ্রমের সহিত আলাপ পরিচয় করেন। উভয়ে কথোপকথন হইতেছে, এমন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "গাঙ্গুলীদিগের মধ্যে কোনও সম্প্রদায় ভেদ আছে কি?" জগচ্চন্দ্র উত্তরে বলেন "গাঙ্গুলীদিগের মধ্যে শ্রেণী বা সম্প্রদায় ভেদ নাই। কিন্তু ইহাঁরা সাধারণতঃ 'বঙ্গদেশে গাঙ্গুলী' এবং 'আমটের গাঙ্গুলী' নামে বিভক্ত বাসস্থান ভেদে এই দুইনাম হইয়াছে।" প্রেসিডেন্ট বাহাদুর (রাজা) মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "বাঙ্গালার লোকেরা আমেরিকাকে কি বলিয়া ডাকে?" গাঙ্গুলী কহিলেন "বাঙ্গালী ব্যবসায়িবর্গ আমেরিকাকে প্রায়ই মার্কিনমুলুক বলিয়া ডাকে।" তিনি বলিলেন "পাদ্রী সাহেব, আপনি আজ হইতে মার্কিন গাঙ্গুলী নামে খ্যাত হইলেন—"You are an American Gangooly" সেই দিন হইতে শতসহস্র আমেরিকাবাসী জগৎ বাবুকে মার্কিন গাঙ্গুলী বলিয়া সম্বোধন করিত।

পাদ্রী জগচ্চন্দ্রের অনেক গুণ ও অনেক সামর্থ্য ছিল। তিনি খৃষ্টান হইয়াও হিন্দুর পরম মিত্র ছিলেন; তিনি ইউরোপ ও আমেরিকাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু ভারতবর্ষকে তিনি তদপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন

(সমাপ্ত)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী

' Vide Weldon's Register of Facts in Occurences in literature and science.

কামাখ্যা প্রসাদ বসু : প্রাচীন হিন্দু বাণিজ্য....., শশিমোহন বসাক ; আদর্শ ও উদ্বোধন, ডাঃ রজনী কান্ত গুপ্ত : স্বাস্থ্য তত্ত্ব।

১ম ভাগ, ১২ সংখ্যা, চৈত্র ১৩১১

জানকীনাথ পাল : গৌরশীলা, আদর্শ ও উদ্বোধন, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত : গোধুলি [কবিতা], চারুশীলা পাল : আমাদের অভাব ও আমাদের উপায়, সতীশচন্দ্র সেন : পরিবর্তন [গল্প], অর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ : মুখ [কবিতা]।

২য় ভাগ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১২

পুরাতন বর্ষের কথা, জানকীনাথ পাল : শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রী প্রকাশনন্দ সরস্বতী [প্রবন্ধ], কুঞ্জবিহারী হার : রঙ্গমতী বীরেন্দ্র [গল্প] কামাখ্যা প্রসাদ বসু : প্রাচীন হিন্দু বাণিজ্য ..., অম্বিকাচরণব্রহ্মচারী ভট্টচার্য : বর্দ্ধমান ও বৈষ্ণবধর্ম [ঐ], ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল : পঞ্চমী [গল্প], কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত : কবিতাদ্বয়, শশিমোহন বসাক : ভাব ও উদাস [ঐ]।

২য় ভাগ ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২

জানকী নাথ পাল : শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য ও শ্রী প্রকাশানন্দ সরস্বতী [প্রবন্ধ], কুঞ্জবিহারী হার : রঙ্গমতী বীরেন্দ্র, শশিমোহন বসাক : ভাব ও উদাস, এককড়ি মল্লিক : সম্ভাষণ [কবিতা], পঞ্চমী [ঐ], বৰ্দ্ধমান ও বৈষ্ণবধর্ম, কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত : বিধবা [কবিতা]।

২য় ভাগ ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১২

জানকীনাথ পাল : শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে আগমন, কামাখ্যা প্রসাদ বসু : প্রাচীন হিন্দু বাণিজ্য ...., দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা : অন্তে [কবিতা], ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ সেন : মেঘনাদ [প্রবন্ধ],

বর্ত্তমান কালের সাধারণ স্ত্রীশিক্ষা

'পূরাকালে ছিল লীলাবতী খনা,
বিদুষী ললনা আর কত জনা
বহুকাল হ'তে ভারত ললনা,
মলিনা মূর্খতা আধারে।'

—এই আক্ষেপ বহুদিন হইতে শুনিতেছি এবং এই মূর্খতা আধার দূর করিবার জন্য দেশের জ্ঞানী ধনিমানিগণ বহু যত্ন—বহু আয়াস স্বীকার করিতেছেন, এবং খৃষ্টান মিশনারিগণও বহুতর বালিকা স্কুল স্থাপন করিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু শিক্ষা নামের উপযুক্ত শিক্ষা অতি অল্পই পরিলক্ষিত হইতেছে। এই প্রবন্ধ লেখিকার অতি শিশুকাল হইতে প্রবল আশা ছিল যে, স্ত্রীলোক শিক্ষা লাভ করিলে নিশ্চয়ই সীতা, সাবিত্রী ও লীলাবতী-খনার মত সরলতার প্রতিমা, পতিভক্তির প্রতিমূৰ্ত্তি হইবে। হিংসা, দ্বেষ, কপটতা, বিলাস-বাসনা, ভক্তিহীনতা, ধর্ম্মানুরাগ-শূন্যতা কলহপ্রিয়তা ইত্যাদি দোষসমূহ

তাহাদের কোমল অন্তঃকরণ হইতে পলায়ন করিয়া কোথায় যাইবে। কেবল স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নয়, সমস্ত পুরুষজাতি সম্বন্ধেও এই অপরিণামদর্শিনী প্রবন্ধ লেখিকার সম্পূর্ণ এই ধারণা ছিল যে, শিক্ষা—বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকযুবতীবৃন্দ এক আদর্শ পদার্থ হইবে। তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইবে, পাপীর পাপ-বাসনা কোথায় চলিয়া যাইবে, হিংসুক অহিংসুক হইবে, কপট সরলতা শিক্ষা করিবে, অহঙ্কারী নম্র হইবে, তাহাদের চরিত্রের মহত্ব ও সরল ব্যবহারে এই সন্তাপিত বসুন্ধরা শীতল হইয়া যাইবে। এই আশায়—এই ভরসায় বিস্ফোবিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম যে, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক ও বালিকা কাল যুবক ও যুবতী হইয়া ক্রমে আশা পুরণ করিবে। হায় ! হায় ! কোথায় সে দিন ! কোথায় আমার সেই বাল্যজীবনের প্রবল আশা ! গৃহে চতুর্দ্দিকে শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা পাশ—মহা মহা পাশ বহু বহু ভাষাশিক্ষা, দেশের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহু শিক্ষা সকলেই ভোজবাজির মত দেখিতেছি ! হায় কোথায় আমার সেই আশার স্বপ্ন ! কোথায় সীতা, কোথায় রাম, কোথায় সীতার পতিপ্রেম, কোথায় সেই স্বামীর সঙ্গবর্ত্তিণী হইয়া রাজকন্যার বনগমন,—আর কোথায় বা রামচন্দ্রের গভীর পত্নী অনুরাগের পরাকাষ্ঠা স্বণসীতার প্রতিষ্ঠা ! কোথায় সেই লক্ষ্মণের ভ্রাতৃ অনুরাগের প্রকৃত নিদর্শন বনগমন,— আর কোথায় আজিকার শিক্ষিতবৃন্দের গৃহে গৃহে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ! কোথায় পরসেবা, আর কোথায় পরপীড়ন ! কোথায় ভাবিয়া ছিলাম রমণী শিক্ষিতা হইয়া স্বর্গের দেবী হইবে, কিন্তু দেবীর সংখ্যা খুব অল্প পরিলক্ষিত হইতেছে ; অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, হিংসাদ্বেষের প্রবল ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে। আর শিক্ষাও প্রকৃষ্ট প্রণালীতে হইতেছে। তাহা পাখী পুষিয়া পড়া শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। উচ্চশিক্ষিতা মহিলাবৃন্দের এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা ও চেষ্টা যত্ন করা কর্ত্তব্য, তাহারা এজন্য দায়ীও বটেন। মিশনবি স্কুলে কি পাঠশালা ইত্যাদিতে একটু একটু শিক্ষা প্রাপ্ত বালিকাগণ সাধারণতঃ বিলাসিতার এক একটী প্রতিমা প্রস্তুত হইয়া থাকে মাত্র। তাহারা বেশভূষার পারিপাট্য সাধন, দেশীয় ও বিলাতি প্রণালীতে যথেষ্ট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ধনী ও সৌখিন পিতা, ভ্রাতা এবং স্বামীদেরও তাহাতে বিলক্ষণ আনন্দ অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে যে ভবিষ্যতে কি বিষময ফল প্রসূত হইতেছে তাহা তাঁহারা একটু চিন্তাও করেন না। যে শিক্ষার হার এই ভারতে সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর চরিত্রে গীত হইয়াছিল,—যে শিক্ষাই কেবল হৃদয়ের কোমলতা প্রশস্ততা ও ধর্ম্মপরায়ণতা ও সরলতা প্রধানের উপায় ছিল, হায় ! কোথায় সে শিক্ষা—কোথায় সেই শিক্ষক আর সেই শিক্ষালাভের উপযুক্ত কন্যারত্ন প্রেরণ করিবেন কি ?--না এভাবেই কলিকালকে আরও ঘোর কলিতে পবিণত করিবেন? কতকগুলি বর্ণমালা কণ্ঠস্থ করিয়া শিক্ষাকে শিক্ষা নামে অভিহিত করা যাইতে পারেনা ; বরং যদি এই কয়টী বর্ণমালা উদরস্থ করিলে বিলাসের খনি হইতে হয়, তবে ইহা উদরস্থ না করাও মঙ্গলের বিষয়। যদি প্রাচীনাদের মত বর্ত্তমান রমণীগণ যুবতী, ধর্ম্মপরায়ণা পতি অনুরাগিনী, পরসেবাপরায়ণ হন, তবেই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। শিশুকালের সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য কতই আয়াস স্বীকার করিলাম.— যে ছবি হৃয়য়ে শৈশবে অঙ্কিত করিয়াছিলাম, সে ছবি বাহ্য চক্ষুতে দর্শনাভিলাষে উন্মত্তা হইয়া ব্রাহ্ম, খৃষ্টিয়ান, মুসলমান ও হিন্দু নানা সম্প্রদায়ের শিক্ষিতা, উচ্চশিক্ষিতা, অশিক্ষিতা বহু রমণীবৃন্দের মুখ চাহিলাম, হায় ! ২।১টী ভিন্ন আমার সে আশার ছবি দেখিলাম না। তাহাতেই হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নাচবাসনা হিংসা-দ্বেষ

অহঙ্কার-মিলন রমণীমুখ প্রাণে শেল বিদ্ধ করে। একখানি শিক্ষিতা রমণীর মুখ যদি সরলতা পবিত্রতামাখা দেখিতে পাই,—একখানি হৃদয় যদি অহঙ্কার-কালিমায় মলিন না দেখি, তবে মনে করি যে কোটি ২ দেবতা দর্শন করিলাম। একটী শিক্ষিত যুবক যদি সর্ব্বগুণাধার দেখিতে পাই, তবে আশার প্রান আকুল হইয়া উঠে,—ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দেই। কিন্তু কি দুরদৃষ্ট,—কি মহাপাপ,—কি কলি ধর্ম্ম, সব হইল, কিন্তু যা চাই তা হইল না। শিক্ষা হইল,—উচ্চ শিক্ষা হইল,—বাঙ্গালী উন্নতির উচ্চচূড়ায় আরোহণ করিতেছে আবার পড়িতেছে আবার উঠিতেছে, কিন্তু খাটি সোণা হইতে পারিতেছে না। মনে হয় যে, পুরুষদের চরিত্র-বল যদি প্রাচীন ভারতের মত হয়, তবে স্ত্রীজাতির চরিত্র উন্নত হইবে। পুরুষ অবশ্যই স্ত্রীজাতির শিক্ষক ; তাহারা যদি চরিত্রবলে বলীয়ান হন, তবে তাহাদের স্ত্রীকন্যাও তদনুরূপই হইবে। স্ত্রীলোক অনেক সময় দেখা যায়, যেন ছানা ময়দার মত ; পুরুষ যে ভাবে গড়ে, তেমনটিই প্রস্তুত হয়। এমতাবস্থায় আমাদের বঙ্গ-সমাজের পুরুষগণ নিজদের অশেষ মঙ্গল জন্য স্ত্রীশিক্ষার সুবন্দোবস্ত বিধান করিতে যত্নবান হইবেন। কন্যাগণকে উত্তম সাজসজ্জায় পুতুলের মত সাজাইয়া শ্লেট বই হাতে দিয়া কেবল নিয়মিত সময় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেই যদি স্ত্রীশিক্ষা দিতেছে এরূপ কেহ মনে করেন, তবে সেটী বড়ই ভ্রান্তি। বর্ণমালা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনের কিরূপ উন্নতি হইতেছে,—গৃহকার্য্যে তাহারা কিরূপ সুপটু হইতেছে,—দয়াধর্ম্মে তাহারা কিরূপ শ্রেষ্ঠতালাভ করিতেছে, এ সকল বিষয় দৃষ্টি করা শিক্ষিত পিতা মাত্রেরই কর্ত্তব্য। বালিকাগণই কালে পত্নী ও জননী হইবে ; সুকন্যাই কালে সুপত্নী ও সুমাতা হয়, এবং সুমাতা হইলেই তাহার গর্ভে সুপুত্র জন্মগ্রহণ করে। কন্যাকে কেবল পালন করিলে হয় না ; এ বিষয়ে ঋষিবাক্য আছে ;— "কন্যাস্যের পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ"।— কন্যাকে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে। ভারতের প্রাচীন শিক্ষা অতি উচ্চ দরের ছিল ; এখন বালকশিক্ষারই প্রকৃষ্ট প্রণালী নাই, তাহাতে আর বালিকাশিক্ষার কি সুবন্দোবস্ত হইবে। প্রাচীন শিক্ষার ভিত্তি ধর্ম্মের উপর সংস্থাপিত হইত ; প্রাতরুত্থান হইতে স্নান 'আহার' শয়ন ইত্যাদি সকল বিষয়েই বালকগণ ধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষকদের সমীপবর্ত্তী থাকিয়া ও অধীনে থাকিয়া অতি উচ্চদরের জীবন গঠন করিতে পারিত। তাহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বা তপোবনে অবস্থান পূর্ব্বক ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে বিজড়িত সর্ব্ব প্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিত। এখনকার শিক্ষা ধর্ম্মহীন শিক্ষা, ধর্ম্মের সঙ্গে ছাত্রজীবনের যেন কোন সম্বন্ধই নাই। পূর্ব্বকার বালকবৃন্দ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সকল শিক্ষা সমাপনান্তে গৃহে যাইয়া দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসারধর্ম্ম পালন করিত। তাহাদের চরিত্রবলে স্ত্রীকন্যাগণও তেমনই সুচরিত্রা হইত। আর এখন সহরে থাকিয়া সহস্র বিলাসিতা ও প্রলোভন মধ্যে অবস্থিতি করিয়া বালকবৃন্দ কতগুলি ভাষা কণ্ঠস্থ করিয়া ও বিলাসের ফাঁস গলায় পড়িয়া ভগ্ন হৃদয়ে ও ভগ্ন শরীরে বহির্গত হয়। তাহাদের অনেকেরই শিক্ষা নিতান্ত ধর্ম্মহীন শিক্ষা হইয়া থাকে। এমন অবস্থায় সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা নিজেরাই কর্ণহীন নাবিকের মত প্রলোভনের প্রবল বাত্যায় ইতস্ততঃ পরিচলিত হয়। স্ত্রীকন্যার জীবনের উন্নতি আর তাহারা কি করিবে ;—নিজের জীবনই তাহারা সুপথে চালাইতে পারেনা, অন্যের চালক হইবে কিরূপে? সুতরাং স্ত্রীশিক্ষাও তেমনই হইতেছে। এ সকল বিপদের উপর আরও কত বিপদ আছে। অনেক বালক হয় ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ না করিতেই পুত্র-কন্যার পিতা হইয়া উঠে ; তাহারা আর স্ত্রীকন্যার সুশিক্ষা প্রদান করিবে কিরূপ?

প্রাচীনকালে শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়া উচ্চবংশীয় কোন ব্যক্তিও দাম্পত্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইত না ; বর্ত্তমান সময়ে তাহা হইতেছেনা। মাতাপিতা আদর করিয়া বালকের হাতে একটী বালিকার জীবন অনেক সময় ন্যস্ত করেন। ফল অতিশয় মন্দ হইতেছে,—বাল-বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে ; অথচ বিধবার সেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার কোন উপায় আর বর্তমানকালের অবলম্বিত হইতেছেনা। প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বালকবৃন্দ ছাত্রজীবন যাপন করিত, তৎপর পত্নী গ্রহণ করিত ; পরিণত বয়সে তাহাদের পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিত। তাহারাও সেই পুত্র কন্যাগণের সুশিক্ষা প্রথমে সম্পূর্ণ সমর্থ থাকিতেন। দুরদৃষ্টক্রমে কন্যার বৈধব্য ঘটনা হইলেও পিতার ও মাতার মহৎ চরিত্র দর্শনে কন্যাও সহজে ব্রহ্মচারিণীর জীবন গড়িতে পারিতেন। এখন বিলাসী পিতামাতার বিধবা কন্যা কিরূপে সেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইবে? এদিকে আমরা সাহেব হইতেছি এবং তাহার আধাআধি রকমের ; খাটিখুটি সাহেব সমাজের অনুকরণ করিতে পারিলে এ দুর্দ্দশা হইতে তাহার মন্দ ছিলনা। সাহেব সমাজে বিধবা-বিবাহ আছে, বিধবা-জীবনের অনেক কার্য্য আছে ; বঙ্গ-বিধবার বিবাহ নাই,—কোন সৎকার্য্য করিবার সুবিধা নাই,—ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানও নাই। সকল পথ বন্ধ,কেবল সর্ব্বনাশের পথ বিলক্ষণ প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে। আমরা ননীর পুতুল, বিলাসের খনি ; কষ্ট সহ্য করিতে পারিনা, ব্রহ্মচর্য্য করিব কিরূপে ? অথচ বিধবা-বিবাহ দিবারও সাহস নাই ; তাহাতেও কষ্ট সহ্য করিতে হয়,—সমাজ ছাড়িতে হয়,—না হয় অনেক বাদ বিসম্বাদ করিতে হয়, তাহাও পারিনা। যে সমাজের যে টুকু সহজসাধ্য, তাহাই গ্রহণ করি ; যে টুকু কঠিন, তাহা পরিত্যাগ করি। যে সমাজে বিধবার বিবাহ নাই,— যে শাস্ত্রে সতীত্বের আসন সর্ব্বোপরি, সে সমাজে বসতি করিতে হইলে—সে শাস্ত্রের পথানুসরণ করিতে হইলে রমণীগণকে জন্মাবধি ব্রহ্মচর্য্যের আভাষে গড়িতে হয়। বালিকা-বিবাহ অবাধে চলিতেছে ; বালিকা-কন্যা বিধবা হইলে তাহার পবিত্র জীবন যাপনের কোন শিক্ষা দেওয়া হইতেছেনা। ধিক্ আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ ! বালকবালিকা বিবাহ নিতান্ত দোষনীয় ; কিন্তু আমরা সুবিধা বাদী সুবিধার অনুরোধে আমরা আজ বাল্যবিবাহ মহাপাপ ঘোষণা করি, কা'ল শিশুবিবাহ পরম মঙ্গল প্রচার করি ; আজ বিধবাকে ব্রহ্মচারিণী সাজাই কা'ল ব্রহ্মচর্য্য কঠোর ও নিষ্ঠুরতা মনে করিয়া বিধবার দেহ নানা আভরণে সাজাই ;-এই স্বেচ্ছাচারী সমাজের আর মঙ্গল কিসে হইবে, ? স্ত্রীশিক্ষা— সাধারণত: যেরূপ স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে, ইহার সংশোধনে যত্ন চেষ্টা করা শিক্ষিত ও শিক্ষিতা মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী।

কেন কাঁদালে

১

চলিলে কালিয়ে কালি আসিব বলিয়ে
কাঁদায়েই গোপাঙ্গনে—হৃদয়ে দলিয়ে।
তব, রথ যতক্ষণ
দেখিলে গোপিকাগণ
তত ক্ষণ অনিমিষে তোমারে হেরিল
শূণ্যময় দশদিক, যবে না দেখিল !

২

কে বলে অক্রূর তারে—সে যে অতি ক্রূর
সেইত করিল ত গোপীরে বিধূর !
কৃষ্ণ গোপিকার প্রাণ
প্রাণশূণ্য বৃন্দাবন—
কেমনে অভাগীগণ বাঁচে কৃষ্ণ বিনে
রহিতে কি পারে জল বিনা মীনে?

৩

কৃষ্ণহারা তারা দেখহে কালিয়ে।
মৃতপ্রায় শীর্ণ-দেহ বরণ কালিয়ে
কেহবা ধরণীতলে
কেহবা তরুণ তলে
গড়াগড়ি দিতেছি হে হাহাকার করি
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি তব গুণ স্মরি।

৪

দেখ প্রাণ প্রিয়তমা তোমার শ্রীমতী
দেখহে তাহার এবে কত যে দুর্গতি।
কনক বরণী ধনী
যেন স্থির সৌদামিনী
চিন্তিয়ে সদ্য--তোমার চরণ
হইয়াছে ভাগ্যগুণে তোমার বরণ।

৫

এক কৃষ্ণ ছিলে নাথ ! বৃন্দাবন মাঝে
কৃষ্ণময় দেখ এবে হইয়াছে ব্রজে !
ভাবিয়ে তোমারে কৃষ্ণ
অন্তরে অভাব ব্রজে আর কিহে সখা
যেদিকে ফিরাই আঁখি কৃষ্ণ পাই দেখা !

৬

মনে কি হে পড়ে এবে তোমার সে রাধা
লজ্জামান তেয়াগিল, নাহি মানে বাধা !
তুমি কিহে ভাব তারে
যে মরে তোমার তরে
এবে সেই শ্রীরাধিকা হল পাগলিনী
দশম দশার প্রায় আছে সেই ধনী

৭

যমুনা পুলিনে কুঞ্জে রাখিয়ে শ্রীমতী
নিবেদিতে তুয়াপদে আতসু ভূপতি।
কিসলয় শয্যা , পরে
শোয়াইলে শ্রীমতীরে
পদ্মপত্র দিয়ে কেহ কবিছে বীজন
কেহ শীত জল গাত্রে করিছে সেচন।

৮

অচেতনে বিনোদিনী না মেলে নয়ন
শ্রীমতী দশা দেখি কাঁদে জীবগণ
পিক কাঁদে বসি ডালে
ভৃঙ্গ কাঁদে শতদল
দেহে প্রাণ বুদ্ধি আর নাহি এইক্ষণ
রাধাশূণ্য বুঝি হ'ল বৃন্দাবন !

৯

পুরাতনে এত ঘৃণা ? তাই সবপ্রেমে
মাতিয়া বুলেছ সব নিজ বন্ধুজনে।
রূপে গুণে সারাৎসাবা
জগম্মান্যা পরাৎপরা
সে রাধারে তেয়াগিলে পেয়ে কুব্জারাণী।
কি চক্ষে লেগেছে কুব্জা, জান গুণমণি।

১০

রাখাল বালক সব দেখ তোমা তবে
ম্লান মুখে বসি সদা ভাসে অশ্রুনীরে
পশু পক্ষী দেখ সব
মৌনব্রত শূন্যরব
যমুনা বহে না স্রোত—বাঁশী নাহি স্বনে
নিরানন্দ হয়ে সবে আছে তোমা বিনে

১১

শিখিকুল দেখ কৃষ্ণ শাখীর শাখায়
নৃত্য নাহি করে কেহ না বিস্তৃত পাখায়
নীরবে তমাল ডালে
শুক আঁখি নাহি মেলে
চাহেনা সারীর পানে মরমের দুখে
কোকিল কোকিলা গান নাহি করে সুখে।

১২
গাভীগণ দেখ, আর স্বর নাহি মুখে
কবলে রাখিয়ে গ্রাস তব পথ দেখে
দেখ সব বৎসগণ
নাহি পিয়ে মাতৃস্তন
ব্রজে সবে হারা হ'য়ে প্রাণের রতন
মথুরার পথ পানে চাহে অনুক্ষণ !

১৩
দেখ তব পিতা নন্দ আজি নিরানন্দ
কোন কার্য্যে নাহি মন, যেন নাহি স্পন্দ !
আর দেখ যশোমতী
কাঁদে কত দিবারাতি
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে চক্ষু দেখ অন্ধপ্রায়
নয়নের মণি বিনে দেখিতে কি পায় ?

১৪
প্রভাত হইলে দেখ হস্তে লয়ে থালা
বলে আয় বাপ কৃষ্ণ কোথা না পালা,
বহু দিন তোর মুখে
ননী দিই নাই সুখে
আয়রে নয়ন মণি হৃদয়ের ধন
হেরিয়ে জুড়াই তোর ও চন্দ্রবদন।

১৫
কি আর বলিব বল বৃন্দাবন দশা
সুখময় বৃন্দাবন শূন্যসুখ আশা।
ব্রজভূম বাস তরে
বাঞ্ছা আর নাহি করে
চল হরি গিয়ে দেখ ব্রজের জীবন।
কেন ব্রজধাম শূন্য করেছ এমন ?

১৬
কি অভাব ব্রজে বল ছিলহে তখন
কেন তবে কাঁদাইলে ব্রজবাসিগণ ?
তব পিতা রাজা নন্দ
তার রাজ্য কিসে মন্দ ?
সে রাজত্বে বুঝি তব উঠিলনা মন।
মথুরায় রাজা হ'তে এতই যতন ?

১৭

আসিব হে কালি বলি আসিলে চলিয়ে
সে কালের কত বাকি দেখনা কালিয়ে
যে জন তোমার লাগি
হয় হরি সর্ব্বত্যাগী
তাহারে কাঁদাও তুমি এই কি ধরম
রাজার বিচার দেখি পাই হে সরম।

১৮

ব্রজের অবস্থা হরি করছে স্মরণ
কত কাঁদে তব লাগি ব্রজবাসিগণ।
দিন দুই তিন তরে
চল হে আসিবে ফিরে
বিনয় করিয়া আমি বলি তব পায়
দাসীর মিনতি আজি রাখ শ্যামরায়।

শ্রীমতী চারুশীল দাসী।

২য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩১২

শ্রীমদ নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীল রঘুনন্দন সরকার ঠাকুর : বর্দ্ধমান ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, কামাখ্যা প্রসাদ বসু : শ্যাম ও কাম্বোডিয়া [প্রবন্ধ],

স্মরণ

নিশিতে যমুনা যবে লহরী খেলিয়া
কুলু গীতি-গাহি' ধায় ;
জানিনা-কাহার পানে হৃদয় তরিকা
সহসা ভাসিয়া যায়।
শশীর-কিরণ-যবে পৃথিবী ছড়ায়ে
মাতায় সুধায় হিয়া ;
তখন বদন কার হঠাৎ উপজে
বিমল মুরতি লিয়া।
সুমধুর বাঁশী সুর পশি যবে কানে
ওমণি ত্বরায় হায় ;
কার সুধা-ভরা স্বর জাগিয়া পরানে
পরান হারিয়ে যায়।
শাখার উপরে বসি' যবে পিককুল
"কুহু কুহু" মাতোয়ারা ;
কার আসি কণ্ঠরব দেয় করি'মোরে

বিভোর পাগল পারা।
"পিউ পিউ" ডাকি' যবে' 'পাপিয়া'-নিশিতে
যায় চলি' শিরোপরে ;
তখন কাহার হায় মধুমাখা বাণী
ওমণি মনেতে পড়ে।
সন্ধ্যায় যখন বেলা সেফালী মালতী
ফুটিয়া হাঁসিতে দেখি ;
তখন কাহার ছবি স্মরণ করিয়া
জলে ভরে দুটি আঁখি।

মহাম্মদ হারুণ।

রঙ্গমতীর বীরেন্দ্র, শ্যামসুন্দরী দেবীর কন্যা : দেব মাতা [প্রবন্ধ], কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত : ঘরে খেয়ে উমেদার,

সময়োপযোগী নিবেদন

দেশের প্রকৃত উন্নতি কিসে সংসাধিত হইতে পারে সে বিষয় নিয়া বর্ত্তমান সময়ে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি দুইটি মতেরই বিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হইতেছে। এক মতাবলম্বিগণ বলিতেছেন, কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স যে প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে দেশের কোনই উপকারের আশা নাই, রাজার স্বার্থের বিরুদ্ধে সভা সমিতি করিয়া রিজলিউসন্ পাশ করিলে তাহাতে রাজার দয়া হওয়া স্বভাবের বিরুদ্ধে। আমাদের নিজের পায় ভর করিয়া আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে—দেশের শিল্পোন্নতি চেষ্টা করিতে হইবে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। ভিক্ষুকের মত কেবল চিৎকার করিলে নিজেদের দীনতাই প্রকাশ পায় এবং প্রবল পক্ষের ঔদাসিন্য বৃদ্ধি হয়। আর কার্য্য দ্বার আপনাদের উপযুক্ততা প্রমাণ করিতে পারিলে তাহাতে প্রবল পক্ষের সম্মান আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

অপর মতাবলম্বিগণ বলিয়া থাকেন, আমাদের নিজেদের পায় ভর করিয়া যে আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে—দেশের শিল্পোন্নতির চেষ্টা এবং দেশমধ্যে বিশেষরূপ শিক্ষার বিস্তার যে আমাদিগকে করিতে হইবে তাহা ঠিক বটে ; কিন্তু সেই সঙ্গে রাজার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে, এবং আম্যাদের হীন পক্ষেরও যেটুকু স্বার্থ আছে, সেই স্বার্থটুকু রক্ষার জন্য, প্রকাশ্যে আন্দোলন আলোচনাও করিতে হইবে। আজ যে সমস্ত ভারতবর্ষময় এক নব জীবনের সঞ্চার পরিলক্ষিত হইতেছে—আজ যে আমরা উচ্চশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলে বুঝিতে পারিতেছি যে দেশের শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে,—আমাদের এই জ্ঞান জন্মিবার মূলও ঐ আন্দোলনে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যদি কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সের জন্ম না হইত, যদি রাজার অন্যায় আচরণ ও অবিচারের আলোচনা এবং নিজেদের অভাব অভিযোগাদির বিষয় রাজার গোচর আনিয়া তৎ-প্রতিকার জন্য প্রকাশ্য সভাসমিতিতে আন্দোলন না হইত, তবে আজ আপামর সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই নবজীবনের সূত্রপাত পরিলক্ষিত হইত কি না

সন্দেহ। সকলে দেশের অভাব বুঝিতে সক্ষম হইত না, কেবল গুটিকতক শিক্ষিত লোকের মনেই সময় সময় দেশের অভাবাদির চিন্তা উদয় হইয়া অমনি লয় পাইয়া যাইত। প্রবল পরাক্রান্ত লোকের নিকট হীন ভিক্ষুকের মত উদরান্নের জন্য চিৎকার করিলে তাহাতে ভিক্ষা না মিলিতে পারে বটে, কিন্তু ভিক্ষুকগণ স্বীয় স্বীয় জঠরানলের তীব্রতা অনুভব করিয়া পরস্পর পরস্পরের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে এবং সকলে মিলিত হইয়া জঠরানল নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে বদ্ধপরিকর হইতে পারিবে।

ঘোর তমসাচ্ছন্ন নিশিতে কোন পথভ্রান্ত পথিক যদি জনহীন প্রান্তর মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং ক্রমে হতাশামনে অগ্রসর হইতে হইতে সহসা কোন আলোক-রশ্মি তাহার দৃষ্টিপথারূঢ় হয়, তাহা হইলে সেই পথিক তথায় উপস্থিত হইয়া নিজকে নিরাপদ বিবেচনা করিয়া যদি সেই আলোক নিরাশ করিয়া দেয়, তবে সে নিশ্চিন্তে সেস্থানে সময় কর্তন করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার পরবর্তী কোন পথিককে সেস্থানে আকর্ষণ করিবার আর কিছু থাকে না ; সে আঁধারেই ঘুরিতে থাকিবে। তদ্রূপ বালসূর্য্যের তরুণ—আলোকের মত যে রাজনৈতিক আন্দোলন-শিখার মৃদু জ্যোতিঃতে আজ কোটি কোটি ভারতবাসী কর্তব্যপথ ধরিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই নব প্রজ্জ্বলিত শিখাটুকু যদি নিভাইয়া দেও, তবে আমাদের পরবর্তী সম্প্রদায় আর এ পথে প্রবেশ লাভ করিবার সুবিধা পাইবে কি প্রকারে? সে অবস্থায় আমরা বর্তমান সম্প্রদায়ের কতক লোক দ্রোণাচার্য্যের নির্মিত ব্যূহে প্রবেশকারী অভিমন্যুর মত স্বীয় স্বীয় কর্তব্য সাধন করিয়া দেহপাত করিতে পারিব বটে, কিন্তু আমাদের পরবর্তী সম্প্রদায়ের কেহ আর ব্যূহ প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদের আরব্ধ কার্য্যের জীবনীশক্তি রক্ষা করিবার সুযোগ পাইবে না।

উপরে ক্রমে দুই পক্ষের মতই বলা হইল। এখন এই উভয় মতের কোনপ্রকার সংঘর্ষণ না হইয়া সংমিশ্রণ হইতে পারে কিনা সেবিষয় বিবেচনা করা উচিত। দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করা এবং দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা যে এখন আবশ্যক, এ সম্বন্ধে কোন মত ভেদ নাই। তবে বতমান প্রণালীতে রাজনৈতিক আন্দোলন করা সঙ্গত কি না, সে সম্বন্ধেই দুই পক্ষের মত বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইহার স্বপক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় যতই যখন ক্ষমতাবলী লোকগণ দ্বারা পরিপোষিত, সে অবস্থায় স্বীয় স্বীয় মতের সমর্থন জন্য কোন পক্ষেই যুক্তি তর্কের অভাব হইবে না ইহা নিশ্চয়। এইরূপ মতদ্বৈধতা দরুণ দেশের সার্ব্বজনিক মঙ্গলকর কার্য্যে যদি উভয় পক্ষ একতাপাশে আবদ্ধ না হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়—অন্তত ততদূর না করিলেও যদি পরস্পর পরস্পরের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক সহায় না হয়—তবে দেশের অধঃপতন অতি নিকটে জানিতে হইবে।

রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে যদি উভয় পক্ষের মতের সামঞ্জস্য রক্ষা অসম্ভব হয়, তবে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া, একপক্ষ অপর পক্ষের অনুষ্ঠিত কার্য্য সুসাধনার্থ সে পক্ষের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে সহায় হওয়াই উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যেন কোন কোম কার্য্যে এই ওচিত্যের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে, মতের বৈষম্য দরুণ, সাধারণের হিতকর কোন কার্যো সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে, শিক্ষার গৌরব আর কিছু তাকে বলা যাইতে পারেনা। কাজেই আর কিছু থাকে বলা যাইতে পারেনা। কাজেই আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, যে কোন পক্ষ যখন

দেশ হিতকর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান তৎপ্রতিপক্ষগণ যেন সেই কার্য্য "জননীর সুখ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আপন ভ্রাতার নিঃস্বার্থ চেষ্টা" ভাবিয়া, মত বৈষম্য ভুলিয়া, অন্তরের সহিত যে কার্য্য সংসাধনে ব্রতী হন।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন।

অক্ষয়কুমার গুহ, স্মৃতিশাস্ত্রের সংখ্যা নির্ণয়, জীবেন্দ্রকুমার রায় : দূর হতে [কবিতা]

২য় ভাগ ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২২

জানকীনাথ পাল : মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ, নৃত্যলাল মিত্র :- চিন্তা [কবিতা], শশিমোহন বসাক : লক্ষণ ও অর্জ্জুন [প্রবন্ধ],বরদাচরণ চক্রবর্তী : প্রকৃত পশু [কবিতা], ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী : হেমবাবুর উইল [গল্প],

প্রতিজ্ঞা।

বিগত ২২শে শ্রাবণ সোমবার দিবস কলিকাতা 'টাউন হলে' বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে প্রতিবাদ জন্য যে মহতী সভা আহূত হইয়াছিল, তাহা সমগ্র বাঙ্গালীজাতির পক্ষে একটী সবিশেষ ঘটনা। উক্ত সভাতে 'ইন্ডিয়ান মিরারের' বিজ্ঞবর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় যে তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং যাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাতে পরিগৃহীত হইয়াছিল, উক্ত প্রস্তাবটি প্রত্যেক বাঙ্গালীর—শুধু বাঙ্গালীর কেন, সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে শোণিতাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। প্রস্তাবটির স্থূলমর্ম্ম এই : —আমরা সাধ্যমত বিদেশীয়—বিশেষতঃ বিলাতী জিনিষ বর্জ্জন করিয়া দেশীয় জিনিষ ব্যবহার করিব। ঐ স্মরণীয় দিবসে, সমগ্র বাঙ্গালীজাতির প্রতিনিধিমণ্ডলী সমবেত হইয়া দেশীয় জিনিষ ব্যবহার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।

টাউনহলে যে প্রতিজ্ঞাবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিধ্বনি সুদূর পল্লীর নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া শতকোটি বাঙ্গালীর নিবাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়াছে। বাঙ্গালী ভাবিতেছে, বুঝি বা দিন ফিরিল। তাই আজ আশায় বুক বাঁধিয়া দেশে দেশে, নগরে নগরে, পল্লীতে বাঙ্গালী দলবদ্ধ হইয়া প্রাণপণে সভা-সমিতি করিতেছে এবং প্রাণের সমস্ত বল সমবেত করিয়া দেশীয় জিনিষ ব্যবহারের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে এবং অপরকেও উৎসাহিত করিতেছে। যেখানে যাও সেই খানেই শুনিতে পাইবে, "দেশীয় জিনিষ ব্যবহার কবিব" "দেশের জিনিষ তুচ্ছ হইলেও, উপেক্ষার বিষয় নহে", "বিদেশীয় জিনিষ স্পর্শ করিব না।" আজকাল সর্ব্বত্রই এই প্রকার মঙ্গলময় প্রতিজ্ঞায় আশাপ্রদ বাণী শ্রুতিগোচর হয়। কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি যুবক, সকলেই যেন দেশীয় জিনিষ ব্যবহার ও দেশীয় শিল্পের উদ্ধারের জন্য মাতিয়া উঠিয়াছে। এমন কি অন্তঃপুরবাসিনী সীমন্তিনীগণও উদাসীনা নহেন। এ উৎসাহে তাঁহারাও মাতিয়াছেন ; এ দেশময় বন্যার ঢেউ তাঁহাদেরও গায়ে লাগিয়াছে। যাহারা বৃদ্ধ তাহারা বলিতেছেন, এ প্রকার সার্ব্বজনীনভাব আমরা কখনও দেখি নাই। বরিশালের সেই ঝালকাঠির মুচির কথা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। পুলিশের এক দারোগা বাবু বিলাতী জুতা মেরামতের জন্য ঐ মুচির নিকট দেন। চর্ম্মকারপ্রবর "আর বিলাতী জুতা সলাই করিব না" বলিয়া জুতা দূরে নিক্ষেপ করে। সেই চর্ম্মকার ধন্য। তাহার হৃদয়ে

স্বদেশানুরাগ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। দেশটা হঠাৎ দেশীয় জিনিসের জন্য মাতিয়া উঠিল কেন? কাহার সুমঙ্গল মধুর আশ্বাস বাণীতে, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আজ সমস্ত বঙ্গদেশ বিচলিত? ম্রিয়মাণ বাঙ্গালীর বিষাদ হৃদয়ে আজ জননী জন্মভূমির সুধামাখা নাম স্মরণ করাইয়া কে অমৃতরাশি সিঞ্চন করিল? বঙ্গদেশ আজ লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গবিচ্ছেদরূপ দারুণ অশনি নিপাতে বিদীর্ণ-হৃদয়। এমন দুর্দ্দিনে, ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশার দুর্ভেদ্য তামিশ্রের অন্তরালে অশনিপাত-সহচারিণী সৌদামিনীর ক্ষণিক আলোকে কে আজ বাঙ্গালীর কর্তব্য নির্দ্ধারণের ছলে সমগ্র ভারতবাসীর কর্তব্যেব ছায়া প্রদর্শন করিল? করভার-প্রপীড়িত, দুভিক্ষ-বিদীর্ণ, ব্যাধিজাড়িত, দুর্ব্বল, নিঃসহায় দরিদ্র ভারতবাসী পথ হারাইয়া অনাথ বালকের ন্যায় "কঃ পন্থা"—"কঃ পন্থা" বলিয়া কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে ছিল, আজ বহু দিনের পর সৌভাগ্যক্রমে তার কর্তব্যের পথ নয়নগোচর হইয়াছে, তাই বিষাদের দিনেও বাঙ্গালীর ঘরে২ আনন্দময়ী আশাবাণী ঘোষিত্ হইতেছে। পাঠক! এ আশাবাণী কি তোমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে? যে স্বদেশ-প্রেমের ঢেউ আজ সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছে, সেই পবিত্র ঢেউএর কণা কি তোমার গায়ে স্পর্শ করিয়াছে? 'স্বদেশ'—'স্বদেশী'র নাম উচ্চারিত হইলে কি তোমার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব সুধাধারা ক্ষরিত হয় না? যে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির স্নেহময় ক্রোড়ে আজন্ম পরিবর্দ্ধিত হইয়াছ, স্বর্গাদপি গরীয়সী সেই স্নেহময়ী জননীর অপরিশোধিত ঋণ পরিশোধ করিবার কি এই উপযুক্ত অবসর নহে? আজ সমগ্র বঙ্গসন্তান স্বদেশের হিতসাধনার যে মহৎ ব্রত অবলম্বন করিয়াছে, তুমি বাঙ্গালী হইয়া কোন্ প্রাণে সে বিষয়ে উদাসীন থাকিবে? সেই মহৎব্রত যদি এখনও অবলম্বন না করিয়া থাক, তবে এই মুহূর্তে সংযতচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া অমৃতময়ী জন্মভূমির নাম স্মরণ পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মবিধাতা, অসীম মঙ্গলময় ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া সেই পবিত্র ব্রত ধারণ কর। আজ হইতে প্রতিজ্ঞা কর,—আর বিদেশী জিনিষ স্পর্শ করিবে না; স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিবে। আর বিলম্ব করিওনা। অনেক বিলম্ব হইয়াছে। একই মাতৃক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত তোমার স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের ন্যায্য দাবী বহুদিন উপেক্ষা করিয়াছে। তুচ্ছ বিলাতের অলীক কুহকে বলিয়া নিজের অর্থরাশি পরের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক বহুদিন তোমার অর্থকোষ নিঃশোষিত হইয়াছে। এই দেশ, একদিকে শীর্ণ-কলেবর অর্দ্ধ নগ্নকার লক্ষ২ তাঁতি কর্ম্মকার হাহাকার করিয়া হা অন্ন হা অন্ন বলিয়া তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান। অপরদিকে, ব্রহ্মাণ্ডলোলুপ সর্ব্বার্থগ্রাসক স্বার্থান্ধ বৈদেশিক স্বার্থবহগণ, নিজ ২ স্বার্থভার করে গ্রহণ করিয়া আপাতঃ-মধুর বিলাস সামগ্রী যোগাইবার ছলনায় তোমার অর্থরাশি শোষণ করিবার অভিপ্রায়ে তোমার দ্বারে করাঘাত করিতেছে। কর্তব্য নিদ্ধারণ কর। আর নীরব থাকিলে চলিবে না।

সমগ্র বঙ্গদেশ আজ আন্দোলনের বিষম তরঙ্গে উদ্বেলিত। চতুর্দ্দিকে মহাহুলস্থূল পড়িয়াছে। সকলেই নবীন উৎসাহের সহিত বিদেশী বর্জ্জনরূপ মহান উদ্দেশ্যের দিকে নিজস্ব বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইতেছে। নব অনুরাগের প্রাবল্যে দিশাহারা হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া না পড়ি, তজ্জন্য সুচতুর বর্ণধারের প্রয়োজন। কাহার পরামর্শ আশ্রয় কবিযা, আমরা গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারিব? কে আমাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে প্রতিজ্ঞাসমুদ্রের পরপারে লইয়া যাইবে? সত্যবটে, বঙ্গাধিবাসী সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বজন-মনোহর শ্রুতি-সুখকর সুচতুর বাক্যবিন্যাসে শ্রোতৃবর্গের অশেষ তৃপ্তিসাধন করিয়াছে;—সত্য বটে, বঙ্গাধিবাসী কঠোর রাজনৈতিক কর্তব্যের অনুশাসনে তীব্র-বচন-কটাক্ষে রাজপুত্রদিগের

মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশে তাহাদের কর্ত্তব্যের পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছে। বিষয় সমস্যার দিনে,—বিশেষ পরীক্ষার দিনে অনেক গুরুতর ভাব সম্পন্ন করিয়া থাকিলেও, এই আন্দোলনের সময়, বঙ্গের অধিনায়কদিগকে বিশেষ সাবধানের সহিত কার্য্য করিতে হইবে।বর্ত্তমানে তাঁহাদের কর্তব্যভাবে অতীব গুরুতর। আর সভা-সমিতি করিয়া বক্তৃতার প্রয়োজন নাই। সকলেরই লক্ষ্য স্থির হইয়াছে। কি প্রকারে লক্ষ্য স্থানে উপনীত হওয়া যায়, তজ্জন্য পরামর্শের প্রয়োজন। বঙ্গের পরিণতবয়স্ক বৃদ্ধগণ একত্রিত হইয়া পরামর্শ করুন। আমাদের প্রয়োজনানুযায়ী দেশী জিনিষের যে প্রকারে আমদানী হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করুন। যে পর্য্যন্ত দেশী জিনিষের প্রচুর পরিমাণে আমদানী না হয়, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই ক্ষান্ত কি নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। দেশের শুভ মুহূর্ত উপস্থিত। জাতীয় জীবনে এই প্রকার সুযোগ একবার বই দুইবার আসে না।

শ্রীহরকুমার সাহা।

ক্ষিতীশচন্দ্র রায় : "আজি তার শেষ" [কবিতা],

মুসলমান কবির বাঙ্গালা গীত।

বর্তমান কালের শিক্ষার অনুপাত মত বঙ্গভাষার প্রতি বঙ্গীয় মুসলমানগণের ততটা অনুরাগ বা সহানুভূতি নাই, ইহা অনেকাংশে সত্যকথা। পূর্ব্বকালে কিন্তু এরূপ অবস্থা ছিল না। সে কালে সাধারণ জনগণ মধ্যে শিক্ষার প্রসার ছিল না। সেই কালেই বঙ্গভাষার প্রতি এতগুলি লোকের এমন আগ্রহ ও সেবাপরায়ণতা দেখা যায় যে, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। প্রাচীন হিন্দু কবিগণের ত সংখ্যাই করা যায় না,—তাঁহাদের পার্শ্বে মুসলমান কবিগণও একটা বৃহত্তর অনুপাতের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। মুসলমান কবিগণের আবিষ্কার করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে কোন চেষ্টা হয় নাই। সেরূপ কোন্ অনুষ্ঠানে হস্তপেক্ষ করিলে তাহা যে আশাতিরিক্ত সফলতামণ্ডিত হইবে, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ এখন অল্প অল্প বঙ্গভাষার অনুশীলনে অগ্রসর হইতেছেন। আশা করা যায়, তাঁহাদের স্বজাতীয় প্রাচীন কবিগণের কীর্তিরাজির উদ্ধারে ব্রতী হইয়া তাঁহারা অনতিকাল-বিলম্বেই স্বজাতির কলঙ্ক—কালিমা অপসারিত করিতে সচেষ্ট হইবেন।

প্রাচীন সাহিত্যের বিরাট কলেবর। ইহার বহুলাংশ কালের করাল কবলে পতিত হইয়া চিরদিনের মত বিনষ্ট হইয়া গেলেও এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাই ঢের বলিতে হইবে। এই নষ্টপ্রায় অংশটিও আবার আমাদের অবহেলায় বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। অল্প কয়েক বৎসর হইল, বঙ্গীয় শিক্ষিত লোকগণের মধ্যে কয়েকজন মহাশয় লোকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়ায় ইতিমধ্যে বহুল প্রাচীন সাহিত্যকীর্তি আবিষ্কৃত ও লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়াছে। তাহাতে আমাদের দীনা বঙ্গভাষার অঙ্গ যে বিশেষরূপে পরিপুষ্ট এবং সৌন্দর্য্য ও গৌরবমণ্ডিত হইয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

বোধ হয় সকলেই জানেন যে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার-কল্পেই 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের'[১২৬] সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমিতির সৃষ্টি অবধি প্রাচীন সাহিত্য-বিভাগের যতটা কাজ হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলেই কেহ বিস্মিত না হইয়া পারিবেন না। আমরাও 'সাহিত্য-পরিষদের' সদুদেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তৎসাহায্য-কল্পে এ অঞ্চলে প্রাচীন

সাহিত্যের উদ্ধার কার্য্যে ব্রতী আছি। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে যাইয়া সময় সময় আমরা বঙ্গদেশে মুসলমান কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের সে আনন্দ-পরিপ্লুত বিস্ময় যে কেবল হৃদয়েই চাপিয়া রাখিয়াছি, তাহা নহে ; আমরা সাহিত্য সংসারে তাহার সুপ্রচারেও পরাঙমুখ হই নাই। এ পর্য্যন্ত আমরা বহুল মুসলমান কবির আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি। অদ্য 'নববিকাশের' পাঠকবৃন্দের গোচরো কয়েকজন মোসলেম কবির সামান্য পরিচয় উপস্থিত করিবার জন্য প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

বর্তমান স্থলে আমরা কেবল ৫টি মাত্র সঙ্গীত প্রকাশিত করিয়াছি। এই পাঁচটি সঙ্গীতের মধ্যে একটি সঙ্গীতের রচয়িতার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় নাই। অবশিষ্ট গীতগুলির ভণিতিস্থলে সৈয়দ জাফর, আলি রাজা (রেজা), রুস্তম (আলী) এবং আলী মিঞার নাম দেখা যায়। সৈয়দ জাফর একজন শাক্ত কবি। তাঁহার নাম আমরা ইতঃপূর্ব্বে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' শুনিয়াছি বটে ; কিন্তু কোন পরিচয় পাই নাই। মুসলমান কবিগণের মধ্যে আরো দুইজনে শাক্ত সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে দুইজন—মির্জ্জা হুসেন আলী ও এই প্রবন্ধোক্ত আলী রাজা (রেজা) বটে।

আলী রাজা চট্টগ্রাম বাঁশখালী থানার অন্তর্গত 'ওশখাইন' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বড় রকমের ফকির ছিলেন। এজন্য সাধারণতঃ তিনি 'কানু ফকির' নামেই অভিহিত হইতেন। তাঁহার সাধনাদি সম্বেন্ধে এদেশে নানা অদ্ভুত কথা শুনা যায়। তাঁহার পীর বা দীক্ষা-গুরুর নাম সাহ কেয়ামদ্দিন। জ্ঞান-সাগর, সিরাজ-কুলুপ, ধ্যানমালা নামে তাঁহার রচিত তিনখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন 'যোগ-কালন্দর' নামক গ্রন্থ খানিও তাঁহার রচিত বলিয়া অনুমিত হয়।

রুস্তম আলী চট্টগ্রাম—পটীয়া থানার অন্তঃপাতী 'সাহামীরপুর' গ্রামে জন্মলাভ করেন। তিনি সাধারণ্যে 'পণ্ডিত' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সঙ্গীত-বিদ্যায় জ্ঞানী হইলে সাধারণতঃ তাঁহাকে এদেশে 'পণ্ডিত' বলা হয়। সুতরাং উক্ত বিদ্যায় তাঁহারও যে কতকটা জ্ঞান ছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

আলী মিঞাও 'পণ্ডিত' আখ্যাধারী। তাঁহার জন্মস্থান পটীয়া থানার অন্তর্গত 'শ্রীমাই' গ্রাম। তদীয় পিতার নাম হাসিম পণ্ডিত। হাসিম পণ্ডিতও একজন কবি ছিলেন। আলীমিঞা লোকান্তরিত হইয়াছেন, বড় বেশী দিন হয় নাই। অধুনা তাঁহার এক ভগ্নী মাত্র জীবিতা আছেন।

আমরা সংক্ষেপেই সকলের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিলাম। এখন আমরা তাঁহাদের রচিত গীত গুলি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি :—

(১)

গারা ভৈরবী--আড়াঠেকা।

কেন গো ধরেছে নাম দয়ালয়ী তারা,
(এ মা দয়াময়ী তারা) !
আমাদের কি দিবে ধন, নিজে তোমার নাই বসন,

বসন থাকিলে কেবা উলঙ্গিনী রয়।
জনম ভিখারী পতি, জনক নিষ্ঠুর অতি,
এ কুলে ও কুলে তোমার দাতা কেহ নয়!
সৈয়দ জাফর তরে, কি ধন রেখেছে ধরে,
সম্পদ দুখানি পদ হরের হৃদয়॥

(২)

কর্ণাট।

প্রিয় হে, তুমি বিনু কে জানে মরম।
তুমি বৃদ্ধ তুমি যুবা তুয়া সে বালক॥
জ্ঞান ধ্যান রূপ তুমি ভাবিনী ভাবক।
হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি কেলিকলারসরঙ্গ।
তুয়া সে বরণ বাবি* সাগর তরঙ্গ॥
কহে আলী রাজা পীর পদ করি সার।
জানিয়া না করা দয়া মহিমা তোমার॥

(৩)

গভীনে ডুবাইল নৌকা কৃপাময় ধনী,
রে মন (শুন মোর বাণী।)
সপ্ত হাত পানির নীচে হরিণী ঘাস খায়।
পাথরেতে ধৈরছে ঘুণে কেবা প্রত্যয় যায়॥
পাথরেতে ধৈরছে ঘুণে প্রত্যয় যাইব কে?
মার বিহার দিন বাপ মরি গেল্ জন্ম দিল কে?
মার বিহার দিন বাপ মরিয়া গেল্ তাতে কিবা আন।
আণ্ডার ভিতর বাচ্চা মৈল কোন্ দি গেল্ পরাণ
ধর ভাঙ্গি হাতিনা* পৈল, উঠান নিল স্রোতে।
দর্গ্যারে+ বৈরছে পানির তিরাষে, আগুন মরের# শীতে
দীন রুস্তমে কহে, তুমি কোন্ গিরস্থের# ঝি?
তলইর‡ ধান চডুইএ খাইল জবাব দিবা কি?

* বাবি—বায়ু
* হাতিনা—গৃহের অংশবিশেষ।
\+ দর্গ্যারে—দরিয়ারে; সমুদ্রকে।
\# মরের—মরিতেছে।
\# গিরস্থের—গৃহস্থের।
‡ তলাই—যাহার উপর রাখিয়া ধান্য শুষ্ক করা হয়।

(৪)

রসিক বাঁকা চিন্‌লি না তুই কেমন জন,
মন রে মন !
রসিক মৈলে বুঝ্‌তে পারে,
রসিকের দরদ,
যেবা হয় বিশারদ ;
ইঙ্গিতে সে বুঝতে পারে ঐ রসিকের আলাপন।
কদম ডালে নন্দলালে মুরলী বাজায়,
রাধিকা জল ভরিতে যায় ;
হাসি হাসি প্রাণ–প্রেয়সী
বসন দি' ছাপাই বদন॥
আলী মিঞা কহে গো তবে মনের বাঞ্ছা·সার,
কর যৌবন দান ;
মনেব আশা পুরাইলে দিম্‌‡ ...রে সোণার বাজুবন॥

৫

তন~ বলে মন যাই ও না রে !
তন বলে যাই ও না শ্যাম বারুণীর স্নানে। ধূ।
মনে হাসে তনে কান্দে মনুরা গাহে গীত।
উড়ি গেল পিঞ্জরার শুয়া ভাঙ্গি গেল পিরীত॥
তনে বলে ওরে মন সঙ্গে লই যা' মোরে।
কোন্ দোষে ফেলিয়া যাও শূন্য একাশ্বরে॥
(ওরে মন রে) মনে বোলে ওরে তন
সঙ্গে নিম্* তোরে।
তোমার লাই* . রাখ্যাছম্ ঘর
জোড় পুকুরের পাড়ে॥
উড়িতে উড়িতে শুয়া ধরিল আকাশ।
শুয়া বিনে পিজরারে দিনান্তের উপবাস~ ॥
মনের নাও পবনের খেওয়া গাছে রৈল বৈয়া।
মাওলাজীর নিজ নাম মুর্সিদে দিল কৈয়া।

‡ দিম=দিমু ; দিব।
~ তন=তনু ; দেহ।
* নিম্=নিমু ; নিব।
* লাই=লাগি ; জন্য।
~ উপাস=উপবাস।
বাধিকালাল সাহা : মৃত্যু [কবিতা]

এই প্রবন্ধধৃত ৩য় ও ৫ম গীত দুইটি কেমন প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়। পাঠকগণের মধ্যে কেহ উহাদের সরলার্থ করিতে পারেন কি?

শ্রী আবদুল করিম।

২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩১২

জানকীনাথ পাল : মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ [প্রবন্ধ], ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী : হেমবাবুর উইল, শশিমোহন বসাক : লক্ষণ ও অর্জ্জুন, হরেন্দ্রনাথ সাহা রায় : বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে "সুখেদা ও সহায়", হরগোবিন্দ শিরোমণি কাব্যতীর্থ : কাব্য-কুঞ্জ [কবিতা], দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা : অঙ্গলি [ঐ], শরচন্দ্র সাহা : সন্নাসী [কবিতা], নরহরি সরকার ঠাকুর প্রমুখ : বর্দ্ধমান ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল : পশ্চিম বন্দেলখণ্ড, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী : বুদ্ধদেবের অন্তিম অবস্থা,

স্বদেশী আন্দোলন

"Justice rules the world.

Truth rules the world.

Love rules the world.

Justice, Truth, Love, make all men one, as they are moved by common impulse, common sympathies and common interests, I believe in the ward of nations, in the youth of nations, in their maturity, decline, death and resurrection"

Rev. Protap Chandra Mazoomdar.

ন্যায় এই জগৎকে শাসন করিতেছেন। সত্য এই জগৎকে শাসন করিতেছেন। প্রেম এই জগৎকে শাসন করিতেছেন। ন্যায়, সত্য, প্রীতি সমগ্র মনুষ্যজাতিকে একাত্মভাবাপন্ন করিতেছেন। কারণ সকলেই একই বস্তুর আকর্ষণে পরিচালিত হইতেছেন, একই রূপ অনুভব করিতেছেন, একই বস্তুকে লাভ করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রত্যেক জাতিরই শৈশবাবস্থা আছে, যৌবনাবস্থা আছে, পরিপক্ক অবস্থা আছে,—জড়া, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম আছে।

এখন প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়েই এই প্রশ্ন সমুদিত হইয়াছে।—আর্য্যজাতির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শাখার,—হিন্দুস্থানবাসীর হিন্দু, সেমিটিক ও ইরাণী শাখার,—ভারতবর্ষের হিন্দু, মুসলমান ও পার্শী নামধেয় আর্য্যজাতির এই তিন শাখার পুনর্জ্জন্ম, শৈশবাবস্থা ও যৌবনাবস্থা আছে কিনা? ভারতীয় আর্য্যজাতির জড়া ও মৃত্যু যে আছে তাহা স্থির নিশ্চিত, কারণ আমরা এখন মৃত। আমাদের পুনর্জ্জন্ম হইবে কিনা, ইহাই এখন বিষম সমস্যা।

পুরাবৃত্তে আছে, একদিন মহারাজ বেলশেজার স্বীয় কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন একখানা মৃত হস্ত তাঁহার সম্মুখের প্রাচীরে এই কথা লিখিয়া দিল 'তোমাকে পরিমাপ করা হইয়াছিল, কিন্তু তুমি ওজনে অল্প হইয়াছ।" বলা বাহুল্য যে সেই সময়

হইতেই বেলশেজারের অধঃপতন হয়। প্রত্যেক জাতিকে ভগবান্ই পরিমাপ করেন এবং ন্যায়, সত্য ও মনুষ্য-প্রেম—যাহার অপর নাম ভগবৎপ্রেম, তাহাই বাটখারা। ভারতীয় আর্য্যজাতিও এই ন্যায়, সত্য ও মনুষ্যপ্রেম দ্বারাই পরিমিত হইয়াছিলেন এবং ওজনে হাল্কা হওয়ায় উন্নত, সভ্য, স্বাধীন জাতির গণ্ডীর বাহিরে পরিয়াছেন। কে জানে ইংলণ্ডের ইংরেজ-জাতিও এই সময়ে ন্যায়, সত্য ও মনুষ্যপ্রেমরূপ বাট্খারা দ্বারা পরিমিত হইতেছেন কিনা এবং তাঁহাদের ওজন হ্রাস ও লঘু হইয়াছে কিনা? বাঙ্গালী কবি কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বেই গাহিয়াছেন—

সেভাব থাকিত যদি, পার হয়ে সিন্ধুনদী,
আসিতে কি পারিত যবন?

আর্য্যজাতির এই দুর্দ্দশা ও দুর্দ্দিনের সময় সাধক দেখিলেন যে ন্যায়, সত্য ও প্রেম প্রতিষ্ঠাতা ভগবানের শবণাপন্ন হওয়া ভিন্ন মৃতজাতির পুনরুত্থানের উপায়ন্তর নাই। তাহাতেই সাধক গাহিয়াছেন—

"তব পদে লই শরণ,
প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্য্যদের প্রিয়ভূমি, সাধের ভারতভূমি,
অবসন্ন আছে অচেতন হে;
একবার দয়া করি, তোল করে ধরি,
দুর্দ্দশা আঁধার তার করহে মোচন।
কোটি কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়ন বারি,
অন্তর্যামী জানিছ সে সব হে;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে,
অসাব শরীরে পুনঃ দেওহে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন, অচেতন পরাধীন,
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে:
সেই কৃপ ঋণে, দেখি শুভক্ষণে,
সাধের ভারতে পুনঃ আনহে জীবন॥"

মানবজাতিব ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কালিকারূপিনী এক মহাশক্তি শক্তিমানের প্রেমরাজ্য, ন্যায়রাজ্য, ও সত্যের রাজ্য জগতে সংস্থাপন করিবার জন্য এবং অন্যায়, অসরা ও অপ্রেমের উপাসক অসুরদিগকে সংহার করিবার জন্য নিরবধি জগতে কার্য্য করিতেছেন। তিনি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে হে মানবগণ! ন্যায়পবায়ণ, সত্যপরায়ণ ও প্রেমিক হও এবং বর গ্রহণ কর, আমি বর দিতে আসিয়াছি।" তিনি বামহস্তে খড়গ গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন যে "হে অসুরগণ! যদি কিছুতেই তোমাদের আসুরী প্রকৃতির পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে এই খড়গদ্বারা তোমাদিগকে নির্ম্মূল করিয়া ধরার অসুরভার সংহরণ করিব। "জগতেব কত জাতি বর গ্রহণ করিয়া কালীর বরপুত্র হইয়াছিলেন, কালপ্রভাবে সর্ব্ববিষয়ে যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হইয়া অধোগতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই আর্য্যজাতি ভগবানের অতি প্রিয়, ভগবানের মনোনীত জাতি; তিনি ভালবাসিয়া ইহাকে মনোজ্ঞ ভূষণে, মনোহর শারীরিক সৌন্দর্য্যে ও উন্নত বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে বিভূষিত করিয়াছেন এবং

ইহাদের বাসভূমিকে "সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা, শস্যশ্যমলা" করিয়াছেন। তবে এই আর্য্যজাতি মৃতপ্রায় নিদ্রায় অচেতন কেন? দেখা যায় কোন অত্যাশ্চর্য্য মোহান্ধকারে আমাদিগকে ঘেরিয়াছে, কোন সম্মোহনী শক্তি প্রভাবে আমরা আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া ছায়া যেমন বস্তুর অনুকরণ করে, তদ্রূপ অন্যান্য জাতির ক্রীড়নক হইয়া পড়িয়াছি। এই কুহক অপসারিত হইলে,—আমরা আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে,— আমাদের নিজের শক্তি সামর্থ্যের প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিলে সেই সম্মোহন দূরে পলায়ন করিবে এবং পূন্যশ্লোক নলরাজা যেমন গণনাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ধারণাশক্তি প্রভাবে কলির শাপ হইতে মুক্ত হইয়া পূন্যজ্ঞান , পূর্ব্ব-স্মৃতি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরাও তদ্রূপ সম্মোহনমুক্ত হইয়া পুনরায় ভগবানের প্রিয় ও মনোনীত জাতি হইতে পারিব। এখন আমরা স্বপ্নের ঘোরে মুহ্যমান রহিয়াছি। কি উপায়ে কুহকিনী মায়াবিনীর সম্মোহনী শক্তির প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, তাহাই এখন বিচিন্তনীয় বিষয়।

যাঁহারা নিদ্রাঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া শোকে ও দুঃখে পীড্যমান হয়েন, তাঁহাদের জন্য এক শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আছে। তাহা এই যে, শয়নকালে নিজ জননীর নাম লিখিয়া উপাধানের (বালিশের) নীচে রাখিতে হয় এবং মাতৃকামন্ত্র বা স্বীয় মাতার নাম জপ করিতে হয়। কালিকামন্ত্র জপ করিলে যাদুকরীর কুহক নষ্ট হয়। ধ্যানধারণা ও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ আত্মযোগ রূপ সুদর্শন চক্র দ্বারাও সম্মোহনী শক্তির বিনাশ সাধন করা যায়। আমাদিগকেও এখন যাদুকরের কুহকমন্ত্র হইতে উদ্ধার পাওয়াব জন্য স্বীয় জননীর নাম জপ করিতে এবং হে ভ্রাতৃগণ ! যদি দেখরে পথে ভয়ের আকার, প্রাণপণে ডাকিও "বন্দে মাতরম্"। মোহিনীশক্তি প্রকাশের ইহাই মূলমন্ত্র। আজকাল নট্যালযে যাত্রার দলে "জনা" বা "প্রবীর পতন" অভিনীত গীত হইয়া থাকে। বালক প্রবীর প্রথম যুদ্ধে জননী জনার নাম স্মরণ করিয়া ও পদধূলি শিরোধাণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। দ্বিতীয় দিবস চক্রীব চক্রে কুহকিনী মায়াবিনী নায়িকাব কামকিঙ্কর হইয়া জননী জনাকে ভুলিয়া গেলেন এবং জননীর পদধূলিরূপ দর্শন চক্রে সুরক্ষিত না হওযায় যুদ্ধে তাহার পতন ও মৃত্যু হইল। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের প্রতি কি ...নিক্ষিপ্ত হইয়াছে?—কাঞ্চনের প্রলোভন এবং ...বেতনের প্রলোভন। আর্য্য মুসলমান ও মিশ্র ইউরেশিয়ান এবং ইরাণী পার্শীদিগকে চাকুরীর মোহন কুহকে প্রলুব্ধ করিয়া বলা হইতেছে যে "হিন্দু চাকুরী ত্যাগ করিয়াছে বিলক্ষণ! তোমরা সেই চাকুরী কর, বড়লোক হইবে ; হিন্দুই অধঃপাতে যাউক ! স্বদেশী আন্দোলনে তোমরা যোগদান করিওনা, তোমরা পূর্ব্বে রাজা ছিলে, এখন তোমরা প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া হিন্দুদিগকে রাজকার্য্য হইতে বিতাড়িত কর ; তোমরা রাজার সহকারী হইয়া রাজ্যসুখ সম্ভোগ কর।" এ কুহকে অকর্ম্মণ্য হইবে, যদি আমরা মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হই,— যদি আমরা প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারি "বন্দে মাতরম্"। যদি মুসলমান, ইউরেশিয়ান ও পার্শীগণ এই কুহকচক্রব্যূহ ভেদ করিতে না পারেন,—যদি তাঁহারা হিন্দুর পরিত্যক্ত চাকুরীর গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও আমরা হতশ্বাস হইব না ; কারণ ইহা ধ্রুব সত্য যে ভগবান ভারতবর্ষকে স্বদেশবাসীর সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি ভারতবর্ষকে স্বদেশ জ্ঞান করিবেন না, অথচ ভারতের অর্থ শোষণ ও অপহরণ করিবেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট ও লোকের বিচারে পাপভাগী হইবেন। কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ ! আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, যদিও অশিক্ষিত চিন্তাশক্তিশূন্য, চক্রীর চক্রমোহান্ধ কতিপয় মুসলমান, ইউরেশিয়ান ও পার্শী

ভ্রাতৃদ্রোহী হইয়া হিন্দুর পরিত্যক্ত চাকুরী গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের সমাজের চিন্তাশীল নেতৃগণ কখনই মোহঘোরে অভিভূত নহেন ও থাকিবেন না এবং ইহা অভ্রান্ত সত্য যে, এই স্বদেশী আন্দোলন ব্যক্তিবিশেষের হুজুগে প্রসূত হয় নাই, ইহা ভগবানের অভিপ্রায় অনুসারেই সঞ্জাত হইয়াছে, ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষগণ দ্বারাই সঞ্জীবিত থাকিবে ও পরিপুষ্ট হইবে। ইহার গতি‍িরাধ করা মানব বা আসুরী শক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ আসুরী শক্তি সর্ব্বদাই দৈবীশক্তি কর্তৃক পরাভূত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমি পরে বলিতেছি।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে আত্মযোগরূপ সুদর্শনচক্র দ্বারাও মোহিনীশক্তির কুহক নষ্ট করা যায়। যোগ করিতে হইলে শক্তির প্রয়োজন। অগ্রে শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়, তৎপর যোগে নিরত হইতে হয়। এই যে আমরা মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চাহিতেছি, এই মন্ত্র ধারণে আমাদেব শক্তি আছে কি না? ইহার একমাত্র উত্তর,--আর্য্যশক্তি এই মন্ত্র গ্রহণে ও মন্ত্রের সাধনে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত ; কিন্তু সেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি এতদিন নিদ্রিতা থাকিয়া উৰ্দ্ধ গমনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া ছিলেন, সহসা জাগরিতা হইয়া সেই দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। জাগরিতা হইবার কারণ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদই বলুন অথবা আত্মার অস্তিত্ব জগতে বর্তমান রাখিবার প্রবল স্বাভাবিকী ইচ্ছাই বলুন, যাহাই বলুন না কেন, শক্তি নিশ্চয়ই জাগরিতা হইয়াছেন। যাদুকরের সিংহ যদি কোন নির্ব্বাচনীয় কারণে বা ঘটনাবশে তাহার নিজের শক্তির পরিচয় পায়, তাহা হইলে সে আর যাদুকরের আদেশানুসারে তাহার করতালিতে নৃত্য করিতে চাহেনা। যাদুকরের ক্রীড়নক না হইলে যাদুকর তাহার পোষা সিংহকে অনাহারে রাখিয়া বশতাপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে যে, অনাহারে প্রাণ যায় তাহাও স্বীকাব তথাপি সিংহ বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকার হইয়াছে। কারণ সিংহ বুঝিতে পারিয়াছে তাহার শক্তি যাদুকরের শক্তি অপেক্ষা ন্যূন নহে, প্রত্যুত অনেক অধিক। মহাদেব তপস্যারতা কুমারী উমাকে বলিয়াছিলেন "নিজের শক্তি চিন্তা পূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে কি? শরীরমাদ্যাং থলু ধর্ম্ম সাধনং (শরীরই ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রধান উপায়)।" আমাদেরও প্রথম চিন্তনীয় বিষয় এই যে আমরা নিজের শক্তি পর্য্যালোচনা কবিয়া মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি কি না এবং আদ্য-ধর্ম্ম-সাধন শরীরকে রক্ষা করিবার উপায় আমাদের করতলগত আছে কি না? ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এই যে হিন্দুগণ, মুসলমানগণ ও পার্শীগণ আর্য্যবংশ সম্ভূত এবং হিন্দুগণ আর্য্যজাতির সর্ব্ব-প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান শাখা এবং ইংরেজগণ আর্য্যজাতির পঞ্চম শাখা টিউটনিক বংশসম্ভূত। সুতরাং এমন তপস্যা বা যোগ নাই, যাহা ইংরেজ করিতে পারে কিন্তু হিন্দু পারে না। হিন্দুদিগের অসাধ্য বিষয় সাধন করিতে ইংরেজও সমর্থ নহে ইহা স্থিরনিশ্চয়। ইংরেজ যদি কূটচক্র ও কূটনীতি অবলম্বন না করিয়া ন্যায়সঙ্গত ভাবে তুল্য সুবিধা লইয়া হিন্দুর সহিত কোন বিষয়ে প্রতিযোগিতা করিতে আসেন, তাহা হইলে হিন্দু আর্য্যোচিত গুণগরিমায় কোন অংশে ন্যূন হইবেন না, ইহাই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। যেমন সর্ষপ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বীজের অভ্যন্তরে বিশাল শালবৃক্ষের অণিমা নিবদ্ধ থাকে, তদ্রূপ আর্য্যহিন্দুর অভ্যন্তরেও জগতেব যাবতীয় উচ্চ সদগুণের শক্তিবীজ নিহিত আছে, তাহাতে উপযুক্ত শিক্ষারূপ জলসেচন করিলেই ঐ বীজ মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়া মহাশক্তিশালী বল প্রসব করিয়া শিক্ষারূপ জল সেচনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়দের দাসত্ব করিবার বীচপ্রবৃত্তি, মনুষ্যজাতিকে ও স্ত্রীজাতিকে তাহাদিগের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কুপ্রবৃত্তি,—এক কথায়, অন্যায় অসত্য ও অপ্রেমরূপ

আগাছা উপাড়িয়া ফেলিতে হইবে। আর্য্যজাতির মন স্বভাবতঃই উচ্চদিগের প্রধাবিত হয়, কুসংসর্গে সদগুণের বীজ মৃতরা থাকে ও আগাছা পরগাছা জন্মিয়া তাহা ছাইয়া ফেলে, কিন্তু ইহা স্থিরনিশ্চয় যে, পরগাছা সাফ কবিয়া মৃতপ্রায় বীজে জলসিঞ্চন করিলে ..অঙ্কুরিত হইবে ও তাহা মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়া সুফলই প্রসব করিবে। এই কারণে সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদিগের শক্তি-সামর্থের প্রতি সন্দিহান হইবার কোনই কারণ নাই। যাহারা মনে করেন বা বলেন যে, আমরা স্বদেশী-গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জ্জনে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না, তাঁহারা জানেন না, যে হিন্দুগণ কি কি উৎকৃষ্ট উপাদানে গঠিত। বিকৃত শিক্ষায়, বিদেশীয় কুসংসর্গে ও স্বভাবের প্রতিকূল আচরণে আমাদের অভ্যন্তরে পরগাছা জন্মিয়া সদ্‌গুণ ও সৎপ্রবৃত্তির (তন্মধ্যে জননী ও জন্মভূমির সেবাব্রত একটি) বীজ শুষ্ক ও নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু একেবারে নষ্ট করিতে পারে নাই। এখনও সময় আছে ; বিদেশীয় হাবভাব, রীতিনীতি, দ্রব্যসম্ভার ব্যবহারস্পৃহারূপ পরগাছা উৎপাটিত করিয়া স্বদেশজাত ও নিৰ্ম্মিত দ্রব্যাদি ব্যবহার ও আর্য্যজনোচিত স্বদেশীয় রীতিনীতি আচার ব্যবহার অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই আমরা আমাদেব ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব। এই স্বদেশীগ্রহণরূপ বীজে জলসিঞ্চন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পরগাছা উৎপাটিত করিতে হইবে, বিদেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহারের স্পৃহা দমন করিতে হইবে। যদি আমাদিগের প্রকৃতি স্বদেশীয় হয়, তাহা হইলে বিদেশীয় বর্জ্জনের জন্য কোন প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন হইবে না, অথবা তজ্জন্য অধিক প্রয়াসও পাইতে হইবে না, আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই স্বভাবের অনুকূলে স্বদেশী-গ্রহণে ও স্বভাবের প্রতিকূল বিদেশী-বর্জ্জনে সমর্থ হইব। বিদেশী বর্জ্জনের জন্য হিন্দুবিধবাদিগকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় না।

দ্বিতীয় কথা এই, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে কল-কারখানাব অত্যন্ত অভাব এবং এক একটি কল স্থাপন করিতে হইলে বহুলক্ষ মুদ্রার প্রয়োজন ও অন্ততঃ দুই তিন বৎসর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন। আমরা তাহা করিতে পারিব কিনা এবং তাহা করিলে আদ্যধর্ম্মসাধন শরীরকে রক্ষা কারবার উপায় আমাদের করতলগত আছে কিনা? আমরা ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকায় "আমাদের অভাব ও তন্মোচনের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, যে আমাদের অশনবসনের উপযোগী যাবতীয় দ্রব্যসম্ভারই এই দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিযা থাকে। নদী ও পুস্করিণী আছে মৎস্য পাওয়া যায়,—শস্যক্ষেত্র আছে ধান্য, গোধুম, রবিশস্য জন্মে,—মাংসের জন্য ছাগাদি আছে এবং দুগ্ধের জন্য গোমহিষ আছে। অশনের দ্রব্যাদি (কেবল লবণ, বিস্কুট, বালী প্রভৃতি বাদে) এখনও আমরা বিদেশ হইতে আমদানী করি না এবং অল্পদিনের পরীক্ষাতেই দেখা যাইতেছে লবণ, বিস্কুট, বালী, চুরুট ও বিলাতী মদ্য এবং বিলাতী ঔষধাদি বিদেশ হইতে আমদানী না করিলেও আমরা জীবনধারণ করিতে পারি। বসন সম্বন্ধে আপাততঃ কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, কারণ সর্ব্বনাশিনী কূট রাজনীতি আমাদের দেশের বস্ত্রব্যবসায় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তুলা জন্মাইবার রীতি ও সূতা কাটিবার চরকা নষ্ট করিয়াছে। এখন হইতে প্রত্যেক গৃহস্থ নিজেবা গৃহপ্রাঙ্গণে দশটি করিয়া তূলাব গাছ রোপণ করিলে এবং এক একটি চরকা রাখিলে বসনের অভাব থাকিবে না। বিশেষতঃ যদি দুই বৎসর সংযমই অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলেই বা দুঃখ কি? বহু বৎসর জননীকে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করিয়া আমরা যে মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছি, তুষানলই তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। কিন্তু তুষানলের পরিবর্তে সামান্য সময়ের জন্য কিছু সংযম অবলম্বন

করিলেই আমাদের সেই পাপ পালন করিতে পারি ; ইহা করিতে কে অসমর্থ বা অসম্মত হইবে ? যদি আমরা বুঝিয়া ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি যে, আমরা মাতৃদ্রোহরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা হইলে সেই পাপের বিন্দুমাত্রও ক্ষালন করিতে সংযম অতি যৎসামান্য প্রায়শ্চিত্ত।

এখানে একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। আমি সম্প্রতি গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত বালিয়াকান্দির নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম—যেখানে শ্বেতপুঙ্গবেরা দেশীয় নরপশুগণের সাহায্যে নিরীহ জমিদার ও কৃষককূলের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া রুধিরাক্ত অর্থ সংগ্রহ করতঃ নারকীয় বীভৎস আমোদ উপভোগ করিত, তাহা এখন স্তুপীকৃত ভগ্নরাশি রূপে বিদ্যমান্ থাকিয়া অতীতের অত্যাচার কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। একজন বৃদ্ধ কৃষক আমাকে সমস্ত দেখাইয়া বলিল "নীলকরের সাহেবেরা ও আমলারা আমাদের উপর যে কি অত্যাচার করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। আমাদের সাক্ষাতে আমাদের উপর অত্যাচার করিয়া আমাদিগকে শাসন করিয়াছে। অবশেষে আমরা ধর্ম্মঘট করিলাম যে, আর এই হাতে নীল বুনিব না,—নীল ছুঁইব না। প্রথমে আমাদিগকে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিল, কিন্তু আমরা টলিলাম না। অবশেষে একজন সাধু পাদ্রীসাহেব নীলকুঠির প্রধান সাহেব হইয়া আসিলেন, তিনি দিনরাত্রি বাইবেল পড়িতেন। বড় ধার্ম্মিক ও দয়ালু ছিলেন। তিনি আমাদের পুত্রকন্যাদিগকে মধ্যে মধ্যে খাদ্যদ্রব্যাদি উপহার দিতে লাগিলেন ও আমাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাবা সকল ! আমি যতদিন থাকি ততদিব নীল বুনানী কর, পরে আর করিও না।" আমাদের একই উত্তর—এ হাতে নীল বুনিব না, নীল ছুঁইব না। এই সময়ে ঘটনাক্রমে নীলকুঠির লাঠিয়ালদের সহিত দাঙ্গা হইয়া পাঁচজন লোক খুন হইল। তখন কুঠিয়াল সাহেবও দেশীয় আমলারা পুলিশ লইয়া আমাদিগকে বলিল 'হয়ত নীল বুনানী কর, নচেৎ তোমরা খুন করিয়াছ এইরূপ প্রমাণ করিব, তোমাদের ফাঁসী হইবে, তোমাদের স্ত্রীকন্যার উপর অত্যাচার হইবে'। আমরা বলিলাম 'সাহেব ! তোমরা যে মিথ্যা মকদ্দমা করিয়া আমাদিগকে বিপদের ফেলিতে পার, তাহা আমরা জানি। আমাদের স্ত্রী-কন্যার উপর অত্যাচার করিতে পার, তাহাও, জানি। তুমি আমাদের উপর খুনের মকর্দ্দমাই চাপাও, কিম্বা আমাদের সম্মুখে আমাদের স্ত্রী-কন্যার প্রতিই অত্যাচার করাও, কিন্তু আমাদের প্রতিজ্ঞা এই,—এ হাতেনীল বুনিব না, নীল ছুঁইব না। সেইদিন হইতে এই কুঠীতে নীল বন্ধ হইয়াগছে।" ভ্রাতৃগণ। তৎকালে নিরক্ষর কৃষকগণ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য জমীদার বা ধনীলোকের সাহায্য পায় নাই এবং ধর্ম্মঘট করিবার নিয়মবালীও বিদেশয়িদিগের নিকট শিক্ষা করে নাই। কে তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার বল দিয়াছিল ? একমাত্র উত্তর,—ঐশ্বরিক শক্তি একমাত্র ভগবান্।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এই স্বদেশী আন্দোলন ব্যক্তিবিশেষের হুজুগে প্রসূত হয় নাই, ইহা ভগবানের ইচ্ছাতেই সজাত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষগণ দ্বারাই সঞ্জীবিত থাকিবে ও পরিপুষ্ট হইবে। ইহার গতিরোধ করা মানব বা আসুরী শক্তির সাধ্যায়ত্ব নহে। কারণ আসুরী শক্তি সর্ব্বদাই দৈবীশক্তি কত্তৃক পরাভূতা হইয়া থাকে। ভারতবাসীর মন বহুকাল যাবৎ দেশীয় শিল্পের উন্নতিবিধানে কৃতসংস্কল্প হইয়াছিল, যৌথ-কারবার স্থাপন করা ও দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যবস্থার সম্বন্ধে আমি এই পত্রিকায় "আমাদের অভাব ও

তন্মোচনের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছে। তৎপূর্ব্বে কোহিনুর পত্রিকায় ১৯০৩ সালে লিখিয়াছিলাম:—

কিরূপে আমাদের দেশকে ভগবানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ নিচের শ্রেণী হইতে সভ্যজাতিদের শ্রেণীতে উন্নীত করা যায়, প্রত্যেক চিন্তাশীল দেশহিতৈষী ব্যক্তির মনেই এই দৃঢ়সংকল্প অহরহ জাগরূক রহিয়াছে। যাহাতে সভ্যজাতিদের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া জাতীয় দায়িত্ব, স্কন্ধে বহন করতঃ ভগবানের আদিষ্ট কর্ম্ম সুসম্পন্ন কবা যায়,নিজকে ও স্বদেশবাসী সকলকে প্রস্তুত করাই এখন আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মদের যুধিষ্ঠিরকে নানাতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেইরূপ আমাদের দেশের ভূষণস্বরূপ স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকিয়া ১৯০৩ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে তাঁহার প্রিয়তম বিজ্ঞান-সভার ষষ্ঠবিংশতি বার্ষিক অধিবেশনে যে বিষাদমাখা পত্রখানি লিখিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আছে:—

"আমি পুনঃপুন: বলিতেছি, যদি আমাদের দেশের কিছুমাত্র উন্নতি করিতে ইচ্ছা কব,— যদি আমাদের দেশকে জগতের সভ্যজাতি সমূহের পদবীতে উন্নতি করিয়া সভ্যজাতির দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ইহা কেবল বিজ্ঞানচর্চ্চা, অর্থাৎ ভগবানের সৃষ্টির যথার্থ জ্ঞান দ্বারাই হইতে পারে ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা।"

এতদ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, এই স্বদেশী আন্দোলনের জন্য, বিদেশীবর্জ্জন ও স্বদেশীগ্রহণ নিমিত্ত ভারতবাসীর মন বহুকাল যাবৎ প্রধুমিত হইয়াছিল, বঙ্গবিভাগে তাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে বহুবৎসর সময় লাগিয়াছে, তাহা সহসা নির্ব্বাপিত হইতে পারে না। ইহা নির্ব্বাপিত হইবে—এ কথা যে বলে, সে অতি ভ্রমান্ধ; কালের গতি, নিয়তির কার্য্য কিছুমাত্র বুঝিতে সক্ষম নহে।[১]

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, হিন্দুগণ আর্য্যজাতির প্রথম শাখা। আর্য্যজাতির পাঁচ শাখাই এখন জগতে বিদ্যমান আছে। যদি আর্য্যজাতিকে বিনষ্ট করা ভগবানের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এক শাখাকে রাখিয়া অন্য শাখা বিনষ্ট হইবে না; সমগ্র আর্য্যজাতি নষ্ট হইয়া তৎস্থানে উন্নততর জাতির আবিভাব হইবে। আর্য্যজাতির এক শাখা অর্থাৎ পঞ্চম শাখা এত বেশী পূণ্যশীল ও ভগবানের প্রিয়তম নহে যে, ভগবান্ তাহাকে রাখিয়া তাহার সুখসচ্ছন্দতার জন্য অপর শাখা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধানও প্রথম শাখাকে বিনষ্ট করিবেন। আর ভগবান্ বিনষ্ট না করিলে জাতিবিশেষকে কে বিনষ্ট করিতে পারে?

যদি আর্য্যজাতির প্রথম শাখাকে বিনাশ করা ভগবানের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বেই এই জাতি বিনষ্ট হইত। ইংরেজ জাতির এদেশে আগমনের প্রাক্কালে যখন হিন্দুগণ ব্রহ্মবিদ্যা হারাইয়া অধর্ম্ম-পদবীতে পদার্পণ করিয়াছিল,—যখন ভণ্ড তান্ত্রিকগণ প্রকৃত তন্ত্রোক্ত প্রণালীমতে মহামায়ার উপাসনা বুলিয়া তন্ত্ররূপ যন্ত্রের সাহায্যে সমাজে জঘন্য ব্যবিচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল এবং পঞ্চ "ম"কারে দেশ ছারখারে গিয়াছিল,—

---

১ I have only now to re-iterate my conviction that our country is to advance and take rank with and share her responsibilites with the civilized nations of the world, it can only be by means of science or positive knowledge of God's works

যখন বৈষ্ণবগণ প্রকৃত ভাগবতধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া যুগলমূর্ত্তি উপাসনা ও রাসলীলা, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি অভিনয়স্থলে বিধবাব বৃহ্মচর্য্যার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছিল,—যখন ভীরুতা, প্রবঞ্চনা, লাম্পট্য, গোড়ামি প্রভৃতি পশ্চাতে রাখিয়া সত্য, সাহস বীর্য্য ও প্রকৃত ধর্ম্ম এদেশ ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিয়াছিল,—যখন একজন বৃদ্ধ বা শিশুর সহিত বহুসংখ্যাক বালিকা যুবতী বৃদ্ধার বিবাহ হইত,—যখন নরবলি ও গঙ্গাসাগরে পুত্রকন্যা বিসর্জ্জন দেওয়া হইত,— যখন বিধবাবিবাহ অপেক্ষা ভ্রূণহত্যা উৎকৃষ্টতম মনে করা হইত এবং সর্ব্বোপরি পিতা বা পিতামহের মৃত্যু হইলে বলপূর্ব্বক গর্ভ ধারিণী মাতা ও মাতামহীকে শবের সহিত একত্র দাহ করা মঙ্গলজনক ধর্ম্মসম্মত পূণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত, তখনই ভগবান এ জাতিকে বিনষ্ট করিতেন। কিন্তু এ জাতির মৃত্যু নাই। ভগবদিচ্ছায় তখন রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি মহাপুরষগণ জম্মগ্রহণ করিয়া বৃহ্মবিদ্যার পুনরুদ্ধার করিবেন, সামাজিক অধর্ম্ম কতক পরিমাণে নিবাকৃত করিলেন ও শিক্ষার বিস্তার করিলেন। ঊনবিংশতি শতাব্দীতে যাহা আবশ্যক, তাহা হইয়াছে। এই বিংশতি শতাব্দীতে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাও মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবে ছাত্রগণ উপলক্ষ মাত্র। ইহার কিঞ্চিৎ পবেই দেখিবেন--সামাজিক কুনীতি, অধর্ম্ম ও অত্যাচাব নিরাকৃত করিবাব জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষগণ চেষ্টিত হইবেন। এই স্বদেশী আন্দোলনে ঈশ্বরের হস্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ; ইহার বিনাশ নাই। ভ্রাতৃগণ! আপনারা শত্রুপক্ষেব ভ্রূভঙ্গীতে ও উপহাসে ভীত বা নিরুৎসাহ হইবেন না। (ক্রমশঃ)

রাজবাড়ী।
১৩১২। ১২ কার্ত্তিক।

বিনীত
শ্রী জানকীনাথ পাল

প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার।।

বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যেব বিবাট কলেবব। কত পুঁথি যে তখন বিবচিত হইয়াছিল, তাহাব সংখ্যা কবা যায না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা ইহার সর্ব্বাঙ্গ অধিকার করিতে সক্ষম হই নাই। তৎপ্রতি আমাদেব দৃষ্টি পতিত হইবার পূর্ব্বে ইহার বহুলাংশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গালা কাগজে নিবদ্ধ সাহিত্যেব শত্রু অনেক ;—কালানল. সর্ববিধ্বংশী কীট ও কালান্তক কাল আমাদেব কি অনিষ্ট না সাধন করিয়াছে! তবে সুখের বিষয়, নষ্টাবিশিষ্ট যাহা একনো আছে, তাহাই আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের অস্তিত্ব সূচনার পক্ষে যথেষ্ট।

আজ কয়েক বৎসব হইতে নানা উপাধে প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতির উদ্ধারসাধন হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার ও সংরক্ষণ কল্পে 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ' সৃষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রাচীন পুথির প্রকাশ ও প্রচার হইতেছে এতদ্ভিন্ন ব্যক্তিগত চেষ্টাতেও অধুনা অসংখ্য প্রাচীন গ্রন্থরাজি সুরক্ষিত হইতেছে। এ সমস্তই নিতান্ত সুখের সংবাদ, সন্দেহ নাই। প্রাচীন সাহিত্যের রক্ষণাভাবে আমাদের আধুনিক সাহিত্যের একাঙ্গ অপূর্ণই থাকিত। যাঁহারা আমাদের এই অত্যাশ্যক অভাবের পরিপূরণে সচেষ্ট আছেন, সুতরাং তাঁহারা মাতৃভাষা-- প্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

একটা কথা আছে। 'সাহিত্য-পরিষৎ' প্রভৃতি আমাদেব বড় বড় কাব্যগুলিরই প্রকাশভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন সাহিত্যের যাঁহারা কোন খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, বৃহৎ কাব্যাদি অপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যই অধিক।

তন্মধ্যে এখন অসংখ্য গ্রন্থ আছে, যাহাদের স্বতন্ত্র প্রকাশ অসম্ভব না হইলেও কোনরূপ সুবিধাজনক নহে। অথচ ক্ষুদ্রাবয়ব বলিয়া এগুলিকে আমাদের উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। তবে এ সকল ক্ষুদ্র২ কাব্যাদি প্রকাশ করা যায় কিরূপে?

আমরা একটা উপায় দেখাইয়া দিতে পারি। বাঙ্গালায় অধুনা অসংখ্য মাসিকপত্র ও পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথিগুলি যদি এই সকল মাসিক কাগজে প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহা আমাদের সকল দিকই রক্ষা হয় : — বিনষ্টপ্রায় পুথিগুলিও সমজে শীঘ্র স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয় ও তাহাতে কাহারো অন্যবিধ কষ্টও হয় না বৎসর বৎসর আমাদের বিলুপ্ত প্রায় সাহিত্য কালের অতল গহ্বরে চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছে ; এরূপ অবস্থায় আর বেশী দিন অবহেলায় বসিয়া থাকিলে আমাদের যে ক্ষতি হইবে, তাহা আর কোনও রূপে কদাচ পূণ হইতে পারিবে না। আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়ের মদীয় প্রাগুক্ত প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিতে ঔদাস্য প্রকাশ্য করিয়া স্বজাতীয় সাহিত্যের অঙ্গহানি করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্ব-কথিত উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা 'নববিকাশের' কলেবরেও প্রাচীন ক্ষুদ্র২ পুঁথি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি বিলুপ্তপ্রায় বলিয়া রত্ন-সদৃশ এই সমস্ত প্রাচীন পুঁথি 'নববিকাশে' অশোভন রূপে গণ্য হইবে না। আজ যে পুঁথিখানি প্রকাশিত হইতেছে, তাহার নাম 'হাড়মালা'।

১। হাড়-মালা।

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুঁথি ;—মোট ১৭৩টি পদে সমাপ্ত। সমগ্র পুঁথিখানি পয়ারেই লিখিত হইয়াছে। ইহা একখানি তাত্ত্বিক মতের পুঁথি। তাহাতে যে সব বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহার সাহত সাধারণের কোন সংস্রব নাই। এজন্য ইহার স্থানে২ দুর্ব্বোধ প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হইবে।

ইহার রচয়িতা কে, তাহা পুঁথিতে উল্লেখিত দেখা যায় না। অন্য কোনরূপেও যে তাহা আবিষ্কৃত হইতে পারিবে, সে আশা বড় কম। ময়মনসিংহ--কিশোরগঞ্জের অন্তঃপাতী ধারীশ্বর গ্রামবাসী জগন্নাথ দাস নামক জনৈক সাধক কবি ও 'হাড়মালা' নামক এক গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার গ্রন্থের সহিত আমাদের আলোচ্য পুঁথির কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, উভয় গ্রন্থ না দেখিলে বললে না। এই পুঁথির রচনা যিনিই করুন না কেন, তিনিও যে একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

পুঁথির রচয়িতার নামই যখন অজ্ঞাত রহিল, তখন আর সময় নির্দ্ধারণ করিব কাহার? তবে পুঁথির লিপিকাল ধরিয়া বিচার করিলে ইহাকে নেহায়েৎ আধুনিক রচিত বলিয়া অনুমান করা যায় না।

সাহিত্যের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন নিমিত্ত এই গ্রন্থ রচিত হয় নাই ; সুতরাং ইহাতে কাব্যোচিত গুণাদির অভাব লক্ষিত হইলে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কথা নাই। প্রাচীন সাহিত্যের প্রকাশে সৌন্দর্য্য প্রদর্শন যতটা উদ্দিষ্ট নহে, তাহায় স্থায়িত্ববিধান ততটা অধিক উদ্দিষ্ট, পাঠকগণকে একথা মনে রাখিতে হইবে।

প্রাচীন সাহিত্যাভিজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন যে, একমাত্র প্রতিলিপির সাহায্যে সেকালের কোন পুঁথিই বিশুদ্ধরূপে প্রচারিত করা অসম্ভব। এই জন্য আমাদের এই পুঁথিতেও

স্থানে স্থানে অনেক ভুলভ্রান্তি পরিদৃষ্ট হইতে পারে। প্রাচীন সাহিত্যের সংশোধনাদি করা অন্যায় বোধে আমরা কেবল কয়েকটি স্থলে বর্ণবিন্যাসে ভিন্ন অন্যত্র হস্তক্ষেপ করিব না। করিতে গেলে গ্রন্থের মৌলিকত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে। যাহা হউক, এখন পুঁথিখানি উদ্ধৃত করিতেছি ;* —

নমো গণেশায় নম।

অথহাড়মালা লিখ্যতে।

প্রাণমোহ শিব শক্তি দেবের চরণ।
যাহার প্রসাদে নির্ম্মল হএ মন॥
বিদ্যুতের প্রভা যেন তেন হর গৌরী।
জ্যোতির্ম্ময় রূপে আছে ধেআইতে (নারি ?)॥'
সূক্ষ্মরূপে সাধু জনে ধেআইতে না পারি।
সেই সে কারণে হরগৌরী নাম ধরি॥
শুন তত্ত্ব রাজন হইয়া সাবধানে
যোগ শাস্ত্র পুরাণ যে হইল কেমনে॥
একদিন হরগৌরী কৈলাশ শিখরে।
মহামায়া লৈআ তেতি * আনন্দে ক্রিয়া করে॥
এই মতে ভোলানাথ আছে নানা রঙ্গে।
হাড়মালা দেখি দেবী পুছিলেন্ত রঙ্গে॥
হীরা মণি মাণিক্য আদি জথেক রতন।
ইহা ছাড়ি কেনে হাড়মালাকে যতন॥
বড়হি বিস্ময় গোসাঞি লয় মোর মনে।
কহত স্বরূপ কথা শুনি সাবধানে॥
শঙ্করে বোলেন শুন মোর প্রাণেশ্বরি।
হাড়মালার কথা কেনে পুছহ সুন্দরি॥
এই কথা থাকৌক এবে কথা শুন আর।
যে কথা শুনিলে রঙ্গ বাড়এ তোহ্মা॥ ১০
দেবী বোলে আর কথা না পুছি তোহ্মারে।
হাড়মালার কথা কহিবা আহ্মারে॥
শিবে বোলে শুন দেবী আমি কহি কথা।
পূর্ব্বে জম্মে আছিলা তুমি দক্ষরাজ সূতা॥
সতী নামে ছিলা তুমি মোর প্রাণেশ্বরী।
প্রতিজ্ঞা এ তনু (?) তুমি ছাড়হ সুন্দরি॥

* এই পুঁথিখানি চট্টগ্রাম—খবন্দীপ মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের হেড়পণ্ডিত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

* তেতি কি তেনি—তিনি

এই কথা শুনিয়া দেবী বিস্ময় ভাবি মনে।
হেন দুষ্ট বাক্য প্রভু বোলে কি কারণে॥
আমি যদি মরি তুমি না মরিলা কেনে।
এহার স্বরূপ কথা কহত আপনে॥
শিবে বোলে দেবী আমি জানি ব্রহ্মযোগ।
ব্রহ্মজ্ঞান যেই জানে নাহিক মত্যু রোগ॥
লক্ষ কোটি ইন্দ্র যদি যাএ তবে মরি।
লোমগাছি না খশে মোর শুনহ সুন্দরি॥
ব্রহ্মজ্ঞান জানিলে নাহিক মরণ।
কহিল তোহ্মাতে আমি স্বরূপ বচন॥
দেবী বোলে যদি তুমি জান ব্রহ্মযোগ।
তবে কেনে মরি আমি যাই পরলোক॥
স্বামী গতি হএ যেই গতি সেই ভায্যার।
স্বামীবিনে পতিব্রতার গতি নাহি আর॥ ২০
এহেন পতিব্রতাকে স্বরূপে ভাবিআ।
ধিক পণ্ডিত ধিক ব্রহ্মজ্ঞান (জানিআ?)॥
নিদআ পুরুষ জাতি কঠিন-হৃদয়।
হেন জ্ঞান থাকিতে অস্থি না থাকে অঙ্গএ*
এবোল বলিআ দেবী শিবরে দিলা পৃষ্ঠ।
অধ (অধো) মুখে রহিলা কবিআ কোপ দৃষ্ট॥
মহাকোপে দেবীর চক্ষুর জল পড়ে।
কোপমন হৈআ দেবী না চাহে শিবেরে॥
শঙ্করে বোলেন শুন মোর প্রাণেশ্বরি।
একবার অপরাধ শুনহ সুনদরি॥
করুম (করচ?) প্রণতি দেবী হইআ কাতর।
মধুর বচনে মোর প্রাণ রক্ষা কর॥
দন্তে তৃণ ধর** দেবী হইআ বস্ মুখি।
তোহ্মারে বিমুকে মোর সকল অসুখী।
কাতর হইয়া যদি ধরহ চরণ।
সদয় হইয়া মোকে কহত কথন॥
সানন্দিত হৈআ তেজে সব কোপ।
ব্রহ্মজ্ঞান কহি শুন জগতের গোপ॥
এবোল শুনিয়া দেবী করিল প্রণতি।
কোপ ছাড়ি গুপ্তকথা শুনেন পার্ব্বতী॥ ৩০

* অঙ্গএ—অঙ্গে

** অখে। ধর=ধরো, ধরি।দন্তে তৃণ ধরিতেছি, তুমি আমার মুখী (৯দিকে) হইয়া বস।

দেবী শুন শিবে বোলে কহি আমি যোগ।
ব্রহ্মজ্ঞান জানিলে নাহিক মৃত্যু রোগ॥
সমুদ্রে পালিবেন ধর্ম্ম চিন্তিবেহ নিশি।
ফল বাঞ্ছা না করিলে থাকিবা হরিষী।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ হিংসা পিশূন।
অহঙ্কার মদ দর্পতা সমো * বর্জ্জন॥
অল্পং২ করি তুমি ছাড়িবা দিনে২।
ক্ষমা সত্য দয়া ধর্ম্ম পালিবা সর্ব্বক্ষণে॥
নিরবধি চিন্তিবা তুমি আপনার মন।
যেইরূপে পাইবা নৈরাকার নিরঞ্জন॥
দেবী বোলে শুন প্রভু আম্মার বচন।
কিরূপে থাকেন নৈরাকার নিরঞ্জন॥
কিরূপ তাহার চিহ্ন বৈসে কোন ঠাই।
তোমা হনে আর কেবা আছএ গোসাঞি॥
জ্যোতিস্ময় নিরঞ্জন আদি নাম তার।
নবীন মেঘেতে যেন বিদ্যুত আকার॥
নহে স্থুল্য নহে শূন্য নাহি তার ছায়া
অতিশয় বেক্ত (ব্যক্ত) নহে ভিন্ন২ কায়া॥
কিছু নমে তার সকল হএ সেই।
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিলে নাহি তার বহি** ॥[৪০]
পাপ পূণ্য দোষ গুণ নাহিক তাহার।
উৎপত্তি প্রলয় এক নাহিক যাহার॥
জলে জন্মে বিম্ব যেন জকেতে মিশাএ।
অনন্ত কোটী ব্রাহ্মণ্ড যাহাতে আইসে যাএ॥
তুমি আমি করি আর জথেক ভুবন।
সমাকে*** ত সেই প্রভু করিছে সৃজন॥
দেবী বোলে শুন প্রভু বচন আম্মার।
নিরঞ্জনরূপে কার (?) সংসারের সার॥
কিবারূপে সৃষ্টি তেনি (তিনি) করিল সৃজন।
বিবেচিআ মহ প্রভু শুনি বিবরণ॥
শঙ্করে বোলেন শুন আম্মার উত্তর।
যেইরূপে সৃজিলা সৃষ্টি জগত ঈশ্বর॥
এক কাল নিরঞ্জন করিল স্মরণ।

* সমো—সকল।
** হনে—হইতে। তার বহি—তাহা ভিন্ন।
*** সমাকে—সবরে।

সংসার সৃজিতে গোসাঞি করিলা বলেন॥
মনেত ভাবিআ প্রভু চাহে চারি ভিত।
হেন কালে অনাদি জন্মিল আচম্বিত॥
জন্মিল অনাদি তাতে না দেখিল কেহো।
মুই ঈশ্বর মত পরে নাহি কেহো॥
আপনারে কর্ত্তা মানে অনাদি ঈশ্বর।
তাহা দেখি নিরঞ্জন করিলা উত্তর॥৫০
আপনারে বড় মানে আশ্চর্য্য বড় কথা।
আম্মাতে জন্মিলা তুমি আমি তোর পিতা॥
তবে ত অনাদি বোলে সৃজিলা আম্মারে।
কি রূপে কথাতে* আছ না দেখি তোম্মারে॥
ঈশ্বর বোলেন শুব অনাদি কুমারী।
রূপ রেখ কিছু নাহি দেখহ আম্মার॥
দেখিতে না পারে মোর রূপ রেখ নাই।
নৈরাকার রূপে ব্রহ্মা আমি সে গোসাই॥
রূপ গুণ কিছু মোর নাহি পরিমাণ।
সূক্ষ্মরূপে থাকি আমি শূন্য অধিষ্ঠান॥
মুই ২ করিআ করহ অহঙ্কার।
সিদ্ধি না পাইব পিণ্ড পড়িব তোম্মার॥
সংসার সৃজিল আমি বড় দুঃখ পাইআ।
সমাকে সৃজিলা আমি কালরূপ হৈআ॥
এথ বুলি ঈশ্বর হইল অন্তর্দ্ধান।
হেন কালে শিব শক্তি হৈলা অধিষ্ঠান॥
তবে আর হরি ব্রহ্মা হৈল দুইজন।
এই পঞ্চে মিলি সৃষ্টি করিলা সৃজন॥
দৃতিআর** তেজ বায়ু আর আকাশ।
সৃষ্টির কারণে পঞ্চ হইল প্রকাশ॥
আকাশের ভাগে হৈল অনাদি প্রচার।
বরুণের ভাগে হৈল বিষ্ণু অবতার॥
পৃথিবীর ভাগে ব্রহ্মা হইল উৎপত্তি।
বায়ুর ভাগে শিব আমি ঈশ্বর মুরতি॥
তেরজর ভাগে আপনি তুমি শক্তি অবতার।
পঞ্চ রূপে করিলা প্রভু সৃষ্টির প্রচার॥
এক দেব পঞ্চ মুর্ত্তি হৈল ততক্ষণ॥
দেবী বোলে শুন প্রভু আম্মার বচন।

* কথাতে—কোথাতে।
** দৃতিআর—না হইয়া 'ক্ষিতি অপ' হয়ত বোধ হয়।

পঞ্চ ভূত অংশ সৃষ্টি করিলা সৃজন॥
পঞ্চে পঞ্চবিংশতি হইল কেনে মন।
বিবেচিআ কহ শুনি অপূর্ব্ব কথন॥
শঙ্করে বোলেন শুন দেবী মহামতি।
বিবেচিআ কহি সৃষ্টি হইল যেমতি॥
পৃথিবীর তেজ বায়ু আর আকাশ।
একত্র হইআ পঞ্চ শরীরে প্রকাশ॥
অস্থি চর্ম্মো মাংস নক্ষ * লোম পঞ্চজন।
পৃথিবীর অংশে হৈল শরীর কারণ।
সুখ নিদ্রা ক্লেশ মল মূত্র কহি আর।
আর কাশ জন্মিল পঞ্চ শরীর উদ্ধার॥[৭৩]
কাম ক্রোধ ক্ষুধা নিদ্রা (আর) পিশূন।
তেজ অংশে হৈল পঞ্চ শুন বিবরণ॥
চেতন ধারণা প্রত্যাহ মুকুঞ্জ ধ্যান। (?)
বায়ু অংশে হৈল পঞ্চ শরীর কারণ॥
নিদ্রা ভয় লোভ মোহ হিংসা কার আর।
আকাশ অংশে হৈল পঞ্চ শরীর উদ্ধার॥
তোহ্মাকে কহিএ আমি সব্ব বিবরণ।
এহার অন্ত পায় যেই সেই নিরঞ্জন॥
দেবী (বোলে) শুন প্রভু জগত-ঈশ্বর।
যে কিছু কহিলা প্রভু শুনিলাম সকল॥
নাড়িভেদ চক্রভেদ পিটির (?) লক্ষণ॥
দশ বায়ু কথাএ** বসে কহ বিবরণ॥
শঙ্করে বোলেন দেবি যে পুছিলো আমা।
সাবধান হৈআ শুন কহি আমি তোহ্মা॥
বাসত্তৈর হাজার নাড়ি শরীরেতে স্থিতি।
অমৃতের পথে সব হৈল উৎপত্তি॥
চৌষষ্ট নাড়ি তাথে কবিলা উদ্ধার।
একাদশ নাড়ি তাতে মুখ্য কৈল সার॥
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা যে সুমন্দা সুযুয়া?) কহি আর।
চিত্রা হস্তিনা অনাবতি (") যে গান্ধার॥[৮০]

* নক্ষ—নখ?
** কথাএ—কোথায়।

পিঙ্গা পুষা মূল পুষা এই তিন জন।
কুর্ম্ম শঙ্খিনী এই একাদশ প্রধান॥
একাদশ প্রধান যে নাড়ির ভিতরে।
শরীরে নাড়ির কথা কহিলুম তোম্মারে॥
মূলাধার আদি আর নাসিকার দ্বার।
সুমন্দার বামভাগে বৈসএ ইঙ্গিলা।
তাহার দক্ষিণ ভাগে বৈসএ পিঙ্গিলা॥
অবেক্ত চিত্রিকা নাড়ি বৈসে অভ্যন্তরে।
এই চারি নাড়ি প্রধান নাড়ির ভিতরে॥
গান্ধারি নামে নাড়ি চক্ষুতে তার স্থিতি।
দক্ষিণ লোচনে তবে হস্তিনার বসতি॥
পিঙ্গা নামে নাড়ি বৈসে দক্ষিণের কর্ণে।
পুষ্যা নামে নাড়ি বৈসে বাম প্রবণে॥
যোগ অভ্যাসেই বায়ু করএ ভক্ষণে।
মূল পুষ্যা নামে নামে নাড়ি বৈসএ বদনে॥
পূরক পূরিয়া বায়ু এড়ি ধীরে২।
কথা কিছু খাইয়া থাকে তখনে উদ্গারে॥
এইমতে বায়ু তুমি করিয়া সেবন।
সাবধানে শুন দেবী কহি বিবরণ॥ ৯০
লিঙ্গমূলে কুর্ম্ম শঙ্খিনী মাথার উপর।
এই একাদশ দেবী নাড়ির ভিতর॥
দশ বায়ুর কথা কহি শুনহ পার্ব্বতী।
দশ বায়ু কথাএ বৈসে শুন তার স্থিতি॥
প্রাণ অমান সমান উদান সময়॥
বিনাম কুম্মদেব দৈত্য ধনঞ্জয়॥
কিঙ্কর এই দশ বায়ু বৈসে দশ স্থান।
বিবেচিয় কহি আমি শুন সাবধান॥

(ক্রমশঃ)
শ্রী আবদুল করিম।

২য় ভাগ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১২

জানকীনাথ পাল : মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ, শশিমোহন বসাক : প্রীতি ও উন্নতি [প্রবন্ধ], দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা : বিসর্জ্জন [কবিতা],

স্বদেশী আন্দোলন (২)

"There is a tide in the affairs of men,
Which taken at the flood leads on
to fortune ,
Omitted, all the voyages of their life
Is bound in shallows, and in miseries.
On such a full sea are we now afloat ;
And we must take the current when it serves
Or lose our ventures".
(Shakespear's Julius Caesar)

দেশহিতৈষিতার পবিত্র স্রোত মানবহৃদয়ে সতত প্রবাহিত হইতেছে। যখন এই স্রোত অন্তঃসলিল থাকে,--যখন মানবহৃদয়ে নিবদ্ধ থাকে, তখন এই অবরুদ্ধ স্রোত নীরবে প্রবল ও গভীর শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখে। যখন কোন উত্তেজক কারণে বাঁধ ভাঙ্গিয়া সেই স্রোত বাহিরে প্রবাহিত হয়, তখন পূর্ব্বসঞ্চিত শক্তির প্রবলতা ও গভীরতা অনুসারে স্রোতের প্রবাহ অল্পকাল বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"—জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠা—এই উক্তি জাতিবিশেষের বা জীববিশেষের উক্তি নহে—এই উক্তি জীবমাত্রেরই হৃদয়-ভাবব্যঞ্জক। এই ভাব জীবমাত্রেরই জন্মগত সংস্কার। কোন জীবই মরণ কামনা করে না, জন্মস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য লোকে যাইতে ইচ্ছা করে না। এই স্বদেশপ্রিয়তার ভাব জন্মগত সংস্কার হইতেই উদ্ভূত হয়। ইহা প্রত্যেক জীবেই বর্ত্তমান আছে, ইহা সভ্য মানব অপেক্ষা অসভ্য মানবেই অধিকতর প্রবল, কারণ অসভ্য মানব এই জগৎ অপেক্ষা অধিক সুখের স্থান অন্য কোন লোকের পরিচয় জানে না। কোন জাতি বিশেষের অধিনায়কগণের হৃদ্‌গত দেশহিতৈষিতার পবিত্র স্রোত যখন কোন উত্তেজক কারণ পাইয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া কোন দিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন সেই জাতির সকল লোকের সঞ্চিত দেশহিতৈষিতারশক্তিপ্রবাহ একত্র হইয়া এক বহিঃসলিলা প্রবল স্রোতস্বতী প্রস্তুত করে, এবং সেই স্রোতস্বতী পদ্মানদীর ন্যায় সমস্ত বাঁধাবিঘ্ন ও প্রতিকূলতাচরণ ভাঙ্গিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন কেহই তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয়েন না। কিন্তু স্রোতের বাঁধ সহসা ভঙ্গ হয় না। সকলেই গঙ্গার পবিত্র স্রোত পৃথিবীতে আনয়ন করিতে সক্ষম নহেন। গঙ্গার পবিত্র স্রোত পৃথিবীতে প্রবাহিত করিবার জন্য, পুরাণকর্ত্তা বলেন, অংশুমান্ তপস্যা করিলেন পারিলেন না,—তাঁহার পুত্র দিলীপ তপস্যা করিলেন পারিলেন না, তাঁহার পুত্র ভগীরথ মহাতপস্যা করিলেন, তজ্জন্য গঙ্গাদেবী প্রসন্না হইয়া প্রবাহিতা হইতে সম্মতা হইলেন। গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া মানবগণের পাপ ধৌত করিলেন। আমাদের এই স্বদেশহিতৈষিতার স্রোতস্বতীকে প্রবাহিত করিবার জন্য পূর্ব্বে মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ, রাজা রামমোহন রায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, কৃষ্ণদাস পাল, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু বহু মহাপুরুষগণ বিস্তর চেষ্টা করিয়া আপাতদৃষ্টিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

তখন এই স্রোতস্বতী বহিঃসলিলা হন নাই, অন্তঃসলিলা থাকিয়া প্রবল ও গভীর শক্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন প্রবলবেগে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইলেও এই স্রোতস্বতী দুর্ব্বলা হইবেন না।

আমরা এই স্রোতে গা ঢালিয়া দিব কি না?—ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, তুমি যদি সয়তানের সহিত সখ্যতা করিয়া প্রবল প্রতিকূলতাচরণ না কর,—তুমি যদি নিশ্চল নিশ্চেষ্ট হইয়া নিরপেক্ষভাবেও বসিয়া থাক, তাহা হইলেও দেখিবে, তুমি অজ্ঞাতসারে এই স্রোতের সহিত ভাসিয়া যাইতেছ। স্রোত একবার প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে স্রোতের গতি প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রবল হইতে প্রবলতর বেগ ধারণ করে। কোন দেশের বা জাতির অধিক সংখ্যক লোকের মনের ভাব যে স্রোতে প্রবাহিত হয়, তাহা ধর্ম্মানুমোদিত হইলে স্বয়ং ঐশ্বরিক শক্তি তাহার পরিপোষণ করেন এবং সচ্চিদানন্দময় ভগবান সুদর্শনচক্রে তাহাকে রক্ষা করেন। যাঁহারা নিজের স্বতন্ত্রতা অক্ষুণ্ন রাখিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া শুধু তামাসা দেখেন, তাঁহারা চিরজীবন দারিদ্র্যহত জীবন লইয়া দেশের ও জাতির কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া মানবের ও ভগবানের অভিশাপগ্রস্ত হীনযোনি কৃমিত্ব প্রাপ্ত হন, এখন এই পৃথিবী হইতে প্রয়াণকালে কতকগুলি হীনযোনি কৃমির জনক ও পতি হইয়া প্রেতলোকে নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রণার বোঝা বহন করেন। এই জন্যই সহজ কথায় বলে—"জয়কালে ক্ষয় নাই, মরণকালের ঔষধ নাই।"

বিরুদ্ধাচারিগণ এই প্রবল স্রোতের গতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে না কেন? অধিকাংশ লোকের মন প্রস্তুত হইয়া যে মত গঠিত হয় ও যে ভাবপ্রবাহ বহিতে আরম্ভ হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে জাতীয় জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে এমন কি পশুপক্ষিগণ পর্য্যন্ত সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়। এই স্বদেশী আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হওয়ার পর স্থানে স্থানে নানারূপ নূতন কাণ্ড সংঘটিত হইতেছে। কেহই আর নীরবে বিদেশীদিগের অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। সম্প্রতি গোয়ালন্দ ঘাটে কয়েকটী ঘটনা ঘটিয়াছে। মেসার্স্ বার্ড কোম্পানীর এক সাহেব একটী কুলিকে পদাঘাত করিলে ঐ কুলিও তাঁহাকে প্রহার করিয়াছে। এই সময়ে অন্য দুইজন সাহেব উক্ত সাহেবের সাহায্যার্থ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে অন্য কুলিরা তাঁহাদিগকে বলিল যে—"যদি এই সাহেবের পক্ষ হইয়া এই কুলির গাত্রে হস্ত উত্তোলন কর, তাহা হইলে তোমাদের শরীরের হাড়চাম্‌ড়া একত্রে থাকিবে না।" ঐ দুই সাহেব নিশ্চেষ্টভাবে এই প্রহার দর্শন করিল। গোয়ালন্দের আই, জি, এন্ কোম্পানীর এক সাহেব ঐ কোম্পানীর এক বাঙ্গালী ডাক্তার গিরিশ বাবুকে কিছু অবমাননাসূচক তিরস্কার করিলে ঐ ডাক্তার বাবু তৎক্ষণাৎ চাকরী ইস্তাফা দিয়াছেন ও ঐ সাহেবের মুখের উপর যে সমস্ত কথা শুনাইয়া দিয়াছেন, তাহা সাহেব মহাশয়ের বহুদিন স্মরণ থাকিবে। একটী উড়িয়া বোহারাকে এক সাহেব কটু কথা কহায় সেও সাহেবকে গালি দেয়, তাহাতে ঐ সাহেব দুঃখিত হইয়া বলেন যে, "আজি উড়িয়া বেহারাও আমাকে মন্দ বলিতে সাহস পাইতেছে!" এই সমস্ত ঘটনায় কোন্ পক্ষের ন্যায়, কোন্ পক্ষের অন্যায়, তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা এই মাত্র দেখাইতে চাহি যে সময়ের গতির কি অপূর্ব্ব মহিমা! গঙ্গার পবিত্র স্রোতে অনেক অপবিত্র দ্রব্যাদিও ভাসিয়া যায়। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের পবিত্র স্রোতেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যায় অত্যাচার ও স্বার্থান্ধ ব্যবসায়িগণের দেশীয় দ্রব্যাদির অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি করা, বিদেশীয় পণ্যদ্রব্যকে দেশজাত পণ্য বলিয়া বিক্রয় করা, ভেল চালান প্রভৃতি নানা প্রকার কুকার্য্যের পূতিগন্ধময় শবদেহ ভাসিবে, তাই বলিয়া গঙ্গার পবিত্র স্রোত যেমন

অপবিত্র হয় না, সেইরূপ এই দেশীয় আন্দোলনের স্রোতও অপবিত্র হইবে না। আমরা এই মাত্র বলিতে চাহি যে, এই সময়ের গতি কে রোধিবে? 'কে রোধে কেশরীরে বীতংসে?'

সত্য সত্যই এই আন্দোলনের প্রবাহ কেহ বন্ধ করিতে পারিবেন না। ন্যায়ের নিকট,—সত্যের নিকট,—স্বার্থত্যাগ স্বীকারের নিকট অন্যায়, অসত্য ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থ চিরকাল পরাজিত হইয়া আসিতেছে। আমরা যাহা করিতেছি, তাহা নিজের নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য নহে; আমরা নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলিদান দিয়া ত্যাগ স্বীকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ভগবানের রাজ্যে সংস্থাপন করিবার অভিলাষ করিতেছি। আমরা অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ভগবানের রাজ্যে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। প্রতিকূলাচরণকারী ত্যাগস্বীকারের বিরুদ্ধে সংকীর্ণ স্বার্থের রাজ্য—ন্যায় ও সত্যের বিরুদ্ধে অন্যায় ও অসত্যের রাজ্য স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিবেন, কিন্তু অসত্যস্বরূপ, ন্যায় স্বরূপ, বৈরাগ্যরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ এইরূপ চেষ্টাকে ফলবতী করিবেন না। আমরা যদি উমির্চাদের ন্যায় নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের আকাঙ্ক্ষী হইতাম, তাহা হইলে ক্লাইব,—যিনি দেশের ও জাতীয় স্বার্থের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত কার্য্যই পুরস্কৃত হইতে পারিত ও হইত। কিন্তু এই স্বদেশী আন্দোলনে আমরা উমির্চাদ নহি। সুতরাং মিষ্টার ব্রড্রিক, লর্ড কার্জ্জন, সার্ এণ্ড্রুফ্রেজার, মিষ্টার ফুলার, মিষ্টার কার্লাইল প্রভৃতি যে খেলাই খেলুন না কেন, তদ্দারা আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবেন না; কারণ আমরা অন্যায়, অসত্য ও স্বার্থ প্রণোদিত নহি—আমরা ব্যক্তিগত লাভালাভের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিতেছি না।

কেহ কেহ এমন বলিতে পারেন যে অন্যায় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত কোন আন্দোলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারেনা;—"কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে?" কেহ কেহ বলেন যে. এই আন্দোলনের মূল কারণ ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্রকে এদেশ হইতে বিতাড়িত কর—বিদেশীয় পণ্যদ্রব্যকে "বয়কট" অর্থাৎ অশুচি–জ্ঞানে একঘরো করা, এবং রাজার বিধিবদ্ধ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধাচারণ করা। সুতরাং ঈর্ষ্যা যাহার জননী–বেআইনী কার্য্য যাহার জনক, সেইরূপ স্বদেশী আন্দোলন ভগবানের অভিপ্রেত নহে, তাহা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া শুভফল প্রসব করিতে পারেনা। কিন্তু এই আপত্তি যুক্তিহীন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ অথবা বিদেশীয় দ্রব্যের 'বয়কটের" সহিত এই আন্দোলনের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, এবং উহারা এই আন্দোলনের মূল কারণ নহে, উপাদান বা নিমিত্ত কারণও নহে, কিয়ৎপরিমাণে উত্তেজক কারণ বলা যাইতে পারে। যদি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বিষয়ক আইন রহিতও হয়—যদি সমগ্র বঙ্গদেশেব জন্য একজন গভর্ণরও নিযুক্ত হয়, অথবা প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান্ ডিভিসন্ নূতন পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভূক্ত হয়, তথাপি স্বদেশী আন্দোলনের স্রোত বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে তাহার গতিরোধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অদূরদর্শী ইংরেজী সংবাদপত্রই ঘোষণা করিতেছেন যে স্বদেশী আন্দোলন মৃত হইয়াছে—অদূরদর্শী কার্লাইল ও লায়ন্ সাহেব মনে করিতেছেন যে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণই স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিধিবদ্ধ আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে—মিসেস আনি বেসান্তও সম্যক্ চিন্তা না করিয়াই বলিতেছেন যে স্বদেশী আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন,—ম্যাঞ্চেষ্টারের ধনকুবেরগণও প্রকৃত সংবাদ না জানিয়াই বলিতেছেন যে এই স্বদেশী আন্দোলন তাঁহাদের প্রতিকূল হিংসামূলক আন্দোলন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন বাস্তবিক ইহার কিছুই নহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেশহিতৈষিতা জীবমাত্রেরই জন্মগত

সংস্কার, স্বদেশপ্রিয়তার ভাব বা স্বদেশপ্রেম প্রত্যেক জীবেই বর্ত্তমান আছে ; বহুদিনের সঞ্চিত প্রেম বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা রাজনীতির কোন ধার ধারেন না, তাঁহারাও অবাধে ইহাতে যোগদান করিতেছেন। অনেক ইংরেজ সংবাদপত্র তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে স্বদেশী আন্দোলন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা মনে করেন, যখন ক্ষুধিত ব্যাঘ্র পালকের হাত চাটিতে চাটিতে রক্তের আস্বাদন পায়, তখন বর্ধিত রক্তপিপাসায় পালকের সমস্ত রক্তপান করে। এইরূপে, যদি আন্দোলনকারিগণ অথবা বঙ্গবাসীগণ জানিতে পারে যে তাহাদের আন্দোলন কিঞ্চিৎ ফলজনক হইয়াছে—তাহারা বিদেশীয় পণ্যব্যবসায়ীদের কিঞ্চিৎমাত্রও ক্ষতি করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে বর্দ্ধিত উৎসাহেব সহিত তাহারা এই আন্দোলন চালাইতে থাকিবে ; কিন্তু যদি তাহারা জানিতে পারে যে এই আন্দোলন কোনরূপ কার্য্যকরী হইতেছে না, তাহা হইলে তাহারা ইহা হইতে নিবৃত্ত হইবে। ইংরেজ সংবাদপত্রের এই বিশ্বাস ও যুক্তি ভ্রমপূর্ণ। কর্ম্মচারিগণের ধর্ম্মঘটে কিম্বা সৈনিকগণের বিদ্রোহে ও যুক্তি খাটিতে পারে ; কারণ দুই দশজন ধর্ম্মঘট করিত বা বিদ্রোহাচরণ করিতে আরম্ভ করিলে অন্যরা দেখিয়া উৎসাহান্বিত হইয়া তাহাতে যোগদান করে, আবার যখন শুনিতে পায় যে ধর্ম্মঘট ও বিদ্রোহ নিবারিত হইয়াছে তখনই সকলে শান্তভাব ধারণ করে। কিন্তু এই স্বদেশী আন্দোলন ধর্ম্মঘট বা বিদ্রোহাচরণ নহে, ইহা ভগবানের অভিপ্রেত, ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত, অধিকাংশ লোক ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেও প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক ইহা হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। "জীবে দয়া, নামে রুচি" সর্ব্বধর্ম্মের সার। জীবে দয়া করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিজের কুটুম্বভরণ করিতে হইবে ও স্বদেশবাসীর প্রতি দয়া দেখাইয়া তাঁহাদের জীবনধারণের উপায় করিযা দিতে হইবে। "নামে রুচি" অর্থে প্রাণ মন খুলিয়া "বন্দে মাতরম্" এই উদ্গাথার উচ্চারণ। ইহাতে কোন অপরাধ হইতে পারে না। কিন্তু মিষ্টার কার্লাইল ও ফুলার ইহার কিরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন তাহা জানি না। একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজের সহিত আমার এই সম্বন্ধে আলাপ হয়, তিনি আমাকে বলেন যে তাঁহাকে একজন বুঝাইয়া দিয়াছেন "বন্দে" অর্থ "বাঁধ", এবং "মাটরম্" অর্থে "মারপিট্" দাও। এইরূপ অর্থ করিলে "বন্দে মাতরম্" পুলিশ সার্কিউলারের মধ্যে আসিলেও আসিতে পারে, কিন্তু আমরা "বন্দে মাতরম্" এইরূপ অর্থে প্রয়োগ করি না। যখনই অসত্য ও অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতে হয়—আর্ত্তের ক্লেশ নিবারণ করিতে ইচ্ছা হয়, তখন একার শক্তিতে না কুলাইলে আমরা "মার" নাম করিয়া ডাকি, অমনি মায়ের সন্তানগণ যিনি যেখানে থাকেন ছুটিয়া আসিয়া শুভকার্য্যের সহায়তা করেন। ইহা করিলে আইন অনুসারে কোন অপরাধ হয়? যে আইনে বা সার্কিউলারে ইহাকে অপরাধ বলে, সেই আইন বা সার্কিউলারকে কর্ম্মনাশ জলে নিক্ষেপ কর।

অনেক স্বার্থান্ধ ইংরেজ মনে করিতেন যে ছাত্রগণকে ও তাহাদের শিক্ষকগণকে এই স্বদেশী আন্দোলন হইতে দূরে রাখিতে পারিলেই স্বার্থের জয় ও দেশহিতৈষিতার পরাজয় হইল,—ইংরেজরাজের সিংহাসন দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। অবোধ ইংরেজ ! তোমরা এতদূর নীচে নামিয়াছ ! ভগবান্ তোমাদের হস্তে জগতের রাজ্যশাসনভার দিয়াছেন কেন? তোমরা আত্মরক্ত বলিদান দিয়া নিজের স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ দেখাইয়া জগৎ হইতে দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়াছ,—অসভ্য দেশে সভ্যতার ও সত্যের আলোকে এবং বাইবেল লইয়া গিয়াছ,—জগতে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছ,

তজ্জন্যই জগতের শাসনভার পাইয়াছ। অন্যায় করিয়া তুমি বাঙ্গলার রাজা হও নাই,—যুদ্ধে লোকসংহার করিয়া তুমি আমাদের দেশ কাড়িয়া লও নাই। ভগবানের ইচ্ছাক্রমে আমরাই সদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তোমাদের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছি। তুমি মোহনলালের শাণিত তরবারি বক্ষে ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হও নাই,—পঞ্জাবের খাল্‌সা সৈন্যদিগের কামান বক্ষ পাতিয়া অম্লানবদনে গ্রহণ করিয়াছ। কিন্তু বল দেখি, এক্ষণে সামান্য কয়েকজন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নির্দ্দোষ "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি তোমার কর্ণে অশনিপাতের ন্যায় কেন বোধ হয়?—তোমার হৃদয় কেন কম্পিত হয়? ভীরুতার কারণ কি? ন্যায়েব নিকট কে কম্পিত না হয়? তুমি কি জগতের নিকট—ভগবানের নিকট বলিতে পার, "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ করার জন্য ছাত্রগণকে দণ্ড দিতেছি? যদি ছাত্রগণ কিম্বা কোন বাঙ্গালী, দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত না হয়,—অন্যায় কার্য্য না করে,—দণ্ডবিধি আইনের কোন ধারার অপরাধ না করে, তাহা হইলে আমাদিগকে শাস্তি দিবার তোমার কি ক্ষমতা আছে? বর্দ্ধমান জেলায় এক ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব একদা এক পাগলকে বলেন, "তুই জানিস আমি কে? আমি তোকে জেলে দিব।" পাগল উত্তর করিল, "আমি চোরের হাকিম, চুরী করিলে জেলে দিতে পার ; আমাকে জেলে দেওয়ার ক্ষমতা তোমার নাই।" যাঁহারা বিবেকের দংশনে প্রপীড়িত (Victim of unrestful conscience) তাঁহারাই নির্দ্দোষ "বন্দে মাতরম্" শুনিয়া ভয়বিহ্বল হয়েন।

ছাত্রগণ ও শিক্ষকগণ এই স্বদেশী আন্দোলনের সহিত প্রকাশ্য সভায় প্রকাশ্যভাবে যোগদান না করিলে কি আন্দোলন অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে? তাহা কখনও হইবে না - তাহা কখনও হইবে না। ছাত্রগণের যে কার্য্য তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহারা এখন দূরে থাকিয়া সোৎসুক নয়নে তাহাদের পরিচালিত আন্দোলনের গতি নিরীক্ষণ করুক এই আমার ইচ্ছা। ন্যায়কে—সত্যকে বাঁধিবার জন্য যতই বন্ধন আঁটিয়া দিবে, ততই তাহা খসিয়া যাইবে। রাণী যশোমতী সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সুদীর্ঘ দড়ী দিয়াও বাঁধিতে পারেন নাই। যদি এই নিরীহ ছাত্রবৃন্দের বিরুদ্ধে এই নির্দ্দোষ স্বদেশী আন্দোলনের জন্য কোনরূপ অন্যায় মিথ্যা মকদ্দমা স্থাপিত হয় অথবা অন্য কোন দণ্ড প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে অচিরেই দেখিতে পাইবেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ কেহই নীরবে না থাকিয়া সকলেই সমস্বরে তীব্র প্রতিবাদ করিবে। স্বদেশহিতৈষিতার তরুণ ভানু অচেতন বঙ্গদেশে কিরণ বিতরণের অগ্রে অগ্রে ছাত্রগণ গমন করিয়া মনোহর বৈতালিক গীত "বন্দে মাতরম্" গাহিয়া সকলকে জাগরিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ;—

"তথা বালিখিল্যা ঋষয়োঽঙ্গুষ্ঠ পব্বমাত্রাঃ।

ষষ্ঠিসহস্রানি পুরতঃসূয্যঃ সূক্তবাকায় নিযুক্তঃ

সংস্তবন্তি॥" (৫/২২/১৭)।

অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বমাত্র এই সকল ঋষি আদিত্যমণ্ডলবর্ত্তী আধিদৈবত পুরুষের অনুগামী। প্রজাপতিগণ অর্থাৎ সপ্তর্ষিগণ প্রজা সৃষ্টি করেন, তাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গের প্রবর্ত্তক। সপ্তর্ষির মধ্যে ক্রতু নামক ঋষির ষষ্ঠি সহস্র ক্ষুদ্রকায় বালখিল্য নামক ঋষিগণ পুত্র ছিলেন। ইঁহারা সকলেই প্রবৃত্তিমার্গের প্রবর্ত্তক। যখন সূর্য্যদেব রথে আরূঢ় হইয়া পরিক্রমণ করেন, তখন এই সকল ঋষি রথের অগ্রভাগে গমন করেন এবং সূর্য্যদেবের স্তুতি করেন। আমাদের ছাত্রগণও

বালখিল্য ঋষি প্রবৃত্তিমার্গের প্রবর্ত্তক। দেশহিতৈষিতারূপ সূর্য্যদেবের রথের অগ্রভাগে গমন করিয়া "বন্দে মাতরম্" এই স্তুতি পাঠ করেন। ইহাঁদের কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। রামায়ণে আছে--ভুভার হরনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র অবতরণ করেন। বৈষ্ণবী ধনুতে শর যোজনা করিলে বৈষ্ণবী শক্তি তাহাকে আশ্রয় করিল।

ততঃ পরশুরামস্য দেহান্নির্গত্য বৈষবম।

পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং তেজো রামমুপাগমৎ॥

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বৈষবী শক্তি পরশুরামে আবিষ্ট ছিল, এক্ষণে সমস্ত বৈষ্ণবী শক্তি শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্রয় করিলে পরশুরামের কোন প্রয়োজন রহিল না; তপস্বার্থ কৈলাসে গমন করিলেন। আমাদের ছাত্রবৃন্দও এক্ষণে তপস্যায় নিরত হইতে পারেন; মনু বলেন, "ছাত্রানামধ্যয়নং তপঃ।" তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে.—তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তিশালী ব্যক্তিগণ এক্ষণে এই স্বদেশী আন্দোলনে যোগাদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঘাত-প্রতিঘাত না হইলে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় না শক্তি প্রকাশিত হয় না, প্রবল বাধা না পাইলে প্রবল শক্তির বিকাশ হয় না। স্বদেশী আন্দোলন অঙ্কুবিত হইয়াছে, ইহাকে রক্ষার জন্য দেবগণ ও মহাপুরুষগণ সচেষ্ট হইয়াছেন। এই দেশহিতৈষিতার স্রোত যতই বাধা পাইবে, ততই প্রবলতর বেগ ধাবণ করিয়া বাধাবিঘ্ন ভাঙ্গিয়া লইয়া অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইবে।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর দানে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই অগ্রসর হওয়া উচিত। এই প্রবন্ধের শিরোভাগে স্বদেশ প্রেমিক ব্রুটাসের উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আমরাও সকলে অকুল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, সময় বুঝিয়া সকলকেই স্বদেশী আন্দোলনের অনুকুল স্রোতে সন্তরণ দিতে হইবে. নচেৎ বাঙ্গালীর জীবনতরী চড়ায় ঠেকিয়া বিপন্ন ও ভগ্ন হইবে,— বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব আর্য্যজাতির প্রধান শাখা আর্য্যহিন্দু হইতে বিচ্যুত হইয়া কাঠুরিয়া ও ভিস্তিওয়ালার মধ্যে পরিগণিত হইবে—Hewers of wood and drawers of water.

এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা হিন্দুর ষড়দর্শন পাঠ করিয়াছি,—ইংরেজের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠ করিয়াছি,--মহাত্মা ডিগ্‌বী সাহেবের প্রণীত (Prosperous India) পাঠ করিয়াছি, সুতরাং আমাদিগকে অলীক ভয় প্রদশন করিয়া ও চাকরীর প্রলোভন দেখাইয়া আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইতে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করা বৃথা। ইংলিশম্যানপ্রমুখ অনেক ইংরেজী কাগজ বলিতেছেন যে আমরা এই আন্দোলন হইতে প্রতি নিবৃত্ত না হইলে ইংরেজেরা আমাদিগকে চাকরী দিবেন না। চাকরী করা অর্থে অন্যের সেবা করা—অন্যের দাসত্ব করা। যদি ইংরেজগণ হিন্দু মুসলমান চাকর না রাখিয়া এই ভারতবর্ষে একাধিক দিবসও বাস করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা সন্তোষের বিষয়। কিন্তু আমরা জানি, মুসলমান আয়া ও খানসামা এবং হারাম পাক করিবার জন্য ম্যাথর না রাখিলে এবং হিসাব বিভাগে হিন্দু কেরাণী না রাখিলে ভারতে ইংরেজ থাকিতে পারেন না। আর অন্য চাকরীর কথা কি বলিব? যদি বাস্তবিকই মিষ্টার কার্লাইলের ও মিষ্টার ফুলারের সার্কিউলার প্রত্যাহৃত না হয়,—যদি গভর্ণমেন্টের স্কুল কলেজের "বয়কট্" করিয়া আমাদিগকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ই স্থাপন করিতেই হয়, তাহা হইলে জাতীয় স্কুল কলেজ; বিলাতের ক্যাম্ব্রিজ,

অক্সফোর্ড প্রভৃতি বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে,—এই দেশে ডেপুটী মাজিষ্ট্রটের চাকরীর প্রার্থী না হইয়া বিলাতে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, এদেশে উকীল না হইয়া বিলাতের ব্যারিষ্টার হওয়া যায়,—এদেশে সরকারী ডাক্তারী কলেজে না পড়িয়া বিলাতের ইণ্ডিয়ান্ মেডিক্যাল্ সার্ভিস্ লাভ করা যাইতে পারে, এবং বেসরকারী চাকরী ও ব্যবসায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। আমাদের দেশেও এই কথা প্রচলিত আছে— "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ, তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি, তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং"। মহাত্মা ডিগ্‌বী সাহেবের পুস্তক পাঠ করিলে জানা যায়, ইংরেজকৰ্ম্মচারিগণ ভারতবর্ষ হইতে কত অর্থ দেশে লইয়া যাইয়া তদ্দারা বিলাতে কলকারাখানা স্থাপন কবিয়া ধনী হইয়াছেন। ভারতবাসিগণ সরকারী বা বেসরকারী চাকরী করিয়া প্রতিবৎসর যে বেতন প্রাপ্ত হয়েন, তাহার সমষ্টি অতি সামান্য। ইংরেজ ব্যারিষ্টার ও ইংরেজ ডাক্তার এবং ইংরেজ বণিক এই দেশ হইতে বৎসর বৎসর যত অর্থ লইয়া যান, তাহার তুলনায় সমস্ত চাকরীর বেতন সমষ্টি অতি সামান্য। আমরা প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে ৩৩ কোটি টাকার কাপড়, ৫ কোটি টাকাব চিনি, ৩ কোটি টাকার তৈল, সওয়া দুই কোটি টাকাট জুতা, এক এক কোটি টাকার রেসম, ঔষধ, কাঁচ, বং, ৫০ লক্ষ টাকার দেশলাই, ৫০ লক্ষ টাকার গাড়ী, ৭৫ লক্ষ টাকার কাগজ ষ্টেশনারী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকি। কৃষিকার্য্যের উপস্বত্বের অর্থাৎ চা, নীল প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্যের লভ্যাংশও ইংরেজ কোম্পানীব হাত দিয়া বিদেশে নীত হয়। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে চাকরী না করিয়া বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য করিলে আয্যজাতির উন্নতি ভিন্ন অবনতি হইবে না।

সমপ্রতি বস্ত্রবয়নের প্রতিই আমাদেব অধিক মনোযোগী হইতে হইবে ; কারণ কাপড়ের জন্যই আমরা বৎসর বৎসর ৩৩ কোটি টাকা বিদেশে দিয়া থাকি। আমাদের কৃষি প্রধান দেশ কার্পাস অনায়াসে জন্মাইতে পারি। যে দেশে কার্পাস নাই, সে দেশের লোকের বস্ত্রবয়ন করিতে যাওযা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের দেশে শ্রাদ্ধের সময় ভূমিদান দিবার বিধান আছে। বাঙ্গলার প্রত্যেক গৃহস্থই যদি এক এক বিঘা জমীতে কার্পাস বপন করেন, নিজ নিজ গৃহপ্রাঙ্গনে ১৫টী কার্পাস বৃক্ষ রোপণ করেন, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন ভারতের গৌরব-রবি আবার উদিত হইবে। পাঠকগণ কি এই বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন?

লর্ড কার্জ্জনও সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"Our real reform has been to endeavour for the first time to apply science in a large scale to the study and practice of Indian agriculture". ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্যে অধিক পরিমাণে বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রয়োগ না করিতে পারিলে প্রকৃত উন্নতির আশা কম। আমরা কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞান প্রয়োগ করিতে সমর্থ নহি, এই বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবেনা। পূর্ব্বে ঢাকাতে অতি সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইত, তদ্দ্বরা মছলিন বস্ত্র প্রস্তুত হইত। মছলিন বস্ত্র প্রস্তুতের উপযোগী উৎকৃষ্ট কার্পাস ঢাকাতেই জন্মিত, ঢাকার রমণীগণই চরকার সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম সূত্র কাটিতে পারিতেন এবং তদ্দ্বারাই মছলিন বস্ত্র বয়ন করা হইত। কার্পাস বৃক্ষের বীজ অনেকেই কেন, সকল গৃহস্থই স্বীয় স্বীয় গৃহপ্রাঙ্গনে বাসাবাটীতে লাগাইতে পারেন, ঐ কার্পাস দিয়া অন্ততঃ আমোদের জন্যও চরকা দ্বারা সূত্রে প্রস্তুত করিতে পারেন, এবং সেই সূত্রে প্রতিবেশী কোন তন্তুবায়ের বাটীতে পাঠাইয়া তিন চারি আনা মজুরী দিয়া একখানা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া আনাইয়া তাহা অতি যত্নের সহিত, আনন্দের সহিত, আদরের

সহিত, পরিত পারেন। স্বদেশপ্রেমিকের নিকট "ক্ষেতের সোনা," 'বাণিজ্যের সোণার' ন্যায় ভালবাসার সামগ্রী।

কোন কোন রাজভক্ত, স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিতে নানা কারণে ইতঃস্তত: করিতেছেন। তাঁহারা মনে করিতেছেন যে স্বদেশী আন্দোলন ইংরেজরাজের অনভিপ্রেত কার্য্য। বাস্তবিক তাহা নহে। দিল্লীর দরবারে ভূতপূর্ব্ব বড়লাট পত্নী এই দেশের কিংখাপ ও অন্যান্য বস্ত্র ব্যবহারের সহায়তা করিয়া স্বদেশী ভিত্তি পত্তন করেন। পশ্চিমবঙ্গের ছোটলাট এই দেশের দ্রব্যাদিই ভালবাসেন। ফলত: প্রত্যেক মহানুভব ইংরেজ রাজপুরুষই ভারতবর্ষে জাত দ্রব্যাদির পক্ষপাতী জারী করিয়া ছাত্র ও শিক্ষক নিগ্রহের দুর্ব্বল চেষ্টা চলিতেছে, ইহা কেবল দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণের জন্য, স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নহে।

কোন কোন হিন্দু রাজভক্ত, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের নব লেপ্‌টেনান্ট্ গভর্ণর ফুল্যার সাহেবের ঢাকার ও বরিশালের উক্তির উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে হিন্দুরা উন্নতিমার্গ হইতে পাঁচশত বৎসর পশ্চাতে পড়িল—হিন্দুগণ চাকুরী পাইবে না, মুসলমানগণই অল্পবিদ্যাতেও চাকরীর অধিকারী হইবে। অবিবেচক ব্যক্তির নিকট এই কথা কতটা যুক্তিযুক্ত বোধ হইলেও ইহা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। সুযুক্তিপূর্ণ রিপোর্ট লিখিবার জন্য- অন্ববিদ্যায় হিসাব নিকাশ করিবার জন্য মিষ্টার ফুলার কোন্ জাতীয় কেরাণী নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইবেন? যদি এই স্বদেশী আন্দোলনে, মুসলমানগণ মাসিক ২০/২৫ টাকা বেতনের কেরাণীগিরির প্রলোভনে, অথবা সবরেজিষ্টারী অফিসে চাকরী পাওয়ার দুর্দ্দমনীয় লোভবশতঃ যোগদান না করেন, তাহা হইলে হিন্দুগণের অনিষ্ট হইবে না, যাহারা এই আন্দোলন স্রোতের ঝাঁপ না দিবে, তাহাদেরই অবিষ্ট স্থিরনিশ্চিত। লর্ড কার্জ্জনও একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন--"To prepare us for complete living is the true function of educaton'. Higher education is a science, the science fo human life and conduct, in which we must give a fair leaving". অনেক শিক্ষিত লোকের মনে এই অমূলক সন্দেহের উদয় হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের উচ্চশিক্ষার প্রতিকূলতাচরণ করিতেছেন। লর্ড কার্জ্জন সেই সন্দেহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন "Becaușe of the suspicion that we encounter among the educated classes that we really desire to restrict their opportunities and in some way or other to keep them down". তৎপর তিনি বলিয়ায়াছেন যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এমন মূর্খ নহেন যে তিনি বাঙ্গালীর ন্যায় অতিশয় শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান জাতিকে উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিবার চেষ্টা করিবেন এবং চেষ্টা করিলেও যে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে তাহাও স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার্য।" যাহা আইনবলে পারা যায় না, তাহাই করিবার জন্য ছোটলাট ফুলার সাহেব চাকরীর প্রলোভন দেখাইতেছেন কেন? ইংরেজের ন্যায় বুদ্ধিমান জাতি জগতে অতি অল্পই আছে। সেক্‌স্পীয়ার, মিল্‌টন, নিউটন, হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার, হার্সেল প্রভৃতি মহাত্মাগণের বংশধরেরা বাঙ্গালী হিন্দুর সহিত সমান সুবিধায় প্রতিযোগী পরীক্ষা দিতে ভয় পায় কেন? কারণ তাহারা অনেক নীচে নামিয়াছে। এই অবনতির কারণ কি? একমাত্র কারণ এই যে, গভর্ণমেণ্টের প্রিয়পুত্র হইয়া অল্প বিদ্যাতেও চাকরী পাওয়া যায়, বাঙ্গালী হিন্দু শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম না করিলে বিলাতে যাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না। মহাত্মা উড্রোফ্; ইভান্স, পলসাহেব, ডব্লিউ, সী, বনার্জ্জি প্রভৃতি বারিষ্টারগণ ও বহুসংখ্যক উকীলগণ, বহুসংখ্যক ডাক্তারগণ, বহুসংখ্যক ব্যবসায়িগণ

ও রাজা মহারাজার কার্য্যকারকগণ এবং বহুসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারগণ মাসে মাসে যত টাকা রোজগার করেন, তদ্বারা ২০/২৫ টাকা বেতনের কত কোটি চাপ্‌রাসীর সেবা ক্রয় করা যায়? হিন্দুগণের সহিত অল্প অল্প প্রতিযোগিতা করিয়া মুসলমানগণ অনেক ডাক্তার ও উকীল হইতেছিলেন, কিন্তু যদি মুসলমান ছাত্রগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে যে সামান্য শিক্ষা দ্বারাই গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে ক্ষুদ্র চাকরী মিলিবে, তাহা হইলে কয়জন উচ্চশিক্ষার জন্য লালায়িত হইবে? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করিয়া কাহাকেও কোন অভিনব জমিদারী দান করা হইবেনা ইহা বিঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং মুসলমানদিগকে চাকরীর প্রলোভন দেখাইয়া উচ্চশিক্ষা বিষয়ে পরাঙ্মুখ করা কাহারও উচিত নহে। ভরসা করি মুসলমান সম্প্রদায়ের অগ্রণিগণ এই বিষয় স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। মুসলমানগণ চাকরী পাইলেও হিন্দুদিগের কোনই উদ্বেগের কারণ নাই; কারণ স্বদেশী আন্দোলন স্বার্থকের নহে,—কোন একটী জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের উপকারার্থ নহে, স্বদেশের সকলের উন্নতিকল্পেই সমানভাবে সচেষ্ট।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বদেশী আন্দোলনের সহিত বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক নাই। যদিও বঙ্গবিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশী আন্দোলন জ্বলিয়া উঠিয়াছে—যমজভ্রাতার ন্যায় একত্র উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তথাপি উভয়ের জন্য কারণ এক নহে। স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষের সাধারণ আন্দোলন, আর বঙ্গবিভাগের প্রতিকূলে যে আন্দোলন তাহা বঙ্গবাসীর মধ্যে আবদ্ধ। বঙ্গবিভাগে ভারতবাসীর পরিণামে লাভ হইবে কি ক্ষতি হইবে, তৎসম্বন্ধে ভরতবাসীদের মধ্যে অনেকের মতদ্বৈধ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন ফলোপধায়ক না হইলে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের যে ঘোর অনিষ্টপাত হইবে, তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই ও কোনই মতদ্বৈধ নাই। গত ৩০শে নভেম্বর সেইণ্ট্ আণ্ড্রুস দিবসে কলিকাতা টাউন হলে যে ভোজ হয়, তথায় আমাদের বর্ত্তমান বড়লাট লড মিণ্টো উপস্থিত ছিলেন। সেই ভোজনসভায় ভারত হিতৈষী মিষ্টার ডি. এস. হ্যামিল্‌টন যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাকে তিনি বলিয়াছেন যে, স্বদেশী আন্দোলন কতটুকু পর্য্যন্ত যমজ তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

উক্ত সভায় মিষ্টার হ্যামিলট্‌ন "বন্দে মাতরম্" সম্বন্ধে কয়েকটী উপাদেয় উপদেশ দিয়াছেন! তিনি বণিকশ্রেষ্ঠ এবং অর্থ ব্যবসার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিশেষতঃ স্বদেশী আন্দোলনের শিষ্য বলিয়া পরিচিত। আমরা ভারতবাসী অর্থব্যবহার শাস্ত্রে অজ্ঞ, অর্থনীতির কূট আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, আমাদের প্রকৃত বন্ধু কে, তাহাও চিনিতে পারিতেছি না। সুতরাং মিষ্টার হ্যামিলটনের উক্তি ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থায় অগ্রণীয় কি না তাহা সুধিগণের অবধারণার্থ সংক্ষেপে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করা যাইতেছে।

মিষ্টার হ্যামিলটন্ "বন্দে মাতরম্", এই মহতী উক্তিকে প্রশংসা করিয়া ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"Motherland is the Seat of Life, the Giver of Wealth, the sole Nourishare and Upholder," জন্মভূমি জীবনের উৎস, সম্পদদায়িকা, একমাত্র পালিকা ও পোষিকা। মিষ্টার হ্যামিল্‌টন্ আরও বলেন যে "স্বদেশীও আছে, স্বদেশীও নাই" (There is Swadeshi and Swadeshi). অর্থাৎ সব স্বদেশী সমান নহে। অন্য দেশের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়া যদি নিজের দেশের লোকসান হয় তাহা হইলে তাহা তমোজ্ঞানপূর্ণ, স্বদেশী, তাহা

হেয়। যেমন, বিলাতী দ্রব্যের উপরে রাগ করিয়া ভারতের অর্থদ্বার ক্রীত বিলাতী দ্রব্য দগ্ধ করা।" এস্থানে একটী কথা এইমাত্র বক্তব্য আছে যে, বিলাতের প্রতি শত্রুতা করিয়া কেহই ভারতের অর্থ পোড়ায় নাই, নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ, অর্থাৎ "এই হাতে আর বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিব না, যায় জীবন যাউক, যায় ভারত রসাতলে যাউক, আমার প্রতিজ্ঞা অটল, অচল থাকিবে," এই উদাহরণ জগতে দেখাবার জন্যই অর্থ দ্বারা ক্রীত (যেমন বিষ, মদ্য প্রতিজ্ঞাপালনের অন্তরায় সুতরাং অধর্ম্মের পোষক দ্রব্য) দ্রব্যাদি স্থানে স্থানে ভষ্মীভূত হইয়াছে। যদি স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র চেষ্টা করিতে হয়, তাহা হইলে, স্বদেশী আন্দোলনের কোন অর্থ-ই থাকেনা। লড মিন্টো তাঁহার বক্তৃতায় "Breaths there a man" ইত্যাদি যে কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেই স্বদেশ অর্থ স্কটল্যাণ্ড, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নহে। মিস্টার হ্যামিলটন অর্থনীতি শাস্ত্রের একটী স্বীকার্য্য সত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাহা এই,—যে দেশের খরিদ করিবার শক্তি (Purchasing power) অধিক সেই দেশেই ধনী ; —যে মুদ্রায় বা দ্রব্যের ক্রয় করিবার শক্তি (Purchasing power) অধিক, তাহাই অধিক মূল্যবান লর্ড কাজ্জন এদেশ হইতে প্রস্থানের পূর্ব্বে বৈকুল্যা সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এই দেশের শ্রীবৃদ্ধির এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, আমাদের টাকার ক্রয় করিবার শক্তি কমিযাছে। মহামান্য ফুলার সাহেব যে সায়েস্তা খাঁর কথা বলিয়া আমাদিগকে জুজুর ভয় দেখাইয়াছিলেন, সেই সায়েস্তা খাঁর কালের এক টাকা আট মণ চাউল খরিদ করিতে পারিত, এখনকার ৩২ টাকা আট মণ চাউল খরিদ করিতে পারে। মিষ্টার হ্যামিলটন কয়েকটী উদাহরণ দিয়াছেন, তন্মধ্যে একটীর উল্লেখ করিতেছি। দেশের অধিবাসীদের প্রয়োজন কুলাইয়া ভূমি হইতে যত পরিমান প্রয়োজনাতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন করা যাইবে, তাহাই স্বদেশী শিল্পের লাভ। ভূমিতে ফসল না জন্মিলে কল কারখানা চলিতে পাবে না। দেশের অধিবাসীর পরিশ্রমের মূল্য না থাকিলেও কল কারখানা চলিতে পারে না। এই জন্যই আমরা বলিতেছি, সর্ব্বাগ্রে ভারত ভূমি হইতে কপাস উৎপাদনের উপায় কর, তৎপর চরকা দিয়া সূতা কাট, তৎপর তোমার পরিশ্রমের মূল্য বৃদ্ধি কর;—অর্থাৎ অশিক্ষিত পরিশ্রম মূল্যহীন, শিক্ষিত পরিশ্রম (যেমন শিল্পবিদ্যা ইত্যাদি) স্বর্ণপ্রসূ।

বিনীত—

রাজবাড়ী। শ্রীজানকীনাথ পাল, বি, এল্,

নাস্তিক

'ভালবাসা'? ছি ছি সখি ভুলে যাও তাহা
কাপের অঙ্গুলি স্পর্শে পলে পলে যাহা
ভাঙ্গে গড়ে এত ;—সে কি ভালবাসা? হায়!
ধু ধু আমি শিখা, সে যে তৃণানল প্রায়!
আজি করিয়াছি তোমা আত্ম-সমর্পণ,

হয় তো দেখিবে কাল আরেক নয়ন,
আরেক সৌন্দর্য্য আসি বিনামূল্যে লবে
কিনিয়া হৃদয় প্রাণ, অনাদৃত রবে
তুমি সেথা, ধুলি হ'বে তব প্রেমাঞ্চল !
পুরুষের মন সখি এমনি চঞ্চল।
'উপকার ?'—ধিক্, সেও স্বার্থময় অতি—
প্রতিদান প্রত্যাশায় ; প্রদোষ-আরতি
দু'খানি চরণে শুধু বরলাভ তরে ;
বাহিরে তোমার পূজা—নাস্তিক অন্তরে।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

কামাক্ষীপ্রসাদ বসু : কাম্বোডিয়ার ভাষা, যোগীন্দ্রনারায়ণ কাব্যতীর্থ : প্রথম [কবিতা], ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী : বুদ্ধদেবের অন্তিম শয়ান,

প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার (১। হাড়মালা)। (২)

প্রাণবায়ু হৃদিস্থানে করএ উশ্বাস।
অপান বায়ু গোপ্তে কমলে করে বাস॥
জ্যোতির্ম্ময় রূপে নাড়ি পদ্মের সমান।
কণ্ঠে থাকিআ বাক্য করাএ উদান॥
ব্যান বায়ু সর্ব্ব শরীরে করে স্থিতি।
বাসট্ট হাজার নাড়ি বহে যার গতি॥
নাগ বায়ু শরীরেত করাএ চেতন।
দক্ষ বায়ু করাএ ত চক্ষুতে মিলন॥
দেবে দৈত্যে বায়ু দেখে (দেহে?) হাস্য তুলাএ।
ধনঞ্জয় বায়ু দেহে শব্দ করাএ॥
কিঙ্কর বায়ু শরীরে করে ভোগ।
বায়ু বশ করিলে তবে সিদ্ধি হএ যোগ॥১০০
দশ বায়ুর কথা যেন কহিলাম আমি।
ষড়চক্র ভেদ কথা কহি শুন তুমি॥
মুলাধার সাধিষ্টান আর মণিপুর।
অনাহত বিশুদ্ধি আর আজ্ঞা চক্র মূল॥
চক্রমূল নাভিদেশে আর হৃদয়।
কণ্ঠদেশে ভুরু মধ্যে এইস্থানে রএ॥
ছঅ স্থানে ছঅকঅল* আছ এ বেকতে।
কহিব সকল কথা ভোক্তার সাক্ষাতে॥

* কঅল-কমল।

গুহ্য মুলে মূলাধার অরুণ বরণ।
বসেন্তক (?) বর্ণ চারি দলেত লিখন॥
তার মধ্যে যোনি মুদ্রা আছএ বিরলে।
সিদ্ধাগণ বন্দিত (?) কামাখ্যা রূপ ধরে॥
জবা কুসুম বর্ণ আছে উর্দ্ধমুখে।
যোনি মধ্যে মহালিঙ্গ আছে অধমুখে॥
লিঙ্গমুলে সাধিষ্ঠান বিজুলী আকার।
বালাঙ্কক ছয়দলে অঙ্কুরিত তার॥
নাভিমূলে মণিপুর রত্নের আকার।
ডাদিক কার রস্ত দশ দলে তার॥
হৃদি পদ্ম অনাহত সুবর্ণ বরণ।
বার দলে ককার আদি ঠকার যুগল॥ ১১০
তালু মূলে বিশুদ্ধি চক্র যে জ্যোতির্ম্ময়।
ষোল দলে শুন শুর (?) বাত্তা আছ এ॥
ভুরু মধ্যে আজ্ঞা চক্র যেন মণি বণ।
শেষ দুই অৰ্দ্ধ দুই দলেত লিখন॥
(যড় চক্র ভেদ কথা কহিবা আন্ধারে।
এহা বহি গোপ্ত কথা নাহিক সংসারে॥)
জ্যোতির্ম্ময় রূপে সেই আছে অধমুখে।
সুষুম্নার মধ্যে ত থাকএ সুক্ষরূপে॥
সুষুম্নার মধ্যে তথা বহে ব্রহ্মপুরে।
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা বৈসে নাসিকার দ্বারে॥
শক্তিরূপে চান্দে তথাএ বহে ত পবন।
দক্ষিণেত শিব শক্তি বায়ুর গমন॥
হকারে নিঃসরে বায়ু শ কারে প্রবেশে।
হংস মতি শাস্ত্র জীবে জপে এহ নিশে॥*
অজপা এহার নাম শুনহ পাৰ্ব্বতি।
হংস বায়ু সাধিলে সিদ্ধি হএ মুকতি॥
যত স্থানে যত পীঠ কহি শুন তারে।
ষড় চক্র ভেদ কথা কহিলুম তোমারে॥
মহাপীঠ উড়িআন আর জলন্ধর।
কামরূপে বর্ণগিরি শ্রীহট্ট আর॥ ১২০
এই পঞ্চ পীঠ আছএ পঞ্চ স্থানে।
বিবেচিয়া কহি শুন দেবি সাবধানে॥
শক্তি নাভি দ্বার (পুরে?) মধ্যে পীঠ উড়িআন।

* এহ নিশে – না হইয়া 'অহর্নিশে' ছিল, বোধ হয়।

ন্যাভিরত্ন অধেতে কিছু জলেশ্বর স্থান।।
কামের উপরে পূর্ণ আছে গিরি।
শ্রীহট্ট পীঠ আছে তালুর উপরি।।
মূল আদি করিয়া সহস্র দল কমল।
কদম্ব গোলাক্ষ পুনি বুঝি এ সকল।।
মেরুডণ্ড (দণ্ড) জুড়িআ ত আছএ সকল।
ত্রিশ গোট গ্রহন্থির কহি ত্রিশ ফল।।
পঞ্চ পীঠ ত্রিশ গ্রন্থি আছএ বিশেষে।
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা বৈসে তাহাব দুই পাশে।।
মধ্যে তার নাড়ি আছে নামে সুষুম্না।
তিন দ্বারে তিন জন হবিহব ব্রহ্ম।।
স্বরূপে কহিল দেবি শুনহ বচন।
দেবী বোলে আর কথা পুছিতে লএ মন।।
কথাএ বৈসএ চন্দ্র কথাএ বৈসে মন।
কথাএ বৈসএ বায়ু বৈসএ পবন।।
কোন খানে শিব শক্তি দেব আছে তিন।
কথাএ ব্রহ্মাণ্ড সপ্ত পাতাল পণ্ডন।।[১৩০]
কার কোন রূপ কিবা বৈসে কোন ঠাই।
বিস্তারিয়া কহ শুনি ত্রিলোক্য গোসাঞি।।
শিবে রোখে দেবি শুন বচন আন্ধার।
যেইখানে যেই বৈসে কহি শরীর মাজার।।
কণ্ঠে আদি বৈসে চান্দ্র কমল দুই দল।
সূর্য্যের আগে বায়ু বৈসে চান্দের লাগে মন।।
যোগ্য শক্তি বৈসে কণ্ঠে অধ শক্তি মূলে।
মধ্য–শক্তি নাভিমূলে বৈসে কুতহলে।।
নাভিমূলে বৈসে ব্রহ্ম হৃদয়ে শ্রীহবি।
বায়ুরূপে শিব তথাএ দেব অধিকাবী।।
রজ গুণে বৈসে ব্রহ্মা যত্ন গুণে হরি।
তম গুণে রুদ্র তথা জমত শ্রীহরি।।
মেরু শৃঙ্গে বৈসে চান্দ কমল দুই দল।
অধ মুখে অমৃত যে করিব সফল।।
ববি শশী দুই জন বৈসে দুই জনে।
অধ মুখে চান্দ রবি করএ ভক্ষণে।।
দোহার সংযোগ প্রাণ দোহে থাকে সুখে।
এহার প্রমাণ জন্ম বুঝ গুরুমুখে।।
যেই সব কহিল দেবি শুনহ কথন।
এহার অন্ত পাএ যেই সেই নিরঞ্জন।।
জ্যোতির্ম্ময় নিরঞ্জন সেই নৈরাকার।
অবেক্ত হইআ সৃজে সকল সংসার।।

দেবী বোলে শুন প্রভু আন্ধার বচন।
কোন রূপে (আরাধি?) সেই নিরঞ্জন॥
কিবা রূপ নিরঞ্জন কেমতে তাকে পাই।
বিস্তারিআ কহ শুনি ত্রিলক্ষ গোসাই॥
শিব বোলে শুন দেবি আন্ধার বচন।
কিরূপ মহাপ্রভু না জানি অথন॥
চতুর্দ্দশ শাস্ত্র পড়িলে না জানে শ্রীহরি।
কোন শাস্ত্র কোন মতে দাড়াইতে না পারি॥
এক বোল কহি দেবি শুন সাবধানে।
শরীরেতে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বৈসে যেই স্থানে॥
সারস্তি মহরে (?) তার মনের সহিত।
মন রূপ নিরঞ্জন প্রতি ঘটে স্থিত॥
নিরঞ্জন রূপে মন সংসারের সার।
মায়াতে মোহিত করে সংসারের সার॥
বায়ু হোতে অধিক চঞ্চল মনুরাএ।
নিরবধি শরীরেত ভ্রমিআ বেড়াএ॥
স্থানে ২ গেলে মন ধরে নানা রূপ।
মন স্থির যোগ সিদ্ধি জানিবা স্বরূপ॥[১৫০]
দেবী বোলে শুন প্রভু আন্ধার বচন।
নিরঞ্জন রূপে তুমি করিলে কারণ॥
শরীরেত মন যদি ভ্রমিআ বেড়াএ।
কথাএ* গেলে কোন মর্ম্ম করে মনুরাএ॥
মন হোতে অধিক নাহিক কোন [illegible]।
চিত্ত দিআ শুন দেবি অপূব কথা॥
শিবে বোলে দেবি শুন বিবরণ।
যেইখানে গেলে যেই কর্ম্ম করাএ সেই মন॥
সূর্য্য ঘরে গেলে মন করাএ গমন।
চন্দ্র ঘরে গেলে মন করাএ রমণ॥
তেজ ঘরে গেলে মন ভোজন করাএ।
সুমন্দাতে (?) গেলে মন স্বপ্ন দেখাএ॥
ইঙ্গিলা ঘরে গেলে মন সুখে নিদ্রা যাএ।
সাধিষ্টানে গেলে মন উন্মাদ করাএ॥
যেইখানে ভগ লিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
ভগ লিঙ্গ এক ২ বাএ সেই মনে॥(?)
শৃঙ্গার করন্ত তবে সেই মন স্থানে।
স্বপ্নে চন্দ্র টলে পুনি সেই সে কারণে॥
এইরূপে সেই জন ফিরে সর্ব্বক্ষণ।

* কথায়- কোথায়।

নিরবধি অস্থির থাকে সেই বুলি মন॥[১৬০]
চঞ্চল হইআ মন ফিরে সর্ব্বক্ষণ।
স্থির নহে যেই মন সংসার কারণ॥
সেই মন যথ এ গেলে থাকএ নির্ভয়ে।
তাহাকে চিনিলে মন চিরকাল জীএ॥
মনে মন চিন্তি মন বৈসে এই স্থানে।
এহাকে জানিলে দেবি নাহিক মবণে॥
বিনি গুরু মুখে না জানিএ এহা কেহ।
এহাকে জানিলে সে সুবুদ্ধি লোকেহে॥
এই মতে নিজ দেহে ফিরে মনুরাএ।
অমৃত বরিষে চন্দ্রে তাকে নাহি খাএ॥
সদাএ সুধা জারে (?) না করে ভক্ষণ।
ভক্ষণ হইলে সুধা অমৃত ভক্ষণ॥
এই মত ভ্রমণ কর এ মনুরাএ।
নিশ্চয় (নিশ্চল?) হইলে মন পরম পাদ পাএ॥
গুরুকে সেবিলে সিদ্ধি পাই ভাল মতে।
নিরবধি চিন্তি মন পালিব সেই পথে॥
মনে মন ভাবিয়া করিব সাবধান।
ভাবিতে ভাবিতে তবে সিদ্ধি হইব জ্ঞান॥
তবে দড় করি মন নিব সেই রূপে।
সেই নিরঞ্জন দেবি জানিবা স্বরূপে॥[১৭০]
সেই নিবঞ্জন প্রভু সেই নৈরাকার।
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সেই অধিকার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভাবএ যাহারে।
কোনরূপ নিরঞ্জন ধরাইতে না পারে॥
যার মনে যেই লয় সেই হএ রূপ।
এই সে পরম যোগ কহিল স্বরূপ॥[১৭৩]

"ইতি হারমালা পোস্তক সমাপ্ত: সন ১১১৪ মগী তারিখ ২৪ আশ্বিন স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভয়াচরণ সাং সাকপুরা থানা পটিআ জিলা চট্টগ্রাম হক মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দাসস্য।"

শ্রী আবদুল করিম।

শায়েস্তা খাঁ।

পূর্ব্ববঙ্গের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত ফুলার সাহেব শায়েস্তা খাঁর মূর্ত্তি ধারণ করিবেন প্রকাশ করিয়াছেন ; সুতরাং এ সময়ে নবাব শায়েস্তা খাঁ আমির উলওমরার জীবনচরিত বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে শায়েস্তা খাঁ অতি সুদক্ষ এবং সচ্চরিত্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন ; কিন্তু ইংরেজগণ তাঁহাকে অত্যাচারী লিখিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ

ইংরেজের লেখা অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমানগণের বর্ণনাই গ্রহণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যগণের সত্যপ্রিয়তার ইহা প্রধান নিদর্শন। শায়েস্তা শব্দের অর্থ দক্ষ, সুতরাং তাহার নাম অর্থসূচক ছিল।

শায়েস্তা খাজা আইয়াসের পৌত্র এবং আসফ খাঁর পুত্র। নূরজাহান তাহার পিশি এবং জাহাঙ্গির তাহার পিশা। তাহার পিতা আসফ খাঁ জাহাঙ্গিরেব মন্ত্রী (উজির) ছিলেন; বহুকাল দিল্লিতে ছিলেন; পরে শিবাজীর সাহেবেব জন্য তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাহার রণদক্ষতায় মহাত্মা শিবাজী কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাহার অনেক দুগাদি শায়েস্তা খাঁ অধিকার কবেন এবং পুনা নগরীতে যে প্রাসাদে তিনি বহুকাল যাপন করিয়াছিলেন, শায়েস্তা সেই প্রাসাদে অবস্থান করিতেন। এক সময়ে রাত্রিকালে শিবাজী অল্প সংখ্যক লোক সহ শায়েস্তা খাঁব প্রাসাদ আক্রমণ করেন। শায়েস্তা খাঁর বহু লোক হতাহত হয় এবং তিনি স্বয়ং একটি গবাক্ষ দ্বাবা নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময় মাত্তলীর অস্ত্রাঘাতে তাহাব হাতের কয়েকটা অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া যায়। তৎপরে তিনি কাতর অবস্থায় দিল্লীতে থাকেন। এই সময়ে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাহাকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে পদার্পণ কবেন। তাহার পূর্ব্বে সুবিখ্যাত মীরজুম্লা বঙ্গের নবাব ছিলেন।

শায়েস্তা খাঁর রাজধানী ঢাকাতে ছিল। এই সময়ে আরাকানবাসী মগ ও সন্দীপ নিবাসী পর্টুগিজগণেব বিশেষ দৌবাত্ম্য ছিল। শায়েস্তা খাঁ ঢাকা হইতে ১৩০০০ সৈন্য ওসেদ খা ও হোসেন বেগ নামক মোগল সেনাপতি গণের অধীনে চট্টগ্রাম প্রেরণ করেন। তাহারা আরাকান–রাজকে পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম নিবাসী পর্টুগিজগণকে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকার নিকটস্থ ফিরিঙ্গির বাজারে বাসস্থান প্রদান করেন। মগগণের নামে পূর্ব্ববঙ্গ কম্পিত হইত কিন্তু শায়েস্তা খাঁ তাহাদিগকে দমন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে শান্তিস্থাপন করেন। বর্ত্তমান শায়েস্তা খাঁ মগের পরিবর্ত্তে গুরখা বরিশালে আনিয়াছেন।

শায়েস্তা খাঁ দুইবার বঙ্গদেশ শাসন করেন। প্রথমবার ১৬৬৩ হইতে ১৬৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত বঙ্গে ছিলেন; তৎপরে স্বেচ্ছায় দিল্লিতে গমন করেন। তাহার আমলে দীনেমার ও পরাসীগণ বঙ্গদেশে কুঠী স্থাপন কবেন ও ইংরেজগণের বাণিজ্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। ১৬৭২ খৃঃ অব্দে তিনি কোম্পানীর কর্ম্মচারিগনকে বিনা মাশুলে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

শায়েস্তা খাঁর কর্ম্মচারিগণ শতকরা ২৫ সুদে হিন্দুগণকে টাকা কর্জ্জ দিতে বাধ্য করিতেন এবং নয় মাস পরে বৎসরের সুদ সহ টাকা আদায় করিতেন এবং অনবরত মাল বাজেয়াপ্ত হইয়া তাহাদের হস্তগত হওয়ায় তাহারা ঐ মাল উচ্চমূল্যে হিন্দু বণিকগণের নিটক বিক্রয় করিত। ফুলার সাহেব বোধ হয় শায়েস্তাখাঁর গুণ উপেক্ষা করিয়া এই সমস্ত দোষের অনুসরণ করিবেন।

শায়েস্তা খাঁর পরে বৎসর ফেদাই খাঁ বঙ্গের নবাব ছিলেন; পরে ১৬৭৮ খৃঃ পুনরায় শায়েস্তা খাঁ বঙ্গের নবাব হইয়াছিলেন। এইবার তিনি সম্রাটের আদেশে হিন্দুগণের প্রতি জিজিয়া কর ধার্য্য করিয়া বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি অনেক হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেন ও রায় মাণিকচাঁদ নামক সম্ভ্রান্ত হিন্দুকে টাকার জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ রাখেন। শিবাজীর পুত্র শম্ভুলী সহ ইংরাজগণের যোগ হেতু শায়েস্তা খা

আওরঙ্গজেবের আদেশে ইংরেজগণকে হুগলি ও সুতানুটি হইতে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি ১৬৯০ খৃঃ বঙ্গদেশ হইতে গমন করেন। তাহার সময়ে ঢাকাতে এক টাকায় আট মণ চাউল হইয়াছিল ও পরে শরফরাজ খাঁর সময়েও ঐ মূল্য হইয়াছিল। ১৬৯৫ খৃঃ আগরা নগরে শায়েস্তাখাঁর মৃত্যু হয়। শায়েস্তা খাঁ ও শরফরাজ খাঁর নাম পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ প্রচলিত। শায়েস্তা অর্থে এখনও দক্ষ বুঝা যায় এবং সরফরাজ অর্থে অব্যবস্থিত বুঝায়।

জননী জন্মভূমির প্রতি।

কেন মাগো আর দাঁড়ায়ে এখানে?
কেন মিছে আশ পোষিছ পরাণে?
চাবে না কো কেহ তব মুখপানে
সুধা'বে না কেহ বারেক ভুলি।
নাইক এদের সিনেহ পরীতি
নাইক অন্তরে জননীভকতি
বৃথা মা দাঁড়ায়ে কেন জপ স্মৃতি
দেখিবে না এরা নয়ন তুলি।

(২)

নাই মা তোমার সে তনয় আর,
মনকর্ণ পাতি যেবা একবার,
শুনিবে কাতর কাহিনী তোমাব,—
দেখিবে নয়নে তবু দুর্গতি;
সে সকল মাতঃ! পাইয়াছে লয়
নাই সে এদের সরল হৃদয়,
হ'য়েছে কেবল হলাহলাময়,
শুনিবে না তব বিষাদ-গতি।

(৩)

তোমার স্নেহের পিযুষ শকর।
তোমার বিপুল পিরীতি মদিরা
তোমার স্তন্য ক্ষীরধারা যারা
দিবস রজনী করেছে পান,—
আজ মা তারাই সকলে মিলিয়া
স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহ রয়েছে ভুলিয়া
দুঃখ আঁধারে তোমারে ফেলিয়া
যাইতে চলিয়া বাঁচাতে প্রাণ।

(৪)

এতদিন ধরিয়ে যে সন্তানগণে
পালিলে মা তুমি নিয়ত যতনে
যাদের শান্তি মঙ্গল সাক্ষ্য
ত্যজেছিলে মাগো আপন সুখ।
আজ মা তোমার এ বিপদকালে
গেছে কোথা তারা গেছে কোথা চলে
কেন মা ভাষাও ধরা আঁখিজলে
কেন মা প্রকাশ্যে পরাণ দুঃখ।

(৫)

এদের হৃদয় নহে গো সরল
পূরিয়াছে দ্বেষ হিংসা সে কেবল
অমৃতের স্থান উঠেছে গরল
হারায়েছে এরা একতা ধন।
নিঃস্বার্থ মানব বিরল এখানে
কেন মা তাকাও কাতর নয়নে
রাখ নিজ দুঃখ আপন পরাণে
ধৈর্য্য বাঁধনে বাঁধ মা মন।

শ্রীমহম্মদ হারুণ।

২য় ভাগ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩১২

বর্দ্ধমান ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা : আরতি [কবিতা], প্রাচীন পুঁথি, কামাখ্যাপ্রসাদ বসু : শায়েস্তা খা, জানকীনাথ পাল : অর্থনীতি [প্রবন্ধ], হরগোবিন্দ শিরোমণি : যুবরাজের শুভাগমনে [কবিতা], জীবেন্দ্রকুমার দত্ত : উদাসী [ঐ], এককড়ি মল্লিক [ঐ], শরচ্চন্দ্র সাহা : উদ্বোধন [ঐ]।

২য় ভাগ : ১০ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১২

অর্থনীতি, দীনবন্ধু সাহা : আশা [কবিতা], পশ্চিম বুন্দেলখণ্ড,জীবেন্দ্রকুমার দত্ত : চিন্তাদেবী [কবিতা], যোগীন্দ্রনারায়ণ কাব্যতীর্থ,বিদ্যাবিনোদ শাস্ত্রী : শাক্যসিংহের গৃহত্যাগ [কবিতা]।

২য় ভাগ, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩১২

মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ, ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী : ভুল [গল্প], প্রীতি ও উন্নতি,জীবেন্দ্রকুমার দত্ত : প্রাচীন সাহিত্যোদ্ধার, কুঞ্জবিহারী হার : নাম [প্রবন্ধ], রজনীকান্ত মজুমদার : স্বাস্থ্যতত্ত্ব, পশ্চিম বুন্দেল খণ্ড, বাবা হরিনাথ।

বিজ্ঞাপন

নববর্ষের নববিকাশ

নবসাজে সজ্জিত হইয়া শীঘ্রই গ্রাহকগণের নিকট উপস্থিত হইতেছে। নিয়মিত সময়ে পত্রিকা প্রকাশেরও বন্দোবস্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, নববিকাশের উন্নতকল্পে ও গ্রাহকগণের মনস্তুষ্টি বিধান জন্য উত্তরোত্তর যত্ন করা হইতেছে। এবার নববর্ষের প্রথম সংখ্যায় কি কি উপাদেয় বিষয় আছে, পাঠকগণের কিঞ্চিৎ নিবারণ জন্য তাহার একটু আভাস দিতেছি ;—

(১) "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ও প্রকাশানন্দ "সরস্বতী" অর্থাৎ বারানসীর ঘোর অদ্বৈতবাদী ও মায়াবাদী এবং পণ্ডিতাভিমানী প্রকাশনান্দ সরস্বতীকে প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমদানে কিরূপে কৃতার্থ করেন, সেই পূণ্যকাহিনী ;--বৈষ্ণব প্রবন্ধলিখনে সিদ্ধহস্ত বাবু জানকীনাথ পাল বি, এল্, শাস্ত্রী বাচস্পতি কর্ত্তৃক লিখিত। (২) "রঙ্গমতীর বীরেন্দ্র"—অর্থাৎ বাবু নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত "রঙ্গমতী" নামক প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থোক্ত বীরেন্দ্র চরিত্রের সুন্দর সমালোচনা—বাবু কুঞ্জবিহারী হার এম্-এ লিখিত। (৩) "প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধবাণিজ্য"--- এবার কৌতুহলপূর্ণ বালিদ্বীপের বিবরণ ;—বাবু কামাখ্যাপ্রসাদ বসু বি, এল লিখিত। (৪) বর্দ্ধমান ও বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ বর্দ্ধমান জেলার বৈষ্ণবকবি ও ভক্তগণের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা এবং তাৎসহিত বঙ্গভাষা ও বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতর সম্বন্ধ প্রদর্শন—বাবু অম্বিকাচরণ ব্রাহ্মচারী-ভট্টাচায্য ভক্তিরঞ্জন লিখিত। (৫) "পঞ্চমী" কৌতুহলপূর্ণ উপ্যাখ্যান--বাবু ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল লিখিত। (৬) "বত্তমান স্ত্রীশিক্ষা"—ইহার দোষগুণ সমালোচনা——

শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী

ম্যানেজার—নববিকাশ, ঢাকা।

বিজ্ঞাপন।

কেবল একমাসের জন্য মায়ডাকমাশুল ১৷৷. টাকায় "মিনাভা," "ক্ল্যাসিক" ও "রয়েল বেঙ্গল" প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে অভিনীত—

ছয়খানি নাটক, গীতি-নাট্য ও প্রহসন ! !

সুপ্রসিদ্ধ "এমাবেল্ড" রঙ্গমঞ্চে অভিনীত মান, ঠক্‌লে কে, যুগের হুজুক, লছ্‌মী—লীলা, গৌরবগনেশ, নাট্য-সংহার প্রভৃতি প্রণেতা—

শ্রীযুক্ত রায় বৈকুন্ঠনাথ বসু বাহাদুর প্রণীত বসন্তসেনা।

যে সকল সংস্কৃত নাটক এক্ষণে প্রাপ্তব্য, তম্মধ্যে 'মৃচ্ছকটিক' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। নাটকখানি তাহারাই মম্মানুবাদ। গল্পাংশে ও ঘটনার সমাবেশে ইহা বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের বিশেষ উপযোগী বলিয়া "রয়েলবেঙ্গল থিয়েটারে" সমারোহে অভিনীত হয়।

রামপ্রসাদ।

নাটকখানি উক্ত মহাত্মার "জীবনী" ও সাময়িক ইতিবৃত্ত হইতে সংগৃহীত ও প্রধান প্রধান ঘটনার ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ও উক্ত রঙ্গমঞ্চে অতি সুখ্যাতির সহিত অভিনীত।

কৃষ্ণাষ্টমী

"মিনার্ভা থিয়েটারে" সমারোহে অভিনীত নাম পুরাণ অবলম্বিত মহাজন পদাবলীসমন্বিত নাট্য–গীতিকা।

পৌরাণিক পঞ্চরং ও বারবাহার।

"The Eighth wonder of the world" amd "The Beauty of the Bar," রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার অভিনীত দুইখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন।

ঘোর বিকার।

Histriones in Hysterics, সুবিখ্যাত "ক্ল্যাসিক থিয়েটারে" সুখ্যাতির সহিত অভিনীত একখানি ব্যঙ্গনাট্য। পুস্তকস্থ গীতগুলি নাটক গিরীশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত।

সকল পুস্তক অধিক নাই—অতি সত্বর করিলেই সেট সম্পূর্ণ পাইবেন।

কলিকাতা ষ্টোর এজেন্সী
১৬৭ (ন), মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন

স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত গ্রন্থাবলী।

১। "ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী" ১ম খণ্ড ; মূল্য এক টাকা, মাশুল এক আনা। কলিকাতা ২১০।৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। ২। "ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী" ২য় খণ্ড ; মূল্য ১ টাকা, মাশুল এক আনা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। ৩। "The Yogi and his message" (ইংরাজি পুস্তক) ; মূল্য আট আনা, মাশুল অৰ্দ্ধ আনা। কলিকাতায় মেসার্স থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

চতুর্থ গ্রন্থের নাম--

"সিদ্ধান্ত-সমুদ্র"

এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ দ্বাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পযন্ত সমুদয় জাতির প্রাচীন ও আধুনিক কালের বিস্তৃত ইতিহাস প্রকাশিত হইতেছে। ১ম খণ্ডে গোপ, সদগোপ, মাহিষ্য ও গন্ধবণিক জাতির বিবরণ আছে। মূল্য ১॥. টাকা, মাশুল অৰ্দ্ধ আনা। দ্বিতীয় খণ্ডে সুবর্ণবণিকজাতির ইতিহাস ; মূল্য আট আনা, মাশুল অৰ্দ্ধ আনা। তৃতীয় খণ্ডে বারুইজাতির ইতিহাস, মূল্য আট আনা মাশুল অৰ্দ্ধ আনা। চতুর্থ খণ্ডে বৈদ্যজাতির বিবরণ ; মূল্য আট আনা মাশুল অৰ্দ্ধ আনা এবং ৫ম খণ্ডে তিলি, তাম্বুলী, উগ্রক্ষত্রিয় ও ময়রা জাতির ইতিহাস আছে। মূল্য আট আনা, মাশুল অৰ্দ্ধ আনা। ৬ষ্ঠ খণ্ডে সাহাবণিক জাতির বিবরণ মূল্য ॥. আনা। ঢাকা, বাবুরবাজার, শ্রী গোকুল চন্দ্র দাসের নিকট পাওয়া যায়।

১। যুগধর্ম্ম অর্থাৎ কলিযুগের ধর্ম্ম। শ্রীজানকীনাথ পাল, বি, এল, শাস্ত্রী বাচস্পতি (হাইকোর্টের উকীল) কর্ত্তৃক প্রণীত।

এই পুস্তকে ভাগবত, গীতা, চণ্ডীর সারসংগ্রহ, ষড়দর্শন, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ষট্‌চক্রভেদ, সাত্ত্বিক আহার বিহার, 'জ্যোতিষ পুবাণের ভিত্তি নহে' ও 'রাসলীলা রূপক নহে' এসম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ. ভক্তিযোগ, এবং কিরূপে প্রেমভক্তি সাধন করিতে হয়, তাহার কার্য্যকরী সোপান বিশদরূপে ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। মূল্য ১৷৷.

২. রূপসনাতন গোস্বামীর জীবনী ও শিক্ষা। (ঐকৃত)

এই পুস্তকে শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপ গোস্বামীর বিস্তৃত জীবনচরিত ও মহাপ্রভু চৈতন্য দেবেব বামকেলী দর্শন, বৃন্দাবন ভ্রমণ এবং উক্ত গোস্বামীদ্বয়কে যে ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও অবতারতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা বর্ণিত আছে। যাঁহারা থিয়সফি পাঠ করেন, তাঁহারা এই পুস্তকে দেখিতে পাইবেন, কত কত অসংখ্য বিশ্বজগৎ এবং অবতারবৃন্দ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান আছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তির ঠিকানা ;—

গ্রন্থকাব. রাজবাড়ী, পূঃ বাঃ রেঃ ষ্টেশন।

[২ বয, ৯ম সংখ্যা]

ম্যানেজার পরিবর্ত্তিত

শ্রীযুক্ত বাবু হরগোবিন্দ দাস ম্যানেজারের কায্য হইতে অবসর গ্রহন করিয়াছেন। এখন হইতে টাকা পয়সা চিঠিপত্র কেবল নিম্নঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

"ম্যানেজার"—নববিকাশ।
সাচিপান্দরিপা, ঢাকা।

[২বর্ষ, ৪–৫ সংখ্যা]

বিজ্ঞাপন

সাহাবণিকজাতির ইতিহাস

(প্রকাশিত হইয়াছে)

অদ্বিতীয় জাতিতত্ত্ব-বিশারদ, বিবিধ ভাষাভিজ্ঞ এবং অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক ঋষিতুল্য ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী কর্ত্তৃক প্রণীত। এই পুস্তকে সংস্কৃত, উর্দ্দু, আরবী, পার্শী, হিব্রু, হিন্দি ভাষায় সাহা শব্দের ব্যুৎপত্তি ও বিশদ ব্যাখ্যা আছে। ঋগ্বেদ. অথর্ব্ববেদ, মনু, রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ বর্ণিত মগধ অর্থাৎ বাণিজ্য প্রধান বিহার দেশে যে সাহাবণিকজাতির উৎপত্তি এবং তথা পরে তাঁহাদের বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃতির বিসয বর্ণিত হইয়াছে। সাহাবণিকগণ যে ভারতের নানান এবং আফগানিস্থান প্রভৃতি দূরদেশে যাইয়া বাণিজ্য করিতে এবং সাহানামানুসারে তথায়

অনেক ও গ্রামাদি সংস্থাপন এবং সুদূর ইউরোপখণ্ডেরও বর্ত্তমান রুষজাপান যুদ্ধের রঙ্গভূমি মাঞ্চুরিয়া কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যার্থে যাতায়াত করিত তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। শৌণ্ডিক হইতে সাহাবণিকজাতি যে সম্পূর্ণ পৃথক এবং সাহাবণিকজাতি যে আর্য্য-বৈশ্য-বংশসম্ভুত তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ অকাট্য সুযুক্তি এবং মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের নজীর এবং গবর্ণমেন্টের রিপোর্ট দ্বারা বিস্তারিতরূপে সপ্রমান করা হইয়াছে। বঙ্গের শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ধনী মহাজন, জমিদার তালুকদার প্রভৃতি সাহাবণিকগণের নাম ও বিবিধ উপাধি এবং তাঁহাদের সৎকীর্ত্তি, প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ সুদৃঢ়ভক্তি, পবিত্র চরিত্রতা এবং বিশুদ্ধ আচার ব্যবহারের বিষয় বিশদভাবে লিখা হইয়াছে। প্রত্যেক সাহারই গৃহপঞ্জিকার ন্যায় এক খণ্ড পুস্তক রাখা উচিত। এই পুস্তক প্রায় ১২০ পৃষ্ঠায় হইয়াছে। মূল্য ৷৷ আনা, ডাক এবং প্যাকিং খরচ সহ ৷৷/. আনা এবং ভি, পিতে ৷৷ . আনা মাত্র।

প্রাপ্তির ঠিকানা— শ্রীহরগোবিন্দ দাস, ম্যানেজার নববিকাশ, ঢাকা

শ্রীগোকুলচন্দ্র দাস, বাবুরবাজার ঢাকা। শ্রীযাদবচন্দ্র রায়—সাহাসমিতি কার্য্যালয়, শিরাজগঞ্জ, পাবনা।

নব-বিকাশের নিয়ামাবলী

১। নববিকাশের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্রই ২ দুই টাকা মাত্র। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগে

২। নমুনার জন্য ৵. তিন আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে একখণ্ড প্রেরিত হয়।

৩। গ্রাহকগণের মূল্যপ্রাপ্তির বিষয় নববিকাশে স্বীকার করা হয়।

৪। লেকখগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবন্ধাদি স্পষ্ট করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া সম্পাদকের "নব-বিকাশ কার্য্যালয়" ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রবন্ধাদি মনোনীত না হইলে ফেরৎ দেওয়া হয় না। অতএব উহার প্রতিলিপি রাখিয়া পাঠাইবেন।

৫। প্রবন্ধাদি, সমালোচনার জন্য পুস্তক এবং বিনিময়ে মাসিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রাদি অফিসের ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পয়সা ও চিঠিপত্রাদি ম্যানেজারের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীহরগোবিন্দ দাস—ম্যানেজার।
নববিকাশ কার্য্যালয়, সাচিপান্দরিপা, ঢাকা।

নব-বিকাশ সম্বন্ধে সম্পাদকগণের অভিমত

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার ১৬শে আশ্বিন ১৩১১ সন।—আমরা ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত প্রথম পাঁচ সংখ্যা "নব-বিকাশ" প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রবন্ধগুলি সুপাঠ্য গবেষণাপূর্ণ, সুলিখিত এবং বহুল জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। লিখকগণ কৃতবিদ্য ও উৎসাহী। আমরা নব-বিকাশের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

বঙ্গবাসী ৮ই আশ্বিন ১৩১১ সন। —"নব-বিকাশ" এ পত্রিকাখানি নূতনত্ব প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সকল প্রবন্ধ পড়িবার অবসর হইল না। দুই একটী প্রবন্ধ ভাল লাগিল।

হাওরা হিতৈষী ২২শে আশ্বিন ১৩১১ সন।—আমরা "নব-বিকাশের" প্রথম পাঁচ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই মাসিক পত্রিকা খানি হিংসা বিদ্বেষ বা পরশ্রীকাতরতায় কুৎসিত নহে। ইহা ভক্তিপ্রীতি ও পর-মঙ্গলেচ্ছায় সমলঙ্কৃত। প্রবন্ধ বৈচিত্রে ও প্রবন্ধ গৌরবে ইহা প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য। বাবু শশিমোহন বসাক বিরচিত দার্শনিক প্রবন্ধ বিষয় ও বাবু কামেখ্যা প্রসাদ বসু লিখিত দেশের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ কয়টী বিশেষ মনোরম হইয়াছে। নব-বিকাশের প্রবন্ধ গুলির লিখন ও নির্ব্বাচন প্রণালী দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে উদারতা, সমতা ও একতা নব-বিকাশের মহামন্ত্র জাতীয় প্রাণ প্রতিষ্ঠা নব-বিকাশের মূলসূত্র, সামাজিক সব্বাঙ্গীন হিত সাধন হইবার একমাত্র দীক্ষা। আমরা প্রার্থনা করি যে এই পত্রিকাখানি সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দেশের উপকার করিতে সমর্থ হউক।

হিন্দুরঞ্জিকা ২৬শে আশ্বিন ১৩১১। "নব-বিকাশ" পত্রিকাখানি কি অঙ্গসৌষ্ঠবে কি ভাষা গরীমায় কি প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে সকল বিষয়েই প্রশংসা প্রাপ্তির সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইহার কাগজ ও মুদ্রাঙ্কন পরিপাটী। বৈশাখ হইতে ভাদ্র সংখ্যা পয্যন্ত এই পাঁচ সংখ্যায় যতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে সকলগুলিই সুলিখিত ও সময়োচিত। ইহাকে সাধারনের নিকট বিকাশ প্রাপ্ত হইতে দেখিলে অতীব আনন্দিত হইবে।

জ্যোতি ৩০শে ভাদ্র ১৩১১।--এই বৎসরের প্রারম্ভ হইতে নব-বিকাশেব প্রচার আরম্ভ হইয়াছে এখনও ইহা শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই। প্রার্থনা করি নব-বিকাশ সুদীর্ঘ জীবন লাভ করুক। ইহার আকার, ভাষা ও বিষয় নির্ব্বাচন সুন্দর।

মিষ্টভাষী ১৫শে অগ্রহায়ণ ১৩১১ সন।—নব-বিকাশের এই প্রকার উন্নতি দর্শনে আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। নব-বিকাশের এই (আশ্বিন ও কার্ত্তিকের) সংখ্যা দেখিয়া আমরা ইহাকে প্রথম শ্রেণীর মাসিক বলিতে কুণ্ঠিত নহি।

ঢাকা প্রকাশ ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩১১ সন।-- প্রথমাবধিত এপর্য্যন্ত নব- বিকাশেব সকলগুলি সংখ্যাই আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার লিখকগণ প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত। যে পর্য্যন্ত দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় ভগবৎ কৃপায় নববিকাশ দীর্ঘজীবন লাভ করিলে ঢাকার পক্ষে অগৌরবের বিষয় হইবে না। পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া বর্ত্তমান বঙ্গের যুবক বন্দ মাতৃভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'ন নাই এদৃশ্য বস্তুতঃই পরমানন্দ দায়ক। আমরা এই নবীন সহোযোগীর দীঘজীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিতেছি।

বান্ধব কার্ত্তিক ১৩১১ সন।-- "নব-বিকাশ মাসিক পত্রিকা"।—ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট সাহিত্যপত্র এবং বিষয়ের অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ্যতার সুকুমারমতি পাঠক সকলের জন্য অধিকতর উপযুক্ত। লেখকেরা সাহিত্যক্ষেত্রে—উচ্চশিক্ষিত, কেহ কেহ বাঙ্গালা সাহিত্যের সমুন্নত ব্রতে আত্মোৎসগো কামনায়, একান্ত উৎসাহ দীপ্ত। নববিকাশের এই মাত্র প্রকাশ হইয়াছে,—এখন পর্য্যন্ত সবে চারি পাঁচ খানা পত্রিকা পাঠকের পরিচয়ে আসিয়াছে। ইহার প্রচাবকের অচিরেই পরিবর্দ্ধিত হইবে;—এবং আশা করি বাবু হরকুমার সাহা ও বাবু শশিমোহন বসাক প্রভৃতির লেখা কালে সাহিত্যে সেবিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

অর্চ্চনা কার্ত্তিক ১৩১১ সন।— শ্রাবন মাস পর্য্যন্তই আমরা এই (নব-বিকাশ) নূতন মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় "আবাহন" কবিতাটী মন্দ হয় নাই। "আমাদের অভাব এবং তন্মোচন উপায়" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। "মহৎ জীবনের আখ্যায়িকা" "জাতিগঠনে ব্যক্তি" "জ্ঞান ও বেরাগ্য প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ। শ্রীমতি শ্যামাসুন্দরী দেবীর "আশীব্বাদ" পাঠে আমরা সুখী হইলাম, আমরা এই নূতন মাসিকের উন্নতি কমনা করি।

ধূমকেতু ৭ম এবং ৮ম সংখ্যা ১৩১১ সন।— আমবা "নব বিকাশের" তিন সংখ্যা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি সব্বাগ্রে আমবা এই নবীন সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আর্থিক অসচ্ছলতায় "নব-বিকাশ" কখনও মারা যাইবেনা। বিশেষতঃ সাহা সম্প্রদায়ে যে সকল ধনী সন্তান রহিয়াছেন তাহারা যদি দীনা বঙ্গভাষার কল্যাণ কামনায় এবং স্বদেশ ও সমাজের উন্নতি কল্পে এদিকে একটুকু কৃপাকটাক্ষপাত করেন তবে নব বিকাশের দীর্ঘজীবন অবশ্যম্ভাবী।

১। যুগধর্ম্ম অর্থাৎ কলিযুগের ধর্ম্ম। শ্রীজানকীনাথ পাল, বি. এল, শাস্ত্রী বাচস্পতি (হাইকোর্টের উকীল) কর্ত্তৃক প্রণীত।

এই পুস্তকে ভাগবত, গীতা, চণ্ডীর সারসংগ্রহ, ষড়দর্শন, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ষটচক্রভেদ, সাত্ত্বিক আহার বিহার, 'জ্যোতিষ পুরাণের ভিত্তি নহে' ও 'রাসলীলা রূপক নহে' এসম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, এবং কিরূপে প্রেমভক্তি সাধন করিতে হয়, তাহার কার্য্যকারী সোপান বিশদরূপে ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। মূল্য ১।৷.।

২। শ্রীরূপসনাতন গোস্বামীর জীবনী ও শিক্ষা

এই পুস্তকে শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপগোস্বামীর বিস্তৃত জীবনচরিত ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের রামকেলী দর্শন, বৃন্দাবন ভ্রমণ এবং উক্ত গোস্বামীদ্বয়কে যে ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও অবতারতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা বর্ণিত আছে। যাঁহারা থিয়সফি পাঠ করেন, তাঁহারা এই পুস্তকে দেখিতে পাইবেন, কত কত অসংখ্য বিশ্বজগৎ এবং অবতারবৃন্দ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান আছে। মূল্য . . আনা।

প্রাপ্তির ঠিকানা ; –
গ্রন্থকার, রাজবাড়ী, পূঃ বাঃ রেঃ ষ্টেশন।

দ্রষ্টব্য

নববিকাশ প্রতিমাসে নিয়মিতরূপে পাঠাইবার জন্য পোষ্টাফিসে রেজিষ্টারী করিয়া লওয়া হইয়াছে ; সুতরাং এখন হইতে প্রতিমাসে গ্রাহকগণ নিয়মিত নববিকাশ পাইবেন। যদি কোন গ্রাহক কোন মাসে পত্রিকা না পান, তবে তৎপরবর্ত্তী মাসের ২য় সপ্তাহে পত্র দ্বারা জানাইলে বিহিত করা যাইবে।

[২য় বর্ষ ৭-৮]

সংকলন

জীবনসহচর

শ্রাবণ, ১৩১২ সাল।

সম্পাদকীয় কন্তব্য।

শ্রীভগবানেব আশীর্বাদে এবং পাঠকগণের অনুগ্রহে আমরা পুনরায় পুরাতন "জীবন-সহচরকে" নূতন করিয়া নূতন ভাবে নূতন আকারে সকলেরই জীবন- সহচর করিয়া দিবাব জন্য কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। জানিনা কতদূর কৃতকায্য হইব?

গ্রাহকগণের অনুগ্রহ, কালে আমরা পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক ভাবে বাহির করিবার বাসনাতেই ইহাকে পুস্তকাকারের পরিবর্ত্তে সংবাদ পত্রাকারে পরিণত করিলাম। সেই জন্যই ইহার মূলভিত্তি দৃঢ়তর করিতে আমাদিগকে সুদীঘ সময় ক্ষেপণ করিতে হইয়াছে। প্রকৃতির অশ্রুজলে চক্ষের জল মিশাইয়া এই শ্রাবণের ধারায় সহচর" "জীবনের পথে পুনরায় বাহির হইল।

সাধারণ পাঠকগণ ইহাকে সাধারণ সংবাদ বা সাময়িক পত্র বলিযা মনে করিবেন না এবং কোন মাসের কোন সংখ্যাবই অপব্যবহাব করিয়া অপচয় কবিবেন না। প্রকৃতই ইহাকে জীবন-সহচর ভাবিয়া নিত্য সহচর করিবেন ; তাহা হইলে কালে, সকলে সুখে দুঃখে সম্পদে, বিপদে এই অকপট সুহৃদের সারবত্তা, উপকাবিতা ও সহৃদয়তার পরিচয় নিশ্চয়ই পাইবেন।

সাধারণ সংবাদ পত্রের তুলং ।য় ইহাকে একখানি চটি বিজ্ঞাপনেব কাগজ মনে করিয়া কেহই অতি ক্ষুদ্র বলিয়া অনাদর করিবেন না। কারণ, মহাকায় মানবের মহাপ্রাণটুকু কত ক্ষুদ্র বলুন দেখি? মানব-জীবনেব সেই ক্ষুদ্র প্রাণটুকুর সহচরও ক্ষুদ না হইলে কি সমানে সমানে মিলে? যোগ্যে যোগ্য না মিলিলেও কি কখন জীবন-সহচর হওয়া যায়? ক্ষুদ্র না হইলে কি ক্ষুদ্রের সহিত মিশিয়া যাওয়া যায়? কাজ কি ভাই, তোমার বাহ্যাডম্বরে? তোমার বাজে বিষয়ে? যে টুকু তোমার ক্ষুদ্র প্রাণের ভিতর ধরিবে, সে টুকুই ভাল নহে কি" ভাবুন দেখি, সেই খাঁটি সার টুকু (Essence) কতই মধুর।

দরকার কি দীঘাকাবে? আবশ্যক কি হাবড় হাটিতে? যদি শিক্ষিতা শিক্ষিত ব্যক্তিরূপ দেবাসুবগণ কর্ত্তৃক আজকালকার সমগ্র সাহিত্য-সমুদ্র কিরূপে মথিত হইতেছে, দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে "জীবন-সহচরের" নিতান্ত আবশ্যকীয় ও স্মরণীয় সংবাদসার, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধ, নিত্য-নূতন তত্ত্ব এবং অদ্ভুত ছবিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন ; তাহা হইলে আর ইহার ক্ষুদ্রত্বের ক্ষোভ রহিবে না, বরং প্রতি মাসান্তের মধুরতার দিকে মন আকৃষ্ট হইবে ; অধিকন্তু ভরসা করি, ভাগ্যে আর কাহারও গরল উঠিবে না।

আর ইহাও বলিয়া রাখি যে, যদি ইহাতে কোন মহদুদ্দেশ্যই থাকিবে, তবে এই পুস্তকপত্রিকাদিপ্লাবিত প্রদেশে ক্ষুদ্র এত টুকু "জীবন-সহচরের" আবশ্যকতা কি? ইহার মধ্যস্থ 'পাঠিকার প্রশ্ন', 'পাঠকের উত্তর' এবং 'সম্পাদকের মীমাংসা' প্রভৃতি প্রবন্ধে সে সকল ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

চৌবেড়িয়া গ্রাম খানির অবস্থা ক্রমেই অধিকতর শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ইহা একখানি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল; এক্ষণে যশোহর জেলার মধ্যে আসিয়া ইহার দুদ্দশার সীমা নাই। এ চৌবেড়িয়াতেই সেই সুবিখ্যাত স্বর্গীয় কবিবর রায় দীনবন্ধু মিত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই গ্রামেরই চারিদিকে ক্ষুদ্রনদী যমুনা মৃদুমন্দবেগে প্রবাহিত হইতেছে--ইহারই প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া পূর্ব্বে বিস্মিত হইতে হইত। আর এখন সেই সৌন্দর্য্যশালী নগরোপম জনাকীর্ণ স্থান ক্রমে জনশূন্য ও জঙ্গলপূর্ণ হইতেছে। এখনও কত কৃতি সন্তান বর্তমান, কিন্তু সকলেই বিদেশ বাসী জন্মভূমি, মাতৃভূমির দিকে আদৌ নাই। যাতায়াতের অসুবিধা ও ম্যালেরিয়া পূর্ণ স্থান বলিয়াই নাকি তাহারা এই ক্ষুদ্র পল্লী-জননীর নিকট চিরবিদায় লইয়াছেন।

এই চৌবেড়িয়াতে কত অট্টালিকাই সে জনশূন্য ও জঙ্গলপূর্ণ, কত বাস্তুভিটাই যে বন্য বৃক্ষলতাদিতে আবৃত তাহার সংখ্যা নাই। সময়ে সময়ে বাঘের ভয়ে ও চোরের দৌরাত্ম্যে লোকের বাস করাই কঠিন হইয়া পড়ে। তবে দুই একজন দেশহিতৈষী ধনী মহাত্মা এখনও এখানে বাস করিতেছে বলিয়া ইহার পথ, ঘাট ও স্কুল প্রভৃতির কতকটা উন্নত অবস্থা আজও আছে, নতুবা এতদিন ইহার সমস্তই শ্বাপদসঙ্কুল বিজনবনে পরিণত হইত। আমরা সুবিধা মতে সেই সকল স্বদেশপ্রিয় মহোদয়গণের সম্যক পরিচয় দিব।

এই চৌবেড়িয়া হইতেই "জীবন-সহচর" ক্ষুদ্র কলেবর লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ইহার স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় গ্রাহক ও এজেন্ট মহোদয়গণ প্রথম হইতেই যেমন ইহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন, ভরসা করি এই নূতন আকারের "জীবন সহচরের" প্রতিও তাহাদের সেইরূপ লক্ষ্য থাকিবে।

বঙ্গের লেখকাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি এ এই পত্রিকার একজন প্রধান লেখক ও সহকারী সম্পাদক, তাহাছাড়া আর অন্যান্য সুলেখকগণ ইহাতে লিখিবেন। আরও যাঁহারা এই পত্রিকায় গ্রাহক বৃদ্ধি করিয়া দিয়া এজেন্ট হইবেন; গ্রাহক বৃদ্ধির সংখ্যানুসারে তাঁহাদের সেই পরিমাণে কম বেশি রচনা তাঁহাদের নামে মুদ্রিত হইবে এবং ক্রমে তাঁহাদের জীবনী ও গুণের কথা জীবন সহচরে জ্বলন্ত অক্ষরে খোদিত থাকিবে।

শ্রাবণ ১৩১২--১ম সংখ্যা জীবন সহচবেব ক্রোড পত্র

পাঠক ! একটি জকবী খবব শুনুন,—এত দিনেব পব বঙ্গ বলিদানেব বাজনা থামিযাছে, এক কোপেই ফবসা—আব ভবসা নাই। এত কাতব চিৎকাব ও অন্তিম আর্তনাদ বিফল হইল। ধন্য লর্ড-কর্জন—ধন্য তাহাব প্রাণ। আমবা বাবান্তবে এই বঙ্গ বিভাগেব বিশেষ বিববণ বিবৃত কবিব।

কপগুণ--অবস্থা--তুলনা--উদ্দেশ্য।

(১)

কে ঐ কোচা কাচা দেযা, জামা জুতা পবা
সুসভ্য সাহেব পাশে অসভ্যতা ভবা?
সেলাম সেলামী দিযে, গোলামীতে দড
ছেডে দিলে তেডে ধবে, ধাপ্পে চডসড।
ধবে নাহ অষ্টবম্ভা সাহেব না চাইল,
কভু বা বাবুব দাপে কাপে দিকপাল।
লাথি ঝাটা খেতে কি তু গুণে ঘাট নাই
বচনে পোডাতে পাব কেবা অহ ভাই?

(২)

বুঝি বা ড্যাম বাঙ্গালী দাডাযে অইবে,
ভতলে অতুল আব এমন কইবে?
দেখবে দেখবে চেযে দুনযন ভবে,
অহবে ড্যাম বাঙ্গালী বাঙ্গালীব ঘবে।
পেযেছিনু পুণ্যফলে বাঙ্গালী জনম
কালেব ধবমে গেল, ধবম কবম।
তাইবে ড্যাম বাঙ্গালী মানেব বাঙ্গালী,
নিজ দোষে নিজে মজে খায গালাগালি।

(৩)

এক মহাদেশে বাস এসিযা নিবাসী
ক্ষুদ্রতব আছে কত আব (ও) জাতি বাশি,
তাবা ত এমন নয, তাদেব কেমন—
গৌববে গঠিত আহা জাতীয জীবন।
তাব সাক্ষী দেখ আজ জাপানেব কাজ,
বাণিজ্য সভ্যতা শিল্প কিবা যুদ্ধসাজ।
বাঙ্গালী-সভ্যতা শুধু হ্যাট কোটে সাজি
খানা পিনা 'হামবডা' আব গলাবাজী।

(৪)

রাখিতে বাঙ্গালী নাম	বাঙ্গালীর মান
গাইবে "ড্যাম বাঙ্গালী"	কর্তব্যের গান !
"ড্যাম বাঙ্গালীর" তাই	শুভ আগমন,
বাঙ্গালী মঙ্গল গান	গা'বে অনুক্ষণ !
বাক্যবীর বাঙ্গালীর	মরমের কথা,
বর্ণিবে "ড্যাম বাঙ্গালী"	শুধু যথা তথা !
"ড্যাম বাঙ্গালীর কথা	অমৃত সমান,
যে পড়িবে, যে শুনিবে—	সেই পুণ্যবান।

চৌবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত, "জীবন-সহচরের" সহিত সংযোজিত এই মাসিক পত্র "ড্যাম বাঙ্গালীর জন্যই লিখিত ! বা কি, বাঙ্গালীর যেরূপ দুঃসময়, তাহাতে 'ড্যাম বাঙ্গালির' ন্যায় এরূপ একখানি পত্রিকার প্রচার প্রয়োজন কি না, বাঙ্গালী মাত্রই তাহা বিচার করিবে বাঙ্গালীর উন্নতিকল্পে যত কিছু প্রযোজন, সকলই আয়োজন করা হইয়াছে ; বহুতর বিষয়ই ইহাতে দেখিতে পাইবেন ; তম্মধ্যে তিনটী চিত্রই এবারে সব্বপ্রধান প্রথমটী—

চাকুরী না গুখুরী !

ইহাতে সকল প্রকার চাকরে বাঙ্গালীরই মম্মকথা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। দ্বিতীয়টী-

মাতৃভাষার পিতৃশ্রাদ্ধ ! !

নামেতেই ইহার পরিচয় পাইতেছেন ; দর্শপিণ্ড ব্যবস্থা, পিণ্ডদান, দান সাগর, তিলকাঞ্চন, বৈতরণী, বৃযোৎসর্গ প্রভৃতি বহু উপসর্গ ইহাতে থাকিবে এবং কাঙ্গালী বিদায়, ব্রাহ্মণ ভোজন, মেযে কীত্তন, কাটুম্বিতা. ত্রয়োদশা বা নিযম ভঙ্গাদি কিছুই বাদ পড়িবে না।

এই দুইটী চিত্র আঁকিতে আরম্ভ হইয়াছে, নমুনাতেই বোধ হয়, পাঠক ! ইহাদের পরিণাম বুঝিয়াছেন ; আরও বুঝিবেন যে, কি নিত্য-নতন যড়রসমাখা অপূব্ব ভাবে ইহাদের ক্রমবিকাশ ও "মধুরেণ সমাপয়েত" হইবে। তাহার পর তৃতীয়টী নাম শুনিবেন কি? তবে শুনুন—বাঙ্গালীর ভাগ্য-গগনের সেই অদ্ভুত ধূমকেতুর নামটী শুনুন—

রিফাইণ্ড শতমুখী ! ! !

এই শতমুখীর শত শলাকার সূক্ষ্মাগ্রভাগ শত শত বাঙ্গালীর মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে বিঁধিবে। এই বিশুদ্ধ ঝাঁটায় বঙ্গ সমাজের অনেক জঞ্জাল ঝাটাইয়া পরিষ্কার করিতে একশত শলাকা বা কাটীতে এই শতমুখী গুচ্ছ বাধা হইবে ; তম্মধে এ বৎসরে তৃতীয় সংখ্যা হইতে দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত দশ সংখ্যায় দ্বাদশটী মাত্র 'কটী' বা শলাকা পাঠক দেখিতে পাইবেন ; দেখিবেন—প্রত্যেক শলাকারই অগ্রভাগ কত সূক্ষ্ম ও সুতীক্ষ্ণ ! মর্ম্মের অন্তস্তলে আমূল প্রবেশ করিয়া "আঁতে ঘা লাগে" কি না? এক্ষণে সেই এবারকার বারোটী 'কাটীর' নাম কি, দেখুন- -

১। লবঙ্গের (Long) লঙ্ লেক্‌চার—হাড়ী জয় জয়কার !
২। পুঙ্গীর পুত চাষার নন্দন—গুয়ে গোবরা বাবু গোবর্দ্ধন !
৩। বংশীধারীর ধোঁয়া যাত্রা—ক্রমে বৃদ্ধি মাত্রা !
৪। বিলাস বিউটী (Beauty)— কোর্টসিপ কমিটী !
৫। মিটিং এ ফেটীং—ড্যানসিং এণ্ড সিঙ্গিং (Dancing and Singing) !
৬। মিস্ মেরীর মনচুরী—বকাউল্লার বাহাদুরী !
৭। আতাউল্লার "আ"—রাম পাখীর ছাঁ !
৮। নব নটবর-- লভের (Love এর) সাগর !
৯। মিলনে বাবু—বিচ্ছেদে বৌ+উ !
১০। মকট আকার—ভাষা বিকার !
১১। বিষম ফাঁড়া— গুদাম ভাড়া !
১২। হাটের ন্যাড়ার হট্টগোল—বোল্ হরিবোল্ ! !

পাঠক ! আর কি চাহেন ! আবার মূল্যও কত সুলভ দেখুন—প্রতি সংখ্যার মাসিক মূল্য বরাবর এক আনা, ত্রৈমাসিক তিন আনা এবং বার্ষিক এগার আনা মাত্র। কিন্তু প্রথম তিন হাজার ৩০০০ গ্রাহক বার্ষিক নয় আনা মূল্যে পাইবেন। মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক যে কোন প্রকার গ্রাহকের নাম এই ৩০০০ নম্বরের মধ্যে থাকিলেই তিনি ভাগ্যানুসারে কিছু না কিছু উপহার পাইবেন। নিয়মাবলী দেখিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন। এজেন্ট হইলেও বিশেষ লাভ আছে ; এজেন্ট- নিয়মাবলী দেখুন। এজেন্ট গণের বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া মূল্য পাঠাইলেই "ড্যাম বাঙ্গালীর" গ্রাহক বা এজেন্ট হইতে পারিবেন ; কিন্তু বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া বিলম্ব করিয়া মূল্য পাঠাইয়া পত্র লিখিলে কোন সুবিধাই থাকিবে না ; কারণ যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে ৩০০০ গ্রাহক শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া যাইবে।

চৌবেড়িয়া
জীবন সহচর—ড্যাম বাঙ্গালী কার্য্যালয়,
চৌবেড়িয়া পোষ্ট, (জেলা যশোহর।)

সম্পাদক
শ্রী মাখন লাল দত্ত।

চাকুরী না গুখুরী।

বা

চাকুরে বাঙ্গালীর মর্ম্ম-কথা।

শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে প্রায় পনেরো আনা, উনিশ গণ্ডা, তিন কড়া, দুই ক্রান্তি লোকই চাকুরীজীবী। অশিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যেও যে চাকুরী-জীবী নাই, তাহা নহে ; তবে সংখ্যায় এত অধিক নয় ! কিন্তু কালের গতিতে চাকুরী-প্রিয়তায় শিক্ষিতাশিক্ষিতের তারতম্য আর

বেশী দিন থাকিবেনা। কারণ চাকুরী-প্রিয়তা সকলেরই হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় মিশিতেছে চাকুরী থাকিলেই বাঙ্গালী—বাবু! 'বেকার' বসিয়া থাকিলেই অপদার্থ 'কাবু'! পিতামাতার আশীর্ব্বাদ ও কামনা—চাকুরী। দেবতার নিকট দিন রাত মাথা কুটিয়া বর মাগি—চাকুরী! যাহার হাত ধরা যায় না, তাহার পায়ে পর্য্যন্ত পড়ি ও চাহি—চাকুরী! হাঁ চাকুরী! ধন্য তোমার যাদুকরী! তুমি যাদুমন্ত্রে বাঙ্গালীর প্রাণ মন এমন করিয়া ভুলাইয়াছ যে, ব্রাহ্মণের চামার বৃত্তি—কামারের কুমার বৃত্তি প্রভৃতি উচ্চের নীচ প্রবৃত্তি এবং নীচের উচ্চ বৃত্তিতেও প্রবৃত্তি লওয়াইয়াছ ; স্ব, স্ব, জাতীয় ব্যবসায়ে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিতেও আর কাহারও লজ্জা নাই!

ব্রাহ্মণ শাস্ত্রালোচনা ছাড়িয়াছেন—সওদাগর "বাণিজ্যে বশতা লক্ষ্মী" ভুলিয়া ইহাতে "অলক্ষ্মীই" আশ্রিতা হয়েন, ভাবিয়াছেন ; আবার নিম্ন শ্রেণীতে চাষা চাষের আশা ভরসা ক্রমশঃই ছাড়িতেছে—যাহার যে একচেটিয়া জাতীয় ব্যবসা আছে, তাহা ঘৃণিত মনে করিয়া সেও চাকুরীর জন্য ছেলেদের লেখা পড়া শিখাইতেছে। সেই জন্যই চাকুরীর ছড়াছড়ি বাজারেও ইহা এত মহার্ঘ যে, সামান্য একটী ৩৪ টাকার মুহুরীর আবশ্যক হইলেই, তাহার শত শত প্রার্থী আসিয়া যুটে, কিন্তু ষোল স্থলে সতের আনা অগ্রিম দিয়া এবং নানারকমে খোসামোদ করিয়া ও একটী কুলী মজুর মিলান আজকাল ভার হইয়া উঠিয়াছে, জানিনা, বাঙ্গালীর ভবিষ্যত আরও কিবা ভয়ঙ্কর?

বাঙ্গালীর বিদ্যা এখন "অর্থকরী"। শিক্ষা এক্ষণে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য নহে—শুধুই এই আপাতমধুর লোভনীয় চাকুরীর জন্য। শিক্ষা দীক্ষা, মতি গতি, সকলই এখন চাকুরীর দিকে! চাষ বাস ও ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতিতে পুঁজিপাটা চাই, অধিকন্তু গাধা খাটুনী, মাথা ঘামান ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা বিস্তর আছে! ও সকল ঝঞ্ঝাটে কাজ কি তাই? খাই দাই আর চাকুরির মন যোগাই! যে কয় দিন বাঁচিয়া যাই—বহুত আচ্ছা ইহাতেই বাচ্চা বাচ্চা বাঁচিবে ও নিজের পেট ভরিবে, এইত বাঙ্গালীর মনের ধারণা, তাহা ছাড়া আর কি বক্তব্য বলনা?

ভবিষ্যৎ চাকুরী প্রত্যাশী শিক্ষার্থী ও উমেদার বা প্রবেশনারগণ 'দিল্লীকা লাড্ডু' চাকুরী পাইবার প্রত্যাশায় সতৃষ্ণ নয়নে "ফটিক জল, ফটিক জল" করিয়া চাতকের ন্যায় চাহিয়া আছেন আর দিবানিশি কহিতেছেন— হা চাকরী, যা চাকরী, পাবে—যে চাকরী প্রভাবে মোরা সদ্য স্বর্গে যাব। আর এই 'লাড্ডু' খাইয়া যাহারা দিন গুজরাণ করিতেছেন, তাঁহারা এখন কেবল বলেন--পরের চাকরী— কি ঝকমারী! চাকুরী না গুখুরী?

"অধম তারণ রেলওয়ে," অন্তজ তারণ ট্রামওয়ে, "গোয়ার তারণ পুলিস," গোলাম তারণ পোষ্টাফিস, বেচারী তারণ সরকারী ও সওদাগরী অফিস, বেহায়া তারণ বেসরকারী বাজে অফিস, বেল্লিক তারণ কুলী ডিপো বা আরাকাটী অফিস, ভবঘুরে তারণ ষ্টীমার অফিস, হাঘরে তারণ আদালত ও আবগরী অফিস, নিরেট তারণ কল কারখানা, গর্দ্দভ তারণ চা বাগিচা, জড়ভরত তারণ জমিদারী সেরেস্তা, দিগ্‌গজ তারণ বড় বড় আরত দোকান, বিদ্যাবাগীশ তারণ বিদ্যাবিভাগ ও পতিত পাবন পাঠশালা প্রভৃতি চাকুরীর আড়ং বা অড্ডাস্থান হইতেই নিয়ত শব্দ উঠিতেছে—'চাকুরী না গুখুরী'? এই সকল চিপরপদানত,

হীনবীর্য্য, ভগ্নোসাহ নিরুদ্যম চাকুরে পুরুষের তাপিত প্রাণে যা সিঞ্চিতে পারি—কিঞ্চিৎ শান্তিবারি, তাই প্রকাশ করি—এই চাকুরী না গুখুরী ! নতুবা চাহিনা, দেখা'তে অন্য কোন বাহাদুরী ! প্রাণের নিভৃত অন্তস্থলের গুপ্তকথা—এই চাকুরী না গুখুরী !

প্রথমে সর্ব্ব প্রধান রেলের চাকরী হইতে আরম্ভ করিয়া যত প্রকার ছোট বড় চাকুরী আছে,তাহা দেখাইবার জন্যই—এই চাকুরী না গুখুরী ! যিনি যে প্রকার চাকুরীতে লিপ্ত, তাঁহার সেই প্রকার চাকুরীরই গুপ্ত তত্ত্ব নিত্য ইহাতে দেখিতে পাইবেন। প্রত্যেক চাকরীতেই পেটের দায়ে যে কিরূপ মনের কষ্ট, মনে মনে চাপিয়া রাখিয়া অহরহ: অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে হয়, সেই সকল নীরব মর্ম্মোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার জন্যই– এই চাকুরী না গুখুরী ! ইহাই আমাদের বক্তব্য এবং তাই এখন, নিবেদন—ভাই চাকুরে পুরুষগণ ! অক্লান্ত পরিশ্রমে পরপদসেবা করিযা এক একবার দিনান্তে দেখিবেন— এই "চাকুরী না গুখুরী !"

জাপান যুদ্ধের যথার্থ সংবাদ।

জানিতে পারা বডই শক্ত ! বিশেষত: সাধারণ সংবাদপত্র পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠকের যুদ্ধের সংবাদ অবগত হওয়া এক প্রকার বিড়ম্বনা মাত্র। সেই সুদারুণ টৌ লগাফের 'কটমট'- -সাত জায়গায় সাত 'ভজ কট' ; রয়টারের ঠার ঠোর—জটিল "পাচ মিশালি" সংবাদ রাশির ঘোর, এই সকলের মধ্যে খাঁটী খবরটুকু পাওয়া বড়ই কঠিন। তাই আমরা রয়টারের টেলিগ্রাফ ও সমস্ত সংবাদপত্রের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক এমন সুললিত ভাষায় খাঁটী খবর টুকু প্রকাশ করিব যে, সে সকল ঘটনা যেন চক্ষের উপরেই ঘটিতে বলিয়া বোধ হইবে।

আধুনিক 'বায়স্কোপ' নামক যন্ত্রের কাঁচের উপর চক্ষু রাখিলে যেমন সমস্ত চিত্রিত ছবি প্রত্যক্ষ দেখা যায় ও জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ এই বর্ত্তমান যুদ্ধের সার সংবাদও এমন ভাবে ইহাতে লিখিত থাকিবে, যেন সে সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন বলিয়া বোধ হইবে ও সময়ে সময়ে সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে। সেই জন্যই পাঠিকার প্রিয় সহচর--এই "জীবন সহচর" সময়ে সময়ে যেন বায়স্কোপ দেখাইয়াই তাহাদিগকে সকল সংবাদ সুস্পষ্ট ভাবে অবগত করাইব ! তাই ইহার নাম 'আজগবি বায়স্কোপ' !

যতদিন যুদ্ধ চলিবে, ততদিন যুদ্ধে যাহা হইয়া গিয়াছে, যাহা হইতেছে ও যাহা হইবে সে সমস্তই এই 'বায়স্কোপ' দেখান হইবে। পরে যুদ্ধ শেষে বিবিধ রাজনৈতিক এবং সামাজিক নক্সাও ইহাতে জীবন্ত প্রত্যক্ষ করিবেন। এখন দেখুন—দেখুন—

বর্ত্তমান যুদ্ধ প্রসঙ্গে
আজগবি বায়স্কোপ।

১ম দৃশ্য-সেন্ট পিটার্সবর্গে।
জারের জারিজুরী।

রুষিয়ার রত্ন ময় রাজ সিংহাসনে বসিয়া করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক আজ কে তুমি এত চিন্তাকুল? তুমি না, প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাধিরাজ রুষ-সম্রাট? তোমার স্বর্ণময় পুরী আজ অন্ধকারময় কেন? তোমার জ্যোতির্ম্ময় রাজ্য আজ নিষ্প্রভ কেন? তোমার উৎসাহপূর্ণ অনুরাগ মাখা মুখ খানিতে আজ বিরাগের চিহ্ন কেন? আজ তোমার সেই সদানন্দ অনিন্দ্য

বদনারবিন্দ বিশুষ্ক ও ম্লান কেন? তোমার অসাধারণ যশোসৌরভ,তোমার অমানুষিক গুর্খগৌরব আজ নীরব কেন? তোমার বিপুল রাজ্যাধিকার, তোমার অপার সৈন্য-পারাবার, আজ হাহাকারময় তুমুল তুফানসঙ্কুল কেন? হায়, হায়, মরি, মরি! রাবণের স্বর্ণলঙ্কা যেন রে—তুচ্ছ নর-বানরে ছারখার করিয়া ফেলিল—রুষ সম্রাটের আজ অলোকসামান্য লোকবল, ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র জাপান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইলরে! হা পোড়া কপাল! জগতে কে জানিত আগে—জাপানের এমন বাহাদুরী আর জারের এই জারিজুরী! এখন দেখি, সকলই ফক্কিকারী।

কি হবে রাজন্—ভাবিলে এখন? "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"! কিছুই ত তোমার অভাব ছিল না; বল বীর্য্য, শক্তি শৌর্য্য জনবল নৌবল,সুদূর শাসন, প্রবল পরাক্রম প্রভৃতি সমস্তই বিধাতা তোমাকে অমিত হস্তে দিয়াছিলেন; তবে কেন এ দুর্ম্মতি? তবে কেন এত দুরাকাঙ্ক্ষা? তুমি এত মহৎ—তোমার রাজ্য এত বৃহৎ, তবু তুমি রাজ্যলালসায় অন্ধ হইয়া ক্ষুদ্র মাঞ্চুরিয়ার দিকে কি কুক্ষণে দিলে—তীব্র দৃষ্টি? নতুবা কি হইত এত রক্ত বৃষ্টি—এখন রসাতলে যায় যে সৃষ্টি?

তোমার মন্ত্রীর মন্ত্রীরই বা কিরূপ বল দেখি? এত বড় রাজ্যের রাজ মন্ত্রীর রাজ নৈতিক বুদ্ধি কি এতই সঙ্কুচিত ছিল? আর দেখ দেখি, জাপান তোমার ভবিষ্যত কটাক্ষপাত বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়া বহুদিন ধরিয়া কত আয়োজন করিয়া যুদ্ধের জন্য কেমন প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল? জাপানের কেমন রণ কৌশল, কেমন বুদ্ধিবল, কেমন গোলাগুলি, কেমন বারুদরসদ বল দেখি? ক্ষুদ্রের অসীম শক্তিতে সমগ্র সংসার যে আজ স্তম্ভীত হইল!

তোমার বুদ্ধির দোষে, তুমি ত আজ শুধু জাপানের নিকট পরাস্ত নহ; জগতের যাবতীয় জাতি, যাহারা তোমাকে অজেয় বলিয়া জানিত, আজ তাহাদের নিকট ও তুমি বিজিত ও বিনত। ধিক তোমাকে? এমন কি, জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় রণকুশল মহাবলবান্ ইংরাজও সময়ে সময়ে বালকের ন্যায় যেন 'জুজু কাটার' ভয়ে তোমার নামে হাড়ে কম্পবান্ হইতেন—তোমার প্রতি পদক্ষেপে আতঙ্কে অধীনে হইতেন—তোমার শারদীয় জলদ গর্জ্জনের ন্যায় এক একটী বৃথা ভৈরব হুঙ্কারেও শঙ্কায় আকুল হইতেন, তাঁহারাই বা আজ কি মনে করিতেছেন বল দেখি? ছি, ছি, কাজ ভাল কর নাই:

যাহাদের আশায় রণোন্মত্ত হইয়া নাচিয়াছিলে— যাহাদের বুকে বুক বাঁধিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলে, এখন তাহারা কোথায়? কোথায় তোমার সেই শক্তিশালি সেনাপতি ষ্টোশেল? কোথায় তাঁহার সেই সগর্ব্ব আস্ফালন? শেষফল ত শুধু শুধু আত্মসমর্পণ? এখন, ভাব দেখি একবার—তোমার বড় আশার আর্থার বন্দর! দর দর ধারায় চক্ষের জল পড়ে না কি? বড় আশায় নিরাশ হও নাই কি? তাহার পর তোমার সেই অমিত শৌর্য্যশালিন্ কুরোপাট্কিন্—তিনি যে এখন দ্বেষ হিংসাহীন! তাঁহার বীরোচিত বলগর্ব্ব, একেবারে খর্ব্ব হইয়াছে যে! তাঁহার রণপিপাসা ত এখন 'অহিংসা পরমোধর্ম্মে' পরিণত হইয়াছে! কেমন—নয় কি?

এই ত গেল স্থল যুদ্ধের কথা ; জল যুদ্ধেও আবার ব্যথা পাইযাছ শুনিতেছি, তাহাতেও যে সর্ব্ব শরীর রোমঞ্চিত হইয়া উঠে।

ধন্য জাপানী ! ধন্য তাহার রণ কৌশল—ধন্য তাহার জল যুদ্ধ শিক্ষা ! সংপ্রতি জল যুদ্ধের নূতন সংবাদ যে বড়ই ভয়াবহ। হায়, হায়, কোথা গেল--তোমার সেই বাল্‌টিক বাহিনীব নৌ সেনাপতি বোজ ডেষ্ট ভেন্‌স্কি? তাঁহাবও চিবাভ্যস্ত ওইস্কিপান এখন হয় বা জন্মের মত শেষ হয় ! তাঁহার এত আয়োজন—এত আস্ফালন--এত রসদ সংগ্রহ—এত গুপ্ত মন্ত্রণা সকলই যে অকারণ হইল। তোমাব দ্বাদশ বণতরিই যে আজ বিধ্বস্ত ও বিচূর্ণিত হইয়া কতক সাগরের অতল তলে ডুবিল এবং কতক শত্রুহস্তগত হইল। তাহাদের মধ্যে আবার যে দুই খানি রণতরি সর্ব্বাধিক শক্তি সম্পন্নএবং শত শত কোটী টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত, সেই 'অরেল' ও 'বায়োদিনো' নামক জাহাজদ্বয় যদি গিয়া থাকে, তবে আব তোমার রহিল কি জার?

আবার বাল্টিক বাহিনীর তৃতীয় বহরের নৌ সেনাপতি এডামরাল নিবাগোটাভ তিন সহস্র নৌ সেনার সহিত বন্দীও হইয়াছেন শুনিতেছি ! আর সর্ব্বনাশের বাকি কি? আর তোমাব আছে কি? বাহিরে ত পদে পদে এই বিষম বিভ্রাট ও পরাজয় ! ঘবেও ত তোমার তিলেকের তরে শান্তি নাই ; যাহাদিগকে এতদিন আপন ভাবিয়া প্রাণে স্থান দিয়াছিলে, যাহাদিগকে তোমার নিতান্ত হিতৈষী সুহৃদ বলিয়া জ্ঞান ছিল, তাহারাই যে আবার নিষ্ঠুর নির্ম্মম নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া এরূপ ঘোব বিপ্লব উপস্থিত করিবে এবং সময় বুঝিয়া তোমার বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্তে হইবে, তাহাও কি কখন ভাবিয়াছিলে? তাই বলি তোমার এখন ঘরে শনি—বাহিরে রাহু ! আর এখন 'উহু 'উহু' বলিয়া অনর্থক মর্ম্মান্তিক যাতনায় কেন কাতর হইতেছ?

'যাক্ প্রাণ— থাক মান' এই নীতিই সাব জ্ঞান না করিয়া—দাঁতে তৃণ লইয়া--জাপানের চবণে পড়িয়া—'ভিক্ষাং দেহি' বলিয়া সন্ধি ভিক্ষা কর : আর কেন? যতদূর দেখিবার তাহা ত দেখিল ! স্থল যুদ্ধ, জল যুদ্ধ, শূন্য যুদ্ধ সকলই ত নিষ্ফল ! আবার অস্ত্র যুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি কোন যুদ্ধেই ত জাপানীর সমকক্ষ হইতে পারিলে না। এক্ষণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া দেশের মানুষগুলিকে দেশে ফিরাইয়া আইস এবং কাহারও দিকে দৃষ্টি না দিযা নীরবে নিজ-রাজ্য ভোগ কর।

হায়! কাকে বলি—কে শুনে? মতিচ্ছন্ন হ'লে কি আব হিত কথা ভাল লাগে না মনে আসে? তবে যাও, তোমার বাজ্যের বাজলক্ষ্মীব সহিত যুক্তি করিয়া যাহা কর্ত্তব্য মনে কর, তাহা সম্পন্নকর। ডাক দেখি, এক বার তোমার রাজ লক্ষ্মীকে ; কই, তিনি কোথায়?

তাহাকে আর এখন কোথা পাবে? তিনি কি আর রাজধানীতে আছেন? রুষিয়ার রাজ লক্ষ্মী ! এখন সাইবিরিয়ার মরুময় প্রান্তরে ! সে বড় ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ দৃশ্য ! পাঠক ! "জীবন সহচরের" তৃতীয় সংখ্যায় আবার এই বায়স্কোপে সেই দৃশ্য দেখিতে পাইবেন। আপনি ভারতবাসী বা বাঙ্গালী হইলেও সেই দ্বিতীয় দৃশ্য দেখিয়া চমকিত স্তম্ভীত ও বিস্মিত হইবেন।

নানা কথা।

বিবিধ সংগৃহীত জ্ঞাতব্য বিষয়।

"গোঁফ দেখিয়া নাকি মনুষ্যস্বভাবের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। গোঁফ এবং ওষ্ঠের গঠনের ভাবে জানা যায়, যে, মানুষ অহঙ্কারী, আত্মনির্ভরপর, গর্ব্বিত, আত্মসংযমী অথবা তদ্বিপরীতভাবাপন্ন কিনা। গোঁফ যদি ন্যাকড়ার মত হয়, এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়ায়, তাহা হইলে বুঝা যায় তাহার সমুচিত আত্মশাসন ক্ষমতা আছে; কিন্তু গোঁফ যদি সোজা সাজান ভাব হয়, তাহা হইলে ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন বুঝিতে হইবে। আবার গোঁফের অগ্রভাগ সকল কুঞ্চিত হইলে তাহা দুরাকাঙ্ক্ষা ও গর্ব্ব-প্রকাশক এবং কুঞ্চিত অগ্রভাগ গুলি উর্দ্ধমুখী হইলে প্রসন্ন ও প্রেমিক ভাবের পরিচায়ক বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু ঐ গুলি নতমুখী হইলে তাহাতে তদ্বিপরীত ভাবই অনুমেয়। মহাকবি সেক্ষপিয়র জীবনের প্রশান্ত ও প্রেমিক ভাবের জন্য বিখ্যাত, সাধারণ চিত্রকরগণ দ্বারা উক্ত কবিবরের যেরূপ চিত্র চিত্রিত হইয়াছে তাহাতেও উহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সৎস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাদের গোঁফ উর্দ্ধমুখী করিতে যত্নবান, এবং তদ্বিপরীত স্বভাবের লোক সে গুলি নতমুখী রাখিতে যত্নপর। বলা বাহুল্য, একখানি বিলাতি পত্রে গোঁফের এইরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু যাহাদেব গোঁফ একেবারেই নাই, তাহাদের কোন কথা এই বিজ্ঞানে নাই কেন? গোঁফেব বিজ্ঞানে আমরাও অপণ্ডিত নহি। আমরাও গোঁফ দেখিয়াই শিকারী বিড়াল চিনিতে পাবি।"

ডাক্তার কনষ্টান্টাইন ফলবাগ কয়লার এই আশ্চয্য গুণ আবিষ্কার করেন। তিনি একদা কয়লা হইতে উৎপন্ন তেলের বহুবিধ পরীক্ষা করিতে কবিতে উহাতে এরূপ নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, সমস্ত দিন আহাব নিদ্রা ভুলিয়া আপনার পরীক্ষাগৃহে (Laboratory) অতিবাহিত করেন। সন্ধ্যার পর পরীক্ষা সমাধা হইলে উপবাসী আছেন বলিয়া মনে হয়। তখন অনতিবিলম্বে ভোজনাগারে আসিয়াই রুটী ভক্ষণ করেন। তাড়াতাড়িতে হস্ত মুখ প্রক্ষালন কবিতে ভুলিযা গিয়াছিলেন। রুটী মিষ্ট বোধ হইল। জলপানের জন্য গ্লাস তুলিলেন; যেখানে অঙ্গুলি লাগিয়াছিল ঘটনাক্রমে সেই খানেই অধরৌষ্ঠ স্পর্শ করিল। জলকে সরবৎ বলিয়া ভ্রম হইল। তাহাব পর তিনি আপনার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট লেহন করিয়া দেখিলেন যে, উহা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মধুরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি আলকাতরা হইতে এমন এক পদার্থ বাহির করিয়াছেন, যাহা মধু অপেক্ষা মধুর। তিনি ভোজনপাত্র ফেলিয়া পরীক্ষাগৃহে যাইয়া দেখিতে লাগিলেন; সমুদয় পাত্র অতি সুমধুব হইয়াছে। ইহার পর তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস প্রগাঢ় গবেষণা ও বহুবিধ পরীক্ষা করিয়া সুলভ উপায়ে বিক্রয়োপযোগী শকরা বাহির কবিতে সমথ হইয়াছিলেন। জার্ম্মাণিতে এই চিনি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। উহা এত মিষ্ট যে এক ছোট চামচায় করিয়া এক বারেল জলে ফেলিয়া দিলে সমুদয় জল সুমিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার অতি সামান্য

কণিকা তিক্ত কুইনাইন বা তীব্রাম্লময় ঔষধে ফেলিয়া দিলে উহা গুড়ের ন্যায় সুমিষ্ট হইবে অথচ ঔষধের উপকারিতা নষ্ট করিবে না। ঔষধের মন্দগন্ধনিবারক সামগ্রী এমন আর নাই। সাধারণ ইক্ষু আদির চিনি অধিক দিন অনাবৃত থাকিলে বা জলীয় বাষ্প বা উত্তাপ পাইলে নষ্ট হয়, গাজিয়া উঠে ও পচিয়া যায় ; কয়লার চিনিতে তাহা হয় না।

ইক্ষুর চিনির ২০০ গুণ, কয়লার চিনির এক গুণের সমান। অর্থাৎ এক সের কয়লার চিনি প্রয়োগ করিলে যে পরিমাণ জলের সরবত হইবে, সেই পরিমাণ সরবত প্রস্তুত করিতে আখের চিনি সাড়ে পাঁচ মণের প্রয়োজন।

দক্ষিণ ফ্রান্সের পোকার উৎপাতে ইক্ষু চাষ উঠিয়া গেলে, তথাকার কৃষকেরা বীট পালঙ্গের আবাদ আরম্ভ করেন। উহার মূল হইতে এক প্রকার চিনি বাহির হয়। কিন্তু উহা ইক্ষুর ন্যায় মিষ্ট নহে। এজন্য তথাকার ব্যবসায়ীরা বীটের চিনিতে অতি সামান্য পরিমাণ কয়লার চিনি মিশ্রিত করিয়া উহা দ্বারা ইক্ষুর চিনির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে।

চীন দেশে, কোন কোন ব্যক্তি মাসিক বা বার্ষিক বেতনের বরাদ্দ করিয়া ডাক্তার রাখেন। কিন্তু সর্ত্ত এই যে, বাটীতে কাহারও অসুখ হইলেই ডাক্তারের মাহিনা বন্ধ। যতদিন না রোগ ভাল হয়, ততদিন ডাক্তার বেতন পাইবেন না। রোগী ভাল হইলেই, আবার ডাক্তারের মাহিনা চলিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই ত ডাক্তার ; স্বাস্থ্য যে কদিন ভাল থাকিবে না, সে কয়দিন ডাক্তার পয়সা লইবেন কেন? এক সময়ে বিলাতের একজন উকীল, পুলিশের প্রতিও এইরূপ নিয়ম চালাইতে চাহিয়াছিলেন। একদিন রাত্রে তিনি বাড়ীতে ছিলেন না, ঘরে চোর প্রবেশ করিয়া, তাঁহার জিনিসপত্র চুরী করে। তিনি তারপর পুলিশের টেক্স বন্ধ করিলেন। মাজিষ্টার শমন করিলে, বলিলেন, "পুলিশ চুরী সিঁদ নিবারণ করিবে এইত পুলিশের কাজ ; টেক্সও এই জন্যই দেওয়া যায়। আমার বাড়ীতে চুরী হইল, আমি টেক্স দিব কেন? এক সহজ কথা।" মাজিষ্টার সোজা কথাটা অবশ্য শুনিতে পারিলেন না, কি করেন, আইনানুসারে টেক্স দিবার হুকুম দিতে তাঁহাকে বাধ্য হইতে হইল। তা হউক, কিন্তু কথাটা নিতান্ত উপহাসের নহে। আমাদের ঠিক স্মরণ হয় না, নেপাল কি দেশীয় অন্য কোন রাজ্যে পূর্ব্বে এরূপ রীতি ছিল যে, কোন স্থলে চুরী হইলে, সেই এলাকায় পুলিশ পাহারার কাছে, আগে চোরাই মালের মূল্য ধরিয়া লইয়া, তবে চুরীর অনুসন্ধান চলিত। চুরি চামারির জন্য, পুলিশ দায়ী থাকিত। চুরীর প্রাদুর্ভাবও একেবারেই তথায় ছিল না ; জিনিসপত্র পথে পড়িয়া থাকিলেও, কেহ ছুইত না। টাকার তোড়া দেখিলেও, কাহারও হাত দিবার এক্তিয়ার নাই। আমাদের ইংরেজ রাজ্যের অকর্ম্মণ্য পুলিশ প্রথার পরিবর্ত্তন না করিলে আর নিস্তার নাই।"

বিখ্যাত পিরামিডের গাঁথনীর পরিমাণ ৮৫০,০০০,০০০ কিউবিক ফুট। কিন্তু চীনের জগদ্বিখ্যাত প্রাচীরের পরিমাণ ৬,৩৫০,০০০,০০০ কিউবিক ফুট। এক জন ইঞ্জিনিয়ার কয়েক বৎসর চীন দেশে ছিলেন, তিনিই ইহা বলিয়াছেন। তিনিও আরও বলেন যে ইউনাইটেড ষ্টেটসের ১,০০,০০০ মাইল রেল রাস্তা তৈয়ারী করিতে যত টাকা খরচ হইয়াছে, তাহারও অধিক টাকা এই প্রাচীর তৈয়ার করিতে খরচ হইয়াছে। এই প্রাচীরের গাঁথনীতে যে সমস্ত মাল মশলা লাগিয়াছে, তাহাতে চারিহাত উচ্চ দেড় হাত চওড়া প্রাচীরের দ্বারা পৃথিবী বেষ্টন করা

চলে। কিন্তু এই বিরাট ব্যাপার ২০ বৎসরে শেষ হইয়াছে এবং এত বড় একটা বিপর্যায় কাণ্ড করিতে একটা পয়সাও ধার কর্জ্জ করিতে হয় নাই। ইহা যেমন একটী মহান কাণ্ড তেমনই ইহা মনুষ্যজাতির পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের একটী জগদ্বিখ্যাত চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত।"

সংবাদ সংগ্রহ

১। লণ্ডন সহরে "ট্রিবিউন" নামক নতুন একখানি সংবাদ পত্র বাহির হইতেছে ; ৪৫ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া এক কোম্পানী ইহা বাহির করিতেছেন। এই পত্র লিবারেল দলের মুখপত্র স্বরূপ হইবে। ইহার মূল্য এক পেনি বা এক আনা মাত্র।

২। আমাদের রাজপুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ভারতে শীঘ্রই শুভাগমন করিবেন। কুমারের কিরূপ অভ্যর্থনা করিতে হইবে, তাহা স্থির কবিবার জন্য কলিকাতা টাউন হলে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভাপতি হইয়াছিলেন স্বয়ং ছোটলাট—বঙ্গেশ্বর।

৩। সিমলা পাহাড় এখনও থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে ; এই কম্পন স্থানীয় বলিয়াই অনুমান হয়।

৪। বিলাতের পালিয়ামেন্টে সম্প্রতি কুকুর রক্ষা সম্বন্ধীয় একটী আইনের জন্য একখানি দরখাস্ত পেষ হইয়াছে ; ইহা লম্বায় আড়াই মাইল এবং ওজনে প্রায় সওয়া মণ ! এই দরখাস্তে প্রায় ১ কোটী ৮০ লক্ষ লোকের দস্তখত আছে।

বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রতি।

এবারে অপরের কোন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় নাই ; কারণ ইহার প্রচার কিরূপ হয় না দেখিয়া ইহা লওয়া যুক্তি সঙ্গত মনে করি নাই। প্রথমে মোটে ভাগ্যোপহারের গাহক অনুযায়ী ৩০০০ তিন হাজার মাত্র ছাপা হইয়াছিল ; ভগবানেব কৃপায় "জীবন সহচরের" সেই তিন সহস্র সংখ্যাই শেষ হইতে আর বেশী বাকী নাই। প্রত্যহ যেরূপ পত্র ও মূল্যাদি আসিতেছে, তাহাতে তৃতীয় সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে ছাপাইতে হইবে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যারও ২য় সংস্করণ করিতে হইবে। সেই জন্য তৃতীয় সংখ্যা হইতে বিজ্ঞাপন ছাপার জন্য আমরা পত্রিকার স্থান সঙ্কুলান রাখিব এবং বেশী বিজ্ঞাপন পাইলে আয়তনও বৃদ্ধি করিব। পূজার পূর্ব্বেই তৃতীয় সংখ্যা বাহির হইবে ; বিজ্ঞাপনদাতাগণ এখন হইতেই বিজ্ঞাপন পাঠাইতে থাকুন। ভাদ্র মাসের ২০শের মধ্যে বিজ্ঞাপন ও মূল্য হস্তগত না হইলে আশ্বিনের সংখ্যায় বাহির হইবে না ; মনে রাখিবেন—এই সংখ্যা হইতেই সেই বাঙ্গালীর ভাগ্য-গগনের অদ্ভুত ধুমকেতু অর্থাৎ "রিফাইণ্ড শতমুখীর" আবির্ভাব হইয়া বঙ্গ সমাজে মহা প্রলয় উপস্থিত করিবে।

বিজ্ঞাপনের মূল্য।—আপাততঃ অল্পদিনের জন্য "জীবন সহচরেব" এই প্রশস্ত কলমের স্মল পাইকা অক্ষরের বহৎ লাইন দুই আনা হিসাবে এবং বেশী দিনের জন্য এক আনা হিসাবে লওয়া হইবে। বেশী দিনের জন্য প্রতি কলাম দুই টাকা ও প্রতি পেজ সাড়ে তিন টাকা হিসাবে মাসে লাগিবে। ২/১ মাসের জন্য লাইন হিসাবে ধরা হইবে। এখন যাঁহারা বিজ্ঞাপন

দিবেন, পরে মূল্যের হার বাড়িলেও তাঁহাদিগের পক্ষে এই নিয়মই চিরদিন থাকিবে। সেই বর্দ্ধিত হার শুধু নূতন বিজ্ঞাপন দাতাগণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইবে।

জীবন সহচর—ড্যাম বাঙ্গালী।

ভাদ্র, ১৩১২ সাল।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

জীবন সহচরের ১ম সংখ্যায় "ড্যাম বাঙ্গালীর" বিবরণ অর্থাৎ ইহাতে কিরূপভাবে লিখিত হইবে এবং এই বৎসরে প্রধান প্রধান কি কি বিষয় থাকিবে, সেই সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক লিখিত হইয়াছে। আরও "চাকুরী না গুখুরীর" বক্তব্য বিবৃত হইয়াছে। এবার এই দ্বিতীয় সংখ্যায় 'ড্যাম বাঙ্গালীর' গোবরচন্দ্রিকা ভাঙ্গিয়া 'মা ভবতারার পিতৃশ্রাদ্ধ' ও চাকুরী না গুখুরীর এই দুইটী চিত্র আরম্ভ করা হইল। তৃতীয় সংখ্যা হইতে "বিফাই ও শতমুখী" ও শতমুখে শত শত জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইবে। এই বৎসরে "ড্যাম বাঙ্গালীতে" এই প্রধান তিনটী চিত্র অঙ্কিত হইবে এবং আরও ছোট খাটো অনেক ছবি দেখিবেন। আবার আগামী বৎসরেও নূতন নূতন চিত্র প্রকাশিত হইবে। মোট কথা ইহাতে সকল সময়েই নিত্য নূতন দেখিতে পাইবেন।

গত জুলাই মাস হইতেই বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ে অর্থাৎ কলিকাতা হইতে খুলনা ও বনগ্রাম হইতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইন আর কোম্পানীর হস্তে নাই। গবর্ণমেণ্ট এই লাইন খাস করিয়া লইয়াছেন।

আমাদের অর্দ্ধযুগাধিককালের অর্থাৎ প্রায় সপ্তবৎসরের সাধের "জীবন সহচর" ও আজ "ড্যাম বাঙ্গালীকে" বক্ষে লইয়া নূতন আকারের নূতন ভাবে আবার ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা হিসাবে গত জুলাই মাসেই বাহির হইয়াছে। ভরসা করি, বাঙ্গালা ১৩১২ সালের শ্রাবণ ও ইংরাজী ১৯০৫ সালের জুলাই মাস আমাদের ও পাঠকবর্গের পক্ষে বিশেষ স্মরণীয় মাস রূপে গণ্য থাকিবে।

চাকুরী না গুখুরী।
(১ম খণ্ড)

রেলের বাবু।

প্রথম চিত্র।

বিলাপ—প্রিয়া সম্বোধনে।

"সত্যবান গলে সাবিত্রী সুন্দরী,
অপূর্ব্ব মিলন আহা! মরি মরি!
তুইরে অভাগী, প্রমদা আমার,
কেন মম গলে দিলি ফুলহার?

কেন মম পাণি করিলি গ্রহণ?
কেন মম করে সঁপিলি জীবন?"
নিদাঘ নিশীথে যুবা একজন,
বলিল একথা বিদারি গগণ;
চিবুক ধরিয়া আদর সোহাগে,
বলিল প্রিয়ারে প্রেম অনুরাগে,
তুইরে অভাগী প্রাণের পুতুলি!
কেন মম গলে দিলি মালা তুলি?
জান না কি প্রিয়ে বলিতে সে কথা,
মরমেতে লাগে নিদারুণ ব্যথা,
রেলের চাকর শ্রীরামের চর,
আমরা সকলে বড় ভাগ্যধর;
এত ভাগ্য ধরে রেলের চাকরে,
কপালে যাদের মুকুতা বাজারে,
কণ যাহাদের ঢেঁকিকল[*] পার,
থাকে অবিরত মনে ভয় করি,
চক্ষু যাহাদের জগন্নাথা[†] পানে,
থাকে অবিরত সহিত পরাণে;
হস্ত যাহাদের লৌহের মতন,
টিকিট কাটিতে হয় সর্ব্বক্ষণ,
এহেন পুরুষে প্রণয় বন্ধনে
কেনরে বাঁধিলি পবিত্র মিলনে?
লাল সাদা আর সবুজ নিশান
লইয়া যাঁহারা সতত বেড়ান;
বিদ্যাদিগ্‌গজ তর্ক পঞ্চানন
পিটার গোমিস জন ডইলসন,
প্রভু কতজন যাদের কপালে,
দিবানিশি যারা সদা আজ্ঞা পালে,
উঠিতে বসিতে কথায় কথায়,
যাদের সতত খেটে প্রাণ যায়,
বিদেশে যাদের চিরদিন যায়,
ঘোর বিপদেও ছুটি নাহি পায়,
রেলে বা জেলে পা যাদের বিধান,
তারে কেন প্রিয়ে সঁপিলে পরাণ?
গাড়োয়ানী বৃত্তি যাদের ব্যবসা,
মুচী অব্রাহ্মণ হাঁসা মুষো চাষা
অমিষ বচন পদবী যাহার,

কেন তারে বল আমার আমার?
মুর্খের অধম হইয়া এমন,
কাটাতে সংসারে অভাগা জীবন
পেটের দায়েতে লয়েছি এখন
অধমতারণ রেলের শরণ।
নারিনু করিতে সুখের সঙ্গিনী,
কেবলি হইলে দুঃখের ভাগিনী।
সুখে না রাখিতে পারিনু তোমায়
জ্বালানু সদাই দারুণ জ্বালায়।
জীবন অবধি জনমের তরে,
লিখে রেখো প্রিয়ে জ্বলন্ত অক্ষরে,
তোমার সরল মনের ভিতর,
ধরায় অধম রেলের চাকর।[†]

* (মর্স টেলিগ্রাফ)

† (নিডল টেলিগ্রাফ)

স্বামীর এই দুঃখের কথায় স্ত্রী যাহা উত্তর দিবেন, তাহা বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

গৌরচন্দ্রিকা -- ১ম ধূয়া।
আপন ছবি আপনিই আঁকি।

'সাধে কি বাঙালী মোরা, চির পরাধীন?
সাধে কি বিদেশী আসি, দলি পদভরে,
কেড়ে লয় সিংহাসন? করে প্রতিদিন,
অপমান শত শত চক্ষের উপরে?"

(পলাশীর যুদ্ধ।)

ভাই বাঙ্গালী! তুমিও বাঙ্গালী আমিও বাঙ্গালী! তবে কেন এই গালাগালি? তবে কেন লিখি "ড্যাম বাঙ্গালী"? নিজেব ফটো কেন নিজেই তুলি? স্বজাতীর মান মর্য্যাদা কেন সহজেই ভূলি? ভুলিবনা কেন ভাই? আর আমাদের আছে কি? কিছুই ত আর নাই বাকী—তাই ভাই, আজ আপন ছবি আপনিই আঁকি।

সহরে নগরে, জেলায় মহকুমায়, ফাড়ী থানায়, কুটী বাঙ্গালায়, চা বাগিচায়, কল কারখানায়, আফিসে আদালতে, সভা দরবারে, রেলে জেলে, যেখানে সেখানে গৌরাঙ্গের গালাগালি—মিঠা বুলি "ড্যাম বাঙ্গালী" আমরা ত অহরহঃ অঙ্গভার করিয়াই রাখিয়াছি। আবার পথে ঘাটে, ট্রেণে ট্রামওয়ে, ষ্টিমারে জাহাজে আমরা অতি নগণ্য শ্বেতাঙ্গের সহযাত্রী হইলেও তাঁহারা ঘৃণার চক্ষে চাহিয়া থাকেন। আগে জানিতাম সূর্য্যাপেক্ষা রৌদ্রই বেশী তীব্র; কিন্তু সে দিন স্বয়ং কুণ্ঠিত হন নাই! আমাদের রাজরাজেশ্বরের প্রতিনিধি স্বয়ং বড়লাটই যখন কন্‌ভোকেসন সভায় সমগ্র ভারত সন্তানকে মিথ্যাবাদী বলিতে ছাড়েন নাই, তখন আর অন্য পরে কা কথা! এর চেয়ে আর কি আছে দুর্ব্বিসহ মর্ম্মব্যাথা? যখন আমাদের সে ব্যথা কেবল কথার কথামাত্র, তখন আর আমাদের বাকি আছে কি--তাই ভাই, আজ আপন ছবি আপনিই আঁকি।

যদি বল, যাহাদের জাতীয় জীবন চিরদাসখতে আবদ্ধ, যাহারা পরাধীন—পরের চরণে চিরবিক্রিত, সেই বিজিত জাতি যদি ঘৃণিত বা উপেক্ষিত না হইবে, তবে আর হইবে কে? কিন্তু ভাই! শুধাই তোমায়, শুধুই কি তাই? তোমার নিজের দোষ কি, কিছু মাত্র নাই? আপন দোষে যে আপনি মজিতেছে এবং সোনার বাঙ্গালা মজাইতেছে, তাহা কি বারেকের জন্যও তোমার আমার মনে আসে? কখনই না! আপন দোষের দিকে দৃষ্টি দিলে বিদেশীর বিষদৃষ্টিতে আমরা কখনই পড়িতাম না। আপন অপরাধ আপনি কখনও দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি কি? তাই ভাই আজ আপন ছবি আপনিই আকি!

ছবি ত অনেকেই অনেক রকম আঁকিয়াছেন. কত নাটক. কত প্রহসন. কত উপন্যাস, কত নবন্যাসই ত আজকাল বাঙ্গালী চিত্তের আধার তাহার উপর আবার, অমৃতের অমৃত ধারা—গিরীশের শ্লেষের ছড়া—"মডেল ভগিনীর" মুখনাড়া—"চিনিবাস" আদির চরিত কথায় প্রাণে কত ব্যথাই পাইবার কথা! ঘরে ঘরে যে ছবি প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাই আবার

রঙ্গালয়ের অভিনয়ে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হইতেছে দেখিতেছি; শেষে "বলিদানের" কোপে এবং "চাবুকের" আঘাতেও চৈতন্য হয় কি? বরং সে সকল দেকিয়া শুনিয়া দিবানিশি শুধু হা-হা হাসি! আর মুখে মুখরোচক পর-নিন্দারাশী! আপন দোষ আপনি কিছু দেখি কি? তাই ভাই, আজ আপন ছবি আপনিই আঁকি!

এ ছবি পুস্তক বিশেষে শেষ হইবে না। এ ছবি বংশাবলি ক্রমে আজীবন বাঙ্গালী জীবনের সহচর করিয়া দিবার জন্যই "জীবন সহচরের" সহিত সংযোজিত রহিল। মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, নব নব ভাবে "ড্যাম বাঙ্গালীর" ছবিগুলি ক্রমঃই ফুটিয়া উঠিবে। ইহার সমুজ্জ্বল ছটায় সমগ্র বঙ্গ বিভাসিত হইবে—ইহার অভিনব দৃশ্যাবলীতে গৌড়-জল-প্রাণ পুলকিত ও মোহিত হইবে! কারণ এই "ড্যাম বাঙ্গালী" কলঙ্কের লেখা জলের রেখা নহে ইহা মুহূর্ত্তে মুছিবার নহে। এ ছবি অঙ্কনের উপকরণও স্বতন্ত্র; বাঙালী নর নারীর তপ্ত মর্ম্মোচ্ছাসি মিশ্রিত অশ্রুজলে ইহার ফলাইতেছি আর প্রাণের ... আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে—উঃ-উঃ-ওহো—গেলাম, গেলাম— হা হতোস্মি!"—পতন ও মূর্চ্ছা!!

(২)

ঘাটে।

'হায় কি হলো—হায় কি হলো—সংসার আঁধার হলো যে—আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পলো যে—আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেলো যে!

"হা জেন্টলম্যান— হা মম ধ্যান জ্ঞান! প্রাণ করে আনচান্! একবার চোখ খুলে চাও—একবার উঠে কথা কও! হা ভ্রাতঃ! হা সখে! হা নীলমণি! তুমি যে সকল গুণের গুণমণি! তুমি যে মম-হৃদি-চন্দ্র-চূড়ামণি; ডাকি আমি তোমা সখে—যথা ডেকেছিল মহাশ্বেতা পুণ্ডরীকে!

"উঠ বীরবর—ওহে গুণধর! উচিত কি তব এ শয়ন! ধীরে ধীরে বারেকের তরে মেলরে নয়ন! অচিরে করিব বাসনা পূরণ! লিলির এইরূপ বারম্বার বিলাপোক্তিতেও নীল সাহেবের চৈতন্য হইল না!

তখন মিস্ লিলি ও তাঁহার সঙ্গী মিষ্টার বুল্ বুল্ বেগতিক দেখিয়া দুইজনে ধরাধরি করিয়া-নীলুকে তাড়াতাড়ি নিকটস্থ জলের ঘাটে লইয়া গেলেন। গড়ের মাঠে, মাঝে মাঝে এরূপ জলাশয় অনেক আছে। ঘাটে গিয়া নীলসাহেবের মাথায় জল দিয়া স্ব, স্ব রুমাল দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে নীলুর একটু চৈতন্য হইল: তখন রাত্রি প্রায় ৭।।০ টা, গ্যাসের আলোকে মাঠ আলোকিত.হইয়াছে; নীলসাহেব একবার মাত্র ভয়ব্যঞ্জকস্বরে "অই ভূত—অই ভূত" বলিয়া চীৎকার পূর্ব্বক পুনরায় অজ্ঞান হইলেন। লিলি ও বুলবুলের শুশ্রূষায় পুনরায় চেতনা পাইয়া নীলসাহেব এবার একেবারে উঠিয়া বসিলেন; তাঁহার সেই চিন্তা-মেঘম্লান মুখশশী—এখন যেন জ্বলন্ত অগ্নিরাশী! শিখা সকল নাক কান, চোখ মুখ প্রভৃতি সমস্ত রন্ধ্র পথ দিয়া

অনর্গল বাহির হইতেছে! তিনি রক্তবর্ণ চক্ষু বিঘূর্ণিত করিয়া দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ পূর্ব্বক গম্ভীর রবে বাবম্বার বলিতে লাগিলেন—"ড্যাম বার্ণাকুলার—ড্যাম ভার্ণাকুলার!"

লিলি কহিলেন—"তার জন্য আর চিন্তা কি সখে? আপনি প্রকৃতিস্থ হউন;তাহার পর বাঙ্গলা ভাষার অস্তিত্ব যাহাতে বিলুপ্ত হয়, মাতৃ ভাষার পরিবর্ত্তে রাজ-ভাষা যাহাতে বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বণিতার কথোপকথনের ভাষা অর্থাৎ কলোকোয়েল ল্যাঙ্গোয়েজ হয়, তাহার চেষ্টা বিধিমতে করিব। তখন দেখিবেন রাজভাষাই আমাদের মাতৃভাষা হইবে। কেন আপনি ভাবছেন? সেই বাঙ্গালা কাগজওয়ালাদের এবং বিকট ভূত সকলের নামে মানহানি অর্থাৎ ডিফামেশনের মোকদ্দমা আনিব। মনে কি নাই—ভগ্নি কুসুমের কুৎসায় বিশারদের কি দুর্দ্দশা?"

নীলু। তবে আর ভাবনা কি বলনা? থাকিতে প্রাণের ভগ্নি—হেন শিক্ষিতা ললনা? ও মাইডিয়ার—চিয়ার, চিয়ার, চিয়ার—ও মাই এভার ডিয়ার

—গুড পেয়ার—থ্যাঙ্ক ইউ ফর এভার!

বুলবুল। থ্রি চিয়ার্স (Three cheers) ফর লিলি! কিন্তু বলি, এসকল কি সম্ভব হইবে?

লিলি। নিশ্চয়, নিশ্চয়—দেখবেন, দেখবেন—সিওর এন্ড সার্টেন!! আগামী কল্যই মিটিং কোরে এমন সংযুক্তি বা'র কোরবো যে, দেখবেন— শীঘ্রই পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হ'বেই হ'বে!

নীলু। আচ্ছা, এই মিটিংএ ত সকলে আসবেন না। এমন কি, আমাদের বিলাত ফেরতের মধ্যে ও যে কাহারও কাহারও মাতৃভাষার নামে মুখ দিয়া জল পড়ে। তাঁরা আবার ইহার উন্নতি কল্পে সময়ে সময়ে আর্টিকেল অবধি লেখেন দেখিতে পাই। ড্যাম মাতৃভাষা! এবার আগে তোর মূল উপড়া'বো—তোর বাপের শ্রাডড কোরে, তবে তোর শ্রাডেডর চাল চড়া'বো।

লিলি। ঠিক বোলেছেন; মাতৃভাষার পিতৃশ্রাদ্ধ সর্ব্বাগ্রেই আবশ্যক; নহিলে সমূলে বিনশ্যতি হইবে কেন? তার পর তা'কে নিয়ে পড়া যা'বে। আর এ মিটিংএ ত সকলকে নিমন্ত্রণ কোরবোনা; যাঁরা আমাদের পার্টিভুক্ত আছেন, তাঁহাদেরই কেবল বোল্‌বো।

নীলু। কা'কে কা'কে বোলবেন বলুন দেখি?

লিলি। মিষ্টার ভি ঘোষ, মিষ্টার এবাদুল্লা খাঁ, আচার্য্য কৃপানন্দ সরস্বতী, ফাদার রমানাথ শাস্ত্রী আর আমাদের সঙ্গী এই মিষ্টার বুল বুল্! এই পাচজন পুরুষ মেম্বর।

নীলু। আমাকে ধোল্লেন না যে, গুণ্‌তে ভুল নাকি?

লিলি। ও—নো —নো—গুণ্‌তে ভুল কেন? আপনি মেম্বর হইলেই আপনাকে যে সভাপতি অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট কোরবো! আর স্ত্রী লোকের মধ্যেও আমরা পাঁচ জন; যথা—মিস বকুল, গিন্নি-মা ম্যাডাম মনোরমা, মিষ্ট্রেস মালতী, শিষ্টার প্রভাবতী আর এই কুমারী পদ্মাবতী-'খুড়ী'—মিস্ লিলি!

(নেপথ্যে) জনৈক পথিক। ঠিক, ঠিক—ঠিক মিলেছে—

"অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥"

নহিলে পঞ্চে পঞ্চ মিশিবে কেন? পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশাই ত নৈসর্গিক নিয়ম। ইতি মাতৃভাষার পিতৃশ্রাদ্ধে—এই পঞ্চ কন্যা (Plus) প্লাস অর্থাৎ যুক্ত + উক্ত ষটপুরুষ (Minus) মাইনস অর্থাৎ বিযুক্ত —সভাপতি সেন জি. ইকোয়াল টু (Equal to) অর্থাৎ সমিত = দশজনের 'দশপিণ্ড ব্যবস্থা' নামক প্রথম লীলা। অহং ব্রাহ্মণঃ—ঘোর মাথামাটিসন—ভট্টাচার্য্য তর্কপঞ্চাননঃ।

একি, কোথা হইতে কে এই দৈববাণীর ন্যায় দশপিণ্ড ব্যবস্থা বিদগ্ধব্যঞ্জক ভাষায় ব্যক্ত করিল- কে কোথা হইতে সহসা এমন মান্যমান জেন্টলম্যান ও মাননীয়া লেডির মান নষ্ট করিতে উদ্যত হইল—কে স্বেচ্ছায় আগুনে হাত দিয়া এমন কথা বলিয়া উঠিল? নীল সাহেব ভীত জড়িত কণ্ঠে অদম্য আবেগ ও সহিষ্ণুতা সংযোগে ইহার তুলি প্রস্তুত করিয়াছি। তাহা ছাড়া আর আমাদের আছে কি? তাই ভাই আজ আপন ছবি আপনিই আঁকি।

এ ছবি কোন ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র বিশ্লেষ করিয়া চিত্রিত হইতেছেনা, ইহা সাধারণ বাঙ্গালী জাতির জাতীয় অধঃ-পতনের ছায়া-ছবি মাত্র। এ ছবি যাহাতে বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষের প্রাণের অন্তস্তলে সুদৃঢ় ভাবে সংলগ্ন থাকে, এ ছবি-নিহিত সুতীক্ষ্ণ শ্লেষ শলাকার সূক্ষ্মাগ্রভাগ যাহাতে বাঙ্গালীর মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হয়, আর তাহা হইতে যাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, কি দোষে সুসভ্য বিদেশবাসীর নিকট আমরা এত ঘৃণিত থাকি— তাই ভাই, আজ আপন ছবি আপনিই আঁকি।

এ ছবি আঁকিতে দেখিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিয়া টিপি টিপি থাকিয়া মিটি মিটি হাসিতেছ, কে তুমি গো? বুঝিয়াছি, তুমি পাঠিকা সুন্দরী। পুরুষগুলা বাহির হইতে 'মিঠাবুলি ড্যাম বাঙ্গালী' শুনিয়া আসিয়া আবার ঘরের কোণে আপনাদের নিকটও মিঠাকড়া বোল চাল পায় বলিয়াই কি আপনারা আহলাদে আটখানা ক্ষত বিক্ষত পুরুষ প্রাণে সুশীতল শান্তি বারির বিনিময়ে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" দিয়া মজা দেখা কি আর সাজে? একটী সম্পূর্ণ মনুষ্যের অর্দ্ধেক পুরুষ আর অর্দ্ধেক আপনি। আপনিই যে পুরুষের চিরসঙ্গিণী সহধর্ম্মিনী। আপনি যে সকল বিষয়েরই অর্দ্ধেক—গালাগালিতেও কি আপনি নহেন ফলভাগী? "ড্যাম বাঙ্গালী" পুরুষেরাই কি একাকী? কি দোষে আমরা এত ঘৃণিত, তাহা কখনও ভাবিয়াছেন কি? ভাবেন যদি, বুঝেন যদি তবে ছাড়ুন ছলনা ফাকি। আমার মত সমস্বরে স্বীয় সঙ্গিনীগণকে ডাকিয়া বলুন—"আর কেহ নাই বাকি—তাই ভাই, আজ আপন ছবি আপনিই আঁকি।"

এ ছবি, বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতারই স্বচ্ছ দর্পণ বিশেষ। ইহাতে সকলেরই প্রতিবিম্ব সমভাবে পড়িবে, কেবল বাহ্যাবয়ব বলিয়া নহে, মনের নিভৃত অন্তস্তলে যে অণুপরিমাণ দাগটুকুও আছে, তাহাও ইহাতে দেখা যাইবে। শুধু মাসান্তে কাচ খানিতে নূতন নূতন ছাঁচ ঢালা হইবে মাত্র। তাই বলি পাঠক! দিনান্তে একবার এই 'আয়না' খানি খুলিও—কেমন সুস্পষ্টভাবে আপন ছবি আপনি দেখিবে। আর পাঠিকা! আপনি সর্ব্বাগ্রে এই খানি খুলিয়া

পরে সাধারণ 'আরসীতে' মুখ দেখিয়া আপনার প্রত্যাহিক কেশ বিন্যাস কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তাহা হইলে, আপনার কমনীয় কান্তি অধিকতর কমনীয় দেখাইবে—অন্তর বাহিরের বিমল জ্যোতি শতগুণ বিভাসিত হইবে। হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, বা অন্য যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন, এক বিন্দু বাঙ্গালী রক্তও যাহার শরীরে আছে তিনিই এই নূতন বাঙ্গালী দর্পণ "ড্যাম বাঙ্গালী" যাহাতে প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিত্য সহচর হয়, সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন এবং আমার মত এক মনে এক তানে গাহিবেন—পথভ্রান্ত, দিশাহারা বাঙ্গালীর আর কিবা আছে বাকী—তাই ভাই, আজ আপন ছবি আপনিই আঁকি।

গৌরচন্দ্রিকা—২য় ধূয়া।

অল রাইট (ALL RIGHT.)

আসমানেতে হাওদা পেতে
হাওয়ার পিঠে চ'ড়ে,
চ'লতে চায় এ দুনিয়ার
সকল মুলুক যুড়ে।
পিঞ্জরে পোরা চক্ষু দুটী
চুরুট আঁটা মুখে,
সকের সাহেব ফুল গুঁজেছে
পরদা নসিন বুকে।
এমনি শিখে কপাল ঠুকে
"প্রমিস" ক'রে বসে,
হেট নেটিবের চাল চলনে
ধর্ম্ম কর্ম্ম উড়ায় হেসে।
ভলাণ্টিয়ার ভারত উদ্ধার
ব'লছে "কামন ফাইট"
শরের সেপাই পলায় আগে
মুখে "অল রাইট"।
এমন ধারা সাহেব যারা
ধরা বাঁধা তাদের পায়,
ভেঙ্গে চুরে নতুন ক'রে
জগৎটারে গ'ড়তে চায়।
দেশের ছেলে স্বদেশ ভুলে
বিদেশ পানে অমনি যায়,
ফিরে এসে সাহেব ঘেঁষে
নেটিব পানে নাহি চায়,
সাহেব কিন্তু ভাবে জন্তু

খাতির করে খাসা।
গালের বুলি "ড্যাম বাঙ্গালী"
এড়ায়না ঘুঁশো ঘাঁশা
বুটের দাগে রক্তভাঙ্গে
কান্না থামেনা হোল নাইট !
মান ত এই মানেতে ছাই,
গিন্নিবলে—"অল রাইট"।
কোরতে নকল ঘুচলো সকল
তবু ভাঙ্গলোনা জারি !
"মুখে মারিতং সৌর জগতঃ"
কাজের বেলায় ফক্কিকারী !
চাষার ছেলে লাঙ্গল ফেলে
ছুটে প্রাইমারিতে যায় ;
ড্যাম বাঙ্গালী বাঙ্গালা বুলি
বোলতে লজ্জা পায় !
ড্যাম বাঙ্গালী বাঙ্গলা ভাষা
গড়াগড়ি তাদের পায়,
"সবজান্তা" সে সব সাহেব
"কৃটিসিজম্ কথায় কথায় !
চাইনে সে সব মতামত
চাইনে তাদের সু-"সাইট"
দেশের রত্ন যত্নে নিয়ে
লিখবো যা, তা –অল রাইট"।

মাতৃভাষার পিতৃশ্রাদ্ধ।
প্রথম লীলা।
দশপিণ্ড ব্যবস্থা।

(১)
মাঠে।

'চাকি ডুব্ ডুব্! গোধুলি হয়নি তবু—এমন সময়ে কে তুমি প্রভু? গড়ের মাঠেবাপু! এক পাশে একা ব'সে 'ভেকা' হ'য়ে ভাবচো বল দেখি?

তোমার পরণে হ্যাট কোট—চরণে বিলাতী বুট—ঠোঁটে আঁটা বর্ম্মা চুরুট : কি তোমার চিন্তার রুট (Rule) —বল দেখি, শুনি? ওহে গুণমণি! ভাবে বোধ হয়, তুমি যেন কোন আঁধার ঘরের নীলমণি! তোমা বিনা কেহ যেন আজ মণিহারা ফণী! বল, কে তুমি—তোমার কি চিন্তা, শুনি?

এমন 'সখের প্রাণ, গড়ের মাঠ'—নবীন বয়স নবীন ঠাট! নীরব, নীরস যেন শুক্‌না কাঠ—ব'সে ভাবচো কেন, হ'য়ে আকাট? যাট! যাট্।

এ হেন নবীন পুরুষ-- যেন কোন 'নামজাদা' মানুষ! আজ কেন এত বেহুঁস্? মুখে সদাই হুস্ হুস্! কি বেদনা - কি যাতনা--কি ভাবনা--- বলনা বলনা? কোরেছে ছলনা কি কোন ললনা? ওহে বলনা বলনা?

এমন নিস্মল আকাশ—সাঁঝের বাতাস! কেন কর হা হুতাশ? কেন এতদীর্ঘশ্বাস? কে তুমি, কোথায় নিবাস? কর তুমি কাহার আশ? হ'য়েছ কি কোনআশাতে নিরাশ—তাই এত মর্ম্মোচ্ছ্বাস?

তোমায় যেন চেন চেন করি—অথচ চিনিতে না পারি! কে তুমি হাতে ছড়ি, চাপদাড়ী-- কোকড়া চুলে বাকা টেরি? ওকি? কা কে ডা'কো, চোখ ঠারি?

তোমায় যেন দেখেছি কোথায়—মনে হয় হয়—হয় না, হায় হায়! এই যে—আবার মনে হয় হয়! ওহো, হয়েছে—যেন কোন নব রঙ্গালয়ে—মিস্ লিলি ল'য়ে—নীরব অভিনয়ে কোরেছ মোহিত! ওহে ললিত যুবা! আর যা'বে কোথা? এই বার প'ড়েছ ধরা— ওহে লিলি-মনোহারা! কি ভাবচো—কা'কে ডাকচো—বল ত্বরা? এই যে—এসেছে, এসেছে—তোমার মনচোরা!

দেখিতে দেখিতে চকিতের মধ্যে আর একজন হ্যাট-কোটিধারী যুবা-পুরুষের সহিত একটী সান্ধ্যসমীরসেবনকারিণী সুশিক্ষিতা রমণীমণি নিলমণি বাবুর—"শ্রীবিষ্ণু"—মিষ্টার নীলুসেনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং সাৎসুকে রমণী কহিলেন "এাক! আজ এখানে কেন এমন নিস্পন্দ নির্ব্বাক? ... মুখে বক্তৃতায় ফুরায় না বাক্—সে মুখে আজ কেন সরেনা বাক্? অবাক্ হয়ে ভাবচেন দেখে আমিও যে অবাক্! সে সব এখন চুলোয় যাক্—শুধু শুধু চিন্তায় কেন পুড়ে হ'চ্চেন খাক্? দেখে আমার লেগেছে যে তাক্!

"ভূতলে কেন গগনের চাঁদ—যেন শাপভ্রষ্ট সোণার চাঁদ। পেতেছেন চাঁদপরা ফাঁদ?—না, আরও কোন আছে সাধ? তাই আজ এমন ছাঁদ? বলুন, বলুন, মনে মনে কি বাঁধছেন বালির বাঁধ?

মিষ্টার সেন, সুদীর্ঘ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন "বালির বাঁধ নহে ভদ্রে। লৌহ প্রস্তরের বাঁধই বাঁধ্ছি; আর এই লিলি-চাঁদ ধোববে ব'লেই ফাঁদ পেতে ব'সে আছি—এসেছেন, বেশ হ'য়েছে'!

"এসেছি ত, কিন্তু
ম'রে যাই—মনে মনে কি ভাব উদয়?
কেন আজ হেন সাজ এতই নিদয়?
মুখে নাই মৃদু হাসি দেখতে যা ভালবাসি,
না বাজে মোহন বাঁশি—অই সুধাস্বর।
না নাচে আমার করে—অই চারুকর।
নীরবে একাকী থাকি কার খাচা ভাঙ্গা পাখি
যেন উড়ে এসে যুড়ে—বসেছে হেথায়,
কি জানি কি ছলে বঁধু, কাহারে ভুলায়।—"

মিষ্টার নীলু অমনি রমণীকেবাধা দিয়া দুই কাণে হাত রাখিয়া কহিলেন—"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল—বিঁধিল গো!—উঃ উঃ, আর না, আর না—আর শুনিব না গো—অই বাঙ্গালা বুলি! ল্যাটিন ভাঙ্গা ল্যাঙ্গোয়েজ আমি মাথায় তুলি—যত্নে রাখ্‌বো ভিক্ষার ঝুলির পাশ্চাত্য রত্নগুলি—দিব শিরে দিবানিশি, স্যাক্সন মাসির পদধূলি—ন্যাষ্টি নেটিভ ভাষা জন্মের মত যা'ব ভুলি। তাই বলি, প্রাণের লিলি! শুনুন বলি—আপনার কাছে প্রমিস্ কোরে বলি—অই দুষ্ট ভাষা দুই পায়ে দলি!" এই বলিয়া মৃত্তিকার উপর সেন্‌জী সেখানেই সজোরে সবুট পদাঘাত করিলেন। বসুমতী যেন কম্পিত হইল— লিলিব কোমল হৃদয়ও যেন চকিতের মত চমকিত হইল!

আবার নীলু কহিলেন—"বেগ ইওর পার্ডন, লিলি! আজ আমি লেডীর অবমাননা করিয়াছি; চিন্তার ঘোরে বিভোর হ'য়ে আপনার সহিত হাসিমুখে কথা কহি নাই, এমন কি, অই কোমল করে কর মিশাইয়া কার মর্দ্দনও করি নাই (সেকহ্যান্ড?)—ধিক্ আমার জীবনে! আপনি গুণবতী, তাই আমার হাসি ও কণ্ঠস্বরের গুণ ব্যাখ্যা কোরে দুষ্ট ভাষার কবিতায় দুঃখ প্রকাশ কচ্চিলেন!"

রমণী কহিলেন "ব্যাপার কি বলুন দেখি, আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা।" মিষ্টার সেন কহিলেন "ব্যাপার আর কি? আমার মাথা আর মুণ্ডু! সে দিন আমরা বড়সাধে সংস্কৃত অর্থাৎ রিফাইণ্ড রামায়ণাদির নীরব অভিনয়ে জগত মুগ্ধ করিলাম। কিন্তু কতক গুলি বাঙ্গালা কাগজওয়ালা আমাদের সেই অভিনয়ের বিষয় এমনই কুরুচি-মাখা শ্লেষ মাখাইয়া ব্যঙ্গের তরঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া লিখিয়াছে যে, তাহা পড়িলে বা শুনিলে আপনারও অন্তরাত্মা 'খাঁচা ছাড়া' হইয়া যায়! আবার কতকগুলি মূর্খলোক সেই সকল বিষয় পাড়তেছে আর হো-হো

হাসিতেছে! সেই বিকট দন্তের বিকট হাসির নিকট দিয়া আসিয়া এখনও আমার বুক কাঁপিতেছে--যেন সেই বিকট আবার "অই ভূত-বিকট ভূত--সেই পঞ্চভূত" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। লিলি অমনি তাড়তাড়ি তাঁহাকে থামাইয়া কহিলেন—"ভয় কি, স্থির হউন, অনেক কষ্টে আপনাকে সুস্থ করা হইয়াছে। ভূতের ভয়ে অত ভীত কেন? উপযুক্ত ওঝা দ্বারা শীঘ্রই ও সকল ভূত ভাগাইয়া দিব"

তখন সকলেই ঘাট হইতে উপরে উঠিয়া দেকিলেন যে, একটা চ্যাঙ্গড়া গোছের ছোঁড়া দৌড়িয়া পলাইতেছে। সম্মুখেই একজন পাহারাওয়ালাকে দেখিয়া লিলি কহিলেন—"পাক্ড়ো ওস্কো—চোর আদমী—পালাতা হ্যায়, পাক্ড়ো পাক্ড়ো!"

পাহারাওয়ালা পুরুষেব কথায় কর্ত্তব্য পালন পূর্ব্বক পাকড়াইতে যাইত কিনা জানি না; স্ত্রী লোকের কথা কিন্তু অমান্য করিল না সেও সেই ছোঁড়ার পিছনে পিছনে ছুটিল। পাঠক পাঠিকাগণ! আসুন, আমরাও আজিকার মত ছুটি—দেখবেন, ক্রমে কত মজা লুটি—সবুরে মেওয়া ফুটী।

সংবাদ সংগ্রহ।

হাতীই যখন হাবড়ে--তখন বেঙ্ আর কি করে?

হুগলীর প্রত্যাপশালী ম্যাজিস্ট্রেট স্বনাম ধন্য কেরি সাহেব সে দিন এক জন বিখ্যাত বাঙ্গালী জমিদারকেই "ড্যাম বাঙ্গালী" প্রভৃতি মধুর বুলিতে আচ্ছা 'বাঘা তাড়া' দিয়াছিলেন। অপরাধের মধ্যে,নেটিভ জমিদার বাবু সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনায় বহুক্ষণ তাঁহার বাঙ্গালায় বসিয়াছিলেন; পরে সাহেবের বাহিরে আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, তাঁহার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ একাকী একস্থানে বসিয়া থাকা কষ্টকর—বিবেচনায় কিয়ৎক্ষণের জন্য সম্মুখস্থ রাস্তায় পদচারণা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে সাহেব তাঁহার বিনা অনুমতিতে বাঙ্গালা ছাড়া হইয়াছে বলিয়াই জমিদার বাবুকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন। জমিদার বাবু আর কেহ নহেন; প্রসিদ্ধ রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র এবং এক সময়ের হাইকোর্টের প্রথম জজ স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র—ইনিই সেই উত্তর পাড়ার সুবিখ্যাত জমিদার প্যারীমোহন রায়! ইহারই যখন এই দুর্দ্দশা, ইনিই যখন ড্যাম বাঙ্গালী, তখন আব অন্য বাঙ্গালীকে কি বলি?

শুনিয়া সুখি হইলাম, আমাদের সদাশয় বঙ্গেশ্বরের বিচারে শেষে সাহেবকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে এবং বদলী হইতে হইয়াছে। বাঙ্গালীর দুর্গতি—ক্ষমাতেই নিষ্কৃতি!

অতি উত্তম ইতর জাতি--সুসভ্য বর্ব্বর বাঙ্গালী।

লন্ডনের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' নামক সংবাদ পত্রে সম্প্রতি একজন মেম সাহেব ভারতের নেটিভ আয়াগণকে সুখ্যাতি করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। নেটিভ আয়ারা বড় ভাল মানুষ, তাহারা প্রভুভক্ত এবং পরিচর্য্যারত তাহারা অন্যান্য দেশের আয়াদের মত বাবু নহে—পুলিশ ম্যানের সহিত প্রেমালাপ করে না। তাহারা সাধারণতঃ সন্তানের মাতা, সুতরাং মাতৃভাব তাহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদাই আছে এবং সেই ভাবেই তাহারা প্রভুর পুত্র কন্যাকেও

পালন করিয়া থাকে। বিবিদের এইরূপ প্রশংসায় আমরা বড়ই খুসী হইয়া থাকি। কুলীর দলকে যদি কেহ বলে, "তোমরা খুব ভাল কুলী," তাহা হইলে তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। এখন এই রকম সুখ্যাতি আমাদের বাঞ্ছনীয় ! অবস্থা কি শোচনীয়।

বাঙ্গালীর ভাগ্যে কুলীগিরি--ফিরিঙ্গীর খিঙ্গীপদ।

সম্প্রতি নুতন আইন হইয়াছে, যে সকল চাকুররি বেতন চল্লিশ ৪০ টাকার কম নহে, সে সকল পদ অন্ততঃ শতকরা ত্রিশটী ফিরিঙ্গীর জন্য রাখিতেই হইবে, মোটা মোটা সমস্ত পদেই বিলাতী সাহেবদিগের একটেটিয়া অধিকার—মাঝারি মাঝারি গুলিতে ফিরিঙ্গীরাই অংশীদার—নেটিভ ভাগ্যে ছিল ক্ষুদ্র চাকুরী অল্প মাহিনার ! এবার আবার সে দফাতেও রফা—ভবিষ্যত অষ্টরম্ভা ! ছিল গুড়ে বালি—এবার শাকেও পোড়লো বালি—হায় কি ভাগ্য, তোমার ড্যাম বাঙ্গালী ?

হরি নামে বিপদ ভারি--আল্লা নামেও আইন জারী!

মুরসিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট হ্যালিফাক্স সাহেব ইতিপূর্ব্বে রাত্রী দশটার পর হিন্দুদিগের হরিনাম সংকীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এবার আবার মুসলমানের ধর্ম সঙ্গীতও বন্ধ করিয়াছেন। একজন মুসলমান নাকি এই হুকুম জারির পরেও ধর্ম্ম সঙ্গীত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি কেন অভিযুক্ত হইবেন না, তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য তাঁহাকে কৈফিয়ত তলব করা হইয়াছে। ক্রমে দেখি, কেহই আর থাকেনা বাকী ! বাদ বাঙ্গালী খ্রীষ্টিয়ান—যত বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান, সকলেরই এক ক্ষুরে মাথা মুড়াইতে হইতেছে। ছাড় হরি বলা ভুলে যাওয়া খোদাতালা-বলিওে যায় বলা—যিশুর প্রেমের লীলা ! তুলসী তসবী রাখিতুলি—রাম রহিম যাওরে ভুলি—যে আজ্ঞা ! নহিলে তাকে গালাগালি শোন্ ওরে হিন্দু মুসলমান 'ড্যাম বাঙ্গালি।'

পাড়াগেঁয়ে প্রাণ।

পাড়াগেঁয়ের কলিকাতা দর্শন,
কলিকাতা—না জানি কেমন !

১ম উল্লাস
(মেমসাহেব সন্দর্শনে)

আজ বহু দিন পরে শৈশবের সকল আশা সফল হইল। আমার পিতার সহিত কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতার শিয়ালদহ স্টেশন আমার মনে হইল "খোদ কলিকাতা" বা জানি কেমন স্থান। পূর্ব্বে লাল মুখ দেখিয়াছি, তাহাদের সহিত বেড়াইয়াছি, কথা বলিয়া কৃতার্থ মনে করিয়াছি, আবার সেই গৌরবের গল্পও পাড়া-প্রতিবাসীর মধ্যে শত মুখে গল্প করিয়াছি ; কিন্তু তাহারা "পাখী মারা" সাহেব, আর এই স্থানে "খাস্" মূর্ত্তির আবির্ভাব। প্রথমে দেখিয়াছিলম শুধু শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, এখন যাহা দেখিলাম, সে সময় তাহার বর্ণনা করিতে কখনই পারিতাম না। ভয়ে ভয়ে দু একটীবার চুরি করিয়া চাহিয়া তড়িতের ন্যায় তীর গতিতে

চক্ষু নিজের বিনামার অগ্রভাগে নিহিত করিলাম; যদিও এই উদ্যমে সফল মনোরথ হইলাম, তথাপি সাধ মিটিল না, "পোড়া পাড়াগেঁয়ে" প্রাণের পরিতৃপ্তি হইল না; মনে মনে ভাবিলাম যে সত্য সত্যই নন্দন কানন বিহারী অপ্সরা সুর-কিন্নরীগণই কলিকাতায় উদ্যান-বিহার-মানসে সমাগত হয়; এইরূপ ধারণা হইবে তাহাতে কিছুই আশ্চর্য নাই। বাল্যাবধি ঠাকুর-মার নিকট শুনিয়া আসিতেছি যে মেমগণ কটা, কারণ ফরসা বলিলে প্রশংসা করা হয়; এবং এইটীই বাঙ্গালীর মেয়েদের স্বধর্ম্ম—নিজে ভিন্ন আর সকলেই অতি কুৎসিত; কিন্তু কুৎসা করিতে বসিয়া অনেক সময়ে প্রশংসাই কুৎসা জ্ঞানে বলিয়া স্বকীয় মার্জ্জিত বুদ্ধির সম্যক্ পরিচয় দিয়া বসে।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞাপন। (ADVERTISEMENTS)

জীবন সহচরের বিশেষ নিয়ম।

জীবন সহচর" এবার চারি কোয়াটারে চারি নিয়মে বিভক্ত হইল! প্রথম কোয়াটার বাঙ্গালা শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এবং ইংরাজী জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর এই তিন মাস কেবল সুলভ প্রচার ও ভাগ্যোপহারের জন্য গ্রাহক লইয়া হইবে। দ্বিতীয় কোয়াটারের প্রথম অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে প্রথম কোয়াটারের গ্রাহকের নম্বর ও সেই নম্বরের উপহারের বিবরণ সম্বলিত এক এক খানি সুন্দর সচিত্র "ড্যাম বাঙ্গালী প্রাইজ কার্ড" প্রত্যেক গ্রাহকই চতুর্থ সংখ্যার সহিত পাইবেন। দ্বিতীয় অর্থাৎ অগ্রাহায়ণ মাসে সেই স্ব, স্ব, প্রাইজ কার্ডে লিখিত উপহারগুলি শুধু বার্ষিক মূল্যদাতা গ্রাহকগণ পাইবেন। তৃতীয় অর্থাৎ পৌষ মাসে "বড়দিনের ভেট" নায়ক এক এক খানি ছবি মাসিক ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক মূল্যদাতা সকল গ্রাহকই সাধারণ ষান্মাসিক উপহাব স্বরূপ পাইবেন। এই কোয়াটারের নুতন গ্রাহকগণ "বড়দিনের ভেট" ছাড়া আর কোন উপহার পাইবেন না। অধিকন্তু বার্ষিক মূল্য ।।৯০ লাগিবে। তৃতীয় কোয়াটার অর্থাৎ মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রমাসে পত্রিকা ভিন্ন অন্য কিছু প্রাপ্য নাই। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ কোয়াটারে এপ্রেল, মে, জুন বা ১৩১৩ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যে ১ম কোয়াটারের শ্রেণীভুক্ত ত্রৈমাসিক ও মাসিক মূল্য দাতা গ্রাহকগণের সেই প্রাইজকার্ডে লিখিত ভাগ্যোপহার বিতরিত হইবে। ত্রৈমাসিক মূল্যদাতা গ্রাহকগণপ্রত্যেক তিন মাসের তিন আনা ৯০ প্রত্যেক কোয়াটারেব প্রথম মাসেই পাঠাইবেন; তাহা হইলে শেষ কোয়াটারের প্রথম অর্থাৎ ১৩১৩ সালের বৈশাখ মাসেই উপহার পাইবেন। মাসিক গ্রাহকগণ শেষ অর্থাৎ আষাঢ় মাসে পাইবেন।

কিশোর প্রিন্টিং ওয়ার্কস।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত কবা যাইতেছে যে, কিশোর প্রিন্টিং ওয়ার্কস নামক একটী নূতন প্রেশ খোলা হইয়াছে, ইহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিল, রশীদ, সারকিউলার, বিল অফ লাডিং, পাটা কবুলিয়ত হ্যান্ডবিল, ক্যাটেলগ প্রভৃতি যে কোন রকম কার্য্য হউক না

কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নিয়মিত সময় মত কার্য্য ডেলেভারি দেওয়া হয় মূল্য যথা সম্ভব সুলভ, কি ইংরাজী, কি বাঙ্গালা সমস্তই নূতন অক্ষর জানিবেন. একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিবেন সত্য কি মিথ্যা ইতি।

প্রোপ্রাইটর,

কে, সরকার,

২০৭, নং আপার সারকিউলার রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা

এ, সুরের জগদ্বিখ্যাত শ্যামবাজারের সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ। মার্কারি (পারা) বর্জ্জিত গরমির ঘায়ের অব্যর্থ মহোষধ।

ইহা পারার ঘা ও গরমির ঘায়ের একমাত্র মহৌষধ।

যাঁহারা উপরোক্ত পীড়ায় নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়াও হতাশ্বাস হইয়াছেন, তাঁহারা এই মহোষধ ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিবেন। ইহা স্বপ্নাদ্য ঔষধঃ—৭০/৮০ বৎসর হইতে বংশানুক্রমে ব্যবহৃত হইতেছে। ১ মাসের ব্যবহারোপযোগী ঔষধের প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।০ চারি আনা।

১১ নং বনমালি চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, টালা, কলিকাতা।

চৌবেড়িয়া হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
২০৭, অপার সারকিউলকাব রোড,
কিশোর প্রিন্টিং ওযার্কসে—
শ্রীকালাচাঁদ সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

নোটীস্।

যদিও পূর্ব্বে পত্রিকা পাইবার ঠিকনা "পোস্ট মাষ্টার চৌবেড়িয়া" এইরূপ লিখিত ছিল ; কিন্তু পোষ্ট মাষ্টারের সহিত ইহার আর কোন সংস্রব নাই। কারণ পোষ্ট মাষ্টার পরিবর্ত্তনশীল ও স্থায়ী। সুতরাং এখন হইতে পত্রাদি ও টাকাকড়ি সমস্তই একেবারে বরাবর স্থায়ী সম্পাদকের নাম দিয়া—শ্রীমাখন লাল দত্ত, জীবন সহচর কার্য্যালয়, চৌবেড়িয়া পোষ্ট জেলা যশোহর" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

১৫ই জুলাই ১৯০৫ } শ্রীপ্রতাপ নাথ বসু।
Offg. পোষ্ট মাষ্টার, চৌবেড়িয়া

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা ভাগ্যোপহারের ৩০০০ তিন হাজার গ্রাহক সত্বরই সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাহাতে সচিত্র প্রাইজকার্ড (৪র্থ সংখ্যার সহিত পাঠাইবার নিয়ম থাকিলেই) তৃতীয় সংখ্যার সহিত পূজার পূর্ব্বেই পাঠাইতে পারি, সেইজন্য ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় সংখ্যা. ১ম সংখ্যার সহিত পূর্ব্বেই পাঠাইতেছি। যাঁহারা বার্ষিক হিসাবে অগ্রিম মূল্য ।।/০ নয় আনা দিয়া শীঘ্র গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদের উপহারও ৫ম সংখ্যার সহিত পাইবার নিয়ম থাকিলেও প্রাইজকার্ডের সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে বিতরিত হয়, তাহারও চেষ্টা করা যাইতেছে। এজেনটগণের পক্ষেও তাহাই হইবে। যত শীঘ্র পারেন, বার্ষিক মূল্য দিয়া সকলেই সত্বর ভাগ্যোপহারে টিকিট বা প্রাইজকার্ড সংগ্রহ করুন। মাসিক মূল্যদাতা গ্রাহকগণও এবারে একেবারে এই দুই সংখ্যার মূল্য ৯০ দুই আনা পাঠাইয়া বা এজেন্টে নিকট জমা দিয়া এই সঙ্গে টিকিট সংগ্রহ করিয়া রাখুন ; পরে দ্বাদশ সংখ্যার সহিত উক্ত কার্ডে লিখিত উপহার পাইবেন।

সংকলন

বৌদ্ধ পত্রিকা

১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩১২

ধম্মপদ, ব্রাহ্মজালসূত্র, জগজ্জ্যোগতি, বাহ্মবাসীর পত্র, নমোবুদ্ধায়, ন্যগ্রোধ মৃগজাতক,

ভগবানের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।

গত ৩০শে শ্রাবণ মঙ্গলবার পূর্ণিমা তিথিতে বহুকাল মুমূর্ষপ্রায় চট্টলবাসী বৌদ্ধবাসী বৌদ্ধগণ যেন এক সঞ্জীবনী শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান অভূতপূর্ব্ব অভিনব দৃশ্য সন্দর্শনে পবম পুলকিত হইল। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়, যুগান্ত-প্রলয় বাদ্যবৎ সমগ্র নগরের বক্ষ কম্পিত করিয়া বেন্ড বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সহস্র ২ লোক আকুল ও উদগ্রীব হইয়া সমারোহের পশ্চাৎ২ ছুটতে লাগিল। সর্ব্বঙ্গে বাদ্যকরগণ তৎপশ্চাতে নগ্নপদে স্থানীয় বৌদ্ধগণ সুসজ্জিত, বিবিধ কারুকার্য্যখচিত, সুশোভন রূপ আপনারা নিজেই আকর্ষণ করিয়া চলিতেছিল দেদীপ্যমান মূর্ত্তিমান প্রীতি, ভক্তি ও উৎসাহ যেন তাহাদের প্রত্যেকের চোখ মুখ ফাটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহাদের পশ্চাতে গৈরিক চীবর পরিহিত মুণ্ডিত মস্তক, নগ্নপদ প্রশান্ত-সৌম্য স্মিত-আনতানন শ্রমণগণ ধীরপদবিক্ষেপে রথের অনু গমন করিতেছেন। পশ্চাতে জনতা স্রোত, কোথাও নৃত্যপরায়ণ নদীস্রোতের ন্যায়, কোথাও ঝটিকা বিক্ষিপ্ত উর্ম্মিমালার ন্যায় প্রশান্ত ও অধীর হইয়া চলিতেছে। রথের পুরোভাগে ষট্‌রশ্মি সমাকীর্ণ বোধি-জ্যোতির অনুকরণে গঠিত বিচিত্র বোধিবজ ও জাতীয় পতাকা হস্তে বৌদ্ধবালকগণ সগর্ব্বে ও সাগ্রহে অগ্রসর হইতেছিল। বলা বাহুল্য এই সমারোহ অনাথ বাজারবৌদ্ধ মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রঙমহল পাহাড়ের অভিমুখের ছুটিতেছিল রঙমহল শৈলে আরোহণ করিয়া অসংখ্য দর্শকগণের সভক্তি আনন্দ কোলাহল ও জয়ধ্বনির মধ্যে বৌদ্ধগণ তাহাদের প্রাণের আরাধ্য প্রাণরাম ভগবন্মূর্ত্তিকে রথোপরি স্থাপিত করিয়া ৬টার সময় তথা হইতে অবরোহন করিবলেন। পবিত্র গৈরিক চীবর পরিহিত ভগন্মূর্ত্তি সন্দর্শনে.. নরনারী আবালবৃদ্ধ জাতিবর্ণ অস্তিত্ব হারাইয়া— সকলেই এক হইয়া গেল। সকলেই বোধ করিতে লাগিল চিন্ময় ভগবন্মূর্ত্তি ব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও কিছু নাই, নিজেরাও নাই ; সকলেই তন্ময় হইয়া চিন্ময় ভগবন্মূর্ত্তিই দেখিতেছে—ভগবন্মূর্ত্তিতেই মিশিয়া গিয়াছে।

পুনঃ প্রলয়ঙ্কর বেণ্ড বাদ্য বাজিয়া উঠিল। বৌদ্ধগণ ভগবানের রথ টানিয়া চলিল। অগ্রে ২ জাতীয় পতাকা উড়িতে লাগিল। গায়ক গায়িকা গণ প্রাণ খুলিয়া উচ্চকণ্ঠে ভগবন্মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। অসংখ্য ২ দর্শকগণজয়ধ্বনি দিয়া উঠিল। মহা জনতাস্রোত প্রতিকূলগামী ক্ষুদ্র জনতাস্রোতকে নিজের অনুকূল করিয়া ভাসাইয়া লইয়া চলিল। সহরে অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য হইল।

ঘন২ ব্যোমধ্বনিতে ভূতল গগন বিদীর্ণ ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধগণের হস্তস্থিত আলোকমালায় নগর আলোকিত হইয়া হাসিতে লাগিল। বয়স্ক প্রাচীন শিক্ষিত বৌদ্ধগণও সুকুমার বালকবৎ বালকগণের নৃত্য গীতে যোগদিয়া মানব প্রাণের স্বাভাবিক প্রথমাবস্থা লাভ করিল। রাত্রি ৮ ঘটীকার সময় ভগবানের মূর্ত্তি অনাথ বাজার বৌদ্ধমন্দিরে স্থাপিত হয়। ভগন্মূর্ত্তির এই অভিনব দৃশ্য সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাজকুমার সিদ্ধার্থের রথারোহণে প্রমোদ-উদ্যান পরিদর্শন ও মহাভিনিষ্ক্রমণের কথা হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে।

ভারত-জননীর ধন-ধান্য সুখৈশ্বর্য পূর্ণ সেই প্রাচীন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে ! !

হায় ! সর্ব্বধ্ব-সকর কাল ! তুমি কি না করিতেছ? প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টলরাজ্য, প্রকৃতির প্রিয় পুত্র মগধারজগণের--মগধবংশীয়গণের শাসনাধীনে কতই উন্নত, গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত ছিল। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এই বৌদ্ধরাজগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। কালের বিচিত্র গতিতে মুসলমানেরা এই শৈলশিখরে তাঁহাদের বিলাসিনী ঘোষিৎ-বৃন্দের উদ্দাম বিলাস-বাসনা চরিতার্থের জন্য সাধের রঙমহাল নির্ম্মাণ করেন। কালের বিচিত্র গতিতে এতদিনে পুনরায় ইংরেজ বাহাদুরের চিকিৎসালয়ের ভিত্তি খননের সময় পবিত্র ভগবন্মূর্ত্তি লোকনেত্রের গোচরীভূত হইল। মূর্ত্তি বহুকাল ভূগর্ভে ধ্যান-স্তিমিত নয়নে বীরাসনে আসীন ছিলেন। প্রাণারাম বৌদ্ধদেব ! প্রভো ! তোমার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠাতা মগধগণের কথা মনে করিয়া আমরা যে তাঁহাদেরই বংশধর, তুমি এ কথা বুঝিতে পারিবে কি? আর নিজে না বুঝিলে আমরা তোমাকে বুঝাইতে পারিব কি? বুঝিবে কিনা, বুঝাইতে পারিব কিনা, প্রভো ! তুমিই তাহা জান ! প্রভো ! মগধগণের হৃদয়ে বল দাও, তোমাকে দেখার পূর্ব্বে ইঁহারা কাষ্ঠ-পুত্তলিকা ছিলেন, আশীর্ব্বাদ কর তোমাকে দেখিয়া, তোমাকে চিনিয়া, তোমাকে শিখিয়া,—তাঁহারা পুনর্জীবিত হউন। আগে অন্তরালে ছিলে, এখন সংস্পর্শে আসিলে, দেখি তোমার সংসর্গে—তোমার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, ইঁহাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় কিনা।

সংবাদ ও পত্রাদি।

"বৌদ্ধপত্রিকা" পঞ্চম মাস অতিক্রম করিয়া ৬ষ্ঠ মাসে পদার্পণ করিল। বৎসরে অর্দ্ধেক চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও আমাদের অনেক গ্রাহকের নিকট মূল্য বাকী আছে, আশাকরি সহৃদয় গ্রাহকগণ কৃপা বিতরণে সহসা নিজ ২ পত্রিকাব মূল্য প্রেরণে আমাদিগকে পরমোৎসাহিত করিতে ভুলিবেন না। তাঁহারা মনে রাখিবেন তাঁহাদের অনুগ্রহের উপরই পত্রিকার অস্তিত্ব নির্ভর করে। বর্ত্তমানে কোন নূতন গ্রাহক পত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে আমরা বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে পত্রিকা দিতে পারি। কেননা এখনও আমাদের নিকট পুরাতন পত্রিকা অনেক মজুদ আছে।

আমরা ব্রহ্মবাসী জনৈক বন্ধুর পত্রে জানিতে পারিলাম রেঙ্গুনে ও মেমিও সহরে "বৌদ্ধ জ্ঞানোদয়" নামক ২টী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর উক্ত ২টী সভা সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল এবং স্থানীয় বৌদ্ধমণ্ডলী ইহাদের দ্বারা প্রভূত উপকার লাভ করে। সম্প্রতি উক্ত সভাদ্বয় বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আশাকরি সভার সভ্য মহোদয়গণ যাহাতে সভা ২টী চিরস্থায়ী হয় তজ্জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইবেন।

আমবা এস্থলে আর একটী সভার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। চট্টগ্রামস্থ শিলকোপ গ্রামের জনৈক পত্রপ্রেরক জানাইয়াছেন যে উক্ত গ্রামের "বালক হিতৈষিণী সভা" প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে

স্থানীয় বৌদ্ধ বালকগণের দিন দিন উন্নতিলাভ হইতেছে। গ্রামস্থ উৎসাহী ভিক্ষুমহোদয় ইহার প্রধান নেতা। তাঁহার উৎসাহে "সভা" দৈনন্দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে আশা করা যায়।

দার্জ্জিলিং নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মইয়ফুরু বড়ুয়া মহাশয় আমাদের "বৌদ্ধ পত্রিকায়" গ্রাহক সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য তাঁহাকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমাদের অন্যান্য যেসকল বন্ধুবান্ধবগণও এই বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষরূপে সাহায্য করিতেছেন, তাহাদিগকেও শত ২ ধন্যবাদ।

বৌদ্ধ পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধক্ষ শ্রীযযুতবাবু হরকিশোর চৌধুরী মহাশয় হইতে আমরা যে সমস্ত গ্রাহকের টাকা এযাবৎ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সমস্তই পত্রিকায় প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছি। হর কিশোর বাবুর নিকট প্রেরিত কোন টাকার প্রাপ্তি স্বীকার না হইয়া থাকিলে, গ্রাহকগণ আমাদিগকে জানাইবেন, আমরা তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিব। হরকিশোর বাবু পত্রিকার কার্য্যভাগ পরিত্যাগ করিয়া, কথেক মনিবের টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া ফের দিয়াছেন, কথেক গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে দিয়াছেন, কথেক আমাদিগকে গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, কথেক নিজে গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, কথেক নিজে গ্রহণ করিয়া দণ্ডভয়ে পুনরায় প্রেরকের নিকট ডাকযোগে পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং কথেক টাকা গ্রহণ করিয়া কিছু দিন রাখিয়া গণ্ডগোল করতঃ আবার ফেরৎ দিতে বলিয়া বলিতেছেন। ফলতঃ ধূমাচ্ছন্ন চৌধুরী বাবু পথ দেখিয়া লইতে পারিতেছেন না। চৌধুরী মহাশয়ের এসমস্ত কার্য্যকলাপ ও এতাদৃশী শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমরা তাঁহার জন্য দুঃখ অনুভব করিতেছি ! মৈত্রী, করুণা, মুদিতা. বৌদ্ধভাব তাঁহার ও তাঁহার দলে সক্রন্কামিত হইয়া সকলে বৌদ্ধ পত্রিকার শ্রাদ্ধের বিরাট আয়োজন করিতেছেন। অনুগ্রাহক পাঠকবর্গ আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুণ আমরা এরূপ সুযোগ্য দায়াদ পাইয়া প্রস্থানের সমস্ত যেন হাসিমুখে চলিয়া যাইতে পারি।

সম্প্রতি আমরা "বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারিনী" নামক একটী সমিতি গঠন করিবার মনস্থ করিয়াছি। এই সমিতি হইতে বৌদ্ধ গ্রন্থের সমূল বঙ্গানুবাদ আমরা জন সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে বাসনা করিতেছি। ত্রিপিটকের যথাসম্ভব অনুবাদ বঙ্গাক্ষরে প্রচারিত না হইলে সাধারণ বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ বৌদ্ধধর্ম্মের গূঢ়রহস্য কিছুই অবগত হইতে পারিবেন না। বৌদ্ধ পত্রিকার বাৎসরিক খরচ বাদে, যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা "বৌদ্ধ পত্রিকা ফণ্ডে" জমা হইবে। এই ফণ্ডের টাকা দ্বারা আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিব। এইক্ষণও আমাদের নিকট অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে। অধিকাংশের প্রাঞ্জল অনুবাদ কার্য্যও হইয়া গিয়াছে, কেবল মাত্র খরচের অভাবে তাহা আমরা জন সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছিনা। বহু কষ্টে ও পরিশ্রমে মাত্র একটী পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে। আশাকরি আমাদের ধর্ম্মো সাহী বৌদ্ধভ্রাতৃগণ এই সাধু কার্য্যে আমাদিগকে যথোচিত রূপে সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করিবেন।

কলিকাতায় বহুদিন যাবৎ একটী গুরুতর অভাব ছিল। বিদেশী বৌদ্ধ যাত্রীগণকে বুদ্ধগয়া, কুশীনগর ও কপিলবস্তু ইত্যাদি প্রদেশে গমনকালে পথে কলিকাতায় অবস্থান সময়ে স্থানাভাবে অনেক অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইত। অধুনা মাননীয় পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত কৃপাশরণ ভিক্ষু মহাশয়ের কঠোর পরিশ্রমের সেই অভাব দ্রবীভূত হইয়াছে। ভিক্ষু মহাশয় গত ৩/৪ বৎসর পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম, আকিয়াব ও ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি নানা স্থানে ভিক্ষা করিয়া, কলিকাতা, কপালিটোলা ললিত মোহন দাসর লেইনে এক নূতন বুদ্ধমন্দির প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এযাবৎ বিহারের নির্ম্মান কার্য্যে ১০৩০০ দশ হাজার তিন শত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণ প্রবাসী ভিক্ষু ও বৌদ্ধ ক্ষত্রীগণের থাকিবার আর কোন কষ্ট হইবেনা। মন্দিরে ভগবান বুদ্ধদেবেব শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিহারের অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে আরও প্রায় হাজার টাকার আবশ্যক। আমরা সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ ভ্রাতাভগ্নীগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি, তাঁহারা উক্ত বিহারকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ভিক্ষু মহাশয়কে সাধ্যায়ত্ত সাহায্য দান করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামস্থ চাক্‌মাদিগের ধর্ম্মপুস্তকের নাম আগরতাবা (অগ্রত্রাণ)। ইহা চাক্‌মা অক্ষরে লিখিত। বর্ম্মা অক্ষরের সঙ্গে চাক্‌মা অক্ষরের অনেক সাদৃশ্য আছে। এতদ্দেশীয় প্রাচীন অন্যান্য হস্তলিখিত গ্রন্থের ন্যায় এই পুস্তক তালপত্রে লিখিত। ইহার ভাষা ঈষৎ রূপান্তরিত পালি ভিন্ন অপর কিছু নহে। পুস্তকের স্থান স্থানে এরূপ পাঠবিপর্য্যয় হইয়াছে যে সাধারণ লোকে উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেনা। মাননীয় ধর্ম্মবংশ ভিক্ষু মহাশয় যখন শ্রীযুক্ত বাবু ত্রিলোচন দেওয়ান বাহাদুরের বাড়ীতে উপস্থিত হন, তখন তিনি এই পুস্তকের মর্ম্মার্থ তথাকার চাক্‌মাদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন্। তাহাতে দেওয়ান বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত পুস্তক বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত ও অনূদিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তিনি এখন উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থ চট্টগ্রাম অনাথ বাজার বৌদ্ধবিহারে শ্রীযুক্ত ধর্ম্মবংশ ভিক্ষু মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। ভিক্ষু মহাশয় বহু পরিশ্রমের সহিত এই পুস্তকের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। দেওয়ান বাহাদুর এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভার নিজে বহন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ভিক্ষু মহাশয়ের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও দেওয়ান বাহাদুরের বদান্যতার জন্য আমরা উভয়কে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমরা আশা করি চট্টগ্রামের অন্যান্য অবস্থাপন্ন ভদ্র মহোদয়গণও দেওয়ান বাহাদুবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

গতবারে আমরা আমাদের "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতা মৃত" সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ছিলাম এবং সহৃদয় সৌভাগ্য সম্পন্ন কয়েকজন বন্ধুর নিকটও সাহায্য ভিক্ষা চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। মানীয় শ্রীযুক্ত কৃপাশরণ ভিক্ষু ১৫ টাকা এবং শ্রীযুক্ত গুনালঙ্কার ভিক্ষু প্রযুক্ত বাবু বিপ্রদাস মুচ্ছদ্দী, বাবু বৈষ্ণব চরণ বড়ুয়া মহোদযগণ প্রত্যেকে ১০ দশটাকা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। অনেক বন্ধুরাই যথাসাধ্য সাহায্য কবিবেন বলিয়া আমাদিগকে উৎসাহ সূচক পত্র লিখিতেছেন। সমগ্র পুস্তক ২০০ ফরমারও অধিক হইবে। আমরা অর্থাভাবে অগত্যা বাধ্য হইয়া সম্প্রতি ৮ ফরমা আকারে একখণ্ড বাহির করিলাম। ইহার উপর সর্ব্বসাধরণের

স্নেহদৃষ্টি পতিত হইলে অচিরে ২য় খণ্ড প্রকাশ করিব এবং ক্রমশঃ সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশে যত্নপর হইব।

স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির উন্নতি কামনায় বদ্ধপরিকর হইয়া আমরা "বৌদ্ধ পত্রিকা" ও "বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ" প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি এবং সাধ্যানুরূপ স্বজাতি সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছি। আশা করি এইক্ষণ এই অধীন সেবকগণের কার্য্য ভিক্ষু ও গৃহস্থ জাতি সাধারণ সকলেই অনুমোদন পূর্ব্বক তাঁহারা স্ব স্ব সাধ্যায়াত্ত সর্ব্ববিধ বিষয়ে পত্রিকা ও পুস্তকের সাহায্য করিয়া তাঁহাদের স্বধম্ম ও স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। পত্রিকা ও পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের উদীয়মান লেখক শ্রীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্র লাল মুচ্ছদ্দি ও বঙ্গ বিখ্যাত, প্রাচীন লব্ধ প্রতিষ্ঠ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠকগণের দৃষ্টি ও মতামতের জন্য আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি : -

---

শ্রদ্ধাস্পদ,

আপনার ১৮ই তারিখে পত্র ২৩শে তারিখ পাইয়াছি। পাইয়া যে পরম পুলকিত হইয়াছি-- ইহা বলাই বাহুল্য। আপনার পুস্তক প্রেসে দিয়াছেন শুনিয়া ততোহধিক সুখী হইয়াছি। পুস্তক ছাপা, না ছাপা বাহাদুরী অবাহাদুরী কিনা সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন আমার মনে উদিত হয় নাই। তবে আমি এই বুঝি যে ছাপা গ্রন্থ সমাজের সম্পত্তি ও পরিমাণ দণ্ড। বিধর্ম্মী লিখিত বহুগন্থ থাকুক ;—কিন্তু তাহা আমাদের নিজস্ব কি? আমাদের শক্তি সাক্ষী কে? নুতন উপযুক্ত হস্তের লিখিত গ্রন্থাদির প্রচার যেন সমাজের গৌরবকর, তেমনি উৎসাহবদ্ধন এ বিষয়ে, বিশেষ আপনার সাহিত্যিককারে যে, আমার পূণ সহানুভূতি আছে তাহা আবার লিখিয়া বলিতে হইবে আমি শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র বড়ুয়া সহিত আপনাকে আর্থিক সাহায্যে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রস্তাব ক রিয়াছি। সুতরাং পুস্তকের অগ্রিম মুল্য স্বরূপ এই সহরবাসী বঙ্গবৌদ্ধ হইতে এক, একটা চাঁদা তুলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যথা সম্ভব শীঘ্রসাহায্য পাঠাইতে চেষ্টা করিতেছি। আমি শারীরিক একরূপ ভাল আছি। শুনিলাম—বৌদ্ধ সমাজ দেহ ডবল একটীং এঞ্জিনে চালিত হইবার যোগাড় হইতেছে। সমাজের ক্ষীণদেহ ভঙ্গ না হইয়া গেলেই মঙ্গল। ডবল চাপ বৌদ্ধ-সমিতি সহিতে পারিবেন কি? দেহের পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে এ অত্যাচার কেন আরম্ভ হইতেছে? ইহার নাম কি সামজ-প্রেম? বড় দুঃখে কবি রাজকৃষ্ণ গাইয়াছিলেন :—

"যে যা বলে, যে না করে সব সইতে পারি,
কাঙ্গাল পুতের ঘোড়া রোগ সইতে কিন্তু নারি?"
আমিও কি গাইব—
"অনক্ষরের এডিটারী সইতে কিন্তু নারি।"
আমরা দূরে আছি ;আপনাদের লড়াই দেখিতে২
বলিব
'ফেরা, তারা, চাক্কা, হিদল, কুচ্যা, বেঙখা।"
বীরেন্দ্র।

প্রিয় বিপিন, তোমার বৌদ্ধপত্রিকা রীতিমত পাইতেছি, পত্রিকা খানি বেশ চলিতেছে। আমি শীঘ্রই একটী প্রবন্ধ পাঠাইব, ও আমার Subscription পাঠাইব। পত্রিকা খানি যেমন করিয়া পার বাঁচাইয়া রাখিবে। সে জন্য Donation তুলিতে হয় তুলিবে। বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ যত দিতে পার দিবে। শেষে সেগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইবে। বৌদ্ধবোর্ডিং ভাল আছে শুনিয়া বড় আনন্দ হইল, আশাকরি বৌদ্ধছাত্র সকলেই পালিভাষা শিখিতেছে। তোমাদের কুশলে আমার কুশল।

তোমাদের—

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়।

পত্রিকা পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিতায়ন হইলেও কোনোভাবে এবার "মিলিন্দ প্রশ্ন" প্রকাশিত হইতে পারিলনা। ভবিষ্যতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে !

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র বড়ুয়া	কুমিল্লা	১৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ বড়ুয়া ডাঃ	চরণদ্বীপ	১৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু শিশুকুমার চৌধুরী	লামা	১৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীচন্দ্র বড়ুয়া সবরেঃ	লাম্বুরহাট	১৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রলাল বড়ুয়া	রহমতগঞ্জ চট্টগ্রাম	১৷৷০
শ্রীযুক্ত পুনাউগ চাউ ভিক্ষু	কাচলং	১৷৷০
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভিক্ষু	উনাইনপুরা	১৷৷০
শ্রীযুক্ত মহারাজ ভিক্ষু	বড়হাতিয়া	১৷৷০
শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুচ্ছদ্দি পেলিটুঃ	আকিয়াব	১৷৷০
শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় তুলাকদার	আকিয়াব	১৷৷০
শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র বড়ুয়া	আকিয়াব	১৷৷০
শ্রীযুক্ত চাঙ্কাচরণ বড়ুয়া	আকিয়াব	১৷৷০
শ্রীযুক্ত কমলচন্দ্র বড়ুয়া	আকিয়াব	১৷৷০
শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ বড়ুয়া	আকিয়াব	১৷৷০
শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র তালুকদার	আকিয়াব	১৷৷০
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র তালুকদার	আকিয়াব	১৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু জীবনচন্দ্র বড়ুয়া	ডিব্রুগড় আসাম	১৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু নবরাজ চৌধুরী	ডিব্রুগড় আসাম	১৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র বড়ুয়া	মংডু আকিয়াব	১৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু বৈষ্ণবচরণ বড়ুয়া	মেচিনা (বর্ম্মা)	১৷৷০

শ্রীযুক্ত বাবু নিশিচন্দ্র বড়ুয়া	শাকপুরা	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বড়ুয়া	ওভারসিঃ আইজল	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র মুচ্ছদ্দি	মির্জ্জাপুর	১॥০
শ্রীমতি মনমোহিনী বড়ুয়া	বৈদ্যপাড়া	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন বড়ুয়া	সিমলা	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্তরাম বড়ুয়া	সিমলা	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র বড়ুয়া	সিমলা	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার বড়ুয়া	সিমলা	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকুমার চৌধুরী	সিমলা	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু চাঁথোয়াই চৌধুরী	উঃহিলা	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বড়ুয়া	কক্সবাজার	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ বড়ুয়া	মেচিনা বর্ম্মা	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু ললিতকুমার বড়ুয়া	আন্দরকিল্লা (চট্ট)	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াচরণ বড়ুয়া	রাঙ্গামাটী	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু ছাত্তাংফুরু বড়ুয়া	দার্জ্জিলিং	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু মইয়ফুরু বড়ুয়া	দার্জ্জিলিং	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণহরি বড়ুয়া	অনাথবাজার	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ বড়ুয়া	রাঙ্গামাটী	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন বড়ুয়া	মিম্বু (বর্ম্মা)	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বড়ুয়া	কলিকাতা	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু সুবলচন্দ্র সদাগর	কলিকাতা	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু অর্জ্জুনচন্দ্র বড়ুয়া	ঠেকরপুনী	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু মেঘনাথ বড়ুয়া	কর্ত্তালা	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বড়ুয়া পণ্ডিত	গহিরা	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু যুবরাজ দেওয়ান	মহালছরি	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার তালুকদার	আন্ধারমাণিক	১॥০

ক্রমশঃ

সংকলন

দিনাজপুর পত্রিকা

অষ্টাদশ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩১০

নববর্ষ, অসভ্যপ্রিয়তা, ভাগ্যচক্র, বড়দিনের উপহার, বালুর ঘাটের পত্র,

চারিদিন।

কেবল চারিটি দিন—বেশী দিন নয় ;
অয়ি সুকুমারী ! তব পুণ্য সম্মিলনে
কি সুখে যে হ'য়েছিল পূর্ণিত হৃদয় !—
নাহি ভাষা,—হায়, তাহা কহিব কেমনে ?
অষ্টমির চন্দ্র তবক্ষুদ্র কলেবর,
যে অমৃতদগ্ধ প্রাণে ক'রেছে সিঞ্চন ;
সে অমৃত-স্বাদ বুঝি পায়নি অমর,
দেবের দুর্লভ তাহা মহার্হ রতন।
কিন্তু এই সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল অচিরে,
চারি দিন চলি' গেল চারি পলে যেন ;
সুখের দিবস গুলি এত ক্ষুদ্র কিরে ? '
চাবি দিন চারি যুগ হইল না কেন ?
অতৃপ্ত হৃদয়ে আমি তা' হলে কি হায়,
পুণ্য নিকেতন ত্যজি হ'তেম বিদায় ?

বালুরঘাটের পত্র।

ভিষণ অগ্নি কাণ্ড—বিগত ৪ঠা বৈশাখ অপরাহ্ণ বেলা ২ ঘটীকার সময় হঠাৎ বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাসা হই'তে অগ্নি উত্থিত হইয়া সমস্ত বন্দর ও সন্নিকটস্থিত গ্রাম একেবারে ভষ্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। আগুন যে কি প্রকারে লাগিয়াছিল তাহা এ পর্য্যন্তও জানা যায় নাই। এ প্রকার ভয়ানক আগুন আর কখন বালুরঘাটে দৃষ্ট হয় নাই। এবার লোকের সর্ব্বশান্ত হইয়াছে। কাহারও কিছু বাঁচে নাই কেবল পরিধেয় বস্ত্র লইয়া যেযেরূপে বাহির হইয়াছিল তাহাই মাত্র অবশিষ্ট ও সম্বল রহিয়াছে। অল্পক্ষণ মধ্যে চতুর্দ্দিকে অগ্নি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল কাহারও নিকটস্থ হইবার শক্তি ছিল না এমনকি প্রত্যেকেরই জীবন বাঁচন ভার হইয়াছিল। টীনের ঘর ও অট্টালিকা পর্যন্ত দগ্ধ ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রভূত ধান, চাউল ও রাশি২ অন্যান্য জিনিষ পত্র ভষ্মিভূত হইয়াছে মানুষ ও গরু পুড়িয়া মরিয়াছে। একটী হস্তীও অর্দ্ধ দগ্ধ হইয়াছে। বাজারে খাদ্য সামগ্রীর অভাব হইয়াছে। এমন কি সামান্য চিড়া, গুড় পর্যন্তও কয়েক দিন পাওয়া যায় নাই। অনেকেই আহার্য্যের জন্য ক্লেশ পাইয়াছিল ও পাইতেছে, গরীব লোকদের ত কথাই নাই। এই বিপদে ধনী ব্যক্তিগণও শেষ বিপদাপন্ন হইয়াছেন।

নাশিকা দংশন—জনৈক পল্লীগ্রামবাসী লোক বারবনিতার ঘরে পূর্ব্ব পরিচয় হেতু প্রবেশ করায় এবার হয়ত কোন কারণ বশতঃ বরাঙ্গনার সহিত তাহার অবর্গ হওয়ায় বারবনিতা উক্ত লোকটীর নাশিকায় ভয়ানকরূপে দংশন করিয়া দিয়াছে। উপযুক্ত ব্যক্তির এই উপযুক্ত শিক্ষা !

মুনসেফ—বালুরঘাটের ভূতপূর্ব্ব মুনসেফ শ্রীযুক্ত আলিআহাম্মদ খাঁ স্থানান্তরে বদলি হওয়ায় তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়াছেন।

পল্লী গ্রামের রাস্তা ইত্যাদি—এপ্রদেশে পল্লীগ্রামে চলাচলের ভাল রাস্তা নাই তজ্জন্য ভদ্র লোকের পল্লীগ্রামে চলাচল কষ্টকর। এ বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষিত হওয়া উচিত।

স্থানীয় সংবাদ।

স্বাস্থ্য—এবার সহরের স্বাস্থ্য বড়ই খারাপ হইয়াছে। বৃষ্টির অভাবে দেশে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে এবং গ্রীষ্ম অতিশয় বাড়িয়াছে। সহরের নানা স্থানে বসন্ত রোগ হইতেছে এবং এই রোগে কয়েকটি মারাও পড়িয়াছে।

চাউলের দর—মোটা চাউল টাকা ১২ হইতে ১৩ সের দরে বিক্রয় হইতেছে। বৃষ্টির অভাবে এবার পাট ও ভাদুইর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

মিথ্যা মোকদ্দমার অভিযোগ—বাহারুদ্দিন চৌধুরী পুলিস দারগার বিরুদ্ধে ঘুসের মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল। তাহার মোকদ্দমা মিথ্যা সাব্যস্ত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ১৮২ ধারা মত মোকদ্দমা স্থাপিত হয়। কলিকাতার বারিষ্টার শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী আসিয়া আসামীর মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র দত্ত ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে আইন সঙ্গত দোষ স্খলন করিয়া পুনরায় বিশুদ্ধরূপে মোকদ্দমা স্থাপিত হইতেছে।

বিদায় ভোজ—শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এখান হইতে বদলির হুকুম হইয়াছে। ২৩শে বৈশাখ শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস সেন উকিলের বাসায় তাঁহাকে একটী বিদায় ভোজ দেওয়া হইয়াছিল।

চিনিরবন্দরের মোকদ্দমা—চিনিরবন্দরের দারোগা বিপিনবিহারী দের বিরুদ্ধে সেসন জজ সাহেবের হুকুম অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত গ্যারেট সাহেবের নিকট বলাৎকার এবং ডায়ারী জাল করার অপরাধের যে বিচার হইছিল তাহাতে বিপিন বাবু খালাস পাইয়াছেন। বিপিন বাবু যতদিন সস্‌পেণ্ড ছিলেন সেই কালের বেতন সহিত তিনি আপন পদে প্রতিষ্ঠীত হইয়াছেন। শুনিতেছি নাকি শ্রীযুক্ত সেসন জজ সাহেব পুনরায় বিপিন বাবুর নামে নোটীশ জারি কয়াছেন [করিয়াছেন] যে কেন তিনি সেসনে সোপর্দ্দ হইবেন না তাহার কারণ দর্শান।

ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট —জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত গ্যারেট সাহেব ছয় মাসের জন্য দার্জিলিঙ্গে বদলি হইলেন। তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত জেফিস্ সাহেব আগমন করিয়াছেন।

বৃষ্টি—বর্ত্তমান মাসের শেষ ভাগে মফঃস্বলেব সর্ব্বত্র খুব বৃষ্টি হইয়াছে। সহরেও দুইদিন বৃষ্টি হইয়াছে।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর,	দিনাজপুর,	১৩০৯—১
শ্রীযুক্ত কুমার শরদেন্দুনারায়ণ রায়,	দিনাজপুর,	১৩০৯—১
কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়,	দিনাজপুর,	১৩০৯—১
হরেন্দ্রনারায়ণ সরকার এল. এম. এস.	মুন্সিপাড়া	১৩০৯—১
উমেশচন্দ্র খাসনবিশ মোক্তার	বড়বন্দর,	১৩০৯—১

টীকা

১ পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর (১৮৪১–১৮৯৯) অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর জন্ম নদীয়ার প্রখ্যাত অদ্বৈতাচার্যের বংশে। শান্তিপুরে প্রারম্ভিক পড়াশোনা শেষ করে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। এই সময়ই হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে তখন তিনি ভর্তি হয়েছিলেন মেডিকেল কলেজে ফাইনাল পরীক্ষার আগে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হলে কলেজ ত্যাগ করেছিলেন। কলেজে পড়ার সময় আকৃষ্ট হয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রতি। কলেজ ছাড়ার পর সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সমাজের কাজে। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দুটি গানের তিনিই রচয়িতা। ১২৯৩ সনে তিনি আবার উপবীত গ্রহণ করে ফিরে গিয়েছিলেন হিন্দু ধর্মে। আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঢাকার গেণ্ডারিয়ায়। তাঁর মৃত্যু নীলাচলে।

বিজয়কৃষ্ণের জীবন ও কার্যাবলীর জন্য দেখুন—

অমৃতলাল সেন গুপ্ত, *আচার্য্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী,* কলকাতা ১৯১৫।

জগবন্ধু মিত্র, *প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী*, কলকাতা, ১৯১৪।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, *ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয়,* কলকাতা, ৫৬ ব্রাহ্ম সংবর্ত।

প্রথমোক্ত বইটির অধিকাংশই গালগল্পে ভরা।

২ বাংলা মুদ্রণ ও গদ্য রচনার ক্ষেত্রে উইলিয়াম কেরী (১৭৬১–১৮৩৪) পালন করেছেন পথিকৃতের ভূমিকা। জন্ম ইংল্যাণ্ডে। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন ১৭৯৩ সালে। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামপুর মিশন। এখানেই পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় নির্মিত হয় বাংলা টাইপ। ১৮০১ সালে তাঁকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়। ত্রিশ বছর সেখানে তিনি অধ্যাপনা করেন। পাঠ্যপুস্তকের অভাব মেটানোর জন্য নিজেই পাঠ্যপুস্তক রচনা শুরু করেন। এ ছাড়া ভূবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল। রচনা করেছেন প্রায় ৫০টি বই। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *কথোপকথন* (১৮০১) ও *ইতিহাসমালা* (১৮১২)। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন সজনীকান্ত দাস, *উইলিয়াম কেরী,* কলকাতা, ১৩৮৩।

৩ জন মার্শম্যান ছিলেন ইংরেজ মিশনারী ব্যাপটিস্ট মিশনের সদস্য। শ্রীরামপুরে বসতি বেঁধেছিলেন। *ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া* নামক পত্রিকার ছিলেন সম্পাদক। ভারতে শিক্ষার বিস্তার, বিশেষ করে কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ছিলেন তিনি একজন প্রবক্তা।

৪ উইলিয়াম ওয়ার্ডের জন্ম ১৭৬৯ সালে গ্রেটব্রিটেনের ডার্বিতে। খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কেরীর আহ্বানে ১৭৯৯ সালে যোগ দেন শ্রীরামপুর মিশনে। তারপর কেরীর সেই বিখ্যাত মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। বেশ কিছু গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, *ভিউ অব দি হিস্ট্রি, লিটারেচার অ্যাণ্ড মিথলজি অফ দি হিন্দুজ : ইনক্লুডিং এ মাইনিউট ডেসক্রিপশন অফ দেয়ার ম্যানর্স অ্যাণ্ড কাস্টমস* (৪খণ্ড, ১৮১১)। ১৮২৩ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

Samuel Stennett, *Memoirs of William Ward* London, 1825

J C Marshman, *The Life and Times of Carey Marshman and Ward embracing the History of the Serampore Mission* vol 1-11, London, 1859

৫ আলেকজান্ডার ডাফের জন্ম স্কটল্যাণ্ডে, ১৮০৬ সালে। ১৮৩০ সালে কলকাতায় আসেন মিশনারী হিসেবে। ধর্মপ্রচার ছাড়াও ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে কাজ করেন। ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন' যা পরে পরিণত হয় স্কটিশ চার্চ কলেজে। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা করেন 'ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিশন' যা এখন ডাফ কলেজ নামে পরিচিত। কলকাতার বাইরেও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন কয়েকটি বিদ্যালয়। ১৮৪৫–৪৯ সাল পর্যন্ত ছিলেন বেথুন সোসাইটির সভাপতি। পরলোকগমন করেন ১৮৭৮ সালে। আলোক রায়, *আলেকজান্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন,* কলকাতা, ১৯৮০।

৬. ইয়ং বেঙ্গল নেতা, খৃষ্টধর্ম প্রচারক, শিক্ষাবিদ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮১৩ সালে। ১৮৩১ সালে আলেকজান্ডার ডাফ দ্বারা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন।
বিভিন্ন বিদ্বৎসভার সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগ। বাংলা বিদ্যাকোষ রচনার তিনি পথিকৃত। তাঁর 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' প্রকাশিত হয় ১৩ খণ্ডে (১৮৪৬–৫১)। কয়েকটি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব ল' এবং বৃটিশ সরকার প্রদান করে 'সি আই. ই' উপাধি। ১৮৮৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
যোগেশচন্দ্র বাগল, *কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়*, কলকাতা, ১৩৬২।
H.Das, "The Rev. Krishna Mohan Banerjea", *Bengal Past and Present*, Calcutta, 1929.

৭. গত শতকের ষাট ও সত্তর দশকে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮–১৮৮৪) ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অবিসংবাদী নেতা। শুধু তাই নয়, 'অসাধারণ বাগ্মিতা ও স্বদেশপ্রীতির জন্য দেশজোড়া খ্যাতি ছিল' তাঁর। ১৮৫৬ সালে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ব্রাহ্মসমাজে। ১৮৬১ সালে প্রকাশ করেছিলেন *ইণ্ডিয়ান মিরর* ও *সানডে মিরর*। হিন্দুধর্মের নানাবিধ সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার কাজ চালানোব জন্য কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন তরুণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের বিরোধ বাঁধে, যাব ফলে ১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। ব্রাহ্মদের উপবীত ত্যাগ করার পক্ষে আন্দোলন করে সফল হয়েছিলেন। ১৮৭২ সালে তাঁর উদ্যোগেই 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু ১৮৭৮ সালে তাঁর প্রচারিত নীতি ত্যাগ করে তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর নাবালিকা কন্যাকে কুচবিহারের যুবরাজের সঙ্গে। ফলে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করে গঠন করেন 'সাধাবণ ব্রাহ্ম সমাজ'। এ ঘটনার পর থেকেই সর্বক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র তাঁর প্রভাব হারাতে থাকেন।
পূর্ববঙ্গে কেশবচন্দ্রের কর্মকাণ্ড বা যোগাযোগের জন্য দেখুন, বঙ্কবিহারী কর, *পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা, ১৯৫১। আর কেশবচন্দ্রের ধারাবাহিক জীবনী ও কর্মের বিবরণের জন্য দেখুন, গৌরগোবিন্দ রায়, *আচর্য্য কেশবচন্দ্র*, কলকাতা।

৮. রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র জন্ম বর্ধমানে ১৮২৪ সালে। ১৮৪৩ সালে রেভারেণ্ড ডাফ তাঁকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। শিক্ষাবিদ হিসেবেই জীবন অতিবাহিত করেন। ইংরেজি ভাষায় বেশ কিছু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য *The History of a Bengal Raiyat. Folk Tales of Bengal* মৃত্যুবরণ করেন ১৮৯৪ সালে।

৯. *বান্ধব* সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিক্রমপুরের ভরাকরে (১৮৪৩)। ঢাকা কলেজিয়েটে কিছুদিন পড়ার পর চলে গিয়েছিলেন কলকাতায়। এবং নিজ চেষ্টায় শিখেছিলেন ইংরেজি ভাষা। বিশ বছর বয়সেই কালীপ্রসন্ন পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন বক্তা হিসেবে। প্রথমে, ভবানীপুরে খৃষ্টধর্ম বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর দীর্ঘ তিন ঘণ্টা বক্তৃতা শ্রোতারা শুনেছিল মন্ত্র মুগ্ধের মতো। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত বক্তৃতা শুনে তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমরা ইংরেজীর জন্য যত কেন পরিশ্রম না কর, উহা কখনও তোমাদিগের নাম মুদ্রায় মুদ্রিত হইয়া পৃথিবীতে প্রচলিত হইবে না'। তখন থেকে তিনি উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন বাংলা ভাষা চর্চায়।

কালীপ্রসন্ন ঢাকার ছোট 'আদালতের ক্লার্ক অফ দি কোর্ট' নিযুক্ত হয়েছিলেন বাইশ বৎসর বয়সে। এখানেও বক্তা হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর খ্যাতি।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। প্রধানত ব্রাহ্মদের উদ্যোগে স্থাপিত শুভসাধিনী সভার মুখপত্র হিসেবে 'শুভসাধিনী' প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর সম্পাদনায়। তবে, ব্রাহ্ম সমাজে থাকেননি তিনি বেশীদিন, পরিণত হয়েছিলেন আবার গোঁড়া হিন্দুতে।

১৮৬৯ সালে তাঁর প্রথম বই *নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব* প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে। তবে তাঁর প্রধান কীর্তি *বান্ধব* [১৮৭৪] সম্পাদনা বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত যার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

ঢাকার আদালতে তিনি চাকরি করেছিলেন এগার বছর। এরপর ১৮৭৭ সালে যোগ দিয়েছিলেন ভাওয়াল জমিদাবীর ম্যানেজার হিসেবে। এখানে থাকার সময় তাঁর কারণে কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস বাধ্য হয়েছিলেন

ভাওয়াল ছাড়তে। ভাওয়ালে তিনি ছিলেন চব্বিশ বছর। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ন পরলোক গমন করলে রাণী বিলাসমনি কালীপ্রসন্ন ঘোষের নামে দশ লাখ বাষট্টি হাজার টাকার মামলা করেছিলেন। পরে, এ মামলা অবশ্য আপোষে মিটে গিয়েছিল।

বৃটিশ সরকার তাঁকে ১৮৯৭ সালে রায় বাহাদুর ও ১৯০৯ সালে সি আই ই উপাধি দিয়েছিল। পণ্ডিতরা দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর উপাধি। বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি, যার মধ্যে *প্রভাত চিন্তা* [১৮৭৭], *নিভৃত চিন্তা* [১৮৮৩], *নিশীথ চিন্তা* [১৮৯৬] প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কালীপ্রসন্ন ঘোষ* (সাহিত্য সাধক চরিতমালা), কলকাতা, ১৩৬৫।

মুনতাসীর মামুন, *কালীপ্রসন্ন ঘোষ*, ঢাকা, ১৯৮৮।

১০. নব্যবঙ্গের নেতা রামগোপাল ঘোষের জন্ম ১৮১৫ সালে, হুগলীতে। ডিরোজিওর শিষ্য ছিলেন। ডেভিড হেয়ার ও বেথুনকে স্কুল স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন। সমাজ সংস্কারক রামগোপাল অসাধারণ বাগ্মী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তাঁকে বলা হতো 'ইণ্ডিয়ান ডিমস্থিনিস'। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি দাবি তুলেছিলেন। আইনের চোখে ভারতীয়দের সমান সুযোগ দেয়ার জন্য রচনা করেছিলেন—'A few remarks on certain Draft Acts, Commonly called Black act.' পরলোকগমণ করেন ১৮৬৮ সালে।

১১. ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রখ্যাত প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন হুগলীতে, ১৮৪০ সালে। ১৮৫৯ সালে দীক্ষিত হন ব্রাহ্মধর্মে। 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর সম্পাদক ছিলেন। প্রচারের জন্য প্রথম ইংল্যাণ্ড যান ১৮৭৪ সালে। এরপর আরো কয়েকবার গেছেন ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায়। তাঁর বিখ্যাত একটি বই *Life and Teachings of Kashub Chandra Sen.* এ ছাড়া প্রতাপচন্দ্র রচিত আরো কয়েকটি বই *Oriental Christ, The Spirit of God* ও *Hearts Beats.* মারা যান ১৯০৫ সালে। দেখুন, উপেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *চরিতাভিধান*, কলকাতা, ১৮৩৩ শক।

১২. সমাজ-সংস্কারক, ব্রাহ্মআন্দোলনের অন্যতম নেতা, সাহিত্যিক শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম চব্বিশ পরগণায় ১৮৪৭ সালে। 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন তাঁর মামা। ১৮৭৩-৭৪ সালে সেই সূত্রে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটিও কিছুদিন সম্পাদনা করেন। ১৯৭৪-৭৮ পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকুরি করার পর সরকারি চাকুরির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পদত্যাগ করেন। তারপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কাজই করে গেছেন। ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হলে সাধারণ-ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতারূপে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

১৮৭৭ সালে তিনি গঠন করেছিলেন একটি বৈপ্লবিক সমিতি, স্বাধীনতা লাভ ছিল যার একটি উদ্দেশ্য। এখানে উল্লেখ্য, তাঁর রচিত *যুগান্তর* উপন্যাসের নামে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয় সংবাদপত্র 'যুগান্তর'। বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে জড়িত ছিলেন যা তৎকালীন যুগের তুলনায় বৈপ্লবিক-ই বলা যেতে পারে। ১৮৭৯ সালে 'সিটি স্কুল' প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। ঐ বছরই প্রতিষ্ঠা করেন 'স্টুডেন্ট ইউনিয়ন' ; 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠায়ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে—*আত্মচরিত, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, রাম মোহন রায়, নয়নতারা, History of the Bhamo Samaj, Men I have Seen.* পরলোকগমণ করেন তিনি ১৯১৯।

হেমলতা দেবী, *পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনী*, কলকাতা, ১৯২০।
বারিদবরণ ঘোষ, *শিবনাথ শাস্ত্রী*, দিল্লী, ১৯৯৫।

১৩. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৪৩ সালে হুগলীতে। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং মাত্র আঠার বছর বয়সে ব্রাহ্মসমাজের 'আচার্য' পদ লাভ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বেশ কটি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—*মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত*। মারা যান ১৯১৩ সালে।

১৪. আনন্দমোহন বসুর জন্ম ১৮৪৭ সালে বরিশালে। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় নবম এবং এম.এ. পর্যন্ত বাকী সবগুলি পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়েছেন। তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে র‍্যাংলার ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৪৭ সালে বার-এট-ল পাশ করে তিনি দেশে ফিরে আসেন।
আনন্দমোহন সস্ত্রীক ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়েছিলেন ১৮৬৯ সালে, পরে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপনে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন তের বছর। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে গঠন করেন 'স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন'। এর সভাপতিও ছিলেন তিনি। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ১৮৯৮ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্মেলনের ছিলেন সভাপতি। এ ছাড়া তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কলকাতায় 'সিটি স্কুল' ও 'বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়' স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ ছাড়াও ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ময়মনসিংহ ইনসটিটিউশন' (১৮৮৩) যা আমাদের কাছে আজ পরিচিত 'আনন্দ মোহন কলেজ' হিসেবে। পরলোক গমন করেন ১৯০৬ সালে।

১৫. স্বামী বিবেকানন্দের [১৮৬৩-১৯০২] ছেলেবেলার নাম বীরেশ্বর। অন্নপ্রাশনের সময় তাঁর নাম দেয়া হয়েছিল নরেন্দ্রনাথ। ১৮৮৩ সালে জেনারেল এসেমব্লীজ ইনসটিটিউশন থেকে বি.এ. পাশ করেছিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, পরে রামকৃষ্ণ দেবের সংস্পর্শে এসে আমূল বদলে গিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ দেবের মৃত্যুর পর বরাহনগরে মঠ স্থাপন করে সন্ন্যাস নাম গ্রহণ করেছিলেন বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ সালে শিকাগোয় বিশ্ব ধর্মসভায় যোগ দিয়ে অর্জন করেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি। ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি রামকৃষ্ণ মিশন। ইংরেজি ও বাংলাভাষায় তিনি কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'বাংলা সাহিত্যে সফল কথ্য রীতির অন্যতম প্রধান প্রচারক। তাঁর বক্তৃতা ও রচনা তেজ, বীর্য, কর্তব্যপরায়ণতা, উদারতা, দেশানুরাগ, সাম্য, স্বাধীনতা, সর্বজীবে দয়া, ত্যাগ ও বৈরাগ্য সাধনার বাণীতে ভাস্বর।' উনিশ শতকের শেষার্ধে ও এ দশকের প্রথমার্ধে তাঁর জীবন ও কর্ম যুবসমাজের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।
দেখুন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *বীরেশ্বর বিবেকানন্দ*, দুইখণ্ড, কলকাতা, ১৯৫৮, ১৯৬১।

১৬. রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব উনিশ শতকের শেষার্ধে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনে বিশেষ করে এলিটদের মনের উচ্চাসনে হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছিলেন। তাঁর জন্ম ১৮৩৬ সালে হুগলীতে। রঁমা রঁল্যা তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন--"ত্রিশ কোটি মানুষের দু'হাজার বছরের আধ্যাত্মিক জীবনের সার।" আর রাধাকৃষ্ণের ভাষায়--"**He had helped to raise from the dust the fallen standard of Hinduism, not in words merely, but in works also** "
দেখুন, সুনীতিরঞ্জন রায় চৌধুরী, *উনিশ শতকে নব্য হিন্দু আন্দোলনের নায়ক*, কলকাতা, ১৩৮৮।
শ্রী ম-কথিত, *শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত*, কলকাতা, ১৯৮৩।

১৭. শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীই পরিচিত বারদীর ব্রহ্মচারী হিসেবে। আনুমানিক ১১৩০/৩১ বাংলা সনে পশ্চিমবঙ্গে তাঁর জন্ম। ১২৬৮ সনে তিনি ঢাকার বারদীতে চলে আসেন এবং বারদীর নাগ চৌধুরী বংশের জমিদার সেখানে তাঁর থাকার বন্দোবস্ত করে দেন। ১২৯৭ সালে পরলোক গমণ করেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, পণ্ডিত শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী, *বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস*, ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা।

১৮. দয়ানন্দ সরস্বতীর জন্ম ১৮২৪ সালে গুজরাতে। ১৮৪৬ সালে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তিনি বৈষ্ণব ও শৈব মতের বিরোধী ছিলেন। বিশ্বাস করতেন বেদের অভ্রান্ততায়। জাতিভেদ ও বাল্যবিবাহের বিপক্ষে ছিলেন তিনি, আবার পক্ষে ছিলেন একেশ্বরবাদের। তাঁর চিন্তাধারা হিন্দুসমাজের একাংশকে প্রভাবিত করেছিল। ১৮৮২ সালে কলকাতায় পরলোকগমণ করেন।

১৯. অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম বর্ধমানের চুপী গ্রামে ১৮২০ সালে। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা তাঁর ছিল না বটে কিন্তু সারাজীবন জ্ঞানার্জনেই কাটিয়েছেন। বিজ্ঞান বিষয়ক লেখায় ছিলেন অগ্রগণ্য। ১৮৪২ সালে প্রকাশ করেছিলেন মাসিক *দিগদর্শন*। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। ১৮৪৩ সালেই গ্রহণ করেছিলেন ব্রাহ্মধর্ম। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হলো—*বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* (দুই খণ্ড ১৮৪১, ১৮৫৩) *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (দুই খণ্ড, ১৮৭০, ১৮৮৩)। তাঁর বচিত *চারুপাঠ* (১৮৫২) শিশুপাঠ্য গ্রন্থ হিসেবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিল। জীবন অতিবাহিত করেন বালি গ্রামে। পরলোকগমণ করেন ১৮৮৬ সালে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর দৌহিত্র। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অক্ষয়কুমার দত্ত,* কলকাতা, ১৩৪৯। বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র,* ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৩।

২০. ঢাকার ব্রাহ্মদের (প্রধানত) উদ্যোগ স্থাপিত 'বাল্য বিবাহ নিবারিণী সভা'র মুখপত্র হিসেবে, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল *মহাপাপ বাল্য বিবাহ* (বেশাখ, ১২৮০)। সভা ও পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল একই—বাল্য বিবাহ নিবারণ করা। এর মূল্য ছিল বার্ষিক তিন রুপি ও আয়তন ছিল এক ফর্মা। পত্রিকাটি টিকে ছিলে দু'বছর।
দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সংবাদ সাময়িকপত্র,* কলকাতা, ১৯৯৭।

২১. বেহরামজি মেরওয়ানজি মালাবারি ছিলেন গুজরাটের পার্সী কবি। সহবাস সম্মতি আইনের সময় তাঁর প্রস্তাব নিয়ে প্রবল বিতর্ক উঠেছিল। ১৮৮৪ সালে, বিয়ের বয়স বৃদ্ধির জন্য তিনি লর্ড রিপনের কাছে 'নোটস অন ইনফ্যান্ট ম্যারেজ এণ্ড এনফোর্সড উইডোহুড' নামে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন। বিতর্কের এটিই ছিল ভিত্তি।

২২. শ্রীনাথ চন্দের সম্পাদনায় ১৮৭৯ সালে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল *সঞ্জীবনী*। দু'বছর পর তা লুপ্ত হয়েছিল। ১২৯০ [১৮৮৪] সালে কৃষ্ণকুমার মিত্রের সম্পাদনায় সঞ্জীবনী আবার প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে। কৃষ্ণকুমার ছিলেন শ্রীনাথ চন্দের ছাত্র। দেখুন, শ্রীনাথ চন্দের আত্মজীবনী—*ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর,* ময়মনসিংহ, ১৯১৩।

২৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন—বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ,* তিন খণ্ড, কলকাতা ১৩৬৪, ১৩৬৬।

২৪. পূর্ববঙ্গে কুলীন প্রথার বিরোধী আন্দোলনে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) পালন করেছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। কুলীন বংশোদ্ভূত রাসবিহারীর জন্ম বিক্রমপুরে। আটবার বিয়ে হয়েছিল তাঁর। পরে এ ব্যাপারে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর মনে। কুলীন প্রথার বিরোধীতা করে তিনি অনেক গান ও *বল্লাল সংশোধনী* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন তাঁর আত্মজীবনী, 'জীবন বৃত্তান্ত', নরেশচন্দ্র জানা প্রমুখ সম্পাদিত *আত্মকথা,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮২।

২৫. উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সংস্কারক, বাংলা গদ্য রীতির সার্থক প্রবর্তক, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) জীবন ও কর্মের ওপর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন,
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *আত্মীয় সভার কথা,* কলকাতা, ১৩৮১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য,* কলকাতা, ১৯৭২।
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত,* কলকাতা, ১৩৮১।
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন,* কলকাতা, ১৩৭০।
ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, *রামমোহন ও ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনা,* কলকাতা, ১৩৮৯।
যোগানন্দ দাস, *রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন,* কলকাতা।

২৬. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই [১৮১৭-১৯০৫] ব্রাহ্মমতকে লালন করে বিকাশের পথে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৩৯ সালে স্থাপন করেছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। ১৮৪২ সালে এই সভা গ্রহণ করেছিল ব্রাহ্ম সমাজের ভার। পরের বছর তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং সভার মুখপত্র হিসেবে প্রকাশ করা শুরু করেছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। ব্রাহ্মমত প্রচারে এ পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৮৬৭ সালে ব্রাহ্মরা তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'মহর্ষি', ১২৬৬ সালে বীরভূমের ভুবনডাঙ্গায় বিস্তৃত জমি কিনে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজকের বিখ্যাত শান্তিনিকেতনের ভিত্তি সেই আশ্রমেই। দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের বিবরণের জন্য দেখুন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, [সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত], কলকাতা, ১৯৬২।

২৭. ব্রজসুন্দর মিত্রের [১২২৭–১২৮২ বাংলা সন] জন্ম ঢাকার সিমুলিয়ায়। ১৮৪০ সালে ঢাকার কমিশনার অফিসে কেরাণীর কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ডেপুটি কালেক্টর ও আবগারী কালেক্টর হয়েছিলেন ১৮৪৩ ও ১৮৪৫ সালে। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, হেমলতা সরকার, *স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গে শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্মান্দোলনের আংশিক চিত্র*, কলকাতা, ১৯১৫।

২৮. উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকার একজন অগ্রগণ্য নাগরিক ছিলেন দীননাথ সেন। পূর্ববঙ্গে স্কুল পরিদর্শক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

দীননাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঢাকার দাসরায়, ১৮৩৯ সালে। পড়াশোনা করেছিলেন কুমিল্লা জেলা স্কুলে, পরে ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন [বঙ্কিমচন্দ্রও সেবার ছিলেন পরীক্ষার্থী] কিন্তু কৃতকার্য হন নি। ফলে, শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। এর কিছুদিন পর নিযুক্ত হয়েছিলেন নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক। পূর্ববাংলার স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর হয়েছিলেন শেষ অবধি।

যৌবনেই দীননাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রতি। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ তথা পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও ঢাকার পটুয়াখালিতে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মমন্দির স্থাপনে পালন করেছিলেন অগ্রনী ভূমিকা। একসময় সম্পাদনা করেছেন *ঢাকা প্রকাশ*। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন সংস্কারমূলক আন্দোলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরিণত বয়সে অবশ্য তিনি মত পবির্তন করেছিলেন। পবলোকগমণ করেন তিনি ১৮৯৮ সালে।

উল্লিখিত শিক্ষা সম্মেলন সম্পর্কে দীননাথের জীবনীকার আদিনাথ সেন লিখেছেন—

"প্রথম শিক্ষা সম্মিলনীর পরিকল্পনা দীননাথই করিয়াছিলেন এবং তাহাকে কার্য্যেও পরিণত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি পরীক্ষা করিয়া দীননাথ দেখিতে পাইয়াছিলেন যে যদিও প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেরই উদ্দেশ্য ছাত্রদিগকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে পরীক্ষার জন্য তৈয়ারী করা, তবুও এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পরস্পর অধ্যাপনা, নিয়মানুবর্তিতা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। প্রত্যেকটিই যেন এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান ; এবং নিরপেক্ষভাবে যাহার যাহার অভিপ্রায় অনুসারে পরিচালিত হয়। দীননাথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই বিচ্ছিন্নতা ও স্বৈরচারিতার মধ্যে এক নিয়মানুবর্তিতা না আনিতে পারিলে বাংলাদেশে শিক্ষার উন্নতি সম্ভব নয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলে শিক্ষাদান কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের অনুমতি পাইয়া তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি গবর্ণমেন্ট প্রেসে ছাপা হইয়াছিল এবং পূর্ববিভাগের প্রত্যেক স্কুলে পাঠান হইয়াছিল।"

পূর্ববঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা ক্রফটকে দীননাথ লিখেছিলেন, সম্মেলনের কয়েকটি প্রস্তাব নিয়ে হেড মাষ্টারদের মধ্যে মতভেদ হচ্ছে। "..The points are, the introduction of an hour of recreation enforcing the use of slates instead of paper for writing exercises in the upper classes, and the adaption of the system of changing places in the lower classes."

এই সম্মেলনের অনেক প্রস্তাব বিভিন্ন স্কুলে কার্যকর করা হইয়াছিল।"

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আদিনাথ সেন, *দীননাথ সেনের জীবনী* ও *তৎকালীন পূর্ববঙ্গ*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪৮।

২৯. ঢাকা প্রকাশের প্রথম সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। তিনি তাঁর সময়ে ছিলেন পূর্ববঙ্গের একজন খ্যাতনামা কবি। জন্ম তাঁর ১৮৩৪ সালে যশোরের সেনহাটিতে। পিতার নাম মানিক্যচন্দ্র

মজুমদার। ছদ্মনামে লেখা তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 'ছেলেবেলায় আমার গুপ্ত নাম রামচন্দ্র ছিল।' এ গ্রন্থ থেকেই জানা যায় যে, ছয় বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। তাঁর নানা ছিলেন বরিশালের কীর্তিপাশার জমিদার। তিনি তাঁর জমিদারী থেকে একটি বৃত্তি নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য। পাঁচ বছর বয়সে হাতে খড়ি হয় তাঁব। তাবপর একটু বয়স হতেই তিনি চলে গিয়েছিলেন নানা বাড়ি এবং সেখানে মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে শেখা শুরু করেছিলেন ফার্সী। কিছুদিন পড়াশোনাব পর কৃষ্ণচন্দ্র পালিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতায়। কিন্তু তাবপর ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। এসময় তাঁব মামাতো ভাই প্রসন্ন থাকতেন ঢাকায় এবং কৃষ্ণচন্দ্রও চলে এসেছিলেন সেখানে। সেই সময় তাঁব সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিলে হবিশ্চন্দ্র মিত্রের। ঢাকা থেকে তিনি কলকাতার 'সংবাদ প্রভাকব'-এ লেখা পাঠাতেন। বেকাবত্ব, দাবিদ্র সর্বকিছু যখন কৃষ্ণচন্দ্রকে বিমর্ষ কবে তুলেছে তখন তিনি মাসিক পনের টাকা বেতনে নর্মাল স্কুলের অধীন মডেল স্কুলে চাকবী পেয়েছিলেন হেড পণ্ডিতের। 'আর সেই আশা স্ফূর্তির সহযোগেই এই সময় হইতেই 'সদ্ভাব শতক' লিখিতে আরম্ভ করি, তখন আমার বয়স আন্দাজ ২১/২২ বৎসব।' ১৮৬১ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত *সদ্ভাব শতক* কাব্য গ্রন্থের কয়েকটি কবিতাই তাঁকে অমব কবে রেখেছে। এ বছবই ঢাকাব প্রথম কবিতাপত্র *কবিতা কুসুমাবলী* (১৮৬১) প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর সম্পাদনায় 'বাঙ্গালা যন্ত্র' থেকে।

এ পবিপ্রেক্ষিতেই কৃষ্ণচন্দ্র *ঢাকা প্রকাশ* সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। নর্মাল স্কুলের ১৫ টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে ১৮৬১ সালে *ঢাকা-প্রকাশ*-এ পঁচিশ টাকা বেতনে যোগ দেন। তাবপর চাকবি পেয়েছিলেন যশোরের এক স্কুলে ত্রিশ টাকা বেতনে, কিন্তু *ঢাকা প্রকাশ* কর্তৃপক্ষ তাঁব বেতন দশটাকা বৃদ্ধি করাতে *ঢাকা প্রকাশ*-ই থেকে গিয়েছিলেন। পবে ঢাকার আবেকটি সংবাদপত্র 'বিজ্ঞাপনী'তে সম্পাদকরূপে যোগ দিযেছিলেন পঞ্চাশ টাকা বেতনে। এছাড়া 'মাসিক মনোবঞ্জিকা' নামে একটি সাময়িকপত্রও সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। এসব কিছুতেই তাঁর সহায় ছিলেন বন্ধু হরিশ্চন্দ্র।

সদ্ভাব শতক ছাড়া কৃষ্ণচন্দ্রেব প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে *রা সেব ইতিবৃত্ত* (ঢাকা, ১৮৬৮), *মোহভোগ* (কাব্যগ্রন্থ, ১৮৯১), *কৈবল্যতত্ত্ব* (১৮৮৩), ও *বাবণবধ* (নাটক, মৃত্যুর পব প্রকাশিত)।

চাকবি থেকে অবসব গ্রহণেব পর কৃষ্ণচন্দ্র ফিরে গিয়েছিলেন গ্রামে এবং সেখানেই পবলোকগমন কবেছিলেন ১৯০৭ সালে। এ প্রসঙ্গে লিখেছেন আদিনাথ সেন,—'সদ্ভাব শতকেব উপস্বত্ব নন্দকুমাব গুহেব নিকট ২৮০ টাকায় বিক্রয় করিয়া নিজ গ্রামে গিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় মাবা যান।'

বা. সে. *ইতিবৃত্ত*, ঢাকা, ১৯৬৮।

আদিনাথ সেন, *স্বর্গীয় দীননাথ সেনেব জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ*, কলকাতা, ১৯৪৮। ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদাবের জীবনচরিত*, কলকাতা, ১৯১১। *ঢাকা প্রকাশ*।

৩০. গোবিন্দ রায়েব জন্ম টাঙ্গাইলে। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াব সময় চাকুরীর উদ্দেশ্যে আসাম যান। পি ডব্লিউতে সামান্য কর্মী হিসেবে চাকুবি পান। তারপব নিজ চেষ্টায় শুধু বই পড়ে 'Theodolite Survey এবং Engineering শিক্ষা করেন।' এরপব একই বিভাগে সামান্য বেতনে স্থায়ী পদ লাভ করেন। কালক্রমে পি ডব্লিউ ডি'র সুপারিনটেনডেন্ট হন। সে পদ থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। অবসর নেযাব পর ঢাকার নবাব এস্টেটের ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দু'বৎসর কাজ করেন। পরলোকগমন করেন ১৯০৪ সালে।

সমাজ সেবা ও জনহিতকর কাজে আজীবন জড়িত ছিলেন গোবিন্দ রায়। নিজ গ্রামে স্কুল, পোষ্ট অফিস, ডিসপেনসারী প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য, গিরিশচন্দ্র নাগ, *ডেপুটীর জীবন*, ঢাকা, ১৩৩৪।

৩১. অঘোরনাথ গুপ্তের জন্ম (১৮৪১-১৮৮১) শান্তিপুরে। উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজে এবং যোগ দিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজে। পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে তিনি বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর রচিত *শাক্যমুনিচরিত* ও *নির্বাণতত্ত্ব* বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রথম গ্রন্থ। দেখুন [লেখকের নাম নেই], *সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিত*, কলকাতা, ১৯০৯।

৩২. ব্রেনাণ্ড ছিলেন ঢাকা কলেজের গণিতের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। শিক্ষকতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল, ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। তবে, তৎকালীন ইংরেজদের মতো তিনিও দেশীয়দের অধস্তন ভাবতেন।

৩৩. আর্মেনী ব্যবসায়ী, জমিদার ও ঢাকার প্রভাবশালী নাগরিক নিকি পোগজ ১৮৪৮ সালের ১২ জুন স্থাপন করেছিলেন পোগজ স্কুল। তখন এর নাম ছিল 'পোগজ এ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল এ্যাট ঢাকা'। ১৮৭০ সালে পোগজের মৃত্যুর পর সবজীবাগানের জমিদার মোহিনীমোহন দাস পোগজ স্কুলের দুই তৃতীয়াংশ কিনে এর মালিক হয়েছিলেন। ঐ সময় [আনুমানিক] বর্তমান স্থানে স্কুলটি স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা : স্মৃতিবিস্মৃতির নগরী*, ঢাকা, ১৯৯৩।

৩৪. ঢাকার ব্রাহ্ম আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে, ঢাকার গোঁড়া হিন্দু উকিল কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গোঁড়া হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভা' স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু কাশীকান্তর বড় ছেলে শ্যামাকান্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মে এবং 'ঢাকা প্রকাশ'এ, এর সমর্থনে লেখালেখিও শুরু করেছিলেন। 'পুত্রের এইরূপ আচরণে পিতা মর্মান্তিক ক্লেশ পাইয়াছিলেন এবং এই ঘটনা হইতেই 'ঢাকা প্রকাশ' এর প্রতিদ্বন্দ্বী তত্রত্য হিন্দু সমাজের মুখপত্র স্বরূপ একখানি পত্রিকা বাহির করিবার জন্যে তাহার প্রবল ইচ্ছা জন্মে।' (নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯২২)। সুতরাং 'হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভা'র মুখপত্ররূপে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হতে থাকে *হিন্দু হিতৈষিণী*। হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে (চৈত্র, ১২৭১) পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার শিরোনামের নীচে মুদ্রিত হত একটি শ্লোক—'কর্ম্মনা মনসা বাচা যত্নাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ'। *হিন্দু হিতৈষিণী* কতদিন টিকে ছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথ কেদারনাথের অনুসরণে লিখেছেন, পত্রিকাটি টিকে ছিল ১৮৭৮ পর্যন্ত। কিন্তু সরকারী তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৮৮০ সাল পর্যন্তও পত্রিকাটির অস্তিত্ব ছিল এবং তখন এর প্রচার সংখ্যা ছিল তিনশো কপি। হরিশ্চন্দ্র ১৮৬৯ সালে এর সম্পাদনাভার ত্যাগ করেছিলেন এবং তখন এর সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন আনন্দ চন্দ্র সেনগুপ্ত।
মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*।

৩৫. নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ঢাকার পশ্চিম পাড়ায়, তাঁর পিতা কাশীকান্ত ছিলেন ঢাকার গোঁড়া হিন্দুদের নেতা আর নবকান্ত ছিলেন ব্রাহ্মদের। ১৮৬৯ সালে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ঢাকার বিভিন্ন সভা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। ঢাকার ইডেন স্কুলের একজন প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ যে ক'জনের কারণে বিস্তৃত হতে পেরেছিল, তিনি তার মধ্যে অন্যতম। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, [লেখকের নাম নেই] *নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়*, কলকাতা, ১৯২২।

৩৬. দিল্লী লুট ও গণহত্যার জন্য নাদির শাহ খ্যাত। পারস্যের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন তিনি ১৭৩৬ সালে। মুহম্মদ শাহ যখন মুঘল সম্রাট তখন তিনি ভারত আক্রমণ করেন ; দিল্লী পৌঁছান ১৭৩৯ সালে। দিল্লী জ্বালিয়ে দেন, লুট করেন, হত্যা করেন প্রায় ত্রিশ হাজার বাসিন্দাকে। তাঁর লুটের পরিমাণ ছিল—"thirty crores of rupees in cash. besides Jewels, pearls, diamonds including the koh-i-nur, the Peacock throne, 1000 elephants, 7000 horses, 10,000 camels, a bevy of beautiful young girls from the Mughul harem, 200 builders, 100 masons and 200 carpenters " লুটের পরিমাণ এমন ছিল যে পারস্যে তিনবছর কোন খাজনা আদায় করা হয় নি। নাদির শাহকে হত্যা করা হয় ১৭৪৭ সালে।

৩৭. নাদির শাহ নিহত হওয়ার পর আফগানিস্থানের আবদালী গোষ্ঠীর একজন কর্মকর্তা আহমদ শাহ আফগানিস্থানের শাসন ক্ষমতা দখল করে নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। ১৭৪৮ থেকে ১৭৬৭ পর্যন্ত কয়েকবার তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল আক্রমণ করেন। নাদির শাহর সঙ্গে তিনিও ভারত এসেছিলেন এবং সাম্রাজ্যের শাসনকর্তাদের দুর্বলতা অনুধাবন করেছিলেন। যে কারণে, নাদির শাহ'র মতো তিনিও ভারত আক্রমণ করে লুট করে, বিভিন্ন আফগান গোষ্ঠীর প্রধানদের তা বিতরণ করে খুশি রাখতে চেয়েছিলেন।

৩৮. লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৩৮–১৮০৫) ১৭৮১ সালে, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন ইয়র্কটাউনের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর আত্মসমপণে লুপ্ত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাজ্যের সাম্রাজ্য। ১৭৮৬ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল। ১৭৯৩ পর্যন্ত ছিলেন এ পদে। ১৮০৫ সালে আবার নিযুক্ত হয়েছিলেন এ পদে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পরলোক গমন করেছিলন। বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে ভূমিকা ছিল তাঁর। আভ্যন্তরীন বিভিন্ন সংস্কারগুলি ছিল তাঁর সুদূরপ্রসারী, যার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অন্যতম।

৩৯. ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত লর্ড ডালহৌসী ছিলেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল। তাঁর শাসনকালও খ্যাত সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য। যুদ্ধ ও তাঁর উদ্ভাবিত 'স্বত্ববিলোপ' নীতির মাধ্যমে তিনি বিস্তার করেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। এ নীতিতে বলা হয়েছিল ভারতে বৃটিশ সৃষ্ট রাজ্যগুলির রাজারা উত্তরাধিকারীহীন হিসেবে পরলোক গমন করলে সে রাজ্য কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ক্ষেত্রে দত্তক পুত্রের অধিকার স্বীকার করে নেয়া হবে না। তবে ডালহৌসী আভ্যন্তরীন উন্নতির জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বাংলার শাসনভার অর্পণ করেছিলেন একজন লেফটেনান্ট গভর্ণরের হাতে (১৮৫৪)। গঠন করেছিলেন গণপূর্ত বিভাগ, স্থাপন করেছিলেন রেল, টেলিগ্রাফ এবং উন্নত করেছিলেন ডাক বিভাগ। কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, উডের ডেসপ্যাচ কার্যকর করা শুরু করেছিলেন।

৪০. গৌতম বুদ্ধের অপর নাম।

৪১. তৃতীয় মৌর্য সম্রাট অশোক (২৭৩–২৩২ খৃ: পূ)–এর পুরো নাম অশোক বর্ধন। এ ছাড়াও তিনি পরিচিত দেবনাম প্রিয় ও প্রিয়দর্শিনী নামে। অশোকের সাম্রাজ্য ছিল বিস্তৃত। উত্তর–পশ্চিমে হিন্দুকুশ থেকে পূবে বাংলা, হিমালয় থেকে দক্ষিণে পেন্নান নদ। অশোক ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন প্রজাদের মঙ্গলার্থে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়ার কারণে। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক গ্রহণ করেছিলেন বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যা নেওয়া হয়নি। বলা হয়ে থাকে তিনি একহাজার স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। চীনা পরিব্রাজক ফা–হিয়েন তাঁর আমলে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Romila Thapar, *Asoka and the Decline of the Maurya Empire*, Vincent Smith, *Asoka*, R K Mookerji, *Asoka*
R C Majumdar (ed) *The Age of Imerial Unity, Delhi*

৪২. বিক্রমাদিত্য বলতে সাধারণত তৃতীয় গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে বোঝায় (৩৮০–৪১৫ খৃ:)। অনুমান করা হয় মহাকবি কালীদাস তাঁর দরবারেই ছিলেন। কিন্তু, এই উপাধিটি ভারতবর্ষের অনেক রাজা গ্রহণ করেছিলেন যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্কন্দ গুপ্ত (৪৫৫–৬৭ খৃ:), চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য (৬৫৫–৮০খৃ:), বিক্রমাদিত্য (১০৭১–১১২৫ খৃ:)।

৪৩. অষ্টম শতকে দক্ষিণ ভারতে জন্ম শঙ্করাচার্য্যের। হিন্দু দার্শনিকদের মধ্যে তাঁর স্থান উঁচুতে। উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করেছিলেন তাঁর মতবাদ অদ্বৈত।

৪৪. তৃতীয় মুঘল সম্রাট আকবর (১৫৫৬–১৬০৫)–কেই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যকে তিনি ১৫টি বিভাগ বা সুবায় ভাগ করেছিলেন প্রশাসনিক সুবিধার জন্য। জমির নতুন বন্দোবস্ত করেছিলেন। নতুন ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁর শাসনকালকে দীপ্তিময় বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভিনসেন্ট স্মিথ লিখেছেন—"Akbar was a born king of men, with a rightful claim to be one of the mightiest sovereigns known to history. That claim rests securely on the basis of his extraordinary natural gifts, his original ideas, and his magnificent achievments." দেখুন—Abul Fazl, *Ain-i-Akbari* (trn. by Blochmann and Jarrett). Abul Fazal, *Akbarnamah* (Tran. by H. Beveridge). Vincent Smith, *Akbar the Great Moghal.* Moreland, *India at the death of Akbar.*

৪৫. স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর জন্ম পুনায় ১৬২৭ সালে। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গযেবের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিন সংঘর্ষ চলেছে। ১৬৭৪ সালে তিনি মারাঠা রাজ্যের সৃষ্টি করে নিজেকে স্বাধীন ঘোষনা করেন। মারা যান ১৬৮০ সালে। দেখুন, যদুনাথ সরকার, *শিবাজী*, কলকাতা, ১৯৭৩।

৪৬. রবার্ট ক্লাইভ (১৭২৫–১৭৭৪) বাংলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন পত্তন করেছিলেন। কোম্পানীর রাইটার হিসেবে তিনি ভারতবর্ষে আসেন, তারপর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কর্ণাটকের চান্দা সাহেবকে ১৭৫০ সালে পরাজিত করার পর তিনি কোম্পানীর কর্মকর্তাদের নজরে আসেন।
১৭৫৭ সালে ক্লাইভ ও ওয়াটসন সিরাজউদদৌলার অধিকার থেকে কলকাতা দখল করে নেন এবং জুন ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদদৌলাকে পরাজিত করে বাংলায় কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁকে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৭৬০ সালে ফিরে যান ইংল্যাণ্ডে। লাভ করেন লর্ড উপাধি। কোম্পানীর পরিচালকরা ১৭৬৫ সালে আবার তাঁকে বাংলার গভর্ণর ও সেনাধ্যক্ষ করে পাঠান। ১৭৬৭ সালে অবসর নিয়ে ফিরে যান। স্বদেশে তাঁকে বিভিন্ন অপকর্মের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। অভিযোগ করা হয় যে অবৈধভাবে তিনি ২৩৪,০০০ পাউণ্ড অর্জন করেছেন। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন। দেখুন, Percival Spear, *Master of Bengal, Clive and His India*, London, 1975.

৪৭. ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২–১৮১৮) ছিলেন বাংলার প্রথম গভর্ণর জেনারেল। কোম্পানীর কাজে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ১৭৫০ সালে। বিভিন্ন পদ ঘুরে ১৭৭২ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন বেঙ্গল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাশ হলে এ পদের উপাধি হয়েছিল গভর্ণর জেনারেল অফ ফোর্ট উইলিয়াম ইন লণ্ডন। দ্বৈত শাসনের তিনি বিলোপ ঘটিয়ে কলকাতায় স্থাপন করেছিলেন বোর্ড অফ রেভেনিউ। জমির রাজস্বের ক্ষেত্রে করেছিলেন পাঁচশালা বন্দোবস্ত, কোম্পানীর প্রশাসনিক ভিত্তিও স্থাপন করেছিলেন তিনি। বিচারকার্যের জন্য গঠন করেছিলেন সদর দিওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত। ভারতে কোম্পানী শাসনের বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন। তবে তাঁর শাসনামল নিন্দিত নন্দকুমারের ফাঁসি ও বেনারসের রাজা চৈৎ সিং ও অযোদ্ধার বেগমদের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণের জন্য। ১৭৮৫ সালে তিনি পদত্যাগ করে ফিরে গিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে। তাঁকে সেখানে কুড়িটি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল যার মধ্যে ছিল চৈৎ সিং ও বেগমদের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগও। সাত বছর বিচারেব পর তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন।

৪৮. লর্ড জন লরেন্স (১৮১১–৭৯) ১৮৩০ সালে কোম্পানীর সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে কালক্রমে গভর্ণর জেনারেল এবং ভাইসরয় পদে উন্নীত (১৮৬৪–৬৯) হয়েছিলেন। ভারতীয়দের শিক্ষার বিস্তারে এবং সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নয়নে ছিলেন আগ্রহী।

৪৯. অম্বরের রাজা মানসিংহ সম্রাট আকবরের অধীনে চাকরি নিয়েছিলেন ১৫৬২ সালে এবং ১৬১৪ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি মুঘল সেনাপতি/আমত্য হিসেবে কাটিয়েছেন।

৫০. আকবরেব রাজস্ব মন্ত্রী। জন্ম লাহোরে। ১৫৬১ সালে আকবরের চাকুরিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৫৭৬ সালে বাংলা জয় করেন। ১৫৮০ সালে কয়েক বছবের জন্য বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

৫১. শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নানকের জন্ম লাহোরের সন্নিকটে ১৪৬৯ সালে। তাঁর বাণী ও গান লিপিবদ্ধ আছে গ্রন্থসাহেব–এ যা শিখদেব পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

৫২. বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদেব পরিচিত নিমাই, গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভু, শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য নামেও। জন্ম নদীয়ায়। সন্যাস গ্রহণ করেন ১৫১০ সালে। তাঁর ধর্ম মত মধ্যযুগের বাংলার সমাজ জীবনে বলা যেতে পারে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। তাঁর মূল দর্শন—প্রেমধর্ম। অর্থাৎ সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই।
দেখুন, বিমানবিহারী মজুমদার, *শ্রী চৈতন্যচরিতের উপাদান*, কলকাতা, ১৯৫৯।
হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৮৯।

৫৩. লর্ড জর্জ ফ্রেডরিক স্যামুয়েল রবিনসন রিপন (১৮২৭–১৯০৯) ১৮৮০–৮৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল। গ্ল্যাডস্টোনীয় উদারনীতিতে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। এ কারণে, ভারতবাসীদের কাছে রিপন ছিলেন জনপ্রিয়। 'ভার্ণকুলার প্রেস অ্যাক্ট' তিনি বাতিল করেছিলেন, স্থাপন করেছিলেন স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি। বিচার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসনের জন্য ইলবার্ট বিলের প্রস্তাব

করেছিলেন তিনি। এ বিলের কাবণে, ইংরেজদের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠলেও ভারতীয়দের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আরো প্রিয়। গভর্ণর জেনারেলের পদে পদত্যাগ করে চলে যাবার সময় ভাবতবাসীবা তাঁকে যে ভাবে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন আব কোন ভাইসবয়কে তারা তা জানিয়ে ছিলেন কিনা সন্দেহ।

৫৪. এলাহাবাদ থেকে জর্জ অ্যালেন প্রকাশ করেছিলেন 'পায়োনিয়াব'। 'ইংলিশ ম্যান' ছিল নেটিব বিদ্বেষী ; পরিচিত ছিল 'প্ল্যাটার্স নিউজ পেপার' নামেও। 'বোম্বে গেজেটে'র সম্পাদক রবার্ট নাইট ১৮৬৩ সালে 'বোম্বে গেজেট' ত্যাগ কবাব সময় লাখ খানেক টাকা পেয়েছিলেন। কলকাতায় এসে তিনি প্রকাশ কবেছিলেন 'ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া' ত্রিশ হাজার টাকায়। তাব সঙ্গে পরে একীভূত হয়েছিল 'ইণ্ডিয়ান স্টেটসম্যান' (১৮৭৫)। কালক্রমে 'স্টেটসম্যান' হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভাবতবর্ষেব প্রভাবশালী পত্রিকা। দেখুন, Uma Dasgupta, *Rise of an Indian Public*. Caltutta, 1977
অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতায়। পবে তা রূপান্তরিত হয় ইংরেজিতে।

৫৫. ম্যাক্সমুলাবেব মতে, জীবিত থাকাকালীন রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন শ্রেষ্ঠ ভাবত তত্ত্ববিদ। জন্ম ১৮২৪ সালে কলকাতায়। বিভিন্ন ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ১৮৪৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে যুক্ত হন এবং ১৮৮৫ সালে প্রথম ভাবতীয় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৮৫১ সালে প্রকাশ কবেন মাসিক 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'। সাতবছব পত্রিকাটি চলেছিল। ১৮৬৩ সাল থেকে চারবছর পর্যন্ত সম্পাদনা করেন মাসিক 'রহস্য সন্দর্ভ'। 'হিন্দু–প্যাট্রিয়ট' কিছুদিন সম্পাদনা করেছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, টেক্সটবুক সোসাইটি, দ্বিতীয় কংগ্রেস অধিবেশন (১৮৮৬) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনিই শুরু করেছিলেন ইতিহাস চর্চা। তাঁব কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—*Antiquities of Orissa, Nepalese Buddhist Literature* ইত্যাদি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকেই প্রথম সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী (১৮৭৬) প্রদান করে। সরকাব দিয়েছিলেন রায় বাহাদুর (১৮৭৭), সি আই ই (১৮৭৮) ও রাজা (১৮৮৮) উপাধি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন— "রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটা সভা। তিনি কেবল মননশীল লেখকই ছিলেন না... তাঁহাব মূর্তিতে মনুষ্য প্রত্যক্ষ হইত। অথচ যোদ্ধবেশে তাঁব রুদ্রমূর্ত্তি বিপজ্জনক ছিল। রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান—কখনো পরাভূত হইতে জানিতেন না।" রাজেন্দ্রলাল পবলোক গমন করেন ১৮৯১ সালে। বিস্তারিত বিবরণেব জন্য দেখুন, অলোক বায়, *রাজেন্দ্রলাল মিত্র*, কলকাতা, ১৯৬৯।

৫৬. ১৮৪৩ সালে সিভিলিয়ান হিসেবে রোহিলাখণ্ডে জর্জ ক্যাম্পবেল শুরু কবেছিলেন কর্মজীবন। বাংলাব লে. গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৮৭১ সালে এবং সে পদে ছিলেন ১৮৭৪ পর্যন্ত। তাঁর পূর্বসূরিবা ছিলেন বাংলা ক্যাডারেব সুতরাং বাংলা সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল। ক্যাম্পবেল ছিলেন উত্তব পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ক্যাডারের। ১৮৭১ সালে তিনি প্রবর্তন করেছিলেন প্রাদেশিক রোড সেসের। প্রথম আদমশুমারীও হয়েছিল তাঁর আমলে। ক্যাম্পবেল সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল এ বলে যে, "As a statesman, Sir G. Campbell stands foremost among the Lieutenant Governors and it is unpleasant to add that he was the least popular Perhaps he was too earnest, and saw too far into the future for ordinary men. Perhaps he fell back too completely on 'first principles' disregarded existing facts."

৫৭. থমাস ব্যাবিংটন মেকলে [১৮৮০–১৮৫৯] ছিলেন অভিজাত ইংরেজ পরিবারের সন্তান। চারখণ্ডে 'হিস্ট্রি অফ ইংল্যাণ্ড' [প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৮ ও ১৮৫৫ সালে] গ্রন্থের রচয়িতা। ভারতের ইতিহাসে তিনি খ্যাত শিক্ষা সংস্কারের জন্য। ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত যখন তিনি সুপ্রিম কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ার সদস্য ছিলেন তখন তিনি 'পিনাল কোড' ও শিক্ষা সংস্কারের নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন যা বিতর্কিত। তাঁর শিক্ষানীতির মূল কথা ছিল ভাবতে এমন এক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী গড়ে তুলতে হবে—"Who may interpret between us and the

millions whom we govern--a class of persons, Indian in colour and blood, but English in taste, in opinions, in morlas and in intellect."

৫৮. ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত স্যার চার্লস উড ছিলেন বোর্ড অফ কনট্রোলের সভাপতি। এ পদে থাকার সময় ১৮৫৪ সালে তিনি ভারতের শিক্ষানীতি সম্পর্কে যে দলিল দাখিল করেন তাই বিখ্যাত এডুকেশান ডেসপ্যাচ নামে। উডের এই ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষানীতিতে শৃংখলা এনে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এর বৈশিষ্ট্য হলো, শিক্ষা দান, সরকারি প্রতিষ্ঠানে 'একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ' শিক্ষা দেয়া, শিক্ষার বিভিন্ন স্তর—প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি এবং কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

৫৯. লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেনডিস বেন্টিংক ছিলেন বাংলার শেষ গভর্ণর জেনারেল। ভারতবর্ষের সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য তাঁর শাসনামল উল্লেখযোগ্য। ভারতীয়দের নিম্নপদে বহাল রাখার কর্ণওয়ালিসের নীতি তিনি বাতিল করেছিলেন (যেমন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে ভারতীয়দের নিযুক্তি) প্রাদেশিক কোর্ট বিলুপ্ত কবেছিলেন। সৃষ্টি করেছিলেন বিভাগীয় কমিশনারের পদ। ১৮২৯ সালে লুপ্ত কবেছিলেন সতীদাহ প্রথা, দমন কবেছিলেন ঠগী। সবকারী স্কুল সমূহে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির প্রচলন ও কলকাতা মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গভর্ণব জেনারেলের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলন তিনি ১৮৩৫ সালে।

৬০. পেনহার্স্টের ব্যারণ, চার্লস হার্ডিঞ্জ ১৯১০ থেকে ১৯১৬ সাল পযন্ত ছিলেন ভারতের ভাইসরয়। তাঁর দাদা লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত ছিলেন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল। তাঁর আমলের প্রধান ঘটনা বঙ্গভঙ্গ রদ ও ১৯১১ সালের দিল্লী দরবার।

৬১. বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, M A Qayyum, *A Critical Study of the Early Bengali Grammars, Halhed to Haughton*, Dhaka, 1982.

৬২. উইলিয়াম উইলসন হান্টার [১৮৪০–১৯০০] ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তি পেয়েছিলেন ১৮৬২ সালে। পড়াশোনা করেছেন তিনি গ্লাসগো, প্যারিস ও বনে। ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় তাঁর দান অনস্বীকার্য। বাংলা প্রদেশ নিয়ে তাঁর লেখা, ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত 'অ্যানার্লস অফ রুরাল বেঙ্গল' তৎকালে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব জরীপ তিনিই সংগঠন করেছিলেন এবং ১৮৭৫-৭৭ সালের মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন কুড়িখণ্ডে, 'স্ট্যাটিসটিকাল একাউন্ট অফ বেঙ্গল'। ২৩ খণ্ডে 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া'ও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮২-৮৩ সালের শিক্ষা কমিশনের ছিলেন সভাপতি এবং তাঁর রিপোর্ট পরবর্তীকালের শিক্ষানীতি প্রভাবিত করেছিল। হান্টারের জীবন ও ইতিহাস কর্মের ওপর আলোচনার জন্য দেখুন—
Md. Delwar Hussain, *A Study of Nineteenth Century Historical Works on Muslim Rule in Bengal*, Dhaka, 1987, Chapter IV

৬৩. যদুনাথ মজুমদারের জন্ম ১২৬৬ সালে যশোরের লোহাগড়ায়। এম.এ পাশ করার পর কিছুদিন শিক্ষকতা করেন এবং তারপর 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। পরে সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন লাহোরের সুখ্যাত 'ট্রিবিউন' পত্রিকার। ট্রিবিউনে কিছুদিন চাকরি করার পর নেপাল ও কাশ্মীরের উচ্চপদে চাকরি করেন এবং তারপর যশোরে ফিরে এসে ওকালতি শুরু করেন। ওকালতির পাশাপাশি সামাজিক কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেন।
যশোরে ১৮৮৯–৯০–তে আবার নীলের উপদ্রব শুরু হলে তাঁর চেষ্টায়ই তা বন্ধ হয়। 'সম্মিলনী ইনসটিটিউশন' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া যশোর থেকে *হিন্দু পত্রিকা* নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। যদুনাথ যশোর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন।
সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, ১ম খণ্ড।
কেদারনাথ ভারতী, *কর্ম্মবীর যদুনাথ*, কলকাতা, ১৯২০।

৬৪. "তিনি কেবল প্রাচ্য বিদ্যার সংগ্রাহক বা ভাণ্ডার'ই ছিলেন না", হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পর্কে লিখেছিলেন সুশীলকুমার দে, "এই বিদ্যার আহরণে ও সদ্ব্যবহারেও অসীম উৎসাহী ছিলেন। ... পথিকৃৎ হিসেবে

এবং প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে বহু নতুন তথ্য আবিষ্কারের জন্য প্রকৃত পাণ্ডিত সমাজে এই জ্ঞান তপস্বীর মর্যাদা কোনকালে ক্ষুন্ন হইবার নহে।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জন্মেছিলেন নৈহাটিতে (১৮৫৩-১৯৩১)। কৃতি ছাত্র ছিলেন। 'শাস্ত্রী' উপাধি পেয়েছিলেন ১৮৭৭ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে এম এ পরীক্ষায় একমাত্র ছাত্র হিসেবে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে। বিভিন্ন কলেজে শিক্ষকতা করার পর যোগ দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর যোগ দিয়েছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটিতে এবং প্রায় আজীবন সেখানেই গবেষণা করে কাটিয়ে ছিলেন। তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব নেপাল থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার যা বাংলা ভাষার ইতিহাসের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করেছিল। বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ ছাড়া উপন্যাসও লিখেছেন কয়েকটি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ*, তিনখণ্ড, কলকাতা, ১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮৪।

৬৫ যতটা না হাইকোর্টের অ্যাটর্নি তার চেয়েও বেশি দার্শনিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৪২)। তাঁর শিক্ষাজীবন অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ। ১৮৯৪ সালে হাইকোর্টের অ্যাটর্নিশিপ পরীক্ষা পাশ করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথেও যুক্ত ছিলেন। *পন্থা* ও *ব্রহ্ম বিদ্যা* নামে দু'টি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য, *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, ১ম খণ্ড।

৬৬ নিবেদিতা ছিলেন আইরিশ কিন্তু কাজ করে গেছেন ভারতের মুক্তির। আসল নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল (১৮৬৭-১৯১১)। জন্ম আয়ারল্যাণ্ডে। লণ্ডনে শিক্ষকতা করার সময় ১৮৫৯ সালে বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং তাঁর আহ্বানে ১৮৯৮ সালে ভারতবর্ষে চলে আসেন। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা নেবার পর তিনি তাঁর নামকরণ করেন নিবেদিতা। সেই থেকে তিনি ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিত।

রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য হলেও পরবর্তীকালে তিনি ভারতের মুক্তি ও বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর ভাষণ, লেখা, কর্মকাণ্ড তৎকালীন বাঙালী যুবকদের অনুপ্রাণিত করেছিল। লিখেছিলেন তিনি—"সমগ্র এশিয়া খণ্ডে অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এক অখণ্ড সভ্যতা বিরাজমান। এশিয়াখণ্ডের এই বিশেষ সভ্যতার উদ্ভবকেন্দ্র হইতেছে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ হইতেই প্রাচীন এশিয়ার সবদেশে ধর্ম, সভ্যতা ও দার্শনিক চিন্তাধারা মরু, গিরি, কান্তার, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য রহিয়াছে, ভারতবর্ষের জাতীয়তা বোধের তাহাই মূল ভিত্তি।" তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে— *দি ওয়েব অফ ইণ্ডিয়ান লাইফ, দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম*, ইত্যাদি। দেখুন—

- *Complete Works of Sister Nivedita*, vol I-IV Calcutta 1968 Prabrajika Atmaprana *Sister Nivedita of Ramakrishna Vivekananda* Calcutta 1967
  ভারতকোষ, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা।

৬৭ রাজেন্দ্রলাল আচার্য ছিলেন ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; অনুবাদক ও শিশুসাহিত্যিক হিসেবে তিনি ছিলেন সুপরিচিত।

৬৮ আজ অনেকেই ভুলে গেছেন যে, নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮) এক সময় সাহিত্যিক ছিলেন। পরে তিনি ব্রতী হন বিশ্বকোষ রচনায় এবং একাই ২২ খণ্ডে সমাপ্ত বাংলা ভাষার প্রথম বিশ্বকোষের কাজটি সমাপন করেন। এ ছাড়াও ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৬৯ অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২)-এর জন্ম ফরিদপুরে। পেশা ছিল ওকালতি কিন্তু কালক্রমে জড়িয়ে পড়েন রাজনীতির সাথে এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হয়ে ওঠেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌয় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

৭০ অশ্বিনীকুমার দত্ত জন্মগ্রহণ [১৮৫৬-১৯২৩] করেছিলেন বরিশালে। কংগ্রেসের অন্যতম নেতা অশ্বিনীকুমার স্বদেশী আন্দোলনের সময় তৃণমূল স্তরে আন্দোলন ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশেষ করে বরিশালের রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনে অশ্বিনীকুমারের প্রভাব ছিল প্রবল। বরিশালের ব্রজমোহন ইনস্টিটিউট ও কলেজ তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি।

'যাত্রার গায়ক মুকুন্দ দাসকে স্বদেশী যাত্রায় অনুপ্রাণিত করা অশ্বিনীকুমারের আর এক কীর্তি।' বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, শরৎকুমার রায়, *মহাত্মা অশ্বিনীকুমার*, কলকাতা, ১৯৫৭।

৭১. সরলা দেবী চৌধুরাণী [১৮৭২–১৯৪৫] ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। এ শতকের প্রথম দশকে বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রেখেছিলেন বিশেষ ভূমিকা। কিছুদিন বিখ্যাত 'ভারতী' পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলায় প্রথম বিপ্লবী দল গঠনেও সাহায্য করেছিলেন তিনি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন তাঁর আত্মজীবনী, *জীবনের ঝরাপাতা*, কলকাতা. ১৯৭৫।

৭২. যোগেশচন্দ্র বায়ের জন্ম হুগলী জেলাব দিগড়া গ্রামে ১৮৫৮ সালে। ১৮৮৩ সালে উদ্ভিদবিদ্যার একমাত্র ছাত্র হিসেবে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। চট্টগ্রাম কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে শিক্ষকতা করে ১৯১৯ সালে অবসব গ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে পুরির পণ্ডিতসভা তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে বিদ্যানিধি উপাধিতে ভূষিত করে। মৃত্যুর ঠিক পূর্বে ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদান করে সম্মানসূচক 'ডক্টবেট'। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে চারখণ্ডে *বাংলা শব্দকোষ*, *পূজাপার্বণ*, *অ্যানসিয়েট ইণ্ডিয়ান লাইফ* প্রভৃতি। সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী চবিতাভিধান*, ঢাকা, ১৯৯৭।

৭৩. ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায় ১৮২৭ সালে। উনিশ শতকের বাংলায় শিক্ষা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। শিক্ষালাভ করেছিলেন হিন্দু কলেজে। ১৮৪৮ সালে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতাব মাদ্রাসায় ; ১৯৬৪ সালে উন্নীত হয়েছিলেন স্কুলসমূহের অতিরিক্ত পরিদর্শকরূপে। অবসর গ্রহণ করেছিলেন হান্টাব শিক্ষা কমিশনেব সদস্য হিসেবে ১৮৮৩ সালে। বাংলা ভাষায় আদি উপন্যাসেব মধ্যে অন্যতম ভূদেব মুখোপাধ্যায় বচিত *সফল স্বপ্ন* ও *অঙ্গুবী বিনিময়*। তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ— *পারিবারিক প্রবন্ধ* ও *সামাজিক প্রবন্ধ* ইত্যাদি। বেশ কিছু স্কুলপাঠ্য বইও লিখেছিলেন তিনি। ১৮৭৭ সালে উপাধি পেয়েছিলেন সি.আই.ই। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়েছিলেন ১৮৮২ সালে।

৭৪. মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–১৮৭৩) 'বঙ্গীয় রেনেসাঁর' সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। বাংলায় প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট রচনাও করেছিলেন তিনি। তাঁব জীবন ও কর্মের জন্য দেখুন--গোলাম মুরশিদ, *আশার ছলনে ভুলিনু*, কলকাতা।

৭৫. *বঙ্গবাসী* সাপ্তাহিক আকাবে প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে। সম্পাদক ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়। "বঙ্গবাসীব উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানেব বিস্তার। রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, জীবনচবিত, বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদপত্র।" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র*. ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৪।

৭৬. *বসুমতী* ১৮৯৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক হিসেবে, ১৯১৪ সালে দৈনিক হিসেবে। এ ছাড়া ১৩২৯ থেকে *মাসিক বসুমতী*ও প্রকাশিত হতে থাকে। সাপ্তাহিক *বসুমতী*র সম্পাদক ছিলেন প্রথমে ব্যোমকেশ মুস্তফী, দৈনিকেব শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও মাসিকের হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। সাপ্তাহিক *বসুমতী* প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল—

"প্রতি দিনই বাঙ্গালা সংবাদপত্রেব গ্রাহক সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়া বোধহয়, অতৃপ্ত হৃদয় পাঠকবৃন্দ যেন কোন্ পত্রে মনোমত প্রবন্ধ পাইবেন তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।...এই অভাব যথাসাধ্য মোচনার্থ চেষ্টা করিবার জন্যই 'বসুমতী' প্রচারিত হইল। সংবাদপত্রের আলোচ্য বিষয় রাজনীতিও ইহাতে থাকিবে, দেশের অভাব-অভিযোগাদির কথাও থাকিবে। তদ্ভিন্ন ইতিহাস, দেশনগরাদির বিবরণ, চাষবাসের কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা, হিন্দুর পুরাতন মহিমার কথা, ধর্ম্মশাস্ত্রাদির কথা, উপন্যাস, রঙ্গরহস্য প্রভৃতি সুখপাঠ্য বিষয় থাকিবে। অন্নপ্রাণ বাঙ্গালী অবসন্ন প্রাণে যাহাতে দুটা সুখের কথা, দুটা অর্থের কথা, দুটা উপাদেয় কথা, দুটা আশার কথা, দুটা হাসির কথা পড়িতে পায়, বসুমতীতে প্রধানত তাহারই চেষ্টা করা যাইবে।"

ঐ।

৭৭. উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে মহামারী ছিল সাধারণ ব্যাপার। বিশেষ করে কলেরা এবং ম্যালেরিয়া। এ দুটি রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়ার কারণ ছিল পূর্ববঙ্গের শহর ও গ্রামের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং অপরিকল্পিতভাবে নদ–নদীতে দেয়া বাঁধ। কলেরা এবং ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মাঝে মাঝে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। বাঁধ ছাড়া মহামারীর প্রধান কারণ ছিল জঙ্গল, বদ্ধজলাভূমি এবং পয়–প্রণালীর অভাব। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন—
মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, ঢাকা, ১৯৯৭, প্রথম অধ্যায়।
C.A. Bentley, ***Malaria and Agriculture in Bengal***, **Calcutta, 1925.**

৭৮. উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গে একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫–১৯১৮)। জন্ম, ঢাকার জয়দেবপুরে। নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন ; ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ তাঁর শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করতেন। গ্রামে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে বছর খানেক পড়াশোনা করেন। ভাওয়াল রাজকুমারের সচিব হিসেবে কাজ করার সময় তাঁর সাথে যুদ্ধ শুরু হয় ভাওয়াল এস্টেটের ম্যানেজার সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষের সাথে। গোবিন্দ দাস চাকুরিচ্যুত হন। এরপর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ধরাবাধা কোনো চাকরি ছিল না, অন্নকষ্টেই জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু কাব্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। "পূর্ববঙ্গের প্রকৃতির বর্ণনা, গভীর বাস্তববোধ ও প্রগাঢ় পত্নীপ্রেম তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য।" "স্বভাব–কবি" হিসেবেই তাঁকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সে প্রতিভা স্বাভাবিক গতিতেই স্ফূরিত হইয়াছিল—সংস্কার ও বৈদগ্ধ্যের দ্বারা তাহা পরিপূর্ণভাবে শিল্পসুষমামণ্ডিত হয় নাই। "স্বভাব–কবি" আখ্যার মধ্যেই তাঁহার যথার্থ পরিচয় নিহিত আছে।"
গোবিন্দ দাসের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০টি—*প্রসূন* (১৮৭০), *প্রেম ও ফুল* (১৮৮৮), *কুঙ্কুম* (১৮৯২), *মগের মুল্লুক* (১৮৯৩), *কস্তুরী* (১৮৯৫), *চন্দন* (১২০), *ফুলরেণু* (১৮৯৬), *বৈজয়ন্তী* (১৯০৫), *শোক ও সান্ত্বনা* (১৯০৯), *শোকোচ্ছ্বাস* (১৩১৭)। এর মধ্যে 'মগের মুল্লুক' খ্যাতি অর্জন করেছিল। কালীপ্রসন্নের কারণে ভাওয়াল রাজ তাঁকে ভাওয়াল ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। সে প্রসঙ্গেই এটি রচিত। 'স্বদেশ' শিরোনামে লিখিত তাঁর কবিতাগুলি একসময় সাধারণের মুখে মুখে ফিরতো, যেমন—

> "স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে? এ দেশ তোমার নয়,—
> এই যমুনা গঙ্গানদী, তোমার ইহা হ'ত যদি,
> পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন রয়?
> গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্মা ভরা চুনি মণি,
> সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়?
> স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়!"
>
> মৃত্যুর আগে নিদারুন মর্ম বেদনায় লিখেছিলেন—
>
> "ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে—
> তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?
> আজ যে আমি উপোস করি,
> না খেয়ে শুকায়ে মরি,..."

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন—
হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, *স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস*, রংপুর, ১৯২৬।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *গোবিন্দচন্দ্র দাস*, কলকাতা, ১৩৬৮।

৭৯. উনিশ শতকে যে কজন মহিলা বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেছিলেন, মানকুমারী বসু (১৮৬৩–১৯৪৩) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পিতার নাম আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী যিনি ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের জ্ঞাতি ভাই। যশোরে তাঁর জন্ম, দশ বছর বয়সে বিয়ে হয় বিধুশংকর বসুর সাথে। কিন্তু, সতের বছর বয়সেই বিধবা হন। এরপর তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ (গদ্য–পদ্যের সংকলন) *প্রিয় প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়*। তাঁর রচিত গ্রন্থসংখ্যা ১১। এর

মধ্যে বিখ্যাত *কাব্যকুসুমাঞ্জলী* (১৮৯৩) ; *কনকাঞ্জলি* প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৬ সালে। "হেয়ার-প্রাইজ এসে ফান্ড" থেকে পুরস্কৃত হয়েছিল গ্রন্থটি।
ভাবত সরকার ১৯১৯ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মাসিক তাঁকে ৩০ টাকা বৃত্তি প্রদান করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত 'ভুবনমোহিণী সুবর্ণ পদক' (১৯৩৯) ও 'জগত্তারিণী সুবর্ণ-পদক' (১৯৪১) মানকুমারী বসুকেই প্রথম দেয়া হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে চন্দন নগরে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন'—কাব্য সাহিত্য শাখায় তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন।
মানকুমাবী লিখেছিলেন—"নব্য ভাবতের অন্যতম সুকবি বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিত্বশক্তি এবং গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যিক শক্তির নিকট আমি বহুল পরিমাণে ঋণী। সকলের অপেক্ষা সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রেব ঋণই আমার গুরুতর।"
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন,
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, *মানকুমারী বসু*, কলকাতা, ১৩৬৯।

৮০. ময়মনসিংহের কবি। মৃত্যু ১৩১৯। গ্রন্থ—*শিশুতোষ, মোহনভোগ* ও *হাসিখুশি*।
শাকিরউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, *ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি* [এরপর থেকে উল্লিখিত হবে *মসাস*]।

৮১. কবি মানকুমারী বসু। দ্র. টীকা ৭৯।

৮২. কেদাবনাথের জন্ম ১৮৫১ (১২৭৭) সালে ময়মনসিংহে। সাংবাদিক ও গবেষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত *কুমাব, বাসনা* (১৩০৬), *আবতি* (১৩০৭) ও *সৌবভ* বিশেষ খ্যাতি অর্জন কবেছিল। তাঁব প্রকাশিত গ্রন্থেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য—*ময়মনসিংহের ইতিহাস, ঢাকার বিবরণ* ও *বাঙালির সাময়িক সাহিত্য*।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, যতীন সরকার, *কেদারনাথ মজুমদাব, ঢাকা*।

৮৩. উনিশ শতকের মধ্যভাগে যে ক'জন বাঙালি মহিলা সাহিত্য চর্চা শুরু করেছিলেন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮—১৯২৪) তাঁদের একজন। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"গিরীন্দ্রমোহিনী নারীমনের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে কবিতা বচনা করিয়াছেন, তাঁহার আবেগের কেন্দ্র প্রধানত তাঁহার স্বামী।" *জাহ্নবী* নামে একটি পত্রিকাও তিনি কিছুদিন সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হলো—*জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী* (১৮৭২), *কবিতাহার* (১৮৭৩), *ভারত-কুসুম* (১৮৮২), *অশ্রুকণা* (১৮৮৭), *আভাষ* (১৮৯০), *সন্ন্যাসিনী* (১৮৯২), *শিখা* (১৮৯৬), *অর্ঘ্য* (১৯০২), *স্বদেশিনী* (১৯০৬) এবং *সিন্ধুগাথা* (১৯০৭)।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *গিরীন্দ্রমোহনী দাসী*, কলকাতা, ১৩৬৯।

৮৪. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদাবের জন্ম (১৮৭৭-১৯৫৭) ঢাকার সাভারের কাছে উলাইলে। একুশ বছর বয়সে পিতা বমদারঞ্জনের সাথে মুর্শিদাবাদ চলে যান। সেখানে থাকার সময়ই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এবং *সুধা* নামে একটি সাময়িকপত্রও প্রকাশ শুরু করেন। ১৯০৩ সালের দিকে জমিদারি সূত্রে ময়মনসিংহে আসেন এবং পরবর্তী দশ বছর চন্দ্রকুমার দে'র মতো ঐ অঞ্চলের লোকগাথা সংগ্রহ শুরু করেন। দীনেশচন্দ্র সেনের পরামর্শ অনুযায়ী—রূপকথা, গীতিকথা, রসকথা ও ব্রতকথা—এই চারধবণেব উপাদান সংগ্রহ শুরু করেন। এর ওপর ভিত্তি করে রচিত তাঁর রূপকথাগুলি অমরতা অর্জন করেছে, যেমন, *ঠাকুবমার ঝুলি* (১৯০৮), *ঠাকুরদাদার ঝুলি* (১৯১০), *ঠানদিদির থলে* (১৯১১) ও *দাদা মহাশয়ের থলে*। দেখুন, *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, কলকাতা, ১৯৭৬।

৮৫. উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে অন্যতম সাহিত্য বিষয়ক সাময়িকপত্র ছিল *বান্ধব*। অনেকে একে বলতেন 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন'। ১৮৭৪ সালে ঢাকা থেকে সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষের সম্পাদনায় দীর্ঘদিন অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল *বান্ধব*। প্রথম পর্যায়ে *বান্ধব* চলেছিলো ১১ বছর (১২৮১-৯৫) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫ বছর (১৩০৮-১৩)। '*বান্ধব*' ও এর সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের ওপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন,

মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশে সংবাদ সাময়িকপত্র*, ২য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৭।
মুনতাসীর মামুন, *কালীপ্রসন্ন ঘোষ*, ঢাকা, ১৯৮৮।

৮৬. গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জন্ম ১৮২২ সালে চব্বিশ পরগণার রাজপুরে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠি ও সহকর্মী ছিলেন। ১৮৪৫-৫১ সাল পর্যন্ত ছিলেন সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক, ১৮৫১ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন একই কলেজে। প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম মতবাদ গ্রহণ করলেও পরে তা ত্যাগ করেন। *সংস্কৃত যন্ত্র* স্থাপনে বিদ্যাসাগরকে সহায়তা করেছিলেন। ১৯০৩ সালে পরলোকগমণ করেন। *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*।

৮৭. মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের জন্ম হাওড়ায় (১২৪২ বাংলা সন)। ১৮৬৪ সালে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ১৮৭৬ সালে কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৮৯৫ পর্যন্ত এ দায়িত্ব তিনি পালন করেন। ১৮৮১ সালে সি আই ই ও ১৮৮৭ সালে মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। মৃত্যু, ১৩১২ সনে।
ঐ।

৮৮. কৃষ্ণদাস পালের জন্ম কলকাতার কাঁসরিপাড়ায়। ১৮৩৮ সালে। বাগ্মী এবং সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১৮৬১ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক। এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ছিলেন সেই পদে। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের' সহ-সম্পাদক এবং পরে সম্পাদক হয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক' সভার সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন ১৮৮৩ সালে।
বাকল্যাণ্ড লিখেছিলেন, বাংলার লে: গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল মন্তব্য করেছিলেন কৃষ্ণদাস পাল সম্পর্কে এই বলে যে তাঁর জানামতে, ভারতীয়দের মধ্যে 'best informed' কৃষ্ণদাস ছাড়া কেউ নেই—
"...his assistance in legislation was really valuable ; and in Public affairs he had more force of character then any Native of Bengal. He belong to a caste below that of Brahmin, and was the Editor of *Hindu Patriot* newspaper, published in English. This paper was the organ of the Bengal zamindars and was in the main sustained by them but it had large circulation otherwise both among Europeans and Native, being conducted with independence, loyalty and learning." পরলোকগমন করেন ১৮৮৪ সালে।
দেখুন,
C.E Buckland, *Bengal Under the Lieatenant Governors* vol.II, New Delhi, 1976.

৮৯. প্রতাপচন্দ্র ঘোষের জন্ম ১৮৯০ সালে কলকাতায়। কর্মজীবন শুরু করেন এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারি গ্রন্থাগারিক হিসেবে। পরে কলকাতা জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর রেজিস্টার নিযুক্ত হন। তাঁর রচিত একটি সুপরিচিত উপন্যাস—*বঙ্গাধিপ পরাজয়*। মৃত্যু ১৯২১ সালে।
দেখুন, *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*।

৯০. উপমহাদেশে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য। ১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সমর্থনে এবং উইলিয়াম জোনসের উদ্যোগে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটি। এই সংস্থা প্রচুর দুর্লভ পুঁথি, পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রা সংগ্রহ করেছিল যা সুসংহত ও সহায়তা করেছিল প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণাকে। পরবর্তীকালে এর আদলে বাংলাদেশ, পাকিস্তানেও স্থাপিত হয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি। উইলিয়াম জোনস ও এশিয়াটিক সোসাইটির ওপর আলোচনার জন্য দেখুন—*Sir William Jones : Bicentenary of his Birth Commeration Volume*, Calcutta, 1948.

৯১. *অতিথি* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৩ সালে।

৯২. এ শতকের সাহিত্য বিষয়ক সবচেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকা *প্রবাসী* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০১ সালে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এর সম্পাদক।

৯৩. ময়মনসিংহের সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের মহারাজ কুমুদচন্দ্র (১২৭৩-১৩২২) সাহিত্য ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি লিখতেন। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *কৌমুদী*।

৯৪. সুরেশচন্দ্র ছিলেন সুসঙ্গের জমিদার। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কিছুদিন। নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ—*মৃগনাভি চিরন্তনী* ও *লাজের বাঁধ*। দেখুন, *মসাস*।

৯৫. 'চোখের বালি, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশি হয়েছিল ১৩০৯ সালে।

৯৬. রামপ্রাণগুপ্তের জন্ম ১৮৬৯ সালে ময়মনসিংহের কেদারপুরে। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম আন্দোলনের ছিলেন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি। গবেষক ও ঐতিহাসিক হিসেবে ১৯ শতকে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলায় যাঁরা হজরত মহম্মদ (দ:)–এর জীবনী লিখেছেন, রামপ্রাণ তাঁর মধ্যে চতুর্থ। গ্রন্থাকারে 'হজরত মোহাম্মদ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১১ সনে। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—*মোগল বংশ* (১৩১১), *ইসলাম কাহিনী* (১৯১১), *প্রাচীণ ভারত* (১৩২১) প্রভৃতি। *রিয়াজুস সালাতীন* এর বাংলা অনুবাদও করেছিলেন তিনি। পরলোকগমণ করেন ১৯২৭ সালে। *মসাস*।

৯৭. করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম নদীয়ার শান্তিপুরে ১৮৭৭ সালে। ১৯০২ সালে বি.এ. পাশ করার পর পেশা হিসেবে বেছে নেন শিক্ষকতাকে। ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বঙ্গ–মঙ্গল*। রবীন্দ্রানুসারী এ কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে—*প্রসাদ* (১৩১১), *ঝরাফুল* (১৩১৮), *শান্তিজল* (১৩২০), *ধানদুর্বা* (১৩২৮), *শতনরী* (১৩৩৭), *রবীন্দ্রআরতি* (১৩৪৪), *গীতায়ন* (১৩৫৬) ও *গীতরঞ্জন* (১৩৫৮)। পরলোকগমণ করেন তিনি ১৯৫৫ সালে।
শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন সম্পাদিত, *চরিতাভিধান*, ঢাকা, ১৯৮৫।

৯৮. বাংলা সাহিত্যে মোজাম্মেল হক নামে দু'জন কবি আছেন। একজন শান্তিপুরের এবং অপরজন ভোলার। দু'জনই যার যার নামের শেষে 'ভোলা' অথবা 'শান্তিপুর' লিখতেন যাতে পাঠকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়।
ভোলার মোজাম্মেল হক শুধু কবি ছিলেন না। ছিলেন সাহিত্য সংগঠক, সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদও। ১৮৮৫ সালে ভোলায় তাঁর জন্ম। ১৯০৮ সালে কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন ১৯১২ সালে। কলকাতায় এরপর প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি। আরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেছিলেন ১৯২১ সালে। রাজনীতি সচেতন মোজাম্মেল হক কৃষক প্রজা পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন এবং ১৯৩৭ সালে এ পার্টি থেকে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর পরিচিত কাব্য গ্রন্থের নাম—*জাতীয় মঙ্গল কাব্য*। *ঐ*।

৯৯. নলীনীকান্ত সেনের জন্ম চট্টগ্রাম। সমাজ হিতৈষি ও স্বদেশপ্রেমী নলিনীকান্ত ১৮৯৫ সালের দিকেই চট্টগ্রামে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে বি.এ. পড়ার সময় *আলো* নামে একটি 'শিক্ষামূলক' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। চট্টগ্রামে তিনি বিনা বেতনে এক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন ও 'হিন্দু–মুসলিম সংহতি'র জন্য প্রচেষ্টা চালাতেন। অত্যধিক পরিশ্রমের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। 'সংসদ বাঙালী' চরিতাভিধান'–এ তাঁর-মৃত্যুর তারিখ লেখা হয়েছে ২০.১.১৯০১। *আশার* সংবাদে জানা যাচ্ছে ১৯০৩(৪) সালে নলিনীকান্ত সেন পরলোকগমণ করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে শেষোক্ত তারিখটিই গ্রহণযোগ্য।

১০০. কবি শশাঙ্কমোহন সেনের জন্ম চট্টগ্রামের পটিয়ায় ১৮৭২ সালে। ১৮৯৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় প্রথম হন। বি.এল. পরীক্ষা পাশ করেন ১৮৯৭ সালে। তারপর চট্টগ্রাম ফিরে ওকালতী শুরু করেন কিন্তু সাহিত্য নেশার কারণে তাতে সুবিধা করতে পারেন নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯২০ সালে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দিতে। শশাঙ্কমোহন সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'গোপাল দাস চৌধুরী' অধ্যাপক পদ দিয়ে সম্মানিত করেছিল। "বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের প্রধান কাব্য বিশ্লেষক সম্ভবত তিনিই এবং আমাদের প্রথম আধুনিক সাহিত্য সমালোচকও সেই সাথে।" তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ—*সিন্ধুসঙ্গীত* (১৮৯৬), *শৈল সঙ্গীত* (১৮৯৬), *স্বর্গে ও মর্ত্যে* (১৯২২), *বিমালিকা* (১৯২৪), *সাবিত্রী* (১৯০৯) ইত্যাদি।

১০১. অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণির জন্ম নোয়াখালির পূর্ব-সোমপাড়ায়। নোয়াখালি জেলাস্কুলের হেডপণ্ডিত হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন পরে কাশীর ঈশ্বর পাঠশালায় যোগ দেন। সংস্কৃতে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁকে বারাণসীর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। কাশীতে পরলোক গমণ করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম *ধর্মশাস্ত্র কোষ* যা তিনি সম্পাদনা করেন। এ ছাড়া সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ—*মহাপ্রস্থানম, শ্রী রামাভ্যুদয়ম, ষড় দর্শনের রহস্য, ষড়দর্শনের চিত্র* প্রভৃতি। *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*।

১০২. 'মানসী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'মানসী' তাঁর প্রথম 'কাব্যপদবাচ্য রচনা'—
"মানসী থেকে আবম্ভ করে বাকি বইগুলির কবিতায় ভালোমন্দ মাঝাবি ভেদ আছে, কিন্তু আমাব আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতাব শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।"
ববীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬৩।

১০২.ক. টাঙ্গাইলেব জমিদার প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (১৮৭১–১৯৪৯) ছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের একজন বিশিষ্ট কবি। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়েব সাথে মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সাহিত্য সঙ্গত' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। *সুহৃৎ* নামে একটি সাহিত্য পত্রিকাও সম্পাদনা কবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *কণিকা* উৎসর্গ কবেছিলেন প্রমথনাথ কে। "প্রমথনাথের গীতিকবিতা সে যুগে পাঠক মহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর কাব্যে জন্ম-মৃত্যু, প্রেম-বিরহ-ভালবাসা, দেশভ্রমণেব স্মৃতি, পৌবাণিক কাহিনী ও আদর্শ, নানা উপদেশ, হিমালয় ও সমুদ্র-দর্শনের ফল, বিভিন্ন পূজাপার্বণ উপলক্ষে ভাবনা-চিন্তা বিধৃত হযেছ।" তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের নাম—*পদ্মা* (১৮৯৮), *দীপালী* (১৯০১), *আবতি* (১৯০২), *গৈবিক* (১৯১৩), *পাথার* (১৯১৪) প্রভৃতি।
মসাস, চরিতাভিধান।

১০৩. মোজাম্মেল হকের জন্ম (১৮৬০–১৯৩৬) শান্তিপুরে। সাহিত্যিক ও সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। *শান্তিপুব, লহরী* ও *মোসলেম ভারত* পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। নজরুলের প্রথম জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিল *মোসলেম ভারত*-এ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ–-*হজরত মোহাম্মদ, মহর্ষি মনসুব, শাহনামা, হাতেম তাই* প্রভৃতি।

১০৪. সৈয়দ এমদাদ আলীর জন্ম বিক্রমপুরের খিলগাঁয় ১২৮২ অব্দে (বাংলা সন)। ১৮৯৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কিন্তু অর্থাভাবে আর পড়াশোনা সম্ভব হয় নি। কর্মজীবন শুরু করেন শিক্ষক হিসেবে, পরে যোগ দেন পুলিশে এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশ ইনস্পেক্টর পদে উন্নীত হন। কর্মদক্ষতার কারণে সরকার তাঁকে খানসাহেব উপাধি দিয়েছিলেন।

ছাত্র জীবন থেকে তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেছিলেন। ১৯০৩ সালে *ইসলাম প্রচারক*-এ 'বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব' নামক প্রবন্ধ লিখে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯০৩ সালে তাঁকে *নবনূর* পত্রিকাব সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ করা হয় এবং সাফল্যের সাথে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত তিনি মাসিক পত্রটি সম্পাদনা করেন। *নবনূর* এ তিনি ঘোষণা করেন—

"ভারতবর্ষের অদৃষ্ট ফলকে হিন্দু-মুসলমানের সুখ-দুঃখ এখন একই বর্ণে চিত্রিত। বিজয়দৃপ্ত মুসলমান এখন হিন্দুর ন্যায়ই বিজিত। এই দুই মহাজাতির সম্মিলনের উপরেই ভারতের শুভাশুভ নির্ভর করে। সাহিত্যই এই মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র।

ডালি (১৯১২) তাঁর একমাত্র কবিতার সংকলন। "বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গী, দুদিক দিয়েই এটি গৌরবের দাবী করতে পারে।" মুসলমান নবজাগরণ, নারী জাগরণ ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *তাপসী রাবেয়া* (১৯১৭), *হাজেরা* (১৯২৮)। আনিসুজ্জামান লিখেছেন, *নবনূর* সম্পাদনা তাঁর "খ্যাতির অন্যতম কারণ। এই পত্রিকায় সাহিত্য-সমালোচনার একটি সুষ্ঠু ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। নির্ভীক, পক্ষপাতিত্বহীন ও সরস সমালোচনা অনেক সময় কবি ও লেখককে সম্পাদকের প্রতি বিমুখ করে তুললেও ভবিষ্যতের কাছে সম্পাদক ও তাঁর রসবোধ ও কর্মব্যনিষ্ঠার

স্বাক্ষর রেখে গেছেন।" পরলোক গমণ করেন তিনি ১৩৬৩ (১৯৫৬) সনে। আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৪।
ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৩।

১০৫. দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম (১৮১৯–১৮৭০) চব্বিশ পরগণায়। মাত্র দশ বছর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশোনা স্থগিত থাকে। পরে চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষাগ্রহণ করেন ও চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

১০৬. রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮–১৯০৯) জন্মেছিলেন কলকাতায়। সাহিত্যক, ঐতিহাসিক এবং সিভিলিয়ান–এই তিন পরিচয়েই তিনি ছিলেন বিখ্যাত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল গুপ্ত ও তিনি ১৮৭১ সালে একই সাথে আই সি এস হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন চাকুরিতে। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৮৩), প্রথম ভারতীয় অস্থায়ী বিভাগীয় কমিশনার। কিন্তু, রমেশচন্দ্র যখন অনুভব করলেন যে ভারতীয় হিসেবে তিনি আর উচ্চপদে যেতে পারবেন না তখন পদত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন লণ্ডন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছিলেন। ১৯০৪ সালে বরোদার অর্থমন্ত্রীরূপে আবার ভারতে ফিরে এসেছিলেন। কংগ্রেসের সাথেও যোগ ছিল তাঁর। প্রথমে তিনি ইংরেজিতে লেখা শুরু করলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বাংলায় লিখতে। তারপর তিনি ইংরেজি ছাড়া বাংলায়ও লেখা শুরু করেছিলেন এবং সাহিত্যিক হিসেবে সমসাময়িককালে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ হচ্ছে—*মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত*।

১০৭. বিহারীলাল গুপ্তের (১৮৪৯–১৯১৬) জন্ম কলকাতায়। রমেশচন্দ্র দত্তের সাথে আই.সি. এস হন। ১৮৮২ সালে হাওড়ার জেলা জজ থাকাকালে বাংলা সরকারের কাছে এক নোটে প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন প্রশাসনে অংশগ্রহণের অধিকার যদি ভারতীয়দের থাকে তা হলে লর্ড মেয়োর মৃত্যুর পর পাশকৃত ১৮৭২ সালের আইন অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে ইউরোপীয়দের ওপর ভারতীয় প্রশাসকদের কর্তৃত্ব না দেওয়া অযৌক্তিক। এই নোট বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছার পর সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে, বর্ণের ভিত্তিতে বিচারের নীতিমালা বিলুপ্ত করার জন্য পরিষদে ২.২. ১৮৮৩ সালে স্যার কোর্টনি ইলবার্ট যে বিলটি উত্থাপন করেছিলেন তাই ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত।

১০৮. 'ভারত সভা' বা 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' এর প্রধান স্থপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয়দের আশা আকাঙ্খার বাস্তবায়ন ও জনমত সংগঠনের উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৬ সালে কলকাতায় স্থাপন করেছিলেন এ সভা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী A Nation in Making Calcutta, 1925।

১০৯. 'ভারতী'কে ঠাকুর পরিবারের সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় মাসিক *ভারতী* প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৪ সালে। উদ্দেশ্য ছিল—
"ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাঁহার নামেই সপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ভাবস্ফূর্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ–বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই নত–মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ–দৃষ্টিতে দেখিব।"
১২৯০ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীর সম্পাদক ছিলেন। এরপর যারা ভারতীর সম্পাদক হয়েছিলেন তারা হলেন—স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং সরলা দেবী। এর মধ্যে সরলা দেবী তিনবার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাভাষার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ লেখকরা 'ভারতী'তে লিখতেন।

১১০. *সোনার তরী* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০০ সালে। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'সোনার তরী'র ভাবার্থ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। এ প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্খার আবেগ, কিংবা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সাথে মিলিয়ে নিয়ে, যেমন সোনার তরী কবিতাটি। ছিলাম তখন পদ্মার বোটে। জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাঁচা ধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙিনৌকা হু হু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ওই অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলি ধান। আব কিছুদিন হলেই পাকত। ভবা পদ্মার উপরকার ওই বাদল-দিনের ছবি সোনার তরী কবিতাব অন্তবে প্রচ্ছন্ন এবং তাব ছন্দে প্রকাশিত।"

রবীন্দ্র-রচনাবলী. তৃতীয়খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৭।

১১১ সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদনায় ১৯০৩ সালে (১৩১০, বৈশাখ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় *নবনূর*। মুসলমানদের সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে *নবনূর* একটি ভূমিকা পালন কবেছিল। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখেছিলেন—"যে সমাজে 'আখবারে ইসলামীয়া', 'ইসলাম', 'মাসিক মিহির', 'হাফেজ', 'কোহিনূর' এবং 'লহরী', জন্মের কিছুকাল পবেই অকাল মৃত্যুর অধীন হইয়াছে, সেই সমাজে কেন আবার এই প্রয়াস? ...ইহার উত্তরে আমরা কেবলমাত্র একটি কথা বলিতে পারি, মাতৃভাষার সেবাব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্যই আমবা বাহিরের পূর্ণালোকে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমাদের অন্য সাধ নাই, অন্য লক্ষ্যও নাই।"

১১২. বৃটিশ দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিলের (১৮০৬-৭৩) জন্ম লণ্ডনে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে চাকরি করেছেন ১৮৩৩ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত এবং এ সময়েই তাঁর উল্লেখযোগ্য দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন—*A System of Logic* (১৮৪৩) এবং *Principles of Political Economy* (১৮৪৮)। বৃটিশ উদারনীতিবাদে তাঁর তত্ত্ব চিহ্নিত করেছে ক্রান্তিকাল। মহিলাদের ভোট দেয়ার অধিকার সমথন করে পার্লামেন্টে তিনি প্রস্তাব এনেছিলেন ১৮৬৭ সালে যা বৃটেনে প্রথম। উল্লেখ্য ১৮৬৫ থেকে ৬৮ সাল পর্যন্ত লিবারেল দলের এম.পি. ছিলেন তিনি।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা ছিলেন মিলের অনুরাগী, কারণ, মিল উপযোগবাদ তত্ত্বকে আরো বিস্তৃত করার চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজ এই দার্শনিক ছিলেন গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রবক্তা, ভারতীয়রা যে কারণে তাঁর রচনার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মিলের মতে—'রাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তি যে কারুর যে কোনো আচরণের ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি হবে অধিকতম সংখ্যক মানুষের অধিকতম পরিমাণ সুখ উৎপাদনের উপযোগিতা। যে আচরণ মানুষের এরূপ সুখ উৎপাদনে উপযোগী, সে আচরণ ন্যায্য ; যে আচরণ এর অনুপযোগী সে আচরণ অন্যায্য। মিলের মতে, অবশ্য সুখের নিরিখ কেবল তার পরিমাণ দিয়েই হবে না, পরিমাণের সাথে গুণের প্রশ্নও বিবেচনা করতে হবে। সুখ কেবল পরিমাণগতভাবে পৃথক নয়। সুখ গুণগতভাবেও পৃথক হতে পারে। অর্থাৎ আমরা কেবল অধিক সুখই যে কামনা করব, তা নয়। আমরা উত্তম সুখের বাসনা করব। এবং 'অধিকের' চেয়ে 'উত্তম'ই আমাদের কাম্য হবে। তাছাড়া দৈহিক সুখের চেয়ে মানসিক সুখকে উত্তম বলে মনে করব।' মিলের আরো দু'টি বিখ্যাত বই হচ্ছে—'ইউটিলিটারিয়ানিজম' ও 'অন লিবার্টি'। এ বিষয়ের জন্য দেখুন, সরদার ফজলুল করিম, *দর্শনকোষ*, ঢাকা, ১৯৭৩।

১১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া, বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে (১৮৩৮-১৮৯৪) নিয়ে যত লেখা হয়েছে আর কোনো সাহিত্যিককে নিয়ে বোধহয় ততো লেখা হয় নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দু'জন গ্রাজুয়েটের (১৮৫৮) একজন বঙ্কিমচন্দ্র। তেত্রিশ বছর সরকারী চাকুরী করে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ১৮৯১ সালে। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন তিনি ১৮৭৫ সালে। বাংলা সাময়িকপত্রের মাইফলক 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেছিলেন ১৮৭২ সালে। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা চৌদ্দটি। সম্প্রতি তাঁর জীবন-সাহিত্য ও কাল নিয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন সদ্য প্রয়াত সাহিত্যিক পূর্ণেন্দু পত্রী। নাম—*বঙ্কিমযুগ*, কলকাতা, ১৯৯৭।

১১৪. মনোমোহনের জন্ম ১৮৩১ সনে যশোরে। বাংলা নাট্যজগতে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। উনিশ শতকের থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর কিছু মতামত ভেবে দেখবার মতো। মনে হয় ঐ সময়ের নাটক মঞ্চায়নের সমস্যা তিনি কিছুটা অনুধাবন করেছিলেন। তিনি একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন—..."দুইটি বিষয়ের উল্লখ করা আপাতত অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিতেছি। তাহার প্রথমটি গীতের প্রসঙ্গ। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয় গানের বড় আবশ্যক করে না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্যেই গান নইলে চলে না—আনন্দের কার্য্য দূরে থাকুক, মুমূর্ষ ব্যক্তিকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার সময়ে সুস্বরের সাথে হরিনাম সংকীর্ত্তণ যে দেশে বহু কালের প্রথা—সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে?...আমি এখন বলিতেছি না, যে যাত্রা-ওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকেও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই যে, স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান ঘটিতে পারে, তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই হউক না কেন ফলত যে কয়টি গান হইবে, সে কয়টী যেন উত্তম রূপে গাওয়া হয়। ফল কথা, আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই, দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংসে না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লই।...এদেশে কুলদা কামিনীকে অভিনেত্রীরূপে প্রাপ্ত হওয়া এককালেই অসম্ভব, স্ত্রী অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে গেলে কুলটা বেশ্যাপল্লী হইতেই আনিতে হইবে। ভদ্র যুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবেন, বেশ্যার সাথে নৃত্য করিবেন ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়? ইহাও কি সহ্য হয়?..."
ঢাকায় অভিনেত্রী আনায় কেন বারবার প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে তা ঐ যুগের একজন প্রখ্যাত নাট্যকারের জবানবন্দীতেই বোঝা যায়। ১৯১২ সনে মনোমোহন পরলোকগমণ করেন। তিনি মোট আটটি নাটক রচনা করেছেন *রামাভিষেক* যাব মধ্যে প্রথম।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মনোমোহন বসু*, সাহিত্য সাধক চরিত মালা—৫১, কলকাতা, ১৩৬৩।
সুনীল দাস সম্পাদিত, *মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরি*, কলকাতা, ১৯৮১।

১১৫. উনিশ শতকের বাংলা নাটকের পথিকৃত গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্ম ১৮৪৪ সালে। *শর্মিষ্ঠা* নাটকের গীতিকার হিসেবে নাট্যজগতে পদার্পণ করেন। এরপর আজীবন বিভিন্ন নাট্যমঞ্চের সাথে জড়িত ছিলেন পরিচালক, নাট্যকার ও অভিনেতা হিসেবে। ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত তিনি যে সব মঞ্চের সাথে জড়িত ছিলেন সেগুলি হলো—স্টার, এমারেল্ড, ক্লাসিক, মির্নাভা, কোহিনুর প্রভৃতি। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রায় ৮০টি নাটক বচনা করেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—*সীতার বনবাস* (১২৮৮), *চৈতন্যলীলা* (১৮৮৬), *আবু হোসেন* (১৩০৩), *প্রফুল্ল* (১৮৮৮৯), *সিরাজদ্দৌলা* (১৩১২) প্রভৃতি। পরলোক গমণ করেন ১৯১২ সালে।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, *বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৮।

১১৬. গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক বিখ্যাত নাট্যকার ও নট অমৃতলাল বসুও জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলকাতায় ১৮৫৩ সালে। ১৮৭২ সালে 'নীলদর্পণ'-এ অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যজগতে পদার্পণ। তাঁর রচিত নাটকেব সংখ্যা ৩৪টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—*হবিশচন্দ্র* (১৩০৬), *বিজয় বসন্ত* (১৩০০) *তাজ্জব ব্যাপার*। অসাধারণ অভিনয়ের জন্য সাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন তিনি 'রসরাজ' হিসেবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করেছিল 'জগত্তারিণী পদক'; পরলোক গমণ করেন ১৯২৯ সালে। দেখুন, *ঐ*।

১১৭. উনিশ শতকের অন্যতম নাট্যকার *দীনবন্ধু* মিত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৩০ সালে নদীয়ায়। ডাক বিভাগের কর্মচারী হিসেবে যোগ দিয়ে উন্নীত হয়েছিলেন পোস্টাল ইন্সপেক্টর হিসেবে। কর্মে দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে ১৮৭১ সালে লাভ করেছিলেন রায়বাহাদুর উপাধি। নীলকরদের নিয়ে রচিত ১৮৬০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত *নীলদর্পণ* নাটক প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সমসাময়িককালে *নীলদর্পণ*-এর মতো আর কোন নাটক বাঙালি সমাজে

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। *নীলদর্পণ* প্রথম বাংলা নাটক যা ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছিল। *নীলদর্পণ* ছাড়াও তিনি রচনা করেছিলেন— *সধবার একাদশী, জামাই বারিক, নবীন তপস্বিনী* প্রভৃতি। তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের ওপর আলোচনার জন্য দেখুন, *ঐ*।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দীনবন্ধু মিত্র*, কলকাতা, ১৩৭৭।
Ranajit Guha, 'Neel-Darpan', 'The Image of a Present Revolt in a Liberal Miror', *Journal of Peasant Studies*, vol II, No. I, London, 1975.

১১৮. উপেন্দ্রনাথ দাসের জন্ম ১২৫৫ সনে কলকাতায়। ১৮৭৫ সালে পরিচালক নিযুক্ত হন 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের'। তিনি কয়েকটি নাটকও রচনা করেছিলেন। পরলোকগমণ করেন ১৩০২ সনে।

১১৯. খুব সম্ভবত উনিশ শতকের ষাটের দশকের শুরুতেই নির্মিত হয়েছিল 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'। কারণ, ১৮৬৫ সালের *ঢাকা প্রকাশ*-এর একটি সংবাদে উল্লেখ আছে, ঐ সময় আটহাজার টাকা চাঁদা উঠিয়ে এটি সংস্কার করা হয়েছিল। নব্বই দশকে 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' ভেঙ্গে সেখানে স্থাপন করা হয়েছিল ক্রাউন থিয়েটার। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের থিয়েটার*, ঢাকা, ১৯৮৫।

১২০. কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র (স্বামী শচীন্দ্রনাথ বসু) জন্মগ্রহণ করেন টাঙ্গাইলের বাঘিল গ্রামে। ১৯০৩ সালে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদ্মাবতী মেডেল পেয়েছিলেন। কুমুদিনীর প্রথম গ্রন্থ *শিখের বলিদান* প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ *জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী , মেরী কার্পেন্টার, সমাধি* (১৯১৮)।

১২১. কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্ম বর্ধমানে ১৮৮২ সালে। পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষকতাকে। কবিতার ভাষা ছিল তাঁর সরল, ভাবাদর্শ বৈষ্ণব। তাঁর রচিত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ—*উজানি* (১৯১১), *বনতুলসী* (১৯১১), *স্বর্ণসন্ধ্যা* (১৯৪৮)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদান করেছিল তাঁকে 'জগত্তারিণী পদক'। কুমুদরঞ্জন মারা যান ১৯৭০ সালে।

১২২. "উচ্চাঙ্গের সচিত্র মাসিকপত্র"—মন্তব্য করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ *প্রদীপ* সম্পর্কে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৩০৪ সালে তা প্রকাশিত হয়েছিল। রামানন্দ অবশ্য তৃতীয় বর্ষেই সম্পাদনার ভার ত্যাগ করেছিলেন। ১৩১০ সালে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড।

১২৩. *দেবীপ্রসন্ন* রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় ১২৯০ সনে প্রকাশিত হয় মাসিক *নব্যভারত*। ১৩৩২ সন পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*।

১২৪. মার্কুইস অফ কেডলেসটন বা জর্জ নাথানিয়েল কার্জন (১৮৫৯-১৯২৫) ভারতে প্রথম গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন ১৮৯৯ সালে। ১৯০৪ সালে তাঁকে দ্বিতীয়বারের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু ১৯০৫ সালে কর্তৃপক্ষের সাথে নীতিগত বিরোধ হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁর আমল আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত এ কারণে যে ঐ সময়েই বঙ্গ-বিভাগ হয়েছিল যা বাঙালীর জাতীয়তাবোধকে তীব্র করতে সহায়তা করেছিল। দেখুন, Marques Curzon, *Leaves from a Viceroys Notebook*, 1926. D.Dilks, *Curzon in India*, 1969 ; Earl of Ronaldshay, *Life of Lord Curzon*, 1928.

১২৮. কলকাতা থেকে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে *জানকীর অগ্নি পরীক্ষা* (পৃ. ১৩৫)। গ্রন্থের উপ শিরোনাম ছিল—'কাব্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান'। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল—"জানকীর অগ্নি পরীক্ষা সংক্রান্ত আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত ভারতীয় ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম পরিচ্ছেদ। এই পুরাতন ও পবিত্র কাহিনী, বাল্মীকির পৃথ্বী বিখ্যাত রামায়ণ ও পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক কবিদিগের পুরাণে ও কাব্যোপাখ্যানে, যেভাবে অলিখিত হইয়াছে। তাহা ভক্তির বিলাস ক্ষেত্র স্বরূপ ভারতবর্ষেই সম্ভব। আমি কখনও ভক্তিরসে উচ্চগ্রাম ও অমৃতময় ধামে অরূঢ় হইয়া, ইহা লিখিবার আশা করি নাই। কেবল কথাটি, সরলভাবে ও সরলভাষায়, সর্ব্বজনবোধ্য প্রণালীতে বুঝাইবার জন্য যত্নপর হইয়াছি ; এবং যাহাতে কোনো অংশে, বিদ্বজনের চিত্তরঞ্জন কিংবা বৈজ্ঞানিক যশ ; কামনার অনুরোধে, প্রকৃত সত্যের অপলাপ না হয়, সে বিষয়েও সতত সাবধান রহিয়াছি।..."

১২৫. কিপলিংয়ের (১৮৬৫–১৯৩৬) জন্ম বোম্বেতে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের এই প্রবক্তা মাত্র ২০ বছর বয়সে তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হওয়ার পর খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর বিখ্যাত দু'টি গ্রন্থ, *কিম* এবং *জাঙ্গলবুক*। ১৯০৭ সালে নোবল পুরস্কার লাভ করেন। দেখুন তাঁর আত্মজীবনী, Rudyard Kipling, *Some thing of Myself*, London, 1977.

১২৬. শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায়, ১৮৪৪ সালে। ছাত্রজীবনে প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন এবং পি এইচ.ডিও লাভ করেছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য (১৮৯০–৯৩)। 'স্যার' উপাধি পেয়েছিলেন ১৯০৪ সালে। বেশ কটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। মৃত্যু ১৯১৮ সালে।

১২৭. বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে দেখুন,
Further Papers Relating to the Reconstuction of the Provinces of Bengal and Asam, London, 1905.
Sumit Sarkar, The *Swadeshi Movment*, New Delhi, 1973.
Richard Paul Crorin, *British Policy and Administration in Bengal 1905-1912*, Calcutta, 1977.
মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *বঙ্গভঙ্গ*, ঢাকা, ১৯৮১।

* অনবাধনতাবশত সাহিত্য পরিষদ ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত—এ দু'টি পদের ক্রম নাম্বার এক হয়ে গেছে। অর্থাৎ দুটোর নাম্বার–ই হয়ে গেছে ৭৪। টীকায় *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান* (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬, ১৯৮১)–এর দুইখণ্ড এবং *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান* (১৯৮৫) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

শব্দসূচি

পঞ্চম খণ্ড—২য় সংখ্যা] [ফাল্গুন, ১৩০৩

প্রার্থনা।

হে পরম পিতঃ পরমেশ্বর! দেখ আজ পর্য্যন্তও আমরা ধর্ম্মের প্রকৃততত্ত্ব বুঝিতে পারিলাম না। এখনও ধর্ম্মকে দশটা জিনিসের মধ্যে একটা জিনিস মনে করি। এখনও মনে করি ধর্ম্ম এক দিকে, সংসার আর এক দিকে: ইহাদের মধ্যে যেন এক চিরন্তন বিরোধ রহিয়াছে, যেন ধর্ম্ম করিতে হইলে সংসার ছাড়িতে হইবে, সংসারে বাস করিতে গেলে ধর্ম্মকে ছাড়িতে হইবে। হে জগদীশ! এই ভ্রমে পড়িয়াই ত কত ভ্রাতা ভগিনী ধর্ম্মের নামে বিষম জঞ্জালে পড়িয়া আপনাদের জীবন বৃথায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করি তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ স্বর্গীয় আলো আমাদের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া এই ভ্রমান্ধকার হইতে আমাদিগকে অনেক পরিমাণে উদ্ধার করিয়াছ। কিন্তু হে পরিত্রাতা! আমরা এখনও সেই পুরাতন কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতেছি না। তুমি কৃপা কর, যে আলো জ্বালিয়াছ তাহা যেন আমরা অনুসরণ করিতে পারি। বুঝিতে দেও ধর্ম্ম বাহিরে নয়—ধর্ম্ম ভিতরে, প্রত্যেক কাজে ধর্ম্ম, প্রত্যেক চিন্তায় ধর্ম্ম, ধর্ম্ম জীবনের প্রত্যেক স্তরে প্রবেশ করুক। আহা! তাহা হইলে জীবন বাস্তবিক মধুময় হইবে। ধর্ম্ম সহজ হউক, ধর্ম্ম স্বাভাবিক হউক, তোমাকে আর দূরে রাখিব না—জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে তোমাকে আয়ত্ত করিয়া সুখী ও শুদ্ধ হইব। তোমার আশীর্ব্বাদই আমাদের একমাত্র ভরসা।

সেবক-এর প্রথম পাতা

১ম বর্ষ, চৈত্র, ১৩০৫ ৫ম সংখ্যা

অঞ্জলি।

শিক্ষা বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীরাজেশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত।

[illegible] সাহিত্য বিশারদ [illegible]
শ্রীযোগেন্দ্রমোহন গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চট্টগ্রাম

সনাতন যন্ত্রে, প্রিণ্টার শ্রীহারাণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৵০ আনা।

মাগুরা (যশোহর)
কল্যাণী কার্য্যালয় হইতে
শ্রীবিশেশ্বর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সূচী।

মাগুরা—কল্যাণী প্রেসে
শ্রীকেদার নাথ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩১২ সাল

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা প্রতি সংখ্যা।০ আনা।

আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীসারদাচরণ ঘোষ এম্, এ, বি, এল্।
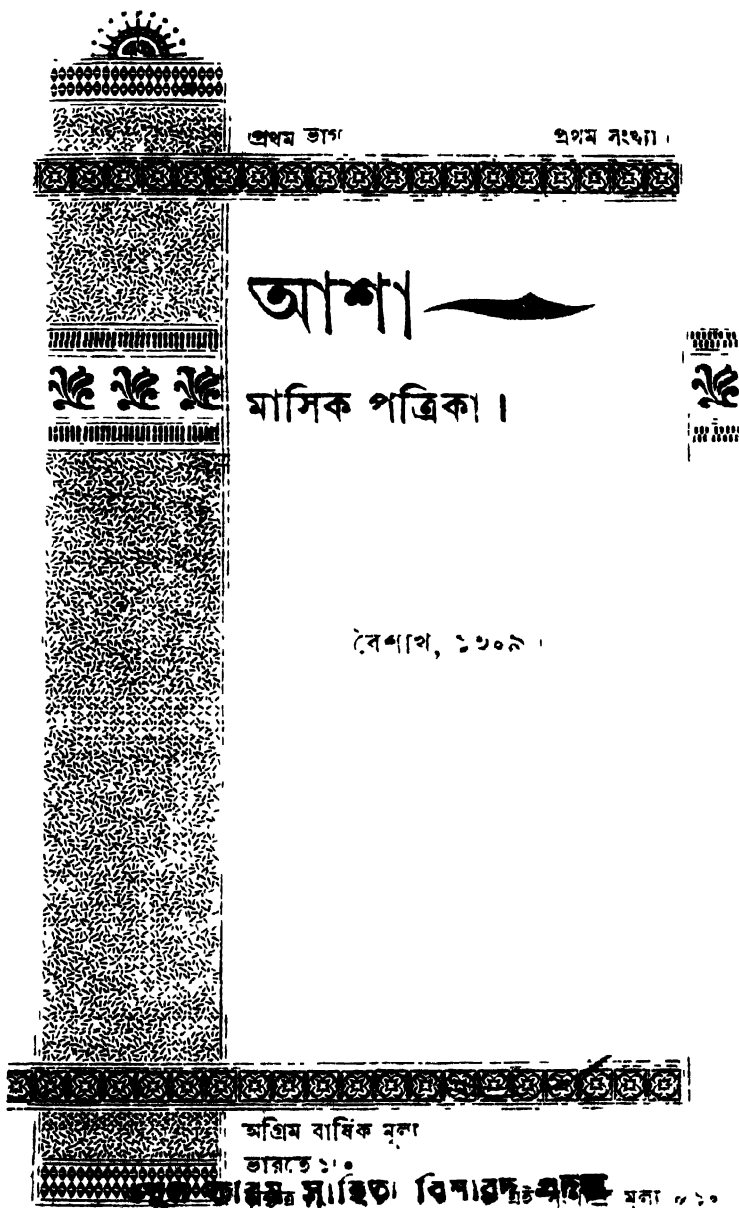
তৃতীয় বর্ষ,

১৩০৯ আষাঢ় হইতে ১৩১০ জ্যৈষ্ঠ।

ময়মনসিংহ
সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত।
মূল্য দেড় টাকা।

প্রথম ভাগ প্রথম সংখ্যা।

আশা

মাসিক পত্রিকা।

বৈশাখ, ১৩০৯।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
ভারতে ১।০

সাহিত্য বিশারদ মূল্য

nted at the Indian Press

১ম ভাগ   চৈত্র—১৩০৯   ১০ম সংখ্যা

ভারত-সুহৃদ

মাসিক পত্র

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত রমনীমোহন ঘোষ বি, এ, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন কি, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র শীল, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী ও সম্পাদক প্রভৃতি।

সূচী।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

সম্পাদক।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত এম. এ, বি. এল।

ও

শ্রীমৌলবী এ, কে, ফজলেলহক্ এম, এ, বি, এল,

বরিশাল।

বিকাশ মেসিন প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে

শ্রীনিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷০ টাকা।   এই সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা

ভারত-সুহৃদ্।

মাসিক পত্র।

প্রথম ভাগ।	মাঘ ও ফাল্গুন।—১৩০৯।	৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

দান।

"What's the true test of living?
A life that's spent in giving."

Alice King.

"Give, give, give, continually, for giving
is of the very nature of Love.
And Love is God, God is Love."

Annie Besant.

একদা প্রজাপতির নিকট দেবতা, অসুর ও মানব তিনজনে উপস্থিত হইয়া, আপনাপন কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করায় প্রজাপতি এক "দ" শব্দদ্বারা তিন-জনকে উত্তর প্রদান করেন। দেবতাকে বলা হইল, দয়াই তাঁহাদের ধর্ম্ম; অসুরকে বুঝাইলেন দম শিক্ষা করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কাজ; আর মানুষকে বলিলেন, পুণ্য সঞ্চয়দ্বারা উন্নত হইবার জন্ত দানই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। এই প্রকারে একাক্ষর "দ"'র দ্বারা তিনজনকে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দেওয়া হইল।

উপরোক্ত বিধানানুসারে আত্মার কল্যাণ হেতু দান শিক্ষা আমাদের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। এখন দেখা যাউক, দান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কিরূপ এবং কি প্রকার দানদ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

সাধারণভাবে লোকে বলে, দানের অধিক পুণ্য নাই। কোন্ শ্রেণীর দানে কি পরিমাণ পুণ্য হইয়া থাকে, শাস্ত্রাদিতে তাহা নানা প্রকারে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত।

"অন্নদঃ সুখমাপ্নোতি সুতৃপ্তঃ সর্ব্ববস্তু।
ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিদ্যাদানং ততোঽধিকম্।

"যিনি অন্ন দান করেন, তিনি অন্ত বস্ত সকলের দাতা অপেক্ষা সুতৃপ্ত হইয়া সুখ লাভ করেন। ভূমিদানের অপেক্ষা দান নাই। বিদ্যাদান তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট।"

অন্নদান দাতাকে তৎক্ষণাৎ সুতৃপ্ত করে। বাস্ত-বিক আশু অভাব মোচনদ্বারা ক্ষুধাক্লিষ্ট ব্যক্তিকে তৃপ্তি দান করতঃ অন্নদাতা যে পুণ্য অতি সত্বর সঞ্চয় করেন তাহা বড়ই প্রীতিপ্রদ। অন্ত কোন দানদ্বারা গৃহীতাকে আপাততঃ তৃপ্ত করা যায়

ভারত-সুহৃদ-এর প্রথম পাতা

"With fit audience though few"

১ম ভাগ] আষাঢ়, ১৩১০ [২য় সংখ্যা।

মাসিকপত্র ও সমালোচনার

সমালোচন।

শ্রীনীরদ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদিত।

"The peole's praise, if always praise unmixed?
And what the people but a herd confused,
A miscellaneous rabble, who extol
Things vulgar and, well weighed, scarce worth the praise?
They praise, and they admire they know not what,
And know not whom, but as one leads the other;
And what delight to be by such extolled,
To live upon their tongues and be their talk,
Of whom to be dispraised were no small praise,"

ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে—

প্রিণ্টার—শ্রীহরিহর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত।

২০শে আষাঢ়। ১৩১০ সন।

ঔষধ খরিদ করিতে

কি তাজ্জবের কথা।

আমার সর্ব্বজ্বরগজসিংহ, সর্ব্বদদ্রুহুতাশন কণ্ডুদাবানলের
রূপ জাল করিয়া আমারই এজেন্ট এবং দোকানদারদিগকে সিকি মূল্যে
্য গোপনে২ বিক্রী করিতেছিল। কোনও২ গ্রাহক আমার ঔষধ ভ্রমে
ল ঔষধ ক্রয় করিয়া ঠকিয়াছেন এবং আমার নিকট পত্র লিখিয়াছেন
এব সর্ব্বসাধারণকে এই সমস্ত জাল জুয়াচুরির কথা জানাইয়া দিতেছি যে
কের নামে মোকদ্দমা করিয়া প্রতিফলও দিয়াছি। তাহার পর হইতেই
ল ঔষধ বিক্রয় একেবারে বন্ধ ছিল।

সম্প্রতি আমার ঔষধ সকলের নামের কিছুটা পরিবর্ত্তন করিয়া
শঙ্খমার্কা বলিয়া যাহাতে লোকের ভ্রম জন্মিতে পারে, তদ্রূপ শঙ্খাকৃতি
িয়া, কেহবা মৎস্য, কেহবা শামুক, কেহবা গরুড়, কেহবা নারিকেল,
হবা কড়িমার্কা দিয়া নকল ঔষধ বিক্রী করিতেছে। এমন কি মোকদ্দ-
র ভয়ে আমার নিকটবর্ত্তী কুটুম্ব বিশেষকে শিখণ্ডীবৎ অগ্রে রাখিয়া ঔষধ
চার করিতেছে। তাহারাই আমার মত কৌটা, লেবেল, ব্যবস্থাপত্র ও
াপনাদি করিয়া ঔষধ নকল করিতেছে। তাহাও সর্ব্বসাধারণকে জানা-
য় দেওয়াতে হতাশ হইয়া পড়িয়া আবার আমার পঞ্জিকাও নকল করিয়াছে।
ই বলি সাবধান! আমার নাম ও রেজেষ্টরী করা শঙ্খমার্কা দেখিয়া লই-
েন, নতুবা ধনে প্রাণে মরিবেন, অথচ মূল্যও ফেরত পাইবেন না।

নিঃ শ্রীলালমোহন সাহা শঙ্খনিধি।

ঢাকা বাবুবাজার ঔষধালয়।

ৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে আমার নিকট স্পষ্টাক্ষরে পত্র লিখিলে ভেঃ
পিঃ পার্শেলে অগোপনে ঔষধ পাইবেন।

ধূমকেতু-তে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন

...tered No E 35

২য় ভাগ। পৌষ ১৩১১। ৯ম সংখ্যা।

নব-বিকাশ

মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—

শ্রীহরকুমার সাহা এম্, এ, বি, এল্।

সূচীপত্র।

ঢাকা

সাচিপাদরিপা, নব-বিকাশ কার্য্যালয় হইতে

শ্রীগোকুলচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত,

সুদর্শন প্রেসে, শ্রীনন্দকিশোর বসাক দ্বারা মুদ্রিত।

[বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা]

বৌদ্ধ পত্রিকা।

মাসিক পত্র।

শ্রীবিপিন চন্দ্র বড়ুয়া কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১ম ভাগ। ২৪৪৯ বুদ্ধাব্দ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১২৬৭ মগাব্দ।

আশ্বিন ১৩১২।

চট্টগ্রাম, গোবিন্দ যন্ত্রে

প্রিন্টার— শ্রীহরেন্দ্র কুমার ভদ্র দ্বারা মুদ্রিত।

চট্টগ্রাম অনাথবাজার বৌদ্ধবিহার ভবন হইতে

প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। প্রতিসংখ্যা ৵০ তিন আনা।